মনের মতো বই

সম্পাদনা

অজয় দাশগুপ্ত

করুণা প্রকাশনী/কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

প্রকাশক ঃ
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
'করুণা প্রকাশনী'
১৮এ টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ
বিষ্ণুপদ চৌধুরী
প্রিণ্ট হোম
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

অধরা মাধুরী



মনের মতো বই—১

আকাশ নিদারুণ কালো করে এসেছে। পশ্চিমে দক্ষিণে, উ রে বাবা, উত্তরেও ঘোর কালো। এবার যা একখানা নামবে আর দেখতে হবে না। দেখতে দেখতে কলকাতা ধুয়ে যাবে ডুবে যাবে তলিয়ে যাবে। বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবে, ট্যাক্সি তার মিটারবাক্স লাল সালুতে জড়াবে কিংবা 'বিকল' এই নিশান তুলে দিয়ে পাশ কাটাবে। আর যদি পড়ি-মরি ছুটে, হুমড়ি খেয়ে, চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে, একটাকে ধরাও যায়, নির্ঘাত প্রশ্ন করে বসবে কোন এলাকা আপনার লক্ষ্য। ভবানীপুর কি শ্যামবাজার, বেহালা কি বেলেঘাটা—সম্ভাব্য একটা উত্তর আপনাকে দিতেই হবে। যাই উত্তর দিন, ড্রাইভার বিপন্ন বা বিষণ্ণ কণ্ঠে একই আপত্তি জানাবে, ও-অঞ্চলে নিদারুণ জল, গাড়ি যাবে না। আপনাকে জলে ফেললেও কথা ছিল, আপনাকে পথে বসাবে।

ট্যাক্সি! ট্যাক্সি! ধরো ধরো, একজন ঠিক গিয়ে ধরল দরজাটা। অমনি কোত্থেকে আরেকজন এসে দাবিদার হল, বললে, 'আমি আগে হাত তুলেছি মশাই।'

'পাকড়ে ধরা আর হাত তোলা সমান হল?' প্রথমজন খেঁকিয়ে উঠল : 'আপনি তো বৃষ্টির থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যেও হাত তুলতে পারেন।'

'কেন হাত তুলেছি ড্রাইভার জানে।' দ্বিতীয়জন বললে।

'ড্রাইভারের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই বৃষ্টির মধ্যে আপনার হাত তোলা দেখেছে।' প্রথমজন আবার গর্জে উঠল : 'পটল তোলা দেখালেই পারতেন। আমি আগে ধরেছি, এ ট্যাক্সি আমার।' বলে প্রথমজন দরজা খুলে গাড়িতে উঠে পড়ল।

বিপরীত দরজা খুলে উঠে পড়ল দ্বিতীয়জন। বললে, 'আমি আগে ডেকেছি, এ ট্যাক্সি আমার।'

'বেশ, ড্রাইভার বলুক এ ট্যাক্সি কার প্রাপ্য!' বললে প্রথমজন।

দ্বিতীয়জন সমর্থন করল : 'বেশ, বলুক ড্রাইভার।'

দুজনেই ড্রাইভারকে সালিশ মানল। আশ্চর্য, এই এক জায়গায় দুই আরোহীর মিল হল।

ড্রাইভার পরম উদাসীনের মত বললে, 'আমি কিছু বলতে পারব না। আপনারা ডিসাইড করুন।'

কেননা ড্রাইভার জানে যে পক্ষের বিরুদ্ধে সে রায় দেবে সে পক্ষই তাকে গালাগাল ছুঁড়বে। বিচারে যে পক্ষ হারে সে পক্ষ বিচারককে নির্ঘাত শালা বলে।

আপনারা ডিসাইড করুন। দুজনে দুকোণে চুপচাপ বসে থাকি। সাধ্য নেই কোনো যুক্তসিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

কেউ কারু জন্যে এতটুকু স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। এ-ও হামবড়া, ও-ও হামবড়া। এ বলে আমি কম কিসে; ও বলে আমিও কিছু ভেসে আসিনি।

ড্রাইভার সিগারেট ধরায়।

প্রথমজন বললে, 'থানায় চলুন।'

দ্বিতীয়জন রুখে উঠল : ভয় দেখাচ্ছেন কি। চলুন থানায়। সেখানে ডিসিশন হবে।'

কিন্তু ড্রাইভার নড়ে না। বলে, 'থানা পর্যন্ত যে যাব তার ভাড়া দেবে কে?'

সুতরাং গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো। বসে থাকো কুণ্ডলী পাকিয়ে। বৃষ্টি ঝরুক, জল বাড়ুক,

সময় চলে যাক। আমি যদি ছেড়ে দি আমি হেরে গেলাম। ও যদি পেয়ে গেল, বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। এ লড়াই বসার লড়াই—বসতে না শিখলে স্কোয়্যাট করতে না শিখলে বাঁচব কি করে?

তখন অনন্যোপায় ড্রাইভার বললে, 'আপনারা যদি এক অঞ্চলের বাসিন্দে হন, চলুন দুজনকেই আমি একে একে পৌঁছে দিচ্ছি।'

এখানেও দুজনের অনৈক্য। এ দক্ষিণের, ও উত্তরের। তখন ড্রাইভার সিগারেটটা শেষ করে নিজের মনে গাড়িতে স্টার্ট দিল। ফ্ল্যাগ ডাউন করে নিয়ে চালাল নিজের মনে।

'এ কি, কোন দিকে যাচ্ছেন?' প্রথমজন চেঁচিয়ে উঠল।

ড্রাইভার নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'হাওড়ায়।'

'ওদিকে আপনাকে কে যেতে বলেছে?' রুখে উঠল দ্বিতীয় জন।

'আপনারাই তো যেতে বললেন।' ড্রাইভার গাড়িতে স্পীড দিল।

'আমরা কখন যেতে বললাম? এই দাঁড়ান, আমি নেমে যাচ্ছি।'

'এই রোকো! হাওড়ায় কে যাবে?'

ট্যাক্সি দাঁড় করাতেই দুজনে দুদিকের দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে গেল। শুধু এই পলায়নেই এদের একতা।

ট্যাক্সির কথা রঞ্জন আপাতত ভাবতেই পারে না। বিশেষত ভরা বৃষ্টির দিনে কলকাতায় ট্যাক্সি কি মিটারে চলে? চলে শুধু ফুরণে।

পুরণ করতে গিয়েই যা ফুরিয়ে যায় তার নাম ফুরণ!

একমাত্র অগতির গতি রিক্সা। বর্ষায় সেই একমাত্র যান—রাজ-যান। কিন্তু তারও গরম কত! স্থলে যা আট আনা জলে তাই আট গুণ।

'হ্যাঁ রে, যাবি?'

রিক্সাওলা গম্ভীর মুখে বললে, 'আপ বলিয়ে বাবু!'

ডালহৌসি স্কোয়ারে রিক্সা কোথায়? সুতরাং সে ভাবনা ছেড়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়ো। ট্রাম-বাস যা পাও ঝুলে পড়ো রড ধরে। রড না পাও আর কারু কোমর ধরে।

এই ডামাডোলে সুবিধে, ভাড়া দিতে হবে না। কি বিপজ্জনক ভাবে ঝুলছি, ভাড়া গুনব কি করে?

বলা বাহুল্য, ভাড়া মারতেই তো ভিড়ের মধ্যে ওঠা। ভিড় দেখে ওঠে পকেটমার, আর আমরা ভাড়া-মার। আবার কখনো কখনো ভিড়ের মধ্যেই নিবিড় হয়ে দাঁড়ানো। কখনো কখনো ও-পক্ষই এমনি নিশ্চল যে উদাসীন হয়ে যেতে হয়।

আচ্ছা, কত ভাড়া রোজ ট্রামে-বাসে মারা যায় তার কোনো খতেন হয়েছে? যারা এমনি করে পয়সা বাঁচায় তারা কি সেই পয়সাটা পথের মোড়ের ভিখিরির হাতে সমর্পণ করে? বয়ে গেছে। তা তো গেছে, কিন্তু বিবেক কি বলে? স্বাভাবিক নীতিবোধ কি বলে? একজনের প্রাপ্য মেরে দিয়ে বেমালুম হজম করছি সেই অন্যায়টা খোঁচা মারে না? রাখো তোমার অন্যায়ের বক্তৃতা! তুমিই যেন তোমার প্রাপ্য পাচ্ছ সব কড়ায় গণ্ডায়! সুবিধে পেয়েছি, মেরে দিয়েছি—এটাই এ যুগের বিধিলিপি। এ যুগে সুবিধাই একমাত্র সু-বিধি!

রেলে তো আগে থেকে টিকিট করে তবে ট্রেনে ওঠা। তবে সেখানে অত ডব্লিউ-টি বা বিনা-টিকিট কেন? বাঃ, টিকিট কাটবার সময় পেলুম কই? স্টেশনে পৌঁছতে দেরি করলে কেন? কেন এক ট্রেন আগে পৌঁছুলে না? বাঃ, বেশ বলেছেন! এক ট্রেন আগে

পৌঁছুলেও এই ভিড়। বাজার করে নেয়ে-খেয়ে চোঙা প্যান্টে বোতাম আঁটতে-আঁটতেই দেরি হয়ে গেল। আগে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে, পাছে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে। সেই দাঁড়িয়ে যাওয়া। সেই একই ঢোলসমুদ্র। টিকিট কাটতে ইচ্ছে করে?

শুধুই কি দাঁড়িয়ে যাওয়া? লাফিয়ে ওঠা নয়? নামা নয় লাফিয়ে? উঠতে গেলে পায়ের তলায় ফুটবোর্ড নেই, নামতে গেলে নেই প্ল্যাটফর্ম। থিত-ভিত কিছু নেই। সর্বত্র একটা হুলুস্থূল চলেছে। যাচ্ছি যে আশা নেই, ফিরছি যে আশ্রয় নেই। যা পাচ্ছি, যৎসামান্য মনে হচ্ছে। আস্তিন গুটিয়ে স্লোগান দিয়ে যদি বা দু'টাকা মাইনে বাড়াচ্ছি, বাজারও তেমনি চড়ে উঠে গালে চড় মারছে। এ যে মশাই, ধামা দিয়ে ছায়া ধরবার চেষ্টা। ডাইনে আনতে বাঁয়ে নেই।

ঐ দেখুন না, আকাশ কালীবর্ণ হয়েছে কি কেরানিরা কলম রেখে উঠে পড়েছে চেয়ার ছেড়ে। পালাই-পালাই রব তুলেছে। ট্রাম-বাস ধরতে গরু-ছোটা ছুটেছে।

অফিস-সুপারইনটেন্ডেন্ট গোপেশবাবুর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল রঞ্জন। এখনকার পার্টে মুখে একটা কাতরতা ফোটাতে হবে বলে গলার স্বরও নম্র করল 'স্যার, বাড়ি যাই—'

চোখ না তুলে গোপেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কটা বেজেছে?'

ডান হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাবার একটা ভঙ্গি করল রঞ্জন। বললে, 'প্রায় চারটে।'

'আরো ঘণ্টা দেড়েক তো অফিসে থাকবার কথা—'

'কিন্তু কি ভীষণ মেঘ করেছে দেখুন! এখুনি হুড়মুড় করে নেমে পড়বে।'

'বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি পড়বে তার আমি কি করতে পারি?'

'কিন্তু তোড়ে একবার নেমে পড়লেই রাস্তা একহাঁটু হয়ে যাবে। বাড়ি পৌঁছুতে পারব না।'

বাড়ি পৌঁছুনোটাই সার কথা। অফিসকে তার বরাদ্দ সময় দেওয়াটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। দাবিটাই মুখ্য, দায়িত্বটা কাল্পনিক। প্রাপ্তব্যটাই আসল, কর্তব্যটা হলে হল, না হলে না-হল! গোপেশবাবু জানেন মোটা কথাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও ছোকরা তর্ক করবে, আর তর্কে বিপক্ষের উকিলকে পরাস্ত করা গেলেও উঠতি বয়সের এক্লেলে যুবককে বিচ্যুত করা যাবে না। শেষকালে বলবে লোকটা হার্টলেস, দুঃস্থ-দরিদ্রের প্রতি এতটুকুও দরদ নেই।

ভুরুতে কুঞ্চন না এনে ঠোঁটে হাসি আনলেন গোপেশবাবু। জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ লজেন্স পেয়েছিলে?'

পেয়েছিলে! 'আপ বলিয়ে স্যার!' রঞ্জনের জিভের ডগায় প্রায় এসে গিয়েছিল। নিজেকে খুব জোর সামলে নিলে। যখন 'তুমি' করে বলেছে, তখন নিশ্চয় একটু অন্তরঙ্গতার ছোঁয়াচ আছে কোথাও। সেই সূত্রে কিছু আনুকূল্য পেতেও পারে বা। তাই সত্য কথাটাই বললে মাথা চুলকে : 'কি করে পাব? রাস্তায় বাস ব্রেকডাউন হল যে—'

গোপেশবাবু রোজ দশটায় অফিসে আসেন, আগতদের মধ্যে তিনিই প্রথমতম, আর আসেন কোটের পকেটে এক ঠোঙা লজেন্স নিয়ে। তাঁর সেই আগের দিনের পোশাক। কোট-প্যান্ট। আর কোটের দুদিকে দুটো বিশাল পকেট, একদিকে যত রাজ্যের কাগজপত্র, আরেক দিকে লজেন্সের ঠোঙা। যে সব কেরানি সাড়ে দশটার মধ্যে অফিসে হাজির,

তাদের প্রত্যেককে একটি করে লজেন্স উপহার দেন, তাদের সময়নিষ্ঠার পুরস্কার বলে। যাদের হাজিরা সাড়ে দশটা পার হয়ে যায়, তারা আর পায় না লজেন্স।

লজেন্সটা হাতে পৌঁছে দিয়ে গোপেশবাবু বলেন, 'একবারটি হাসুন।'

'হাসব!'

'ভুরু কোঁচকাতে যেটুকু পরিশ্রম হয়, হাসিতে ততটুকুও পরিশ্রম লাগে না। একমাত্র হাসিই বিনা-ব্যায়ামের জিনিস।' তখন কেরাণি হাসে।

আরেকজনকে দিয়ে গোপেশবাবু বলেন, 'মুখটাকে একটু মিষ্টি করুন।'

'মানে, লজেন্সটা এক্ষুনি খাব? মিষ্টি মুখ করব?'

'না, না, খেতে বলছি না। কিন্তু একটা মিষ্টি জিনিস পেলেন, মুখটা একটু হাসি-হাসি করবেন তো?'

কেরানি তখন লাজুক মুখে হাসি আনে।

আরেকজনকে গোপেশবাবু সরাসরি বললেন, 'খেয়ে ফেলুন।'

'খেয়ে ফেলব?'

'অনেকদূর থেকে আসছেন, গলা নিশ্চয়ই শুকিয়ে গিয়েছে। মুখে পুরুন, ভালো লাগবে।'

কেরানি লজেন্সটা আঙুলে করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। বললে, 'খাব যে, ভেজাল কিনা কে জানে?'

গোপেশবাবু হেসে উঠলেন ঃ 'লজেন্স ভেজাল কেউ শুনেছেন?'

কেরানি বললে, 'রঙিন কিনা, তাই সন্দেহ হচ্ছে।'

'বোতলে পোরা রঙিন জল ভেজাল শুনেছি। রঙিন ছেড়ে দিন, সাদা কলের জলও ভেজাল। কলের জলে সাপ আসছে, জোঁক আসছে—'

'স্যার, বৃষ্টির জলও ভেজাল।' কে একজন পাশের টেবিল থেকে টিপ্পনী কাটল ঃ 'বৃষ্টির জলও রেডিও-অ্যাকটিভ—'

'জল বলতে একমাত্র চোখের জলই খাঁটি!' কে আরেকজন ওপাশ থেকে বচন ঝাড়ল।

'আজ্ঞে না, চোখের জলও ভেজাল হয়।' গোপেশবাবু আপত্তি করলেন ঃ 'যেমন কুমিরের চোখের জল—কুম্ভীরাশ্রু, ক্রকোডাইল টিয়ার্স—'

সবাই হেসে উঠল।

তারপর গোপেশবাবু রঞ্জনের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি কি বলো? পৃথিবীতে একমাত্র খাঁটি কি?'

রঞ্জন ভরা গলায় বললে, 'রক্ত, স্যার। হিউম্যান ব্লাড। কালো রক্তও লাল, সাদা রক্তও লাল, তামাটে রক্তও লাল।'

'ঠিক বলেছ' গোপেশবাবু রঞ্জনের দিকে একটি গভীর সমর্থনের দৃষ্টি পাঠালেন।

এমনি করে মুখের হাসি আর মনের খুশি দিয়ে তোয়াজ করে তুইয়ে-বুইয়ে কেরানিদের কাজে ধরে রাখেন। তাঁর হাত থেকে লজেন্স পাওয়া একটা প্রিভিলেজের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু কই, আজ রঞ্জনের তো তা জোটেনি?

'রাস্তায় বাস ব্রেক-ডাউন হল! কেন কলিশন নাকি?' গোপেশবাবু পুরোনো কথায় ফিরে গেলেন।

'না, কলিশন নয়। ড্রাইভারগুলো এমন বিশ্রী বেপরোয়া চালায়, গাড়ির প্রতি এতটুকু

মায়া-মমতা দেখায় না—যা চালাবার তাই অচল করে বসে।'

'ঠিক বলেছ।' গোপেশবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'আমরা সবাই অমনি বেপরোয়া চালাচ্ছি, সমাজের প্রতি আমাদের এতটুকু দয়া-মায়া নেই, যা আমাদের সতর্ক হয়ে সযত্নে চালানো উচিত তা তছনছ করে দিচ্ছি।'

'স্যার, বৃষ্টি এসে গেল।' জানলার বাইরে চোখ পাঠাল রঞ্জন ঃ 'দেখুন সবাই কেমন বেপরোয়া হয়ে ছুটেছে!'

'সবাই বলছেন কেন, অনেকেই আবার ছুটছে না। অনেকেই তাদের কর্তব্যে দৃঢ় থাকছে। এ তো শুধু বৃষ্টি—বন্যা নয়, ভূমিকম্প নয়, এয়ার-রেড নয়—

'কলকাতার বৃষ্টি স্যার, ঐ যাদের নাম করলেন, প্রায় তাদেরই সগোত্র।'

গোপেশবাবু হাসলেন। বললেন ঃ 'তবুও অনেকে শেষ পর্যন্ত থেকে যাবে। অন্তত আমি থেকে যাব।'

'আপনার গাড়ি আছে।'

'গাড়ি? তার সম্বন্ধে যত কম বলবে ততই ভালো করবে। আগে ছিল পথি নারী বিবর্জিতা, এখন হয়েছে পথি গাড়ি বিবর্জিতা।' গোপেশবাবু গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেন ঃ 'কিন্তু যাদের গাড়ি নেই তাদের অনেকের কর্তব্য-বুদ্ধি আছে। তারা ঠিক সময়ে আসে, ঠিক সময়ে যায়। কিন্তু তুমি আসতেও লেট, যেতেও আর্লি!'

'যদি যেতে না দেন, যাব না!' রঞ্জনের স্বরে অভিমান ফুটল ঃ 'সকালে বাস ব্রেকডাউন হলে বাকি রাস্তা হেঁটে এসেছি। এখনো বাস-ট্রাম বন্ধ হলে হেঁটেই বাড়ি ফিরতে হবে। ট্যাক্সি দূরের কথা, একটা রিক্সা নেবার মতও আর্থিক সামর্থ্য নেই।'

গোপেশবাবুর মন এমনিতেই নরম হত, এ কথায় আরও নরম হল। তাঁর টেকনিক হচ্ছে, বাইরে থেকে শাসন আরোপ করা নয়, ও-পক্ষের নিয়ম পালনের বোধটাকে জাগিয়ে দেওয়া। রঞ্জনের মধ্যে তবু একটা শ্রী আছে, অনুমতি চাইতে এসেছে—কেউ কেউ যে না বলেই চম্পট দেবে—এরই মধ্যে হয়তো দিয়েছে—তা আর বিচিত্র কি! সতেজ সরলতার জন্যে রঞ্জনকে একটু ভালবাসেন বলেই তার সঙ্গে ঠিক আদেশের পর্যায়ে না থেকে আলাপের পর্যায়ে নেমে আসেন। তাই কণ্ঠস্বরে আশ্বাস নিয়ে বললেন, 'ট্রাম-বাস বন্ধ হতে অন্তত আধঘণ্টা একটানা তুমুল বর্ষণ দরকার। তুমি তার আগেই একটাতে ঠিক জায়গা করে নিতে পারবে। কিন্তু জিজ্ঞেস করি এত তাড়া কিসের? তোমার সেই নাটকের রিহার্সাল নাকি?'

'আজকের রিহার্সাল তো আকাশের স্টেজে—'

'তবে কারু সঙ্গে মীট করার কথা আছে নাকি?'

যাবার কথা ভাবতে ভাবতে অন্যদিকে মন ফেরাল রঞ্জন। বুঝল বৃদ্ধ বিপত্নীক গোপেশবাবু তেমনিধারা কিছুই শুনতে চান। ঘাড় চুলকে একটু নাটুকে আড়ষ্টতায় রঞ্জন বললে, 'সেই রকমই তো কথা ছিল—'

'তোমার সেই রক্তের টান, কি যেন সেই কথাটা—রক্তই রক্তকে ডাকে!'

'কিন্তু দেরি হয়ে গেল বোধ হয়।'

'তবে যাও, ছোটো--বৃষ্টি এসে গেল।'

চোঙা প্যান্ট, ফিতে-বাঁধা ছুঁচলো জুতো--তীরের মত ছুটল রঞ্জন। খরশরধারায় বৃষ্টিও নেমে এসেছে। খানিকটা ছুটে ট্রাম-স্টপের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখল, অদূরে

একটা শেডের নিচে নীলিমা দাঁড়িয়ে।

এ একেবারে আশাতীত। দুর্যোগের মাঝখানে এ কি সৌভাগ্যের চিঠি! ভাগ্যিস গোপেশবাবু দেরি করিয়ে দিয়েছিলেন, তাই তো মিলে গেল এই উপহার—বর্ষার উপরে স্থলে জল-পদ্ম।

'তুমি এখানে?' রঞ্জন উছলে উঠল।

'এই বৃষ্টির জন্যে।' মৃদু-মদির হাসল নীলিমা।

উত্তর শুনেই বোঝা উচিত ছিল নীলিমা কিছু গোপন করছে, পুরোপুরি সব কথা বলছে না খোলাখুলি. কিন্তু রঞ্জনের আনন্দ ওসব কিছু দেখতে চাইল না, মানতে চাইল না। অফিস-পাড়ায় এর আগে তার সঙ্গে যে কোনোদিন দেখা হয়নি, দেখা হবার সম্ভাব্যতা ছিল কিনা, তাও একবাব হিসেবে আনল না। এ পাড়ায় না বে-পাড়ায় কোন অফিসে সে কাজ করে তাতেও তার কৌতূহল ছিল না কোনোদিন। তার একমাত্র লক্ষ্য নীলিমা, একমাত্র লভ্য আনন্দ, একমাত্র জিজ্ঞাস্য ভালোবাসা।

সব কিছু ছুটছে, কিন্তু ভালোবাসাই দাঁড়িয়ে। সব কিছুই অস্থির, একমাত্র ভালোবাসাই অবিচল। সব কিছু বৃষ্টিতে ঝাপসা, একমাত্র ভালোবাসাই স্পষ্ট।

'চলো, এই ট্রামটা কিছু ফাঁকা—'

ফাঁকা মানে পা-দানিটা ফাঁকা। ওঠবার মুখটাতেই গাঁদি মারেনি। একবার উঠতে পারলেই আস্তে আস্তে দাঁড়াবার জায়গা করে নিতে পারবে।

'উঠে পড়ো।' রঞ্জন আবার ডাক দিল।

সেই ডাক মুহূর্তে নীলিমাকে তার সাময়িক বিন্যাস থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিল। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলিয়ে দিল এক নিমেষে। কোনো দ্বিতীয়ের জন্যে অতিরিক্তের জন্যে অপেক্ষা করতে দিল না।

বেশ রপ্ত মেয়ে নীলিমা, চলতি ট্রামেই বেশ উঠে পড়ল।

'তুমি—তুমি কোথায়?' নীলিমা এক পলক চাইল পিছনে।

'আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আমি ঠিক আছি।' অনেক লোকেব ব্যূহ ভেদ করে ঠিক ছুটে এসে রড ধরল রঞ্জন।

জীবনে যৌবন শুধু একবারই আসে। তাকে আসার মত করে আসতে দাও। যৌবন ছাড়া আর কে পেরেছে অসাধ্যের সাধনা করতে? যদি অসাধ্যকে কেউ সম্পন্নও করে থাকে সে যৌবন।

নীলিমা কেন ওখানে এসে দাঁড়িয়েছিল তার ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে। সেটি সে রঞ্জনকে জানতে দিল না। গোপন করলে। বিবেককে বোঝাল সেটা এমন কিছু একটা গগন-বিদারক সংবাদ নয় যে রঞ্জনকে বলতে হবে। রঞ্জন যদি স্বামী হত, তবে আজ কেন, সেদিনই বলত।

কিন্তু স্বামী হলেও বা কতটুকু বলত? কতটুকুই বা বলা যায়?

কিন্তু ব্যাপারটা কি?

কয়েকদিন আগে আরো একবার তুমুল বর্ষণ হয়েছিল এ অঞ্চলে। এরও ঘণ্টা দেড়েক পরে প্রায় সন্ধ্যের ধার ঘেঁষে। আজকের জায়গায় নয়, আরো খানিক দক্ষিণে, আরেকটা গাড়িবারান্দার নিচে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে ছিল নীলিমা। বৃষ্টির ছাঁটে হাত-পায়ের মত তার চিন্তাভাবনাও যেন অসাড় হয়ে পড়েছিল। ভেবে পাচ্ছিল না এ জলপ্রপাত কতক্ষণে

শেষ হবে আর শেষ হলে কিভাবে কতক্ষণে সে বাড়ি পৌঁছুবে দূরের দিকে ক্লান্ত চোখ মেলে বিষাদের ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর এখন উপায় কি?

সেদিন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল সব্যসাচী। যাচ্ছিল মোটরে, হুইল ড্রাইভারের হাতে। ড্রাইভারের পাশে অফিসের চাপরাসী। পিছনের সিটে সব্যসাচীর পাশে তারই অফিসের একজন সহকর্মী।

বামে-দক্ষিণে সমান ক্ষিপ্রতা---সব্যসাচীরই প্রথম চোখ পড়ল। বললে, 'ঐ মেয়েটিকে লিফট দিই! যেন কেমন করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।'

পাশের সহকর্মী সতীনাথ বললে, 'করুণ চোখ দেখে ভোলবার বয়েস কি আর আছে?'

'ভোলবার কিছু নয়। বিপন্নকে সাহায্য করা।'

'সে তো মেয়ে বলেই।' ঠোটের কোণে ঠাট্টা ফোটাল সতীনাথ।

'নিশ্চয়ই। মেয়ে বলেই তো বেশি বিপন্ন।'

'কিন্তু দেখো পরোপকার করতে গিয়ে নিজে না বিপদে পড়ো।' সতীনাথ কঠিন হতে চাইল ঃ 'কে জানে পথেব মেয়ে কিনা!'

'সবাই পথের মেয়ে। ঘর দিলেই আবার ঘরের মেয়ে হয়ে যায়।'

'শেষকালে না ব্ল্যাকমেইল করে!'

তাতেও ভড়কাল না সব্যসাচী। মেয়েটির ঐ একলাটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, আশাহীন আর্ত চাউনি, তাকে ঘিরে একটি অলিখিত লাবণ্য— সব মিলিয়ে ঐ মেয়েটিই সব্যসাচীকে আকর্ষণ করল। তার মত শক্তিশালী অফিসার, সঙ্গে যার চাপরাসী, তদুপরি নিরপেক্ষ সাক্ষী সতীনাথ, তার আবার ভয় কি!

সব্যসাচীর নির্দেশে ড্রাইভার কার্ব ঘেঁষে গাড়িটাকে দাঁড় করাল।

সব্যসাচী মুখ বাড়িয়ে নীলিমার উদ্দেশে ডাক পাঠাল ঃ 'যাবেন?'

সাহেবী পোশাকে কে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক পরিচিত আত্মীয়ের মত তার দিকে হাত বাড়িয়ে কি বলছেন—হাঁ, তাকে লক্ষ্য করেই---নীলিমা কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। ঠিক কি যে বলছেন বৃষ্টির শব্দে স্পষ্ট বুঝতে পারছে না, তবু অবধারিতের মত এমন একটি ডাক— হলই বা তা ছোট ও দ্রুত— নীলিমা উপেক্ষা করতে পারল না। ডান হাতটা তুলে মাথাটা আড়াল করে---যেন হাত দিয়ে ঐ বৃষ্টির কিছু প্রতিবিধান করা যাবে, ফুটপাত পেরিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে এগিয়ে এল। প্রশ্নটা কি, যেন শোনবার জন্যে কানটাকে তীক্ষ্ণ করল।

'আপনি কোন দিকে যাবেন?'

'সাউথে।'

'তবে চলুন, উঠে পড়ুন।' সব্যসাচী গাড়ির দরজা খুলে দিল।

দ্বিধা করবার মত বিন্দুমাত্রও সময় পেল না নীলিমা। এইটুকু আসতেই সে বেশ ভিজে গিয়েছে, আরো ভিজে আগের জায়গায় ফিরে যাবার কোনো অর্থ হয় না। আব সে তো শুধু ফিরে যাওয়া নয়, ভিজে কাপড়ে অনির্দেশ্যকাল দাঁড়িয়ে থাকা। তা ভাবতেও গায়ে শীত ধরে। তবু একবার সব্যসাচীর চোখের উপর চোখ রাখল নীলিমা। মনে হল সে চোখে শুধু আশ্বাসই নেই, বিশ্বাসও আছে। তাছাড়া এটা এখন জরুরীকালীন অবস্থা। সাপ ধরে দেয়াল ডিঙিয়ে যাবার মত---এখন অত সূক্ষ্ম বাছবিচার করা যায় না। বৃষ্টির ছাঁট দিচ্ছে না বিচার করতে।

নীলিমা গাড়ির মধ্যে উঠে পড়ল।

যতদূর সরে বসা যায় বসল সব্যসাচী। বললে, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

এটা একটা প্রশ্নই নয়। কেননা নীলিমা যদি টালিগঞ্জে থাকে আর ভদ্রলোকের বাড়ি যদি ভবানীপুরে হয়, তবে এ আশা করা মোটেই ন্যায্য হবে না যে ভদ্রলোক তাকে আগে টালিগঞ্জে পৌঁছে দিয়ে পরে ভবানীপুরে ফিরবেন। বরং ভদ্রলোকের যতদূর দরকার ততদূর চলুন, পথে নীলিমার বাড়ি বা রাস্তা পড়ে সে নেমে যাবে, না পড়ে তো এ ভদ্রলোকের গন্তব্যেই নিজের গন্তব্য শেষ করবে—গাড়ির জন্যে আর পথ বাড়াবে না। সেইটেই সমীচীন। সেইটেই সুশোভন।

তাই মুখে হাসি এনে বেশ সপ্রতিভের মত নীলিমা বললে, 'তার চেয়ে আপনার বাড়ি কোথায় জানতে পারলে ঠিক করতে পারি আমি কোথায় নামব।'

'আমার বাড়ি?' সব্যসাচী সানন্দে তার ঠিকানা দিল।

'তাহলে বাঁয়ে টার্ন নেবার মোড়েই আমাকে নামিয়ে দেবেন।' শান্তিতে বললে নীলিমা।

'আপনার বাড়ি ওখান থেকে কদ্দূর?'

'কাছেই।'

'তাহলে আপনাকে একেবারে বাড়ির দরজায়ই পৌঁছে দিই না কেন? কেন মিছিমিছি ভিজবেন?'

'না, ঐ মোড়ে নামলেই হবে। বৃষ্টি এখন কমে এসেছে।'

এরপর আর পীড়াপীড়ি করার মানে হয় না। ঐ মোড় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াই যথেষ্ট বদান্যতা। বৃষ্টি থেমে গেলে মেয়েটা যেন তা একবার ভেবে দেখে।

গাড়ির মধ্যেটা হঠাৎ যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। দুই বন্ধুতে পরস্পর যে একটু কথা কইবে তাও নয়। নীলিমার মনে হল তার মনে যে একটা অকারণ ভয় আছে এ স্তব্ধতা বুঝি তারই প্রতিচ্ছায়া। সে চাইল কথা দিয়ে আবহাওয়াটাকে হালকা করে দিতে। বললে, 'আমার শাড়ির জলে আপনার কোটটা ভিজে যাচ্ছে।'

'তার জন্যে আপনার দুশ্চিন্তা নেই। আপনার শাড়ির সাধ্যি নেই আমার কোট ভেদ করে আমার গায়ে এসে লাগে। সুতরাং আপনাকে শীর্ণ হতে হবে না।'

'উনি তো শীর্ণই।' সতীনাথ মন্তব্য করল।

'তাহলে শীর্ণতর হতে হবে না।'

দু'বন্ধুতে হেসে উঠল, আর হাসি এমন সংক্রামক নীলিমাও সশব্দ হল। তার মানে কোটের সঙ্গে শাড়ির সজল সাক্ষাৎকারে তারও বুঝি আপত্তি নেই।

নেই-ই তো। চাকরি করতে বেরিয়ে অত ছুঁৎমার্গ মানলে চলে না। লেডিস ট্রামের আরোহিণীদের এ দাবি সঙ্গত নয় যে কণ্ডাক্টরও মহিলা হবে। তার মানে সকালে-বিকালে দুটো ট্রিপের পরই সে মহিলা-কণ্ডাক্টরের আর সারাদিনে কাজ থাকবে না। এমন একটা অবাস্তব কথাও মেয়েরা ভাবতে পারে? তাহলে তো রাস্তায় কোনো মহিলা চাপা পড়লে এমন দাবি তোলা উচিত—কোনো পুরুষ যেন তার সাহায্যে না আসে, হাত-পা ধরে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে না দেয়, হাসপাতালেও যেন ডাক্তারদের ধরতে না দিয়ে মেয়ে-নার্সের খোঁজ করে।

'আপনি কোথায় কাজ করেন?' খানিক পর জিজ্ঞেস করল সব্যসাচী।

এটুকু ঠিকঠাক বলতে বোধ হয় দোষ নেই। নীলিমা তাই বললে অসঙ্কোচে।

'সে তো আমারই অফিসের কাছাকাছি।'

নীলিমা তার ভঙ্গিতে সাহস আনল। স্পষ্ট স্বরে অথচ সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার অফিসটা কোথায় জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই পারেন। সবাই জানে আর আপনি জানবেন না? সেটার নাম হল লেখকদের দালান।'

লেখকদের দালান! হতবুদ্ধির মত চেয়ে রইল নীলিমা।

'তার মানে রাইটার্স বিল্ডিং।' সতীনাথ ধরিয়ে দিল। আর শুধু অফিসেরই নয়, সব্যসাচীর চাকরির ও তার মর্যাদার বর্ণনাটাও দিয়ে দিল সেই সঙ্গে।

কুঁকড়ে শুকিয়ে গেল নীলিমা। বিশাল শাল্মলীর মত একদল জাঁদরেল জবরদস্ত অফিসর—তাঁরই গা ঘেঁষে বসেছে কিনা তারই মত এক পুঁচকে কেরানি! মরমে মরে যাবার মত। দৃশ্য থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়ে অস্তিত্বহীন ছায়ার মত চুপচাপ বসে রইল নীলিমা। কাঁচের উপর চোখ রেখে তাকাল বাইরের দিকে। সব তারই মত ঝাপসা, তারই মত মুছে যাওয়া।

এত হীনমন্যতাই বা কেন? সে তো ভিক্ষে করে আশ্রয় নেয়নি। বাড়ি ফেরার অফিস-টাইমে কারু গাড়িতে লিফট পাওয়া যায় এ যে তার মানবীয় ভাবনার অতীত। সে তো বৃষ্টি কখন থামে তারই আশায় শূন্যমনে দাঁড়িয়েছিল। ভদ্রলোকই তো গাড়ি থামিয়ে তাকে ডাকল। সে কি শুধুই মানবিকতা বোধ, শুধুই কি বিপন্নকে উদ্ধার করার মনোবৃত্তি? তার বাইরে আর কি কিছুই ছিল না? এই জল-ঝরন্ত সন্ধ্যায়—অন্ধকার হয়ে এরই মধ্যে কেমন সন্ধ্যের মতন হয়ে গিয়েছে—একটি পিচ্ছল মুহূর্তে তাকে কি তাঁর চোখে একটু হঠাৎ ভালো লেগে যায়নি? অঘটন-ঘটানো বর্ষা কি তার প্রতীক্ষার ভঙ্গিতে একটি নতুন সুর লাগিয়ে দেয়নি? না, নিজেকে অত দীনহীন, মাত্র দুশো বাইশ টাকার মাইনের নিস্তেজ কেরানি ভাববার কিছু নেই। নীলিমা সহজের চেয়েও সহজ হয়ে রইল। সে যেমন ভয় পায়নি, তেমনি লজ্জাও পাবে না।

অনেক কায়দাকানুন করে ঘুরে-ঘেরে গাড়ি হরিশ মুখার্জি রোডে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

এখানে এবার সতীনাথ নামবে।

অনেক হর্ন দেবার পর ভিতর থেকে চাকর ছাতা ও ওয়াটারপ্রুফ নিয়ে আবির্ভূত হল। এতটুকু পথ একছুটে চলে গেলেই হয়, তা নয়, রয়ে-সয়ে কত আয়োজন। যার বেশি আছে তার আবার সময়ও বেশি লাগে। ওয়াটারপ্রুফটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মাথার উপর ছাতা মেলে ধরে কোনোরকমে পালিয়ে গেল সতীনাথ, কিন্তু কৌতূহলী চোখ দুটো ফেলে গেল গাড়ির মধ্যে।

পাশে জায়গা হতেই সব্যসাচী সরে গেল আর নীলিমাও পারল বিস্তৃত হতে। দুজনের উপস্থিতিতে যতটা সাহস ছিল, এখন একজন কমে যাবার জন্যে সাহসও কমে যাওয়া উচিত এমনি কিছুই মনে হল না নীলিমার। বরং মনে হল এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কত দিন কত বার সে অফিস-বাড়ি যাওয়া-আসা করেছে। বর্ষা কল্পনাকে যে কতভাবে প্ররোচিত করে তার কোনো রীতিনীতি নেই, জন্মজন্মান্তরের সুহৃদকে পর্যন্ত মনে করিয়ে দেয়—সেক্ষেত্রে এই গাড়িটাকে নিজেরই গাড়ি বলে মেনে নিতে বাধা কোথায়? আর পাশের এ লোক? ধরা যাক না কেন তার নিজেরই লোক— করুণা করে নয়, কর্তব্য-

বোধেই নিতান্ত অনুগতের মত তাকে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তুলে নিয়েছে।

কলকাতার বর্ষাকে নিন্দা করে লাভ কি! দোষ তো সরকারের যে উপযুক্ত সংখ্যায় যানবাহন দিতে পাচ্ছে না। দোষ তো কর্পোরেশনের যে রাস্তাঘাটের গর্ত-গহ্বর মেরামত না করে বাস-ট্যাক্সিকে আরো পঞ্চত্ব পাইয়ে দিচ্ছে। নইলে মনে করুন, এমনিতেই তো কতো হুজ্জুত, তার উপরে এই বর্ষা তেমন কিছু অঝোর-ঝরন নয়—এ আধঘণ্টার বৃষ্টি, তাইতেই কত ওয়ার্কিং আওয়ার, কত কাজের ঘণ্টা নষ্ট! সেই সঙ্গে কত কর্মশক্তির অপচয়! কেরানিরা কি করবে? কি করে আসবে, কি করে বা বাড়ি ফিরবে?

সজল নয়নে তাকাল নীলিমা। আমিও তো সেই কেরানি-কুলেরই একজন।

'শুনুন অফিস থেকে ফেরার সময় যদি বৃষ্টির জন্যে অসুবিধে হয়, তবে আমার অফিসে চলে যাবেন, সঙ্কোচ করবেন না, আমি আপনাকে লিফট দেব।' সব্যসাচী প্রায় কানে কানে বলার মত করে বললে। সামনে আর্দালি-রূপী অভিশাপ বসে, কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে কিছু বন্দোবস্ত করতে গেলেই শুনবে বিষকানে। শুনতে হয় শুনুক, মেয়েটি কি উত্তর দেয় তাও শুনে নিক।

নীলিমা বললে, 'মনে রাখব। কিন্তু অফিসে যাবার সময় যদি বৃষ্টি নামে? তখন?' বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি কটাক্ষগর্ভ হাসিও অহেতুক উপহার দিল।

'বেশ তো, আপনার বাড়িটা দেখিয়ে দিন, আমি সকালবেলা ঠিক তুলে নেব আপনাকে।'

'আপনি যান কটায়?'

'নটায়।'

'তা হলে মিলল না। আমি বেরুই দশটা স-দশটায়।'

তা হলে মিলল না। কেমন সাবলীল লাবণ্যে বললে। অনেক অনেক অমিল। নটায় বেরুতে পারলেও মিলত না।

জলের সঙ্গে খেলতে খেলতে থেমে থেমে এগুতে লাগল গাড়ি। নীলিমা যে একটি প্রগাঢ় চাহনিতে বুঝে নিয়েছিল মানুষটি ভদ্র হবে, বিশ্বাসযোগ্য হবে—একটুও ভুল করেনি। একটাও অবান্তর প্রসঙ্গ তুলছেন না, বিরক্তিকর প্রশ্ন করছেন না, তাঁর সম্ভ্রান্ততায় অটল থাকছেন। অন্য লোক হলে এর মধ্যে নিজের প্রতাপ-প্রতিপত্তির কথাও কত বলে নিত, আর্দালি বা ড্রাইভারকে দুটো প্রশ্ন করেও বোঝাতে পারত নিজের মহিমার দ্যুতি-কান্তি, কিন্তু ভদ্রলোক নীরবতায় ডুবে রইলেন।

কখনো কখনো নীরবতা বুঝি মুখরতার মতই উদ্বেগজনক।

বাকি পথটুকু ভালোয় ভালোয় কেটে গেলেই শান্তি। কিন্তু বৃষ্টি বিষম বেহিসেবী। জলের অস্পষ্টতার মধ্যে পুরোনো চেনা মাটিটাকে ঠিক ঠাহর করা যায় না। মাপ-জোকে ভুল হয়ে পড়ে। অনেক ঘুর-পথ ধরিয়ে দেয়। জন্মান্তরের সুহৃদকেই শুধু মনে করিয়ে দেয় না, প্রাচীন-বয়স্ক এক অজানা পথিককেও সুহৃদ করে তোলে।

এবার সেই টার্নিং-এর পয়েন্টটা এসে পড়ল। আর ভাগ্যের এমন পরিহাস, বৃষ্টিও সেই মুহূর্তে প্রবলতর হল। একটা বাজও পড়ল বিদীর্ণ হয়ে।

'কি, এইখানটায় নামবেন বলেছিলেন—নামবেন?' সব্যসাচী খোঁচা মেরে বললে।

'না। দয়া করে আমাকে আমার বাড়ির কাছে নামিয়ে দিন।'

'আপনার বোধ হয় ইচ্ছে ছিল না বাড়িটা আমি চিনে রাখি!'

'বাঃ, তা কেন? আপনার কষ্ট হবে ভেবে আপনার পথটা একটু কমাতে চেয়েছিলাম।'

'আমার এখন কি হচ্ছে! কষ্ট না আনন্দ?' আত্মবিস্মৃতের মত তাকাল সব্যসাচী।

'নিশ্চয়ই কষ্ট—ঘোরতর কষ্ট। কত আপনাকে ঘোরালাম, কত আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিলাম—'

'কিন্তু আপনার কি হচ্ছে?'

'আমার? আমারও কষ্টই হচ্ছে।'

'কষ্টই হচ্ছে।' সব্যসাচী চমকে উঠল। শ্লেষ মিশিয়ে বললে, 'বৃষ্টির মধ্যে পরের গাড়িতে চড়ে দিব্যি বাড়ি ফিরছেন, কষ্টটা কোথায়?'

'আপনার কষ্টেই আমি কষ্ট পাচ্ছি।'

কথাটা শুনে অদ্ভুতভাবে চুপ করে গেল সব্যসাচী। তুচ্ছ একটা কথা, কিন্তু মনে হল তাঁর সমস্ত জীবনের গহ্বরের উপর কে যেন একখানি করপল্লবের কোমল আচ্ছাদন রাখল। ঢেকে গেল, ভরে গেল সমস্ত শূন্যতা।

আর্দালির শ্যেনচক্ষু যাই দেখুক যাই খুঁজুক, সব্যসাচী কখনোই নীলিমার হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেবে না। এ বৃষ্টি যতই সব এলোমেলো করে দিক, তার মাত্রাবোধে বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারবে না। বৃষ্টিতে আর সব চলাচল বন্ধ হতে পারে, সব্যসাচীর রক্ত-চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। কিন্তু এ কেমনতরো কথা? 'আপনার কষ্টেই আমি কষ্ট পাচ্ছি!' এ কি পাশে-বসা এই মেয়েটি বলল, না কি এটা এই বর্ষারই সুর?

'এইবার ডাইনে।' নীলিমাই নির্দেশ দিচ্ছিল ড্রাইভারকে, বলে উঠল ঃ 'আর বেশি যেতে হবে না।'

হঠাৎ সব্যসাচী বললে, 'এই যে এই আমার ফ্ল্যাট!'

'এত কাছে?' প্রায় উছলে উঠল নীলিমা।

কত কাছে তা কি সব্যসাচীর অজানা? কিন্তু নৈকট্য কি স্থানে না অবস্থানে? দোতলার মানুষই তো কত দূর! আধখানা হাত বাড়ালেই তো নীলিমাকে এখন ধরা যায়, কিন্তু তাদের দুজনের মধ্যে কত দুস্তর ব্যবধান!

আরেকটু এগিয়ে আরেকটা বাঁক নিয়েই একটা গলির মোড়ে গাড়ি দাঁড় করাল নীলিমা ঃ 'এইখানে রাখুন।'

সব্যসাচী ড্রাইভারকে বললে, 'হর্ন দাও।'

নীলিমা হাসল ঃ 'যতই হর্ন দিন, আমার বাড়ি থেকে কেউ ছাতা আর বর্ষাতি নিয়ে আসবে না! আমার বাড়ির লোক ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে না যে আমি গাড়ি করে ফিরব!'

'কিন্তু এই বৃষ্টিতে নামবেন কি করে? পুরোপুরি ভিজে যাবেন যে?'

'বাস-এ করে ফিরলে আরো কত বেশি ভিজতাম!'

'এখানে তো কোথাও কিচ্ছু দাঁড়াবারও জায়গা নেই?'

'না, দাঁড়াতে হবে না, একছুটে চলে যাব।'

'আপনার বাড়ি কি গলির মধ্যে?'

'তা নয় কি বড় রাস্তার উপর?' খিলখিল করে হেসে উঠল নীলিমা ঃ 'বড় রাস্তার ওপর হলে তো শুধু ফুটপাতটুকু পেরিয়ে গেলেই হত। এখন গলির মধ্যে যেতে হবে খানিকটা, তারপর সদরের কড়া নাড়তে হবে। বৃষ্টিতে সেই শব্দ কে শোনে, কতক্ষণে

শোনে, তার ঠিক নেই। ভিজে একশা হয়ে যাব।'

'তার চেয়ে আমি বলি যতক্ষণ বৃষ্টিটা একটু না কমে গাড়িতেই অপেক্ষা করা যাক।'

'আপনি পাগল হয়েছেন!' এবার নীলিমার সুরে অন্য রকম টান ফুটল : 'খানিক পরে এ রাস্তায় এমন জল দাঁড়াবে যে আপনার গাড়িই আটকে যাবে। তাই যত তাড়াতাড়ি হয় আমিও পালাই, আপনিও পালান।'

নিজের হাতে গাড়ির দরজা খুলে একটু ফাঁক করল নীলিমা। পিছনে কারু একটা মানসিক বাধা অনুভব করে বললে স্নিগ্ধ স্বরে, 'এবারে তবে যাই?'

'কিন্তু যাবার আগে একটা কথা দিয়ে যান।'

'কি কথা?' নীলিমা দরজার ফাঁকটা কমিয়ে আনল।

'কাল নিশ্চয়ই বৃষ্টি থাকবে না। কাল তাহলে এমনি সময় আমার বাড়ি গিয়ে আমাকে রিপোর্ট করে আসবেন বৃষ্টিতে ভিজে আপনার অসুখ করেনি।'

'আর যদি অসুখ করে?'

'তাহলে একটা চিঠি লিখে দেবেন।'

'আচ্ছা।' সেটা যে কত অসম্ভব তাই বোঝাবার জন্যে সম্মতির সঙ্গে সঙ্গেই হেসে উঠল নীলিমা।

'আর গোড়ার সেই কথাটা মনে আছে তো?'

'কোন্ কথা?'

'অফিস-ফেরত বৃষ্টি নামলে বা বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখলে আমার অফিসে চলে আসবেন।' সব্যসাচী মনে করিয়ে দিল। কোথায় কোন সিঁড়ি দিয়ে কোন তলায় কত নম্বর ঘরে স্লিপ পাঠাতে হবে, এঁকে দিল মানচিত্র।

'আপনার বাড়িতে গেলে?'

'ঢুকেই একতলার বাঁ দিকের প্রথম ঘরেই আমি। দরজায় নেমে-প্লেট আছে। কলিং বেল টিপলেই দরজা খুলে দেব।'

'এত সহজ? দারোয়ান নেই, কুকুর নেই, সত্যি?'

'অন্য লোকজনও নেই। বাড়ি বলতে অবশ্যি আমি আর আমার একতলা। আপনাকে দোতলায় যেতে হবে না।'

'যেখানে আপনি নেই সেখানে আমার যেতে ভারি বয়ে গিয়েছে।' চলে যাবার আগে আরো একটু মধু ঢালল নীলিমা। তারপরে সহসা দরজাটা খুলে দিয়ে সেই অনর্গল বর্ষণের মধ্যেই রাস্তায় নামল আর নেমেই ছুট দিল গলি দিয়ে—পিছন ফিরে তাকিয়েও দেখল না গাড়িটা আছে কি নেই।

সব্যসাচীর মনে হল বৃষ্টির মধ্যে কোনো যুবতীকে এমনি কোনোদিন ছুটতে দেখেনি।

কথাটা মনে ছিল বলেই আজকে বৃষ্টি নামবার তোড়জোড় হতেই নীলিমা সব্যসাচীর অফিসের দিকে যাচ্ছিল সেই প্রতিশ্রুত লিফট পাবার আশায়, কিন্তু তার আগেই রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার পর আর কথা নেই। তখন ট্রামে ফেরা না বাসে ফেরা, না কি সোজা পায়ে হেঁটে—কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তখন ভিজলেই বা কি, না ভিজলেই বা কি!

রঞ্জন নিশ্চয়ই একসময় জিজ্ঞেস করবে এদিকে এসেছিলে কেন? তখন নীলিমা চলতি

কথায় মামুলী উত্তর দেবে. এদিকে একটু কাজ ছিল। নিশ্চয়ই রঞ্জন জেরা করবে না, যতটুকু সে বলবে ততটুকুই সে বিশ্বাস করবে।

তার সব কথাই তো রঞ্জনকে বলে, কিছু লুকোয় না। আর সব্যসাচী বোস-এর সঙ্গে আলাপ হওয়া, তার গাড়িতে লিফট পাওয়া, সে তো বলবার মত কথা। তারপর তার পরদিন তার বাড়িতে গিয়ে যা সব কাণ্ড দেখে এল, সে তো এক চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা। যদি কাউকে বলতে হয়, প্রথমেই বলতে হয়—তবে রঞ্জনকে। ঘটনার পর রঞ্জনের সঙ্গে এই তো প্রথম দেখা—বলবে কখন? আজকে কেন সে এদিকে এসেছে সে সামান্য কথাটাও বলবার মত নয়? বলতে গেলে অনেক কথাই উঠে পড়বে। কি এমন কথা? কেন তা বলবে না? কেন তা গোপন করতে ইচ্ছা করছে প্রাণপণে?

কারণ নীলিমা সব্যসাচীকে ছুঁয়েছে।

তাই এ কথাটা পূর্বপ্রেমিক— পূর্ণপ্রেমিককে বলা যায় না।

লিফটের পরদিনই সন্ধ্যের দিকে নীলিমা সব্যসাচীর বাড়িতে এসে হাজির হল। বাঁ দিকের দরজায় ঠিক নেম-প্লেট. ঠিক কলিং-বেল। টিপলে কে না জানি দেখা দেয়, কি ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা করে কে জানে! ভয়ে ভয়ে বেল টিপল নীলিমা।

প্রত্যুত্তরে স্বয়ং সব্যসাচীই দরজা খুলে দিল।

'কে?'

প্রথমটা সব্যসাচী কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিল, এক নজরে চিনে নিতে পারেনি।

'সে কি, চিনতে পাচ্ছেন না?' অভিমান না দেখিয়ে হাসি ঝরাল নীলিমা।

তৎক্ষণাৎ চিনতে পারল সব্যসাচী। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ঃ 'আরে তুমি? এস এস।' পরে হঠাৎ কি ভেবে গম্ভীর হল ঃ 'কাল আপনি করে বলেছিলাম, তাই না? আপনি করেই বলা উচিত। পাড়ার মেয়ে হলে কি হয়, অফিস-পাড়ার মেয়ে। 'আপনি'ই সম্ভ্রান্ত। সর্বত্র আপ বলিয়ে।'

'কালকের কথা কাল গেছে, আজ প্রথমেই তুমি বলেছেন, আজ ওটাই চালু থাক।' বলতে বলতে ঘরের মধ্যে চলে এল নীলিমা।

'আজ তোমার গায়ে ঠিক অফিসের প্রলেপটা নেই বলে চট করে চিনতে পারিনি।'

নীলিমা লজ্জার আভা ফোটাল মুখে-চোখে, সমস্ত ভঙ্গিতে। সে যে অফিস সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ভোল বদলে এসেছে ঠিক ধরতে পেরেছেন ভদ্রলোক। সহজের উপর ছোটখাটো একটু সাজগোজও যে করে এসেছে তাও বুঝি তাঁর চোখ এড়ায়নি। 'কিন্তু যখন হাসলে, তখন মিস লাফটারকে চিনতে দেরি হল না। মুখ দিয়ে তুমি বেরিয়ে এল।'

'সেইটেই তো স্বভাবের ডাক। আমি আপনার চেয়ে কত ছোট!' নিজের থেকেই নীলিমা বসল চেয়ারে।

'বয়সে ছোট? বয়েস তো একটা মায়া। তা তোমার কত বয়েস হবে?' সব্যসাচীও বসল।

'মেয়েদের কি বয়েস বলতে আছে?' চোখের কোণে হাসির ঝিলিক দিল নীলিমা।

'মেয়েদের বয়েস বলেই কিছু নেই—বলবে কি করে? কিন্তু মেয়ে-কেরানির বয়েস তো লিপিবদ্ধ আছে—সে লিপিতে কত?'

'বাইশ-তেইশ। আপনার?' প্রশ্ন করতে এতটুকু ঠেকল না নীলিমার।

'কত মনে হয়?' কপালে একবার হাত বুলোল সব্যসাচী।

'বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ।'

'আরো দশ বছর যোগ করো। যাঁহা বাহান্ন তাঁহাই তিপ্পান্ন।'

'বাষট্টি-তেষট্টি হলেই বা কি! নীলিমা নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'আপনিই তো বলেছেন বয়েস একটা ভ্রম। আসল হচ্ছে—'

'কি আসল?'

'আসল হচ্ছে প্রাণ।'

কথাটা যেন স্পর্শ করল সব্যসাচীকে। সব্যসাচী নড়ে-চড়ে উঠল। বললে, 'পাশের ঘরে চলো।'

পাশের ঘরটা কি জাতীয় একবার উঁকি মেরে দেখল নীলিমা। এটা যেমন অফিস ঘর, খাড়া-খাড়া কাঠের চেয়ার, পাশেরটা বসবার ঘর, ছড়িয়ে বসার সোফা-কৌচ। অবলীলায় পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হল নীলিমা আর সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে একটা সোফার মধ্যে ডুবে গেল। সিধে তাকিয়ে দেখল পাশের ঘরটা, শোবার একটামাত্র সিঙ্গল খাট পাতা। নিজের মনেই মুখ টিপে হাসল নীলিমা—নিশ্চয়ই আরো পাশের ঘরে যেতে বলবে না। কিন্তু আশ্চর্যের আশ্চর্য, বাড়িতে আর লোক কই? দরজায় পর্দা কই?

সবগুলি ঘর যেন শূন্যতার রোদে খাঁ খাঁ করছে।

'তুমি কি খাবে বলো?' সব্যসাচী আবার চঞ্চল হল।

'আপনি আমার সঙ্গে বসে যা খাবেন তাই।' সুন্দর দীঘল চোখে তাকাল নীলিমা।

'আমি তো এখন এক কাপ চা আর দুখানি বিস্কুট খাব।'

'আমাকেও তাই দেবেন।'

'আমি না হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি—বেশি খাওয়া বারণ—'

'আজ্ঞে আমিও কম বুড়ি হইনি—বেশি খাওয়া অসাধ্য। কিন্তু আপনাকে এই চা-টুকু কে করে দেবে?'

'চাকর আছে।'

স্বরের ঔদাসীন্যটা নীলিমার কানে বাজল। সব্যসাচীর গায়ে এখনো শার্ট, পরনে ট্রাউজার্স, পায়ে অফিস-শু। শুধু কোট আর টাই থেকেই সে মুক্ত হয়েছে। তার মানে অফিস থেকে সদ্য-সদ্যই সে ফিরেছে, ঢিলেঢালা বাঙালিয়ানায় এখনো বিশ্রাম নিতে বসেনি, কিন্তু এই লোকটাকে বাড়িতে অভ্যর্থনা করে নেবার মত প্রিয়জন কেউ নেই কেন? শুধু একটা চাকরই আপনজন?

অদম্য সাহস নীলিমার, জিজ্ঞেস করে বসল, 'এ বাড়ির প্রাণ কই?'

'প্রাণ?'

'আই মীন, গৃহিণী কই?'

হাত তুলে উপরের দিকে ইঙ্গিত করল সব্যসাচী। প্রথমটা নীলিমা বিষণ্ন হল, ভাবল বুঝি ভদ্রমহিলা ইহসংসারে নেই— পরে আবার আশ্বস্ত হল, তার এই আসায় আর থাকায় আর কেউ এসে সদম্ভ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, খানিকটা সময় জীবনের আরেক কোণে বসে নতুন রকম শান্তিতে কাটানো যাবে।

নীলিমা অনুভব করল সমস্ত পরিবেশটা কেমন অতর্কিতে তারই কর্তৃত্বের মধ্যে চলে আসছে। জিজ্ঞেস করলে, 'তবে আপনার দেখাশোনা করে কে?'

'এই যে আসছেন!' বদান্য হাসিতে সমস্ত মুখ ভরে তুলল সব্যসাচী।

কাকে যেন দেখবে সন্ত্রস্ত হয়েছিল নীলিমা, চমকে চেয়ে দেখল বয়স্ক এক ভৃত্য দু'হাতে দুটো খাবারের প্লেট নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে ঢুকছে।

'ইনিই আমার অবধায়ক। এখন এঁরই হাতে মানুষ হচ্ছি।' সব্যসাচী স্নেহচোখে তাকাল চাকরের দিকে ঃ 'এঁর নামটিও দারুণ রেসপেকটেবল।'

'কি নাম?' নীলিমাও তাকাল স্নেহভরে।

টেবলের উপর দুটো প্লেট পাশাপাশি রেখে ভৃত্য বললে, 'কৃষ্ণ।'

'সাবধান!' সব্যসাচী বলে উঠল ঃ 'কদাচ একে কেষ্ট বলতে পারবে না। কেষ্টা বললে তো একেবারে কুরুক্ষেত্র!'

'না, কৃষ্ণই তো ভালো।' মিষ্টি করে হাসল নীলিমা ঃ 'কৃষ্ণই তো সব্যসাচীর সব। কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে।'

কৃষ্ণ গম্ভীর মুখে বললে, 'আমার সাহেব তামাক খায় না আর আমার নাম কৃষ্ণকান্ত নয়, কৃষ্ণকমল।'

অভিভাবকই বটে। নীলিমা হেরে গেলেও হার মানল না, তার সেই হাসির রুপোর কুচিগুলি চারপাশে ছিটিয়ে দিল। বললে, 'কি কুক্ষণে যে লাইনটা কোট করতে গেলাম—'

দেখো কৃষ্ণকমল দিয়ে কিছু পাও কিনা! কৃষ্ণ সরাসরি নীলিমাকেই লক্ষ্য করল ঃ 'কি দেব? চা না কফি!'

কতদিন ধরেই যেন এ-ও না বলে আসছে এমনি অক্লেশে নীলিমা বললে, 'চা।'

যাবার আগে কৃষ্ণ আবার বললে, 'যা দিয়েছি সব কিন্তু খেতে হবে, ফেলতে পারবে না। অন্যায্য দিইনি কিছু।'

যা দিয়েছে মন্দ কি, অন্যায্য বলা যায় কি করে! একটা অমলেট আর চারটে সন্দেশ—দুটো নরম আর দুটো কড়া। কিন্তু সব্যসাচীর প্লেটটা আয়তনে সমান হলেও ভিতরের দ্রব্য অতি ক্ষীণ। সেই সামান্য দুখানি বিস্কুট।

'আমার বেলায় তো অন্যায্য নয় কিন্তু সাহেবের বেলায়?' যেন কৃষ্ণও তার কর্তৃত্বের অধীনে চলে আসছে এমনি ভাবের থেকে বললে নীলিমা।

'ওঁর যে মা অনেক অসুবিধে।'

মা! নীলিমাব বুকের ভিতরটা কেমন থরথর করে উঠল। বা, মা-ই তো সমীচীন সম্বোধন, কানে-শোনা মুখে-ডাকা বুকে-রাখা কত ঘরের কত পরিচিত দিনের সুগন্ধ দিয়ে ভরা, এতে এত শিউরে ওঠবার কী! মা না বলে দিদি ডাকলে কি বেশি ভালো শোনাত? কখনো না। তবু এই নির্জন সংসারের পরিবেশে এই মা-ডাকটা নিদারুণ অদ্ভুত শোনাল।

'যাই তোমার জন্যে আগে এক গ্লাস জল নিয়ে আসি। পরে চা দেব।'

কৃষ্ণ চলে যেতেই একটা নরম সন্দেশ আঙুলে করে ধরে সব্যসাচীর প্লেটের উপর রাখতে গেল নীলিমা। সব্যসাচী অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠল ঃ 'আমি না, আমাকে না—'

নীলিমা তখন সন্দেশটা প্লেটে না রেখে সব্যসাচীর হাতের মধ্যে গুঁজে দিল। বললে, 'আমি দিচ্ছি, আপনি খান—'

'তুমি তুলে দিচ্ছ, নিশ্চয়ই খাব। কিন্তু এখন নয়।' দুষ্টু-দুষ্টু চোখে হাসল সব্যসাচী ঃ 'কৃষ্ণ শুধু এক গ্লাস জল নিয়ে আসবে। দ্বিতীয় গ্লাস চাইতে গেলেই ঠিক ধরে ফেলবে

আমাকে। তাই আগে চা-টা আসুক, ঠিক খেয়ে নেব। তোমার দেওয়া জিনিস ফেলতে পারব না।'

সন্দেশ ফিরিয়ে নিল নীলিমা।

কৃষ্ণ আগে জল ও পরে চা দিয়ে গেল। তখন আশেপাশে কেউ নেই স্থির জেনেও লুকিয়ে সেই সন্দেশটি ফের সব্যসাচীর হাতে গুঁজে দিল নীলিমা। সব্যসাচী বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সেটা মুখে ফেলে দিয়ে তৃপ্তিতে চোখ বুজল।

বাইরে কত বড় জবরদস্ত দুর্দান্ত অফিসর, শুধু শক্তিমত্তায় নয় কর্মনৈপুণ্যে, এমনকি বিদ্যায়, বৈদগ্ধ্যে—এস. বোস বললে সকলে প্রায় থরহরি, সম্ভ্রমে প্রায় নতশির—সে কিনা সংসারের একান্তে এত নির্জীব এত দুর্বল, কটি কোমল আঙুলে ধরা একটি সন্দেশের জন্যে লালায়িত! মানুষের ভিতরে-বাইরে এত বড় একটা ব্যবধানও সম্ভব, কি জানি কি, নীলিমা তার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় কুলিয়ে উঠতে পারল না।

খেতে-খেতে ভরাট গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'বাড়িতে ঐ কৃষ্ণই আপনার একমাত্র সঙ্গী?'

'কৃষ্ণ আর কতটুকু! ও ছাড়া আরেকজন সঙ্গী আছে।'

'কে সে?' যেন চমকে উঠল নীলিমা।

'কী তার নাম বলব? তার বাংলা নাম জানি না। ইংরিজি নাম বলতে পারি—যাকে বলে বোরডম—বোরডম—বাংলায় তুমি কি বলবে?'

'বিরাগ বা বিরক্তি বলা যায় না?' নীলিমা বললে ভয়ে-ভয়ে।

বিরাগ বা বিরক্তির মধ্যেও তো একটি সক্রিয়তা আছে। কোনো ব্যাপারে বা কারু সম্পর্কে আমি বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট এ তো স্পষ্ট বোঝা যায়, ধরা যায়, তার প্রতিকারে আমি আগ্রহী হতে পারি, চাই কি লড়াই করতেও পারি—কিন্তু এ যে কিছু না-চাওয়া না-পাওয়া, না-করা শুধু নয়, করতে না-পারাও নয়—করতে না-জানা—বোঝাবার মত বাংলায় কোনো কথা আছে?'

'জানি না।'

'অনীহা? না, অনীহাও নয়। বাংলাতে নতুন এ কথাটা খুব চলছে আজকাল। অনীহা মানে তো অচেষ্টা। অস্পৃহা—আমার চেষ্টা-স্পৃহাও তো কিছু কম নয়—এ বলতে পারো কিছুতে মন-না-বসা! হ্যাঁ, এতক্ষণে পেয়েছি কথাটা। কিছুতে মন-না-বসা! কিছু ভালো লাগে না তাও তো বলতে পারি না। পড়তে বসি, দু'পাতা পড়ে ফেলে দিই, লোকের সঙ্গে কথা বলি, দু-চারটে কথার পরেই কেটে পড়ি, নয়তো চুপ করে যাই, থিয়েটারে সিনেমায় বা অন্য কোনো ফুর্তির জায়গায় যদি ঢুকি, কতক্ষণ পরে কে যেন ধাক্কা দিয়ে বাইরে বার করে দেয়। মন বসে না, কিছুতেই মন বসে না—'

'কিন্তু অফিসে? আপনার কাজে?'

'সেখানে আমি আরেক লোক। সেখানে আমি দুর্ধর্ষ। অপ্রতিরোধ্য। সেখানে কাজ বলতে আমি, আমি বলতে কাজ। যতক্ষণ পারি অফিসে ওভারস্টে করি—আজ যে সকাল-সকাল ফিরেছি সে শুধু মিস লাফটার আসতে পারে সেই আশায়—কিন্তু যতক্ষণ না বেশি থাকি এক সময় দোকান তো বন্ধ করতেই হয়—তখন কাজ-ছুট হয়ে আমি যাই কোথায়? হাঁটব কোন পথে? কোন দরজায় কড়া নাড়ব? কোন গন্তব্যে উপনীত হব?'

কী বলবে কিছু খুঁজে পেল না নীলিমা। শুধু বললে, 'চা খান।'

নীলিমা বললে বলেই যেন সব্যসাচী চায়ের পেয়ালা মুখে তুলল। বললে, 'তুমি রাস্তায় লাইন দেওয়া দেখেছ, সিনেমার লাইন, রেশনের লাইন, মাঠের লাইন, রেল স্টেশনের লাইন? মনে হয় তেমনি একটা অফুরন্ত লাইনের শেষপ্রান্তে আমি বসে আছি। ফিরে যাবার উপায় নেই, অথচ লাইনও এগোচ্ছে না। বোরডম—মিস লাফটার, একেই বলে বোরডম।' চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখবার সঙ্গে সঙ্গে সব্যসাচী বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নীলিমা মুখ ম্লান করে বললে, 'আপনি যদি এমনি হতাশার কথা বলেন তাহলে আমি হাসি কি করে?'

'হতাশ! তার চেয়েও কিছু বেশি আছে কি না বলো।' চায়ের পেয়ালাটা আবার তুলতে যাচ্ছিল সব্যসাচী, থেমে পড়ল। আর্তস্বরে বললে, 'ঐ ঐ শুরু হয়ে গেল—'

মাথার উপরে দোতলায় অনেকগুলি পায়ের দাপাদাপির শব্দ শোনা গেল, অনেক ঘুঙুরের আওয়াজ, সঙ্গে নানাজাতীয় বাজনার হট্টগোল।

'ওটা কী?' চোখে-মুখে ভয় নিয়ে জিজ্ঞেস করল নীলিমা।

'ওটা একটা তাণ্ডব। জলসার রিহার্সাল।'

'ওরে ব্বাবা! কতক্ষণ চলবে?'

'কম করে বলতে গেলে রাত দশটা পর্যন্ত। নাচ থামলে গান—এককের পর কোবাস। গান থামলে নাটক—কাটাকাটি, ফাটাফাটি— '

'কদিন এমনি চলবে?'

'চলবে কি চলছে। দিনেব পর দিন মাসের পর মাস ধরে চলছে। এ যে চ্যারিটি ফাণ্ডের জন্যে ফাংশন। চ্যারিটির কি শেষ আছে? হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, স্কুলের সাহায্য, খরাত্রাণ, বন্যাত্রাণ, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—হাজার গণ্ডা চ্যারিটি। বুঝলে না, পরের চ্যারিটি করে নিজেদের ভরণপোষণ—তাই যত চ্যারিটি তত ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স।'

'আপনি এ সহ্য করছেন?'

নীলিমার কথাটা ধিক্কারের মত বাজল সব্যসাচীকে। ক্ষণকাল সে যেন বিমূঢ় হয়ে রইল। পরে অসহায় চোখে বললে, 'আমি কি করতে পারি?'

'এ উপদ্রবে আপনি অসুস্থ হন না?'

'অসুস্থ বলে অসুস্থ। প্রেসার বেড়ে গিয়েছে। বুক কাঁপে।'

'তবু সহ্য করছেন আপনি? এ ন্যাইসেন্স বন্ধ করতে পারছেন না?'

'তুমি কি বলছ? এই তো সংস্কৃতি। একে কি কখনো বন্ধ করা যায়?'

'তাই বলে একটা অসুস্থ লোকের মাথার উপরে এমনি উদ্দণ্ড লাফাবে, তার প্রতিকার হবে না?' নীলিমা অবাক মানল : 'আপনি এত বড় একজন হর্তা-কর্তা অফিসর, উপরওয়ালাদের শায়েস্তা করার পথ বার করতে পারেন না?'

পরাভূতের মত চোখ নত করল সব্যসাচী।

'আপনার পুলিস কী করে?'

'আর বোলো না! ঐ দোতলার ফ্ল্যাটটাও যে আমার।'

'আপনার মানে? আপনি ওটার ভাড়া দেন?'

'হ্যাঁ, ওটা আমারই টেনান্সির মধ্যে।'

'তবে কি ওটা আর কাউকে সাবলেট করা?'

কি বলবে এক মুহূর্ত বুঝতে পারল না সব্যসাচী। ম্লানকণ্ঠে বললে, 'না, ওটা আমারই দখলে।'

'তবে আপনারই বাড়িতে আপনার উপর অত্যাচার? এটা আপনি কনট্রোল করতে পারেন না? অন্তত যখন আপনার বিশ্রামের সময় তখন তো আপনি রেহাই পেতে পারেন?'

'সে সামান্য কথাটাই বা বোঝে কই?'

'আমি এর মানে কিছুই বুঝতে পারছি না।' নীলিমা ফাঁপরে পড়ল ঃ 'আপনি বাড়ির কর্তা, মাস-মাস ভাড়া দিচ্ছেন আর আপনি জোর করে এই ন্যুইসেন্স বন্ধ করে দিতে পারেন না? এমন দাপাদাপি চেঁচামেচি চললে কারু সঙ্গে বসে দুদণ্ড আলাপ করবেন কি করে?'

'তুমি ঠিক বলেছ।' হঠাৎ সব্যসাচী ভিতরে একটা জোর পেল। তার ফলে সমস্ত শৈথিল্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দাঁড়াল সোজা হয়ে। বললে, 'নিশ্চয়—কারু সঙ্গে শান্তিতে বসে একটু আলাপ করতে পারব না? তুমি বোসো, আমি এর একটা বিহিত করছি। যাচ্ছি উপরে।' সব্যসাচী দোতলার উদ্দেশে রওয়ানা হবার উদ্যোগ করল।

'আমি আর বসে কি করব, আমি এবার যাই।' উঠি-উঠি করল নীলিমা।

'না, না, তুমি যেয়ো না, তুমি থাকো। তুমি এসেছ, তোমাকে পেয়েছি—তারই জন্যে তো ব্যবস্থা নিতে চলেছি।' সব্যসাচী নীলিমার চোখের মধ্যে চোখ রাখল ঃ 'সত্যি, যেয়ো না কিন্তু—কি, ফিরে এসে দেখব, চলে গিয়েছ?'

মায়া হল নীলিমার। বললে, 'বলছেন যখন বসছি।'

সদর থেকে দোতলায় উঠবার সরাসরি যে সিঁড়িটা দেখা যায় সব্যসাচী সেটা দিয়ে উঠল না। ভিতরের দিকে একটা দ্বিতীয় সিঁড়ি আছে সেটা দিয়ে উঠল। উপরে-নিচে সবগুলি ফ্ল্যাট বিচ্ছিন্নভাবে ভাড়া দেওয়া হবে বলে ঐ একটা সদুরে সাধারণ সিঁড়িই যথেষ্ট ছিল, সব্যসাচী ঠিক তার উপরের ফ্ল্যাটটাও তার টেনান্সির সামিল করে নিল বলে বাড়িওলাকে বললে তাকে একটা একলার জন্যে আলাদা সিঁড়ি তৈরি করে দিতে। বাড়িওলা সহজে রাজি হল। তার ফলে এই দ্বিতীয় সিঁড়ি।

চুপচাপ একা বসে নীলিমা ভাবছিল কি করে, কতক্ষণ বসে! একটু ভয়-ভয়ও যে করছিল না তা নয়, আবার এমন একজন শক্তিশালী ব্যক্তির নিমন্ত্রণে বসে আছে, ভাবতে আশ্বাসেরও উষ্ণতা পাচ্ছিল। তবু প্রতীক্ষারও তো একটা প্রসঙ্গ আছে। এ বাড়ির অন্য কোনো লোক যদি হঠাৎ এসে জিজ্ঞেস করে, আপনি কে, তখন এক কথায় নীলিমা কি বলবে? তারপর প্রশ্ন যদি আরো একটু গভীরে যায়, আপনি এখানে কি করতে বসে আছেন, তারই বা সদুত্তর কোথায়?

কি রকম যেন বিষয়ের বহির্ভূত বলে লাগছিল নিজেকে। নিদারুণ খাপছাড়া! ভাবছিল, কৃষ্ণকে ডেকে, বলে চলে যাই। কৃষ্ণই বা ডাকের নাগালে আছে কিনা কে বলবে? কৃষ্ণকে ডাকতে সে নির্জনতার আরো অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে নাকি? কে জানে কি আছে, পালিয়ে যাওয়াই সমীচীন। কিন্তু কানের মধ্যে সব্যসাচীর সেই অসহায় আর্তস্বর বাজতে লাগল ঃ 'তুমি যেয়ো না, তুমি থাকো, ফিরে এসে যেন তোমাকে দেখি।'

নীলিমা লক্ষ্য করল দাপাদাপি চেঁচামেচি হঠাৎ থেমে গিয়েছে। তারপর শুরু হয়েছে বচসা। ঐ প্রভুত্বময় গম্ভীর স্বর নিশ্চয়ই সব্যসাচীর কিন্তু তাকে প্রতিবাদ করছে একটি

তীক্ষ্ণ স্ত্রীকণ্ঠ—সে কে? নেত্রীস্থানীয়া কেউ নিশ্চয়ই—হয় সভানেত্রী, নয় অভিনেত্রী। ভদ্রলোক যেন সবাইকে বলছে চলে যেতে আর ভদ্রমহিলা যেন বাধা দিচ্ছে, না, কেউ যাবে না। এ বাড়ি আমার—বলছে ভদ্রলোক। এ ঘর-বারান্দা আমার—হাঁকছে ভদ্রমহিলা। নীলিমা যতদূর বুঝতে পারছে—এ ধরনেরই বিতণ্ডা চলেছে। ভদ্রলোক বলছে, সব বন্ধ করো, ভদ্রমহিলা বলছে, চালিয়ে যাও। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার শুরু হচ্ছে জগঝম্প। পরে আবার কলহের শিখাটা উচ্চতর হচ্ছে। কেউ-কেউ বুঝি সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে যাচ্ছে, কেউ-কেউ বুঝি তবুও যাচ্ছে না, এখানে-ওখানে জটলা পাকাচ্ছে। গোলমাল থামলেও গোলমালের গরমটা ঠাণ্ডা হচ্ছে না সহজে।

কিন্তু নীলিমা আর কতক্ষণ বসে থাকবে?

না, সিঁড়ি দিয়ে সব্যসাচী নেমে এসেছে, কিন্তু এ কী উত্তেজিত মূর্তি! সেই স্থির ঋজু দৃঢ় পুরুষ নয়, কি রকম যেন বিধ্বস্ত হয়ে ফিরেছে! হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছে, টলছে দেয়াল ধরে ধরে। বসবার ঘরে নীলিমা পর্যন্ত এগোতে পারল না, মাঝখানের শোবার ঘরে খাটের উপর শুয়ে পড়ল।

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বোধ হয়। নীলিমা নির্বিকার ছুটে গেল। সব্যসাচীর কপালের উপর নিঃসঙ্কোচ স্নেহহাত রেখে জিজ্ঞেস কর, 'শরীর খারাপ লাগছে?'

কপালের উপরে নীলিমার উদ্বেল ডান হাত দুই ব্যাকুল হাতে ধরে রইল সব্যসাচী। বললে, 'এমনি কতক্ষণ থাকো, মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' পরে সেই হাত তার খোলা বুকের উপর টেনে আনল, বললে, 'এইখানে খানিকক্ষণ চাপ দিয়ে রাখো, বুকের ধড়ফড়ানিটাও থাকবে না।'

নীলিমার মনে হল এই বিপর্যয়ের জন্যে সে-ই দায়ী। তারই প্ররোচনা সব্যসাচীকে উপরে পাঠিয়েছে, সংঘর্ষে উদ্যত করেছে। নইলে সে যদি ইন্ধন না যোগাত, এই আগুন জ্বলত না। কি দরকার ছিল পরের ব্যাপারে নাক গলিয়ে হয়কে নয় করে দেওয়া? এখন এই রুগীকে সামলাবে কে?

কৃষ্ণ এল। সে আগে-আগে এমনি অবস্থায় মোকাবিলা করেছে, তাই চঞ্চল হল না। দক্ষ হাতে ওষুধ খাওয়ালে সব্যসাচীকে। জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারকে ফোন করব?'

সব্যসাচী বললে, 'দরকার নেই।'

অনেক হালকা বোধ করল নীলিমা। আবার খাটের কাছে শিয়র ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। বললে, 'এখন কেমন লাগছে?'

'অনেক ভালো।'

'তবে আমি এবার যাই।'

'যাবে? হ্যাঁ, যেতে তো হবেই।' যেন কাতর স্বগতোক্তির মত বললে সব্যসাচী। সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থেকে বললে, 'আবার এস।'

'বা, আসব বৈ কি। আসতে তো হবেই।' হাসল নীলিমা।

'হ্যাঁ, আমাকে সম্পূর্ণ ভালো করে তোলো।'

'নিশ্চয়ই তুলব।' এগিয়ে এসে স্বেচ্ছায় সব্যসাচীর চোখে মুখে গলায় হাত বুলিয়ে দিল নীলিমা। এ শুধু মমতার নয়, সান্ত্বনার নয়, এ আরোগ্যের স্পর্শ। জীবন-জাগরণের শিহরণ দিয়ে ভরা।

বাড়ি ফিরে যেতে যেতে নীলিমা ভাবছিল, দোতলায় যার সঙ্গে এত বচসা সে মহিলাটি কে? স্ত্রী? না, আর কেউ?

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজে দরকার কি? সে সব্যসাচীকে জানে, তার কক্ষে তার বৃত্তেই সে পরিমিত। তার বাইরে তার কৌতূহল কেন?

তবু এমন একটা অভিজ্ঞতার কথা সে তার আপনজন রঞ্জনের কাছে চেপে যাবে? বলবে না খুলে-মেলে?

বৃষ্টির মধ্যে দুজন—রঞ্জন আর নীলিমা—চলতি ট্রামে উঠে পড়ল। কোথাকার ট্রাম দেখবার সময় নেই। কোথাও না কোথাও তো সেটা যাবে, যদি না যাবার হয়, থামবে তো কোথাও। পথের পরিচয়ে দরকার নেই, গন্তব্যের ঠিকানায়ও দরকার নেই, তারা যে একসঙ্গে আছে, একসঙ্গে থাকতে পারছে—এই তাদের পথ, এই তাদের গন্তব্য।

ট্রামে এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে ডাইনে বেঁকল না, সোজা চলল। নীলিমা আর রঞ্জন পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প-অল্প হাসল। ভুল ট্রামে উঠে পড়েছে বলে এতটুকুও ঘাবড়াল না, হা-হুতাশ করল না। হয় পথে কোথাও নেমে পড়বে, নয়তো সোজা ডিপোতে চলে যাবে। ডিপোতে ট্রাম নিশ্চয়ই ফাঁকা হয়ে যাবে—সমস্ত গাড়িতে তারা দুজন ছাড়া কেউ থাকবে না। বৃষ্টির দিনে ট্রাম-ডিপো যে একটা সুন্দর জায়গা সেটা প্রত্যক্ষে আবিষ্কার করবে। বৃষ্টির মধ্যে কেউ তাদের ঠেলে বার করে দেবে না। যাত্রা শেষ হয়েছে বলে যদি কেউ আপত্তি করে তারা বলবে যাত্রা ফের আরম্ভ করতে আমরা রাজি আছি। ততক্ষণ দুজনে বসি না ঘেঁষাঘেঁষি করে, আষাঢ়ে গল্প করি। তোমার ভিড় কোরো না। এদিক-ওদিক থাকো।

কতদিন ধরে একটা নির্জন জায়গা খুঁজছে রঞ্জন, কিন্তু কোনো নির্জনতাই নীলিমার মনঃপূত নয়।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে বৃষ্টিটা একটু কম-কম মনে হতেই দুজনে নেমে পড়ল। নেমে রাস্তা পার হয়ে একটা সিনেমায় এসে দাঁড়াল।

নীলিমা বললে, 'দারুণ ভিজে গেলাম'।

রঞ্জন হেসে বললে, 'এখুনি কি, আরো কত ভিজতে হবে'।

'তার মানে?'

এখনো তো স্যাচুরেশন পয়েন্ট পর্যন্ত আসেনি। এখন তো যত ভিজবে তত খোলতাই হবে।'

বিরক্ত কটাক্ষ হানল নীলিমা : 'চলো টিকিট কেটে সিনেমায় ঢুকে পড়ি।'

'পাগল! আজকের এমন অদ্ভুত সন্ধ্যেটা পর্দার ছবি দেখে কাটাব? আজ দেখব তোমাকে। দাঁড়াও, এখানে কোথাও কাছাকাছি একটা রিকশা পেয়ে যেতে পারি—' বলে জলের মধ্যেই ছুট দিল রঞ্জন।

নীলিমা রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। কোনো দৈবপ্রেরণায় সব্যসাচীর গাড়িটা এখন এদিকে চলে আসতে পারে না? তা হলে সে কী করে? ডেকে উঠে বসে? রঞ্জনকে ফেলে রেখে চলে যায়? বা, তা কেন? রঞ্জন তো এখুনি ফিরে আসছে। ওকেও তুলে নেয় নিশ্চয়ই। তারপর কি করে কি ভাবে সব্যসাচীর পরিচয় দেবে রঞ্জনের কাছে? কোনখান থেকে শুরু করবে? যেটুকু সে না-বলা রাখবে সেটুকু যদি সব্যসাচী বলে দেয়? সব্যসাচী তো রঞ্জনকে

চেনে না, যদি আদরটুকুর কথা বলে দেয়? কি বলতে কি বুঝবে রঞ্জন তার ঠিক কি! দরকার নেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে। তার চেয়ে সিনেমার পোস্টার দেখা ভালো।

রঞ্জন ভিজতে ভিজতে ছুটে এল। বললে, 'রিকশা ঠিক মোড়ে নেই, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। চলো হেঁটে গিয়ে ধরি।'

তার মানে আমাকে আরো ভেজাতে চাও? দৃষ্টি আবার বাঁকা করল নীলিমা ঃ 'দুষ্টু কোথাকার!'

'পাগল! যা আমার একলার দেখবার তা সকলকে দেখাই কেন?' রঞ্জন দীপ্তকণ্ঠে বললে, 'তোমাকে আর মুক্ত বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না। এই দেখ রিকশা এসেছে।'

রিকশাওয়ালা বললে, 'মার্কেট পর্যন্ত যাব।'

'আমিও তো তাই বলছি—মার্কেট পর্যন্ত।'

'দু টাকা দিতে হবে।'

'সে তো ভাড়া। তার উপরে বকশিশ নিবিনে? বকশিশ চার আনা।' নীলিমার হাত ধরে টানল রঞ্জন ঃ 'উঠে পড়ো। পৃথিবীতে এমন উপকারী গাড়ি তুমি আর কোথাও পাবে না।'

বাক্যব্যয় না করে রিকশাতে উঠে বসল নীলিমা। যতটুকু সাধ্য পাশে জায়গা দিল রঞ্জনকে। ভিজের উপর ভিজে—রিকশাওয়ালা ঢাকাঢুকি দিয়ে বাঁধন-ছাঁদন দিয়ে দিল। এখন আর ভাবনা এই, এখন সীমাবদ্ধ সান্নিধ্যে অবন্ধ নিবিড়তা!

রঞ্জন বললে, 'কি, তুমি না রিকশা তুলে দেবার পক্ষে?'

'নিশ্চয়ই। এমন একটা কুচ্ছিত গাড়ি সভ্য দেশে কল্পনা করা যায় না।' বললে নীলিমা।

'কিন্তু কি আনন্দেব সম্ভার বয়ে নিয়ে চলেছে দেখ!' রঞ্জন হাসল ঃ 'আনন্দ আবার সভ্য হল কবে?'

'তাই বলে মানুষ মানুষকে টানবে এ অসহ্য।'

'তুমি মানুষের বদলে যন্ত্র আমদানি করতে চাও?'

'নিশ্চয়ই। যন্ত্রই তো মানুষকে কর্মক্লেশ থেকে মুক্তি দেবে।'

'তখন দেখবে মানুষ কাজ হারিয়ে বলবে আমাদের আবার মোট বইতে দাও, কাঠ ফাড়তে দাও, রিকশা টানতে দাও। যন্ত্রের দৌরাত্ম্যে মানুষের যখন আর কাজ থাকবে না তখন কাজের অভাবে তারা আবার এই যন্ত্রকেই ভাঙতে শুরু করবে। কিন্তু যাই বলো,' রঞ্জন ঘনতর স্নেহে উচ্চারিত হল ঃ 'তোমার এই রিকশাওয়ালা কিন্তু আমাদের পেয়ে খুব খুশি। সে নিশ্চয়ই চাইবে না তার শ্রমের লাঘবের জন্যে আমরা তার বদলে একটা ট্যাক্সি নিই।'

'আশ্চর্য এটুকুন পথ দু টাকা!' নীলিমা রঞ্জনের অপচয়কে শাসন করতে চাইল ঃ 'এতটা প্রশ্রয় দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।'

'দয়া করে তুমি রিকশাওয়ালার অপরাধ নিও না। সারা বছর শুকনো থাকে, এই বর্ষায় ওর মওকা মেলে। আজকের লগ্ন তো শুধু ওর নয়, আমাদেরও।'

'না, তোমার এমন অবস্থা নয় যে তুমি অকারণে দুটো টাকা এমনি জলে ফেলে দিতে পারো।'

'কি বলো! অকারণে! এমন হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া, এমন বৃষ্টি, ভুল ট্রাম, নতুন পরিবেশ, নতুন গন্তব্য— অপচয় ছাড়া এমন ঐশ্বর্য তুমি পেতে কোথায়?'

'না, ধৈর্য ধরা উচিত ছিল।' নীলিমা সিক্ত গলায় বললে, 'উচিত ছিল বৃষ্টি থামার জন্যে অপেক্ষা করা।'

'অনেক হয়েছে, আর অপেক্ষার কথা বোলো না। আমরা অপেক্ষা করলেও বৃষ্টি থামত না, ঝরেই যেত। অপেক্ষা করে করেই কি ভোর ক'রে দেব? বুড়ো হয়ে যাব?'

'কিন্তু এ তো যাচ্ছ মার্কেট পর্যন্ত। তার পরেও তো কত পথ!'

'যদি বৃষ্টি না থামে তবে আবার রিকশা নেব। যে পয়েন্ট পর্যন্ত নিয়ে যাবে সেখান থেকে আবার নতুন রিকশা—'

'হঠাৎ তোমার পার্স এত ভারি হয়ে উঠল কি করে?'

'একটা চ্যারিটি সোসাইটির ফাংশনে নাটকের মধ্যে ঢুকেছিলাম, হিরোর পার্টে বহাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ একটা ভালো টাকা আগাম দিয়েছে। কিন্তু যতদূর বুঝছি প্লে বোধ হয় হবে না।'

রঞ্জন যে মাঝে-মাঝে অ্যামেচার থিয়েটারে বায়না পায় তা নীলিমা জানে এবং এতে করে তার আয়ের অঙ্কটা একটু বাড়ে ভেবে তৃপ্তি পায়। চাকরির বাইরে কিছু বাড়তি আয়ের সুযোগ যদি থাকে, তবে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। তাই একটা ভালো দাঁও পেয়ে যদি ফসকে যায় সেটা নীলিমারও মনস্তাপ। তাই উদ্বিগ্ন স্বরে নীলিমা জিজ্ঞেস করল, 'কেন প্লে হবে না কেন?'

'শুনছি সোসাইটির নাকি টলমল অবস্থা।'

'ভালো টাকা দিচ্ছিল—অবস্থা খারাপ হল কি করে?' নীলিমার কণ্ঠের কুয়াশা কাটল না।

'কি জানি কী গোলমাল!' কথা আর বাড়াল না রঞ্জন, চেপে গেল। বললে, 'আদার বেপারীর জাহাজের খোঁজে কী দরকার? বাকি টাকা দেয় প্লে করে দেব, না দেয়, যা পকেটস্থ করেছি তাই উপরি পাওনা।'

ইচ্ছে করেই ব্যাপারটাকে বিশদ করলে না রঞ্জন। নইলে এমনিতে বিষয়টার মধ্যে রঙ রস নাটক সব ছিল, কিন্তু কথা বাড়াতে গেলেই অনিন্দিতা বোস-এর কথা উঠবে, নীলিমা ঠিক নিরাসক্ত ভাবে নিতে পারবে না। সুতরাং সেটা গোপন করে রাখাই প্রেমিকের কাজ।

নীলিমা লক্ষ্মী মেয়ে, কথার মধ্যে ফাঁক খুঁজে উঁকি দিতে চাইল না। যেমন উদাসীন থাকে, তেমনি উদাসীনই থাকল।

ও কি অন্য কোনো কথা ভাবছে? বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবার কথা?

অসহিষ্ণু হয়ে রঞ্জন বললে, 'তাই বলে তুমি কাঠ হয়ে থেকো না।'

'আমি বুঝি কাঠ?'

'নিষ্ঠুর কাঠ।'

'কাঠে বুঝি এত ফুল-ফল ধরে? এত মধু ঝরে'? এসে গেছে মার্কেট, তাই নীলিমাও বদান্য হল। বললে, 'জানো, শীত হলে গায়ে তাপ হয়, গ্রীষ্ম হলে ঠাণ্ডা হয়, আর বর্ষায় যেমন ভিজে তেমনি ভিজেই থাকে।'

'মোটেই না। পথ ফুরিয়ে গেল বলে, নইলে আমি প্রমাণ করতাম বর্ষায় ভিজে কাপড় শুকিয়ে যায়।'

মার্কেটে পৌঁছুতেই কে যেন কাকে ভারিক্কি গলায় 'লীলা' বলে ডেকে উঠল। চমকে উঠেছিল নীলিমা, কিন্তু তার ডাকনাম যে নীলা সে তো সব্যসাচী জানে না। না, এ সব্যসাচী নয়, আর তাকেও কেউ ভুল করে নীলা বলে ডাকছে না।

রঞ্জনও চমকে উঠেছিল। নীলিমার ডাকনাম নীলা—অনিন্দিতা বোসের ডাকনাম নিন্দা।

রঞ্জনদের 'কৃতিকৃষ্টি' ক্লাবের চাঁই শুভেন্দুই রঞ্জনকে নিয়ে গিয়েছিল।

ভদ্রমহিলার বয়েস হয়েছে নিশ্চয়ই—চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে—কিন্তু রজনীগন্ধার ফুটন্ত দণ্ডের মত শরীর, শুধু বিগত দিনের সুগন্ধে নয় আজকের রাত্রির উজ্জ্বল উন্মেষেই যা পরিচিত, রূপের এমন মহামহিম উচ্চারণ রঞ্জন কল্পনাও করতে পারত না।

শুভেন্দু বললে, 'আপনাকে যার কথা বলছিলাম! যদি আমাদের ক্লাবের 'যেমন সঙ্গ তেমন রঙ্গ' নাটকটা সিলেক্ট করেন, তা হলে এ হিরোর পার্টে নির্ঘাৎ মাতিয়ে দিতে পারবে।'

'সত্যি?' অনেক কমবয়েসী মেয়ের মত অভ্যস্ত সুর বের করে বললে অনিন্দিতা, কিন্তু পরিপূর্ণ চোখে তাকাতে গিয়েই স্তম্ভিত হল। শক্ত কাঠামোতে স্থির দীর্ঘচ্ছন্দ যুবক—নায়ক হবারই উপযুক্ত। অনিন্দিতার মনে হল শুধু রঙ্গমঞ্চে নয়, অনেক স্বপ্নমঞ্চেই এ মাতিয়ে দিতে পারবে।

'কি নাম আপনার?'

'রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।'

'রণ-জন!' অন্যরকম করে উচ্চারণ করল অনিন্দিতা : 'অর্থাৎ যে জন রণ করে, তার মানে আপনি যোদ্ধা।'

'যোদ্ধা?' সুন্দর সমানে-সমানে হাসল রঞ্জন : 'আমি যুদ্ধ করব কি! আমার পদবীতে যে চট্ট। চটি পরে কি কেউ যুদ্ধ করতে পারে?'

অনিন্দিতার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকে হাসল। ছেলেটি শুধু চেহারায়ই সুন্দর নয়, কথায়ও সুন্দর। পুরুষের সৌন্দর্য ব্যক্তিত্বে আর বাক্যই ব্যক্তিত্বের মধু।

'পদবী ফেলে দিন। পদবী দিয়ে মানুষের পরিচয় হয় না।' অনিন্দিতা হঠাৎ মুখচোখ কুটিল করে তুলল।

'কিন্তু আপনাকে তো আমরা মিসেস বোস বলেই জানি'। কে একজন বয়স্ক লোক বললে।

'মিসেস বোস বলে ডাকেন—তা আপনারা ডাকতে পারেন। কিন্তু আমি মিসেস-টিসেস নই, ওটা আমার পরিচয় নয়। আমি অনিন্দিতা—সকলের অনি-দিদি। কি বলো মেয়েরা?'

কতগুলো মেয়ে এক কোণে বসে গুলতানি করছিল, তারা সমস্বরে বলে উঠল : 'অনি-দিদি! অনি-দিদি!'

'তোমরা ছেলেরা কি বলো?'

আরেক কোণে কতগুলি ছোকরা আড্ডা দিচ্ছিল, তারাও তালে-তালে বলে উঠল : 'হনি-দিদি, হনি-দিদি!'

পরিতৃপ্ত চোখে তাকাল অনিন্দিতা। বললে, 'রঞ্জন যদি যোদ্ধা না হয় তো রঞ্জন কি?'

রঞ্জনের মাথায় দুষ্টুমি খেলল। বললে, 'এক্স-রে'।

'এক্স-রে?' অনিন্দিতার সঙ্গে-সঙ্গে অনুচর ছেলেমেয়েগুলি হেসে উঠল।

'কিংবা,' রঞ্জন আরো বিনীত হল, 'বলতে পারেন শুধু এক্স।'

বালখিল্যদের আবার একচোট হাসি।

'কেন এক্স কেন?'

'প্রফেসর Rontgen এক্স-রে আবিষ্কার করেছিলেন, সেই থেকে এক্স-রের বাংলা নাম হয়েছে রঞ্জন রশ্মি। এখন রে-র মানে হচ্ছে রশ্মি। সুতরাং রঞ্জনের মানে হচ্ছে এক্স।'

বলার ধরনে এবারের হাসি আরো ব্যাপক হল।

হঠাৎ কাছে এসে নিচু গলায় অনিন্দিতা বললে, 'কথাটার আরো একটা মানে আছে। সেটা আপনাকে আমি পরে জানাব।'

রঞ্জনের যেন তা জানতে বাকি আছে! নিজের নামের মানে ভাবতে গিয়ে নীলিমার মুখখানিই তার মনে পড়ে গেল। নীলিমার মুখেই যেন তার নামের মানে লেখা!

'বসুন। চট করে চলে যাবেন না যেন। অনেক কথা আছে।'

একটা টেবল ঘিরে বয়স্কের দল নানা আলোচনা করছে, তারই ধারে একটা চেয়ারে রঞ্জন বসল। ব্যাপারটা কি সে আগেই শুনেছে, এখন স্বচক্ষে দেখে অভিভূত হয়ে গেল। উঠতি বয়সের কত শিল্পী, কত তাদের নৃত্য ও নাটকের আয়োজন, কতই বা গানের ধুমধাম। মিসেস অনিন্দিতা বোস একজন নতুন ইমপ্রেসেরিয়ো—নানারকম আনন্দ-অনুষ্ঠান করে টাকা তোলেন ও তা দিয়ে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করেন। 'অনিন্দিতার আনন্দমেলা' বেশি আকর্ষণীয় যেহেতু তার শিল্পীর দল সব সময়েই নতুন, সব সময়েই অম্লান আর বিষয়গুলি সব সময়েই আধুনিক ও অগ্রগামী। ছেলের অনুপাতে মেয়ে বেশি, কেননা অনিন্দিতা জানে যত বেশি মেয়ে তত বেশি চাঞ্চল্য—তত বেশি টিকিটের মর্যাদা। যাদের যৌবন গত বা হৃত তাদের অভিনয়ে যতই পারিপাট্য থাক, শুধু মেকআপের ফাঁকিতে সমুদ্রে ঢেউ তুলতে পারবে না, আর যে মেয়ে সুন্দর তার অভিনয়ে ত্রুটি হলেও সে সুন্দর। তার নাচের ভুলও দর্শককে নাচিয়ে দেবে। কিন্তু যতই মেয়ে এনে জড়ো করুক অনিন্দিতার নজর ছেলের দিকে। কেননা সে জানে আসল সম্ভাবনা ছেলের মধ্যেই—মেয়ে আর কতদিন!

পাশে বসা শুভেন্দুর কানে-কানে বলার মত করে রঞ্জন বললে, 'মেয়ে কত!'

শুভেন্দু বিজ্ঞের মত হাসল। মিসেস বোসের মত একজন মহামান্য মহিলা, তার পক্ষছায়ায় সকলেই নিরাপদ। নিরাপদ শুধু নয়, বাধিত। বাধিত শুধু নয়, বশংবদ। কেউ নেই অনিন্দিতার কথার উপর কথা কয়। কথা কইবার দরকার বা কি। যে কেউই অনিন্দিতার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় সে পার্ট পাক বা না পাক, কিছু না কিছু দক্ষিণা পাবেই। চ্যারিটির আরম্ভ নিজের গৃহে, এ আপ্তবাক্যে নিরঙ্কুশ বিশ্বাসই অনিন্দিতার সাফল্যের হেতু। তাই যখন সে কোনো লোকসেবায় টাকা দেয়, খরচ-খরচা কেটে রেখে তবে দেয়। আর এই খরচ-খরচার মধ্যে জলসার ভিতরের ও বাইরের সকলের প্রাপ্যই ধরা থাকে। যেহেতু তুমি অনিন্দিতার মনোনীত, কোনো না কোনোদিন তুমি কাজে লাগতে পারো সেই জোরেই তোমার মুনাফা মিলে যাবে। তাই সে আসে, অন্তত বসে থাকতে আসে।

নিটুট নিখুঁত সংগঠন। দু'দুটো মেয়ে হিসেব লিখছে—আদায়ের আর দায়-শোধের। টিকিট বেচার ভার আর দুটোর উপর—সময়ে সময়ে এই সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। এরা কাউন্টারে বসে না, এরা ফার্মে ফ্যাক্টরিতে ঘোরে, শাঁসালো অফিসারদের গাঁথে। এই টিমের অধিকর্ত্রী স্বয়ং অনিন্দিতা আর সে গিয়ে দাঁড়ালে কারু সাধ্যি নেই সর্বোচ্চ দামের টিকিট একটা না কেনে। তাই সব্বাইকে দিয়ে-থুয়ে করিয়ে-কম্মিয়ে বেশ মোটা রকম

মুনাফা কামায় অনিন্দিতা---এই সকলের ধারণা। রঞ্জন লক্ষ্য করল এই সংগঠনের নামও অনিন্দিতা। অনিন্দিতার নাটক---অনিন্দিতার নাচগান---অনিন্দিতার জলসা---তার নামেই সবাই মাতোয়ারা! মেয়ে কত! কিন্তু রঞ্জন চেয়ে দেখল নীলিমার মত কেউই মন-প্রাণ ভরে দেয় না। বা, কথা না বলে আলাপ না করে তুমি তাদের দাম কষবে? এই তো শুনতে পাচ্ছি তাদের কথা, তাদের হাসির শব্দ, টের পাচ্ছি তাদের আলাপের কি গতি-রীতি, কই কিছুই তো চিত্তে এসে লাগে না। নীলিমার কথা কি মিষ্টি, হাসি কি সরল-অমল আর যা সে বলবে, যতটুকু বলবে তারই মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের সুগন্ধ। সে যদি কোনো শব্দও না করে, নীরবে কাছে এসে দাঁড়ায়, তাহলে তার মুখের দিকে তাকালেই মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

তুমুল হৈ-হল্লার শেষে মহড়া ভেঙে গেল। এবার তবে ছুটি। রঞ্জন ডান হাতের কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দশটা প্রায় বাজে। একে একে সবাই চলে যাচ্ছে—কতগুলি মেয়ে ঝাঁকে বেঁধে সিঁড়ি দিয়ে নামছে—যেন ঝর্নার প্রপাতের মত। নিচে-উপরে আশেপাশে আরো যে ফ্ল্যাট আছে এবং সে সব ফ্ল্যাটে যে বাসিন্দা আছে, তা তারা লক্ষ্যের মধ্যেই আনছে না। তারা আছে, তাদের পায়ের নিচে ধরাপৃষ্ঠ আছে আর তাদের শরীরে আছে নতুন বয়সের জৌলুস এতেই তারা দিশেহারা। নীলিমা হলে কখনই এমনি ছন্দ-ছাড়া হত না। খুশিতে সে যদি উশ্রীও হত, সুশ্রী থাকত!

কথা আছে, অনেক কথা---একটি কণাও তো পরিবেশন করল না। রঞ্জন বসে-বসে ক্লান্ত হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। চট করে চলে যাবেন না—সে কথা মানতে গিয়ে এ তো শেষেরও বেশি প্রতীক্ষা করছে। তবু যে এক ফাঁকে কেটে পড়েনি তার কারণ মেয়েগুলি। মেয়ে দেখতে রঞ্জনের বেশ আনন্দ হয়। আর এ দেখে আরো আনন্দ হয় কেউ তার নীলিমার, তার নীলার মত যথেষ্ট নয়।

রঞ্জনও শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ল। সৌজন্যের খাতিরে একবার, মানে শেষবার, তাকাল অনিন্দিতার দিকে আর অনিন্দিতা তখুনি তার চোখে ছোট্ট একটি ইশারা করল।

সে ইশারার অর্থ কাছে এস; শোনো---শুনে যাও। সকল কানের আড়ালে তোমাকে একটি গোপন কথা বলবার আছে।

রঞ্জন এক মুহূর্ত নিশ্চলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

সন্দেহ কি, অনেক কথা---একটি ক্ষুদ্র কটাক্ষেই এক অভিধান কথা।

রঞ্জন নড়তে পারছে না দেখে অনিন্দিতাই তার কাছে এগিয়ে এল। কেউ ধারে-কাছে নেই, তবু কণ্ঠস্বর নিচু করে গোপনতার মায়া মাখিয়ে বললে, 'কাল একলা সকাল-সকাল এস।'

'কখন? কটার সময়?'

'ধরো, সাড়ে চারটেয়।'

অফিসের কথা ভেবে বৃথাই বুঝি দ্বিধা করছিল রঞ্জন, অনিন্দিতা করুণা করে বললে, 'আচ্ছা পাঁচটায়। কেমন?'

'আসব।' আরেকবার তাকাতে সাহস পেল না রঞ্জন। একটু বুঝি দ্রুত পায়েই নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

কথা—কথা কি শুধু মুখ বলে? কথা বলে চোখ। সমস্ত নৈপুণ্য চোখে। চোখের আলোতেই লিপির সবগুলি অক্ষর জ্বলজ্বল করে ওঠে।

পরদিন অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল রঞ্জন। জরুরি রিহার্সালের কথা বলেই গোপেশবাবুরর কাছ থেকে ছুটি নিল।

'সে কি কথা?' গোপেশবাবু একটু অবাক হলেন ঃ 'সন্ধের আগেই রিহার্সেল?'

'নাটকটা খুব জরুরি, স্যার।' রঞ্জন কান চুলকোল।

'নাটক না উপন্যাস?' গোপেশবাবু তাকালেন বাঁকা চোখে।

'নাটক, স্যার।'

'তাই বলে এদিকে নাটকটার দিকেও লক্ষ্য রেখো।'

এ দিকের নাটক বলতে গোপেশবাবু বোধ হয় অফিসের কর্তব্যের কথাটাই বোঝাতে চাইছিলেন, কিন্তু কেন কে জানে বঞ্জনের নীলিমার কথাই মনে পড়ে গেল। সে তো শুধু ঘটনার নাটক নয়, চিত্তবিলাসের উপন্যাস নয়, মর্তের ধূলিতে অমরাবতীর কবিতা নয়—সমস্ত কিছু হয়েও সে আবার ব্যাকরণ, সর্বরসের ব্যাকরণ।

প্রথম দিন বলে ছেড়ে দিলেন গোপেশবাবু।

রঞ্জনও অনুভব করল আজকের দিনও বুঝি প্রথম দিন। নীলিমার প্রথম দিনের ডাকও তার মনে পড়ল। সে ডাক মধুরের ডাক। আজ যেন তাকে তিক্ত ডাকছে, রুক্ষ ডাকছে, ডাকছে কটু কষায়। জীবনে এ ডাকাও প্রথম বৈকি। আর ডাকাও দুর্বারণ।

ফ্ল্যাট বাড়ির নিচেটা কেমন যেন থমথম করছে মনে হল। এখন তো দিন বিকেলের দিকে স্পষ্ট হেলে পড়েছে, চারদিকে একটু সাড়াশব্দ থাকলেই স্বাভাবিক হত। সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ, কেমন যেন মুখ-ফেরানো। এ সব ঘরে না-জানি কারা থাকে—তাদের কারু ঘরে কি কোনো শিশু নেই? কোনো কান্না, কোনো কোলাহলেরও কি আভাস মিলবে না? এ কি কবরের দেশ? শুধু স্তব্ধতার স্তূপ?

কালকের রাতে দোতলার নাচ-গান-অভিনয়ের হৈ-হল্লা কেমন যেন অবাস্তব, কেমন যেন ভিত্তিহীন বলে মনে হল।

কাকে চাই—আশ-পাশ থেকে সামান্য কোনো কৌতূহলের খোঁচা নেই। একটা মাত্র সিঁড়ি যা দিয়ে উপরে সটান উঠে যাওয়া যায়। আর উপরে উঠে একটি মাত্রই লোক যার কাছে সে অবাধে গিয়ে পৌঁছুতে পারে।

একটি কটাক্ষের এমনি অগাধ নিমন্ত্রণ!

উপরে উঠছে না নিচের দিকে নামছে বুঝতে পারছে না রঞ্জন। তবু সে যাচ্ছে, চেনা দরজার কাছে এসে সে থামছে, দ্বিধা করছে বন্ধ দরজায় টোকা মারবে কিনা।

কে জানে দরজা খুলে কি সে দেখতে পাবে ভিতরে। হয়তো অনেক লোকজন, অনেক বাধাবিপদের দুর্ভাবনা। হয়তো রঞ্জনকেই চিনতে পারবে না। থিয়েটারে পার্টের প্রার্থী তো এ সময়ে কেন? বুধ-শুক্র-রবি এই তিন দিন ক্লাস বসে তখন একদিন যেন আসে—আর তাও সন্ধে সাতটার পর। আজ তো বেস্পতি—তাও ঘড়িতে এখন মোটে সাড়ে চারটে। এত হন্যে হওয়া কিসের জন্য? আগে এলেই আগে পায় না। আগে আগে দরখাস্ত করতে গেলেই আগে আগে বরখাস্ত হয়ে যায়।

ছলনাতেই নারী মহীয়সী এ কথা রঞ্জন বইয়ে পড়েছে, না হয় বই-ই এবার নিজের চোখে মিলিয়ে নেবে। অভিজ্ঞতাই তো জীবনেরর ইট-কাঠ, অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে গেলে তো বনেদই গাঁথা হবে না। ঐ কটাক্ষটাই তো অভিজ্ঞতা।

সেই কটাক্ষকে স্মরণ করে, তবু ভয়ে-ভয়ে দরজায় আঙুলের গিঁট টোকা মারল রঞ্জন।

কে একটি ফিটফাট যুবতী মেয়ে দরজা খুলে দিল।

এ আবার কে? থমকে গেল রঞ্জন। ভুল ঘরে ধাক্কা দিল না তো? ভয়ে-ভয়ে ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করলে, 'মিসেস বোস আছেন?'

'আরে এস এস, রঞ্জন না?' ভিতর থেকে উচ্চকিত হয়ে ডেকে উঠল অনিন্দিতা। একটা টেবিলের সামনে বসে লিখছিল, উঠে দাঁড়াল। স্বল্প বেশবাস, উঠে দাঁড়াবার আড়ম্বর বুকের আঁচল পড়ে গেল মাটিতে। তুলে স্বস্থানে স্থাপন করবার উদ্যমেও কেমন একটা অমনযোগ দেখাল। আবার তুললে আবার পড়ে যেতে পারে, তাই বিশেষ ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। রঞ্জন দেখল চোখ ভরে। দেখল শ্লথতার মধ্যেও কত মহিমা, কত বৈভব!

'বোসো, বোসো।' অনিন্দিতা একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। বললে, 'তুমি আসবে বলে আমি আজ দুপুরে ঘুমুতে পারিনি।'

অপরাধীর মত মুখ করে বসল রঞ্জন। বললে, 'আপনি দুপুরে ঘুমুন নাকি?'

'দুপুরটাকে ভুলে থাকবার জন্যে ভদ্রমহিলার পক্ষে ঘুমই ভদ্রতম উপায়। কিন্তু শুলেই কি আর ঘুম আসে? আজ তো বেশি করেই আসবে না—আসেও নি। একবার চেয়ারে বসেছি আরেকবার ইজিচেয়ারে শুয়েছি।' অনিন্দিতা এখন মুখোমুখি ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দিল।

শেয়ানা শোভাকে দেখতে দেখতে রঞ্জন বললে, 'কেন, আজকে ঘুমের ব্যাঘাত হল কেন?'

'আহা, বুঝতে পারো না?' চোখের কোলে কালো মদিরার তুলি বুলোল অনিন্দিতা: 'শ্রীমানের জন্যে'।

'আমার তো আসবার কথা সাড়ে চারটেয়।' হাতের ঘড়িতে রঞ্জন সমর্থন খুঁজল।

'সেই ঠিকমত সময়ে আস কি-না তারই জন্যে উদ্বেগ। না কি একেবারে ভুলেই হাওয়া করে দিলে, দু'হাত উপরের দিকে তুলে যুক্ত করতলে মাথা রেখে অনিন্দিতা ভঙ্গিতে আলস্যের লাস্য ছাড়ল।

'আপনাকে ভুলব না আরো কিছু!'

'সত্যি? কিন্তু তোমাকে যে আপনি ছেড়ে তুমি বলছি, তাতে তুমি চটছ না?'

'চটব কেন? তুমি তো বেশ ভালো ডাক।'

'ভালো ডাক!' অনিন্দিতা স্বরটা বাঁকা করল: 'লোকে তুমি বলে কখন?'

'বয়সে ছোট হলে। আর -- '

'তুমি আমার চেয়ে বয়সে কত ছোট তা আন্দাজ করতে পারো?'

'কি করে পারব? আমি কি বয়েস বিশ্বাস করি?'

'বটে? তোমার বয়েস কত?'

'আমার বয়েস ক্লিন আটাশ।'

'আর আমার বয়েস আনক্লিন পঁয়তাল্লিশ।' উচ্চরোলে হাসল অনিন্দিতা।

ভাগ্যিস এখানটায় অনিন্দিতা সশব্দে হেসে উঠেছিল তাই একবার নীলিমার কথা রঞ্জন ভাবতে পারল। তাই সাহস করে বলতে পারল: 'ও কিছু নয়। তুমি ডাক অনায়াসে চলতে পারে।'

'সে তো আমার দিক থেকে নিশ্চয়ই পারে।'

'আমার দিক থেকেও পারে।' দুষ্টু ঠোঁটে হাসল রঞ্জন।

'তার মানে?' কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে অনিন্দিতা ইজিচেয়ারে উঠে বসল।

'তার মানে আমি তোমাকে তুমি বলতে পারি।' যতই ভয় দেখাক, রঞ্জন আর ভয় পেল না। বললে, 'ছোট হলে যেমন বলা যায়, তেমনি আবার সমানে-সমানে বলা যায়।'

'আমি আর তুমি সমান-সমান?' অনিন্দিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'কেন নয়? অনুরাগে সমান-সমান।'

উত্তরে অনিন্দিতা কি করে বা কি বলে দেখবার জন্যে এক-নিশ্বাস স্তব্ধ রইল রঞ্জন। অনিন্দিতা কাছে এসে রঞ্জনের মুখটা দু হাতে ধরে বুকের উপর টেনে আনল। সস্নেহে বললে, 'তাই তো ডাকবার সময় মিসেস বোস বললে?'

'আর বলব না।'

'তবে কি বলবে?'

'অনু বলব।'

'উঃ, অসম্ভব।' দু কানে দু হাতের দুটো আঙুল ঢুকিয়ে অনিন্দিতা ছিটকে দূরে সরে গেল। তার আগের চেয়ারে গিয়ে বসল। বললে, 'ঐ নামে আমাকে আমার স্বামী ডাকত'।

'তোমার স্বামী?' রঞ্জন যেন হকচকিয়ে গেল : 'সে বেঁচে আছে?'

'বেঁচে আছে বৈ কি। দুর্দান্ত বেঁচে আছে।'

'সে কোথায়?'

'সে এখন অফিসে।' বলেই, যেন আশ্বস্ত করা দরকার এমনি ভাব দেখিয়ে হেসে বললে, 'ভয় নেই। এক্ষুনি সে ফিরবে না। ফিরলেও আসবে না এখানে।'

'কেন, সে কি আলাদা থাকে?'

তীক্ষ্ণ প্রশ্নে অনিন্দিতা হঠাৎ বিব্রত বোধ করল। বললে, 'আলাদা থাকলেও দূরে থাকে না। এই কাছাকাছি থাকে।' ধীরে ধীরে অনিন্দিতা আবার তার চেয়ারের কাছে সরে গেল।

'কাছাকাছি মানে কত দূরে?'

'নিচে। নিচে এক নম্বরের ফ্ল্যাটে।'

বেশ, তাতেই রঞ্জনের চলে যাবে—এর বেশি খবরে তার প্রয়োজন নেই। তবু কৌতূহলই মানুষের বড় ব্যাধি, তাই প্রশ্নটাকে তাড়াতে চেয়েও তাড়াতে পারল না। জিজ্ঞেস করলে, 'যে মেয়েটি দরজা খুলে দিল সে কে?'

'কি, রঞ্জন-রশ্মির চোখ ঠিক পড়েছে তাহলে?' পরিচিত পরিহাসের মশাল মিশিয়ে হাসল অনিন্দিতা।

'সশরীরে একজন দরজা খুলে দেবে আর তা চোখে পড়বে না?'

'বেশ তো রঞ্জনরশ্মি তবে নিজেই বলুক মেয়েটি কে?

'তোমার মেয়ে?'

'না, না, আমার মেয়ে হতে যাবে কেন?' এবার যেন পরিহাস নয়, অনিন্দিতার মুখে চোখে একটা কঠিন জ্বালার ছাপ ফুটে উঠল : 'আমার মেয়ে কোথায়? আমার মেয়ে নেই। ও আমার কাজের মেয়ে।'

'শালীন ভাষায় যাকে বলে পরিচারিকা!'

'হ্যাঁ, তাই। সহকারিণী।' অনিন্দিতা অন্য দিকে চোখ রাখল।

কিন্তু কৌতূহল রঞ্জনকে ছাড়ল না, এই কৌতূহলের জন্যে আদিম মানুষ তার স্বর্গ খুইয়েছে, তবু সেই কৌতূহলই তাকে জানলার ফাঁকের কাছে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্বামীও কি এমনি একটি সহকারিণীকে নিয়ে থাকে নাকি?'

অনিন্দিতা ঈষৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে : 'তা একদিন উঁকি মেরে দেখে এলেই পারো কার সঙ্গে থাকে।'

'আমার ভুল হয়েছে। আমি মার্জনা চাইছি।' রঞ্জন বিরক্তির কারণটুকু ঠিক মুছে দিল ক্ষমা চেয়ে : 'তুমি যেমন কাজের মেয়ে, তোমার সহকারিণীকে নিয়ে থাকো, তোমার স্বামীও তেমনি কাজের লোক, তার সহকারিণীকে নিয়ে থাকে। এটা আমার বোঝা উচিত ছিল। তুমি যেমন একলা, আমার বোঝা উচিত ছিল, তোমার স্বামীও তেমনি একলা।' তারপর রঞ্জনের যেমন একটু বেশি কথা বলার ঝোঁক এই প্রগল্‌ভতায় বলে বসল : 'একদিন নিচের ফ্ল্যাটে গিয়ে তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করে আসব।'

'খবরদার না।' অনিন্দিতা গর্জন করে উঠল : 'আমার ঘরে এসে আমার বন্ধু হবার পর আর আমার স্বামীর চৌকাঠ মাড়াতে পারবে না।'

দিব্যি হাসিমুখে মেনে নিল রঞ্জন। বললে, 'তুমি যখন বারণ করছ তখন নিশ্চয়ই মাড়াব না। একটা শূন্য ঘরের চৌকাঠের চেয়ে তোমার বন্ধুতার দাম অনেক, তারপর এই বন্ধুতাকে ঘনতর করার জন্যে বললে, 'তোমার কাছে এতক্ষণ এসেছি, এখনো কিছু খেতে দিচ্ছ না?'

'কী মিষ্টি ছেলে!' স্নেহের উত্তাল ঢেউয়ে ছুটে এসে অনিন্দিতা রঞ্জনের মুখটা আবার বুকের কাছে টেনে নিল। বললে, 'নিশ্চয়ই খেতে দেব।' বলেই ছেড়ে দিয়ে ডাকলে বাসন্তীকে।

রঞ্জন দেখল সেই দরজা খুলে দেওয়া মেয়েটিই বাসন্তী।

'কি রে, হল?' অনিন্দিতা উৎসুক খুশিতে জিজ্ঞেস করল।

'হয়েছে।' বাসন্তী বললে, 'ও-ঘরে দিয়েছি।'

'না, না, এখানে নিয়ে আয়। এখানে সাজিয়ে দে।'

অনিন্দিতা উঠে তার টেবিলের দিকে গেল আর টানা খুলে একটা চৌকো শাদা খাম বের করল। সেটা রঞ্জনের হাতে পৌঁছে দিয়ে বললে, 'এটা রাখো।'

'কি এটা?' এক মুহূর্ত আড়ষ্ট হল রঞ্জন।

'পঞ্চাশটা টাকা। তোমার বায়নার বউনি।' জ্বলো-জ্বলো চোখে হাসল অনিন্দিতা।

'অভিনয়ে পার্ট নিলাম না, এখুনি টাকা কি?'

'আগাম দিয়ে রেখে তোমার নাম পাকা করে নিলাম।'

'টাকা না নিয়ে বুঝি পাকা হতে পারতাম না?'

'তবু আমার আপন লোককে আমি টাকা দেব তাতে তোমার কি বলবার আছে?' অনিন্দিতা তার মুখে-চোখে উপদেষ্টার গাম্ভীর্য আনল : 'হাতে যা আপনি এসে পড়ে, তা তক্ষুনি নিয়ে নেবে। না চাইলে যা পাওয়া যায় তা যদি না নাও, তাহলে জীবনে যখন চেয়েও যা পাবে না তার দুঃখ সহ্য করবে কি করে?'

'কিন্তু আগে থাকতেই টাকা—রাম না হতেই রামায়ণ—' রঞ্জন যেন এ জায়গাটা স্টেজে দাঁড়িয়ে অভিনয় করার মত বললে।

'হ্যাঁ।' অনিন্দিতা প্রায় ধমক দিয়ে উঠল : 'তোমাদের নাটকের নাম 'যেমন সঙ্গ তেমন

রঙ্গ' না? আমারও সেই নাটক। যেমন সঙ্গ তেমনি রঙ্গ। আমার সঙ্গ করতে এসেছ, আমার রঙ্গও তোমাকে দেখে যেতে দেব। আমি পরীক্ষা না নিয়েই পাশ করে দিই, শুধু পাশ করে দিই না, একেবারে প্রথম করে দি—'

'কিন্তু সত্যি বলছি,' রঞ্জন খামটা হাতে রেখেই বললে, 'আমার টাকার দরকার ছিল না—'

'দূর বোকা ছেলে!' আবার ধমক হানল অনিন্দিতা ঃ 'টাকা কখনো কারু বেশি হয়? কখনো কেউ বলতে পারে আমার ভালোবাসা পাবার দরকার নেই? উড়িয়ে দেবার জন্যেও তো টাকার দরকার আছে। বেশ কদিন রেস্তরাঁয় খাও, সিনেমা দেখ, এমনি ঘুরে বেড়াও—'

'ওভাবে ওড়াবার জন্যে একজন সঙ্গী দরকার।'

'কেন, তোমার সুইটহার্ট নেই?'

'কোথায় পাব?' শূন্যায়িত ভঙ্গি করল রঞ্জন। মনে মনে নীলিমাকে বললে, তুমি তখন এসো না, তুমি শূন্যের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকো।

'বিশ্বাস করি না। এমন সুন্দর পৌরুষভরা চেহারা, তুমি কারু রঞ্জন হতে এখনো বাকি আছো!'

'রঞ্জন?' যেন নিজের নামটাই নতুন ঝঙ্কারে রঞ্জনের কাছে বাজল।

'হ্যাঁ, মনোরঞ্জন!' অনিন্দিতা টেবলের দিকে সরে গেল, কী কটা অকারণ গোছগাছে মন দিলে। বললে, 'তোমার নামের সেই আরেকটা অর্থের কথা বলব বলেছিলাম না? এটাই সেই অর্থ। তুমি তো রণ-জন যোদ্ধা নও, তুমি রঞ্জন—বাঁশিওয়ালা।'

রঞ্জন হাসল, বললে, 'আমাদেব দেশে যিনি বংশীধর তিনিই আবার বিরাট যোদ্ধা।'

'জানি। তুমিও তেমনি বাঁশি হয়ে কারু হৃদয়ে ঢুকে অস্ত্র হয়ে বিক্ষত করে বেরিয়ে যাবে।' অনিন্দিতা ভ্রূকুটি করল।

'আমি আবার কার হৃদয়ে ঢুকব? কারুর নয়নরঞ্জনই হতে পারলাম না। তাই মনোরঞ্জন!'

'সত্যি বলছ তোমার কেউ নেই?'

এই ঘরের ছাদ ক্ষণকালের জন্যে নীলিমাকে আড়াল করে থাক। তাই উপরের দিকে চোখ না পাঠিয়ে রঞ্জন ঘরের চার দেয়ালের মধ্যেই তাকে আবদ্ধ রাখল। বললে, 'সত্যি বলছি আমার কেউ নেই।'

'একজনও নয়?' অনিন্দিতার চোখে সেই নেত্রামৃতকটাক্ষ ফুটে উঠল।

রঞ্জনের সাড়া দিতে দেরি হল না। স্বর গাঢ় করে বললে, 'শুধু একজন আছে।'

'কে সে?'

'সে সুইটহার্ট নয়, সে লেডি-লাভ।'

কথা বলার ধরনে ও সংকেতসংকুল চাউনির মিলনে দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল পরমুহূর্তেই অনিন্দিতা গম্ভীর হয়ে বললে, 'দাঁড়াও, আমার স্বামী আসুক, তার কাছে গিয়ে নালিশ করি। তোমার কী ব্যবস্থাটা তখন হয় দেখবে।'

এতটুকু ভয় পেল না রঞ্জন। বললে, 'তোমার স্বামীও আসবে না, তার কাছে তুমি নালিশও করবে না—'

'হ্যাঁ শোনো,' অনিন্দিতা মুখে আরেক রকম গাম্ভীর্য আনল ঃ 'সে আসুক বা না আসুক, তুমি কিন্তু তার কাছে কোনোদিন যেয়ো না।'

'না, না, আমি নিচে নামব না কিন্তু এতক্ষণে টাকা-ভর্তি খামটা পকেটে পুরল রঞ্জন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শরীরে একটা নিশ্চিন্ত স্ফূর্তির ছন্দ আনল। বললে, 'তোমার স্বামীর ডাকা অনু তো তোমার পছন্দ নয়, তবে আমি তোমাকে কি বলে ডাকব? অনি বলে?'

'না, না, ও নামও দিদি-মাসির সঙ্গে মিশে পচে গিয়েছে। তোমার জন্যে নতুন নাম হবে। সে আমি তোমাকে বলব যাবার সময়। এখন খাবে এস।'

ততক্ষণে বাসন্তী কোণের দিকের টেবিলটা প্লেটে-বাটিতে সাজিয়ে দিয়েছে। রাশি-রাশি খাবার। এক নজর দেখেই ভড়কে গেল রঞ্জন। বললে, 'ওরে বাবা, এত! লুচি মাংস পায়েস—আবার মাছ! এত রাজ্যের খাবার কোথায় পেলে?'

'তুমি আসবে ভেবে নিজের হাতে রান্না করেছি।' অনিন্দিতার কণ্ঠ করুণার্দ্র শোনাল।

'নিজের হাতে রান্না করেছ? কী আশ্চর্য!' শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে মুগ্ধের মত তাকাল রঞ্জন ঃ 'কিন্তু এত কি একজনে খেতে পারে?'

'খুব পারে। অফিস থেকে ফিরেছ, এখন তো তোমার খিদে পাবার কথা।'

'তাই বলে এত?'

'তুমি হাত লাগাও তো—দেখি কতদূর কি খেতে পারো। অবশ্যি রান্না খারাপ হলে কি করে খাবে?'

রঞ্জনকে বসিয়ে পাশে আরেকটা চেয়ারে বসল অনিন্দিতা। তার শেষ কথাটাতে কি একটু বেদনার ছোঁয়া লাগল, একটু অভিমানের? কি জানি কি! রঞ্জন হাত লাগাল।

'যেমন গ্রাস করে খাচ্ছ মনে হচ্ছে তোমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।' স্নেহে কথাটাকে লঘু করে দিল অনিন্দিতা ঃ 'তুমি সব শেষ করতে পারবে।'

'আমি যা খাই গোগ্রাসে খাই। কিন্তু গোগ্রাসেরও একটা সীমা আছে। তুমি যা দিয়েছ তা সীমাহীন।' অর্থটাকে খাদ্যেরও বাইরে নিয়ে গেল রঞ্জন।

'জানো আমি যখন কাউকে খাওয়াই, তখন তার খাওয়ার মধ্যে আমি আমার ছেলের ক্ষুধাটাকে দেখি।' বলতে বলতে অনিন্দিতার চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

'তোমার ছেলে!' আশ্চর্য হবার মত কিছু নয়, তবু কেন কে জানে রঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, ষোল বছরের ছেলে। প্রচণ্ড স্বাস্থ্য ছিল—দেখতে প্রকাণ্ড।' অনিন্দিতার চোখে স্পষ্ট জল দাঁড়াল ঃ 'খুব খেতে পারত। ওর সাহেব বাপ ওর এই বেশি খাওয়া দেখতে পারত না। বলত অসভ্যতা। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পরই ঐটুকুন ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে দিল। ওর ধারণা বিলেত গেলে ছেলে শুধু মানুষই হতে পারবে না, সভ্য হতে পারবে। স্নব স্নব—পয়লা নম্বরের স্নব। ছেলের আর কী! কিশোর বয়সের অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্ন দিয়ে ভরা -হাসতে-হাসতে রুমাল নাড়তে-নাড়তে চলে গেল। তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এক কার-অ্যাকসিডেন্টে—।' দু'হাতে মুখ ঢাকল অনিন্দিতা।

তাহলে এই মহিলার জীবনে রোদন আছে—রৌদ্রেও রোদন! কিন্তু তার কি সান্ত্বনা সে দিতে পারে রঞ্জন ভেবে পেল না।

নিরুপায় হয়ে বললে, 'বেশ, আমি খাচ্ছি। চোখ চাও, আমার খাওয়া দেখ।'

অনিন্দিতা মুখের থেকে হাত সরাল বটে কিন্তু মুখের ম্লানিমা এক নিমেষে মুছে ফেলতে পারল না।

রঞ্জন আবার বললে, 'তুমি যদি বিষণ্ণ হয়ে বসে থাক, আমি খাই কী করে?'

'না, সব বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠেছি। তুমি খাও।'

অনিন্দিতা এটা-ওটা এগিয়ে দিতে লাগল আর রঞ্জন যথাসাধ্য পাঠাতে লাগল গলার নিচে। তার এ খাওয়া নিজের তুষ্টির জন্যে নয়, শুধু অনিন্দিতার তৃপ্তির জন্যে।

তারপর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মুখ মুছে বিদায় নেবে, বাসন্তী ছোট প্লেটে পান আর মশলা নিয়ে এল।

বাসন্তীকে দেখে রঞ্জনের কেন কে জানে মেয়ের কথা মনে পড়ল। তখন এই মেয়ের কথাটাই যেন শেষ হতে পারেনি। অব্যক্ত থেকে গেছে।

আবার সেই কৌতূহল রঞ্জনকে খোঁচা মারল।

'তোমার মেয়ে কোথায়—কি যেন বলছিলে তখন—।' ধরিয়ে দিল রঞ্জন।

এ বুঝি আগুন ধরিয়ে দেওয়া। অনিন্দিতা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ঃ 'আমার মেয়ের কথা জানতে চেও না। সে এখন পাগলা গারদে। ঐ, ঐ নিচের পিশাচই তাকে পাগল করেছে। নির্মম নৃশংস।'

'কেন, কি হয়েছিল?' দীর্ঘ পরিচিত আত্মীয়ের মত জিজ্ঞেস করল রঞ্জন। এতটুকুও পাশ কাটাল না। যতটুকু জানা যায়, যতটুকু দেখা যায়। যতটুকু বা সাবধান হওয়া যায়।

'আমার মেয়ে ছেলের চার বছরের বড়। দেখতে সে আমার মতই সুন্দর ছিল। কি, আমি সুন্দর নই?'

'সে পরে বলব'। যেন কোনো স্থিতধী মহাপ্রাজ্ঞের মত বললে রঞ্জন, 'তোমার মেয়ের কথা বলো।'

'সে সুন্দরী মর্যাদাবান ঘরের মানে হাইব্রাউ অফিসারের মেয়ে, এক অনুপযুক্ত যুবককে ভালোবাসল—বিয়ে করতে চাইল। তার কসাই বাবা সে নির্বাচন বরদাস্ত করতে পারল না, মেয়েটাকে ঘরের মধ্যে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখল। এক-আধবেলা নয়, রাত-দিন, দিনের পর দিন। মেয়েটা স্তব্ধ হয়ে গেল তবু তার সংকল্প থেকে ভ্রষ্ট হল না। যখন দরজা খোলা হল মেয়ে তখন বদ্ধ উন্মাদ।'

রঞ্জন আহত দৃষ্টি নত করল। মানুষকে জানতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে শুধু দুঃখকে জানতে পাওয়া।

হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ল অনিন্দিতা। বললে, 'আমিও উন্মাদ। আমার মেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে আর আমি গানে নাচে নাটকে হট্টগোলে মুখরিত হয়েছি। আচ্ছা,' অনিন্দিতা দরজার কাছে রঞ্জনের প্রায় গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল ঃ 'আমি যে তোমাকে ভালোবাসছি এও তো অনুপযুক্তকেই ভালোবাসা। তবে আমার উন্মাদ হতে বাধা কোথায়?'

সহজ নিশ্বাসকে ব্যস্ত হতে দিল না রঞ্জন। বললে, 'তোমার মেয়ে তো ভালোবাসার পর উন্মাদ হয়েছে, আর তুমি তো উন্মাদ হবার পর ভালোবাসছ।'

'ও একই কথা।'

'কিন্তু এ কি ভালোবাসা? একদিনের খেলা একদিনের আলাপেই এই জাগরণ?'

'তুমি কী সেকেলে! চিরদিন বলে কিছু নেই, সবই একদিন। একদিন তো বেশি

বলছি—এক মুহূর্ত। এক মুহূর্তেই অঘটন। এক মুহূর্তেই প্রলয়। এক মুহূর্তেই প্রেম।'

'আর এক মুহূর্তেই ভুল।'

'যে ভুল করে না সে তো কিছুই করে না। তাই পথ ভুলে মাঝে মাঝে এস।'

'বা, আসব বই কি। ভুল পথেই তো ফুল ফোটে। কিন্তু তোমাকে কী নামে ডাকব তা তো বললে না।'

'ও, হ্যাঁ----অনু নয়, অনি নয়, দিতা নয়, নিতা নয়, তুমি আমাকে 'নিন্দা' বলে ডেকো। জানো না চারদিকে আমার অনেক নিন্দা। তুমি আমাকে সেই নিন্দা বলে ডাকলে আমার ক্ষোভ যাবে।'

'অনিন্দ্য নাম। কিন্তু ডাকবো তো তোমাকে নিরিবিলিতে।'

'নিরিবিলি ছাড়া আমাদের আর দেখা হবে নাকি?'

'তবে এবার যাই।' রঞ্জন গাঢ়দৃষ্টিতে তাকাল, বললে, 'তুমি নিন্দা নও, তুমি কীর্তি।'

নিন্দা।

কে লীলা বলে ডাকল—নীলিমা শুনল সব্যসাচী তাকে নীলা বলে ডাকছে, আর রঞ্জন শুনল সেই বুঝি দূরে বা স্বপ্নে অনিন্দিতাকে দেখে নিন্দা বলে ডেকে উঠেছে।

অথচ কেউ কাউকে কিছু বলতে পারবে না, আভাসে ইঙ্গিতেও নয়। আর সব বিষয়ে উন্মুক্ত হলেও এ ঢেকে রাখতে হবে। কি অস্বস্তি, তবু অস্বস্তিতেও একে বাইরে উদ্‌গীরণ করা যাবে না। দুজনে ঐ দুই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাদের মিলতে-মিশতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, তাদের ভালোবাসায় এক চুল রেখা পড়ছে না, বরং ঐ অভিজ্ঞতায় তপ্ত হয়ে তাদের মিলনের, তাদের ঘর-বাঁধার আকাঙ্খা আরো তীব্র হচ্ছে। অথচ এমনি সংস্কার—এমন দুটো আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা কেউ কারু কাছে ব্যক্ত করতে পারবে না। জীবনের ভোজ্যকে যে অতিরিক্ত নুন সুস্বাদু করে তাই রাখতে হবে লুকিয়ে। তার স্বাদটুকু একে অন্যকে জানতে দেবে না। যদি নীলিমা শোনে রঞ্জন অনিন্দিতার সঙ্গে কি আলাপ-আলোচনা করেছে তা হলে নিশ্চয়ই নিদারুণ মুখ-ভার করবে আর রঞ্জন যদি শোনে নীলিমা সব্যসাচীর ঘরে গিয়েছিল তা হলে সেও ছেড়ে দেবে না। তিলকে তাল করে দেখবে।

দরকার নেই খোলামেলা হয়ে। আপন কথা গোপন করো। ঘরে যেখানে আলো জ্বলছে তার কথা বলো, অন্ধকার বারান্দার কথা বোলো না।

মাঝে-মাঝে অন্ধকার বারান্দা ঘুরে আবার আলোকিত ঘরে এসে পরস্পরকে দেখ। দেখ আরো বেশি আলোকিত দেখায় কি না।

'তোমার যা একখানা শ্রী খুলেছে আয়না থাকলে দেখাতাম!' বললে রঞ্জন।

'আর তোমার?'

'এই চোঙা প্যান্টে কী যে কদাকার হয়েছে তা আর মনে করিয়ে দিও না। আগের দিন হলে ব্যাগি প্যান্ট বেশ হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নেওয়া যেত, রাস্তায় জল জমলেও প্যান্টটা বাঁচত। এখন শার্টও ভেজে প্যান্টও ভেজে। জল যদি ফল হয় তবে এখন গাছেরও খাওয়া তলারও কুড়োনো।'

'তবে ঐ প্যান্ট পরো কেন?'

'ওটা যুগের হাওয়া। তোমরা যেমন হাওয়া-খাওয়া ব্লাউজ পরো এও তেমনি। পরেও

স্বস্তি নেই, বারে বারে আঁচল টেনে বারান্দা-ঘুলঘুলিগুলো ঢাকবার চেষ্টা। ঢাকবেই বা কি ছাই, আঁচলেও তো টানাটানি। তা ছাড়া কোথাও-কোথাও বারান্দাও নেই, উঠোন হয়ে গিয়েছে, ঘুলঘুলি নেই, যেন সেই আলিবাবার চিচিং ফাঁক—' কথাটা বলতে পেরে হাসতে লাগল রঞ্জন।

'আর তোমাদের কথা বোলো না। দাঁড়াতে পারো না, বসতে পারো না। দাঁড়াতে গেলে আড়ষ্ট, বসতে গেলে প্রাণান্ত।' পাল্টা নীলিমাও কম হাসল না।

'আমাদের আরো অনেক অসুবিধে আছে যা কোনো ভদ্রমহিলাকে বলা যায় না।' এক মুহূর্ত থামল রঞ্জন—ভদ্রমহিলা বলতে সে বুঝি অনিন্দিতার কথাই ভেবে ফেলেছিল—পরে বললে, 'আসলে এ প্যান্ট তো পালাবার জন্যে—ছোটবার পক্ষে এত সুবিধে যে বলে শেষ করা যায় না।'

'চলো একটা চায়ের দোকানে ঢুকি।'

'নিশ্চয়ই। স্থান তো সেই পুরোনো মার্কেট, পুরোনো চায়ের দোকান, কিন্তু দেখ বর্ষা সমস্ত কি নতুন করে দিয়েছে!'

'শুধু বর্ষা?' ভিজে মাথার থেকে মুখে টুপ-টুপ বৃষ্টির জল পড়ছে, চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল নীলিমা।

'না, না, শুধু বর্ষা নয়, তুমি। তুমি সঙ্গে আছ বলেই সমস্ত নতুন, সমস্ত অপরূপ।'

'শুধু আমি আছি বলে?' চোখের পাতায়ও জল, আবার অগাধ করে তাকাল নীলিমা।

'না, না শুধু তুমিও নয়, তোমার আমার ভালোবাসা আছে বলে।'

'তাই বলো। ভালোবাসাই সমস্ত।'

'হ্যাঁ, ভালোবাসাই সমস্ত। ভালোবাসাই আনে, ভালোবাসাই দেয়, ভালোবাসাই ভরে রাখে।'

'আর ভালোবাসা কখনো চলে যায় না।'

একটা চায়ের দোকানে ছোট কুঠরিতে বসেছ দুজনে। কোথায় বসেছে, কি খাচ্ছে, কতক্ষণ থাকতে পারবে, তারপর কোথায় যাবে, কতক্ষণে যাবে, যেতেই বা পারবে কিনা, সে সব কিছুই হিসেব করছে না। তারা আছে আর তাদের মধ্যে ভালোবাসা প্রাণময় হয়ে আছে এই তাদের সমস্ত উত্তর, সমস্ত সমাধান।

তবু এরই মধ্যে টুকরো স্মৃতি মাঝে মাঝে মনের পটে ফুটে ওঠে। রিকশাতে রঞ্জন যখন তার বক্ষের নিবিড় সখ্য চাইছিল তখন নীলিমার মনে পড়ছিল সব্যসাচীর সেই শিশুর মত আশ্রয় খোঁজার ব্যাকুলতা আর নীলিমা যখন সর্বশেষে রঞ্জনকে স্বেচ্ছায় একটি চুম্বন প্রত্যর্পণ করতে যাচ্ছিল তখন রঞ্জনের মনে পড়ল কি করে শেষ মুহূর্তে মুখটা ঝট করে সরিয়ে নিয়ে অনিন্দিতার প্রথম চুম্বন ঠোঁটে না নিয়ে নিরীহ গালের উপর নিয়েছিল।

মনে হল তুমিই যেন আমার মুখটা তখন ঠেলে দিলে আর ভদ্রমহিলার উপহারটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল—খুব রসিয়ে গল্প বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল রঞ্জনের, কিন্তু বলতে সাহস পেল না। গল্পটা কাল্পনিক নায়ক-নায়িকার নামে চালাতেও ভয় হল। কি জানি যদি কিছু সন্দেহ করে! সন্দেহই তো প্রেমের ক্যান্সার। একবার দেখা দিলে আর রক্ষে নেই। এদিকে ঠেকাও তো ফের ওদিকে গজায়। তার চেয়ে নিরাপদে দু পেয়ালা চা খাও, আজেবাজে গল্প করো, স্বর্গসুখ এখানেই ঝরে পড়বে।

শুধু আজেবাজে কেন? মহৎ থেকে মহীয়ান কত উচ্চ কথাও বলে তারা। রাজনীতি বা সমাজবাদ তো এদের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে। তাদের কথায় কোনো আগল নেই, শুধু তারা পরস্পর প্রেমমুগ্ধ বলে কথায় উপর একটু কবিতার লাবণ্য বোলায়, সে-লাবণ্য পেয়ে খেলো খারাপ কথাও ঝকমক করে ওঠে। যারা সম্ভ্রান্ত আভিজাত্যগর্বিত তারা কি প্রেমিকার সঙ্গে খেলো কথা বলতে পারে? খেলো কথায় কত রস তারা তার সন্ধান রাখে? সব্যসাচী বা অনিন্দিতা কি বলতে পারবে হাওয়া-খাওয়া ব্লাউজ বা উড়ন্ত-ফাটন্ত প্যান্টের কাহিনী?

'জানো আমার বোধ হয় জ্বর হবে।' ছলছল গলায় বললে রঞ্জন।

'কই দেখি।' বলে ডান হাতের উলটো পিঠ দিয়ে রঞ্জনের গলার কাছটা ছুঁল নীলিমা। বললে, 'বাজে কথা। কিচ্ছু হবে না।'

'কিছু হবে না! তুমি বললেই হল?'

'আমি বললাম বলেই তো হবে না।' স্নেহে চোখ নত করল নীলিমা : 'আমি যে তোমাকে এখন ছুঁয়ে দিলাম।'

রঞ্জনের বুকের মধ্যে কথার সুরটা কোথায় যেন মধুর হয়ে বাজল। তার মানে, রিকশায় তাদের যে সান্নিধ্যের নিবিড়তা হয়েছিল সেটা যেন ছোঁয়া নয়, এখন যে দূর থেকে চকিতে হাত বাড়িয়ে কটি আঙুল তার গলার কাছে রাখল কি না-রাখল—সেইটিই হল ছোঁয়া।

হাসল রঞ্জন। খেপাবার জন্যে বললে, 'কে জানে তোমার ছোঁয়াতেই না জ্বর হয়।'

বরং তোমার ছোঁয়াতেই আমি জ্বরে পড়ব—তোমার তো ছোঁয়া নয়, তোমার দংশন—পালটা এমনি অনেক কথা বলতে পারত নীলিমা, কিন্তু কথার চাকচিক্যে না থেকে সে কথার গভীরে গেল : 'জ্বর যদি হয়, আমাকে ডেকো, আমি গিয়ে সেবা করব।'

হো-হো করে হেসে উঠল রঞ্জন: 'তুমি সেবা করবে! তুমি সেবার কি জানো!'

'নাই বা জানলাম। আমি যে তোমার কাছটিতে বসে থাকব, তাইতেই তোমার সেবা হবে।'

'সর্বনাশ! তার মানে তুমিও জ্বরে শয্যা নাও। তখন রুগ্ন দেহে আমাকেই না তোমার সেবা করতে হয়! আমার সেবা তো শুধু কাছে বসে থাকা নয়, দস্তরমতো এক্সারসাইজ—'

'বাজে কথা। তার মানে,' স্বর বুঝি একটু করুণ করল নীলিমা : 'আমাকে ডাকবে না কোনোদিন।'

'ডাকবো কেন, তুমি নিজের থেকে চলে আসবে।'

'তোমার যে অসুখ তার খবর পাব কি করে?'

'কদিন দেখা না পেলেই অনুমান করবে অসুস্থ হয়ে পড়েছি। সটান আমাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে।'

'আর ক'দিন আমার দেখা না পেলে কি অনুমান করবে শুনি?'

'অনুমান করব তুমি অন্য ঘরে গিয়ে উঠেছ।'

বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা খেল নীলিমা। নিটোল গোপন করে বললে, 'তোমার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেই তোমার ঘরের দরজা খোলা পাব তো?'

চোখ-মুখ চিন্তিত করল রঞ্জন। বললে, 'আপাতত সেইটেই তো সমস্যা। ঘর নেই, তার আবার দরজা!'

'কত আপনজন এক বাড়িতে আলাদা ঘরে থেকেই তো সেবা করতে আসে না—' কি রকম চিন্তার টানে অসাবধানে কথাটা বলে ফেলেই তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলালো নীলিমা ঃ 'আর আমি আসব কত দূর থেকে কত রাস্তা ঝেঁটিয়ে—তুমি হয়তো তোমার বাড়ির লোকের সামনে আমাকে চিনতেই চাইলে না।' নীলিমা বুঝি একটু গম্ভীর হলঃ 'তোমার ঘরে আমার জায়গা করে দাও, দেখি স্বাস্থ্যে-অস্বাস্থ্যে তোমার পরিপূর্ণ সেবা করতে পারি কিনা—'

'আচ্ছা উপরের ঐ ভদ্রমহিলা স্ত্রী ছাড়া আর কি হতে পারে? আর স্ত্রী হয়ে অমনি নির্ভয় হৈ-হল্লা করে স্বামীর শান্তি-ভঙ্গ, স্বাস্থ্যভঙ্গ করতে পারে? যাদের সর্বাঙ্গীন বন্ধু হবার কথা, তাদের মধ্যে হতে পারে এমন সর্বাত্মক শত্রুতা?'

নীলিমা চোখ বুজল।

'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়?' রঞ্জন অন্য দৃশ্য কল্পনা করে গম্ভীর হবার চেষ্টা করলঃ 'আমরা যখন বিয়ে করব, সংসার করব, তখন আমরাও ঝগড়া করব?'

'বা, ঝগড়া করব বৈ কি। ঝগড়া না হলে ভাব আবার জমবে কি করে?' মধুর করে হাসল নীলিমা ঃ 'ঝগড়ার পরে আমি মান করব আর সে মান ভাঙাতে তুমি কত আমাকে সাধবে, কত কি আমাকে দেবে-থোবে—'

'না, সে ঝগড়া নয়,' রঞ্জন যেন আরো গম্ভীর হল ঃ 'অভিমানের ঝগড়া নয়, অপমানের ঝগড়া। সকলের সামনে তুমি আমাকে গালাগাল করলে, আমি তোমাকে গালাগাল করলাম। তুমি আমার দুর্বলতা বার করে দিলে, আমি তোমার দুর্বলতা বার করে দিলাম। আমি তোমাকে বললাম, গেট আউট, তুমিও আমাকে বললে, গেট আউট—'

'এমনি কোথাও কিছু দেখেছ নাকি?' নীলিমার বুকের ভিতরটা দুরু-দুরু করে উঠল।

'না, দেখিনি—কোথায় আর দেখব!' রঞ্জন পাশ কাটাল ঃ 'তবে শুনেছি তো, বইয়ে পড়েছি। একসঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে-থাকতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পালিশটা নাকি উঠে যায়, ভিতরের কাঠ-খড়—এমন কি কঙ্কালও নাকি বেরিয়ে আসে—'

'আমাদের সে ভয় নেই।' স্বচ্ছ সুন্দর মুখে বললে নীলিমা।

'ভয় নেই? কেন নেই?'

'আমরা যে আমরা। আমি নীলিমা তুমি রঞ্জন।' নীলিমা খিলখিল করে হেসে উঠল।

কিন্তু যাই বলো ভদ্রলোক কি আনরিজনেবল! এ ভাবছে রঞ্জন। একেবারে অমন মারমুখো হয়ে তেড়ে আসবার কি হয়েছিল? একটু মোলায়েম করে বললেই হত, আজ শরীরটা ভালো নেই, তোমরা একটু আস্তে-সুস্থে রিহার্সাল দাও। না হয় অনুরোধ করত, কোনো ব্যাপার আছে, আজকের দিনটা বন্ধ রাখো। তা নয়, সূচনাতেই একেবারে মিলিটারি! আর গালাগাল দিচ্ছে যেন মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়ছে। কি অশালীন! এতগুলো ছেলেমেয়ের সামনে অনি-দিদির এমন অপমান! আগে-আগে তো কই এমন উত্তাল আপত্তি করেনি, আজ হঠাৎ এমন কি ঘটল যে একেবারে সসমারোহে ঝগড়া করতে এসেছে! এত তেজ দেখাবার হল কি। অনি-দিদি নিতান্তই ভালো মেয়ে, সহ্য করে গেল। নইলে একবার ইঙ্গিত করত, রঞ্জন তার দলবল নিয়ে এক রাত্রেই বারোটা বাজিয়ে দিত বুড়োর।

আর নীলিমা ভাবছে, ভদ্রমহিলা কি হার্ডহার্টেড। একটা গোপন সিঁড়ি দিয়ে দুটো ফ্ল্যাট একান্তে সংযুক্ত, ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই সব্যসাচীর স্ত্রী হবে, নয়তে অন্য কোনো অন্তরঙ্গ

আত্মীয়া। সম্পর্ক যাই হোক, কিছু যায় আসে না, কিন্তু একটা মানবিক মমতাবোধ থাকবে তো? ভদ্রলোক অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে, এখন কোথায় শান্তিতে একটু বিশ্রাম করবে, তা নয়, শুরু হয়েছে রণবাদ্য—বীররসের বীভৎস নাটক—হাসি গান নাচ চিৎকার—হুল্লোড়ের দক্ষযজ্ঞ। কত দিন ধরে সহ্য করছে, কেন করছে—এর কোনো প্রতিকার নেই? এত অসহায়! কেউ এলে তার সঙ্গে বসে নিরিবিলি একটু আলাপ করবারও অবকাশ মিলবে না? নীলিমা তো তুচ্ছ, কত ন্যায্য কারণে কত গণ্যমান্য লোকও তো আসতে পারে এখানে—জরুরী কথোপকথনেরই বা নিভৃতি কোথায়? না কি কেউ এখানে আসে না, আসতে বারণ! সব্যসাচীর জন্যে মায়ায় মনটুকু টলমল করে উঠল।

'তুমি ঠিক বলেছ, আমাদের কোনো ভয় নেই।' রঞ্জন প্রায় চমকে দিল নীলিমাকেঃ 'আমি রঞ্জন, তুমি নীলিমা।'

এদিক-সেদিক আরো কিছু ঘোরাঘুরি করে ফুরনে একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

আর কিছু ভাববার নেই। এইসঙ্গে আছি একসঙ্গে চলেছি—এই অনন্তের মধ্যে থাকা, অনন্তের মধ্যে এগিয়ে যাওয়া। যেন থেমে না পড়ি। হঠাৎ থেমে পড়লেও যেন পাশ কাটিয়ে অলি-গলি দিয়ে যেতে পারি বেরিয়ে।

দুজন যেন একটু ছাড়াছাড়ি হয়ে বসেছে। যেন এর হাতের আঙুল দিয়ে ওর হাতের একটি আঙুলকেও ছোঁয়া বারণ।

'আচ্ছা ভালোবাসাটা কি, কিছু বলতে পারো?' অসহায় চোখে তাকাল রঞ্জন।

'কিছু বুঝি না। বলতে পারি না।' নীলিমা বুঝি ততোধিক অসহায়।

'কোত্থেকে আসে, জায়গা জুড়ে বসে—'

'আর কিছুতেই চলে যেতে চায় না।'

'ভালোবাসা আমাদের কাছে কী চায় বলতে পারো?' রঞ্জন হাতের মধ্যে নীলিমার হাত কুড়িয়ে নিল।

'পারি।' নির্ভয়ে বললে নীলিমা।

'পারো? কি চায়?'

'একখানি ঘর।'

'শুধু একখানি ঘর? আমার তো মনে হয় একটা সাম্রাজ্য।' হাত আবার ছেড়ে দিল রঞ্জন। বললে, 'শনিবারের মিছিলে থাকছ তো?'

'নিশ্চয়ই থাকছি।' নীলিমাও ভঙ্গিতে জোর আনলঃ 'সমস্ত অফিস-কেরানিদের মিছিল, বাদ পড়ব কি করে?'

'হ্যাঁ, দেখো, কেউ যেন বাদ না পড়ে।'

আগে আগে প্রসেশনে মেয়েদের এগিয়ে দেওয়া হত।

লেডিজ ফার্স্ট—এই নিয়মে হয়তো। কিন্তু দেখা গেল আইনের সঙ্গে কোনো কারণে সংঘর্ষ হলে অগ্রণী বলে মেয়েদের উপরেই চোট পড়ে। তখন মেয়েদের উপর নিপীড়ন হয়েছে বলে পরের আন্দোলনটা জোরদার করা যায় বটে, কিন্তু একটা সমালোচনা থেকে যায় যে মেয়েদের এগিয়ে দিয়ে পুরুষেরা, বীরপুঙ্গবেরা, আড়ালে থেকেছে—আড়ালে থেকে গা বাঁচিয়েছে। যে যাই বলুক, কথাটা ভালো শোনায় না। তাই সংযুক্ত মিছিলে

পুরুষেরাই এখন অগ্রনায়ক। ছোটখাটো নিশান নিয়ে মেয়েরা পিছনে থাক, মাঝখানে থাক, এখানে-সেখানে যেখানে খুশি থাক—প্রধান ব্যাপারটা প্রথম সারের পুরুষদের হাতে। তাই যদি কখনো মুখোমুখি মোকাবিলা হয় পুরুষদের সঙ্গেই হবে, মেয়েদের আঁচলের তলায় আলগোছে মাথা লুকিয়েছে এ অপবাদ শুনতে হবে না।

প্রথম সারের দলনেতাদেরই একজন রঞ্জন। বিপরীত গাড়িগুলোকে থামিয়ে রাখছে—আগে মানুষ পরে গাড়ি, নয়তো আশপাশের গলিতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে—আগে রাস্তা, পরে গলি—আর থেকে-থেকে স্লোগান দিচ্ছে চেঁচিয়ে।

কী দীর্ঘ লাইন। দাবির লাইন, অভাবের লাইন, প্রতিবাদের লাইন। যেন কোথাও শেষ নেই—এমনি চলেছে এঁকে-বেঁকে।

আচ্ছা, নীলিমা কি সামিল হয়েছে? ওদের গ্রুপটা কোথায়? পিছন দিকে ক্লান্ত কৌতূহলে একবার তাকাল রঞ্জন, কোথাও কোনো আভাস মিলল না।

'এই যে।' জনতার অরণ্যের মধ্যে থেকে কে এক পাখি ডেকে উঠল।

মিছিলটাকে সুসম্বদ্ধ করার তাগিদে কখন বুঝি পিছিয়ে এসেছিল রঞ্জন। ঠিক শোনা গেল কলস্বন। নীলিমার সঙ্গে সস্মিত একটু ছোট্ট চোখোচোখি হল। তা হলে তুমি আছ। তুমি আছ জানলে আমার গায়ে যেন শত সিংহের শক্তি আসে। মনে হয় ঠিক পারব, ঠিক জয়ী হব যুদ্ধে।

রঞ্জনকে দেখে নীলিমার বুকও ভরে উঠল। আছে, আছে, তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়নি। তুমি যখন আছ, তোমার সঙ্গে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে যাব। আমি একটুও ক্লান্ত হব না।

মাথার উপর আঁচলটা তুলে দিয়েছে কেন নীলিমা? রোদ্দুরের তেজটা বাঁকা হয়ে ঠিক পড়ছে বুঝি চোখের উপর? নিয়ম নেই—তা না হলে নীলিমাকে বলত বাড়ি চলে যেতে। তার এমন কিছু দুর্ধর্ষ স্বাস্থ্য নয়, পারবে না ধকল সইতে। মিছিল থেকে একজন বাদ পড়লে কিছু এসে যাবে না।

কাছাকাছি আরেক সন্ধ্যায় কেন কে জানে সব্যসাচীর জন্যে নীলিমার হঠাৎ মন-কেমন করে উঠল। যাই একবার দেখে আসি ভদ্রলোক কেমন আছেন।

কি যেন একটা আছে যা নীলিমাকে আকর্ষণ করে। সেটা যে সত্যি কি, স্পষ্ট বুঝতে পারে না। হয়তো ওঁর মহত্ত্ব, ওঁর সম্ভ্রান্ততা, পদগৌরব—না, তাই বা কি করে বলা যায়—হয়তো বা ওর অসহায় নিঃসঙ্গতা, অস্ফুট আকুলি-ব্যাকুলি—তাতেই বা এত লোভের কি আছে? কি জানি কি—হিসেবের মধ্যে ধরতে পারছে না নীলিমা—তবু এক-পা দু-পা করে এগুতে লাগল। আর যাই হোক, নীলিমা নিশ্চিন্ত, ওখানে সে নিরাপদ। ওখানে তার কিছু হারাবার ভয় নেই।

দেখল সব্যসাচীর ঘরের দরজা খোলা। উঁকি মারতে যাবে, ঘরের ভিতর থেকে সব্যসাচী হঠাৎ উথলে উঠল : 'আরে, এস এস। রোজ আশা করি আসবে, কিন্তু তোমার দেখা নেই।' ছেলেমানুষের মত অভিমানের ভাব করল।

ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল নীলিমা। স্বচ্ছ মুখে জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন আছেন?'

'মোটেই ভালো নয়—' বলেই দ্রুত কণ্ঠে নিজেকে সংশোধন করল সব্যসাচী : 'মানে, একদম ভালো ছিলাম না, কিন্তু তুমি যেই এলে শরীর মন ভালো হয়ে গেল।'

'আমি তাহলে ম্যাজিক।' শব্দ করে হেসে উঠল নীলিমা।

'তার চেয়েও একটু বেশি। কিন্তু কী আশ্চর্য, এত আলাপ, তোমার নামটিই জানা হল না।'

'বা, সেদিন যে ডাকলেন নাম ধরে।'

'ডাকলাম!' সব্যসাচী যেন অকূলে পড়লঃ 'কি বলে ডাকলাম?'

'মিস—কি, মনে নেই?'

'মিস!' সব্যসাচী বুঝি এবার অতলে তলাল।

'মিস লাফটার!' বলে এক ডাল শিউলি-ঝরার মত সুশুভ্র হেসে উঠল নীলিমা।

সে হাসিতে সব্যসাচীও যোগ দিল। বললে, 'সেটা হঠাৎ আনন্দে ডেকে উঠেছিলাম। ওটা তো নাম নয়, ওটা বিশেষণ। তোমার সত্যিকার নাম কি তা বলো। যা শুধু আনন্দে ডাকবার নয়, যা দুঃখে বিষাদে নির্জনতায়ও ডাকবার মত।'

নীলিমা গোপন করল না। বললে, 'আমার নাম নীলিমা।'

সহসা একটুকরো নীল আকাশ যেন সব্যসাচী দেখতে পেল চোখের উপর। নিটোল নিভাঁজ নির্মেঘ নীল আকাশ—শরতের রোদে ঝলমল করছে।

'নীলিমা! বাঃ, সুন্দর নাম! দাঁড়াও।' খানিকক্ষণ কি চিন্তা করল সব্যসাচী। উপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'আমার তো সমস্তই বিপরীত। তুমিও আমার বিপরীত হয়ে যাও।'

আচমকা যেন একটা ধাক্কা খেল নীলিমা। না-হাসা কঠিন মুখে বললে, 'তার মানে?'

'মানে খুব সোজা।' সব্যসাচী বিশদ হল ঃ 'তুমি নীলিমা তো, তুমি তার উলটো মালিনী হয়ে যাও।'

'সুন্দর হল তো।' সহজের সুগন্ধে ভরে উঠল নীলিমা ঃ 'তাই ডাকবেন। মালিনী বেশ শোনাবে।'

'শুধু ডাকব না, তুমি আমার মালিনী হয়ে যাবে।'

লজ্জায় ঈষৎ আরক্ত হল নীলিমা। বললে, 'আপনার মুনি-বানি জানতে পেলে আপনাকে ঠ্যাঙানি দেবে।'

'তাকে কে ঠ্যাঙানি দেয় দেখ।'

কি রকম যেন একটা মজা পেল নীলিমা। মনে-মনে নিশ্চিন্ত হল গৃহযুদ্ধ যদি বাধে তবে এখানে এই নিচের ফ্ল্যাটে সব্যসাচীর সান্নিধ্যই তার ভালো আশ্রয়। জিজ্ঞেস করলে, আপনার উপরের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গেছে?'

'ঐ শুনতে পাচ্ছ না শব্দ?' ক্লান্তকরুণ মুখ করল সব্যসাচী ঃ 'এখনো ফুল-টিম আসেনি। ক্রমে-ক্রমে আসছে। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে শান্তিতে বসো।'

সব্যসাচী ভেবেছিল নীলিমা বুঝি পুরোপুরি তার কথা শুনবে, কিন্তু না, দরজা বন্ধ না করে শুধু পরদাটা সে টেনে দিল।

সব্যসাচীর মনে হল লোকে না দেখুক এটা যেমন নীলিমা চায় তেমনি পালিয়ে যাবার পথ থাকুক এটাও নজরে রাখে।

সন্দেহ কি, অনেক গভীর গহনের পথ। পর্বতলঙ্ঘন ধীরে ধীরে।

পরদা টেনে দিয়ে সোফায় সুন্দর বসল নীলিমা। বললে, 'আমি ভেবে পাচ্ছি না উপরের ঐ ন্যাইসেন্স কি সত্যি বন্ধ করা যায় না?'

'যায়। যাবে। মুখোমুখি সোফায় বসল সব্যসাচী ঃ 'আমি পুলিসকে খবর দিয়েছি।

তারা সরেজমিনে এনকোয়ারি করতে আসবে বলেছে।'

পুলিসের কথা কিন্তু নীলিমাই আগে বলেছিল, এখন সত্যি-সত্যি আসবে শুনে ভয় পেল। উঠি-উঠি করে বললে, 'পুলিস আসবে, আমি তবে পালাই।'

'আজ এখুনিই আসবে এমন কোনো কথা নেই। আর আসে যদি, এলই বা। তুমি পালাবে কেন?' সব্যসাচী প্রায় শাসন করে উঠল।

সত্যি, পুলিসের নাম শুনে ভয় পাবার কোনো মানে হয় না—নীলিমার বুঝে নিতে দেরি হল না। বরং ভয় পাবার ভাব দেখিয়ে সে বুঝি এই ইঙ্গিতই করল যে সব্যসাচীর সঙ্গে তার সম্পর্কে কোথাও একটি গোপনীয়তা আছে।

ভাগ্যিস দরজাটা বন্ধ করেনি। পুলিসের করাঘাতের উত্তরে দরজা খুলে দাঁড়ালে পুলিস তাকে কি ভাবত!

সেই সমস্যাটা এখানো বর্তমান। তার সাফাই কোথায়?

'পুলিস এসে যদি জিজ্ঞেস করে আমি কে, কি বলবেন?' মরা হাসি হাসল নীলিমা।

'তুমি তো এনকোয়ারির বিষয় নও, তোমার কথা উঠতেই পারে না।'

'তবু পুলিস তো, ওদের রিভলভিং চোখ, ঠিক জানতে চাইবে আমি আপনার কে।'

'বলব, আমার মেয়ে।'

'আপনার কুমারী মেয়ে আছে নাকি?'

'আমার একটিই মেয়ে, আর সে কুমারী।' বলতে কেমন অন্যমনস্ক হল সব্যসাচী ঃ 'সে আছে এসাইলামে।'

'কোথায়?' নীলিমা চমকে উঠল।

'পাগলা গারদে। ঐ, ঐ ওর মা ওকে পাগল করেছে।' সব্যসাচী সহসা তপ্ত হয়ে উঠল ঃ 'মেয়েটা একটা কমজোর অনুজ্জ্বল ছেলেকে ভালোবেসেছিল, সেটা তার মার মনঃপূত হল না। মেয়েটাকে প্রচণ্ড মারপিট করলে আর যাতে পালাতে না পারে ঘরের দরজায় তালা দিলে। মেয়েটা আত্মহত্যা করবার সুযোগ পেল না, পাগল হয়ে গেল। মেয়ে মেয়ের শত্রু হয় এ কথা শুনেছি, কিন্তু মা যে মেয়ের এমন শত্রু হতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।'

বেদনার্ত মুখ করল নীলিমা। বললে, 'ভালোবাসাই তো একমাত্র যোগ্যতা। সেই তো সমস্ত কিছু উজ্জ্বল করে। মায়ের তাই আপত্তি হতে গেল কেন?'

কোথাকার কোন মেয়ের মার গল্প করছে এমনি বিষন্ন দূর থেকে সব্যসাচী বললে, 'শোনা যায় ছেলেটা নাকি মার মনোনীত ছিল। যাক গে', নিজেকে সামলে নিল চট করে ঃ 'মেয়ে না হয়, বলব আমার ছাত্রী।'

'ছাত্রী!' হাসির লহর তুলল নীলিমা ঃ 'আপনি আবার আমাকে কি পড়াবেন!'

'তোমাকে আমি অনেক কিছু পড়াতে পারি। ব্যাস থেকে বাৎস্যায়ন, এঙ্গেলস থেকে এলিস—বিশ্বাস হয় না বুঝি? বেশ, ছাত্রী ছেড়ে দি, বলব আমার অফিসের একজন মেয়ে-কেরানি। একটা লিফট পাবার তদবিরে এসেছে।'

'এইভাবে একলা কেউ আসে না—বিশ্বাস করবে না।' মিটিমিটি হাসতে লাগল নীলিমা।

'কি মুস্কিল! বেশ তবে বলব, একটা বেকার মেয়ে, নতুন চাকরির উমেদারিতে এসেছে।'

'আমি নিজেকে বেকার বলে স্বীকার করব না।'

'করবে না? বেশ, তবে বলব, ইনি মিস লাফটার, আমার ক্ষণিকের আলো, ক্ষণিকের আরোগ্য, ক্ষণিকের বিশ্রাম। কি ঠিক বলব না? পুলিস এখন যা বোঝবার বুঝুক, দুয়ে-দুয়ে পাঁচ করুক।' সোফা ছেড়ে কৃষ্ণের উদ্দেশে উঠে পড়ল সব্যসাচী ঃ 'এখন কি খাবে বলো।'

'আচ্ছা, আমি বলছি, পুলিসের সাহায্য না নিয়ে ওদের তাড়ানো যায় না?'

নীলিমার রঞ্জনের কথা মনে পড়ল। ওর হাতে দল আছে। একটা কিছু বাধিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করতে ও ওস্তাদ। ওকে বলতে পারলে দুদিনেই ভূতের নাচ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু ওকে বলা মানে তো অনেকখানি বলা, নিচে নামিয়ে এনে পরদা সরিয়ে ভিতরে চোখ পাঠানো।

যার কাছে কিছু লুকোবার নেই তার থেকে একটা জিনিস লুকিয়ে রাখার মধ্যে কি রকম যেন একটা নতুনত্ব আছে।

আচ্ছা, উপরে ঐ থিয়েটারের দলে রঞ্জন নেই তো? নীলিমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। ও যে নাটুকে দলের কথা বলেছিল সে যেন কোন এক ক্লাবে, অন্য পাড়ায়। এমন অভিজাত সংসর্গে দোতলার উপরে বিপুল আয়তনে কিছু হলে নিশ্চয় তাকে জানাত। বিশেষত নিচে একজন জাঁদরেল অফিসারকে পর্যুদস্ত করে রেখেছে এই মজাটার ভাগ তাকে না দিয়ে সে ছাড়ত না।

উপরের দলে থাকলেই ভয়। না, রঞ্জনের সম্পর্কে নীলিমার কোন ক্ষোভের কারণ নেই, কোনোদিন ঘটেনি কোনোদিন ঘটবেও না! থিয়েটার করতে হলে মেয়েদের সঙ্গে মিশতেই হয়, আর যা দিন পড়েছে, দলের মধ্যে কটা ঘরছুট মেয়ের ঢুকে পড়া কিছু অসম্ভব নয়। রঞ্জনকে টলাবে ওসব মেয়ের সাধ্য নেই। তেমন কিছু টালমাটাল হলে রঞ্জনই তাকে জানাত আগের থেকে। রঞ্জন এত পরিষ্কার।

কিন্তু নীলিমার ভয়, সে-ই রঞ্জনের কাছ থেকে কিছু লুকোচ্ছে। রঞ্জন যদি আসতে-যেতে কোনোদিন তাকে দেখে ফেলে, নিবিড় নিরিবিলিতে বসে সব্যসাচীর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে—অথচ আগে কোনোদিন এই আলাপের কথাটা ঘুণাক্ষরেও জানায়নি, তখন পরিণাম কি দাঁড়াবে ভগবান জানেন। না, না, এই চ্যারিটি-মার্কা থিয়েটারের দলে রঞ্জন নেই, তার দল অনেক আধুনিক, অনেক অগ্রসর। এখানে এমন কিছু নেই যাতে রঞ্জন আকৃষ্ট হতে পারে। সুতরাং ধরা পড়ার ভয়ে নীলিমাকে ঘরের আরো অভ্যন্তরে গিয়ে লুকোতে হবে না।

তবু মাঝে মাঝে নীলিমা কোলাহলের মধ্যে থেকে বাছাই করে নিতে চেষ্টা করে রঞ্জনের গলা আছে কিনা, আসা-যাওয়ার পায়ের শব্দে বাজে কিনা সেই পরিচিত ব্যস্ততা। একটা আতঙ্কের ছায়া পড়তে না পড়তেই আবার মিলিয়ে যায়। না নেই, নীলিমা নিরঙ্কুশ, নীলিমা স্বাধীন।

আচ্ছা, এখন বললে কেমন হয়?

বললেই বলবে, এতদিন বলোনি কেন? তখন আবার আরেক ফ্যাসাদ। তাছাড়া বলবার আছে কি। জীবনে কিছু কিছু না-বলাও থাক না। না-বলার মধ্যেও তো মাধুর্য্য কম নয়।

কৃষ্ণের উদ্দেশে ডাক পাঠাবার আগেই কৃষ্ণ এসে দেখা দিল। বললে, 'খাবার টেবলে সাজানো হয়েছে।'

নীলিমাকে আরো ভিতরে নিয়ে গেল। আরো নির্জনতার মধ্যে।

'সেদিন মিছিল ভাঙবার পর তোমাকে আর পেলাম না কেন?' দেখা হতেই রঞ্জন প্রশ্ন করল নীলিমাকে।

'আমি তোমাকে কত খুঁজলাম, দেখলাম কোথাও নেই, একেবারে বেপাত্তা।' নীলিমা পালটা নালিশ করল।

'মোটেই না। আমি ছিলাম অনেকক্ষণ, তুমিই হাওয়া হয়ে গিয়েছ। কিন্তু যাবে কোথায়? রাস্তায় একেকটি চলমান হাওয়া দেখি, ধরতে এগিয়ে যাই—দূর, তুমি কোথায়? সবাই তোমার ছায়া চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে।'

'যাক, ছায়ার পিছনে যেও না।' নীলিমা চোখে সতর্কতার ঝিলিক দিল।

'গেলেই বা কি। ভালোবাসা যাবে না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ঠিক স্থিরতার আশ্রয়ে নিয়ে আসবে।'

'তাই তোমাকে না দেখলেও আমি অস্থির হই না। আমি জানি তুমি কোথাও আছ। আর আমার জন্যেই আছ।'

'কিন্তু আমি অস্থির হই। মনে হয় তুমি বুঝি কোথাও পালিয়ে গেলে। হাত বাড়িয়ে তোমার হাতখানি আর খুঁজে পাই না।' চলতে-চলতে রঞ্জন নীলিমার হাত একটু স্পর্শ করল। বললে,'এবার ঠিক হয়েছে, মিছিল নয়, বিরাট আকারে ঘেরাও করব।'

'ঘেরাও!' নীলিমা যেন খুশি হতে পারল না। বললে, 'ঘেরাওটা কিন্তু একদিক থেকে আনফেয়ার।'

'কেন, কি হল?'

'ঘেরাওকারীরা দিব্যি সিফট-ডিউটি করছে। বদলা নিয়ে উঠে-উঠে যাচ্ছে, আর যারা ঘেরাও হয়েছে তারা নিশ্চল হয়ে বসে আছে—তাদের বদলা নেই। এটা ঠিক সমান-সমান হচ্ছে না।'

'আমি-তুমি কিন্তু উঠব না, জায়গা ছাড়ব না, আমাদের বদলা নেই।' তর্কের মধ্যে না গিয়ে রঞ্জন অন্য কথা, আনন্দের কথা বললেঃ 'আমার চোখের সামনে তুমি থাকবে, তোমার চোখের সামনে আমি থাকব। আমরাই পরস্পরের শক্তি, পরস্পরের আশ্রয়। আমাদের জয় অনিবার্য।'

'এস কোথাও একটু বসি।'

বসলেই নানা হাঙ্গামা। চানাচুরওয়ালা আসবে, চা-ওলা আসবে। কেউ আসবে চাঁদার বই নিয়ে, কেউ বা ঝাপসা গলায় শুধোবে, গাড়ি চাই? কেউ কেউ বা কাছে না ঘেঁষে দূরে-দূরে বসবে, উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকবে, বিনা পয়সায় কোনো বিলিতি সিনেমা দেখা যায় কিনা।

সত্যিই তো কত আর হাঁটবে। নীলিমা ক্লান্ত হয়েছে। এখন খনিকক্ষণ বসা যাক—অন্তত যতক্ষণ না তেমন কিছু উৎপাত এসে উদ্ব্যস্ত করে।

মাঠের এদিকটা ভালো—ফাঁকা হয়েও লোকজনের নাগালে।

মুখোমুখি বসল দুজনে—'জানো আমাদেরও ওরা ক্যাপিটালিস্ট, মানে পুঁজিপতি বলে।'

'পুঁজিপতি! কি সর্বনাশ!' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল নীলিমা ঃ 'কারা বলে?'

'আমাদের ইউনিয়নের লোকেরা। তারা আওয়াজ তুলেছে এত সম্পত্তি রাখা চলবে না।'

'সম্পত্তি! আমাদের আবার সম্পত্তি কোথায়!' রঞ্জনের গায়ে মৃদু ঠেলা দিল নীলিমা ঃ 'তুমি কি বলছ?'

'বিরাট সম্পত্তি। আমাদের ওয়েলথ ট্যাক্স ধরা উচিত।'

'আমাদের যা মাইনে তা ইনকাম ট্যাক্সের মধ্যেই পড়ে না, তায় আমাদের সঞ্চিত বিত্ত, তার জন্যে আবার ওয়েলথ ট্যাক্স! রণ, তুমি হাসালে।'

'বিপুল বিত্ত, কুবেরের ভাণ্ডারের চেয়েও বেশি। সে আমাদের ভালোবাসা।' নীলিমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল রঞ্জনঃ 'ওয়েলথের ডিফিনিশানের মধ্যে পড়ে না বোধ হয়, কিন্তু এত বড় বৈভব আর কি আছে? শত ব্যয় করলেও কম পড়ে না, সুদে-আসলে কেবলই বাড়তে থাকে। কত বিপদ থেকে বাঁচায়, কত দুঃখকে উপেক্ষা করে, শত ব্যর্থতায়ও জীবনকে ভরে রাখে। একে তুমি একটা অক্ষয় ঐশ্বর্য বলবে না?'

আনন্দোজ্জ্বল চোখে তাকাল নীলিমা। আরেক হাত নিজেই বাড়িয়ে দিয়ে রঞ্জনের আরেক হাতকে বন্দী করলে। বললে, 'রণ, তুমি মহাপুরুষ।'

এ সময় অতি সহজেই অনিন্দিতার কথা বলতে পারত রঞ্জন। এক দুঃখিনী প্রৌঢ়া, স্বামী-পরিত্যক্তা, রুগ্না, সন্তানশোকে ব্যথিত বলেই স্নেহপরায়ণা। আমাকে দেখে তাঁর হারানো ছেলের কথা বেশি করে মনে পড়ে বলেই আমাকে বেশি ভালোবাসেন, বেশি করে খাওয়ান। বললে অসুবিধে হত এই, নীলিমা বলত, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো, পরিচয় করিয়ে দাও, তিনি জানুন কে তাঁর ভাবী পুত্রবধূ। গেলে দেখত প্রৌঢ়া হলেও অনিন্দিতার মধ্যে রূপ এখনো প্রগাঢ় হয়ে আছে আর রূপের চেয়েও বেশি, আছে তাতে লাস্যের ললিতকলা। নীলিমা নির্ঘাৎ সাপ দেখত, বুঝত সম্পর্কের পোশাকটা শুধু ছলনা। অনুরাগেই অতিশয়োক্তি। মুহূর্তেই নীলিমা অসুস্থ হয়ে পড়ত।

কে জানে নিষ্পাপ-শ্রী শান্ত স্নিগ্ধ নীলিমাকে দেখে অনিন্দিতাই বিগড়ে যেত। গুটিয়ে নিত ইন্দ্রজাল। ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিত দরজা। সুন্দর একটা পাপের নাটক দেখা হত না।

পাপ! যা লুকিয়ে রাখা যায় তা পাপ হয় কি করে?

কাজ নেই নীলিমাকে বলে। কবিতার ছন্দই বলে, এইখানে যতির প্রয়োজন।

'চলবে না, চলবে না,' রঞ্জন হঠাৎ স্লোগান দিয়ে উঠলঃ 'এত সুখ এত প্রেম চলবে না।'

'ওদের বাধা দিচ্ছে কে?' নীলিমা হাসতে-হাসতে বললে, 'ওরাও প্রেম করুক, ওরাও সুখী হোক।'

'সকলেরই কি আর সে ভাগ্য হয়? জমিদারিকে আমরা হেয় চক্ষে দেখি, বলি আনআর্নড ইনকাম। এই ভালোবাসাটাও কি তেমনি আনআর্নড ইনকাম নয়? আমরা এর জন্যে তপস্যা করলাম কবে? কবে প্রার্থনা করলাম? সবাই তাই আমাদের ঈর্ষার চোখে দেখে, স্বার্থপর ভাবে, অন্যের অদৃষ্টে যা জোটেনি তাই আমরা একা-একা ভোগ করছি বলে রাগ করে।'

'করুক। কিন্তু যাই বলো এটা আমাদের কোনো জমিদারি নয়। এটা আমাদের চাকরি, দাসত্বের চাকরি।'

'তুমি কি বলছ?'

'ঠিক বলছি।' নীলিমার মুখের প্রসন্নতা আরো যেন গাঢ় হল ঃ 'আমি রানী হয়েও তোমার দাসী, তুমি রাজা হয়েও আমার বাগানের মালী।'

'দূর! এত ভালোবেসেও এখনো কিছু করতে পারলাম না—'

'কি করতে পারলে না?'

'এখনো একটা সংসার পাততে পারলাম না।'

'কি আমাদের মাইনে! দিয়ে-থুয়ে কি বা আমাদের থাকে।'

'জানো আমাদের চাকরিটাই পাপ। বাড়ির লোকেদের থেকে লুকোনো গেল না। জানা মাত্রই ওরা ওদের অভাবের শীর্ণ হাতগুলি আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিল। আর, আমাদের আরেক পাপ, আমরা কিছুতেই স্বার্থপর হতে পারলাম না।'

নীলিমা কুণ্ঠিত মুখে শুধু বললে, 'তা কেন?'

'যখন চাকরি ছিল না, বেকার ছিলাম, ভালো ছিলাম। দায়-দায়িত্ব ছিল না, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোনো ধারই ধারতে হত না। এখন চাকরি হয়েছে—শুধু আমার নয়, তোমারও হয়েছে—অথচ দিয়ে-থুয়ে দুজনের পছন্দসই একটা সংসার পাতবার মত সঙ্গতি হচ্ছে না। ঐ যে, ঐ এসে পড়ল—' দূর হতে কী দেখে ঝটিতি উঠে পড়ল রঞ্জন।

'কে এসে পড়ল?' শশব্যস্তে নীলিমাও গাত্রোত্থান করল।

'কি, দিদি, রাগ করে চলে যাচ্ছেন যে।' চাঁদার রসিদ-বই হাতে দুটো ছোকরা এগিয়ে এল। একজন টিটকিরি দিয়ে উঠল ঃ 'আমাদের চাঁদাটা দিয়ে যান।'

আরেকজন বললে, 'ওটাকে মাঠে মারবেন না।'

রঞ্জন আর নীলিমা রাস্তা ধরে আবার হাঁটতে শুরু করল।

রঞ্জন যেন হঠাৎ চুপ করে গিয়েছে। ব্যথাভরা নম্র স্বরে নীলিমা বললে, 'তা হলেই বুঝতে পারছ আমাদের মতন দুঃখী আর কোথায়! এত প্রেম অথচ একে স্থান করে দিতে পারলাম না। টিকিট ছিল ট্রেন ছিল অথচ জায়গা হল না।'

'তুমি কি যে বলো! আমাদের মতন সুখী, আমাদের মতন শক্তিমান কে!' রঞ্জন আবার উৎসাহিত হয়ে উঠল ঃ 'আমাদের প্রেমের স্থান কি শুধু একটা ফ্ল্যাট-বাড়ির সংসারে? আমাদের প্রেমের স্থান সমস্ত বিশ্বে। সত্যি এত বড়ো প্রেমের মালিক হলাম অথচ কোনো একটা বড়ো কাজ করতে পারলাম না।'

'বড়ো কাজ—মানে কি কাজ?'

'ঐ যে মহাপুরুষ বলেছিলে, তার যোগ্য কাজ।'

'সে আবার কি কাজ?'

'খুব বড়ো একটা পরোপকার—পৃথিবীর উপকার।'

টিফিন-টাইমে কেটে পড়বে ঠিক করল রঞ্জন।

যে সময় বলে কিছু মানে না, এই জীবনের সিদ্ধান্তে যে এক নিমেষে পৌঁছুতে পারে, প্রথমতম দিনেই সাজতে পারে অন্তরতম রূপে, যে শুধু অবকাশ আর নির্জনতা দিয়ে তৈরি তার আকর্ষণ ভয়াবহ। সেদিন তো অফিস ছুটি হবার পর গিয়েছিল, রিহার্সাল আরম্ভ হবার আগে-আগে, আর আজ যেতে চাইছে দুপুরে। ভরদুপুরের ডাক বুঝি মদিরতর!

দুপুরবেলা ঘুমোয় বলেছিল। দেখি অতর্কিতে গিয়ে ঘুম ভাঙানো যায় কিনা।

পদক্ষেপগুলি নিশ্চয়ই মন্থর হবে। কি রকম না জানি চুপচাপ চারদিক। নিচের কর্তা নিশ্চয়ই এখন অফিসে। অবশ্য কর্তা উপস্থিত থাকলেও তো সীমানার বাইরে। তবু স্বামী বাড়ি নেই এ কথাটার মধ্যে কেমন একটা বৈচিত্র্য আছে। কে আপনি, কি চাই, সিঁড়িতে বা দোরগোড়ায় দেখা হয়ে গেলেও কেউ জিজ্ঞেস করবার নেই। বন্ধ দরজায় টোকা দিতে হবে নিশ্চয়ই, না কি কলিং বেল আছে? অত লক্ষ্য করেনি। কলিং বেল থাকলেও রঞ্জন টোকা দেবে। কলিং বেলটা কর্কশ, পরিবেশ মিলিয়ে টোকার ভাষাই অর্থবহ।

দরজা খুলে দেবে কে? সহকারিণী বাসন্তী, না অনিন্দিতা নিজে? যদি নিজে খোলে তো কথাই নেই, বাসন্তী যদি খোলে তবে সে যার সহকারিণী সে সামলাবে।

মোট কথা, এমন একটা গা-ছম-ছম ভাব, পাপ-পাপ আবহাওয়া অদ্ভুত ভাবে টানছে রঞ্জনকে!

কিন্তু গোপেশবাবুর কাছে গিয়ে ছুটি চাইতেই গোপেশবাবু হাসিমুখে বললেন, 'তোমাকে বড়ো সাহেব ডেকেছেন, সেটা আগে শুনে এসো, পরে যেও।'

না, কোথাও কোনো অন্যায় কাজ করেছে বা করতে যাচ্ছে এমন কিছু নালিশই নয়। মিছিমিছিই ভয় পেয়েছিল রঞ্জন। বড়ো সাহেব তার আগের রিপোর্টটার জন্যে প্রাণখোলা সুখ্যাতি করলেন—-শেষে বললেন, 'এই আরেকটা রিপোর্ট আজকের মধ্যে তৈরি করে দিন।'

তার মানে আজ দুপুরে যাওয়া হল না। গোপেশবাবু হাসছেন, হাসুন। একবার একদিন ঠিক ছুটি না নিয়ে পালিয়েই যাবে।

অফিস ভাঙবার আগেই পড়ি-মরি করে বেরুল রঞ্জন।

তখন বিকেল। সুর কেমন স্তিমিত। অনিন্দিতার ঘুমটুকু শেষ হয়ে গিয়েছে। সে হেলান দিয়ে বসে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছে।

'এসো। বসো।' নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললে অনিন্দিতা।

এখনো নির্জনতা কিছু কম নয়। শো-র লোকজন আসতে এখনো ঘণ্টা খানেকের মত দেরি।

বাসন্তীও রান্নাঘরে। তবু অনিন্দিতার স্বরে অভিমান।

'দুপুরে আসতে চেষ্টা করেছিলাম। পারলাম না।' রঞ্জন দূরের সোফায় বসল।

'তা পারবে কেন? আমি যে বুড়ি। কুৎসিত। আমার ভালোবাসার কি দাম আছে?'

'কি যে বলো তার ঠিক নেই।' রঞ্জন উঠে এসে কাছের সোফায় বসল ঃ 'তুমি যুবতীর চয়েও টাটকা। সুন্দরীর চেয়েও সুন্দর। আর ভালোবাসা সব সময়েই অমৃত।'

'তবে আস না কেন?'

'অফিস কামাই করি কি করে? চাকরি চলে যাবে না?'

'চাকরি!' করুণ চোখে তাকাল অনিন্দিতা ঃ 'কত মাইনে পাও?'

'সামান্য। বলবার মত নয়। কিন্তু ঐ টাকাটার উপর সংসারের নির্ভর।'

'সংসার? বিয়ে করেছ নাকি?' কি রকম আতঙ্কে চোখ বড়ো করল অনিন্দিতা।

'দূর! কাকে বিয়ে করব?'

তাহলে সংসার অর্থে বাবা-মা ভাই-বোন এমনি সাধারণ গেরস্থালি—অনিন্দিতা সহজেই অনুমান করতে পারল। পর-মুহূর্তে দৃষ্টি উদাস করে বললে, 'কিন্তু শিগগির একদিন তো করবে।'

'মাথা খারাপ!' রঞ্জন এক কথায় উড়িয়ে দিতে চাইল।

'না, না, ঠাণ্ডা মাথায়ই করবে। করাই তো উচিত।'

'আপনি শুতে জায়গা পাই না তাই শঙ্করাকে ডাকি!'

'সে তো শঙ্করা হবে না, সে হবে তোমার শঙ্করী।' আলোভরা টলটলে চোখে অনিন্দিতা বললে, 'পাশে তার জায়গা না হোক, তাকে তুমি বুকে করে ঘুমোবে।'

'সে ঘুম তাহলে আর ভাঙবে না। বস্তা চাপা পড়ে মারা যাব।'

রঞ্জন হাসলেও অনিন্দিতা হাসল না। একটু বা বিষাদ মিশিয়ে বললে, 'শোনো, বিয়ে করলেও আমাকে যেন ছেড়ো না। আমার সঙ্গে সম্পর্কটা রেখো।'

রঞ্জন হতভম্ব হয়ে গেল। কিসের সম্পর্ক? কোথায় সম্পর্ক? ভাবল এ বুঝি কোনো নাটকের পার্টে তার পরীক্ষা হচ্ছে। সে তাই পিছিয়ে গেল না, স্বরে যথারীতি গাঢ়তা এনে বললে, 'কোনোদিন ছাড়ব না।'

'শোনো, সাত্ত্বিক আহার স্বাস্থ্যকর বটে কিন্তু স্বাদের জন্যে একটু ঝাল-মশলাও দরকার।' অনিন্দিতা রঞ্জনের চোখের উপর অর্থবহ চোখ ফেলল।

'নিশ্চয়ই। খালি ডাল-ভাত মাছ-দুধে তুষ্টি হয় না, একটু ঝালচচ্চড়ি চাই।'

'ঠিক বলেছ।' অনিন্দিতা উৎসাহে ঝলমল করে উঠলঃ 'শুধু পুষ্টি নয়, তুষ্টিরও প্রয়োজন। আমিই তোমার সেই ঝালচচ্চড়ি।'

'কিন্তু বউ যদি একবার জানতে পায় তাহলে কুরুক্ষেত্র তো কোন ছার, হিরোশিমা করে ছাড়বে।'

'বা, জানবে বৈকি। বউকে জানিয়ে রাখবে। কিছু গোপন করবে না।'

'গোপন করব না?' অবাক হল রঞ্জন।

'না, গোপন করতে গেলেই ঝগড়া হবে। বিয়ে ভেঙে যাবে। আজকাল যত বিয়ে ভাঙে সব এই গোপনতা থেকে। তুমি আগেভাগেই বলবে, আমার এক মহিলা-বন্ধু আছে, মিস অনিন্দিতা বসু, আমার অনি-দিদি, তার সঙ্গে না-মিলে না-মিশে পারব না। তেমনি তোমার বউয়ের যদি কোনো পুরুষ-বন্ধু থাকে সেও তোমার কাছ থেকে সে-কথা গোপন করবে না, তোমাকে জানিয়েই সে তার বন্ধুর সঙ্গে মেলামেশা করবে। কারু কোন গোপনতার পরিশ্রম নেই, ধরা পড়ার ভয় নেই, সন্দেহের ক্ষুদ্রতা নেই, মিথ্যা কথার যন্ত্রণা নেই—দুদিকেই অবাধ সরলতা—বিয়ের নৌকো আনন্দের পাল খাটিয়ে তরতর করে বেয়ে যাবে।'

'তুমি যে শুধু অনি-দিদি নও, তুমি আমার হনি-দিদি, সেটাও জানাব তো?'

'নিশ্চয়ই জানাবে। তেমনি তোমার বউও যদি তার বন্ধুর সম্পর্কে মধুময়ী হয়ে ওঠে, তবে সে-ও সে-কথা জানাবে তোমাকে। তাহলেই তোমাদের বিয়ে সাকসেসফুল হবে, জীবনকে জীবন বলে ভাবতে পারবে। তোমার হনি, তার মধু।'

'তার যদি মধু না থাকে? যদি এই যদুই তার সর্বস্ব হয়?' রঞ্জন বুকে আঙুল ঠেকিয়ে নিজেকে নির্দেশ করল।

'রাখো। আজকাল কোনো পক্ষই একে আবদ্ধ থাকতে রাজী নয়, সবাই একাধিকে আকৃষ্ট। কেননা, একেই একঘেয়েমি, একজনের মধ্যে সমস্ত প্রেমের পরিপূর্তি হয় না আটপৌরে আর পোশাকি—দু'টোর দিকেই মানুষের ঝোঁক—ঘর আর ঘরের বাইরে একটু বাগান, দুয়ে মিলে বসবাসের সুখ। এ ব্যাপারে যদি পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা

থাকে, কেউ কাউকে না লুকোয়, তবে আর অবনিবনা হয় না, বিয়েটাও ভাঙে না, জীবন সুখের হয়ে থাকে। খুঁটিও অটল থাকে, দড়িও ছেঁড়ে না। নইলে গোপন করতে গিয়েছ কি, ধরা পড়েছ। আর ধরা পড়েছ কি, বিয়ে ফাঁস হয়ে গিয়েছে। আসলে পাপ বলে কিছু নেই, গোপনতাই পাপ।'

'তোমার এত সুন্দর বক্তৃতাটা মাঠে মারা যাচ্ছে।' রঞ্জন নিষ্পাপ চোখে তাকাল ঃ 'কেননা আমার বিয়ে হয়নি আর এমন কেউ অতিরিক্ত নেই যার থেকে তোমাকে গোপন করার প্রশ্ন ওঠে। বরং তোমারই ভয়—নিচে তোমার জলজ্যান্ত স্বামী—'

'রাখো! তোমাকে বুড়োর মত মুখ লম্বা করে কথা বলতে হবে না।' অনিন্দিতা খোলা চুল খোঁপায় স্তূপীকৃত করতে লাগল ঃ 'আমার স্বামী থেকেও না থাকার মধ্যে, আমিও স্ত্রীত্বে অনুপস্থিত। আদালতের ডিক্রিতে কাগজে-কলমে বিয়েটা নাকচ না হলেও—উপরে-নিচে আমরা দু'জনেই স্বতন্ত্র—স্বাধীন। এক কথায় বলতে পারো নিরঙ্কুশ। সুতরাং তোমার কোনো ভাবনা নেই, তোমাকে সংকুচিত হতে হবে না।'

'না, না, আমি কিছু ভাবি না, কিন্তু তোমাদের বিয়েটা ফাট হয়ে গেল কেন?' রঞ্জন নির্ভাবনায় প্রশ্ন করলঃ 'এর মধ্যে কি কোন গোপনতার পাপ ছিল?'

রঞ্জন ভেবেছিল, অনিন্দিতা ধমক দিয়ে উঠবে, কিংবা অন্যভাবে উত্তরটা গোপন করবে। কিন্তু, না, অনিন্দিতা সরল মুখে বলল, 'পাপ থাকলে তো বিবাহচ্ছেদ করে অন্য আশ্রয়ে চলে যাওয়া যেত। তা নয়, আমাদের অন্য কারণ।' একটু থেমে কারণটাও বললে করুণ স্বরে ঃ 'আমাদের মধ্যেকার ভালোবাসাটাই মরে গেল।'

'মরে গেল! ভালোবাসাও মরে যায় নাকি?' কীরকম স্তব্ধের মত বসে রইল রঞ্জন।

'কি আশ্চর্য, তোমাকে এখনও কিছু খেতে দিল না?' উঠে পড়ল অনিন্দিতা। বাসন্তীকে ডাকল। বললে, 'খাবার কি দেবে? আমার 'জন' এসেছে।'

প্রচুর খাইয়ে স্নেহে-আদরে উদ্বেলে-পেলবে আপ্যায়িত করে অনিন্দিতা বললে, 'টিফিনে কতক্ষণ ছুটি পাও? মানে কতক্ষণ য়্যাবসেন্ট থাকতে পারো?'

'মেরে কেটে এক ঘণ্টা।'

'বেশ তো, তোমার দুপুরের টিফিনটা আমার এখানেই তো খেয়ে যেতে পারো।'

'ধুস। ট্রামে-বাসে আসতে-যেতেই তো ঘণ্টা শেষ।'

'না, না, ট্যাক্সি করে আসবে, ফিরবেও ট্যাক্সিতেই।' অনিন্দিতা হিসেব আরো পরিষ্কার করলঃ 'যাতায়াতে বড়ো জোর আধ ঘণ্টা, আর বাকি আধ ঘণ্টায় টিফিন!'

'কিন্তু—'

'বুদ্ধিমান হয়ে বোকার মত মুখ কোরো না। ট্যাক্সি-ভাড়া আমি দেব, আমি দিচ্ছি। আগাম দিয়ে রাখছি।'

'কিন্তু প্রতি দুপুরেই তো আসা সম্ভব হবে না।'

'তা আমি জানি। সপ্তাহে না হয় দু'দিন এসো। অন্তত একদিন।'

রঞ্জনের কিন্তু-র এখনো শেষ হয়নি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে খাটো গলায় বললে, 'কিন্তু দরজায় নক্ করলে তো খুলে দেবে বাসন্তী। সে সেটাকে কোন নাটকের রিহার্সাল ভাববে?'

ঠিকরে উঠল অনিন্দিতা ঃ 'আমার দরজা অমন বন্ধ করা থাকে না। তোমাকে নক্ করতে হবে না।' পরে কানে-কানে বলার মত করে বললে, 'দরজা ভেজানো থাকবে।

আস্তে ঠেলা দিলেই খুলে যাবে। বাসন্তীকে ভয় করার কিছু নেই। ওকে আমি সরিয়ে রাখব।'

· দিব্যি হাত বাড়িয়ে টাকা-ভর্তি প্যাকেটটা নিয়ে সানন্দে পকেটস্থ করল রঞ্জন। পথে যেতে যেতে হাতের কাছে যা আসে তাই নিয়ে নিতে হয়। প্রত্যাখ্যান করলে গৌরব কিছু বাড়ে না। বললে, 'তুমি কি সচ্ছল, কি উদার!'

অনিন্দিতার যেন আরো কিছু কথা আছে। বললে, 'আজ সন্ধ্যেয় আর রিহার্সালে এস না।'

'আসব না?'

'না। আজকের এই সুন্দর সুরটি হট্টগোলের মাঝে নষ্ট করে দিও না।'

পুলিস-ইনস্পেক্টর এসেছিল এনকোয়ারিতে। কোনো সুরাহা হল না।

নীলিমাকে বোঝাচ্ছে সব্যসাচী।

ইনস্পেক্টর বললে, 'রাত দশটা পর্যন্ত নাচ-গান রিহার্সাল চলে সেটা তেমন কিছু মারাত্মক নয়। এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত চললে না-হয় আপত্তি করা যেত। তাছাড়া কোনো বেলেল্লাপনার হল্লা নয়, নেহাৎই একটা ইয়ং গ্রুপের প্রাণচাঞ্চল্য। আর সমস্তই আপনার স্ত্রীর পরিচালনায়। আপনার সহ্য করা ছাড়া উপায় কি!'

'কিন্তু এতে যে আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত হচ্ছে, আপনার শরীর অসুস্থ হচ্ছে, সেটা দেখতে হবে না?' নীলিমা দিব্যি সব্যসাচীর পক্ষ নিয়ে কথা বললে।

'ইনস্পেক্টর বললে, আপনি বাড়ির মালিক, আপনি থিয়েটার পার্টিকে তাড়িয়ে দিন। দোতলার দরজায় তালা মারুন।'

'তা কি করে সম্ভব?' নীলিমা সমবেদনার সুরে বললে, 'ঐ পার্টি যে উপরের ভদ্রমহিলার সৃষ্টি। মুখোমুখি ঝগড়া করে তাড়াতে গেলে শুধু অশান্তিই বাড়বে, তাড়ানো হবে না।'

'তুমি ভালো বলেছ। উপরের ঐ ভদ্রমহিলা। তবে বিশেষণটা বাদ দিলেই ঠিক হত।'

'আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর কি সম্পর্ক ইনস্পেক্টরকে বুঝতে দেননি?'

'কে না বুঝবে বলো! ইনস্পেক্টরও এক নজরেই বুঝতে পেরেছে। বললে, সেইটেই তো বিশেষ অসুবিধে। আলাদা ফ্ল্যাট থাকলেও এক ভাড়ার অন্তর্ভুক্ত। ডিভোর্স হয়ে গিয়ে গোটা একটা আলাদা বাড়ির মানুষ হয়ে যেত, শত্রুতা বা ক্রিমিন্যাল ইনটেন্ট অনুমান করা সহজ হত। এখন একই বাড়ির বাসিন্দে হবার দরুন মনে করতে হবে এটাতে যৌথ সমর্থন আছে। যদি আপনার সমর্থন না থাকে, ইন্‌স্পেক্টর আমাকে বললে, আপনি এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র ফ্ল্যাট নিন।'

'সেই ফ্ল্যাটে আবার ঐ মহিলা আপনাকে অনুসরণ করুক।' হাসতে লাগল নীলিমা।

'নইলে, ইনস্পেক্টর বললে, এখান থেকে আর কোথাও পালিয়ে যান।' সব্যসাচী নীলিমার হাত ধরল আঁট করে ঃ 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে?'

খিলখিল করে হেসে উঠল নীলিমা ঃ আমি তো যাব, কিন্তু আপনি যাবেন আপনার কাজ ফেলে? আপনার কত কাজ, তাদের কত মর্যাদা।'

কথাটা কি ভীষণ বাস্তব। তবু মুহূর্তের জন্যে সব্যসাচীর মনে হয়েছিল সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে যেন নীলিমাকে নিয়ে কোন অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তে পারে। যে মেয়ে

ক্ষণিকের জন্যেও জীবনে এমনি অজানার ঠিকানা নিয়ে আসে সে নিশ্চয়ই অভিনব।

হাত ছেড়ে দিয়ে সব্যসাচী নিজের পায়ে দাঁড়াল। বললে, 'না, এখানেই থাকব। আর তুমিও থাকবে।'

'আমি আর যাব কোথায়? কিন্তু দেখছেন, দাপাদাপিটা যেন বেড়েছে!'

'শুনেছে পুলিশ এসেছিল, এ তারই প্রতিবাদ। আমি আর ওসব উৎপাত গ্রাহ্য করব না। তুমি আছ, তোমার বন্ধুতায়ই আমি এর উপশম পাব।'

'কিন্তু আমি কতটুকু! আমি কতক্ষণ!' মিষ্টি করে হাসল নীলিমা ঃ 'আপনার যিনি আসল তাঁর সঙ্গে যদি আপনার ভাব থাকত, দোতলা একতলা এক থাকত, তাহলে ঐ উৎপাত আর উৎপাত থাকত না, উৎসব হয়ে যেত।'

সব্যসাচী যেন হাঁফিয়ে উঠল ঃ 'দরকার নেই আমার আসলে, আমার এই সুন্দর অতিরিক্তই ভালো। ওখানে থাক ঐ উৎপাত তুমিই থাকো আমার উৎসব হয়ে।'

নীলিমা হাঁ-ও বললে না, না-ও বললে না। বিরক্ত বা অনুরক্ত কোনো ভাবই প্রকাশ করল না। বললে, 'আপনাদের ভাবটা চটে গেল কেন?'

সব্যসাচী লাফিয়ে বললে, 'তোমাকে পাব বলে।'

'আমি তো অতিরিক্ত!' দিব্যি একটু অভিমানের টান আনল নীলিমা ঃ 'আপনাদের এতদিনের ভাব, এতদিনের অভিজ্ঞতা—'

'অভিজ্ঞতার চেয়ে আশাই বেশি দামী।' সব্যসাচী গাঢ়স্বরে বললে, 'অভিজ্ঞতা পচা, আশাই টাটকা।'

'কিন্তু আপনাদের এতদিনের ভাবটা যায় কি করে?' প্রায় শিক্ষিকার মত শাসনের সুরে ধমকে উঠল নীলিমা।

'যা যায় তা যায়, যা আসে তা আসে—এর কোনো কেন নেই।' চট করে কাজের কথায় চলে এল সব্যসাচী ঃ 'তুমি টিউশানি করো?'

'আগে করতাম। এখন নেই। তবে ভালো মতন পেলে করি হয়তো। তবে সপ্তাহে ছ দিনই সম্ভব হবে না।' সরল দরিদ্র মুখে বললে নীলিমা।

'না, না, হপ্তায় বড় জোর তিন দিন। বেশ, তবে আজই কাজে লাগো। আর মাইনে বাবদ এই দুশো টাকা এডভান্স নাও।' সব্যসাচী দুখানা একশো টাকার নোট নীলিমার দিকে এগিয়ে দিল।

'মাইনে দুশো টাকা! এডভান্স!' চক্ষু চড়কগাছ করে পিছিয়ে গেল নীলিমা ঃ 'কাকে পড়াব? কি পড়াব?'

'আমাকে পড়াবে। পড়াবে মানে সন্ধেবেলা আমার সঙ্গে একটু সময় কাটাবে, ধরো এই ঘণ্টা খানেক—আমাকে একটু শান্তি দেবে।' জলে-পড়া অসহায়ের মত বললে সব্যসাচী ঃ 'যদি গান জানো খালি গলায় একটু গান শোনাবে, যদি না জানো না-হয় কিছু পড়ে শোনাবে। তাও যদি না পারো, অন্তত হাসতে পারবে তো!'

'তা পারব।' এক পশলা শিউলিফুল হাসি ঝরাল নীলিমা।

'আর যদি শরীরটা খারাপ হয়, অবাধ্য হয়, একটু সেবা-যত্ন করবে।'

'তার জন্যে টাকা কেন?' সব্যসাচীর হাতটা মৃদু ঠেলে দিল নীলিমা।

'তোমার—তোমাদের সংসারে টাকার দরকার নেই?'

'দরকার নেই আবার! দারুণ দরকার।'

'তবে নিচ্ছ না কেন? অভিভাবকদের কাছে বাড়তি টাকার কৈফিয়ত দিতে হবে?'

'কৈফিয়ত? রোজগেরে মেয়ে, অফিস চষে বেড়াচ্ছি, তার আবার কৈফিয়ত কি! কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা রোজগার করে আনলেও কেউ কৈফিয়ত চাইবে না—অবিশ্যি, যদি কিছু অশান্তি না জোটে—'

'অশান্তি!'

'মানে এই চুরি-ডাকাতি-পিকপকেটি—মানে, এই কোনো পুলিশি কাণ্ড—'

'ছি, ও সব হবে কেন? আমি টাকা দিয়ে আমিই আবার নালিশ করব কোন স্বার্থে?'

'না, না, তা নয়। অবিশ্যি সাবধান হতে জানলে, দৃঢ় হতে জানলে, অশান্তি সহজেই পরিহার করা যায়।'

'তবে নিচ্ছ না কেন?' নীলিমার আড়ষ্ট হাত আবার ছুঁল সব্যসাচী ঃ 'সংস্কার?'

'এ যুগে তরুণ-তরুণীদের আবার সংস্কার!'

'তবে কি তোমার ব্যক্তিগত রুচি?'

উপরের গোলমালটা তখন একেবারে ভিতরের সিঁড়ির মুখে এসেছে। কি একটা হাসির ঢেউ উঠেছে, তারই ধাক্কায় কারা বুঝি সিঁড়ির উপর ছিটকে পড়েছে—অশালীনতার একশেষ—অন্য গৃহস্থের অন্দরে না অনধিকার প্রবেশ করে বসে।

রুচির প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে নীলিমা বললে, 'এই অভদ্রতার বিহিত করা দরকার।'

'দাঁড়াও, কৃষ্ণকে ডাকি।' সব্যসাচী উত্তেজিত হল।

'আপনি যাবেন না। অসুস্থ হয়ে পড়বেন।' সস্নেহে বাধা দিল নীলিমা ঃ 'কৃষ্ণ আসুক'

কৃষ্ণ এলে সব্যসাচী বললে, 'আর তো পারা যাচ্ছে না। প্রতিকারের একটা পথ দেখ।'

'দেখি।'

কৃষ্ণ চলে গেলে সব্যসাচী নীলিমার উদ্দেশে হাত বাড়াল ঃ 'তোমার ব্যাগটা দাও—ও হয়তো তোমার হাতের চেয়ে উদার।'

'মোটেই নয়।' ব্যাগটা এক ঝটকায় সরিয়ে নিল নীলিমা ঃ 'চাকরিতে প্রথম জয়েনিং ডেটেই কেউ পুরো মাসের মাইনে পায় না। আগে এক মাস কাজ করি, পরে মাইনে নেব। আপনি ভাবছেন টাকাটা নিলেই বুঝি আমি ঠিক-ঠিক আসব! তবে আর আমার স্নেহের টানের দাম রইল কি? দেখুন না টাকা ছাড়াই স্নেহের টানে সেবার টানে আসি কিনা।'

সব্যসাচীর মনে হল দুশোর অনেক বেশি বুঝি দেওয়া যায় মেয়েটাকে।

নীলিমা টাকা নিল না, অন্তত আজকে নিল না। সে যে দৃঢ় হতে পারে সে কথাটা একটু জানিয়ে রাখল।

যথারীতি পেট্রল পাম্প-এর কাছে দেখা।

নীলিমারই সামিল হতে দেরি হয়েছে। অপরাধীর মত মুখ করে বললে, 'বেস্পতিবার আসতে পারিনি। মার্জনা কোরো।'

'দূর! মার্জনা চাইবার কি হয়েছে?' দিলখোলা গলায় রঞ্জন বললে, 'আজও যদি আসতে না পারতে আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যেতাম।'

'উঃ, আশা করে দাঁড়িয়ে থেকে না পাওয়া কী দারুণ কষ্টকর। আমাকে তোমার শাস্তি দেওয়া উচিত।'

'কোথাও একটা জুৎসই ঘর পাচ্ছি না। পেলে দিতাম শাস্তি কাকে বলে!'

'সেটা বুঝি শাস্তি হত?' চোখের কোণে হাসল নীলিমা : 'সেটা হত পারিতোষিক।'

'তবে কিসে শাস্তি হত?'

'আমি এমনি দাঁড়িয়ে থাকতাম আর তুমি আসতে না।'

'তার মানে বদলা —প্রতিশোধ নেওয়া হত?' রঞ্জন উদার স্বরে বললে, 'ভালোবাসায় যেমন মার্জনার কথা ওঠে না তেমনি প্রতিশোধের কথাও ওঠে না।'

গন্তব্য কিছু ঠিক করা নেই, দুজনে হাঁটতে লাগল।

'কি খাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল নীলিমা।

'বাদাম। তুমি খাবে?'

'কি, কাজু?'

'না, এ একেবারে খোসা ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে খাওয়া। চিনেবাদাম।'

'তাই দাও।' গোল করে হাত পাতল নীলিমা।

খেতে-খেতে চলতে-চলতে রঞ্জন বললে, 'শুধু একখানি ঘর চাই। এককেটা লোক কী বিরাট এককেটা ঘর নিয়ে আছে। আমাদের ছোট্ট একখানি ঘর হলেই চলে যায়।'

'একখানা নয়, অন্তত দুখানা ঘর।'

'না, ভালোবাসায় একখানা ঘরই যথেষ্ট। হয়তো ঘরেরও দরকার নেই। ভালোবাসায় শুধু পথই যথেষ্ট।'

হাঁটতে-হাঁটতে দুজনে একটা পার্কে ঢুকল—না কি এটাকেই লেক বলে? নীলিমা বললে, 'একটু হাওয়া নেই, গাছের একটি পাতাও নড়ছে না।'

'তা হলে হয়তো ঝড়বৃষ্টি হবে।'

'কই আকাশে মেঘ নেই!'

'মেঘ নেই অথচ একটা তারাও চোখে পড়ছে না। হয়তো বা তারাও নেই।'

তবুও ভালোবাসাই যথেষ্ট। গাছ নেই পাতা নেই মেঘ নেই হাওয়া নেই তারা নেই আকাশ নেই, তবু ভালোবাসা আছে, তাই অপরিসীম। লজ্জা নেই অপমান নেই সন্দেহ নেই কৌতূহল নেই ভয় নেই অবিশ্বাস নেই—ভালোবাসাই সমস্ত কিছু ভরে রাখে, সমস্ত কিছু ঢেকে রাখে, সমস্ত কিছু সোনা করে দেয়।

ভালোবাসাই যথেষ্ট।

একটা ফোন করে গেলে হয়!

নিজের মনেই নিজের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল রঞ্জন। জানিয়ে গেলে আর বিস্ময় রইল কোথায়?

জানলে দরজা খোলা রাখবে, নিজেও থাকবে একটু সেজে গুজে—তার মধ্যে আনন্দ থাকলেও চমক থাকবে না। চমকই তো আনন্দকে দ্বিগুণ করে। দেখি না কি রকম কী হয়ে ওঠে!

অফিসে ম্যানেজ করে রঞ্জন একটু আগেই বেরিয়ে পড়ল। দিনে-দুপুরে একা-একা ট্যাক্সি চড়ার কোনো মানে হয় না। মামুলী বাসে যাওয়াই সুন্দর।

পা টিপে-টিপেই উঠতে হল সিঁড়ি বেয়ে। কোথাও একটা জনপ্রাণী নেই। দুপুরের নির্জনতা সিঁড়িটাকে যেন কোন রহস্যালোকের দিকে নিয়ে গিয়েছে।

আশ্চর্য, দরজায় একটু কোমল ঠেলা দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। রঞ্জন ঘরে ঢুকে টুক করে ছিটকিনি তুলে দিল। এতটুকুও শব্দ হতে দিল না।

মস্ত ঘর ফাঁকা। বাথরুমে স্নানের আওয়াজ হচ্ছে। কি আর করবে, রঞ্জন একটা কাগজ নিয়ে টেবলের ওধারে কোণের সোফাটাতে বসল।

সহসা টেবলের উপর টেলিফোন বেজে উঠল।

কি করবে, কি করণীয়, রঞ্জন যেন সহসা স্থির করতে পারল না। টেলিফোন বেজেই চলল। সে ঠায় বসে রইল চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে রিক্ত ও সিক্ত গায়ে কোনোরকমে একটা তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এল অনিন্দিতা। এরকম ক্ষেত্রে বাসন্তীই ফোন ধরে, কিন্তু দুপুরের এক ঘণ্টা তাকে রোজ ছুটি দিচ্ছে বলেই এই বিড়ম্বনা। তা নিজের ঘরে নিজের কাছে তার কুণ্ঠা কি!

কয়েক পা হেঁটে টেলিফোনের দিকে এগুলো অনিন্দিতা। হঠাৎ নজরে পড়ল কোণে রঞ্জন বসে। উজ্জ্বল চোখে সমস্ত নিরীক্ষণ করছে।

'ওমা তুমি! টেলিফোন বেজে যাচ্ছে, ধরতে পাচ্ছ না?'

'ধরলে তোমাকে দেখি কি করে?'

'ওমা কি দুষ্টু! কি চালাক!' অনিন্দিতা তাকিয়ে দেখল দরজা বন্ধ আছে। বাথরুমের দিকে ফিরে যেতে-যেতে বললে, 'ফোন তুলে বলে দাও রং নাম্বার।'

তাড়াতাড়ি তোয়ালেটা খসে পড়ল হাত থেকে। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে অনিন্দিতা বললে, 'কী পাজি! কী দুষ্টু!'' বাথরুমে অন্তর্হিত হয়ে বললেন, 'দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমাকে।'

'তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।' নীলিমা এলে সব্যসাচী বললে।

কি জিনিস কে জানে! বই না কলম না ব্যাগ না ঘড়ি—আর ঘাবড়াবে না নীলিমা। নির্বাষ্প গলায় বললে, 'কই দেখি!'

বাক্স দেখেই বুঝল, শাড়ি। খুলে দেখল দারুণ দামী আর জমকালো। সঙ্গে রঙ-মেলানো ব্লাউজ। দেখেই আঁতকে উঠল নীলিমা ঃ 'কী সর্বনাশ! আমি এসব পরব নাকি? বাড়িতে কি বলব?'

'বলাবলি আর কি! মাঝে-মাঝে নেমন্তন্নে যেতে পারবে, কিংবা কোনো আউটিং-এ, কী চমৎকার মানাবে তোমাকে!'

'যখন সবাই জিজ্ঞেস করবে কে দিল, বলতে পারব না। নিজে কিনেছি এ অসম্ভব। তখন থেকেই অশান্তি শুরু হবে। তার চেয়ে টাকাই ভালো ছিল।' নীলিমা সরলতার ছবি হয়ে বললে, 'টাকা দিব্যি লুকোনো যায়, রয়ে-সয়ে খরচ করা চলে। সচ্ছলতা যদি ধরা-ও পড়ে, অনেক তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু বাড়িতে এত অভাব, কোন সুখে আমি শাড়ি পরি?'

'টাকার যখন যা দরকার হাতখানি পাতলেই পাবে।' সব্যসাচী 'হাত' না বলে 'হাতখানি' বললে, তাইতেই মানেটা সুন্দর হয়ে গেল। বললে, 'শাড়িটা বাড়তি। বাড়িতে না পরো, আমার কাছে এখানে পরো। তোমার সুখের জন্যে না হোক, আমার সুখের জন্যে পরো।'

'এ আইডিয়াটা মন্দ নয়।' নীলিমা প্রায় নেচে উঠল ঃ 'আপনাকে পরে দেখাই। পরে আবার যাবার আগে ছেড়ে যাব।' শাড়ি-ব্লাউজের বাক্সটা বুকের উপর তুলে নিল

নীলিমাঃ 'আর তোমার সুখই আমার সুখ।' পরে পাশের শোবার ঘরের দিকে যাবার মুখ করে জিজ্ঞেস করলে, 'ও ঘর খালি তো?'

'সব খালি।' সব্যসাচী অভয় দিল। তারপর আদর ঢেলে বললে, 'বেশ সুন্দর করে সাজো। নতুন বউয়ের মতো।'

মুখ টিপে হেসে পাশের ঘরে গেল নীলিমা। দু ঘরের মধ্যে পরদা নেই, তাই বলে দোর দিল না। দেখল লম্বা আয়না থাকলেও মেয়েলি প্রসাধন কিছু নেই। কাজল কুঙ্কুম আলতা বা ওষ্ঠ--যষ্টি—থাকবার কথাও নয়। ও সব কৃত্রিমতার প্রয়োজনই বা কি! যদি চোখে কটাক্ষ থাকে, ঠোঁটে মদির হাসি, মুখে লজ্জার আভা আর ভঙ্গিতে একটু লাস্যের উল্লেখ, তা হলেই সে অনির্বচনীয় হয়ে উঠবে। রূপ তো প্রসাধনে নয়, রূপ প্রাণের ঔজ্জ্বল্যে।

নীলিমার তখনই মনে হয়েছিল তার সাজ শেষ হবার আগেই সব্যসাচী ঘরে ঢুকবে। তাই পুরোনো ছেড়ে নতুনে উত্তীর্ণ হবার আগেই পিছনে সব্যসাচীর উপস্থিতির উত্তাপ পেয়েও সে বিশেষ চঞ্চল হল না। বললে, 'সব খালি নয়।'

'তাই তো দেখছি।'

'শাড়ি আর ব্লাউজই এনেছেন, সায়া আর কাঁচুলি নয়। তাই সাজতে গিয়ে আমার এই পুরোনো দুটো রাখতে হল।' তারপর লুটোনো আঁচলটা গায়ের উপর তুলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'কেমন দেখছ?'

কখনো আপনি, কখনো তুমি—যেন পুরোনো সায়া-কাঁচুলির সঙ্গে নতুন শাড়ি-ব্লাউজ—সব্যসাচীর কাছে অনির্বচনীয় মনে হল। বললে, 'এক কথায় অপরূপ।'

'কি, বউ-বউ মনে হচ্ছে?'

'খুঁত থেকে গেছে। ভাবছি হাতে-গলায় সোনার কিছু কারুকার্য দরকার।'

'বাড়াবাড়ি ভালো নয়।' রুক্ষ সুরে শাসন করল নীলিমাঃ 'শান্তির মধ্যে থাকাই সুশ্রী।'

'গয়নাতে অশান্তি কি? গলায় হার, হাতে চুড়ি পরলে, আবার যাবার আগে খুলে রেখে গেলে।'

'যদি না খুলি? দেখ আমাকে লুব্ধ হবার জন্যে বেশি লোভ দেখিয়ো না।' নীলিমা অনায়াসে সব্যসাচীর একখানা হাত ধরল। বললে, 'হাত ধরে সমুদ্রের তীরে-তীরে বেড়িয়ে বেড়ানোই সুন্দর। সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেই সর্বনাশ।'

'কার সর্বনাশ? তোমার?'

'আমার কি! আমি সাঁতার জানি, আমি ঠিক পাড়ে উঠে পড়ব। আপনি মস্ত লোক, ভারী লোক, আপনিই ডুববেন।'

'আমাকে সত্যি-সত্যি একবার ডুবিয়ে দিতে পারো?' উপরের দিকে তাকাল সব্যসাচীঃ 'আমি ঐ ভার বইতে পারছি না।'

'সত্যি আজ গোলমাল আরো প্রচণ্ড।' নীলিমা ত্রস্ত হয়ে বললে, 'ব্যাপার কি?'

সব্যসাচীও চঞ্চল হলঃ 'কৃষ্ণকে ডাকি।'

'তুমি বসবার ঘরে গিয়ে কৃষ্ণকে ডাকো। এখানে এ সজ্জায় আমাকে দেখলে ও কি ভাববে?'

'ওর ভাবতে আর কিছু বাকি নেই।'

কৃষ্ণ বললে, ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। নতুন ধরনের একটা তোলা কয়লার উনুন তৈরি

করে এনেছে। এখন ওটা ভিতরের সিঁড়ির উপর বসিয়ে আগুন দেওয়া হবে।

'সর্বনাশ!' নীলিমা ভয়ে হাঁপিয়ে উঠলঃ 'ধোঁয়ায় নিচের ঘরও তো ভরে যাবে।'

'না, যাবে না। ধোঁয়ার মুখে লম্বা চোঙা বসানো, ধোঁয়া তাই একটানা উপরেই উঠে যাবে।' উনুনটা এনে দেখাল কৃষ্ণ। বললে, 'বলেন তো, আজই ধোঁয়া দিই।'

'মন্দ কি, দেখা যাক না, প্রতিবাদের বাষ্প কেমন উপরে ওঠে।' সব্যসাচী নীলিমার দিকে তাকাল ঃ 'উপরের তাণ্ডব বন্ধ হয় কিনা!'

নীলিমার মনে হল গোলমালটা তার উপস্থিতিতে না হওয়াই সঙ্গত। তাই সে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, 'আজ শুভ দিন। আজকে থাক।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল দেখা যাবে।' ইঙ্গিতটা বুঝে সব্যসাচী আনন্দিত হল। কৃষ্ণকে বললে, 'এবার তবে আমাদের চা-টা দাও।'

খেতে-খেতে বৃষ্টি এল। আর এল একেবারে আকাশ ভেঙে।

'আমাদের প্রথম দেখা বৃষ্টিতে। আর এই প্রথম রাত্রিতেও বৃষ্টি।'

'কি করে যাব?' নীলিমা মুখ মেঘাচ্ছন্ন করল।

'যাবে কেন, থাকবে!'

'আমার কি, থাকব!' মুখের মেঘ উড়িয়ে দিল নীলিমা ঃ 'বলব মহৎ ভেবে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আপনিই বরং বিপদে পড়বেন। রাত কাটাবার ওজুহাত পাবেন না।'

'বাঃ, রাত বলে বউকে বৃষ্টির মধ্যে বার করে দেব?'

'বউ!' খিলখিল করে হেসে উঠল নীলিমা ঃ 'এক স্ত্রী থাকতে আরেক স্ত্রী —আপনার হাতে হাতকড়া পড়বে।'

'স্ত্রী কোথায়! তুমি তো বউ। অন্ধকূপের দেয়ালে একটি ছোট্ট জানলা। শোনো,' সিগার ধরাল ঃ 'যদি কাউকে কখনো বিয়ে করো দুজনে মিলে সেই বিবাহিত অন্ধকূপ করে তুলো না। একজনের মধ্যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি পায় না আরেকজন। তাই দু পক্ষেরই একটি করে দ্বিতীয় দরকার। আর তা পরস্পরের জ্ঞাতসারে, লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়। গোপন করতে গেলেই ঝগড়া। তেমনি আবার আলো-হাওয়া-হীন নিশ্ছিদ্র অন্ধকূপে বাস করতে গেলেও ঝগড়া। গোপনচারিতা যেমন অপরাধ, একঘেয়েমিও তেমনি অসহ্য। তাই অন্ধকূপে দুটি জানলা কোরো—দুজনের জন্যে দুটি—তার দুটিই মুক্ত জানলা। দুজনে এক ধনে ধনী, এক দাগে দাগী—একই আলো-বাতাসে পরিপুষ্ট। তখন সে-বিয়ে ভাঙবে না, পারবে না ভাঙতে। আইডিয়াটা নতুন, প্রোগ্রেসিভ, বলতে পারো মহৌষধ।'

'এটা তো বিয়ের পক্ষে—মানে, যদি কাউকে কখনো বিয়ে করি?' চোখ নাচাল নীলিমা।

'হ্যাঁ, যদি কাউকে বিয়ে করো!'

'কিন্তু যদি কাউকে ভালোবাসি?' নীলিমা চোখ দুটি স্থির করে দৃষ্টিটি গভীর করে তুলল।

সব্যসাচী কেমন তন্ময় হয়ে গেল। বললে, 'সে কথা আলাদা।'

মেয়েটার জন্যে অপার্থিব মায়া হল। বৃষ্টিটা ধরতেই বললে, 'চলো তোমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

নীলিমা রাজি হল না। হেসে বললে, 'এটুকু রাস্তা হেঁটেই চলে যেতে পারব। গাড়িটাই

অন্ধকূপ. পায়ে হাঁটাটাই জানলা।' পুরোনো শাড়ি-ব্লাউজে প্রত্যাবৃত্ত হল নীলিমা। আর সব্যসাচী এবার টাকার প্যাকেটটা এগিয়ে দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করলে না।

'আরে তুমি?'

'তুমি এখানে?'

সেই বৃষ্টিভেজা ঠাণ্ডা রাতে বড় রাস্তার মোড়ে রঞ্জন আর নীলিমার দেখা হয়ে গেল।

'এদিকে আমার ছোটমাসির বাড়িতে এসেছিলাম,' অকপটে বললে নীলিমাঃ 'তারপরে এই বৃষ্টি। তুমি কোথায়?'

'আর বোলো না। কলেজের বন্ধু অমিয়র সঙ্গে হঠাৎ দেখা। ডেকে নিয়ে গেল ওদের তাসের আড্ডায়। বৃষ্টি থামে তো তাস থামে না।' মুক্ত মনে বললে রঞ্জন।

তোমার ছোটমাসি কবে জুটল, এতদিন তো শুনিনি কিছু, কোন রাস্তায় কত নম্বরের বাড়ি—তন্তুমাত্র জানতে চাইল না রঞ্জন। আর অমিয়—কোন অমিয়, চাটুজ্জে না মুখুজ্জে, ঘোষ না ঘোষাল, তার ঠিকানা কি, রঞ্জনই বা কবে তাসে উৎসাহী হল, কই এত দিন তো শুনিনি কিছু—নীলিমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। তাদের যে দেখা হল এইটেই অভাবনীয় সত্য। এই ক্ষান্তবৃষ্টি রাত, খোলা দমকা হাওয়া, নির্জন হয়ে আসা রাস্তা, আর হৃদয়ে ভালোবাসা নিয়ে তাদের এই এক বিন্দু অস্বস্তি—এর বাইরে আর কোন প্রসঙ্গ নেই। বাজনা যদি একবার বাজে, শ্রুতেও বাজে অ-শ্রুতেও বাজে।

'যাবে কিসে?' রঞ্জন বুঝি একটু উদ্বিগ্ন হল।

'এই কাছেই তো বাড়ি। এমনিই চলে যাব। কিন্তু তুমি?' একটু বুঝি উতলা হল নীলিমা।

'বাস পেয়ে যাব নিশ্চয়ই। ঐ তো আসছে একটা।'

উলটো মুখের বাস। তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরোল রঞ্জন।

'সাবধানে উঠো।' বলে দিল নীলিমা।

'পাও তো একটা রিকশা নিয়ো।' রঞ্জন চেঁচিয়ে মনে করিয়ে দিল।

আনুপূর্বিক ভালোবাসা। আদ্যোপান্ত। তাতে ছলনা নেই, মিথ্যাচার নেই। কিছুতেই বুঝি তার লয়-ক্ষয় হয় না। আবরণে না, আভরণে না, নগ্নতায় না। সে দিনে-রাতে, অমায়-জ্যোৎস্নায়, শীতে-শরতে বসন্তে-বর্ষায় অক্ষত হয়ে বেঁচে থাকে।

তারপর উপরের তাণ্ডব বন্ধ করার জন্যে নিচের থেকে ধোঁয়া ছাড়া হল।

পরিপাটি ব্যবস্থা। চোঙা দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া উঠতে লাগল উপরে আর সিঁড়ির মুখে দরজা না থাকাতে ঘরে-বারান্দায় ছড়িয়ে পড়ল। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলেও এত বড় পার্টির এতগুলো ছেলে-মেয়ে কোণঠাসা হয়ে রইল। বন্ধ হল রিহার্সাল।

মানেটা কি? সোজা প্রতিবাদ করবে তার উপায় নেই। ভিতরের সিঁড়িটাই রণস্থল। ঘুরপথে নেমে ফ্ল্যাটের দরজায় ধাক্কা মেরে নালিশ জানাতে গেলে কে শোনে—কিসের নালিশ? আমার বাড়িতে তোলা-উনুনে ধোঁয়া দিচ্ছি, তোমরা নন-রেসিডেন্ট, তোমাদের কী মাথাব্যথা!

সুতরাং ধোঁয়ার উত্তরে পদাঘাত। লোকটার মাথার উপরে আরো বেশি দাপাদাপি করো। মিলিটারি বুট পরে নাও। কুইক মার্চ চালাও।

আর সে দাপাদাপি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। দেখি লোকটা কি করে ঘুমোয়!

'লোকটাকে মদৎ দিচ্ছে কে?' বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করল অনিন্দিতাঃ 'এতদিন তো গান-নাটকে কোনো আপত্তি করেনি, সয়ে নিয়েছে—এখন কি এমন হল যে নিঃশব্দে থাকতে চায়, গায়ে পড়ে ঝগড়া করে—রহস্যটা কি? কৃষ্ণের কাছ থেকে চুপিচুপি জেনে এস।'

কৃষ্ণের কাছ থেকে সহজেই জেনে নিল বাসন্তী। উপরে গিয়ে বললে, 'অফিসের কোন একটা মেয়ে-কেরানির সঙ্গে সাহেবের ভাব হয়েছে, তারই জন্যে এত আড়ম্বর।'

উপরের গোলমালটা দফায়-দফায় দলে-দলে হচ্ছে। কখনো মার্চ, কখনো টেবল-চেয়ার টানাটানি। কখনো বা বাসন-মেরামতি।

'এত সব অর্গানাইজ করছে কে? মূলে কোন পুরুষ কাজ করছে?' কৃষ্ণকে ডাকল সব্যসাচী ঃ 'তুমি বাসন্তীর কাছ থেকে চুপিচুপি জেনে এস।'

কৃষ্ণের জেনে নিতে দেরি হল না। সব্যসাচীকে বললে, 'অফিস-পাড়ার কে এক রঞ্জন ঘোষের সঙ্গে মেমসাহেবের ভাব হয়েছে, সেই সব করাচ্ছে-কম্মাচ্ছে।'

থানায় ডায়রি করে সব্যসাচী পুলিস-ইনস্পেক্টরকে একেবারে বাড়িতে টেনে নিয়ে এল। শুনুন—শুনছেন? করাত দিয়ে কাঠ চিরছে? না কি বাক্সে পেরেক ঠুকছে? আর ঐ বুট-পায়ে রুট-মার্চ!

রাত এখন কটা? দশটা—এগারোটা—বারোটা!

দাঁড়ান, কথা নেই। এখন একবার জানান দিই। কাল একেবারে সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসব।

পুলিস এসেছে খবর পেয়েই রিহার্সালের দল ভেগে গেল। ভেঙে গেল।

'আর যে-ই যাক, তুমি যেও না।' দু বাহু বাড়িয়ে রঞ্জনকে বুকের মধ্যে টেনে নিল অনিন্দিতা।

রঞ্জন বললে, 'আমি কোথায় যাব? আমার আর জায়গা কোথায়?'

তেমনি নীলিমাকে কাছে বসিয়ে সব্যসাচী বললে, 'কেমন সবাইকে হারিয়ে দিয়ে কী মধুর স্তব্ধতা তুমি জয় করে এনেছ! তুমি বিজয়িনী।'

'ঐ ধোঁয়াটে জয়ে গৌরব কি?' নীলিমা বিহ্বলকণ্ঠে বললে,'তোমাকে যদি জয় করতে পারি তবেই আমি বিজয়িনী।'

'একটা দু-ঘরের ফ্ল্যাট যোগাড় হয়েছে। সঙ্গে এক চিলতে বারান্দা।' পরে একদিন দেখা হতেই রঞ্জন সুখবরটা দিল নীলিমাকে।

'সত্যি? তবে চলো নীড় বাঁধি গে।' নীলিমা আনন্দে ঝলমল করে উঠল।

'কিন্তু জানো বাড়িটা কলকাতার কিছু বাইরে। তা বাস আছে, ইলেকট্রিক ট্রেন আছে।'

'এক্ষুনি চলো। বাস-ট্রেন লাগবে না, তুমি-আমি পাশাপাশি পায়ে হেঁটেই অফিস করব।'

'হ্যাঁ, ভাবছি নিয়ে নিই বাড়িটা। আর গোলমাল দাপাদাপি ভালো লাগে না।' কি বলতে কি বলল রঞ্জন!

হ্যাঁ, সব সময়েই ধোঁয়ার মধ্যে থাকা—অস্পষ্ট হয়ে থাকা—' বলতে-বলতে নিজেকে হঠাৎ সামলে নিল নীলিমা।

'জানো তোমাকে একলা খুব দেখতে ইচ্ছে করে—' রঞ্জনের চোখে আনন্দ জ্বলে উঠল।

'আর আমার বুঝি করে না?' নীলিমার চোখে লজ্জার অরুণিমা।

'কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো? আমাদের এত সুখ সইবে না।'

'ভালোবাসায় দুঃখও সুখ।'

'এমনিতে ওভারটাইম উঠে যাচ্ছে, তার উপর শুনতে পাচ্ছি স্বামী-স্ত্রী দুজনের চাকরি করা চলবে না।'

নীলিমা ম্লান একটু হাসল ঃ 'আমাদের যা মাইনে আমরা হয়তো রেহাই পাব। আর যদি না পাই, আমার চাকরিটা যদি ছুটে যায় তবে দিব্যি গা হাত পা ছড়িয়ে সারা দুপুর ঘুমুনো যাবে।'

'হ্যাঁ, কোনো অবস্থাতেই ভালোবাসা অবসন্ন হবে না।' রঞ্জন অন্তরঙ্গ হয়ে বললে, 'তা তুমি সংস্কৃত নীলই হও বা অসংস্কৃত অর্থাৎ ইংরেজি NIL-ই হও!'

'আমি অনিলও হতে পারি।'

'সে কখন?'

'তুমি যখন অনল।'

'তুমি তো নিজেকে খুব বিপ্লবী বলো, আমাকে পারো বিয়ে করতে?' তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে অনিন্দিতা জিজ্ঞেস করল রঞ্জনকে।

'অনায়াসে পারি। তার আগে নিচের কাঁটাটা সরাবে তো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঐ কেরানি মেয়েটার সঙ্গে ও ব্যভিচারে লিপ্ত আমি এই গ্রাউন্ডে ডিভোর্স নিচ্ছি। যাচ্ছি উকিলের কাছে।'

গম্ভীর স্বরে সব্যসাচী নীলিমাকে জিজ্ঞেস করলে, 'খবরের কাগজের হেড লাইন হতে চাও?'

'কি করে?'

'আমাকে বিয়ে করে!'

'সে তো আপনি হেড লাইন হবেন। বুড়ো বয়সে একটি অনাঘ্রাতা কুমারীর সর্বনাশ করলেন।'

'তা করলাম। কিন্তু তুমি রাজি আছ?'

'আমি কি বোকা যে অরাজি হব? কত টাকার মালিক হব, ওয়ারিশি পাব—এত বড় দাঁও ছাড়ে কে? কিন্তু বিয়ে করার আগে উপরের ঐ বাধাটা পার হতে হবে তো?'

'তা তো নিশ্চয়ই। সেই কেরানি ছোকরাটার সঙ্গে ও আছে এই প্রমাণ করে আমি ডিভোর্স নিচ্ছি। যাচ্ছি উকিলের কাছে।'

দুই স্পাই, দুই সাক্ষী, কৃষ্ণ আর বাসন্তী, যার-যার এলেকার বৃত্তান্ত শত্রুপক্ষে চালান করে দিল।

হীরেন সেই ফ্যামিলি-উকিল। তার কাছে আগে গেল অনিন্দিতা। একদিন পরে গেল সব্যসাচী।

দুজনেই বললে, একদিন আপনিই মিটমাট করিয়ে আলাদা থাকবার উপদেশ দিয়েছিলেন। এবার আর মিটমাট নয়, আদালত থেকে বিয়ে-নাকচের ডিক্রি আনিয়ে দিন।

তথাস্তু। হীরেন সেন দুটো মামলাই রুজু করলে। একটা অবশ্যি তার জুনিয়ারকে দিয়ে। দু মামলারই সমন বেরুল।

অনিন্দিতা রাগে রি-রি করতে লাগল ঃ আমার বিরুদ্ধে নালিশ! আমি করাপ্ট!

সব্যসাচীরও সেই ক্ষোভ ঃ এতদূর স্পর্ধা!

রঞ্জন আর নীলিমার মাথায় তো দুদিক থেকে দু-দুটো বাজ ভেঙে পড়ল। এ তো সমন নয়, মূর্তিমান শমন এসে উপস্থিত। রঞ্জন ছুটল অনিন্দিতার কাছে। নীলিমা সব্যসাচীর।

সব্যসাচী নীলিমাকে ঘাবড়াতে নিষেধ করল। দাঁড়াও, উকিলকে ডাকাই। দুই মামলার একই উকিল।

হীরেন সেন নিচে এসেছে শুনে অনিন্দিতা নেমে এল। রঞ্জনকে সঙ্গে নিল, তুমিও চলো। আমারও যখন উকিল, আমার থেকে ফি নিয়েছে, আমারও নিশ্চয় পরামর্শ করবার রাইট আছে।

গত্যন্তর কি, রঞ্জন যখন খেলার মধ্যে, তখন সে আর বাইরে থাকে কি করে? সেও সব্যসাচীর ঘরে ঢুকল।

পাংশু মুখে নীলিমা টেবলের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই অনিন্দিতা ঝাঁজিয়ে উঠল ঃ 'তুমিই নীলিমা সিংহ, জাঁদরেল জয়েন্ট সেক্রেটারির অঙ্কশায়িনী?'

রঞ্জনকে লক্ষ্য করে সব্যসাচী বললে, 'তুমিই রঞ্জন ঘোষ, প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলার নাগর নটবর?'

রঞ্জন আর নীলিমা, নীলিমা আর রঞ্জন। পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দুজনে স্তম্ভিত হয়ে রইল। নীলিমাই প্রথমে আর্তনাদ করে উঠল ঃ 'তুমি?'

'তুমি!' অস্ফুটে করুণ শব্দ করে রঞ্জন এগিয়ে গিয়ে নীলিমার হাত ধরল।

'এ কি, এরাও বিবাহিত নাকি?' হীরেন সেন প্রশ্ন করল।

রঞ্জন বললে, 'আমাদের বিয়ে এখনো হয়নি। হবে।'

নীলিমা শ্বাস ফেলে বললে, 'আমাদের অনেকদিনের চেনা-জানা। থাকবার মত সুবিধের একটা জায়গা পাচ্ছি না বলে দেরি হচ্ছে।'

'তার মানে তোমরা ভালোবাসো?' রঞ্জনের দিকে তাকাল অনিন্দিতা।

রঞ্জন সম্মতিতে হাসল।

'আমাকে এতদিন এত বড়ো কথাটা বলোনি কেন?'

নীলিমার দিকে তাকাল সব্যসাচী।

সে কি বলা যায়, না, বলে বোঝানো যায়? সলাজ মুখে হাসল নীলিমা।

'তবে আর কথা কী! দুটো মামলাই তুলে নিন।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল হীরেন সেনঃ 'উপরের ফ্ল্যাটটা ওদের ছেড়ে দিন। ওদের মিলতে দিন। মেলবার জায়গা দিন। আপনারা বুড়োবুড়ি নিচে থাকুন।'

উকিলের কথামতই হল।

উপরের ফ্ল্যাটটা অনিন্দিতা ছেড়ে দিল রঞ্জনকে। তুমি চরিতার্থ হও।

আর নীলিমাকে উপরে পাঠিয়ে দিল সব্যসাচী। মনে থাকে যেন, ঘরকে অন্ধকূপ করে রেখো না।

একটি চতুষ্কোণ হল বুঝি। আমরা তোমাদের জন্যে। তোমরা আমাদের জন্যে। ঘর আর অলিন্দ, অলিন্দ আর ঘর।

'আমাদের ভালোবাসাই ওদের মিলিয়ে দিল।' রঞ্জন বললে নীলিমাকে।

'কে জানে স্থানে-কায়ে বিচ্ছিন্ন হয়েও ওদের ভালোবাসা একেবারে মরেনি! তাই মেলাতে পারল আমাদের।'

কতক্ষণ পরে রঞ্জন আবার বললে, 'এই, আমাকে দোষী ভাবছ না তো?'

নীলিমা হাসল ঃ 'আমাকে তবে কি ভাববে?' বলে আরো একটু হাসল ঃ 'ভালোবাসায় দোষ নেই।'

উৎসবের একটা বড়ো রাত ওরা দুজনে কাটাল সেই প্রকাণ্ড ঘরে। তারপর ভোররাতেই পালাল চুপিচুপি।

'ওদের একবার প্রণাম করে যাব না?' নীলিমা বুঝি একটু উতলা হল।

'ওরা কতদিন পরে শান্তিতে ঘুমুচ্ছে, ঘুমুতে দাও।' রঞ্জন বললে নির্মল কণ্ঠে, 'পরে একদিন এসে প্রণাম করব।'

'রাস্তায় একটাও ট্যাক্সি নেই। চলো পেয়ে যাব।'

হাঁটতে হাঁটতে রঞ্জন বলল, 'জীবনের সব খেলায় সকলেই আউট হয়ে যায়, একমাত্র ভালোবাসাই উদয়াস্ত নট-আউট।'

তবু মনে রেখো



রচনা-পুরাকাহিনী

না, গল্প বা উপন্যাস এটা নয়। আদৌ কোন গল্প হ'ল কিনা তাও জানি না। হ'লে—সে গল্প বিধাতারই রচনা, আমার নয়।

আমি বলছি অনেকদিন—ধরুন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের কথা।

আমরা তখন কাশীতেই থাকি। বছর আষ্টেক-নয় বয়স আমার। হঠাৎ মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন, রান্না করা কি আগুন-তাতে যাওয়াই নিষেধ হয়ে গেল।

আমাদের কোন অসুবিধা হ'ল না বিশেষ। নামকরা হোটেল 'পার্বতী আশ্রম'-এ মাথাপিছু মাসিক ছ'টাকা হিসেবে দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হল। পার্বতী ঠাকুর হোটেল চালাতেন, নিজেই রান্না করতেন অনেক সময়। দশাশ্বমেধ রোডের ওপর হোটেল। সেখানে এখন অন্য হোটেল হয়েছে।

সে যাই হোক বিপদ বাধল মাকে নিয়ে, বিধবা মানুষ—কার কাছে খাবেন?

রাঁধুনী রেখে রান্না করানো হবে, সে সঙ্গতি তখন ছিল না।

বেশ কয়েক দিন আধা-উপোসে কাটাবার পর একটা সুরাহা হল।

আমাদের পাশের বাড়ির নিচের একটা ঘরে ভাড়া থাকতেন গোসাঁইগিন্নী, ও-পাড়ার বৃদ্ধাদের তিনিই ছিলেন বলতে গেলে অভিভাবিকা, কারণ তাঁদের দুই ননদ-ভাজের পুরো বারোটি টাকা মাসোহারা আসত। তখন তিন টাকাতে বহু বিধবা কাশীতে মাস চালাতেন। তাঁদের মধ্যে গোসাঁইগিন্নী ধনী বলে গণ্য হবেন, এ তো স্বাভাবিক।

তিনিই খবরটা দিলেন।

পাঁড়ে-হাউলীতে এক ব্রাহ্মণ বাড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে, বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত শিব আছেন, নারায়ণ আছেন—নিত্য ভোগ হয়—সেই প্রসাদই পাওয়া যাবে। তবে তাদের খাঁইটা একটু বেশী, একবেলা খাওয়ার জন্যেই মাসে চার টাকা চায়।

যেখানে ছ'টাকায় দুবেলা মাছ-মাংস নানা-ব্যঞ্জন খাওয়া হয়—সেখানে একবেলা নিরামিষ খাওয়ার জন্যে চার টাকা অবশ্যই বেশী। কিন্তু তখন আর উপায়ও ছিল না। মা অগত্যা রাজী হয়ে গেলেন।

গোসাঁইগিন্নী বললেন, 'তিন টাকা হলেই ঠিক হত, তবে কি জানো মা, টাকাটা অপাত্রে পড়বে না। বড্ড অভাব ওদের, এর ওপরেই ভরসা—সংসার চালানো, ঠাকুরসেবা সব।...ঠাকুরসেবার কড়ারেই বাড়িটা পেয়েছিল মটরার বাবা, তা সেবা তো কত—করবে কোত্থেকে, জীবনে তো কোনদিন কিছু করল না। গাঁজা খেয়ে আর সিদ্ধি খেয়েই কাটিয়ে দিলে। ছেলেগুলোও হয়েছে তেমনি, বাপের ধারা আঠারো আনা পেয়েছে। নেশায় পঞ্চরঙ—কোনটা বাকী নেই। বড়টার আবার বে' দিয়েছে সাত-তাড়াতাড়ি—পোড়ার দশা, ওর চেয়ে মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়াও ভালো ছিল...মাঝখান থেকে মাগীটারই কষ্ট। এমনি আরও দু-তিন জনকে ভাত যোগায়—ত াইতে কোনমতে কটা পেট চলে। তাই কি সব দিন জোটে, নেশার পয়সা না জুটলে গুণধররা এসে মাকে ঢিবঢিবিয়ে দিয়ে—যা থাকে দু-এক পয়সা কেড়ে নিয়ে চলে যায়—গাঁজা-চরস খেতে।'

এর পর সে বাড়িতে খেতে যাওয়া কেন—পা দিতেও ইচ্ছে করে না। কিন্তু আমরাও তখন নিরুপায়। না হলে মাকে উপোস করে থাকতে হবে। অসুবিধে ঢের—জায়গাটাও আমরা যেখানে থাকতুম লক্ষ্মীকুণ্ড থেকে বহুদূর, এক মাইলেরও বেশী। এখনকার মতো তখন সাইকেল-রিক্সা ছিল না—আর দেড়-দু মাইল পথের জন্য এক্কা করার কথা কেউ ভাবতেও পারত না। সুতরাং হেঁটেই যেতে হবে।

তবু তাতেই রাজী হলেন মা।

আর, একা যাওয়া তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—ঠিক হল আমিই সঙ্গে যাব। তখনও আমি ইস্কুলে ভর্তি হই নি। বাড়িতেই পড়ি। নিজে হোটেল থেকে খেয়ে এসে আবার মাকে নিয়ে ওখানে যাব—এই রকম ব্যবস্থা রইল।

আজ আর আমার বাড়িটা ভালো মনে নেই। শুধু মনে আছে, পাঁড়ে-হাউলীর সংকীর্ণ গলিটা যেখানে সঙ্কীর্ণতর হয়েছে সেইখানে কোথাও ছিল।

হয়ত আজও আছে—কে জানে। বাড়িতে ঢুকতেই চলনের বাঁহাতি ঠাকুরঘর, সেখানে প্রকাণ্ড একটা শিবলিঙ্গ আর তার পাশে একটা কাঠের আধভাঙ্গা সিংহাসনে একটি শালগ্রাম শিলা ও একটি গোপাল মূর্তি।

পরে শুনেছি—রুপোরই সিংহাসন ছিল—মটরার বাবা বেচে খেয়েছে।

বাড়িটা বেশ বড়, একটু উঠোনও আছে। দোতলা বাড়ি, নিচের তলা—যেমন বাঙালীটোলার বাড়ি হ'ত—এখনও আছে—তেমনিই। অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে। গরমের দিনে দুপুরে আরামদায়ক—অন্য সময় বাসের অযোগ্য।

তবু মটরার মা ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানেই থাকেন। ওপরের তিনটি ঘরের একটায় মটরার দাদা থাকে বৌকে নিয়ে—আর একটা ঘরে ভাড়া থাকেন এক ভদ্রমহিলা। দুবেলা খাওয়া ও ঘরভাড়া ধরে মোট আট টাকা দেন। আর একটা ঘরে ভাড়াটে আছেন, তিনিও বিধবা—তবে তিনি নিজে রেঁধে খান ওপরের চিলেকোঠায়, শুনেছি—তিন টাকা ভাড়া দেন। কিন্তু আলাদা খেলেও বহু খেজমতই মটরার মাকে খাটতে হয় তাঁর, উনুন ধরিয়ে, না ধরলে বাতাস করে—সেই উনুন ছাদে পৌছে দিয়ে আসতে হয়।

এই কটি টাকাই মোট আয়।

অবশ্য হ্যাঁ—আরও একটা ছিল, পাশে কে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক থাকতেন, খুব বৃদ্ধ, তাঁরও খাওয়ার ব্যবস্থা এইখানেই। তিনিও একবেলা খেতেন—তবে তাঁর ভাত পৌছে দিয়ে আসতে হ'ত রোজ। তিনিও মাসে চার টাকা দিতেন, পরে যা শুনেছিলুম।

এ বাড়িতেও লোক কম নয়। তিন ভাই, দুই বোন, একটা বৌ এবং মটরার মা।

এই ক'টা টাকাতেই সকলের খরচ চালাতে হ'ত।

কদাচিৎ কোন পুজো-আশ্রার দিনে দু-এক পয়সার পুজো পড়ত—কী এক-আধখানা কাপড়। বাড়তি আয় বলতে ঐটুকু। সে কিছুই নয়—কাজেই খাওয়ার আয়োজন ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। ডাল, আলুভাতে আর একটা যাহোক তরকারি এবং একটা টক্।

যখন যে আনাজ সস্তা—সেই আনাজই বেশী ব্যবহার করতেন মটরার মা, তাও বাইরের যারা অতিথি, এখন যাদের 'পেয়িং গেস্ট' বলা হয়—তাদেরই পাতে সেটা পড়ত। নিজেদের ঐ ডাল আর আলুভাতে যা করে।

রাতের জন্যেও নাকি সেই ডালই ঢালা থাকত, আর রুটি—দুবেলা উনুন জ্বালার খরচা পোষাত না।

ঐ বাড়ি, ঐ খাওয়া—অত দূর—মা যে বেশী দিন টিকে থাকতে পারবেন—তা মনে হয়নি।

কিন্তু উপচারের দৈন্য মটরার মা-র অন্তরের ঐশ্বর্যে ঢেকে গিয়েছিল।

অমন নিপাট ভালমানুষ, অমন যেন-সকলের-কাছে-অপরাধী—আমি আর দেখি নি। যত্ন করতেন বললে কিছু বলা হয় না, অতিথিদের যেন পুজো করতেন।

তাঁর সেই আন্তরিকতাতেই মা মায়ায় পড়ে গেলেন। দৈনিক প্রায় তিন মাইল হেঁটে যাওয়া-আসার কষ্টও আর তেমন অসহ্য মনে হ'ল না।

অসহ্য আমারও বোধ হয় নি। কথা ছিল আমি প্রথম প্রথম কয়েকদিন সঙ্গে গিয়ে মা-কে একটু 'সড়গড়' করে দেব, কিন্তু সে সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও আমি যেতেই লাগলুম।

এমনিতেই কাশীর ঐ ভ্যাপ্‌সা গন্ধওলা বাড়ি আর রৌদ্রবিরল গলি আমার ভাল লাগত।

আমরা বাঙালীটোলার বাইরে থাকতুম বলেই বোধহয় ভাল লাগত।

বিশেষ এই গলিগুলো—অন্ধকার জনবিরল অথচ পরিচ্ছন্ন। পরিচ্ছন্ন শব্দটা ইচ্ছে ক'রেই বললুম, কারণ সত্যিই তখন গলিগুলো এখনকার মতো অত নোংরা ছিল না। এখন যেমন চলাই যায় না—ঐটুকু পথ তাও আজকাল জঞ্জালে আবর্জনায় ভরে থাকে—তখন তা ছিল না।

কাশী বলতে যে ছবিটা আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, যে কাশীকে সুনীতি চাটুজ্যে মশাই ভেনিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন—সে কাশী আর নেই।

এখন যাদের জ্ঞান হচ্ছে তারা সে কাশীর কথা গল্প-উপন্যাসে পড়বে—কিন্তু ধারণা করতে পারবে না।

কাশীর এখন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে, বড় বড় চওড়া চওড়া রাস্তা, নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠছে, ধীরে ধীরে অন্য যে কোন বড় শহরেরই রূপ নিচ্ছে।

আমাদের পূর্বপুরুষদের তো বটেই, আমাদেরও—কাশী এই নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই—মনে আসে সত্য-কল্পনা-কিম্বদন্তীতে গড়া একটি আধ্যাত্মিক রূপ।

আর কোন তীর্থের নামেই এমনটা হয় না। কাশী সিদ্ধ-সাধক-শূন্য হবে না কোনদিন, একথা জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত শুনেছি।

চোখে দেখেছি বাঙালীটোলার গলিতে গলিতে— গণেশ মহল্লায়, অগস্ত্যকুণ্ডুতে, মান সরোবরে, ত্রিপুরাভৈরবীতে—অন্ধকার জরাজীর্ণ সব বাড়ি, তার মধ্যে এক এক দিকপাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত।

ভাঙা পুরনো মঠ-বাড়িতে বড় বড় নামকরা সন্ন্যাসী; ছত্রে ছত্রে কত বিদ্যার্থী নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণের আহারের ব্যবস্থা; মন্দিরে মন্দিরে সানাই-নহবৎ-শাঁখ-ঘণ্টা-ঘড়ির অপূর্ব ঐকতান; সামান্য মাসিক তিন টাকা কি পাঁচ টাকা আয়ে নিরাশ্রয় বিধবাদের আত্মসম্মান বজায় রেখে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা; দেখেছি রাত চারটে থেকে গঙ্গাস্নান-দর্শনের ভিড়, তিন-চারটি করে তণ্ডুলের কণা ভিক্ষা পেতে পেতে ভিখারীর সামনে প্রয়োজনের ঢের বেশী খাদ্য জমে উঠতে; শুনেছি এক্কা-ওলা, টাঙ্গা-ওলার মুখেও অপরিচিত পথিকদের প্রতি প্রীতি-স্নিগ্ধ সম্ভাষণ—'এ গুরু', 'এ রাজা', 'এ দাদা'—প্রভৃতি।

তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ।

তবু, কাশীর চিহ্ন অদ্যাপি কিছু আছে ঐ গলিগুলোতেই।

তবে বেশী দিন আর থাকবে না। কেদার পর্যন্ত তো রিক্সা যাচ্ছেই, শোনা যাচ্ছে বিশ্বনাথের গলি ভেঙে চওড়া রাস্তা বার করা হবে, বিদেশী টুরিস্ট্‌দের গাড়ি যাবার সুবিধে করতে।

উত্তর-প্রদেশের সাত্ত্বিক সরকারের জয় হোক!

আকর্ষণ আরও কিছু ছিল অবশ্য। সেটা মানবিক।

মটরার মার তিনটি ছেলেই অবতার বিশেষ। ছোটটার বয়স তখন বোধহয় বছর ষোল-সতেরো—দেখতে খুবই ভাল ছিল—কিন্তু সে আবার এক মাত্রা ওপরে। তার তখনই আর সিদ্ধি বা গাঁজা-চরসে সানাত না। বোতলও চলত মধ্যে মধ্যে। কে তাকে যোগাত এ সব খরচ তা কেউ জানত না। জনশ্রুতি—মদনপুরায় এক মুসলমান দোকানদারের সঙ্গে খুব ভাব ছিল, তার কাছ থেকেই কিছু কিছু পেত। তবে তার এক পয়সাও মা পেতেন না—তা বলাই বাহুল্য।

ছেলে তিনটিই বড়, তারপর দুটি মেয়ে—খেন্তি ও মেন্তি।

মেয়ে দুটি মার মতো স্বভাব পেয়েছিল, অমনি ঠাণ্ডা, অমনি সদা-বিনত ও বাধ্য।

মা বলতেন—'নেটিপেটি'।

ভূতের মতো খাটত মেয়ে দুটো মায়ের সঙ্গে—মার সঙ্গেই দাদাদের চড়টা-চাপড়টাও ভাগ্যে জুটত।

পেটভরে খেতেও পেত না বোধহয় বেচারীরা, কাপড় বলতে যৎপরোনাস্তি মোটা ও সস্তা দামের মিলের শাড়ি। দুখানার বেশি তিনখানা ছিল না কারও। বারো আনা চোদ্দ আনায় যা মিলত তখন, তাও দৈবাৎ দুখানাই ভিজে গেলে গামছা পরে থাকতে হ'ত। তবু এসব কাপড় ওদের নিজস্ব রোজগার। কুমারী-পুজোর পাওনা।

এদের মধ্যে খেন্তিই বড়—বোধহয় বছর দশ-এগারোর হবে, মেন্তি সম্ভবত আমার একবয়িসী।

ফুটফুটে মেয়ে. মটরার মার রঙ দুঃখে অভাবে-অনশনে পুড়ে গিয়েছিল, তবে ছেলেমেয়েরা সবাই ফরসা, মেন্তি তো বিশেষ করে—দুধে-আলতা রঙ একেবারে। মা বলতেন—'বসরাই গোলাপ'।

মেন্তির সঙ্গেই আমার ভাবটা বেশি হয়ে গিয়েছিল।

তার কারণ ওর দাদারা বিশেষ বাড়ি থাকত না, থাকলেও এমন গুণ্ডা-গুণ্ডা চেহারা আর ভাবভঙ্গি তাদের যে, কাছে ঘেঁষা যেত না, মুখের দিকে চাইলেই বুকের রক্ত জল হয়ে যেত। খেন্তি মার সঙ্গে সঙ্গে থাকত বেশির ভাগ—রান্নার পরও বসে সারা দুপুর-বিকেল মার সঙ্গেই কাগজের ঠোঙ্গা তৈরী করত। এক দোকানদার কাগজ দিয়ে যেত আবার ঠোঙ্গা বুঝে শুনে নিয়ে পয়সা দিয়ে যেত, সুতরাং খেন্তির পাত্তাই পাওয়া যেত না। মেন্তিকে খুব ভারী কোন কাজ দেওয়া যেত না বলেই তার একটু অবসর ছিল—আমার সঙ্গে গল্প করার।

শান্ত সুশ্রী মেয়েটি, হাসি-হাসি মুখ—গল্প বলার জন্যে তাগিদ করত, তাও ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি।

মেন্তির কথাটা মনে পড়লেই সেই ছবিটা আগে মনে আসে।...

মাস-ছয়েক বোধহয় ওখানে খেয়েছিলেন মা।

তারপর, ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রেই হাঁড়ি-হেঁসেল ধরলেন আবার।

আমাদের কষ্ট হচ্ছিল, তাছাড়া মার পক্ষেও বারো মাস অতদূর হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়—বর্ষায় তো ঠায় ভিজে ভিজে যাওয়া। তখন মহিলারা বিশেষ ছাতি ব্যবহার করতেন না। ঘরে রান্নার ব্যবস্থা না হলে চলে না।

তবে তাতে ক'রে মেস্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন হয় নি। গোসাঁইগিন্নীর কি রকম আত্মীয় হতেন ওঁরা। তাই খবর পাওয়া যেত মধ্যে মধ্যে।...

বছর দুই পরে হঠাৎ শোনা গেল—খেন্তির বিয়ে।

'সে কি!' মা চমকে উঠলেন, 'ওমা, খরচ কে দেবে? আর এই তো ওর সবে তেরো বছর বয়স!'

'তা হোক।' গোসাঁইগিন্নী বললেন, 'তেরো বছরে আমার কোলে ছেলে এসে গেছে। তাছাড়া, একটা যোগাযোগ হয়ে গেল—কোনমতে পার হয়ে যায় সে-ই ভাল। নইলে কে উয্যুগী হয়ে দাঁড়িয়ে ওর বে দেবে তাই শুনি? ঐ গাঁজাগুলিখোর পিচেশ ভাইগুলো?'

'তা খরচ?' মা পুনশ্চ প্রশ্ন করলেন।

'তারা এক পয়সাও নিচ্ছে না। আর নেবে কি—তেজবরে বর!...প্রথম পক্ষের একটা মেয়ে ছিল—গেল মাসেই তার বে দিয়ে দিয়েছে—বোধহয় নিজে আর-একটা বৌ কাড়বে বলেই—দ্বিতীয় পক্ষেরও দুটো বাচ্চা আছে, তাই বলে বয়েস বেশি নয়, চল্লিশ হবে—কি আর দু-এক বছর বড়জোর। রেলে কাজ করে, এলাহাবাদ আতরসুইয়াতে নিজেদের বাড়ি—সে-সব আমি খোঁজ নিয়েছি। লোকটা ভাল। গয়নাপত্তর সব সে-ই দেবে, আশীর্বাদের দিনই দিতে চেয়েছিল, আমিই বলেছি, 'খবরদার, চোখের সামনে সোনা দেখলে গুণ্ডাগুলো কি আর এক কুঁচিও রাখবে! ঐ সম্প্রদানের সময়ই পরিয়ে দেবে একেবারে।'

'তা ঘর-খরচ? দানসামিগ্‌গির?'

মা তবু যেন বিশ্বাস করতে চান না কথাটা।

'সে হয়েই যাবে একরকম করে, ভিক্ষেদুঃখ্যু করে, মেগেপেতে। কন্যেদায় কি আর ঐ জন্যে আটকে থাকে?...দু-এক টাকা ক'রে দিচ্ছে সবাই—তোর কাছেও আসবে এখন, ভয় নেই!'

হাসলেন গোসাঁই দিদিমা।

তেরো বছরের মেয়ে, চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বর, তাও তিনটে ছেলেমেয়ে সুদ্ধ।

মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন শুধু।

উপায় যে কিছু নেই এছাড়া—তা তিনিও বুঝছেন। গোসাঁইগিন্নী আরও একটা কথাতে সব মুখ মেরে দিলেন, 'আর কিছু না হোক, ছুঁড়িটা দুবেলা পেটভরে খেতে পাবে তো অন্তত—দস্যি দাদাদের অষ্টপ্রহর ঐ হুমকি আর দুদ্দাড় মার থেকেও বাঁচবে। সেও কম নয়।'

সত্যিই মেগেপেতে একরকম করে বিয়েটা হয়ে গেল।

আমরাও গিয়েছিলাম। বেশ বর—সৌম্য শান্ত ভদ্রলোক, দু-এক গাছা চুলে পাক ধরেছে, তবে বুড়ো নয়। খেন্তি বেঁচে গেল সত্যি-সত্যিই। অনেকদিন পরে একবার ওদের আতরসুইয়ার বাড়িতে গিয়েছিলাম খুঁজে খুঁজে—দেখেছিলাম ভালই আছে খেন্তি। খুব একটা স্বচ্ছল অবস্থা নয়, তবু শান্তিতে আছে। ওরও দুটো ছেলে হয়েছে, সতীনপোরাও খুব বশ, নিজের নয়—তা বোঝা যায় না।

খেন্তির বিয়ের বছর দুই পরেই আমরা কলকাতা চলে এলাম, কাশীর সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেল অনেকখানি।

তবে চিঠিপত্র আসা-যাওয়া ছিল, তাইতেই একসময় খবর পেলাম মেন্তিরও খুব ভাল বিয়ে হয়ে গেছে।

একেবারেই দৈবাৎ, গঙ্গার ঘাটে ওকে দেখে বরের মা নাকি বাড়ি বয়ে এসে সম্বন্ধ করেছেন। এক পয়সা তো নেনই নি—উল্‌টে এদের ঘরখরচাও নাকি তাঁরা দিয়েছেন।

বৃন্দাবনে ভৃঙ্গারবটের গোসাঁইবাড়ি বিয়ে হয়েছে, হীরের মুকুট পরিয়ে বৌকে নিয়ে গেছে তারা। মথুরা থেকে নাকি হাতীঘোড়ার রেশেলা করে বর-বৌ বাড়ি ফিরেছে।

খবরটা শুনে আশ্চর্য হই নি আমরা।

অমন সুন্দরী মেয়ে—যে দেখবে তারই পছন্দ হবে।

চোখ নাক মুখ হয়ত অত কাটা কাটা নয়, তবে সব মানানসই, রং-এর তো কথাই নেই, গড়নও বেশ সুডৌল।

আর সবচেয়ে যা চোখে লাগে, সে ওর শান্ত বিনম্র ভাব। তার সঙ্গে মুখের হাসি-হাসি ভাবটি।

মা খুবই আনন্দ করলেন খবর পেয়ে। বললেন, 'দিদিকে ভগবান অসুমর দুঃখ দিয়েছেন—তবু, মেয়ে দুটোর যে ভাল হিল্লে হ'ল—এইটেই একটু মুখ তুলে চাওয়া বুঝতে হবে। আহা, এমন মানুষটার কী দুঃখু, সত্যি!...ভগবান একদিক ভাঙ্গেন একদিক গড়েন—জামাই দুটো ভাল হ'ল সেইটেই সুরাহা। বুড়ো বয়সে মেয়েরাই দেখবে।'......

এর বছর দুই পরে বৃন্দাবনে গেলাম। মার অতটা মনে ছিল না, আমিই তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম, 'এইখানেই কোথায় মেন্তির বিয়ে হয়েছিল না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও তো বটে। ভৃঙ্গারবটের গোসাঁইবাড়ি বলে শুনেছি—'

ব্রজবাসী বা পাণ্ডাকে বলতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ মা, ও তো এক প্রধান দর্শন। আমি এমনিই নিয়ে যেতাম। যমুনার ধারে—ভারি ভাল জায়গাটা।'

দশ-বারো দিন পরে একদিন বিকেলে ব্রজবাসী সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন ভৃঙ্গারবটে। যমুনার ধারে বেশ বড় বাড়ি, ঠাকুরবাড়ি আর গোসাঁইদের বসত বাড়ি লাগোয়া।

আমরা যখন গেলাম তখন মন্দির একেবারে জনহীন, কোন পূজারী কি দর্শনার্থী—কেউ নেই। মা দর্শন করে নাটমন্দির থেকে উঠানে নেমে একটু বিমূঢ়ভাবেই এদিক ওদিক চাইছেন—কাকে ধরে খোঁজখবর করবেন ভাবছেন—কোথা থেকে ঝড়ের মতো ছুটতে ছুটতে এসে মেন্তি একেবারে মাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠল, 'ওগো মাসিমা গো, এদ্দিন পরে আমাকে মনে পড়ল তোমার। সব্বাই—মা সুদ্ধ আমাকে ভুলে গেছে, কেউ খবর নেয় না—। কেন, আমি কী করেছি!'

'ওরে থাম্ থাম্, চুপ কর্। কাঁদছিস কেন, এই দ্যাখো পাগল—' মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যেই কোথা থেকে সেই রঙ্গমঞ্চে আর একটি মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আমরা কেউ টের পাই নি।

মধ্যবয়সী একটি স্ত্রীলোক, গৌর বর্ণ, বয়সকালে হয়ত রূপসীই ছিলেন—নাকে

তিলক, গলায় কণ্ঠী, দামী থান-ধুতি পরনে—হাতে কুঁড়োজালিতে মালা—জপ না হলেও ঘুরে যাচ্ছে।

কখন এসেছেন, মেস্তির সঙ্গেই কি না, কেউ দেখি নি। কিন্তু যিনি এসেছেন তিনি নিজের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিতে জানেন। একেবারে যখন তাঁর চাপা অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বেজে উঠল, তখনই চমকে চেয়ে দেখলুম।

'বলি আপনারা—আপনি এর কে হন জানতে পারি কি?' প্রশ্নটা মার দিকেই ফিরে।

অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠস্বর, বড় বেশী শান্ত। শান্ত না ব'লে বরং শানিত বলাই উচিত।

আমরা সবাই চমকে উঠলেও আশ্চর্য পরিবর্তন দেখলুম মেস্তির।

নিমেষে যেন শিটিয়ে কাঠ হয়ে উঠল সে। তখনও সন্ধ্যা হয় নি, দেখার কোন অসুবিধে নেই—সমস্ত মুখখানাও সেই সঙ্গে বিবর্ণ রক্তহীন হয়ে গেল।

এমন অবস্থা সবটা জড়িয়ে যে—মনে হল এখনই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যাবে সে।

আর সেই সময়ই আমার চোখে পড়ল তার একান্ত দীন বেশ।

হীরের টায়রা মাথায় হাতীতে চড়ে যে বৌ এ-বাড়ি এসেছে—তার এ বেশভূষা একেবারেই বে-মানান। সাধারণ একখানা আধময়লা মিলের শাড়ি পরনে, হাতের শাঁখার সঙ্গে একগাছি করে চুড়ি! এ ছাড়া সম্পূর্ণ নিরাভরণ, গলায় এক ছড়া হার পর্যন্ত নেই! চেহারাও—এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম—বেশ খারাপ হয়ে গেছে। রোগা তো হয়েছেই, অমন দুধে-আলতা রঙ, তারও সে জেল্লা নেই আর।

অর্থাৎ এখানে সে সুখেও নেই, স্বচ্ছন্দেও নেই।

মার এত সব লক্ষ্য করার অবসরও মিলল না, তিনি এই আকস্মিক প্রশ্ন ও প্রশ্নের ধরনে থতমত খেয়ে গিয়ে জবাব দিলেন, 'আমি—এই সম্পর্কে ওর মাসী হই।'

'ভাল। মাসী মানে তো গুরুজন, গুরুজন নিজেদের মেয়েকে সৎশিক্ষা দেবেন এইটেই তো আমরা আশা করব। বাপের বাড়িতে কোন শিক্ষাই পায় নি—তাই এমন ক'রে ছুটে বেরিয়ে এসে কথা বলে ও, কিন্তু আপনি কোন্ আক্কেলে সেটার প্রশ্রয় দিলেন? যতই হোক, এটা বারমহল, অন্য মহাজনের যেমন ব্যবসার গদী হয়, এটাও আমাদের তাই। বলি আমাদেরও তো এটা এক রকমের কারবার ছাড়া কিছু নয়, ঠাকুরকে ভাঙিয়ে খাওয়া আমাদের—এখানে নানা রঙের লোক আসছে-যাচ্ছে, কত জাতের কত রীত-চরিত্রের লোক—এটা কি কুলের বৌয়ের সঙ্গে দেখা করার মতো জায়গা?'

এই প্রথম দেখলুম মা একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন। বেশ একটু সময় লাগল আক্রমণের বেগটা সামলে নিতে।

তার পর বললেন, 'কিন্তু আমি তো ঠিক এখানে দেখা করব ব'লে আসি নি, ভেতরেই যেতুম খোঁজ করতে—ও এসে পড়ল বলেই—তাও তো বোধহয় এক মিনিটও হয় নি।'

'আধ মিনিটই বা হবে কেন মা. আপনি ওর কথার জবাবই বা দেবেন কেন। ও না হয় অলবড্ডে ধাঙ্গড়ী, বাপের বাড়িতে কোন শিক্ষা-দীক্ষাই পায় নি, বড় বংশের মান-ইজ্জৎ বোঝার কথা নয় ওর—কিন্তু আপনার তো জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে, আপনার কি তখনই উচিত ছিল না—একটিও কথা না ব'লে ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়া কিম্বা নিজেই বেরিয়ে চলে যাওয়া?...আপনি ওর কী রকম মাসী হন তা জানি না, তবে যদি ওর মার সঙ্গে কোনদিন দেখা হয় তো বলবেন, বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে আসা ঠিক হয় নি, এ-বাড়িতে ওঁদের মতো ঘরের মেয়ে দেওয়া অন্যায় হয়েছে।'

এর মধ্যেই পা-পা করে মেন্তি ভেতরে চলে গেছে। আমি লক্ষ্য করে দেখলুম পা দুটো ওর ঠক ঠক করে কাঁপছে।

এই অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদে একটি কথাও বলার সাহস হ'ল না ওর—এমন কি যাওয়ার সময় আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখারও না।

এতক্ষণে কিন্তু মা নিজেকে সামলে নিয়েছেন।

তাঁর রগের দু পাশের শিরা দুটো ফুলে ওঠা দেখে বুঝলুম ভেতরে ভেতরে তাঁর রাগ চড়ছে। তিনি বললেন, 'দেবার কথা কেন তুলছেন, শুনেছি তো আপনারাই উপযাচক হ'য়ে এনেছেন।'

'অন্যায় হয়েছে, ঘাট হয়েছে। মানছি তা। তবে একটা অন্যায় তো আর একটা অন্যায়ের কৈফিয়ৎ হ'তে পারে না মা। আমার মা বুড়ো মানুষ, বুড়ো হ'লে মতিভ্রম হয়—দেখে পছন্দ হয়েছে তো গলে গেছেন একেবারে। তাছাড়া শুনেছেন নাকি বড় বংশ, ওর মা নাকি গোসাঁই ঘরেরই মেয়ে, কোন সহবৎ-শিক্ষাই যে মেয়েকে দেয় নি তা মার পক্ষে ভাবার কথাও নয়। এমন যে ডাহা ময়লায় হাত পড়েছে, নেশাখোরদের বাড়ির আবর বেতরবিয়ৎ মেয়ে, কোন রকমের শিক্ষাই পায় নি সেটা তো আমরা বিয়ের পর জানলুম। আমাদের এমনভাবে ধোঁকা দেওয়াও উচিত হয় নি আপনার বোনের।'

'তা আপনি ওর কে হন জানতে পারি কি?' মাও বেশ যেন শানিত কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন।

'আমি ওর বড় ননদ হই, বরের বড় দিদি।'

'তা হ'লে তো ওর মা আপনারও গুরুজন হন। তাঁর সম্বন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করছেন—তাতেও তো খুব শিক্ষা কি সহবৎ প্রকাশ পাচ্ছে না।'

এবার মুখোশটা একেবারেই খসে পড়ল, মহিলা বিষাক্ত কণ্ঠে বললেন, 'ছোটলোকে আর ভদ্দরলোকে কুটম্বিতে হয় না। অমনতর লোককে আত্মীয় কুটুম বলে স্বীকার করলে আমাদের আত্মীয়-মহলে কি শিষ্য-সেবকদের কাছে মুখ দেখাব কি করে?......যাক, এসেছেন, দাঁড়ান এইখানে—প্রসাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি নিয়ে যান।'

এই বলে বাতাসে ঈষৎ আতরের সুগন্ধ ছড়িয়ে তিনি সেই পাশের দ্বারপথেই ভেতরে চলে গেলেন।

বলা বাহুল্য, আমরা আর ওঁর প্রসাদের জন্যে দাঁড়াই নি। উদ্দিষ্ট বিগ্রহকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।

মার দুই চোখ তখন ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। ঐটুকু দুধের মেয়ে—এই চেড়িদের হাতে কত নির্যাতনই না সইছে, ভেবে তাঁর চোখের জল আর বাধা মানছিল না। মনে হ'ল এ-যাত্রা এই তীর্থ-ভ্রমণটাই তাঁর বিষাক্ত হ'য়ে গেল।

এর পর বহুদিন আর ওদের কোন খবর পাই নি।

অনেক ক'বছর পরে আবার কাশীতে এসে মাসখানেক থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ই মনে পড়ল মেন্তি বেচারীর কথাটা।.......খবর নেওয়াও শক্ত, গোসাঁইগিন্নী যদিচ তখনও বেঁচে আছেন শুনলুম, তবে সে আগের বাড়িতে আর থাকেন না। ননদ মারা যেতে কোন্‌ এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন।

তবু বিস্তর চেষ্টা-চরিত্র ক'রে খুঁজে বার করলুম একদিন।

অনেক বয়স হয়েছে, তালগোল পাকিয়ে গেছেন একেবারে, বহুক্ষণ ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থেকে তবে চিনতে পারলেন। মেত্তির কথা জিজ্ঞাসা করতেই কেঁদে ফেললেন, বললেন, 'ওরে তার দুর্দশার কথা আর বলিস নি—কি কপাল করে যে এসেছিল মেয়েটা—এমন বরাত যেন অতিবড় শত্তুরও না করে আসে। খুব বে দিয়েছিল মা মাগী, শ্বশুরবাড়ি তো নয়—জবাই হবার জন্যে সাক্ষাৎ কসাইদের বাড়ি দিয়েছিল।....এর চেয়ে গায়ে তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারাও ভাল ছিল। বরটা গাড়ল, আধা পাগলের মতো, শাশুড়ি মাগী মেয়েদের ভয়ে কাঁটা—ঐ রহলা-দহলা দুই বিধবা বোনই সংসারের আসল গিন্নী। সান্দর বৌ আসতে দেখেই ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছল, ভেবেছিল এবার ভাই বোধহয় বৌয়ের বশ হয়ে পড়বে। তাই সেই প্রেথম থেকেই আদাজল খেয়ে লেগেছিল। সেই যা বের কদিন, তার পর থেকে কোনদিন একটা গয়না কি একখানা ভাল কাপড় পরতে দেয় নি। ঝিয়ের মতো রেখেছিল। পেট ভরে নাকি খেতে পজ্জন্ত দিত না! তাই যে রাত্তিরটা একটু শান্তিতে কাটবে—তারই কি জো আছে—বরের সঙ্গে শোওয়ার হুকুম ছিল না। বড় ননদের সঙ্গে শুতে হত। কী সমাচার, না ছেলেমানুষ বৌ, এখন পোয়াতি হলে বাচ্চা রুগ্‌ণ হবে! আরও জো পেয়ে গিয়েছিল—বাপের বাড়ির তো কোন জোর ছিল না, তত্ত্বতাবাস কি একদিন খোঁজখবরও কেউ করত না। ওরা বুঝে নিয়েছিল যে কোন চুলোয় কেউ নেই, দু পায়ে থ্যাঁতলাব, তা-ই সহ্য করবে।'

বলতে বলতে হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন গোসাঁইগিন্নী। খানিক চুপ ক'রে থেকে দম নিয়ে আবার বললেন, 'ওরা একটা ছুতো খুঁজছিলই, ওরই অদেষ্টে সে ছুতো ঘরে গিয়ে পঁউছাল। তোরা নাকি একদিন দেখা করতে গিয়েছিলি বিন্দাবনে,—সে-ই উত্তম সুযোগ মিলল। তোর সঙ্গে বদনাম তুলে দিলে, বললে কিনা ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে খুব ভাব ছেল, বে'র আগেই ওর সঙ্গে নষ্ট হয়েছে। তাই দিনরাত এমনধারা মনমরা হয়ে থাকে, ফোঁস ফোঁস ক'রে নিশ্বেস ছাড়ে, বরের সঙ্গে শুতে চায় না। যতই আমরা বারণ করি—ডব্‌কা মেয়ে—পেছটান না থাকলে ঠিক বরের সঙ্গে ভাব ক'রে নিত। বলি আমরা তো আর দিনরাত পাহারা দিই না। গাই-বাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে পিইয়ে আসে। আসলে ওর মন পড়ে আছে ঐ রসালো নাগরের কাছে। মাসী না ছাই, বামুন শুদ্দুর তফাত লোক কথায় বলে, বামুনের আবার কায়েৎ মাসী কি?......বোঝ্ কথা, নিজেরা বজ্জর আঁটনে বেঁধে রেখেছে—দোষ হ'ল বোয়ের। ঐ একরত্তি মেয়ে, আর ইদিকে দুই দজ্জাল ননদ, তার সাধ্যি কি ওদের চোখ এড়িয়ে বরের কাছে যায়!'

আমি ব্যাকুল হয়ে উঠি, 'কিন্তু আমরা যে এক বয়িসী দিদিমা!'

'সে কি আমি জানি নি? আসলে ওটা তো ছুতো বৈ কিছু নয়। সেই কথামালায় পড়িস নি, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না? তোর শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে ছাওয়ালো গড়ন তো, বলে ওর কম্‌সে কম উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস হবে।—তা শোন্, মেয়েটার দুর্গতি, সেই বদনাম তুলে ভাইটাকে বোঝালে এ নষ্ট মেয়েমানুষ ঘরে থাকলে ঠাকুরের কোপ লাগবে—কোন শিষ্য-সেবক আর থাকবে না। তাকে অমনি বোকা বুঝিয়ে দারোয়ান ঝি সঙ্গে দিয়ে এক কাপড়ে মেয়েটাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে।....মা মাগী তো ঐ হাবাগোবা, আর কীই বা করবে, পয়সা তো নেই যে নালিশ মকদ্দমা করবে কি গিয়ে ঝগড়া করবে। দুই মায়ে ঝিয়ে চোখের জলে ভাত মেখে খেতে লাগল,—যাকে বলে!'

একটানা বলতে পারেন না গোসাঁই দিদিমা, হাঁপ ধরে। তবু বিশ্রামও নিতে পারেন

না বেশীক্ষণ। কথাগুলো যেন অনেকদিন ধরে জমে ছিল বুকের মধ্যে। বার করে না দিতে পারলে ছুটিও নেই, শান্তিও নেই।

তাই এক মুহূর্ত থেমেই আবার বলেন, 'তাতেই কি দুগ্‌গতির শেষ হ'ল? ওদিকে তো খোয়ারের একশেষ। ইদিকে ঐ গুণধর মাতাল ছোট দাদাটা, মটরা—বোনটা দিব্যি দেখতে হয়েছে দেখে—দালাল লাগিয়ে এক তান্ত্রিক সাধুর কাছে বেচে দিলে। একদিন সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল কাপড় কিনে দেবে বলে—আর পাত্তা নেই। মা কান্নাকাটি করলে তেড়ে আসে, বলে দুখানা ক'রে কেটে ফেলব, তোর মেয়ে বেরিয়ে গেছে—আমি কি করব!...কী হয়েছে কেউ কি টের পেতুম? নিহাৎ ছোটর হাতে অনেক পয়সা এসেছে—দুহাতে খরচ করছে, খুব নপ্‌চপানি—দেদার মদমাংস চলছে দেখে বড় দুজনার খুব হিংসে হ'ল, একদিন খুব ঝগড়াঝাঁটি দাঙ্গা—তাতেই অমানুষিক মারের চোটে প্রেকাশ পেল কথাটা।...তা তখন আর চারা কি, কোথায় সে সাধু থাকে কি বিত্তান্ত কেউ জানে না, আর কার কি গরজই বা—ও মেয়ে ঘরে ফিরিয়ে এনেই বা কি করবে? তার কি আর কিছু আদায় আছে? বলে উত্তর-সাধিকা—আসলে নষ্ট করা ছাড়া তো কিছু নয়! আর বোনের জন্যে ওদের দুখদরদেরও সীমে নেই, ওদের তো ঘুম হচ্ছে না একেবারে। ত্যাখন পয়সার গন্ধ পেয়েছিল তাই অত দরদ। মটরাটা নাকি অনেক পয়সা খেয়েছিল, এমন তো পাওয়া যায় না। বামুনের সধবা মেয়ে অথচ সোয়ামীর সঙ্গে সম্পক্ক হয় নি—এ যে তান্ত্রিকদের কাছে দুল্লভ জিনিস একেবারে। ওদের কী সব তপিস্যে আছে, তাইতে লাগে।'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করলেন গোসাঁই দিদিমা। অনেক বকেছেন, আর তাঁর সাধ্যও নেই, এইতেই হাপরের মতো হাঁপাচ্ছেন বসে।

কিন্তু আমার আর তখন ধৈর্য মানছে না, আমি বললুম, 'তারপর? আর কোন খোঁজই পাওয়া যায় নি?'

'কে খোঁজ করবে বল? ও মেয়েকে দিয়ে তো আর কোন কাজ হবে না, শুধু শুধু গলায় পাথর ঝোলাতে যাবে কে? আগুনের খাপরা মেয়ে—আগলাতেই প্রাণান্ত। আর মা মাগী বেঁচে থাকলেও তবু কথা ছিল, তার মায়ের প্রাণ—হাকড়-মাকড় করত।'

'ও, মাসিমা মারা গেছেন?'

'বেঁচেছেন বল! হাড় জুড়িয়েছে। কিছু তো ছেল না দেহে, কোনমতে ধাধসে কাজ ক'রে যেত। তার ওপর এই আঘাতটাতে একেবারে শেষ ক'রে দিলে। ছোট মেয়ে কোলের সন্তান।...কে জানে ইচ্ছে ক'রে কি না, কিম্বা কেউ ধাক্কাই দিয়েছে, কিম্বা মাথাই ঘুরে গেছে—একটা সুয্যি-গেরনের দিন নাইতে গেল গঙ্গায়—আর ফিরল না। ডুবেছে কি না—কেউ লক্ষ্যও করে নি অত, ভিড়ে কে কার খবর রাখছে বল! পরের দিন মড়াটা গিয়ে পঞ্চ-গঙ্গার কাছে আটকে ছিল—পুলিস তুলে ট্যাড়া পিটিয়ে সনাক্ত করাল।...বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে! শুধু শুধু বেঁচে থেকে আরও খানিক বিড়ম্বনা ভোগ করা বৈ তো নয়! এই তো আমাকেই দ্যাখ না—'

এইবার নিজের উনপঞ্চাশ রকমের রোগের ফিরিস্তি দিতে বসলেন তিনি। কোনমতে আরও মিনিট দশেক হুঁ হাঁ দিয়ে 'আবার আসব' বলে উঠে পড়লুম।

সে যাত্রা আর হয় নি। আরও বছর খানেক পরে গিয়ে খুঁজে বার করেছিলুম মেন্তিকে বিস্তর ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল অবশ্য। মেজ ভাই ভোঁদাকে এক বোতল আধাবিলিতি

মদের দাম কবলাতে সে নাম-ঠিকানা বলেছিল, তবে সে ঠিকানায় পাওয়া যায় নি। অনেকদিন আগেই নাকি তারা সেখান থেকে চলে গিয়েছে। কেউ বললে, আদি কেশবের দিকে, কেউ বললে গৈবির কাছে। শুধু একজন বললে, বিন্ধ্যাচলে অষ্টভূজার পাহাড়ের কোলে ঘর বেঁধে থাকেন সে সন্ন্যাসী। খুব উঁচুদরের সাধু, রাতকে দিন করতে পারেন ইচ্ছে করলে। তাঁর ভৈরবী মাও খুব বড় সাধিকা, দুর্গা-প্রতিমার মতো চেহারা, তেমনি শক্তি। সাক্ষাৎ অষ্টভূজাই। ইত্যাদি—

ঐ ঠিকানাতেই পাওয়া গেল।

তখন এত বাস্-এর সুবিধে ছিল না, মির্জাপুর থেকে এক্কা ক'রে যাওয়া, পৌঁছে খুঁজে বার করতে করতে সন্ধ্যে উৎরে গেল।...একটা সামান্য ঝোপ্ড়ার মতো ঘর, পাতা-লতা দিয়ে তৈরি, ওপরে বোধহয় ঘাসেরই চালা। দরজা বন্ধ ছিল, তবে পাতার ফাঁক দিয়ে আলো আসতে দেখে ভরসা ক'রে আস্তে দরজায় ধাক্কা দিলুম।...একটু ভয়ই করছিল, কী রকম তান্ত্রিক সাধু কে জানে, হয়ত ত্রিশূল কি খাঁড়া নিয়ে তেড়ে আসবে।

কিন্তু দরজা খুলে আলো হাতে যে বেরিয়ে এল, সে সাধু নয়—সাধিকা, ভৈরবী স্বয়ং। সে মেন্তিই।

অনেক পরিবর্তন হয়েছে তার। সেদিনের সে শীর্ণ ত্রস্তা মেয়েটি আজ পূর্ণ-যৌবনা, দীপ্তিময়ী। সেদিন যাকে কোনমতে সুশ্রী বলা চলত, আজ সে রূপসী। তবে সাধারণ অর্থে নয়, সেই লোকটিই ঠিক বলেছিল, সত্যিসত্যিই এ রূপ দেবী-প্রতিমার মতো। তার মুখেচোখে এমনই একটি শান্ত সমাহিত ভাব, যে দেখলে শ্রদ্ধাই জাগে, লালসা নয়।

তার পাশ দিয়ে ঘরের মধ্যেটাও দেখে নিয়েছি এক নজর, সেখানেও আলো জ্বলছে, বেশ জোর—একটি বড় প্রদীপে। তার সামনে একটা বাঘছালের ওপর সেই বাঘের মাথাই উপাধান ক'রে শুয়ে আছেন দীর্ঘদেহ একটি পুরুষ।

বাঙালী নয় খুব সম্ভব, কারণ এমন বলিষ্ঠ দেহ বাঙালীর মধ্যে দুর্লভ। তাঁরও উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। বড় বড় দাড়ি গোঁফ, একমাথা ঝাঁকড়া চুল—কাঁচা-পাকায় মেশা, তবে পাকার ভাগই বেশী। প্রশস্ত লোমশ বুকে মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে রক্তচন্দনের আঙ্গুলে টানা প্রলেপ, তার মধ্যে একটি সিঁদুরের ফোঁটা। ভয়ঙ্কর আদৌ নন। বেশ একটু শ্রদ্ধারই উদ্রেক হয় তাঁর দিকে তাকালে। মুখে ঈষৎ কৌতুকমাখা প্রসন্ন হাসি—মনে হ'ল তিনি আমার প্রত্যাশাই করছিলেন, আর তার জন্যে কোন বিরূপতা নেই মনে, বরং অভ্যর্থনা করতেই প্রস্তুত।...

কত কি বলার ছিল, কত কথা বলব বলে মনে মনে তৈরি হয়ে এসেছিলুম—কিছুই বলা হল না। শুধু, কেমন একটু থতমত খেয়ে নামটাই উচ্চারণ করলুম, 'মেন্তি!'

একটু হাসল সে। প্রসন্ন মধুর হাসি। বলল, 'এস, ভেতরে এস। উনি এই একটু আগেই বলছিলেন যে, তোমার সেই বন্ধু আসছেন। চায়ের জল চড়াতে বলছিলেন।'

আরও যেন গোলমাল হয়ে গেল মাথার মধ্যেটায়। আত্মীয়তা করতে আসি নি, এ ধরনের অভ্যর্থনার জন্যেও না। বরং বিপরীত মনোভাব নিয়েই এসেছি। তাই কতকটা আম্‌তা আম্‌তা করেই বললুম, 'আমি—আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি মেন্তি।'

মেন্তি কোন বিস্ময় প্রকাশ করল না, প্রবল প্রতিবাদও করল না। শুধু তেমনি শান্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করল, 'কোথায়?'

'আ—আমাদের বাড়ি। আমার মায়ের কাছে থাকবে—।'

'তারপর? কী করবে আমাকে নিয়ে?'

'তুমি—মানে তুমি যাতে আত্মসম্মান বজায় রেখে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারো—'

আবারও হাসল সে। এবার বেশ শব্দ করেই। মনে হ'ল যেন সে এতক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে পরিহাসই করছে।

'সেটা কি ভাবে হবে বলতে পারো ভূতু? আমায় বিয়ে দিতে পারবে আবার?...তুমি বিয়ে করবে? পারবে? সে সাহস আছে? মা রাজী হবেন? আলাদা সংসার পাততে পারবে আমাকে নিয়ে? আর কিভাবে আত্মসম্মান বজায় রেখে স্বাভাবিক জীবন যাপন করব বলো? এক চাকরি-বাকরি করা—আর নয় তো বিয়ে, তা তেমন লেখাপড়া জানি না যে চাকরি করতে পারব। এখন লেখাপড়া শিখে পাস ক'রে চাকরি করতে গেলে অন্তত সাত আট বছর লাগবে। এই সময়টা খাব কি, থাকব কোথায়? তোমার বাড়ি থাকলে—যে মিথ্যে দুর্নামে আমাকে তাড়িয়েছিল তারা, সেই দুর্নামটাই সকলে বিশ্বাস করবে। আর যাই হোক সেটা আমি সইতে পারব না।'

এসব যুক্তির জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসি নি। কোন রকম বিরোধিতার জন্যেও না। কল্পনা করেছিলুম—আমাকে দেখে মুক্তি পেল এই কথাই ভাববে, তখনই চলে আসতে চাইবে। বাধা যদি কেউ দেয় তো সে ঐ সাধুটাই দেবে। কেমন যেন মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে গেল সব। বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে বলতে গেলুম, 'তাই বলে এই অসম্মানের মধ্যে জীবনটা কাটবে?...না না, আমার জন্যেই তোমার এই লাঞ্ছনা, তুমি চলো—আমি যেমন ক'রে হোক চালাব!'

'যে মেয়ের বাপভাই অমানুষ, যাকে স্বামী নেয় না—তার তো বেঁচে থাকাটাই অসম্মান—তাকে তুমি সম্মান ফিরিয়ে দেবে কেমন ক'রে? আর লাঞ্ছনা কে বললে তোমাকে?...এখনও অনেক জিনিস তোমার জানতে বাকী আছে ভূতু!...তবে সে সব কথা তোমাকে বোঝাতেও পারব না। এইটুকু শুধু জেনে রাখো, আমি ভালোই আছি। সুখে না হোক, ভোগবিলাসে না হোক—শান্তিতে আছি। পরম শান্তি।...না, আমার জন্যে দুঃখু করো না, উদ্ধার করারও চেষ্টা করো না। বছর কতক আগে যদি আসতে তো শোভা পেত।...তখন—ইনি না দয়া করলে হয়ত সত্যিই বাজারে নাম লেখাতে হ'ত। ভায়েরাই রোজগার করাত।...এই একটা সুকৃতি ছিল, এঁর আশ্রয় পেয়েছি। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাও, আমার জন্যে ভেবো না।'

কেমন একটা রাগ হয়ে গেল, সেই সঙ্গে অসহ একটা বিদ্বেষও ঐ লোকটা সম্বন্ধে, যে সেই থেকে নিঃশব্দে শুয়ে শুয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। বললুম, 'আমি পুলিস নিয়ে এসে তোমাকে নিয়ে যাব! কেউ আটকাতে পারবে না। ব্যাটা ভণ্ড—তোমাকে ভয় দেখিয়ে এসব শিখিয়ে রেখেছে!'

এবার খিলখিল করে হেসে উঠল মেন্তি, 'ওমা, তুমি আমাকে পুলিস ডেকে নিয়ে যাবে কোন্ অধিকারে? তুমি কোন্ অভিভাবক আমার?...আর উনি যদি ভণ্ডই হবেন তো এদ্দিন পরে তুমি আসছ খুঁজে খুঁজে—সেটা টের পাবেন কেমন ক'রে যে—শিখিয়ে পড়িয়ে রাখবেন?...ওসব পাগলামি ছাড়ো—ঘরে এসে বসো। চা খাও, চাই কি রাত্রের

খাওয়াটাও সেরে যাও—কোথায় কি জুটবে তার ঠিক নেই। দ্যাখো, আমি নিজে রেঁধে খাওয়াব—!'

আর আমি দাঁড়াতে পারলুম না। এমন হার-মানা বোধহয় আর কখনও মানি নি, এমন অপদস্থ-বোধও করি নি।

এক্কায় চাপতে চাপতে শুনলুম—ভেতর থেকে মিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠে লোকটি বলছে, 'ওঁকে আর টানাটানি ক'রো না তারা, এতটা উনি সইতে পারবেন না একদিনেই—'

এর বহুদিন পরে আর একবার দেখেছিলাম মেন্তি বা তারা ভৈরবীকে।

সেও কি একটা যোগের দিন, অহল্যাবাঈ ঘাটে নাইতে নামছি, সে স্নান ক'রে গঙ্গাজলের ঘটি হাতে চলে গেল। তেমনি স্থির সৌদামিনীর মতো রূপ, তেমনি আত্মসমাহিত ভাব। পরনে লাল কাপড়, হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা—কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। ঘাটের দুপাশে অসংখ্য লোক, পাণ্ডারা পর্যন্ত ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে।

যেতে যেতে আমার চোখে চোখ পড়ল একবার। মনে হ'ল—আমার অনুমান—কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল ওর দৃষ্টি আমার চোখের ওপর, কিন্তু সে ঠিক কয়েক মুহূর্তই, আমাকে চিনতে পারল কিনা তা তার আচরণে বা দৃষ্টিতে প্রকাশ পেল না। যেমন যাচ্ছিল তেমনি শান্ত ধীরভাবেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে গেল।

গ্রন্থারম্ভ

॥ ১ ॥

এতক্ষণ যা বললুম—এ গল্পটা না বললেও হয়ত চলত।

আসল যে গল্প, যার গল্প বলতে বসেছি—তার সঙ্গে ও কাহিনীর খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। অন্তত বাইরের স্থূল সম্পর্ক।

দুই কাহিনীর যোগসূত্র অন্য। পৃষ্ঠপট কাল—একই। পাত্র-পাত্রীও কেউ কেউ। এরা আমারই দেখা লোক, আমারই আত্মীয় বা আত্মীয়তুল্য। আমার জীবনে আজও এরা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে।

যে সময়ের কথা বলছি—সে সময়ে এই শ্রেণীর মানুষগুলো একই রকম ছিল, একই ধরনের আচার-আচরণ ছিল তাদের।

যোগসূত্রটা সেইখানেই।

পৃষ্ঠপট আমার বাল্যের দেখা কাশী। অবশ্য সবটাই দেখা নয়, কিছুটা শোনাও। তবে সে দুইয়ে এক হয়ে গেছে স্মৃতিতে, কোনটা দেখা আর কোনটা শোনা—বেছে নেওয়ার উপায় নেই।

আপনাদের বয়স কত হয়েছে জানি না—ভয় নেই, বয়স জিজ্ঞেস ক'রে বিব্রত করব না, আমার বক্তব্য অন্য—মানে ১৯১০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে যাঁরা কাশী গেছেন তাঁরা আমার রমেশ ঠাকুর্দাকে অবশ্য দেখেছেন। না দেখে উপায় নেই। কারণ কাশী যাবেন অথচ দশাশ্বমেধ ঘাটে যাবেন না. কিম্বা—বিশ্বনাথ দর্শন তো যেমন তেমন, বিশ্বনাথের

গলিতে কাপড়, বাসন, খেলনার জন্যে ঘুরবেন না, দিনে দেখে তৃপ্তি হয় না তাই রাত্রেও একবার আরতি দেখার নাম করে ঐ গলিতে ছুটবেন না—এ তো আর সম্ভব নয়।

সুতরাং ঐ সময় যাঁরা গেছেন, তাঁদের চোখে পড়েছে ঠিকই—আমার রমেশ ঠাকুর্দার অপরূপ মূর্তিটি!

তবে লক্ষ্য করেছেন কিনা সে কথা আলাদা।

কারণ ওঁর রাজত্ব—রাজত্বই বলুন আর চৌহদ্দিই বলুন, ইংরেজী থেকে বাংলা করলে বলতে হয় ওঁর চরে বেড়াবার জায়গা—ঐ পাড়াটাই।

সে সময়কার দশাশ্বমেধের রাস্তা চিন্তা করুন। ঘাটে যেতে ডান দিকে একটা মস্ত ফটকের মধ্যে খানিকটা খোলা জায়গা, এককালে হয়ত কারও হাতীশাল ছিল কিম্বা আস্তাবল—ফটকের ঠিক উল্‌টো দিকের দেওয়াল জুড়ে বহুদূর বিস্তৃত এক বিশাল বটগাছ, তার নিচে স্তূপাকার কয়লা।

ওটা পাইনদের কয়লার দোকান ছিল। ভবানীদা ঐ পড়ো জমিটুকু ভাড়া নিয়েছিলেন, না এমনিই ভোগদখল করতেন তা বলতে পারব না, কেননা দোকান যে খুব একটা রৈ রৈ করে চলত তা নয়। মালও বেশী কিনতে পারতেন না ভবানীদা, এক ওয়াগন ক'রে কয়লা আসত, সেটা ফুরোলে আবার এক ওয়াগন। তাও মধ্যে মধ্যে একেবারেই ক'দিন থাকত না, খদ্দেররা শুকনো মুখে আনাগোনা করত।

এ দোকানেই মাসিক পাঁচ টাকা মাইনেতে খাতা লিখতেন আমাদের রমেশ ঠাকুর্দা, রমেশ মুখুজ্যে মশাই।

মানে খাতা লেখবারই কথা—তবে তা ছাড়াও ঐ পাঁচ টাকা দরমাহাতে অনেক কাজ করতে হ'ত।

ফটকের সামান্য আচ্ছাদনের নিচে তক্তপোশ পেতে তাতে একটা জরাজীর্ণ মাদুর বিছিয়ে কাঠের একটা ক্যাশবাক্সর ওপর খাতা খুলে বসে থাকতেন রমেশ ঠাকুর্দা।

খাতা মেলা থাকত, হাতে কলমও ধরা থাকত কিন্তু খাতা কতদূর লেখা হ'ত তা বলা কঠিন, কারণ আমি যখনই দেখেছি হয় খাতার ওপর ঢুলে পড়ে ঝিমোচ্ছেন, নয়ত উচ্চকণ্ঠে খদ্দেরদের সঙ্গে তদারক করছেন।

কার কত বাকী আছে, কত দিনের বকেয়া; এমন করলে পাইনের পোকে কারবার গুটিয়ে হিমালয় পাহাড়ে চলে যেতে হবে নাগা সন্ন্যিসী হয়ে; পাঁচ আনা মণ কয়লা বেচে কত লাভ হয় যে এত ধার ফেলতে পারে দোকানদার? কয়লা খারাপ? হ'তেই পারে না। এই কয়লা এ টহরণে সবাই ব্যবহার করছে, কই কেউ তো কোনদিন, 'কন্‌পেলেন' করে নি! আসলে উনুন জ্বালাতে জানে না বাড়ির মেয়েরা, ভাবে গোচ্ছার ঘুঁটে দিলেই বনবন ক'রে উনুন ধরে যাবে। কই নিয়ে চলুন তো রমেশ মুখুজ্যকে সে উনুন সাজিয়ে দিয়ে আসুক—কেমন উনুন না ধরে! তেলফেল কিচ্ছু লাগবে না—উনুনটি সাজিয়ে স্রেফ নিচে একটি লম্প জ্বালিয়ে দিন, এক পয়সার লম্প, বাঁই বাঁই করে আগুন উঠে যাবে। বলে, 'নাচতে জানে না নাবডিংরে, উঠোনটাকে বলে হেঁটেন ঠিকরে'।...তা তো নয় বাবা, পয়সার তাগাদা করলেই কয়লা খারাপ হয়ে যায়।...হুঁ হুঁ বাবা, ঢের বয়েস হ'ল রমেশ মুখুজ্যের। দেখলও ঢের। পয়সার তাগাদা না করো—এই কয়লাই এক নম্বর ঝরিয়া হয়ে যাবে—টাকা চাও—চুনারের পাথর।

বেশী কথা বলা স্বভাব ছিল রমেশ ঠাকুর্দার।

বয়সেরই ধর্ম, তবু মনে হয় অন্য বড়োদের থেকেও একটু বেশী বকতেন উনি।

একটা উপলক্ষ পেলেই হয়, বকতে বকতে দুই কষে ফেনা জমে যাবে, হাঁপিয়ে পড়বেন—তবু বকুনি থামবে না। কথাও কইতেন সর্বদা চেঁচিয়ে—যেন ধমক দিয়ে দিয়ে। ওঁকে ঠাকুর্দা বলার পিছনেও এই অভ্যাসের ইতিহাস। প্রথম যেদিন ওঁকে পিছন থেকে ডেকেছি 'কাকাবাবু' বলে—কী বলব ভেবে না পেয়েই কথাটা বেরিয়ে গেছে—প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠেছেন, তেড়ে মারতে আসেন এই ভাব, 'কাকাবাবু কে রে ছোঁড়া? এইটুকু পুঁচকে ছেলে—কত বয়েস হ'ত তোর বাবার বেঁচে থাকলে তাই শুনি? আমি তোর ঠাকুর্দার বয়িসী লোক, আমাকে কাকাবাবু বলা? ঠাট্টা করা হচ্ছে, না? কেন আমি কি খোকা সেজে থাকি বয়েস ভাঁড়িয়ে? জ্যাঠামশাইও তো বলতে পারতিস নিদেন?'

বলা বাহুল্য, তখন বয়স কম, রাগ হয়ে গিয়েছিল খুব। তাই জ্যাঠামশাই না বলে সেদিন থেকে 'ঠাকুর্দা' বলেই ডাকি।

আসলে ঠিক ঠাকুর্দার বয়িসী নন, ওটা বাড়িয়ে বলা। উনি কিন্তু তাতে আদৌ অপ্রসন্ন নন, বরং নাতি সম্পর্ক পাতানোয় রসিকতা করার সুযোগ হওয়াতে ভারী খুশি।

মানুষটা ঐ ধরনের ছিলেন, চেঁচিয়ে গল্প করছেন কিম্বা কাউকে ধমকাচ্ছেন, হঠাৎ তার মধ্যেই গলাটা নামিয়ে সেই কুৎকুতে চোখের একটা টিপে—একটু আদিরসাত্মক ইঙ্গিত কিম্বা দু'একটা খিস্তি না করতে পারলে ওঁর কথা বলে জুৎ হ'ত না।

এখনও বোধহয় ঠিক ধরতে পারছেন না। চেহারার বর্ণনাটা পেলে হয়ত মিলিয়ে নেবার সুবিধে হবে।

আপনাদের মধ্যে যাঁরা বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী পড়েছেন (আগে হ'লে এ প্রশ্নই উঠত না, অক্ষর-পরিচয় আছে অথচ দুর্গেশনন্দিনী পড়ে নি—এমন লোক বিরল ছিল। এখন ক্লাসিক বই পড়াটা ফ্যাসনের বাইরে হয়ে গেছে) তাঁরা গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে স্মরণ করুন। বিদ্যাদিগ্‌গজের শ্রীচরণ দুটির সেই অমর বর্ণনা—অগ্নি কাষ্ঠভ্রমে পা দুখানি ভক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন, কিছুমাত্র রস না পাইয়া অর্দ্ধেক অঙ্গার করিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন'!...আমার মনে হয় আমাদের রমেশ ঠাকুর্দাকে দেখেই বঙ্কিমবাবু ঐ বর্ণনাটি দিয়েছিলেন।

রোগা, কালো, একটু কোলকুঁজো—কালো মানে কয়লার দোকানেই ঠিক মানায় এমন কালো, মসীবর্ণ যাকে বলে—ছোট ছোট দুটি চোখ, বিস্ফারিত ক'রে চাইলেও রাত্রিবেলা যা ঠাওর হয় না এতই ছোট, সহসা দেখলে চোখের জায়গায় দুটো ফুটো আছে শুধু মনে হয়। একমাত্র যা বলবার তা হচ্ছে খুব বেঁটে নয়, তালগাছের মতো ঢ্যাঙাও নয়, মাপিকসই দৈর্ঘ্য। চুল পাকা ধবধবে, তবে দাঁত—আমি শেষ যখন দেখেছি ওঁকে ১৯৩২।৩৩ হবে—তখন বোধহয় আশি পেরিয়ে গেছে ওঁর, উনি যা বলতেন অবশ্য সেই হিসেবে—তখনও বেশির ভাগ দাঁত অটুট।

দাঁত উঁচু যাকে বলে তা ছিল না, তবে বেশ বড় বড়, কোদালে দাঁত, বড় আর সাদা, হঠাৎ হেসে উঠলে অত কালো মুখে অতখানি সাদা—কেমন যেন ভয়াবহ বোধ হ'ত। এক কথায় গ্রহাচার্যরা যাকে শনির জনক বলেন—হুবহু সেই চেহারা।

এ ছাড়াও কিছু ছিল বর্ণনা দেবার মতো—বঙ্কিমবাবুও যা লক্ষ্য করেন নি।

দুই কষে ফেকোপড়া ঈষৎ সাদা দাগ। কথা বলার সময় থুথু বা ফেনা জমত, বোধহয় তাতেই হেজে স্থায়ী ঘায়ের মতো হয়ে গিয়েছিল।...তার ওপর চোখের কোলে ক্রমাগত সুতোর মতো পিঁচুটি জমত, সে সম্বন্ধে বেশ অবহিতও ছিলেন। লোকের সঙ্গে কথা কইতে কইতেই সুকৌশলে আঙুলের ডগা দিয়ে সেই সুতোটি লম্বাভাবে টেনে বার করতেন। এ দৃশ্যে যে দর্শকদের মনে ঘৃণা হওয়া সম্ভব, এসব যে একটু আড়ালে সারতে হয়—এ জ্ঞানই ছিল না তাঁর।

এইবার মনে পড়ছে একটু একটু ক'রে? বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে পাচ্ছেন?

এধারে কিন্তু যতই বদ-অভ্যাস থাক্, ধুতি উড়ুনি (জামা পরতেন কদাচিৎ, কোথাও কোন বিশেষ জায়গায় যেতে হলে তবেই—শীতকালের জন্যে একটা রেলকর্মচারীর গরম কোট ছিল, পুরনো বাজার থেকে কেনা, খালি গায়েই সেটা চড়াতেন) এবং পৈতে—সর্বদা ধপধপ করত।

ধুতি উড়ুনি ফরসা থাকত—তার জন্যে ওঁকে অবশ্য কোন মেহনৎ করতে হ'ত না। আমার সতীদিদির গতর বজায় থাক্, তিনি দু'তিন দিন অন্তরই ক্ষারে কেচে কর্তার ধুতি চাদর, নিজের পরনের শাড়ি এবং বিছানা ধপধপে ক'রে রাখতেন।

সতীদিদি—রমেশ ঠাকুর্দার সম্পর্কে সতীঠাকুমা বলাই উচিত, কিন্তু অত সুন্দর মানুষটাকে ঠাকুমা বলতে কেমন যেন লাগত, ঠাকুমা শব্দটার সঙ্গে বার্ধক্যের অবস্থাটা অঙ্গাঙ্গী জড়িত আমাদের মনে, আমরা সতীদিদি বা সতীদিই বলতুম, মা অবশ্য 'মা' বলেই ডাকতেন, তাঁর অত-শত ছিল না;—ছিলেন ঠাকুর্দা মশায়ের বিপরীত একেবারে।

সুগৌর বর্ণ—হয়ত দুধে আলতা যাকে বলে তা নয়—কিন্তু গৌরী তাতে সন্দেহ নেই। 'গোরোচনা গোরী' যাকে বৈষ্ণব কবিরা বলেছেন, হলদের ওপর চড়া, হরতেলের রঙ দুর্গা প্রতিমায় যে রঙ দেয় কুমোররা। বড় টানা-টানা দুটি চোখ, সপ্তমীর চাঁদের মতো মানানসই কপাল। ক্ষুর দিয়ে কামানোর মতো সরু সুন্দর দুটি ভুরু—[আবারও বৈষ্ণব কবির বর্ণনা মনে পড়ছে—'জোড়া ভুরু যেন কামেরি কামানো', বিখ্যাত কীর্তনিয়া রামকমল এই লাইনটি তিনবার তিন রকমে উচ্চারণ ক'রে আখর দেবার কাজ সারতেন,—'জোড়া ভুরু যেন কামেরি কামানো', 'জোড়া ভুরু যেন কামেরি কামান', 'জোড়া ভুরু যেন কামেরই কামআনো'!] এছাড়া কবির কল্পনার সঙ্গে মেলানো আল্‌তামাখা দুটি ঠোঁট, তার ফাঁকে মুক্তোর মতো শুভ্র সুন্দর দাঁত। গঠনও তেমনি—রোগাও না মোটাও না, সব দিক দিয়েই মাপিকসই; গোলালো গোলালো হাত পা।

একেবারে সেই য়্যান্ডারসনের রূপকথার গল্প—'বিউটি য়্যান্ড দ্য বীষ্ট!' তারই প্রত্যক্ষ উদাহরণ এই স্বামী-স্ত্রী।

কিন্তু তবু, এমন সুখী দম্পতি, পরস্পরের প্রতি এমন গভীর প্রেম, এমন পূর্ণ নির্ভরশীলতা—খুব কম দেখেছি আমি।

আজও, জীবনের এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেও বেশী দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এর জুড়ি আদৌ দেখেছি কিনা সন্দেহ।

অথচ সতীদি ঠাকুর্দার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। আর সেটা দেখলেই বোঝা

যেত। আমরা যখন দেখেছি ঠাকুর্দা বুড়োই, কিন্তু সতীদি তখনও যেন যৌবন অতিক্রম করেন নি, এমন স্বাস্থ্য। এত পরিশ্রম করতেন তবু চামড়ায় কোথাও কোঁচ পড়ে নি, হাতের শিরা ওঠে নি। হাতের মুঠো খুললে মনে হ'ত দুহাতে আলতা মেখেছেন কিছুক্ষণ আগে। 'বাইশ বছরের ছোট আমার চেয়ে'—ঠাকুর্দা নিজেই বলতেন, 'নাতির বয়সে পুতি যাকে বলে।...আমাদের যখন বে হয় তখন আমার ছত্রিশ, ওর চোদ্দ। ভাগ্যিস ছেলেমেয়ে হয় নি নইলে ওকে মা আমাকে দাদু বলত।'

বিয়েটা দ্বিতীয়পক্ষে না তৃতীয়পক্ষের—কেউ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে হা-হা ক'রে হেসে উঠতেন ঠাকুর্দা। বলতেন, 'দ্বিতীয়পক্ষ? কী পেয়েছিস আমাকে? এই চেহারায় বার বার বর সাজব? প্রেথম পক্ষই করবার সাহস হয় নি,—নিতান্ত ইনি নিজের নামের সঙ্গে মেলাতে বুড়োর 'লব্'-এ পড়লেন তাই।...আর বলিস কেন, এঁচোড়ে-পাকা মেয়ে, বাপের বয়সী ব্রেষকাঠ একটা লোককে কায়দা ক'রে বে করলেন। ভাবলেন উনি বুঝি খুব টেক্কা মারলেন।...মর এখন, যেমন বোকা তেমনি ভোগ। বলিছিলুম, রোস, ভাল বে দিচ্ছি তোর। তা নয় জীবনভোর খেটে খেটে গতরপাত, না কোনদিন একটি গয়না অঙ্গে উঠল না একখানা ভাল শাড়ি—এই গুণের ভাতার পেয়েছেন।...তাও বলে কি জানিস? বলে, নিত্যি বিশ্বনাথকে ডাকি, যেন আমার কোলে তুমি যাও!...বোঝো ব্যাপার! হিঁদুর মেয়ে, বামুনের মেয়ে—কোথায় ভগবানকে ডাকবে যেন সোয়ামীর কোলে মাথা রেখে শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে ড্যাং ড্যাং ক'রে যেতে পারি—তা নয়। ওঁর ভয় উনি মরার পর আমি যদি আবার এমনি ছুক্রি দেখে আর একটা বে করি!'

বলে আবারও হা-হা ক'রে হেসে উঠতেন।

এর বেশী কিছু জানা যেত না।

প্রশ্ন করলেও এড়িয়ে যেতেন।

এই—ওঁর ভাষায় 'লব্'—প্রেমে পড়ার ইতিহাসটা অনেকেই জানতে চেয়েছে, কিন্তু তার অবসর হয় নি। ভেতর থেকে তেড়ে উঠেছেন সতীদি, 'ও কি হচ্ছে কী? বুড়ো না হ'তেই ভীমরতি! বলি, আমি কি তোমার জ্বালায় মাথামুড় খুঁড়ে মরব?'

'আচ্ছা, আচ্ছা। এই চুপ করলুম' বলে থেমে যেতেন একটু, তার পর গলাটা নামিয়ে শ্রোতাদের দিকে চেয়ে চোখ মটকে বলতেন, 'এখনও নাকি আমি বুড়ো হই নি—ভীমরতির বয়স হয় নি। এতেই বোঝ লব্টা কী পরিমাণ প্রেগাঢ়! সতী নাম রাখা ওর বাপ-মার সাথক্—কী বলিস? য়্যাঁ?'

॥ ২ ॥

ওঁরা কোথায় থাকতেন? বলছি। সেই সূত্রেই তো আলাপ।

পাড়াটা বলব না, কারণ এখনও কেউ কেউ বেঁচে আছেন—ও-বাড়ির, ও-পাড়ার। তখনকার যারা নাটকের কুশীলব তাদের ছেলেমেয়েরা স্ত্রীরা তো বটেই। তবে খুবই পরিচিত রাস্তা, গোধুলিয়ার কাছেই।

বাঙালীর বাড়ি। মধ্যে বাগান, চারদিক ঘিরে চকমেলানোর ভঙ্গীতে টানা বাড়ি। মাঝে মাঝে পার্টিশান। এইভাবে মোট ছখানা বাড়ি গুনতিতে। চারদিক ভুল বলেছি, একদিকে এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের বাড়ি ছিল, বাগানের দিকে তার পিছনটা। সব বাড়িই তিনতলা,

তলায় তলায় ভাড়াটে, আধুনিককালের ফ্ল্যাটের মতো। সেইভাবেই তৈরি। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ির মুখের দরজা বন্ধ করলেই—একানে, আলাদা।

·দোতলা তেতলায় ঐ হিসেবে ভাড়া, এক এক ফ্ল্যাটে এক এক ঘর ভাড়াটে—কিন্তু একতলায় নয়। রাস্তার দিকে যে দুটো বাড়ি, তার একতলার ঘর, দোকানঘরের হিসেবে করা, তখন দোকান হয় নি—মেথর কসাই টিকেওলা প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুস্থানী ভাড়াটে কয়েক ঘর ছিল। তারা কোথাকার কল-পাইখানা ব্যবহার করত তা জানি না, তবে বাড়ির ভেতরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না।

বাকী যা ভেতরের ঘর—সে ভালো ভাড়াটে পাবার মতো নয়। একতলার ঘর কাশীর বাড়িতে— গরমের দিন ছাড়া ব্যবহার করা যায় না।

অবশ্য এ বাড়িগুলো ঠিক বাঙালীটোলার বাড়ির মতো নয়—মধ্যে বাগানটা থাকায় অত স্যাঁৎসেঁতে অসূর্যম্পশ্যা হ'তে পারে নি—তবুও একদিকেই দরজা জানলা—তিনদিক চাপা বলে বাস করা বেশ কষ্টসাধ্যই ছিল।

তাই, যাদের কষ্ট ক'রে থাকা ছাড়া উপায় নেই—খোপে খোপে পায়রার মতো, সেই বুড়ীরাই ভাড়া থাকত।

কাশীর বিখ্যাত সেই হতভাগ্য স্বজনপরিত্যক্ত বুড়ীর দল—এক একখানি জীবন্ত সচল উপন্যাস—এখন যে 'রেস' নিশ্চিহ্ন হয়ে আসছে!

এক চিল্‌তে ক'রে খুপরি ঘরে থাকত, সামনের রকটুকুতে রান্না করত, বাসন মাজত, জল রাখত— কখনও কখনও স্নানও সারত। সেই রকেই কেউ কেউ কাকের ভয়ে চট ঝুলিয়ে নিয়েছিল। যার তাও জোটেনি, তোলা উনুন ধরিয়ে নিয়ে গিয়ে ঐ ঘরেরই এক পাশে রান্না করত। রান্না অবশ্য একবেলা, তাও মাসে অন্তত সাত-আটদিন বাদ। তবু আয়োজন সবই রাখতে হ'ত। ঐ ঘরটুকুর মধ্যেই হয়ত একটা কেরোসিনের টিন কি কাঠের বাক্সতে কয়লা, চুপড়িতে ঘুঁটে রাখতে হত— হাঁড়িতে হাঁড়িতে চাল, ডাল, আটা, গুড়।

তবু এ-বাড়ির ঘর ভাল এবং বাঙালীটোলার মধ্যে নয় বলে ভাড়া একটু বেশীই ছিল, মাসিক আট আনার কমে কোন ঘর ছিল না।

সুতরাং এখানে যারা বাস করত তাদের আয়ও ভাল। মাসিক তিন টাকা আয়ে যাদের সংসার চালাতে হ'ত— তখনকার দিনেও তাদের বাঙালীটোলার অন্ধকূপ নিচের ঘর ছাড়া গতি ছিল না। এ-বাড়িতে যাঁরা থাকতেন তাঁদের কারুর মাসে ছয় কারুর বা আট টাকা মাসোহারা আসত। গোসাঁই গিন্নী আর তারা দিদিমা পুরো দশ টাকারও বেশি পেতেন। তাঁদের ঘরও ভাল ছিল। এক টাকা ক'রে ভাড়া দিতেন তাঁরা।

এরই একখানাতে—গোসাঁই গিন্নীর পাশের ঘরে থাকতেন রমেশ ঠাকুর্দারা।

ভাড়া দিতে হ'ত না, এমনিই থাকতেন। তার কারণ, বর্তমানে যিনি বাড়িওলা—এঁর একবার খুব মায়ের অনুগ্রহ হয়েছিল। খুব বাড়াবাড়ি, এত বীভৎস ঘা যে বাপ-মাও ঘরে ঢুকতে পারতেন না। গা কাঁপত তাঁদের, মাথা ঘুরে যেত।

সেই সময় ঠাকুর্দা লোক মুখে শুনে উপযাচক হয়ে এসে খুব সেবা করেন। মানপাতা যোগাড় ক'রে তাতে মাখন মাখিয়ে শুইয়ে রাখা, দিনরাত মশারির মধ্যে ধুনো দিয়ে, শুকোবার ব্যবস্থা করা, ঘড়ি ধরে পথ্য খাওয়ানো,—খাওয়ার অবস্থা ছিল না, ফোঁটা ফোঁটা করে এক ঘণ্টা ধরে দুধ খাওয়াতে হত— সব একা করেছেন। বাড়িওলার একমাত্র ছেলে, তাঁরা প্রচুর পুরস্কার দিতে গিয়েছিলেন, ঠাকুর্দা নেন নি।

সে কথা বর্তমান বাড়িওলা লক্ষ্মীবাবু ভোলেন নি। তিনি সসম্মানে একটা গোটা ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে ওঁদের এনে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও রাজী হন নি রমেশ ঠাকুর্দা। বলেছিলেন, 'এখন তো ঝোঁকের মাথায় কাজটা করবে ভায়া—শেষে আপসোসের সীমা থাকবে না। তখন তাড়াতেও পারবে না, আমাদের ওপর বিষদৃষ্টি পড়বে। ও কাজে আমি নেই, আমি যেমন মানুষ, যে ঘরে থাকার যুগ্যি—ঐ নিচের তলার একখানা ঘর যদি দাও, তবেই আসব—নইলে এখান থেকেই রাম রাম!'

তাই দিয়েছিলেন লক্ষ্মীবাবু। অবশ্য ওরই মধ্যে যেটা একটু বড়—সেইটেই দিয়েছিলেন।

সেই থেকেই এখানে আছেন ঠাকুর্দা। বাগানটার জন্যেই ঘরটা বড় প্রিয় ছিল তাঁর, পাড়াগাঁয়ের মানুষ একটু গাছপালা না দেখলে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠত। বাগান তো ভারী, দু-তিন ঝাড় কাঁচকলা, গোটাকতক পেয়ারা গাছ, একটা ডালিম আর একটা একপেটে টগর। তবু ঐটুকুই ওঁর প্রাণ ছিল। নিজে হাতে তদ্বির করতেন, নিঃস্বার্থভাবে। তবে, দীর্ঘকাল ওখানে কাটালেও, বেচারা শেষ নিঃশ্বাসটা ওখানে ফেলতে পারেন নি।

কিন্তু সে কথায় পরে আসব।

ঐ ব্যারাকবাড়িরই রাস্তার দিকে যে দুটো অংশ—তারই একটার তিনতলায় থাকতুম আমরা।

রান্না-ভাঁড়ার ছিল চারতলায়, সেখানে জল যেত না। নিচে থেকে জল বইতে হ'ত। ভাড়াও অনেক বেশী, মানে কাশীর হিসেবে, বারো টাকা। তবু, বাড়িটা ভাল ছিল বলেই—তখনকার দিনে কাশী শহরে অত ফাঁকা বাড়ি দুর্লভ—অনেক অসুবিধা সহ্য ক'রেও থাকতুম আমরা।

আমাদের তিনতলার বারান্দা ছিল খুব প্রশস্ত, বারো ফুট চওড়া হবে বোধহয়। তারই এক কোণে রাস্তার দিকে মা-র তুলসীগাছের টব থাকত।

তিনতলার বারান্দা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ আছে, দোতলার বারান্দাটা—কী কারণে জানি না দু-ভাগে ভাগ করা ছিল। রাস্তার দিকের অংশটা তিনটে ধাপ ভেঙ্গে ওপরে উঠতে হত, ফলে নিচের ঘরগুলোয় অত আলো-বাতাস যেত না।

যাক—যা বলছিলাম, মা-র ঐ তুলসীগাছ উপলক্ষ করেই ঠাকুর্দার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। আর, এই ঘটনাটা ওঁর স্বভাবেরও একটা পরিচয় বটে।

তখনও আলাপের কোন সূত্র পাওয়া যায় নি, অর্থাৎ কোন যোগাযোগ ঘটে নি।

আমরা ওঁদের দেখি ওপরের জানলা থেকে, বুড়ো ভোরে উঠে অবিরাম খক খক করে কাশেন আর ভুড়ুক ভুড়ুক ক'রে তামাক টেনে যান। সতীদি ওঁরও আগে ওঠেন, খুটখাট ঘরদোরের কাজ করেন, মধ্যে মধ্যে কর্তাকে তামাক সেজে দেন আর পাশের বারান্দায় গোসাঁই গিন্নির একটা পোষা চন্দনা ঝোলানো থাকত তাকে চাপাগলায় পড়ান, 'পড়ো, বাবা আত্মারাম, পড়ো। বলো, হরে-কৃষ্ণ, হরে-কৃষ্ণ। বলো বাবা বলো।' চাপাগলায় কারণ—ঠিক মাথার ওপরেই প্রয়াগবাবুরা থাকতেন। তাঁরা বেলায় ঘুম থেকে ওঠেন—চেঁচিয়ে পাখী পড়ালে তাঁরা বিরক্ত হবেন।

এই পর্যন্ত।

উনি বা ওঁরা যে আমাদের লক্ষ্য করেছেন—বা আমাদের অস্তিত্ব আদৌ অবগত আছেন—তাও জানি না।

হঠাৎ একদিন আমাদের সিঁড়িতে চটাস চটাস চটির শব্দ। ঠনঠনের চটি পায়ে দিতেন ঠাকুর্দা। ওঁর ঐ বিশেষ জুতো সম্বন্ধে আসক্তি জেনে কেউ-না কেউ এনেই দিত কলকাতা গেলে। তখন আঠারো আনার চটি বুকে-হাঁটু দিয়ে পুরো দুটি বছর চলত।

যাই হোক অত তখনও জানি না, আমাদের সিঁড়িতে কে উঠতে পারে ভেবে পেলুম না! আমাদের এখানে তিনতলায় কস্মিনকালে কেউ ওঠে না, আমরা নতুন লোক—এখানে আমাদের পরিচিত বলতে যা দু-এক জন—তারা সকলেই দূরে দূরে থাকে—একজন পাঁড়ে-হাউলী, একজন চৌখাম্বা। এত সকালে তারা কেনই বা আসবে? কিছুই ভেবে না পেয়ে অবাক হয়ে, আমি মা-র মুখের দিকে—মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

একটু পরেই খট খট ক'রে কড়া নড়ে উঠল। আমাদেরই দরজার কড়া। একটু ভয়ে ভয়েই দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখি—রমেশ ঠাকুর্দা। তখন 'নিচের ঐ বুড়োটা' বলে উল্লেখ করতুম ওঁকে।

উনি কিন্তু আমাদের দিকে চেয়েও দেখলেন না, বা এই আকস্মিক আগমনের জন্যে কোন কৈফিয়ৎ দেওয়াও প্রয়োজন মনে করলেন না।

'সর্ সর্' বলে আমাকে এক রকম ঠেলেই সরিয়ে—দরজার বাইরে চটিটা ছেড়ে, গট্ গট্ করে চলে গেলেন লম্বা বারান্দা পেরিয়ে একেবারে পুব-দক্ষিণ কোণে—তুলসীগাছটার কাছে। তারপর উবু হয়ে বসে আঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে কী একটা মন্ত্র পড়ে নিয়ে—হয়ত প্রণাম-মন্ত্রই হবে—তুলসীর মঞ্জরীগুলো ভাঙ্গতে লাগলেন। একমনে, নিবিষ্ট হয়ে।

আমাদের গাছ, এতে যে আমাদের কোন বক্তব্য থাকতে পারে, বা আমাদের অনুমতি নেওয়া বা অন্তত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যে দরকার—তাও ওঁর মাথায় এল না।

একেবারে সব মঞ্জরীগুলো ছেঁড়া হ'লে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই কুৎকুতে চোখে পিট পিট করে তাকিয়ে একটা প্রায়-হুঙ্কার ছাড়লেন, 'হ্যা....! গাছ পুঁতলেই হয় না, তুলসীগাছ পুঁতলুম আর একটু ক'রে জল দিলুম, ব্যস্ হয়ে গেল, ডিউটি শেষ! অত মঞ্জুরী হয়েছে—গাছ বাঁচে কখনও? মরে যাবে যে! আমি তাই রাস্তা থেকে দেখি, ভাবি, এই আজ ছিঁড়বে—কাল ছিঁড়বে—দেখি কিছুই কেউ করে না। বুঝলুম কথাটা মাথাতেই ঢোকে নি, কল্‌কাতার ভূত তো, গাছের মম্ম কিছু জানে না, ও আমাকেই করতেই হবে।'

এই বলে হে-হে ক'রে হাসলেন খানিকটা। তারপর আমার মাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'তোমার উনুনে আঁচ পড়েছে—বৌমা?'

মা নতমুখে জবাব দিলেন, 'না, এই তো বাসিপাট সারা হ'ল। এইবার দেব।'

'কী সর্বনাশ! এখনও আঁচ দাও নি, সাতটা বেজে গেল! কখন আঁচ উঠবে আর কখন রান্না করবে!...ছেলেরা ইস্কুলে খেয়ে যাবে তো! ...উনুন ধরানো কি চাট্টিখানি কথা, ভারী শক্ত কাজ।...ঐটেই তো আসল। উনুন যদি ধরে গেল, গনগনে আঁচ উঠল, রান্না করতে কতক্ষণ?...যাও, যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না, যাও!'

আবার তিনি চটি পায়ে গলিয়ে চটাস্ চটাস্ শব্দ ক'রে নেমে গেলেন, কলকাতার লোকেদের গ্রাম্যতা আর অজ্ঞতা সম্বন্ধে আপনমনেই মন্তব্য করতে করতে।

পরে জেনেছিলাম—উনি আমাদের সতীদিদির সংসারে ঐ একটি কাজ করে দিতেন, সকালে কাজে বেরোবার আগে উনুনটা ধরিয়ে দিয়ে যেতেন।

উনুন সাজিয়ে নিচে থেকে একটি লম্প বা ডিবে জ্বেলে দিতেন, একটু অপেক্ষা করে ঘুঁটে ধরে উঠেছে বুঝলে সেটা নিভিয়ে দিয়ে চলে যেতেন।

সেই সময়টা সতীদির বাসিপাট সেরে স্নান করতে যাবার সময়। একটি মাত্র কল, নিচের এতগুলি ভাড়াটের জন্যে—ওদের বাদ দিয়েও জনাছয়েক, আর বুড়োমানুষদের কলতলায় একটু বেশীক্ষণই লাগে—সুতরাং ইচ্ছামাত্র স্নান সেরে চলে আসা যেত না। গোসাঁইদিদির ভাষায় 'টর্ন' আসার জন্যে অপেক্ষা করতে হত।

আগে কলতলাটা খোলা জায়গায় ছিল, বালতি করে জল বয়ে এনে নিজেদের রকে চটের আড়ালে চান সারতে হত, কতকটা সতীদির জন্যেই এখন দুপাশে আর মাথায় করগেটের টিন দিয়ে একটু আড়ালমতো হয়েছে, বাথরুমের নামান্তর। ঠাকুর্দা প্রত্যহ বারোটা নাগাদ তাঁর কয়লার ক্যাশ বন্ধ করে ফটকে তালা লাগিয়ে গঙ্গাস্নান করে ফিরতেন—কলঘর লাগত না।

তা' ঐ একটি কাজ করতেন বলেই ঠাকুর্দার ধারণা ছিল—সংসারের কঠিনতম কাজ হল উনুনে আঁচ দেওয়া।

॥ ৩ ॥

বাড়িভাড়া লাগত না ঠিকই—তবু পাঁচ টাকায় দুজন লোকের তখনও চলত না। শুধু খাওয়াটা হয়ত চলে যেতে পারত, সব খরচ জড়িয়ে চলা সম্ভব নয়—তা যত সস্তাগণ্ডাই হোক।

অথচ সঙ্গতিও আর ছিল না।

ঠাকুর্দামশাই আমাদের নাকি কখনই কিছু করেন নি, যাকে কিছু 'করা' বলে—চাকরি-বাকরি কি ব্যবসা-পত্র।

তার কারণ—যাতে এ বাজারে করে খাওয়া যায়—উনি সেই ইংরেজী লেখা-পড়া কিছুই জানতেন না। জানার ইচ্ছে ছিল, সুযোগ হয় নি।

চব্বিশ পরগণার রাজপুর-হরিনাভি অঞ্চলে কোন্ এক পল্লীগ্রামে বাড়ি, পুরুত-বামুনের ছেলে উনি।

গ্রাম্য পুরোহিত, উপার্জন কম, অনেক ছেলেমেয়ে। ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়ে পাস করাবেন, সে সঙ্গতিও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। তখন পাঠশালা ছিল গ্রামে গ্রামে। পাঠাশালায় পড়ার পর বাবা টোলে দিয়েছিলেন হরিনাভিতে—সংস্কৃত পড়তে।

সে পড়া ভাল লাগে নি, লাগে নি বোধহয় বাবার উদ্দেশ্য বুঝেই আরও। বাবা সংস্কৃতটাও কোন উপাধি পাবার জন্যে পড়তে দেন নি। অল্প কাজ-চলা-গোছ শেখার পর যজমানী করবে ছেলে—এইটেই চেয়েছিলেন।

ঠাকুর্দা টোলে পড়তে পড়তেই ইংরেজী শেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন পাড়াগাঁয়ে ইংরেজী শেখাবার লোক বিশেষ ছিল না। মাস্টারদের কাছে পড়তে গেলে মাইনে লাগে—পাড়ার ছোট ছেলেদের ধরে শেখা সুতরাং অক্ষর পরিচয় আর 'আই গো' 'ইউ গো' 'হি গোজ'—এর বেশী এগোয় নি।

পরে নাকি এখানে এসে একখানা 'রাজভাষা' বই কিনে অনেক ইংরেজী শব্দ শিখেছেন, তবে তাকে ইংরেজী শেখা বলা যায় না কিছুতেই।

কাশীতে এসে বেশ কিছুদিন টিউশ্যনি করে চালিয়েছিলেন।

তখন এখানে বাঙালীর ছেলের বাংলা পড়বার ইস্কুল ছিল না বিশেষ। অনেকেই তাই প্রাইভেটে পড়াতেন।

রমেশ ঠাকুর্দা বাংলা আর সংস্কৃতও একটু—মোটামুটি কাজ চলা গোছের জানতেন ব'লে কোন অসুবিধে হয় নি। এক টাকা আট আনা মাইনের টিউশ্যনি, এ-ই বেশির ভাগ। একসঙ্গে দুভাইকে পড়িয়েছেন মাসিক বারো আনায়—এ টিউশ্যনিও করেছেন।

তাতেই তখনকার দিনে বেশ আয় হ'ত—মাসে ছ-সাত টাকা হেসে-খেলে। গোপাল মন্দিরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বিনা-ভাড়ায়, আর এক বামুনবাড়ি মাসে তিন টাকা দিয়ে দুবেলা খাওয়া চলত। পরে বিয়ে করার পর ঘর ভাড়া ক'রে সংসার পাততে হয়েছে—তেমনি তখন একটু বেশী খেটে মাসে দশ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেছেন।

তবে কখনই কিছু জমান নি, শুধুড়ি বাজার ঘুরে পুরনো বই কেনার বাতিক ছিল। অবশ্য সে আর কতই বা—দু পয়সা চার পয়সা—আর ছিল কিছু গোপন দানধর্ম। সতীদি ঠাট্টা করে বলতেন,—'মেগে পাই বিলিয়ে খাই', তবে কোনদিন বাধাও দেন নি। স্বামীর কোন কাজেই কোনদিন বাধা দেন নি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। তাঁর বিবাহ-ক্ষণের প্রথম প্রণয়-বিহ্বলতা সারা জীবনে কাটে নি।

কিন্তু তার পর—দিন পাল্টে গেল।

ওঁরও বয়স হয়ে গেল, বাংলা পড়াবার মতো ইস্কুলও হয়ে গেল একাধিক।

প্রাইমারী বা পাঠশালা তো পাড়ায় পাড়ায়।

'ঐ চিন্তামণি যখন সরকারী চাকরি ছেড়ে এসে য়্যাংলোবেঙ্গলী ইস্কুল করব বললে—আমিও তখন ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পথে পথে ভিক্ষে করেছি। নিজের ভাত-ভিক্ষে যাবে বলে জাতের ক্ষেতি করব—সে শিক্ষা আমার নয়।'

হেসেই বলতেন ঠাকুর্দা, শুধু হাসিটা ঈষৎ করুণ লাগত।

আরও মুশকিল হল উনি ইংরেজী পড়াত পারেন না, ইস্কুলে দিলে একসঙ্গে সবই হয়। ওঁকে মাইনে দিয়ে রাখবে কেন বাপ-মারা? একটি একটি করে ছাত্রসংখ্যা কমতে কমতে একটিও রইল না আর। তখন—যাকে বলে 'চোখে অন্ধকার দেখা' তাই দেখলেন।

এই আয় কমবার মুখেই, টিউশ্যনি কমতে কমতে যখন মাসিক চার-পাঁচ টাকা আয়ে পৌচেছে—বোধহয় লোকমুখে বিপন্ন শুনেই—লক্ষ্মীবাবু এখানে ঘর দিয়ে এনে রেখেছিলেন। তবে তাতেই বা কি হয়? শেষে এমন অবস্থা হল—মুখুয্যেমশাই এক ছত্তরে গিয়ে খেতে শুরু করলেন, সতীদি দিনের পর দিন একমুঠো করে চিঁড়ে খেয়ে কাটাতে লাগলেন।

তারপরই কী একটা যোগাযোগে পাইনদের দোকানে এই কাজটা পেয়ে গিছলেন।

ওঁকে এখানে ততদিনে অনেকেই চিনেছিল। গরিব লোক, কিন্তু কারও সাহায্যপ্রার্থী কি ভিক্ষার্থী নয়, বরং পরোপকারী, সৎ ব্রাহ্মণ—এই জন্যেই সকলে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। ভবানীদাও জানতেন ওঁকে, তাঁরও লোকের দরকার একজন—কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁদের কাছে কাজ নেবেন কিনা, সন্দেহ ছিল। ঠিক ভরসা ক'রে জিজ্ঞাসাও করতে পারেন নি। ঠাকুর্দা যা মুখফোঁড় লোক, হয়ত মুখের ওপরই বলে বসবেন, 'তোমার আস্পদ্দা তো কম নয় দেখি! তুমি চাও বামুনের ছেলেকে চাকর রাখতে!...না হয় গরিবই হয়েছি, তাই ব'লে পথে পথে ভিক্ষে তো শুরু করি নি এখনও!...আর বামুনের ছেলে ভিক্ষে করলেও তো দোষ হয় না, তাই বলে বেনের কাছে চাকরি! বলি এখনও তো চন্দ্র সূয্যি উঠছে, না উঠছে না?...যদ্দিন তা উঠবে ভগবানের রাজত্বে বামুন বামুনই থাকবে!'

এই ভয়েই অনেকদিন চুপ করে ছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সে ভয় অমূলক। ভবানীদা একদিন নন্দ লাহিড়ীকে কথাটা বলেছিলেন—নন্দ লাহিড়ীও অনেক ইতস্তত করে—বেশ একটু ভয়ে ভয়েই পেড়েছিলেন এ প্রস্তাবটা।

রমেশ ঠাকুর্দা কিন্তু আদৌ চটে ওঠেন নি। বলেছিলেন, 'ও মা, তা করব না কেন? কাজটা পেলে তো বেঁচে যাই ভাই! এতে আবার এত 'কিন্তু' হবার কি আছে?...দ্যাখ্ নন্দ—পষ্ট কথা বলছি, আজ যে আমার অভাব বলে তা নয়, বামুনের ছেলে গঙ্গার ধারে বসে ভিক্ষে করে খেলেও বামুনই থাকব, কেউ বামুন বই শুদ্দুর বলবে না—তা নয়, এ জাতের ভণ্ডামিতে আমার অরুচি ধরে গেছে অনেকদিন।'

একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলেছিলেন, 'অনেক বামুন দেখেছি, অনেক দেখছি—তাদের কাছে চাকরি করা তো দূরের কথা তারা সিধে কি বিদেয় দিতে এলেও নোব না। তাদের কাছে ভবানী লাখো গুণে সোনা। ব্যবসা করতে বসে দুটো মিছে কথা বলে কি ওজনে ঠকায়—আমি জানি না, কথার কথা বলছি—সে আলাদা কথা, সে তবু বুঝি। মিছে কথা কে না বলে, দেহধারণ করলে বলতেই হবে, যুধিষ্ঠিরকে বলতে হয় নি? কেষ্ট বড়াই করেছিল কুরুক্ষেত্তরে অস্তর ধরব না, তাও ধরতে হয়েছে। কিন্তু মাথায় টিকি, গলায় পৈতে, অমুকের হাতে খাব না, অমুকের বাড়ি পা ধোব না, অথচ এক একটি অর্থপিশাচ সব, কেউ গয়না বন্ধক রেখেও চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিচ্ছে, কেউ বা জ্ঞাতিদের কেমন করে বঞ্চিত করবে—সন্দ্যে করতে বসেও সেই মতলব ভাঁজছে! নয়ত গরিব যজমানকে কি করে দুটো ফাঁকিবাজী কথা বলে দেঁড়েমুষে আদায় করবে—এই চিন্তা অষ্টপ্রহর। আর না হলে ঘরে বসে বিধবা ভাজের পেট খসাচ্ছে।...হাত্তোর বামুন। কলির বামুন আবার বামুন কি রে? কলিতে বামুন শুদ্দুরের দাসত্ব করবে—এ তো শাস্তরের বিধান!'

সেই থেকেই ওখানে চাকরি করছেন ঠাকুর্দা।

ভবানীদা তো বেঁচে গেছেন বললেই হয়। কারণ এটা সবাই জানে, না খেয়ে মরে গেলেও রমেশ মুখুজ্যে এক পয়সা ভাঙবে না, কি কোন তঞ্চকতা করবে না।

ভবানীদা উনি আসবার পর দোকানে বসাই ছেড়ে দিয়েছেন একরকম, এক আধবার আসেন, খোঁজখবর নেন, মাল কেনার দরকার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন, টাকাটা হিসেব বুঝে শুনে নিয়ে চলে যান। ভবানীদার ব্যবসার দিকে ঝোঁকটাই কমে আসছিল, পরে ঠাকুর্দার যখন আর মোটেই খাটবার অবস্থা রইল না—তখন দোকানই তুলে দিলেন। শুনেছি তারপর সন্ন্যিসী হয়ে গেছেন ভবানীদা।

সে যা-ই হোক—ভবানীদারও এমন অবস্থা নয় যে ওর থেকে বেশী মাইনে দেন। একটা চাকর রাখতে হয়েছিল, এটা ওটা খুচরো খরচও তো আছে। বিক্রী তো ঐ, দু'ওয়াগন কয়লাও এক মাসে কাটত না। কিন্তু ঠাকুর্দারও অন্য কাজ খোঁজবার কি করবার অবস্থা নয়।

তবে চলে কিসে?

এই প্রশ্নটাই আমাদের মনে বার বার দেখা দিত।

সে উত্তরটা দিয়েছিলেন আমার মা—কিছুদিন লক্ষ্য করে দেখবার পর।

সতীদিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিতেন, 'যোগেযাগে চলে যায় মা, বাবা বিশ্বনাথের রাজত্বে পড়ে আছি, তিনিই চালিয়ে দেন। নইলে বাবার নাম যে মিথ্যে হয়ে যাবে, তাঁকে লজ্জায় পড়তে হবে।'

মাও তাই বলতেন, 'সত্যিই যোগেযাগে চালায় বামনী। কি করে যে চালায় তা ও-ই জানে। বুড়োর কপাল ভাল তাই অমন বৌ পেয়েছে। শুধু রূপ নয়—রূপ তো অনেকেরই আছে, আগুনের মতো রূপ দেখেছি, যেখানে যায় আগুন ধরায়—এমন গুণ কোথায় পাবে? সর্বংসহা একেবারে, ধরিত্রীর মতো। ঐ তো ছিরির বর, তার জন্যে কী সহ্যই না করছে!'

আমরাও তারপর দেখেছিলুম লক্ষ্য করে—মার কথামতো।

কী না করেন ভদ্রমহিলা!

তখন ছোটখাটো যজ্ঞিতে হালুইকর ডাকত না কেউ—কাশীতে বিশেষ পাওয়াও যেত না। 'হাল্‌ওয়াই'—অর্থাৎ ওদেশী কচুরি লাড্ডু করবার কারিগর মিলত, কিন্তু বাঙালী যজ্ঞির লোক বিশেষ ছিল না।

সুতরাং কারও বাড়ি যজ্ঞি হলে মেয়েরাই মিলেমিশে কাজটা তুলে দিতেন; অবশ্য ছোটখাটো যজ্ঞি, ত্রিশ-চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন বড়জোর, তার বেশী হ'লে লোক ডাকতেই হ'ত। হিন্দুস্থানী হালুইকরই ডাকা হ'ত—কারণ কাশীতে তখন খুব বেশী যজ্ঞিতে মাছ মাংস হ'ত না। বিয়ে কি অন্নপ্রাশনেই মাছ হ'ত যা—তাও অল্প লোকের ব্যাপার হলে মেয়েরাই সেরে নিতেন।

এইসব ক্রিয়াকর্মের বাড়িতে সতীদি গিয়ে বুক দিয়ে পড়তেন, বলারও অপেক্ষা করতেন না।

ছোটখাটো ভোজের ব্যাপার যেখানে—সেখানে সব রান্না একাই তুলে দিতেন প্রায়, যেখানে দু-আড়াইশ'র ব্যাপার সেখানেও কুটনো কোটা যোগাড় দেওয়ার প্রশ্ন আছে, ওঁর কাজের অভাব হত না। অন্নপূর্ণা পুজো, কার্তিক পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো—এ সবেতে ভোগ রাঁধার ভার পড়ত তাঁর ওপর। নিরম্বু উপোসী থেকে অত শুদ্ধাচারে আর কে করবে?

তবে একটি শর্ত ছিল ওঁর। উনি না খেয়ে সারাদিন খাটতে রাজী ছিলেন, খাটতেনও তাই, খেলে খাটতে পারা যায় না—এই কারণ দেখিয়ে বড়জোর একটু শরবৎ কি একটু দই খেয়ে নিতেন একবার, ভোগ রাঁধার কাজ থাকলে তো চুকেই গেল—কিন্তু বেলা বারোটার সময় বুড়োর খাবারটি ঘরে পৌঁছে যাওয়া চাই।

পরিষ্কারই বলতেন, 'উনি আমাদের' কিম্বা 'তোমাদের মুখুজ্যেমশাই' ক্ষিদে একেবারে সহ্য করতে পারেন না। বারোটা বাজলেই ছটফট করেন, একেবারে ছেলেমানুষের বেহদ্দ হয়ে যান।...ঐটি আমার চাই ভাই—ঠাকুরদেবতা যা বলো সব মাথায় আছেন, মাথাতেই থাকুন—আমার সকলের ওপর উনি। ওঁর এই দুপুরের খাবারটি পৌঁছে দিয়ে আসব, তারপর বলো—সারা দিনরাত পড়ে আছি তোমার এখানে। রাতের খাওয়ার জন্যে অত তাড়া নেই, ঘরে চিঁড়ে আছে মুড়ি আছে—আমার দেরি হয় সে ঠিক জলে ভিজিয়ে একগাল খেয়ে নেবেখন্। দুপুরে কারও কথা শুনবে না!'

আর সে খাবারও—অপরকে দিয়ে পাঠানো চলত না।

মুখুজ্যেমশাই যার-তার হাতে খেতে পারতেন না। স্ত্রীর রান্না ছাড়া তো পছন্দই হ'ত না—সেই জন্যেই আরও, যজ্ঞিবাড়িতে গিয়ে সতীদি রান্নার দিকেই এগিয়ে যেতেন বেশির ভাগ—ঠাকুর্দা কুৎকুতে চোখ একটা টিপে বলতেন, 'যজ্ঞির ভাত, কলার পাত, মায়ের

হাত—লোকে কথায় বলে, ঐ শেষের শব্দটা একটু বদলে নিয়েছি, মাগের হাত করে নিয়েছি' বলে হা-হা করে উঠতেন—তাও যদি না হয়, তিনি সামনে ধরে দিলেই খুশী। কে কিভাবে দেবে, কি কাপড়ে আনবে, প্রত্যঙ্গ-বিশেষ চুলকোতে চুলকোতেই হয়ত সেই হাতে ধরবে, কিম্বা ঘাম পড়বে বা থুথু—এইসব বাছবিছার ছিল খুব বেশী।

সেই কারণেই যত কাজ থাক্—নিতান্ত দূরের পথ হ'লে হয়ে উঠত না, ভেলুপুরা কি কেদারঘাট থেকে তো আর আসা যায় না—তবে এই কাছাকাছি রামাপুরা কি লাক্সা কি খোদাইচৌকী কি সূর্যকুণ্ড হ'লে ঠিক বুকে ক'রে এনে পৌঁছে দিয়ে যেতেন এক ফাঁকে। তাতে ফিরে গিয়ে আবার কাপড় কাচতে হয় কি স্নান করতে হয়—কোন আপত্তি নেই।

দূরের পাড়ি হ'লে রাত তিনটেয় উঠে তোলা জলে বাসিপাট সেরে যা হোক একটু ভাতেভাত রেঁধে রেখে যেতেন, মাথার দিব্যি দিয়ে বলে যেতেন খাওয়ার আগে একটু 'ছিপারী' জ্বেলে যেন গরম করে নেন একবার।

কিন্তু এই এত কাণ্ড ক'রে ছুটে যাওয়া—শুধু একবেলা কি দু'বেলা ঠাকুর্দাকে ভালমন্দ লুচি-সন্দেশ-রাবড়ি খাওয়ানোর জন্যেই নয়।

এতে অন্যদিক থেকেও কিছু আমদানি হ'ত।

হয়ত আনাজ-কোনাজ অনেক এসে পড়েছে, দেখা গেল যজ্ঞি শেষ হবার পরও স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে আলু কি কপি কি মটরশুঁটি। স্বভাবতই গৃহিনীরা বলতেন, 'কিছু নিয়ে যাও না দিদি (কিম্বা মাসীমা কি বামুন মেয়ে—যেখানে যে সম্পর্ক) এখানে পচবে বৈ তো নয়।'

দিদি দু'একবার 'না না' ক'রে নিয়েও আসতেন। অল্প কিছু গামছায় বেঁধে আনলেও দুজনের সংসারে সাতদিন চলে যেত, তাছাড়া পোড়া ঘি (তখন সৌভাগ্যবশত বনস্পতি বাস্তুদেবতা হয়ে ওঠে নি) হয়ত অনেক বেঁচেছে, মাথাটাথা চুলকে গিন্নী বলে ফেললেন শেষ পর্যন্ত, 'বলতে তো পারি না দিদি, এতটা পোড়া ঘি, অপরাধ নেবেন না, আপনার মতো দেখেন বলেই বলছি—নিয়ে যাবেন একটু? মুখুজ্যেমশাইকে দু'খানা লুচি ভেজে দিতেন?'

এইভাবেই তেল, মশলা, মায় ফোড়ন পর্যন্ত আসত—বাড়ি-বিশেষ বা স্থান বিশেষে।

বাড়ি বিশেষে এই জন্যে বলছি, তেমন তেমন হিসেবী বাড়িতে বেশী কিছুই বাঁচে না, কমই পড়ে শেষের দিকে। আর স্থান বিশেষ অর্থাৎ—স্বল্প-পরিচিত লোকের বাড়ি, যেখানে অন্য কোন পরিচিত লোকের সুবাদে গেছেন—সেখানে নিতে বললেও দিদি নিতেন না, মিষ্টি কথায় নিরস্ত ক'রে চলে আসতেন।

তবে পাওনা এ-ই সব নয়।

এত যে মানুষটা এসে খাটলেন দুদিন তিনদিন ধরে,—যেখানে যেমন দরকার—মুখের রক্ত তুলে বলতে গেলে, তাকে শুধু উদ্বৃত্ত জিনিস কিছু দিলেই কর্তব্যের শেষ হয় না। নগদ টাকা অবশ্যই সতীদি নিতেন না—মানে পারিশ্রমিক হিসেবে হাতে হাতে—কিন্তু বিবেচক যে হয় সে দেওয়ারও অনেক উপায় জানে।

সেটা হঠাৎ-বড়মানুষীর ঔদ্ধত্য বা আত্ম-বড়মানুষীর দিন ছিল না। আমি আমার সুখের জন্যে বিলাসের জন্য মুঠো মুঠো টাকা খরচ করছি, এক টাকা কাউকে দিতে হ'লেও পকেট থেকে নোটের গাদা হাজার দেড় হাজার টাকা বার করছি, কিন্তু পাণ্ডা এলে

তাকে তেড়ে মারতে আসছি, মুটেকে দুপয়সা কম দেবার জন্যে লম্বা বক্তৃতা করছি—এখন এই লোকই বেশী। এরা দান করে—যদি বা করে—তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। সে দান নিরুপায় লোকেরও নিতে মাথা কাটা যায়।

তখনকার দিনে লোক দানও করত অতি সন্তর্পণে, বিনয়ের সঙ্গে। এর ব্যতিক্রমও হয়ত ছিল, তবে আমি ছেলেবেলায় যে কাশী দেখেছি—সেই কাশীর কথাই বলছি।

কাজকর্ম চুকে গেলে হয় বাড়ির কোন ছেলেকে দিয়ে (অব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে কোন ব্রাহ্মণ সঙ্গে দিয়ে) অথবা কোন ব্রাহ্মণের মেয়েকে দিয়ে একটি বড় ক'রে সিধা পাঠানো হ'ত, তার সঙ্গে সন্দেশ আলতা সিঁদুর—নতুন কাপড়। ফলে বিস্তর শাড়িকাপড় জমে যেত সতীদির। মুখুজ্যেমশাই বাড়িতে শাড়ি পরেই কাটাতেন, তা ছাড়াও অনেক সময় সতীদি দশাশ্বমেধের কোন চেনা দোকানে, কি এই বাড়ির অন্য ভাড়াটে কাউকে দিয়ে তার বদলে ধুতি নিতেন।

এই সিধার সঙ্গে সিকি-আধুলি বা কোন কোন জায়গায়—তবে সে খুব কমই—টাকাও আসত দক্ষিণা। সিধাতেও, সাধারণ সিধার মতো আধ সের চাল আধ পো ডাল না দিয়ে লোক বেশী ক'রেই দিত, ধামা বা ঝুড়ি ক'রে—চাল ডাল ঘি তেল সৈন্ধব লবণ, মশলা আনাজ—দশ-বারো দিন পর্যন্ত চলে যেত দুজনের অনেক ক্ষেত্রে।

এ ছাড়াও ছিল।

এইভাবে একজনের মারফৎ আর একজনের পরিচিত হয়ে হয়ে পরিচয়ের পরিধিও বেড়ে গিয়েছিল।

কাশীতে সেকালে সধবা-কুমারী-পুজো করার রেওয়াজ খুব বেশী ছিল। পুজোর সময় তো বটেই—তীর্থ করতে এলেও নতুন মহিলা যাত্রীরা এসব করতেন।

অন্নপূর্ণার রাজত্বে এসে সধবা-পুজোয় খুব মহাত্ম্য। সধবা বামুনের মেয়েকে অন্নবস্ত্র দান করলে আর কখনও ও দুটির অভাব থাকবে না—এই বিশ্বাস ছিল। সে প্রয়োজনেও পরিচিত কেউ কাছাকাছি থাকলেই অথবা জানতে পারলেই সতীদিকে ডেকে আনতেন। নিজস্ব গুরুপত্নী কি পুরোহিত পত্নী থাকলে আলাদা কথা—তবে নতুন যাত্রীদের পুরোহিত আর কোথায়—থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ওঁকেই পছন্দ করতেন যাত্রীরা। জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ, মধুর স্বভাব আর সর্বোপরি এই আশ্চর্য সতীত্ব—ঐ স্বামীকে কেউ অমন ভালবাসতে ভক্তি করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না, কাশীর মতো দরিদ্র জায়গাতেও হাজার হাজার টাকার প্রলোভন এসেছে ওঁর যৌবনকালে—সব জড়িয়ে সতীদি একটা কিম্বদন্তীর মতো হয়ে গিছলেন। যদি কোন সধবাকে দেবীজ্ঞানে পুজো করতেই হয়—তাঁকেই করতে চাইবে মানুষ, এ তো স্বাভাবিক।

সেও শাড়ি, সন্দেশ, দক্ষিণা। যাঁরা জানতেন ওঁদের অবস্থা, তাঁরা ইচ্ছে ক'রেই—এই ছুতোয় কিছু সাহায্য করবেন বলেই—একটা সিধাও দিতেন ঐ সঙ্গে—যাঁর যা সামর্থ্য।

এইটেই ছিল সতীদির যোগেযাগে চালানো।

॥ ৪ ॥

স্বল্পপরিচিত লোকদের মনে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যেত—স্ত্রী এত কাণ্ড ক'রে সংসার চালান; ঠাকুর্দা কিছু রোজগার করার, স্ত্রীকে একটু রেহাই দেবার চেষ্টা করেন না কেন?

এটার সোজাসুজি উত্তর অবশ্য কোনদিনই পাই নি ঠিক। উত্তর পেয়েছি অন্য পরোক্ষ প্রশ্ন ক'রে।

ঠাকুর্দা আর কী কাজই বা করতে পারেন?

এর সোজা জবাব—কেন, যজমানি?

সত্যি, কাশীতে এত বাঙালী, ক্রিয়াকলাপও তো লেগেই আছে।

আর চালাচ্ছেও তো অনেকে।

বড় বড় পণ্ডিত যাঁরা, মহামহোপাধ্যায়—তাঁরা এসব কাজ করেন না, নিজেদের বাড়ির পুজোও করেন না অনেকে! বড়জোর বিদায় নিতে যান। তেমনি তাঁদের অবস্থাও ভাল নয়। প্রভাস পণ্ডিত মশাইকে আমরাই তো দেখেছি, অত বড় পণ্ডিত গুণী লোক—সামান্য চাকরি করে দিনাতিপাত করেন, গৃহিণীর মুখনাড়া খান।

কিন্তু যজমানি করেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই কাশীতে দু'তিনখানা বাড়ি করেছেন, তাঁদের বাড়ির সিন্দুক খুললে কত মণ বাসন বেরোবে তার ঠিক নেই। আমাদের পুরোহিত মশাইকেই তো দেখছি।

সুতরাং ঠাকুর্দা সম্বন্ধে সেই প্রশ্নটাই স্বাভাবিক।

বুড়ো হয়েছেন বটে, কিন্তু এমন বুড়ো হন নি যে যজমানি করা চলে না। চাকরি করছেন পরের—আর লক্ষ্মীপুজো মনসাপুজোয় দুটো ফুল ফেলে আসতে পারেন না? শরীর খারাপ হয়, বড় বড় পুজো—দুর্গাপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো না হয় না-ই করলেন—ষষ্ঠীপুজো, মনসাপুজো, লক্ষ্মীপুজো করলেও তো ওঁদের সংসার বেশ চলে যায়। সতীদিকে এমন উঞ্ছবৃত্তি করতে হয় না।

'এই তো সরস্বতী পুজোয় ছেলেরা পুরুত পায় না। ছুটোছুটি করে একটা পুরুতের জন্যে—হা-পিত্যেশ ক'রে বসে থাকে নাড়ি চুঁইয়ে'—আমার মা-ই গজগজ করতেন, 'পৌষমাস, ভাদ্রমাস, চৈত্রমাসে—খন্দপুজোর বেলাতেও তো দেখি অমনি পুরুতের আকাল। ভদ্রলোক এগুলোও তো করতে পারেন। সারা মাস সাড়ে ছটা থেকে এগারোটা আর তিনটে থেকে ছটা—কয়লার দোকানে হাজরে দিয়ে বুঝি পাঁচ টাকা না ছ'টাকা পান—একটা লক্ষ্মীপুজোর দিনেই তো ও কটা টাকার ঢের বেশী উশুল হয়ে যাবে।'

অনেকদিন পরে এ প্রশ্নটা করেছিলুম রমেশ ঠাকুর্দাকে।

আমাদের সঙ্গে পরিচয়ের বেশ ক'বছর পরে।

একটা 'হ্যাঁ———।' বলে ইংরেজিতে যাকে বলে 'নন্ কমিটাল' শব্দ ক'রে—অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন ঠাকুর্দা।

ঐটে ছিল ওঁর একটা মুদ্রাদোষ। 'হ্যা' বলে শব্দটা উচ্চারণ ক'রে শেষের স্বরটা অনেকক্ষণ ধরে টানতেন। কোন প্রসঙ্গের আগে বা পরে অকারণেই ঐ সংক্ষিপ্ত শব্দটি ব্যবহার করা অভ্যাস ছিল। ওটা স্বীকৃতিবাচক বা সম্মতি-সূচক 'হ্যাঁ' শব্দ নয়—ওটা ওঁর কাছে অনেকখানি বক্তব্যের সার।

বহু চিন্তা, বহু দ্বন্দ্ব, বহু সমস্যার দ্যোতক।

অনেক না-বলা কথার ইঙ্গিত। মানে ওঁর কাছে।

সেদিনও ঐ শব্দটা উচ্চারণ ক'রে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন,—পৃথিবীর বোধ-হয় ক্ষুদ্রতম চোখ দুটি পিট্ পিট্ করতে করতে।

তারপর বললেন, 'তোর মতো আরও অনেকে এ-কথাটা জিজ্ঞেস করেছে নাতি, উত্তর দিতে পারি নি। দিলে বুঝত না। ছুতো মনে করত, বাজে ছুতো। তুইও যে সব বুঝবি তা নয়—তবে বলছি এই জন্যে যে, তুই তোর ঠান্‌দিকে খুব ভালবাসিস, তা আমি লক্ষ্য করেছি। আসলে তার জন্যে তোর কষ্ট হয় বলেই জিজ্ঞেস করছিস। সেইজন্যেই তোকে বলছি, কথাটা শোনা থাক্। এ আমার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া রইল—তোদের সকলের হয়ে তোর কাছে।..... বুঝবি কি না বুঝবি, অত ভাবতে গেলে চলবে না। এখন না বুঝিস পরে বুঝবি। নয়ত আর কেউ বুঝবে।...তবে তুই যা এঁচোড়ে-পাকা দেখি—এই বয়সে গাদা গাদা নবেল-নাটক শেষ করছিস, তুই বুঝলেও বুঝতে পারিস!'

এই ব'লে একটু থামলেন, খক খক ক'রে কাশলেন কিছুক্ষণ ধরে। চোখের পিঁচুটি মুছলেন, তারপর তেমনি পিটপিটে চোখ আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ ক'রে বলতে শুরু করলেন।

তবে চোখ আমার মুখের ওপর থাকলেও মনটা সেখানে ছিল না এটা বুঝতে পারলুম। কোথায় কোন্ সুদূরে চলে গিয়েছিল, এ কৈফিয়ৎ উনি আমাকে দিচ্ছিলেন না, সমস্ত পরিচিত মানুষকেই দিচ্ছেন, এখনই বললেন—কিন্তু তাই কি, মনে হ'ল এ উনি নিজেকেও দিচ্ছেন, নিজের বিবেককে। আর সঙ্গে সঙ্গে করুণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

'দ্যাখ—পুরুত বামুনের ঘরেই জন্মেছিলুম। আমার বাবাও যজমানি করতেন। পাড়া-গাঁ জায়গা, শুনতেই হরিনাভি-রাজপুর—পুরনো বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখন কি হয়েছে জানি না, আমার ছেলেবেলায় খুবই ভগ্নদশা অবস্থা ছিল, বন-জঙ্গলে ভরা। যাদের ক্ষ্যামতা আছে তারা সবাই কলকাতায় বাস করত—কস্মিনকালেও কেউ দেশে যেত না। বরং আরও দক্ষিণে, বারুইপুর কি তারও দক্ষিণে অনেক বড় বড় লোক থাকত শুনেছি। আমাদের ওখানে তো জ্ঞান হয়ে অব্দি দেখছি বড় বড় পুরনো বাড়ি সব ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, নয়ত বট অশথ গাছ গজাচ্ছে। কেউ আর আসেও না, মেরামতও করে না। হয়ত কোন শরিকের অবস্থা খারাপ, তার শহরে যাবার উপায় নেই—তারাই ভাঙা বাড়ির যেটুকু বাসযুগ্যি আছে, ভোগদখল করছে। নয়ত আমাদের মতো দীন-দরিদ্র লোক,—আধপাকা আধকাঁচা বাড়িতে মাথা গুঁজে আছে। আমাদের বাড়ির দ্যাল ছিল পাকা, পাকা মানে ইঁটের—মাটির গাঁথুনি—মেঝেটা অবিশ্যি শানের, চুন দিয়ে পেটা, তখন এত বিলিতি মাটির চল হয়নি—চাল গোলপাতার।

'তা ঐ যা বলছিলুম, তবু ঐ দেশেও আমার বাবা যজমানি ক'রেই—ক'রে খেতেন। এক আধ বিঘে জমি ছিল, নামে-মাত্তর, বছরে তিন মাসের খোরাকও হত না। যা কিছু ভরন্তর ঐ ক'ঘর যজমানের ওপরই।

'হ্যাঁ, বাবা অবিশ্যি খাটতেনও—লক্ষ্মীপুজো, মনসাপুজো কি সরস্বতী পুজোয় দেখেছি—দূরদূরান্তেও যাচ্ছেন, ভোর থেকে উঠে শালগ্রাম মাথায় ধ'রে পাঁই পাঁই ক'রে ছুটছেন আলের ওপর দিয়ে; গ্রীষ্মকালে রাত চারটেয় উঠে বাড়ির পুজো সেরেই বেরিয়ে পড়তেন, শীতে সেটা বড়জোর পাঁচটা হ'ত, বেরোতেন অন্ধকার থাকতেই—ইংবিজি মতে বেস্পতিবার ধ'রে আমাদের পুজোটা হ'ত আর কি—দূর পাল্লায় আগে বেরিয়ে

যেতেন, পৌঁছতে পৌঁছতে সকালটা হয়ে যায় যাতে। তাদের হুমকি দেওয়া থাকত, "রাত থাকতে থাকতে গোছগাছ ক'রে রাখবে, এসে না দাঁড়াতে হয়। যদি ফিরে যাই—যার নাম বেলা চারটে—ইটি মনে রেখো"।

'মনে তারা রাখত। প্রাণের দায়ে মনে রাখত। সত্যিই ওঁর সব বাড়ির পুজো সেরে ফিরতে ফিরতে চারটে সাড়ে-চারটে গড়িয়ে যেত। শীতকালে দেখেছি এক একদিন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে ফিরতে।

'তেমনি ওতেই সংসারও চলত। আমরা একপাল ভাই বোন, বিধবা জ্যাঠাইমা, জাঠতুতো একটা আধ-পাগলা ভাই, এক বরে-খেদানো পিসি—বাবার মামাতো বোন; এতগুলি লোকের ডালভাত খেয়ে মোটা কাপড় প'রে দিন কেটেই যেত একরকম ক'রে।

'বোনদের বে-ও দিয়েছেন বাবা ওর মধ্যেই। দুটো তো দেখেই এসেছি, পরেরগুলোও কোন্ না দিয়েছিলেন। আর সে বে-ও বড় চাট্টিখানি কথা নয়, চেহারা তো আমাকে দেখেই মালুম পাচ্ছ—কেমন সব কন্দর্পকান্তি—এই রকমই ছাঁচ ধরো—উনিশ-বিশ।

'ঐটেই হ'ল কিন্তু কাল। এর ভেতরের দিক, মানে এই পুজোর অন্দরমহলের দিক—থ্যাটারে তোরা যাকে গিরিণরুম বলিস, সেটা আমার আগেই দেখা হয়ে গেল, পাছার ফুল না ছাড়তে ছাড়তে। জ্ঞান হওয়ারও আগে বলতে গেলে—মানে উরির মধ্যেই তো মানুষ। কত যে ফাঁকি তা অবশ্য তখনও জানি না। শুধু জানি যে বাবা পুজোয় বেরোবার আগে সেই শেষ রাত্তিরেই এক গাল চিঁড়ে কি এক গাল পান্তাভাত খেয়ে নিতেন, দুর্গাপুজোতে জগদ্ধাত্রীপুজোতেও, সারা রাতের পুজো হলে তো কথাই নেই—যেমন ধরো কার্তিক পুজো—সে তো দিব্যি ক'রে মাছ ভাত সাঁটতেন। বলতেন, "রাতের পুজো, রাতে না খেলেই হ'ল। দিনের পুজো সব আগের দিন রাত্তিরে খেয়ে যদি হয়—এটা হবে না কেন?" তিনি যে দিনের পুজোতেও দিনেই খেতেন—সেটা তখন মনে থাকত না।

'তারপর কথাবাত্তারাও তেমনি। ফিরে এসে নৈবিদ্যির পুঁট্লি খুলে যে গালাগাল দিতেন রে ভাই—কি বলব।...কে মোটা চাল দিয়েছে, কে ক্ষুদের মতো ভাঙা চাল, কে কম দিয়েছে, কে ধুতির বদলে গামছা দিয়েছে, কে গুণচটের মতো কাপড় দিয়েছে—এই নিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল দিতেন যজমানদের, মানে সে মুখ খারাপ ক'রে একেবারে। শাপশাপান্তও করতেন অনেক সময়। "সব্বনাশ হবে, সব্বনাশ হবে, নিব্বংশ হবে সব। দেবতা-বামুনকে ফাঁকি দিয়ে যে পয়সা জমাচ্ছেন সে পয়সা ওষুধে-ডাক্তারে বেরিয়ে যাবে, শ্মশানঘাটে খরচ হবে। ভোগ করবার লোক থাকবে না, যক দিয়ে যেতে হবে"—এমনি ধারা।

'খুব খারাপ লাগত ভাই, সত্যি বলছি।

'কেন লাগত, তা জানি না। ঐ বাড়িতেই তো আমরা এতগুলো প্রাণী ছিলুম—কই, আর কারও তো লাগত না! বরং দাঁত বার ক'রে হাসত আমার ভাইবোনেরা।

'বোধহয় আমাকে সংসারে পাঠাবার সময় সাধারণ বিধাতার হাত-জোড়া ছিল, ভিন্ন বিধাতার ওপর ভার পড়েছিল আমাকে গড়বার। আমার মনে হ'ত, আহা, ওরা ওদের অবস্থামতো সব দিয়েছে, আর এই বারোমেসে পুজোতে কে এত ছিষ্টি খরচা করে। এ নিয়ে এত বলবার কি আছে? এত যদি ঠকেছি মনে করেন, আগে থাকতে বন্দোবস্ত ক'রে নেন না কেন, এত পেলে যাব—নইলে যাব না?

'তবু কি জানিস, বাবা যেমন বিদ্যে নিয়ে পুরুতগিরি করতেন, পাঠশালে পড়া শেষ হবার পরই যদি আমাকে ঐ জোয়ালে জুড়ে দিতেন,—দুটো অং বং চং, নিজে যা জানতেন তাই শিখিয়ে—আমিও হয়ত অত কিছু ভাবতুম না। বাবার মতোই দিনগত পাপক্ষয় ক'রে যেতুম! পাঠশালার পড়া শেষ করতেই ঢের বয়স হয়ে গিয়েছিল, তার অনেক আগে পৈতে হয়ে গেছে।

'বাবা গেলেন অন্য পথে। তাঁর মনে মনে একটা ভয় ছিল, একটা দুঃখুও বলতে পারো—তিনি লেখাপড়া জানতেন না ব'লে ভরসা ক'রে কোন বড় জায়গায় ভাল জায়গায় যজমানি করতে যেতে পারতেন না। পাছে কেউ ভুল ধরে ফেলে, কোন মন্তরের মানে জিজ্ঞেস করে। সে সময়টা ইংরেজি-জানা বাবুদের খুব একটা বাহাদুরি ছিল, পুরুত বামুনদের অপদস্থ করা। তাছাড়া এদান্তে যজমানরাও একটু-আধটু লেখাপড়া শিখছিল বলে বাবা মনে করলেন একেবারে ফাঁকিবাজির ওপর আর চলবে না, পেটে একটু কিছু থাকা দরকার।....

'একটা ছড়া খুব চলত আমাদের আমলে। অধিক বিদ্যে কানে ফুঁ, অল্প বিদ্যে শাঁখে ফুঁ, আর ন চ বিদ্যে উনুনে ফুঁ—বামুনের এই তিন কম্ম। মানে যে লেখাপড়া জানে সে গুরুগিরি করবে, কানে মন্তর দেবে; যে তার চেয়ে কম জানে সে যজমানি করবে, আর যে কিছুই জানে না সে রান্না করবে, রাঁধুনী বামুন হবে। তা সে আর ছিল না, ন চ বিদ্যেয় শাঁকে ফুঁ চলছিল। বাবার মনে হ'ল যে এভাবে আর চলবে না, একটু অন্তত মন্তরের উচ্চারণগুলো রপ্ত হওয়া দরকার। সেই জন্যেই—হরিনাভিতে এক সসেমিরে গোছের টোল ছিল, আধমরা, নিহাৎ সামান্য কিছু সরকারি বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল ব'লেই চলত—সেইখানে ভর্তি ক'রে দিলেন। আমাদের বাড়ি থেকে ক্রোশখানেকের মতো পথ বেলা দুপুর নাগাদ খেয়ে-দেয়ে রওনা দিতুম, বাড়ি ফিরতে যার নাম রাত আটটা।

'তা হোক—তখন চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স—দু'ক্রোশ পথ হাঁটা আমার কাছে কিছুই নয়। আমার মনটা ভেঙে গেল অন্য কারণে! তখন ইংরিজি পড়ার রেওয়াজ হয়ে গেছে আমার পাঠশালার সাথী যারা তারা সকলেই ইংরেজি ইস্কুলে ভর্তি হ'ল—আমার মনে হ'ল আমি এ কি শিখতে যাচ্ছি!

'সংস্কৃত তখন আর টোলে কেউ শেখে না—ইংরেজি ইস্কুল যেটুকু শেখায় তাতেই কাজ চলে যায়—নিহাৎ আমাদের মতো যাদের অন্য কোন গতি নেই, এমনি দু-চারটি ছাত্র নিয়ে টোল চলে। একেবারে কোন ছাত্র না থাকলে 'গ্র্যান্ট' বন্ধ হয়ে যাবে—তাই অধ্যাপক মশাই-ই একরকম খুঁজে-পেতে ছাত্র ধরে আনতেন।

'তবু, কী আর করা যায়, এই ভেবেই পড়তে লাগলুম। কাব্য আর ব্যাকরণ, বাবা বলেছিলেন পড়তে। পড়ব কি—পণ্ডিত মশাই আজ অমুক জায়গায় বিদেয় নিতে যাবেন, অমুক গ্রামে দীক্ষা দিতে যাবেন, অমুকের পৈতেতে আচার্যির কাজ করবেন; অমুকের বে—তাঁর লেগেই থাকত একটা না একটা। পড়ার দিনের থেকে অনধ্যায়ের দিন তিনগুণ। তিনিই বা কি করবেন, তাঁকেও খুব দোষ দিই না—আমরা কেউই মাইনে দিতুম না, সরকারি বৃত্তিটুকু ভরসা। সেও ঐ নামে মাত্তরই। তাতে তো আর দিন চলে না—তাই গুরুগিরি পুরুতগিরি অধ্যাপকগিরি সবই করতে হত। আগেকার আমলে শুনেছি টোলেই ছাত্ররা খেতে পেত থাকত—সে দিন আর ছিল না। সেই জন্যে যে পড়াটা দু'বছরে হবার কথা—সেটা তিন বছরেও শেষ হ'ত না।

'এধারে আমার বাবা অধৈর্য হয়ে উঠলেন। আদ্য পরীক্ষা দেব বলে তৈরী হচ্ছি, বাবা বললেন, "আর পরীক্ষার দরকার নেই, টোল ছেড়ে দে। আমার যেটুকু দরকার হয়ে গেছে, এতেই কাজ চলবে। এখন আমার কাছে ক্রিয়াকর্মের প্যাঁচগুলো শিখে নে—তাতেই হবে, আমাদের দশকর্মের কাজ, ওর বেশী লাগবে না"।

'এতদিন ভাই বাবার কথা অন্ধভাবে মেনে এসেছি। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও। কিন্তু এবার আর পারলুম না।

'আসলে অন্ধ ছিলুম বলেই এতকাল মেনেছি, অত অসুবিধে হয়নি। বাবাই একটুখানি চোখ ফুটিয়ে দিতে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারলেন।

'লেখাপড়া যাকে বলে তা কিছুই শিখিনি, তবু একটু যা মাথায় গিছল তাতেই বুঝেছি দশকর্ম অত সহজ নয়। পণ্ডিত মশাই নিজেও ওসব ক্রিয়া তত জানতেন না, তবে তাঁর বাড়িতে পুঁথি ছিল ঢের। তিনি প্রায়ই একটি ছড়া কাটতেন—আমার বাবাকে উদ্দেশ ক'রেই, পরে বুঝেছিলুম—"চণ্ডী মুণ্ডি কুশুণ্ডি পার্বণ—এই চার নিয়ে পুরোহিত ব্রাহ্মণ'। বলতেন, পাকা পুরোহিত হ'তে গেলে এই চার কাজ শেখা দরকার। চণ্ডী অর্থাৎ কালীপুজো; কালীপুজোয় যত ন্যাস মুদ্রা জানা দরকার হয়—এত দুর্গাপুজোতেও লাগে না। মুণ্ডি মানে মণ্ডল তৈরী করা—এখানে দুর্গাপুজোতেও তো দেখেছিস আমাদের গণেশ মহল্লার সতীশ ভট্‌চায পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে সর্বতোভদ্র মণ্ডল তৈরী করে—ঐ লোকটা জানে দশকর্ম, সব পুঁথি মুখস্থ—হ্যাঁ, যা বলছিলুম, কুশুণ্ডি মানে কুশণ্ডিকা যে করাতে জানে—ভাল ক'রে—তার যজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থা মোটামুটি জানা হয়ে যায়; আর পার্বণ মানে পার্বণ শ্রাদ্ধ। পার্বণ শ্রাদ্ধ যে নিখুঁতভাবে করাবে—তার কাছে সপিণ্ডকরণ খেলার সামিল।

'ওঁর এই কথাগুলো শুনতুম, আর বাড়ি এসে বাবার যা দু'একখানা পুঁথি ছিল সেইগুলো, কিংবা অনধ্যায়ের দিনগুলোয়—অত দূর হেঁটে গিয়েছি একটু তো জিরুতে হবে—পণ্ডিত মশাইয়েরই ক্রিয়াকর্ম বারিধি, নিত্যপূজা পদ্ধতি, দুর্গাপুজোর তিন-চার মতের পুঁথি—উল্‌টে দেখতুম।

'তাতে যা বুঝেছিলুম—মন্ত্রের মানে, ক্রিয়ার মানে, ন্যাস মুদ্রার মানে—বুঝেছি তো ছাই, হয়ত তিন আনা বুঝেছি, তেরো আনাই বুঝিনি—তান্ত্রিক ক্রিয়া তো কিছুই বুঝিনি—তবু একটা যা ঝাপসা ঝাপসা ধারণা হয়ে গিয়েছিল তাতেই বুঝেছিলুম—বাবা কিছুই জানেন না আর যজমানদের কী ফাঁকিই দেন! তারা সরল বিশ্বাসে ওঁর ওপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাকে—উনি একেবারেই ঠকিয়ে চলে আসেন। তাতেও পাওনা কম হ'লে অত রাগ, অত শাপমন্যি।

'আরও কি বুঝলুম জানিস—দোষ কোন পক্ষেই কম নয়। ছোটবেলাতেই—মানে পৈতের পর আর কি, বাবা কদিন সঙ্গে ক'রে ঘুরেছিলেন। সেই সময়ই দেখেছিলুম, যজমানরাও—একটু লেখাপড়া শিখেছে কি শেখেনি, হয়ত ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত ইংরেজির দৌড়—তারা কী ঘেন্নার চোখেই না দেখে পুরুতকে। মেয়েরা একরকম, তারাই পুজোর যোগাড় করে, ছেদ্দাভক্তিও তাদের আছে, পুরুষরা—বিশেষ বামুন কায়েতের ঘরের পুরুষরা—বোধহয় কুকুর-বেড়ালেরও অধম ভাবে পুরুত জাতটাকে।

'আমিই ভুল বলছি, কুকুর বেড়াল তো শখ ক'রে পোষে লোকে, ভালবাসে, আদর করে; এদের চোর জোচ্চোর বলেই জানে—পুরুতদের। ডাকতেও হয়—সমাজ আছে,

দশবিধ সংস্কারে না ডাকলে চলে না। বে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, পৈতে—এগুলো তো চাই পুরুতের যেটুকু কাজ সেটুকু নিদেন লোকদেখানো না হ'লে আসল যেটা—খ্যাটের ব্যাপার সেটা তো হয় না, তাই ডাকতেও হয়, কিন্তু কেবলই মনে করে ব্যাটারা ঠকিয়ে নিচ্ছে

'তাছাড়া, গরীব-দুঃখী মুখ্যু-সুখ্যু লোক যারা—তারা সাধ্যমতো দেয়। যারা বাবুভাই নিজেদের লেখাপড়া জানা লোক মনে করে—তারা সাধ্যমতো কম দিতে চেষ্টা করে বে'-তে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে, বিদ্ধিশ্রাদ্ধর ফর্দ করতে বসো দিকি, সেখানে যত পারবে কারণকষ্যি করবে। ছ'পয়সা সেরের চাল, তাও যদি আধসের দিতে পারে তো তাই দেয়। তেমনি পুরুতরাও হয়ে গেছে ছ্যাঁচড়া—তারাও চায় যত রকমে পারে প্যাঁচ দিয়ে—এটা ওটা ভাঁওতা দিয়ে বেশী আদায় করতে।...এই টানাটানিটাই আমার খুব খারাপ লাগত। লাগত বলি কেন, এখনও লাগে। দেখছি তো চারদিকেই—'

এই বলে চুপ ক'রে গেলেন ঠাকুর্দা। আগে ভাবলুম দম নিতেই বুঝি থামলেন—কিন্তু একটু পরে মনে হ'ল তা নয়, উনি যেন মনের কোন্ অতলে তলিয়ে গেছেন। এখানে দেহটা থাকলেও মনটা চলে গেছে সুদূর অতীতে।

আরও খানিকটা সময় নিয়ে আস্তে আস্তে বললুম, 'তারপর?'

'তারপর?...তারপর আর কি, ঐ নিয়েই খিটিমিটি বাধল। বিষম অশান্তি, বাবা গোড়ায় চেঁচামেচি করলেন, তারপর গালাগাল, কাকুতি-মিনতিও করলেন শেষে। মাকে দিয়ে বলালেন, জ্যাঠাইমাকে দিয়ে—তাঁরা কান্নাকাটি করলেন। মা—একদিকে ছেলে একদিকে স্বামী—দোটানায় পড়ে একদিন ঢিব্ ঢিব্ ক'রে আমার সামনে মাথা খুঁড়লেন জ্যাঠাইমা বোঝালেন, "তুমি বড় ছেলে, এতবড় সংসারের দায়িত্ব একদিন তোমার ঘাড়েই পড়বে, তুমি এমন অবুঝ হ'লে চলবে কেন? মানুষে জীবিকার জন্যে কত হি হীন কাজ পর্যন্ত করছে—দেখছ তো চারদিকে—এ তো তবু সম্মানের কাজ। বেশ তো তুমি যা জানো সাধ্যমতো জ্ঞানমতো সেইভাবেই করবে, ফাঁকি দেবে কেন? তাতে দু'ঘর কম টানতে পারো তাই টানবে। এখুনি তো তোমায় এত খাটতে হচ্ছে না, এখনও তো মাথার ওপর ঠাকুরপো রয়েছেন। আর ছ্যাঁচড়াবিত্তি না পোষায়, তাও ক'রো না। যে যা দেয় তাই নিয়ে চলে আসবে—একটু কিছু তো দিতেই হবে—যে যতই কম দিক তাই নেবে"।...

'ভাল কথাই বলেছিলেন। কিন্তু আমি জানতুম—এ কাজে ঢুকলে অত সহজে পার পাবো না। যার যা—একদিন ঠিক অমনিই ছ্যাঁচড়াবৃত্তি করতে হবে, একদিন অমনিই ফাঁকি দিতে হবে। আজ বাবা আছেন ঠিকই, যখন থাকবেন না, এই নারদের সংসার চালাতে হবে—তখন আমাকেও একবেলায় কুড়ি ঘর বজায় দিতে হবে, তখন ঐ কোনমতে ফুল ফেলা ছাড়া আমারও গতি থাকবে না, মনে মনে বলতে হবে, ঠাকুর সবই তো বুঝছ, আমার আর সময় নেই। "আমি ঠাকুর হাব্লা গোব্লা ভোগ, খাও ঠাকুর খাব্লা খাব্লা"—সেই রকম আর কি।...

'পুজো, জানিস নাতি, অনেক রকমেই করা যায়, দশ দিকপালের আলাদা আলাদা নাম ক'রে ক'রেও করা যায়, গণেশাদি পঞ্চদেবতাও তাই—আবার একটা ফুলের পাপড়ি দিয়ে 'ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্য নমো, গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্য নমো," বলেও সারা যায় মরশুমের দিন তাও হয়ে ওঠে না, 'ওঁ' বলে একটা হুঙ্কার ছেড়ে, দুটো হাততালি দিয়ে কটা ফুল ছিটিয়ে দিলেই হ'ল। কে দেখতে যাচ্ছে, কে পরীক্ষা নিচ্ছে?

'মোদ্দা কথা—ওঁরা যত বলেন আমার তত জেদ চেপে যায়। শেষে একদিন পরিষ্কার বলে দিলুম বাবাকে যে, "আপনার নাম ক'রেই দিব্যি গালছি, যজমানি কাজ জীবনে করব না—খেতে পাই ভাল, না পাই ভাল"।'

আবারও থামলেন। মনে হ'ল গলাটা ধরে এল যেন। চোখ দেখা যায় না ভাল ক'রে তবু মনে হ'ল সে দুটোও ছলছল করছে। হয়ত অনুশোচনা, হয়ত অকৃতজ্ঞতাবোধের লজ্জা।

আরও খানিক পরে, আবারও মৃদুকণ্ঠে মনে করিয়ে দিলুম, 'তারপর?'

'হ্যা— —।' ক'রে একটা হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'তারপর এই। সেই জন্যেই যজমানি আর করতে পারি না। বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর পায়ে ধরে মাপ চেয়ে কথা ফিরিয়ে নিতুম। সে পথ আর নেই।...তা ছাড়াও দিব্যি অত মানি না, তবে এ নিয়ে অনেক দুঃখ দিয়েছি তাঁকে—তাঁদের, অনেক বেইমানি করেছি, এখন বৌকে সুখে রাখার জন্যে সে কাজ করলে নরকেও আমার ঠাঁই হবে না। তার চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাব সেও ভাল, নইলে—মা গঙ্গার তো জল শুকোয়নি, বুড়োবুড়ি গিয়ে গা-ঢালা দোব।'

এই বলে একেবারেই চুপ করলেন। পাছে আমি আরও প্রশ্ন করি, আরও খোঁচাই—উঠে চলেই গেলেন সেখান থেকে।

॥ ৫ ॥

এইরকমই মানুষ ছিলেন রমেশ ঠাকুর্দা।

সেকেলে বুড়ো মানুষ, লেখাপড়া কম জানতেন, পাড়াগাঁয়ের লোক—কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল একেবারে আমাদের কালের। তাঁর কালের সঙ্গে তিনি কিছুতে খাপ খাওয়াতে পারতেন না তাই। সব জিনিসটাই তিনি নিজের মতো ক'রে ভাবতেন—নিজের মনে সত্যমিথ্যা দোষগুণ ভালমন্দ যাচাই ক'রে নিতেন। সাধারণ নীতিদুর্নীতি, পাপপুণ্য সম্বন্ধেও তাঁর মতামত ছিল বেয়াড়া—কারও সঙ্গেই মিলত না।

একবার মনে আছে—আমাদের বাড়িতে কোন ঘটনা নয়—বোধহয় প্রয়াগবাবুর মা কী একটা বার-ব্রত উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন, তারই ফর্দ হচ্ছিল। আমার মনে আছে, কারণ আমি সেখানে ছিলুম, ব্রাহ্মণের তালিকা করার সময় রমেশ ঠাকুর্দা ফট্ ক'রে নগেন মল্লিকের নামটা ক'রে বসলেন।

বেশ মনে পড়ে, কিছুক্ষণের জন্যে ঘরসুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হয়ে গেল—স্রেফ বিস্ময়ে। কারও মুখে একটা কথা সরল না।

এমন লোকের নাম যে করা যায়, কোন পুণ্যকর্মের উদ্দেশ্যে এমন লোককে ডেকে ব্রাহ্মণ ভোজন করানো যায়—এ কোন সুস্থ সচেতন-মস্তিষ্ক লোক ভাবতেও পারে না।

এমন কি, সেই বয়সেই, আমিও জানতুম ভদ্রলোকের কেলেঙ্কারির ইতিহাস। নগেন মল্লিককে, প্রায় সবাই চেনে, মানে এখানের বাসিন্দারা সকলে। বিশ্বনাথের গলি ছাড়িয়ে গঙ্গার দিকে যেতে—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের শিবমন্দিরের পরেই যে একসার দোকান, তারই একটা ওঁর ছিল, "কারবাইড্/গ্যাসের মশলা/এইখানে পাওয়া যায়" দেওয়ালের গায়ে বড় বড় হরফে আলকাতরায় লেখা—যাঁরা সে সময় কাশীতে গেছেন তাঁরা দেখে থাকবেন—মনেও আছে নিশ্চয়। ভদ্রলোক নাকি তাঁর এক বিধবা মাসীকে নিয়ে—আপন মাসী—এখানে এসে বাস করছেন স্বামী-স্ত্রীর মতো। ছেলেমেয়েও

অনেকগুলি হয়েছে। এমনি খুবই ভদ্রলোক, শুধু কারবাইডে চলে না বলে, কাঠকয়লা, কিছু কিছু লোহার জিনিস, বালতি প্রভৃতিও রাখেন আজকাল। তাঁর চরিত্র যেমনই হোক, তাঁর স্বভাব কি তাঁর সততা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কোন খারাপ ইঙ্গিতটি পর্যন্ত করতে পারেনি। তবু—একে তো বে-আইনি সম্পর্ক—তার ওপর আপন মাসী!

লক্ষ্মীবাবুও সেখানে ছিলেন—বাড়িওলা লক্ষ্মীবাবু, প্রয়াগবাবু ওঁর কী রকম দূর সম্পর্কে মামা হন—তিনিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলেন, 'ও নামটা কি ক'রে করলেন কাকা। আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

আর একজন কে—মনে নেই ঠিক—বলে উঠলেন, 'তা ওঁর কি আর ভীমরতির বয়স হয়নি? ষাট তো পেরিয়ে গেছে কবেই। নেহাৎ প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন তাই—'

প্রয়াগবাবুর মা তাড়াতাড়ি সামলে নিতে গেলেন, 'না না, ও তামাশা করছে। তোরা অমন করছিস কেন?'

'হ্যা— —। বলি ভীমরতিটা কে দেখছে আমার তাই শুনি! নগের নাম করতে সব চমকে উঠলে যে একেবারে! খুব সব সাধুপুরুষ আমরা—না? কেউ কখনও কিচ্ছু করিনি, ভাজা মাছটি উল্টে খেতেও জানি না—সবাই এক একটি ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! রথ তো নেই, টাঙ্গা কি এক্কায় চড়লে চাকা চার আঙ্গুল উঠে থাকবে মাটি থেকে, মলে শিবদূত আর বিষ্টদূতে মারামারি লেগে যাবে—এ বলবে কৈলেসে নে যাই, ও বলবে গোলকে!'

তারপর, তেমনি পিটপিটে চোখে ভ্রূকুটি ক'রে সকলের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললেন, 'কেন, নগে কি বামুনের ছেলে নয়, না কি পৈতে ফেলে দিয়েছে, না তিনসন্ধ্যে গায়ত্রী করে না? না কি অজাত-কুজাত বিয়ে করেছে? মানলুম, বে-করা নয় এমন মেয়েছেলের সঙ্গে ঘর করে। তা এই যে লম্বা ফর্দ হচ্ছে বামুনদের, বড় বড় টিকি-আলা সব ব্রাহ্মণ—এরা কি সবাই চরিত্রবান নিষ্কলঙ্ক পুরুষ? ভাল ক'রে খবর নিয়ে তবে তোমরা ফর্দ করছ তো?'

হ্যা হ্যা ক'রে একটা তিক্ত হাসি হেসে নিয়ে আবারও বললেন, 'মাসী স্বীকার করছি। ন বছরে বে হয়েছিল, দশ বছরে বিধবা হয়েছে। বে'র ঐ আটদিন ছাড়া বরের মুখ দেখেনি, বে যখন হয়েছে তখন কিছুই জানে না—বর-কনের ব্যাপার, কোন যৌবন লক্ষণ প্রেকাশ পায়নি।...নির্দুষি মেয়েটাকে বাপের বাড়িতে ভূতের মতো খাটাচ্ছিল, বলতে গেলে একটা কিষেণের কাজ করাচ্ছিল একফোঁটা মেয়েকে দিয়ে। এ তো শোনা কথা নয়, বনপলাশপুরের ও ভটচায্যি গুষ্টিকে আমি খুব ভাল ক'রে জানি—ধানের পাট থেকে, গরু থেকে, ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা ক্ষার কাচা—সব ঐ মেয়ে। নেহাৎ একাদশীতে উপোসটা করাত না, মা বেঁচে—একটু ক'রে দুধ খেতে দিত!...কী সমাচার—না কাজকম্মের মধ্যে না থাকলে বেচাল শিখবে, স্বাভাব-চরিত্তির খারাপ হয়ে যাবে। অথচ ওর চোখের সামনেই ওর বাবা শিষ্যির বিধবা বোনের সঙ্গে রাত কাটিয়ে আসত।'

বোধহয় দম নেবার জন্যেই থামতে হ'ল একটু, কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তই। আর কেউ কথা বলার সুযোগ পেল না সে অবসরে। উনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করলেন, 'সেই মেয়েটাকে নগে যদি উদ্ধার ক'রে এনে এখানে স্বামী-স্ত্রীর মতো কাটায়—দোষটা কি? একটা মন্তর পড়িয়ে নিলেই তো হ'ত—কিংবা খাতায় লিখে বে করলে তো ট্যা-ফো করতে পারতে না তোমরা? সেইটেই ওদের ভুল হয়েছে।...যখন এখানে আসে—নগের তখন সাতাশ বছর বয়েস, বে'ও করেনি কিছুই না, মেয়েটার আঠারো। কী বয়েস

ওদের?...তোমরাও তো নগেকে দেখছ, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী বাদ নেই, স্নান পুজো—কাউকে ঠকায় না, কোন কলহ-বিবাদে যায় না, কেউ বলতে পারবে না নগেন মল্লিক কারও একটা আধলা হরেহম্মে নিয়েছে!'

তারপর আরও একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'যাদের জিনিস, যারা এসে এই কাশী শহরে রটিয়ে দে গেল কেচ্ছাটা—সেই মল্লিকগুষ্টি এসে এখন ওদের বাড়িতেই উঠছে, ভট্‌চায্যিগুষ্টিও। এক পয়সা খরচা নেই, তোফা মচ্ছি মাংস খেতে পায় দুবেলা, জামাই আদর—মায় রাবড়ি রসগোল্লা পর্যন্ত, পাল-গুষ্টি এসে ওঠে এক এক সময়। ওরাও তেমনি বোকচন্দর, আত্মীয়স্বজন কেউ এলে কিতাথ হয়ে যায় একেবারে! হ্যা— —!'

লক্ষ্মীবাবু বিদ্রূপের সুরে বললেন, 'তাহলে তো কোনদিন আপনি কেদারঘাটের তপন ভট্‌চার্যিরও নাম করবেন!'

'করবই তো! আলবৎ করব। আমার যদি বামুন ভোজন কি বিদেয় দেবার অবস্থা হ'ত—আমি আগে ওদের ডাকতুম...কেন, তপন ভটচার্যি কি অন্যায়টা করেছে তাই শুনি?...না খুড়ি, তুমিই বলো। তুমিও ব্রাহ্মণের বিধবা, নিষ্টেবান ঘরের মেয়ে, তোমার কাছেই আমি বিচের চাই।'...

তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে এক ধরনের নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, 'তপন ভট্‌চার্যির জ্যাঠতুতো দাদা ঘোর মাতাল, মদ মেয়েমানুষ জুয়ো—কোন গুণ বাদ নেই। আর বৌটো,—তাকে এরা সবাই দেখেছে, লক্ষ্মীপ্রীতিমের মতো, শান্ত ধীর নম্রস্বভাব—দেখতে তো অপরূপ সুন্দরী।...অমন বৌ—তা একদিনের জন্যে সুখ পায়নি। মদের ঘোরে এসে ধরত, এক এক দিন আধমরা ক'রে ছাড়ত।...চোরের মার মেরেছে ঐটুকু মেয়েটাকে। কী অপরাধ—না বর ভাড়া খাটাতে চাইত, মেয়েটা রাজি হ'ত না। বলেছিল, "নিজের ধম্ম ক্ষুইয়ে যদি স্বামীকে খাওয়াতে হয় সে খাওয়াব—যদি কোনদিন অক্ষ্যাম হয়ে পড়ো, যেমন ক'রেই হোক চালাব—কিন্তু তোমার মদের আর জুয়ার খরচ যোগাতে নিজের এহকাল পরকাল নষ্ট করব না। তাতে যা করতে হয় করো"।...

'পাশাপাশি বাড়ি, তপন সবই দেখত, ডাক্তারি পড়ছে ও তখন, ফোর্থ ইয়ার, খুব ভাল ছেলে ছিল, পাস করলে আজ ওর পসার খায় কে!...শেষে যেদিন জোর ক'রে মুচড়ে হাতটা ভেঙে দিলে বৌটার—সেদিন আর থাকতে পারল না, এক ঘুষিতে দাদার নাক ফাটিয়ে দিয়ে বৌটাকে নিজের বাড়িতে এনে তুলল। ও কিছু অলেহ্য করতে চায়নি প্রেথমটায়—কিন্তু, ওর বাড়িতে তো কেউ ছিল না, মা মরে গেছে, বাপ বিদেশে, একটা চাকর আর ছোট দুটো ভাই। এই নিয়ে তুমুল ঘোঁট শুরু হয়ে গেল আপ্তকুটুম মহলে, কী সমাচার, না বৌদি ওর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে, ও তাকে নষ্ট করেছে। শুনতে শুনতে শেষে ধিৎকার ধরে গিয়ে বৌদিকে নিয়ে কাশী চলে এল—নিজের আখের, পৈত্রিক সম্পত্তির মায়া ত্যাগ ক'রে। বরটা হুমকি দিতে কাশীতে এয়েছিল, তপন কোতোয়ালীতে গিয়ে ডায়েরী ক'রে এসে আর একটি ঘুষি মারতেই ফিরে চলে গেছে—আর আসেনি।

'তো এই তো বিত্তান্ত। তপনকে তোমরা দেখেছ সবাই। ছোট্ট মুদীর দোকান ক'রে খায়, কারও সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না। বৌটাকে প্রাইভেটে পড়িয়ে দুটো পাস করিয়েছে, তা ইল্‌লিগল্ কনেকশ্যান তোমাদের মতে তো—তাই চাকরি পেলে না। বাড়িতে বসে বিনা-মাইনেয় পাড়ার মেয়েদের পড়ায়—অমন পনেরোটা মেয়ে এসে জোটে, সব খাসা খাসা বামুনের ঘরের মেয়ে তারা। তাতে দোষ নেই, তার দোকানের

ধারে খেয়ে টাকা ফাঁকি দেওয়ায় দোষ নেই—বামুন ভোজনের নেমন্তন্ন করলেই যত দোষ?....হা আমার কপাল রে!'

বলতে বলতে আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ঠাকুর্দা। ঠোঁটের কোণে ফেনা জমেছে অনেকক্ষণই, এখন প্রবলবেগে থুথু ছেটকাচ্ছে—সে এক বীভৎস মূর্তি! ওঁর এ চেহারা চেনে সবাই, থামাবার চেষ্টা বৃথা—তবু প্রয়াগবাবুর মা কী একটা বলতে গেলেন, ঠাকুর্দা সে অবসরই দিলেন না।

বললেন, 'তোমাদের ও পরম নিষ্ঠেবন্ত বামুনও ঢের দেখেছি, ব্রাহ্মণ-কুলচূড়ামণি, শাস্ত্রবাক্য ছাড়া কথা নেই, কথা কইতে গেলে—বিশেষ মুখ্যু মানুষদের সঙ্গে—আদ্ধেক কথা সংস্কৃতয় বলেন, পরগোত্তরে খান না, খুব শুদ্ধাচার, সকালে উঠে পাঁজি খুলে বলে দেন কোন্ দিন কি রান্না হবে—ইদিকে দ্যাখো ঘরে ঘরে ব্যভিচার, বুড়ো বয়েস পজ্জন্ত কলির কেষ্ট সেজে বসে আছেন এক একজন—বিধবা ভাজ, ভাদ্দর বৌ, ভাইপো-বৌ, সধবা নাতনি—কেউ বাদ যায় না। এঁরাও শাস্তরবেত্তা বামুন, তাঁরাও এক একটি খড়দর মা-গোসাঁই, এসে তোমাদের যজ্ঞিতে কাঠি দিলে তোমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার একেবারে, ঐ বামুন এসে অং বং চং আউড়ে বিদেয় নিয়ে গেলে তোমরা কিতাত্থ।...এই তো?...তা খাওয়াও, ঐসব বামুনকেই খাওয়াও।'

'তা এই কি সব?' লক্ষ্মীবাবু যেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেসা করেন।

ওঁর ঐ মূর্তি দেখে সকলেই যেন কিছুটা ঘাবড়ে গেছেন।

'তা কেন হবে! নেই কি, ভাল বামুনও আছে। বড় বড় সত্যিকারের পণ্ডিত—কাশীতে যেমন—এমন আর কোথায়? তবে তারা কেউ একপাত নুচি খেতে তোমার বাড়িতে ছুটে আসবে না। এক অধ্যাপক বিদেয় ছাড়া—তারা কেউ বাড়ি থেকে নড়ে না। তাও—অধিষ্ঠান নেওয়াটা কর্তব্য বলে মনে করে তাই—নইলে একখানা সরা আর দুটো সন্দেশের লোভ তাদের নেই...যাক গে, এসব বলে মুখ নষ্ট, আমার সঙ্গে বাবা তোমাদের মিলবে না, তোমাদের মতো ফর্দ তোমরা করো।....হ্যা— —আমার একপাত জুটলেই হ'ল। হে, হে, হে!'

নিজেই আবহাওয়াটা হালকা ক'রে দেন রমেশ ঠাকুর্দা।

এইবার প্রয়াগবাবুর মা তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করার ফুরসৎ পান। বলেন, 'তা বাবা, সবই মানছি। কথাগুলো তোমার একটাও মিথ্যে নয়। তবে আমাদের তো সমাজ মেনে চলতে হয়। তোমার ঐ নগে আর তপনকে যদি আমি নেমন্তন্ন করি—আমার কোন আপত্য নেই, সত্যিই তো, যাদের বলব সকলকারই কি চরিত্তিরের হিসেব রাখছি?—তা তো আর নয়—ওরাই না হয় ধরা পড়ে চোর সেজেছে, বলে ধরা পড়েছে জয় মিত্তির উল্টো দিকে কাগজ ধরে—তা নয়, বলি তখন অন্য বামুনরা যদি বলে আমরা খাব না ওদের সঙ্গে—তখন কি করব? আয়োজনটাই তো মাটি। আর নেমন্তন্ন ক'রে এনে কিছু বলা যায় না—তুমি ঘরের মধ্যে এককোণে বসে চুপচুপু খেয়ে নাও, কেউ না টের পায়।...বলা যাবে কি?'

'হ্যা— —।' বলে শব্দটা টেনে উঠে পড়েন রমেশ ঠাকুর্দা, 'না, সে ঠিক। না, না, তোমার মতো ফর্দ তুমি করো খুড়ি—আমার ও পাগলের কথায় কান দিতে হবে না। তাছাড়া আমার না হয় হ্স্বি-দীঘ্যি জ্ঞান নেই, তাদের তো আছে, তাদের ডাকলেও তারা আসবে না। নাও বাবা লক্ষ্মী-নারায়ণ, ফর্দ করো তোমরা—আমি চলি। হ্যা— —।'

৬ ॥

দেশ থেকে কেন বেরিয়েছিলেন সেটা জানা হ'লেও কি ক'রে বেরিয়েছিলেন, এত দেশ থাকতে কাশীতেই বা কেন এলেন—সে কথাটা জানা হয়নি অনেকদিন পর্যন্ত। আমরাও নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, ইস্কুল আছে, বাজার আছে, দুধ আনা আছে—ওঁরও সকাল বিকেল চাকরি। কোনদিন একটু ফাঁক পেলে কি দরকার থাকলে—মা ইদানীং ব্রত পার্বণে, অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রতে ফলমিষ্টি নিতে কি শিবরাত্রির পারণ করাতে ওঁকেই ডাকতেন—তবে আসতেন, সেও সকালের চাকরি শেষ ক'রে স্নান সেরে আসতেন একেবারে। বড় জোর এইসব দিনগুলোতে সে পর্বটা একটু সকালে সারা হ'ত এই পর্যন্ত। ভবানীদাকে বলে তাঁকে বসিয়ে উনি চলে আসতেন।

কেবল শিবরাত্রির পরের দিন ভোরবেলাই এসে হাজির হতেন। কারণ তিনিও—এত ক্ষিদেকাতুরে মানুষও—নিরম্বু উপোস ক'রে থাকতেন ঐ দিনটায়। সে জন্যেও বটে, মার কথা ভেবেও বটে—স্নান গায়ত্রী সেরে চলে আসতেন সক্কালবেলাই। অবশ্য, সেদিন সকালে দোকান বন্ধও থাকতে বরাবর। এছাড়া কোনদিন হয়ত এমনিও মার খবর নিতে আসতেন—বিকেলে দোকানে বেরোবার আগে, 'কী করছ, অ মেয়ে। বলি আজ একটু খবর নে যাই, কাজ তো বারোমাসই আছে—বলে, না কাজ না কামাই, হ্যা— —।'

কিন্তু সেও তো আমাদের ইস্কুলে থাকবার সময়, কদাচিৎ কোন ছুটিটুটির বা হাফ হলিডের দিন ওঁর মর্জির সঙ্গে মিললে তবেই দেখা হ'ত। তাও তখন আড্ডা জমাবার মতো সময় থাকত না।

হঠাৎই একদিন সুযোগটা মিলে গেল।

অন্নপূর্ণা পুজো সেদিন, সুরেশ মুখুজ্জের শাশুড়ির মানসিক ছিল কাশীতে এসে অন্নপূর্ণা পুজা করবেন। ঘটার পুজো, অনেক লোক খাবে—হালুইকর বামুন আনিয়েছেন সুরেশবাবু কলকাতা থেকে—কিন্তু ভোগ রাঁধার কাজ তাদের দিয়ে হবে না, শাশুড়ির পছন্দ নয়—ওঁদের বাড়িতেও তেমন কেউ নেই, অগত্যা আমাদের সতীদি ভরসা।

সতীদিরও তাতে কোন আপত্তি নেই। খুব সকালে যেতে হবে, তাও যাবেন। ভোরবেলা উঠে গঙ্গাস্নান ক'রে অন্নপূর্ণার বাড়ি একশো-আটবার ফেরা দিয়ে এসে বুড়োর ব্যবস্থা ক'রে ছটার মধ্যেই সেখানে চলে যাবেন।

বুড়োর ব্যবস্থা করতে হবে—তার কারণ ভোগ সারতে অনেক বেলা—এমনি যজ্ঞির লুচি পৌঁছে দিয়ে যাবেন সে পথও নেই। সুরেশ মুখুজ্জের বাড়ি সিগ্‌রায়, এ পাড়া থেকে বহুদূর। ঠিক ছটায় ডুলি পাঠাবেন সুরেশবাবু বলে দিয়েছেন। যেখানে যাওয়া-আসার ডুলি ব্যবস্থা, সেখান থেকে খাবার নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে দিয়ে যাওয়া যায় না, ডুলিভাড়া দেবারও পয়সা নেই। আসা যাওয়ায় অন্তত আটগণ্ডা পয়সা নেবে তারা, সতীদির কাছে কল্পনাতীত বিলাস।

অবশ্য সেদিন খাওয়ার অত চিন্তাও ছিল না। চিন্তার কারণ ছিল অন্য। আগের দিন ঠাকুর্দার সর্দি-জ্বর মতো হয়েছিল, দুধসাবু ক'রে রেখে গেলেই হাঙ্গামা চুকে যাবে—জ্বর যদি ছেড়ে যায়, হয়ত সন্ধ্যের দিকে প্রসাদ খেতে পারবেন, নয়তো আবার এসে সাবুই ক'রে দেবেন সতীদি। তা নয়—ভাবনা 'যদি দিন-মানে জ্বর আরও বাড়ে, যদি বেঁহুশ হয়ে পড়ে?'

বোধহয় অনেক ভেবেছেন দিদি, সারারাত ঘুমই হয় নি—ভোরবেলা ছুটে এসেছেন

আমাদের এখানে—অন্ধকার থাকতে। কাপড় গামছা ফুলের সাজি কমণ্ডলু আর ছোলার পুঁট্‌লি নিয়ে একেবারে গঙ্গার জন্যে প্রস্তুত হ্‌য়েই বেরিয়ে এসেছেন। একশো আটবার ফেরা দিতে হবে, তার গণনা ঠিক রাখার জন্যে একশো আটটা ছোলা গুণে নিয়ে বেরোনো—একবার ক'রে ফেরা বা প্রদক্ষিণ শেষ হবে আর একটা ক'রে ছোলা ফেলে দেবেন। জপের মালা আছে কিন্তু এসব বৃথা গণনায় নাকি জপের মালা ব্যবহার করতে নেই—তাই এই ছোলার ব্যবস্থা। তখনকার দিনে এক পয়সায় একপো ছোলা পাওয়া যেত—একশো আটটা ছোলা নষ্ট করার জন্যে কেউ চিন্তা করত না।

'অ মেয়ে, এই একটা কথা বলতে এলুম। বুড়োর তো কাল থেকে জ্বর। সারাদিন থাকব না, তাই বড্ড ভাবনা হচ্ছে। এখন অবিশ্যি ঘুরে আসব একবার, চান ফেরা সেরে এসে সাবুদুধ ক'রে রেখে যাব দু'বারের ম'তো, এখন ছোলা, আদার কুঁচি, নুন, মিছরি একটু, গুছিয়ে রেখে এসেছি মুখ ধুয়ে খাবে—তা নয়, চৌপর দিনটা বুড়ো একা পড়ে থাকবে—আমার এই ছোট নাতি যদি একবার একটু দুপুরের দিকে গিয়ে খবর নিত—?...পারবে না? আজ তো ইস্কুল নেই ওদের—'

খুব করুণ অনুনয়ের ভঙ্গী সতীদির। ওঁর ধারণা এটা খুবই অন্যায় অনুরোধ করা হচ্ছে, সেজন্যে সঙ্কোচের সীমা নেই।

মা বললেন,'ওমা, তার জন্যে আবার এত কিন্তু হচ্ছেন কেন? আমি ওদের রান্না সেরে রেখে দর্শনে বেরোব—ফেরা সেরে ফিরতে ধরো বেলা বারোটা—তা আমি এসেই ওকে ছেড়ে দেব। তা'হলেই হবে তো? তারপর বিকেল অবদি থাকতে পারবে। আমি বরং বাবার জন্যে একটু আলুর টুপোও পাঠিয়ে দো'ব। আগে মাজা কড়ায় করব—ওদের বিকেলে জলখাবারের জন্যে ক'রে রাখব একেবারে—আলু আর ঘি, খেতে তো দোষ নেই—?'

এ-ই উত্তম সুযোগ। তবু একটু চিন্তা ছিল বুড়োর যদি সত্যিই জ্বর খুব বাড়ে—তা'হলে আমার যা উদ্দেশ্য তা সিদ্ধ হবে না। কিন্তু, গিয়ে দেখলুম—ছটফট করছেন বটে, তবে সে জ্বরে নয়—ক্ষিধেয়। জ্বর তখন আর নেই। গা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, দুধসাবু যা ছিল—দুবারের মতোই ক'রে রেখে গিয়েছিলেন সতীদি—সে এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। আমি যখন গেলুম তখন উনি শিকেয় ঝোলানো হাঁড়ি আর তাকে টিনের কৌটো হাঁটকাচ্ছেন—কোথাও আগের পাওনা কোন বাসি মিষ্টি পড়ে আছে কি না।

এই অবস্থায় আলুর টুপো পেয়ে যেন বেঁচে গেলেন। আলুর টুপোর সঙ্গে মা একটা সন্দেশও দিয়েছিলেন—বলতে গেলে গোগ্রাসে গিলে এক ঘটি জল খেয়ে—একটা সশব্দ উদ্গার তুলে খুশী মনে গিয়ে তামাক ধরাতে বসলেন। লম্প জ্বেলে একখানা টিকে ধরিয়ে দেওয়া—এইটুকু কাজ—বাকী যা, ক'ল্কে সাজানো তাও সেরে রেখে গেছেন সতীদি। বোধহয় রাত্রিবেলা শুতে যাওয়ার আগেই চারটে ক'ল্কে সাজিয়ে রেখেছিলেন।

তামাক ধরিয়ে হুঁকো নিয়ে তাঁর অভ্যস্ত জলচৌকিটিতে বসতেই আমি চেপে ধরলুম, 'আচ্ছা ঠাকুর্দা—আপনি বাড়ি থেকে চলে এলেন কেন, পুজো করবেন না করবেন না—ওখানে থেকে অন্য একটা চাকরি-বাকরিও তো দেখতে পারতেন। আর পালিয়ে কাশীতেই বা এলেন কেন?'

ঠাকুর্দা তাঁর সেই প্রায়-অস্তিত্বহীন ক্ষুদ্র চোখ দুটিকে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'কেন বল্‌ দিকি তোর এত চোদ্দগুষ্টির নিকেশ নেওয়া?...বলি

আমাকে দিয়ে নবেল লিখবি না কি?—আ মর,—কেন, কি বিত্তান্ত, চোদ্দ ঝুড়ি কৈফেৎ—জ্বালিয়ে খায় ছোঁড়া।'

'আহা, বলুনই না বাবা।...একটু না হয় জানতেই ইচ্ছে হয়েছে। তাতে কোন দোষ তো নেই!'

'দোষ! দোষ আবার কি?' ঠাকুর্দা যেন জ্বলে ওঠেন একেবারে, 'চুরিও করি নি, দারিও করি নি—কাউকে খুন ক'রে কি কারও পরিবার নিয়ে পালিয়েও আসি নি। যা করেছি সাফ সাফ বলতে পারি—মরবার পর যমরাজের সামনে দাঁড়িয়েও কবুল করতে পারি নিশ্চিন্তি হয়ে।'

তারপর চুপ ক'রে বসে খানিকক্ষণ তামাক টেনে কল্‌কেটা একটু ঘুরিয়ে ভাল ক'রে হুঁকোর মুখে চেপে বসিয়ে বললেন, 'কি শুনতে চাস কি? বাড়ি থেকে কেন চলে এলুম?—পুজো করব না বলার পর আমার কি অবস্থা হ'ল বাড়িতে তা তোরা ভাবতেও পারবি নি। মা থেকে জ্যাঠাইমা থেকে ভাইবোন—কেউ আর লাঞ্ছনার বাকী রাখল না। লেখাপড়া শিখি নি যে চাকরি করব। পুজোর ব্যাপার তো চুকেই গেল—তা'হলে করব কি? বাবা রাগ ক'রে বললেন, "তাহলে মার কাছে হাঁড়ি-বেড়ি ধরতে শেখো—ন চ বিদ্যে উনুনে ফুঁ—লোকের বাড়ি ভাত রেঁধে খাও গে!" মামারা পরামর্শ দিলেন চাষবাস দেখতে—একটা তো কিছু করতে হবে।

'ইরি মধ্যে, বোধ হয় কারও পরামর্শতেই বাবা এক ফন্দী আঁটলেন। হঠাৎ শুনলুম, মেয়ে দেখা হচ্ছে, আমার বে' দেবেন এবার। একদিন দুদিন দেখলুমও, ছাতা বগলে ক'রে আমাদের থেকেও দীন অবস্থার লোক সব বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসে হাতজোড় ক'রে বসে থাকছে। প্রেথমটা একটু অবাকই হয়েছিলুম, মতলবটা অত বুঝতে পারি নি। পরে বুঝলুম, বুদ্ধিটা এঁটেছে আমাকে ফাঁদে ফেলে জব্দ করার জন্যে। ঘাড়ে একটা সংসার চেপে বসলে, দু'চারটে বাচ্ছা হয়ে গেলে তখন আর পথ পাবো না, ফেলা থুতু চেটে খেয়ে আবার সেই ঘণ্টা নাড়তে বেরোতে হবে।

'তখনই বুঝলুম যে আর নয়—এবার পথ দেখতে হবে। তবু অত যে তাড়া তা বুঝি নি—যেদিন বাবা বললেন, "আজ বিকেলে কোথাও যাস নি, বোড়াল থেকে দেখতে আসবেন এক ভদ্দরলোকেরা।" সেদিনই বুঝলুম যে বাপের অন্ন এবার উঠল। নিশ্চয়ই আগে কথাবার্তা যা হবার হয়ে গেছে—ছেলে দেখে পাকা ক'রে যাবেন তাঁরা। সেদিনটা আর বাবাকে ব্যাভ্রমে ফেলি নি, পরের দিন ভোর বেলাই চাংড়িপোতায় এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি বলে বেরিয়ে পড়লুম—এক কাপড়ে, সঙ্গে সম্বলের মধ্যে ঐ আগে যে কদিন যজমানি করেছি আর দরুন জমা পাঁচটি টাকা।'

একটু থেমে অকারণেই যেন একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে গল্পের খেই ধরলেন আবার। একটানা হেঁটে বেলা দশটা নাগাদ কলকাতা পৌছলেন। একটা ব্যবস্থা ঠিকই ছিল ওঁর। এক বন্ধুর মামার ছাপাখানা ছিল গরানহাটা অঞ্চলে, সেই ঠিকানাটা লিখে নিয়েছিলেন আগের দিন। খুঁজে খুঁজে বারও করলেন ভদ্দরলোককে—পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি ছাপাখানায় কাজ শিখতে চাই, যদি দয়া ক'রে একটা ব্যবস্থা ক'রে দেন। মাইনে পত্তর চাই না এখন, একটা জীবন-ধারনের মতো ব্যবস্থা হ'লেই হবে।'

তিনি হাসলেন শুনে, 'যদ্দিন কাজ না শিখছ তদ্দিন ও ব্যবস্থাটা কি ক'রে হবে?...তুমি কিছুই জানো না, তোমার টাইপ-কেস চিনতেই তো একমাস লাগবে। কাজ কিছু পেলে তবে

খোরাকী দেওয়ার কথা ভাবা যায়। এখন তোমাকে কে চালাবে? তুমি বলছ রাখালের বন্ধু। কাজ শেখার ব্যবস্থা এখানে করতে পারি—এদের বলে-কয়ে দিলে বিশেষ ক'রে হয়তো শেখাবেও, নইলে এমনি শালারা কিছুতে শেখাতে চায় না, নিজেদের মেগের ভাইদের জন্যে রেখে দেয় বিদ্যেটা—কিন্তু থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা তোমার নিজের।'

'বুঝতেই পারছ আমার অবস্থা।' বললেন ঠাকুর্দা, 'সম্বল তো ঐ পাঁচটি টাকা। তবু ভয়ে ভয়ে বলতে গেলুম, 'এখানে থাকার একটু বন্দোবস্ত হ'তে পারে না? খাওয়াটা না হয় বাইরে বাইরে সারলুম।' তিনি বেশ উঁচুদরের হাসি হেসে বললেন, "তার কম আর নেশা জমবে কেন? প্রেস ঘরে তোমাকে রেখে যাই আর তুমি রোজ এক এক মুঠো টাইপ চুরি করে বেচে খাও!...চিনি না শুনি না, সত্যিই তুমি রাখালের বন্ধু কিনা তাও জানি না। আর তা হ'লেই বা কি, আজকালকার দিনে নিজের ছেলেকেই বিশ্বাস নেই—তা ভাগ্নের বন্ধু। ওসব হবে না বাবা—সরে পড়ো। বলছ তো বামুনের ছেলে, চেহারা দেখে তো মনে হয় না"!'

খুবই অপমান লাগল ঠাকুর্দার। অতটা হেঁটে এসেছেন, সারাদিন খাওয়া হয় নি কিছু—পথে এক জায়গায় এক পয়সার মুড়ি-বাতাসা আর কলকাতায় পৌঁছে একটা দোকান থেকে চার পয়সার লুচি, খাওয়ার মধ্যে এই—সব জড়িয়ে চোখে জল এসে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন একেবারে হাওড়া ইষ্টিশান।...

'বলবি এত জায়গা থাকতে ওখেনে কেন? ঐ নামটাই শোনা ছিল, কলকেতার আর কিছুই তো জানি না—ক'টা পাড়ার নাম জানতুম শুধু। তা কোন চেনা লোক না থাকলে সেখানে গিয়েই বা লাভ কি?...তাছাড়া শরীরটা কোনদিনই ভাল ছিল না। ছোটবেলায় ম্যালেরিয়া আর আমাশায় ভুগে ভুগে দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। শুনেছিলুম পশ্চিমের জলহাওয়া ভাল—তাই ঐ দিকেই ঝোঁকটা ছিল খুব।'

হাওড়ায় তো পৌঁছলেন, এখন যান কোথায়? হাতে তো ছিল পাঁচটি টাকা। তারও তো দুগণ্ডা পয়সা খরচ হয়ে গেছে এর মধ্যেই। অন্তত টাকা খানেক রাখতে হবে। টিকিটের খোপের কাছে গিয়ে শুধুলেন, 'তিন টাকা সাড়ে তিনটাকার মধ্যে কোথায় যাওয়া যায় বলতে পারেন—পশ্চিমের দিকে?' সে বাবুটি আবার রসিক খুব—চোখ টিপে বললেন, 'বাড়ি থেকে পালাচ্ছ বুঝি ছোকরা? তা যাও, মাস ছয়েক বড় জোর—আবার সুড় সুড় ক'রে ফিরে এসে বাপের হোটেলে সেঁধুতে হবে। বাবুরা ভাবেন পশ্চিমে ওঁদের জন্যে সব ডালায় ক'রে চাকরি সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে—গেলেই টুলে বসতে পারবে।...হবে, টিকিট হবে বৈকি। পাটনা হবে, গয়া হবে, ভগলপুর। কোনটা চাই, কোনটা পছন্দ বলে ফ্যালো।'

কী মনে হ'ল, ঠাকুর্দা ফট ক'রে বলে বসলেন পাটনা। শুনলেন তখনই একটা গাড়ি আছে, রাত সাড়ে নটায়। ভোর বেলায় পাটনায় পৌঁছে যায়। টিকিটবাবুই দয়া ক'রে বলে দিলেন, 'বাঁকীপুরের টিকিট দিলুম—ঐটেই শহর। ফট্ ক'রে যেন পাটনা সিটিতে নেমে পড়ো না। ওখানে কিছু নেই—একটা বাঙালীরও দেখা পাবে না।'

'কিন্তু বাঁকীপুরই বা কি পাটনাই বা কি—আমার কাছে সব সমান!' ঠাকুর্দা হেসে বললেন, 'কে-ই বা আছে আমার। কত লোকের কত আত্মীয় থাকে, পশ্চিমে ভাল ভাল চাকরি করে, ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি—আমার কেউ কোথাও নেই।

'বাঁকীপুরে তো নামলুম—সেখানেও কলকেতারই অবস্থা। কে আমার মাসীর মার

টুম আছে সেখানে—যার কাছে গে দাঁড়াব। টিকিটবাবুর কথায় রাগ করেছিলুম টে,—পাটনায় নেমে দেখলুম সে অলেহ্য কিছু বলে নি। চাকরি বললেই কিছু চাকরি মলে না। তা ছাড়া—একটা কথা আগে ভেবে দেখি নি—একমাস চাকরি করলে তবে াইনে হাতে আসবে, এই একমাস খাব কি? মরুক গে—গতস্য শোচনা নাস্তি, তখন আর াপসোস ক'রে লাভ কি বল। ইস্টিশানে নেমে সারা দিন টো টো ক'রে ঘুরলুম শহরে, াকেটে একটা টাকা আর কটা পয়সা মাত্তর ছিল। গঙ্গায় দিয়ে মুখহাত ধুয়ে সন্ধ্যে সেরে াকটা দোকানে গিয়ে একটু জলখাবার খেলুম। ছাতু খেতে পারলে হ'ত—অনেক কম রচায় পেটটা ভরত—সাহস হ'ল না। পেটরোগা চিরকাল। এমনিই তো পেটে ভাত নেই ্রো একদিন—শেষে ছাতু খেয়ে যদি পেট ছাড়ে? পথে পড়ে বেঘোরে মরতে হবে।'

ঘুরলেন অনেক। বাঙালী পাড়া কোথায় খোঁজ ক'রে ক'রে গেলেনও দুচারজন ভদ্র লোকের বাড়ি। বেশ সম্ভ্রান্ত লোক সব, ভাল ভাল চাকরি করেন—সবাই এক রকম দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন। তবে তাঁদেরও বিশেষ দোষ নেই, তখন ওঁর খুব দুঃখ হয়েছিল বটে—পরে বুঝেছেন কোন অন্যায় করেন নি তাঁরা।

'এমন বিস্তর ঠকেছে ওখানকার বাঙালীরা, এই ধরনের বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছোকরাদের চাকরি দিয়ে। আপিসে মুখ পুড়েছে—খাক্‌তাইয়ের একশেষ। বেশির ভাগই দুচার দিন কাজ ক'রে দুচার জনের টাকা মেরে সরে পড়ে—খেটে খেতে চায় না। কে চোর কে জোচ্চোর—অত কে বুঝছে বলো? "অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাসং দেয়ং ন কস্যচিৎ"—এই মন্তরই ভাল। আর আমার তখন যা চেহারা—এক কাপড় এক জামা—আগেই আধময়লা ছিল—দুদিনে রেলের কালিতে ধুলোতে ভিখিরির অধম হয়েছে পোশাকের অবস্থা—তার ওপর চেহারা তো এই লোহার কাত্তিক—আমাকে দেখে কে ভদ্দর লোক বামুনের ছেলে ভাববে বলো?' বলে হ্যা-হ্যা করে হেসে নিলেন একবার।

তবু ঘোরা ছাড়া উপায়ও নেই। কোনমতে পা দুটো টেনে টেনে হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যে হ'ল যখন তখন আর হাঁটবার অবস্থা নেই। আগের দিন ভোর থেকে ক্রমাগত হাঁটছেন—পা আর কত সয়! তার ওপর পেটে কিছু নেই—সকালের সেই সামান্য জলখাবার কখন শেষ হয়ে গেছে। একটা কোন পাত্র থাকলে দুটো চিঁড়ে কিনে ভিজিয়ে খেতে পারতেন, তাতে কিছুক্ষণ তবু যোঝা যেত—সে ব্যবস্থাও কিছু ছিল না। একটা গামছা কি কাপড় নেই যে স্নান করেন—তখন ওঁর মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে। সবচেয়ে কষ্ট ক্ষিধের, পেটে যেন মোচড় দিচ্ছে কে। এক একবার ভেবেছেন যা আছে সঙ্গে—পেটভরে কচুরি জিলিপি খেয়ে নেন—তারপর সোজা গিয়ে গঙ্গায় গা ঢালা দেবেন।...তখন যদি ফিরে যাবার গাড়িভাড়া থাকত তো ফিরেই যেতেন—গিয়ে বাবার পায়ে ধরে মাপ চেয়ে যজমানির কাজ শুরু করতেন!

'এই যখন মনের ভাব—তখন হঠাৎ লুচির গন্ধ নাকে এল। চারদিকে চেয়ে দেখি একটা বাড়িতে খুব আলো, লোকের ভিড়। ওদেশের ঢাক কাঁশির বাজনাও বাজছে একটা। আন্দাজে বুঝলুম বে'বাড়ি। আর একটু এগিয়ে দেখলুম বাঙালীরই বে'বাড়ি, নেমন্তন্নে লোক যারা শামিয়ানার নিচে বসেছে তার বেশির ভাগই বাঙালী। ওরই মধ্যে একটু জাঁকের বিয়ে—অনেক লোকজন, বেশ অবস্থাপন্ন—খানকতক বাড়ির পেরাইভেট টমটম ল্যান্ডো ফিটনও এসে জমেছে!'

দেখতে দেখতে কখন এগিয়ে গেছেন টের পান নি—চুম্বকে যেমন করে লোহা টানে

তেমনি ক'রেই টেনে নিয়ে গেছে ওঁকে লুচির গন্ধ। লোভ দুর্জয়, সেই সময়টায় বোধ হয়! একব্যাচ লোক বসছে—হুড়মুড় ক'রে লোক ঢুকছে বাড়ির মধ্যে—একজন সিঁড়ির মুখে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে বলছে "ব্রাহ্মণ-মশাইরা দয়া ক'রে ডান দিকের ছাদে যাবেন, বাহ্মন লোক কৃপা করকে ডাহিনা তরফ জানা।" ওঁর মনে হ'ল চলেই যান, এই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে এক কোণে বসলে কে আর লক্ষ করবে!

একটু হেসে বললেন, 'গিয়েছিলুমও এগিয়ে দোরের কাছাকাছি—কিন্তু ঠিক পাশের দু'একজন একটু অবাক হয়ে চাইতেই—বিশেষ একজন খোশবো-দেওয়া-রুমাল বার ক'রে নাকে দিতে চৈতন্য হ'ল। এ আমি করছি কি। এ যা বেশভূষা, যা নিশ্চয় দু'দিনে ঘেমো-গন্ধও হয়েছে জামায়—এ দেখে কেউ নেমন্তন্নে বলে ভুল করবে না! সেখানে পংক্তিতে বসার পর কেউ যদি জেরা করে—বা কান ধরে তুলে দেয়—কিছু বলতে পারব না। দু চার ঘা মার দেওয়াও আশ্চর্য নয়। এক পাত লুচি খেলেই তো আর সব সমিস্যের অবসান হচ্ছে না। কী দরকার মিছিমিছি বেইজ্জত হবার, ইচ্ছে ক'রে লাঞ্ছনার মধ্যে যাওয়ার!'

সঙ্গে সঙ্গেই পিছন ফিরেছেন, বাড়ির মালিক যিনি—যিনি এতক্ষণ দরজার কাছে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন—চট ক'রে এসে পথ জোড়া ক'রে দাঁড়ালেন, 'কী, ফিরে যাচ্ছেন যে?'

উনিও তখন মরীয়া, টনটনে জ্ঞান ফিরে এসেছে—সোজা সত্যিই জবাব দিলেন. 'আমার এখানে নেমন্তন্ন হয় নি।'

'তবে ভেতরে যাচ্ছিলেন কেন?'—চারিদিকে ততক্ষণ দু-একজন ক'রে বেশ ক'জন লোক জমে গেছে। সকলেরই মুখে চোখে "মজা"র আনন্দ। কে একজন পেছন থেকে বললে, 'ব্যাটা চোর নিশ্চয়ই, পকেট-মার। কম্ম বাড়িতে এরকম দু-চারটে জুটবেই —আমি কিছুদিন থেকেই দেখছি। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে হাত-সাফাই করে।' ঠাকুর্দার কান-মাথা গরম হয়ে উঠল, তবু সোজা মালিকের চোখের দিকে চেয়ে বললেন,'সারাদিন খাওয়া হয় নি—খিদেয় খুব কষ্ট হচ্ছিল তাই প্রেথমটা লোভ সামলাতে পারি নি—ভিড়ে মিশে ভেতরে যাচ্ছিলুম, যদি এক কোণে বসে খেতে পারি।' বাড়ির মালিক কিন্তু—পরে শুনেছিলেন মেয়ের জ্যাঠামশাই—তিনি ওঁর মতোই শান্তভাবে কথা বলছিলেন তখনও বললেন, 'তা গেলেন না কেন?' উনিও সেই সুরে জবাব দিলেন, 'এখনও মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে যায় নি—ভগবানও বাঁচিয়ে দিলেন কতকটা—নইলে হয়ত লুচির বদলে মার খেতে হ'ত। এই পোশাকে যজ্ঞি-বাড়ি ঢোকা যায় না। যিনি পকেটমার বলছেন তিনি কিছু অন্যায় বলেন নি। তবে—এইভাবে যারা যজ্ঞি-বাড়িতে চুরি করতে আসে—তারা পোশাক-আশাকটা ভাল ক'রেই আসে—নেমন্তন্নে লোকের মতোই।'

বাড়ির কর্তা এবার হাসলেন একটু, বললেন 'বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন বুঝি? বাড়ি কোথায়? কী জাত আপনারা?' ঠাকুর্দা সংক্ষেপেই উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, পালিয়ে এসেছি, সকাল থেকে ঘুরছি এখানে—কাল কলকাতাতেও ঘুরেছি—কোথাও কোন কাজ কর্মের ব্যবস্থা হয় নি, আশ্রয়ও না। পকেটে একটা টাকা আছে এখনও, জামাকাপড় এই যা গায়ে আছে! কোথাও কিছু যদি না হয় গঙ্গায় গিয়ে উলতে হবে। জাত ব্রাহ্মণ—' সেটা প্রমাণ করবার জন্যে পিরানের মধ্যে থেকে পৈতাটাও বার ক'রে দেখালেন—কথা শেষ ক'রে হাত জোড় ক'রে বললেন, 'দয়া ক'রে আমাকে আর আপনি-আজ্ঞে বলে লজ্জা

দেবেন না—এমনিই ঢের লজ্জা পেয়েছি। আপনি শালা-উল্লুক করলে কি দু'ঘা জুতো মারলে এতটা পেতুম না বোধহয়।'

বোধকরি এই স্পষ্ট অথচ বিনত ভাষণেই নরম হয়ে এল ভদ্রলোকের চোখ। বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি গিয়ে বসে পড়োগে, খাওয়া-দাওয়া করো, তারপর ভেবে দেখব কি করা যায়।'

উনি বললেন, 'আজ্ঞে তা পারব না। অজান্তে অজ্ঞানের মতো যা করতে যাচ্ছিলুম—এখন আর তা সম্ভব নয়। এই জামাকাপড় পরে ওঁদের পাশে গে বসতে পারব না।'

তিনিও তেমনি, বললেন,'আমি বলে দিচ্ছি ওরই মধ্যে এককোণে তোমাকে বসিয়ে দেবে। একটু চোখকান বুজে খেয়েই নাও। যজ্ঞি-বাড়িতে আলাদা বসানো বড় ঝঞ্ঝাট, জোটেও না সব জিনিস। আর এরপর খেতে গেলে বেশ রাত হয়ে যাবে। তোমার সারাদিন খাওয়া হয় নি—বসে যাও এই বেলা।.....এই পরমানন্দ—এই ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে বামুনদের দিকে এককোণে বসিয়ে দাও তো—কেউ জিজ্ঞেস করলে বলো আমার জানাশোনা, আমি পাঠিয়েছি।'

একটু চুপ ক'রে গেলেন ঠাকুর্দা। চোখ দুটো ছলছল করছে, বোধহয় সেই ভদ্রলোকের কথা মনে হয়েই। খানিকক্ষণ মৌন থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার শুরু করলেন, 'সে-ই আশ্রয় জুটল। কী বলব ভাই—ভদ্দর লোকের নাম নিতাইবাবু, নিত্যানন্দ—অমন মানুষ আমার এই এত বছর বয়সে আর একটিও দেখলুম না। দেবতা বললেও ওঁকে ছোট করা হয়। এমন স্নেহ—এমন বিবেচনা—এমন সাহস—সাহস ইচ্ছে ক'রেই বলছি, অনেক সময় কাউকে দয়া করতে গেলে রীতিমতো সাহসের দরকার হয়ে পড়ে—আর কারও ভেতর দেখি নি।...অত লোক, অত ভিড়, কাজের বাড়ি, উনিই বাড়ির কর্তা—কিন্তু খেয়ে এসে বাইরে যে এককোণে ঘাড় গুঁজে বসেছিলুম নজর এড়ায় নি।... তার মধ্যেই বাড়তি ধুতি-গামছার ব্যবস্থা করলেন, ভেতর থেকে একটা খাটিয়া আনিয়ে সেদিনের মতো শামিয়ানার নিচেই একপাশে শোওয়ার ব্যবস্থা হ'ল—তার পরের দিন সকালে উঠে কোথায় মুখ-হাত ধোব, কোথায় কি করব—সেসব বাতলে দিয়ে তবে ভেতরে নিজে খেতে গেলেন।'

এই ভাবে অপ্রত্যাশিত একটা আশ্রয় মিলল। পরের দিন নিতাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি জান? কতদূর পড়েছ?' উনিও সোজা উত্তর দিলেন, 'সামান্য কিছু সংস্কৃত পড়েছি, ইংরেজী নাম-মাত্তর।' নিতাইবাবু সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন বাড়িতে যে দুটি ভাইপো-ভাইঝি আর তাঁর একটি নাতি আছে তাদের বাংলা পড়াবেন, ওঁর বাড়ি খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন তার বদলে। তার বেশী যা দরকার নিজেকে রোজগার ক'রে নিতে হবে। তবে এও বলে দিলেন যে বাংলা পড়ানোর টিউশানি এখানে অনেক জুটবে—দু-টাকা এক টাকা মাইনের, তাতে বাকী খরচ চলেই যাবে, তবে চাকরির বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হয় না।

'জুটলও কটা ছাত্তর আরও। পড়ানো মানে অ-আ-ক-খ, দ্বিতীয় ভাগ, বোধোদয় পর্যন্ত দৌড়। আমার কোন কষ্টই নেই। নিতাইবাবুর বাড়ির যে তিনটি—সেও ঐরকম, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, পদ্যপাঠ। হাতের লেখা লেখানোই কঠিন কাজ ছিল, তা তখন—বললে বিশ্বাস করবি না—হাতের লেখা আমার খুব ভাল ছিল, মুক্তোর মতো।'

অর্থাৎ ঠাকুর্দার এমনি অভাব বিশেষ কিছু আর রইল না। বাড়তি যা রোজগার হ'ত

ছ'সাত টাকার মতো, তাতেই হাতখরচ চলে যেত—জামা-কাপড় সুদ্ধ। কীই বা দাম ছিল তখন। তাছাড়া নিতাইবাবু মুখেই খাওয়া-থাকা বলেছিলেন—কাজে জামা কাপড় সবই আসত লাগল নানা ছুতোয়। সেকালে বার-ব্রত বাঙালীর ঘরে লেগেই থাকত, জামা কাপড় ছাতা-জুতো দেওয়ার কারণের অভাব হ'ত না। খাওয়া-জলখাবারের তো কথাই নেই। আধ সের ক'রে দুধই খেতেন রোজ—ক'মাসে মোটা হয়ে গিছলেন।

'কিন্তু, ঠাকুর্দা বললেন, 'মন মোটে টিকল না ওখানে। পশ্চিম পশ্চিম শোনা ছিল, ভাবতুম না জানি কি—মনে মনে একটা ছবিও এঁকে নিয়েছিলুম। তার সঙ্গে কিছুই মিলল না। ধুলোর শহর সরু সরু রাস্তা—সবচেয়ে বড় রাস্তা যেটা কলকাতার গলির মতো,—অতখানি শহর জুড়ে গঙ্গা বইছে তাতে একটা বাঁধা ঘাট নেই কোথাও। তবু পড়ে ছিলুম কাদায় গুণ ফেলে—নিতাইবাবুর টানেও আরও—হঠাৎ ওদের সংসারে একটা ওলট্ পালট্ হয়ে গেল। আমারই অদেষ্ট, নিতাইবাবু চাকরি-বাকরি ছেড়ে হরিদ্বার চলে গেলেন, সন্নিসীর মতো সেখানে থাকবেন একা। উনি থাকবেন না আমি ওখানে থাকব, অত যত্নের পর কুপুষ্যির মতো থাকা—সে আমার ধাতে পোষাল না, আমিও সেই ফাঁকে সরে পড়লুম।'

অনেকক্ষণ একটানা বকে ঠাকুর্দা থকে গিছলেন। উঠে বাইরে গিয়ে মুখে-চোখে জল দিয়ে এলেন। এক ঘটি জল খেলেনও ঢকঢক করে—তারপরে আবার লম্প জ্বেলে টিকে ধরাতে বসলেন।

আমি ধমক খাবার ভয়ে চুপ ক'রে ছিলুম এতক্ষণ। এবার হুঁকোয় বারকতক টান দেবার পর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তারপর?'

'তারপর আর কি? এতদিনে কিছু টাকাও তো হাতে জমেছিল। সোজা পাঞ্জাব মেলে চড়ে বসে চলে গেলাম লাখনাউ। এবার অবস্থা ভাল, কোমরের জোর আছে, একটা ধর্মশালায় গিয়ে উঠে কাজকর্ম খুঁজতে লাগলুম। পেয়েও গেলুম একটা কাজ।...কিন্তু সেখানেও বেশিদিন টিকতে পারলুম না। সেখান থেকে সোজা এই কাশী।'

একটু যেন অতি-সংক্ষেপেই কাহিনীতে ছেদ টানলেন এবার।

আমি আর একটু সাহসে ভর ক'রে প্রশ্ন করলুম, 'ওখানে টিকতে পারলেন না কেন?' ঠাকুর্দা কিন্তু খুব একটা ঝেঁজে উঠলেন না, নরম গলাতেই বললেন, 'সে ভাই তোকে বলতে পারব না। অন্তত এখন নয়। সে বয়স এখনও তোর হয় নি।'

॥ ৭ ॥

সেদিন না বললেও গল্পটা শেষ পর্যন্ত একদিন বলেছিলেন রমেশ ঠাকুর্দা। অনেক পীড়াপীড়িতে সঙ্কোচটা কাটিয়ে উঠেছিলেন।

অবশ্য গল্প তো এটা নয়। তাঁর জীবনেরই অভিজ্ঞতা। জীবন-কাহিনীরও অঙ্গ বলা যায়। সত্য ঘটনাই—অন্তত তাঁর যতটা জানা আর শোনা। তবু, বলতে লজ্জা হয়, সহজে বলেন না কাউকে।

ঠাকুর্দা পাটনাতে এসে নেমেছিলেন কপর্দক-শূন্য অবস্থায় কিন্তু পাটনা ছাড়ার সময় ঠিক সে অবস্থা ছিল না, ট্যাকে কিছু 'রেস্ত' (এটা ঠাকুর্দারই ভাষা, বলা বাহুল্য) নিয়েই বেরিয়েছিলেন।

তবু, সে কিছু কুবেরের ঐশ্বর্য নয়। গাড়ি ভাড়া বাদে হাতে বোধহয় পনেরো-ষোল টাকা ছিল, খুব বেশী হ'লেও দু'মাসের খরচ। ধর্মশালায় উঠেছিলেন বটে, তবে সে বড় নাংরা, আর সেখানে বেশী দিন থাকতেও দেবে না। ঘর একখানা ভাড়া করতে গেলে—তাতেও কোন্ না মাসে একটা টাকা ক'রে বেরিয়ে যাবে।

সুতরাং চাকরি খুঁজতে বেরোতে হয়েছিল।

চাকরি আর কি, এমন ভাল ইংরেজি জানেন না যাতে কোন আপিসে চাকরি হয়। জানেন বাংলা আর কিছু সংস্কৃত, তাতে এক বাঙালীবাড়ি টিউশ্যানি করা যায়—ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়ানো। তখন এত বাংলা ইস্কুল হয় নি, ওটার খুব দরকার ছিল।

সেই কাজই খুঁজতে ডাক্তার বাগচীর বাড়ি গিছলেন, বাড়ি নয় অবশ্য, ডাক্তারখানায়। বাঙালী নাম দেখে ঢুকেছিলেন, ডাক্তার খুব রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আসলে তাঁর ছেলেপুলেও ছিল না—কিন্তু ঠিক সেকথা বলে তাড়ান নি, অকারণে অনেক কটু কথা বলেছিলেন। খিঁচিয়ে উঠেছিলেন বলতে গেলে। এখন বোঝেন রমেশ ঠাকুর্দা যে—মন ভাল ছিল না বলেই বলেছিলেন। জ্বালাটা প্রকাশের পথ খুঁজছিল, হাতের কাছে যাকে পেয়েছে তার ওপরই গিয়ে পড়েছে।

পরের দিনও কাজের খোঁজে অমনি বাঙালী-প্রধান পাড়ায় ঘুরছেন, হঠাৎ সেই ডাক্তারটির সঙ্গে দেখা। খুবই সুপুরুষ চেহারা, দীর্ঘ দেহ, গৌর বর্ণ—বাঙালী নয়, দেখলে পাঠান বলেই মনে হয়। চেহারাটার জন্যেই মনে ছিল আরও, দেখেই চিনতে পেরেছেন ঠাকুর্দা।

কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যে তাকাচ্ছেন তাও মনে হ'ল না—বাড়িতে থাকার জো নেই বলেই বেরিয়ে পড়েছেন—কতকটা সেই অবস্থা। হঠাৎ নজর পড়ল ওঁর দিকে। বেশ উদ্ধতভাবেই বললেন, 'ওহে ছোকরা—শোন! কাল তুমি চাকরি খুঁজতে গিছলে না? কিসের চাকরি? কি জান? লেখাপড়া তো শেখ নি...রাঁধতে জানো? ভাত রাঁধতে? পিরানের মধ্যে থেকে তো পৈতে বেরিয়ে আছে দেখছি।...বামুন তো? ভাত রাঁধবে আমার এখানে?'

এই বলে—ঠাকুর্দার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই বলে গেলেন, 'ভয় নেই, গুষ্টিবগ্‌গের রান্না করতে হবে না। সে আমার মহারাজ আছে একজন, মহারাজ মাহারিণ নৌকর—লোকের অভাব নেই, মুশকিল হয়েছে আমার শাশুড়িকে নিয়ে। তিনি আবার হিন্দুস্থানী বামুনদের হাতে খেতে চান না, বলেন, ওরা ম্যেৎখানায় গিয়ে কাপড় কাচে না—ওদের হাতে খাব না। অসুবিধে কিছু হয় নি এতদিন—নিজের রান্না নিজেই ক'রে নিতেন—হঠাৎ অসুখে পড়েই মুশকিল হয়েছে, অথচ এমন ব্যামো নয় যে ভাত বন্ধ হবে, বাতেই শয্যাগত, মাহারিণটা খুব ভালো, দেখাশুনো করে—কিন্তু রান্না তো চলবে না তার দ্বারা, শুধু ওঁর মতো—ভাত, ডাল আর একটা দুটো ভাজাভুজি ক'রে দিলেই হবে। দ্যাখো পারবে? না পারো—মানে না জানো, সে না হয় আমার মহারাজ দেখিয়ে দেবে—তুমি খুন্তি নাড়লেই হ'ল।'

রমেশ ঠাকুর্দার কি মনে হ'ল, বললেন—'ভাতটা হয়ত নামাতে পারব—ডালটাও, ভাজাও এমন কিছু কঠিন নয়—হয়ত চেষ্টা করলে পারব—তবে আটা-ময়দার পাট কিছু জানি না।'

'কিছু না, কিছু না, কিচ্ছু দরকার নেই। রাত্রে পুরী খান—সে আমার মহারাজই ক'রে

দেয়। লুচি-পুরী ওর হাতে চলে। শুধু ডাল ভাতেই নাকি যত ওঁর জাত বাঁধা আছে—তার জন্যে বাঙালী বামুন চাই। তাহ'লে পারবে তো? কেমন লোক তুমি—চোর কি ছ্যাঁচোড় কিছুই জানি না—কিন্তু অত খোঁজ নেবার আমার সময়ও নেই এখন,—যাও, যাও, কোথায় কাপড়-জামা কি আছে নিয়ে এসো গে। তোফা থাকবে, তোমার রাত্তিরের খাবারও মহারাজ ক'রে দেবে—মছলীও যেদিন মিলবে—এই হেঁসেল থেকে পাবে। খাওয়া-থাকা, তাছাড়া মাইনেও দোব কিছু। আর আমি অন্য লোক পেয়ে যাই এর ভেতর—তোমাকে ভাসিয়েও দোব না তা বলে। তুমি এখানে খেয়ে থেকে টিউশানি-ফিউশানি কি কোন কাজকর্ম যোগাড় ক'রে নিতে পারবে।'

রমেশ ঠাকুর্দা একবার ভয়ে ভয়ে বলতে গিছলেন, 'আমাকে কম্পাউন্ডারীটা শেখাবার একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবেন—তখন?'

'উঁহু,' সাফ জবাব দিয়েছিলেন ডাঃ বাগচী, 'উটি মাপ করতে হবে। বাঙালীকে? আমার ডাক্তারখানার ত্রিসীমানায় আসতে দোব না। দু'দুজনকে শিখিয়েছিলাম হাতে ধরে—দুজনেই আমার ডিস্পেনসারী ফাঁক ক'রে দিয়ে সরে পড়ল—শুনছি, সেই টাকা দিয়ে দেহাতে গিয়ে ডাক্তারখানা সাজিয়ে 'ডাগ্‌দার সাব' হয়ে বসেছে। ঝাঁটা মারো বাঙালীর মাথায়, অমন বেইমান আর নেই.....এ কারবার করতে গেলে বুদ্ধু খোট্টাই ভাল।'

আর কথা বাড়ান নি ঠাকুর্দা। মোট-মোটারি নিয়ে—মোট আর কি, একটু বিছানা আর পাটনায় ওঁর আশ্রয়দাতা নিতাইবাবু একটা পুরোনো প্যাঁড়া দিয়েছিলেন, তাতেই কাপড় জামা—বাগচী সাহেবের বাড়ি এসে উঠেছিলেন।

রান্নার বিশেষ কিছু জানতেন না ঠাকুর্দা। ভাতটাই নামাতে পারতেন শুধু। তবে তাতে কোন অসুবিধা হয় নি। এঁদের পুরনো ঝি রামরতিয়া প্রথম থেকেই স্নেহের চোখে দেখেছিল ওঁকে—সে-ই পাকঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে নির্দেশ দিয়ে রান্না করিয়ে নিত। ভাত ডাল আর একটা দুটো ভাজা। নিরামিষ তরকারি ও-হেঁসেলে 'মছলি' কি 'শিকার' রান্না হওয়ার আগেই পাচক বা মহারাজ বলিরাম তৈরি ক'রে দিত গোপনে, তাই নতুন ঠাকুরের বলে চালানো হ'ত। রামরতিয়া স্পষ্টই বলত, 'আরে সিয়ারাম, সিয়ারাম! বাঙালী মছ্‌লিকোর বাহ্‌মন আবার বাহ্‌মন নাকি!...আচার নেই, পূজাপাঠ করে না......। বলিরামজীর হাতে খাবেন না—এর হাতে খাবেন। শির বিগড়ে না গেলে এমন বুদ্ধি হয়?'

বাগচীর যিনি শাশুড়ি—দীর্ঘ এবং বিরাট দেহ তাঁর, খুবই ফর্সা, এখনও মেমসাহেবের মতো গায়ের বর্ণ; এককালে হয়ত সুন্দরীই ছিলেন—মুখ চোখ দেখে তাই মনে হয়, এখন মোটা হয়ে গিয়ে সে রূপ নষ্ট হয়ে গেছে। এককালে নাকি খুবই কাজের লোক ছিলেন, রান্না-বান্নাও জানতেন খুব ভাল—'হরকিসিম্‌কে' মিঠাই বানাতে পারতেন, সংসারের কোন কাজ অজানা ছিল না, করতেনও খুব। এই সংসারই ওঁর হাতে ছবির মতো ছিল। ইদানীং সব ছেড়ে দিয়েই আরও শরীরটা ভেঙে গেল। বাতে ধরে গেছে, দিনরাত ঐ পাহাড়ের মতো পড়ে আছেন। জামাই ডাক্তার—তার ওষুধ খাবেন না, এখানের কে বৈদ্ আছে জড়িবুটি দেয়—তাই খাচ্ছেন। মালিশ করান না—দুর্গন্ধ বলে। বলেন, 'তাহলে আর কেউ আমার ত্রিসীমানায় আসবে না—আমি বেশ জানি।'

শাশুড়ি যেখানে জামাইয়ের বাড়ি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন—সেখানে স্বভাবতই বৌয়ের কথা ওঠে।

বৌ—মানে ডাক্তারের স্ত্রী কৈ?

বাড়িতে কেউই তো নেই বলতে গেলে। অতবড় বাড়ি, থাকেন শুধু বাগচী সাহেব আর তাঁর শাশুড়ি—মালিক পক্ষের এই মোট দু'জন। এ ছাড়া চাকর, দু'জন ঝি, পাচক, মালী, সহিস-কোচোয়ান (নিজের টাঙ্গা আছে ডাক্তার সাহেবের) এবং এই নব-নিযুক্ত ঠাকুর। এরাই বেশির ভাগ। প্রথম এখানে এসে চার-পাঁচ দিন নিজের কাজ বুঝে নিতেই বিব্রত ও ব্যস্ত ছিলেন ঠাকুর্দা। বিব্রত বোধ করার কথাও, একেবারেই অজানা কাজ। যা করতে যান সেটাই কঠিন মনে হয়। আনাড়ির ব্যাপার। ......সন্ধ্যের দিকে অবসর মিলত বটে, বিকেলের দিকটা পুরোই অবসর—কিন্তু তখন বাইরে বেরিয়ে পড়ার দিকেই মন পড়ে থাকত—নতুন শহরে এসেছেন, নবাবদের শহর, সুন্দরী শহর, সাহেবরা বলত 'সিটি বিউটিফুল'—শহর ঘুরে দেখতেই কেটে যেত অপরাহ্ন আর সন্ধ্যা। পায়ে হেঁটে দেখা বলে সময়ও বেশী লাগত। ফিরে আসার পরও সেই নবদৃষ্ট দৃশ্য, সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতা নেশার মতো আচ্ছন্ন ক'রে রাখত মাথা আর মন—তখন তাই আর কিছু মনে আসত না।

পাঁচ সাত দিন কেটে যেতে—বৈসাদৃশ্যটা চোখে পড়ল। কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন রামরতিয়াকে। রামরতিয়ার ভুরু একটু কুঁচকে উঠেছিল, তারপর কিন্তু প্রশান্ত মুখেই জবাব দিয়েছিল, 'দিদি? দিদি মর গয়ী।'

কে জানে কেন, উত্তরটা ঠিক মনে ধরে নি ঠাকুর্দার। 'পেটের শত্তুর' কথাটা আড়াল থেকে মহিলার মুখে শুনেছেন বার-কতকই। চাপা গলায় আক্ষেপ করছেন তাও কানে গেছে, 'বাইরের শত্তুরকে পার আছে, ঝেড়ে ফেলা যায়—পেটের শত্তুর যে! যাকে বলে ওগরাবারও জো নেই, গেলবারও জো নেই—আমার হয়েছে তাই!'

ঠাকুর্দা একফাঁকে বলিরামকেও প্রশ্ন করেছেন। অতর্কিতে, একান্তে। ঠিক যে এত হিসাব ক'রে করেছেন তা নয়—এমনিই, হঠাৎ মনে হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করেছেন।

বলিরামও উত্তর দিয়েছে, 'দিদি? দিদি মর গয়ী, আউর ক্যা?'

বলেছে—কিন্তু কেমন এক ধরনের অর্থপূর্ণ চোখে চেয়ে হেসেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এবার সন্দেহটা একটু বেশী রকমই হয়েছে। ঠাকুর্দা ঘুরতে ঘুরতে একসময় গিয়ে মালীকে জিজ্ঞাসা করেছেন—'আচ্ছা, মেমসাহেবকে দেখি না—তিনি কোথায়?'

মালীও পুরনো লোক; সে দীর্ঘকাল সাহেবের কাছে আছে। সে ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেছে, 'কেন বলো তো? সে খবরে তোমার কি দরকার? আর দরকার পড়ে থাকে তো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করো না।'

ঠাকুর্দা বলেছেন, 'না, না, আমার কোন দরকার নেই। এমনিই, দেখি না, তাই। মানে মাজী রয়েছেন—মেমসাহেবের কী হ'ল—কথাটা মনে হয় তো—তাই।'

সহজ-স্বাভাবিক ভাবেই বলেন। মালীরও সন্দেহ কেটে যায়। তাছাড়া, এসব কথা তো ওরা বলতেই চায়, মনিব বাড়ির কেচ্ছা। মালী গলা নামিয়ে বলে, 'মেমসাহেব বাইরে গেছেন।...মানে এ শহরেই আছেন—আলাদা থাকেন, হুসেনগঞ্জে।'

ঠাকুর্দা আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'তা মাজী তাহ'লে এখানে থাকেন কেন?...মেয়ে জামাইয়ে বনে না বলে যদি মেয়ে আলাদা, সেখানে শাশুড়ি জামাইবাড়ি থাকেন—এ তো বড়

তাজ্জব। তিনি তো মেয়ের কাছেই থাকলে পারেন।'

গলা আরও নামে মালীর, প্রায় চুপি চুপি বলে, 'মেয়ে জামাইয়ে বনে না কে বললে? ঝুট! বনে না মা আর মেয়েতে। মায়ের ওপর রাগ ক'রেই মেমসাহেব গেছে।'

আরও কিছু বলত হয়ত, বারান্দায় স্বয়ং সাহেবের পায়ের শব্দ পাওয়া যায়, ঠাকুর্দা কামিনীফুলের গাছের ফাঁকে অদৃশ্য হন।

ব্যাপারটা যে একটু ঘোরালো সে বিষয়ে ঠাকুর্দার আর কোন সন্দেহ রইল না। তাঁর কিছু না। তিনি একাজ করতে আসেনও নি। ইতিমধ্যেই দু'একজনের মুখে শুনেছেন যে, কাশীতে বিস্তর বাঙালী—নিম্নমধ্যবিত্ত বেশির ভাগ—সামান্য দু'চার টাকা আয়ে সংসার চালায়, তাদেরই এই ধরনের ছেলে-পড়ানো লোক দরকার, যে দু'টাকা এক টাকায় বাংলা পড়াবে।

তাঁর মন সেই দিকেই ঝুঁকেছে। তীর্থবাসকে তীর্থবাস—জীবিকাকে জীবিকা। সেই ভাল, কাশীর তুল্য ধাম নেই, রামের তুল্য নাম নেই।...সেজন্যে নয়, এমনিই একটু কৌতূহল হয় বৈকি!

'তক্কে তক্কে রইলুম, জানিস', ঠাকুর্দা বলেছিলেন, 'একদিন মওকা মিলেও গেল। রামরতিয়া প্রাণপণে বুড়ির সেবা করত, এটা ঠিক। সে শুনতে আসছে না তার ধম শুনছে, শুয়ে-মুতে করা যাকে বলে, নিজের মেয়েও এত সেবা করে না। তার ওপর মাগীর ফাইফরমাশ অবিরাম। কিছুই পছন্দ হ'ত না, ওর কথা শুনলে মনে হ'ত সবাই মিলে মাগীর ওপর খুব অন্যায় অবিচার সব করছে, অত্যেচার যাকে বলে। বিশেষ রামরতিয়া আর ডাক্তার সাহেব। ডাক্তার সাহেবের ওপর যে কি রাগ তা তোকে কি বলব, পায় তো উকুনের মতো নখে টিপে মেরে ফেলে।

'একদিন এমনি মিথ্যে মিথ্যে ক'রে গাল পাড়ছে—রামরতিয়ার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে, দুপুরের দিক সেটা—আমি বললুম রামরতিয়াকে—"বুড়ি থাকে কেন এখানে পড়ে? জামাই যদি এত খারাপ, এখানে যদি সকলে মিলে এত খারাপ ব্যাভার করে—বুড়ি মেয়ের কাছে চলে গেলেই তো পারে"।...

'রামরতিয়া এতদিনে ভুলে গেছে মেমসাহেবের কথা আমার কাছে কি বলেছিল, কিম্বা রাগের মাথায় আর অত রেখে-ঢেকে বলার কথা মনে পড়ে নি, সে বললে—"হ্যাঁ, মেয়ের কাছে যাবে না আরও কিছু! অত কাণ্ড ক'রে মেয়েকে তাড়ালে কেন তবে? মেয়েকে তাড়িয়ে জামাইকে ষোলআনা ভোগ করবে বলেই তো আদাজল খেয়ে লাগল তার পেছনে, তার সাজানো ঘরকন্না ভোগ করতে দিলে না। ও কি মানুষ, ও ডাইনী। ...ঠিক হয়েছে, তেমনি সাজাও ভগবান দিয়েছেন—তার পর থেকেই দুনিয়ার যত বিমারী এসে ঘিরে ধরেছে, বাত, পেটের গোলমাল, বুকের গোলমাল—নেই কি? আর কতদিন বয়স ঢেকে ঢেকে খুকী সেজে বেড়াবে"?

'যা শোনবার—ওরই মধ্যে শুনে নিয়েছি। পুরোটা শুনি নি বটে—তা না হোক, ক্রমে সবই বেরোবে। এমন সময় ঘাঁটাতে নেই আর। যা বলে ফেলেছে বেফাঁশ, রাগের ধমকেই—এরপর জোর করতে গেলেই সাবধান হয়ে যাবে। সেই দিনই রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ছাদে পাশাপাশি শুয়ে বলিরামকে সটে-পটে চেপে ধরলুম—"কী ব্যাপার বলো তো বাবা বলিরামজী, তুমি তো সেদিন বললে দিদিবাবু মরে গেছে, এই তো শুনছি এখন হুসেনগঞ্জে বাড়ি ভাড়া ক'রে আছে, সাহেবের সঙ্গে দেখাও হয় রোজ"।

'বলিরাম নিঃশব্দে হাসলে খানিকটা, তারপর বললে, 'অমন ধাপ্পা দিয়ে আমার কাছে

থেকে কথা আদায় করতে পারবে না বাংগালী বাবু, যা জিজ্ঞাসা করবে সিধাসিধা করো, আমিও সিধাসিধা জবাব দিচ্ছি। হুসেনগঞ্জে ছিল ঠিকই—এখন সুন্দরবাগে চলে গেছে, সেখানে কোঠী কিনেছে একটা।.....আর সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'তেই পারে না—সে-মুখ মেমসাহেব রাখে নি। গুস্‌সা ক'রেই গেছে এটা ঠিক, তবু খুবই খারাবী হয়ে গেছে কামটা। সাহেব কেন, কোন ভদ্দর আদমীর কাছেই মুখ দেখাবার আর পথ রাখে নি।.....তবু তো সাহেব ভাল। শুনেছি অনেক টাকা মেমসাহেবের নামে ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দিয়েছে—যাতে নাকি তার খাওয়া-পরার কোন কষ্ট না হয়। সেও নিয়ে গিয়েছিল—জেবর, টাকা, কাপড়, বিস্তর জিনিস নিয়ে গেছে, নওলকিশোরকেও ছেড়েছে পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই—টাকা খরচ হওয়ার কোন তরিকা নেই। তা ছাড়া ও যে কিছু হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়বে এমন ছেলে নওলকিশোর নয়। খুব নেক্ ছোকরা ছিল নওলকিশোর, এদের পাল্লায় পড়ে তারই জিন্দিগী নষ্ট হয়ে গেল—নুক্‌সানটা উঠাল সে-ই। এ শহরে আর তাকে খেটে খেতে হচ্ছে না"।

'বুঝলুম তামুক তৈরী। টান দিলেই হয়, বুঝলি! আমিও মিষ্টি কথায় সব কিস্‌সা টেনে বার ক'রে নিলুম একটু ক'রে। সবই খুলে বলল বলিরাম। তারও বোধহয় পেটে ফুলছিল বলতে না পেরে।'

॥ ৮ ॥

সে দীর্ঘ কাহিনী। ঠাকুর্দার জবানীতে বললে আরও দীর্ঘ হবে। তাই এখানে সংক্ষেপেই বলছি। ডাঃ বাগচী যখন কলকাতায় থেকে ডাক্তারি পড়তেন তখন তাঁর অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। বাবা যজমানী ক'রে সংসার চালাতেন, তাতে তাঁর দুটি সংসার—দুটি সংসারই বিদ্যমান ছিল—মোট সতেরো-আঠারটি ছেলেমেয়ে। হরিনাথ বাগচী ডাক্তার সাহেবের নাম—হরিনাথ খুব মেধাবী ছিলেন বলে ওঁর বাবারই এক যজমান বরাবর তাঁর পড়ার খরচ যুগিয়েছেন, মায় যখন এনট্রান্স পাস ক'রে ডাক্তারি পড়তে ঢুকলেন তখনও তিনিই খরচ-পত্র দিয়ে ভর্তি করিয়েছিলেন।

হাসিমুখেই টানছিলেন খরচা, শেষের দিকে ভদ্রলোক একটু 'কারে' পড়ে গেলেন। এক্সপোর্ট-ইম্‌পোর্টের ব্যবসা ছিল, তাতেই লাখখানেক টাকা লোকসান দিয়ে দেউলে খাতায় নাম লেখালেন। তবু হরিনাথকে পথে বসান নি একেবারে—তিনিই এই ওঁর বর্তমান শাশুড়িকে বলে-কয়ে সেখানে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। মাইনেটা তিনিই দিতে থাকলেন অবশ্য। ইনি অর্থাৎ এখন যিনি সাহেবের শাশুড়ি, তরঙ্গিনী—অল্প বয়সে এই মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন, ওঁদেরই আত্মীয়, ব্রাহ্মণ, পয়সা-কড়িও ছিল—কে দেখা-শুনো করে সেই হিসাবেই হরিনাথকে ওদের বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন ওঁর প্রতিপালক সেই চক্রবর্তী মশাই। উভয় পক্ষেরই উপকার। চালাকচতুর চট্‌পটে ছেলে, লেখাপড়ায় ভাল—বিষয়-সম্পত্তিও দেখাশুনো করতে পারবে, অভিভাবকের মতো থাকবে, অবসর-সময়ে মেয়ে তড়িতকে একটু খেলাপড়াও শেখাতে পারবে—তাতে ওঁদেরই বেশী উপকার—তরঙ্গিনীকে সেই কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন চক্রবর্তী।

তখন হরিনাথের বয়স তেইশ-চব্বিশ হবে—তখনকার দিনে বেশী বয়সেই লেখাপড়া শিখত—তড়িতের দশ-বারো, আর তরঙ্গিনীর সাতাশ-আটাশ। এখনকার নিয়ম অনুসারে

তের সঙ্গেই হরিনাথের প্রেমে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু হরিনাথ এক পুরুষ পেছিয়ে গেলেন! অবশ্য হরিনাথের কতটা দোষ ছিল এ ব্যাপারে তা বলা শক্ত। তরঙ্গিনীই এই সুপুরুষ বুদ্ধিমান মেধাবী ছেলেটির প্রেমে পড়ে তার মাথাটি খেলেন।

এইভাবেই চলছিল। সমাজে যথেষ্ট ঘোঁট হ'লেও যেহেতু তরঙ্গিনীর হাতে টাকা ছিল—বিশেষ কেউ কিছু করতে পারে নি। হরিনাথও ভালভাবে পাস ক'রে বেরিয়ে কলকাতাতেই ডাক্তারখানা খুলে বসে বেশ পসার জমিয়ে নিলেন—তাঁরই বা কে কি করবে?

করতে যেটা পারে—সেইটেই করল আত্মীয়রা, তড়িতের বিয়েতে বাগড়া পড়তে লাগল। কিছুতেই কোথাও বিয়ে হয় না—প্রচুর টাকা খরচ করার প্রলোভন দেখিয়েও না। দূর-দূরান্তে ঘটক পাঠিয়ে বিদেশে কোন সম্বন্ধ হয়ত ঠিক করেন তরঙ্গিনী—যথাসময়ে তারা খবরটি পৌঁছে দিয়ে আসে। ফলে পাত্রপক্ষ বিয়ে ভেঙ্গে দেয়—সেই সঙ্গে দেয় কিছু গালাগালি।

এইভাবে বছরের পর বছর কেটে যায়—এধারে মেয়ে ষোল থেকে সতেরোয়, সতেরো থেকে আঠারোয় পৌঁছয়—বিয়ের কোন ব্যবস্থাই করা যায় না। তখনকার দিনে তেরো পেরোলেই জাতে ঠেলত। নেহাৎ এদের এখন এমনিতেই জাত বলতে কিছু নেই—একঘরে হয়েই আছে বহুকাল—এদের আর কি করবে?

তবু ব্যস্ত হয়েই উঠলেন তরঙ্গিনী। শেষ পর্যন্ত যেটা শোভন এবং সঙ্গত, যা বহু আগেই করা উচিত ছিল—তাই করলেন, হরিনাথের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, পূর্বের ইতিহাসে যবনিকা টানতে—কলকাতার পাট একেবারে তুলে দিয়ে বহুদূরে এই লক্ষ্ণৌতে চলে এলেন, যেখানে পরিচিত কেউ নেই। এ বাড়িও তরঙ্গিনীর টাকাতেই কেনা, যদিও বুদ্ধি ক'রে ডাক্তার সাহেব নিজের নামে করিয়ে নিয়েছিলেন দলিল তৈরীর বেলা।

বাড়ি কিনে, ডাক্তারখানা সাজিয়ে দিয়ে জামাইকে—যাকে বলে থিতু ক'রে দেওয়া—তাই করলেন। হরিনাথ ডাক্তারী বিদ্যেটা সত্যিই শিখেছিলেন, তাই এখানেও দেখতে দেখতে পসার জমে গেল, রাশি রাশি টাকা রোজগার করতে লাগলেন; গাড়ি-ঘোড়া, চাকর-দারোয়ান রেখে 'রইস আদমী'র চালেই সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন।

এরপর সম্ভবত একটু নিশ্চিন্ত শান্তি আশা করেছিলেন তরঙ্গিনী, তা পেলেন না।

নিজের মেয়েই বাদ সাধল।

অথবা, মেয়ে বলাও ভুল—প্রকৃতিই তার নিয়ম পালন করল, যা হওয়া উচিত তাই হ'ল।

তড়িতও সুন্দরী, মায়ের থেকেও বেশী। অল্প বয়স তার, হরিনাথ পরিণত-যৌবন, সুপুরুষ। তরঙ্গিনী ততদিনে বাঙালীর হিসেবে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছেন। হরিনাথ আর তড়িৎ পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে আসক্তি বোধ করবে এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ তড়িতের এটা হকের পাওনা, সে ছাড়বে কেন? তরঙ্গিনীরই অবস্থা বুঝে মানে মানে সে অধিকার ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল, উচিত ছিল পিছিয়ে এসে নিজের পরকালের চিন্তা করা—তা তিনি পারলেন না। বরং যেন ক্ষেপে উঠলেন একেবারে। বলিরামের ভাষায়—'আপনা বিটি শৌহর হয়ে উঠল।'

তবু বহুদিন পর্যন্ত হরিনাথ দুদিক সামলে চলেছিলেন। বোধ করি দুজনকেই বোঝাতেন

যে তার প্রতি আসক্তিটাই সত্য—অপরেরটা লোক-দেখানো, স্তোক। সে কথার কিছু ষোল আনা মিথ্যেও নয়। হয়তো তড়িতের প্রতি নবোদ্ভুত কামনাও যেমন সত্য—তেমনি সত্য পুরাতন অভ্যাসটাও। হয়তো তরঙ্গিনীর মোহ তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। হয়তো বা কৃতজ্ঞতার প্রশ্নও ছিল, কিম্বা অশান্তির ভয়।

তরঙ্গিনীর জন্যেই ডাক্তার বার বার তড়িতের সন্তান-সম্ভাবনা নষ্ট করছিলেন। সন্তান হওয়ার পর এই দ্বি-সত্তা বজায় রাখা সম্ভব হবে না। কিন্তু ক্রমশ তড়িৎ বিদ্রোহ করল, ছেলে আর নষ্ট হ'তে দেবে না সে। কিছুতেই না। কোন কথাই আর শুনতে প্রস্তুত নয়। আর শুনবেই বা কেন, সে কি বিধবা?—যে ছেলে হ'লে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না—সেজন্যে গোপনে সন্তান নষ্ট ক'রে ফেলতে হবে?

তড়িৎ এটা বুঝেছিল যে এর প্রতিকার করা হরিনাথের দ্বারা সম্ভব হবে না, দীর্ঘকাল তরঙ্গিনীকে সমীহ করা, ভয় করা তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। সুতরাং যা করতে হবে—এস্‌পার-ওস্‌পার—তাকেই করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর বৈধ সম্পর্কটা লজ্জার কারণ বলে গণ্য হবে, সেটা গোপনে সারতে হবে অবৈধ প্রেমের মতো—আর যেটা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অবৈধ সেটা প্রকাশ্যে চলবে, এ অবিচার ও অস্বাভাবিক অবস্থা সে সহ্য করবে না কিছুতেই।

এই মতলবেই একদিন, ইচ্ছে ক'রে—যাকে বলে গায়ে-গাছ-কেটে ঝগড়া বাধিয়ে—আসল কথাটা শুনিয়ে দিল মাকে! হরিনাথ তরঙ্গিনীকে ঘৃণা করেন, শুধু অশান্তির ভয়েই মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে রাখতে বাধ্য হন; সত্যিকার ভালবাসা তাঁর বিয়ে-করা বৌয়ের সঙ্গেই; আর তাই তো স্বাভাবিক, উচিত। তরঙ্গিনীর তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে; গঙ্গা-পানে পা হয়েছে—এখনও এ অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি সামলাতে পারে না? এবার তো বোঝা উচিত। এখনও এই চালাতে চায় সে? ঘেন্না-পিত্তি বলে কি কিছু ভগবান দেন নি ওকে? ইত্যাদি—

কথাগুলো বেশ প্রকাশ্যভাবেই বলেছিল তড়িৎলতা। গোপন ক'রে গলা নামিয়ে বলার প্রয়োজন বোঝে নি, ঝি-চাকরদের শুনতে কোন বাধা ছিল না। প্রয়োজন বোঝে নি এইজন্যে যে সাহেব ও তাঁর 'শাস'-এর সম্পর্কটা ওদের কারুরই জানতে বাকী ছিল না। ডাক্তার যে প্রতিদিন মধ্যরাত্রে তরঙ্গিনীর ঘরে যান ও শেষরাতে নিজের বা তড়িতের ঘরে চলে আসেন—সেটা একদিন না একদিন সকলেরই চোখে পড়বে বৈকি!

কিন্তু এই যে সামান্য অন্তরালটুকু ছিল, লজ্জার এই পত্রাবরণটুকু—সেটা ঘুচিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড একটা ভুলই ক'রে বসল তড়িৎ। তরঙ্গিনীও মুখোশ খুলে দিয়ে পিশাচীর মূর্তি ধারণ করলেন একেবারে। এমন কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন যে, তারপর আর—মা ও মেয়ে—দুজনের একত্রে থাকা সম্ভব নয়।

হরিনাথ না পারলেন মেয়েকে বাধা দিতে, না পারলেন মেয়ের মাকে। তাতেও অত ক্ষতি হ'ত না—যদি না এটা স্পষ্ট হয়ে উঠত যে হরিনাথ মেয়ের থেকে মাকেই বেশি সমীহ করেন, বা তার মন-যোগানোর চেষ্টাতেই, তাকে শান্ত করতেই বেশী ব্যস্ত। পুরুষমানুষ অশান্তিকে যত ভয় করে এমন আর কিছুকে নয়। আর মেয়েদের কাছে ওটা তত প্রিয়। মধ্যে মধ্যে ঘোরতর রকমের একটা অশান্তি না বাধালে তাদের কাছে জীবনটা বড় বৈচিত্র্যহীন বিস্বাদ লাগে। আর সেই কারণেই পুরুষের মনোভাব তাদের কাছে দুর্জ্ঞেয় মনে হয়। ক্লেদ অশান্তির ভয়ে মানুষ আর সব বিবেচনাকে তুচ্ছ করতে পারে, এটা

মেয়েদের মাথায় একেবারেই ঢোকে না।

হরিনাথ যে তড়িতের স্বাভাবিক প্রেমের ওপর ভরসা ক'রে—তাকে নিজের দলের লোক, তার উপর জোর বেশী ভেবে—তার মাকে মিথ্যা আশ্বাসে ভোলাতে চাইছেন—কেবলমাত্র নিছক অশান্তির ভয়ে—এটা তড়িতের মাথাতে কিছুতেই গেল না, এ তার বুদ্ধির অগম্য, অবিশ্বাস্য তার কাছে। সে এই আশঙ্কাকে সত্যিকার ভালবাসা ভাবল। মনে করল তার প্রতি আচরণটাই আসলে স্তোক, হরিনাথের কাছে সে শুধু সাময়িক সম্ভোগের বস্তু, তাই তাকে মিথ্যা-মধুর কথায় ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে চেয়েছে এতদিন। তাই যখন দুজনের একজনকে বেছে নেবার প্রশ্ন উঠেছে, তখন আসল যে প্রেমাস্পদ তাকেই বেছে নিয়েছে।

সেও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল একেবারে। তখন তার সবচেয়ে বড় চিন্তা হ'ল কি করলে স্বামীকে সবচেয়ে বড় আঘাত দেওয়া যায়। পুরুষ, বিশেষত প্রতিষ্ঠিত কোন পুরুষমানুষকে অপদস্থ, হাস্যাস্পদ ক'রে তোলার থেকে মর্মান্তিক আঘাত আর কিছু দেওয়া যেতে পারে না—এ সহজ জ্ঞানটুকু তার ছিল। সেই পথই সে ধরল। কিন্তু তাতে যে নিজেরও ইহকাল পরকাল, একূল-ওকূল নষ্ট হয়ে গেল, এ ভুল যে সংশোধনের পথ রইল না—তা একবারও ভেবে দেখল না।

নওলকিশোর ছিল হরিনাথের দারোয়ান, সুশ্রী, বিনত, ভদ্র চরিত্রের লোক—লোক কেন ছোকরা বলাই উচিত, বয়স তার তখনও ত্রিশের উপরে নয়, বরং বোধহয় অনেকটা নিচেই—বিজনোর জেলায় বাড়ি, মা-ভাই-স্ত্রী সব আছে—বোধহয় একটা বাচ্চাও হয়ে গেছে, সেকথা লজ্জাতে কাউকে বলে নি। ভদ্র শান্ত স্বভাবের জন্যে বছর তিনেকের মধ্যেই সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল, দারোয়ান থেকে প্রকৃত পক্ষে সেক্রেটারি হয়ে উঠেছিল। ইদানীং 'কলে' যাবার সময়ও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ডাক্তারখানাতেও যেতে শুরু করেছিল সে।

এই নওলকিশোরকেই বেছে নিল তড়িৎ।

ওর মতো সুন্দরী তরুণী মেয়ে পিছনে লাগলে বিশ্বামিত্র-দুর্বাসারও মন টলে—নওলকিশোর তো কোন্ ছার। একদা প্রায় প্রকাশ্যেই হুসেনগঞ্জে একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে নওলকিশোরকে নিয়ে সেখানে গিয়ে উঠল। টাকাকড়ি গয়নাপত্র নিয়ে, একরকম মাকে বলে-কয়েই চলে গেল।

অর্থাৎ নিজের সর্বনাশ ভাল ক'রেই করল নিজে।

আসলে তড়িৎ এতদিনে স্বামীকে সত্যি-সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিল, বরং বলা উচিত বহুদিন থেকেই বেসেছে। সেই দশ-এগারো বছর বয়সের সময়—যখন এই সুদর্শন তরুণ যুবকটি প্রথম ওদের বাড়িতে আসে—তখন থেকেই। একান্তমনে কামনা করেছে ওকে, মনের সবটুকু আবেগ ঢেলে দিয়ে। মার বিসদৃশ আচরণে অস্বাভাবিক আসক্তিতেই সে মনোভাব প্রকাশ করতে পারে নি—মার প্রতি ঘৃণায়, কিছুটা ভয়েও বটে। আর তখন থেকেই তাই লক্ষ্য ছিল, অন্য কোন পুরুষ নয়—এই মানুষটিকেই সে জয় ক'রে নেবে একদিন মার কাছ থেকে।

বহুদিনের এই ইচ্ছার আপাত-ব্যর্থতাতেই পাগল হয়ে গিয়েছিল তড়িৎ—তাই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে প্রত্যাবর্তনের, ভ্রম সংশোধনের সমস্ত পথ ঘুচিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু বেরনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ভুল ভেঙেছে, নিজের মনের চেহারাটা

স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। নওলকিশোরের প্রতি কোন দিনই কোন আসক্তি বোধ করে নি—এখন তো তার সঙ্গ অরুচিকর হয়ে উঠল রীতিমতো। তাকে সব বুঝিয়ে বলে শ'পাঁচেক টাকা দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিল, সেখানে গিয়ে কিছু জমি নিয়ে ক্ষেতীউতি করতে—মোরাদাবাদ কি বেরিলি কোথাও গিয়ে নতুন নৌকরি খুঁজতে। মোট বোধহয় আট দিনের বেশী একত্র থাকে নি ওরা—নতুন বাসায় গিয়ে।

ঠিক—এই সময়টাতেই, তড়িতের গৃহত্যাগের মাস তিন-চার পরেই ঠাকুর্দার প্রবেশ ঐ রঙ্গমঞ্চে, এর পরের ঘটনা তাঁর জবানীতে শোনাই ভাল।

'কী বলব তোকে নাতি, এই কেলেঙ্কারের কথা শুনে গা ঘিন-ঘিন করতে লাগল। কেচ্ছা কেলেঙ্কার চার যুগ আছে, কোন দিনই কেউ একেবারে সাচ্চামোতি ছিল না, পুরাণ তো পড়েছিস, পরাশর বিশ্বামিত্রর মতো তাবড় তাবড় ঋষিরাই কত কি ক'রে গেলেন—তা আমরা তো কোন্ ছার। তা বলছি না, তবু এই মা আর মেয়েতে ঐ একটা পুরুষকে নিয়ে এই বিচ্ছিরি টানাটানি, প্রকাশ্যে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে চাকর-বাকরদের সামনে এই খেয়োখেয়ি—নোংরামি, এ যেন সহ্য হ'ল না। এখন হ'লে হ'ত—তখন দিনকাল ছিল অন্য, আমারও বয়স কাঁচা, ঠাকুরের নামে জুচ্চুরি করতে হবে বলে যজমানি করলুম না—পৈতৃক পেশা ছেড়ে পথে নামলুম—এখানে এই আবহাওয়াতে ভাত রাঁধার চাকরি করা আমার পোষাবে না, বেশ বুঝলুম। যদি উঞ্ছবৃত্তি করতেই হয়—বামুনের ছেলে হাতে পৈতে জড়িয়ে ভিক্ষেই করব, সে ঢের শান্তি, এ পাপের ভাত খাব কেন?

'যাব এটা তো ঠিক—কিন্তু মনে হ'ল যাওয়ার আগে এর একটা বিহিত ক'রে যাব না? মনে মনে একটা মতলব আঁটলুম। শাস্ত্রে পাঁচ রকম মিথ্যের কথা বলা আছে, বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ লোকের কাছে মিথ্যে বললে পাপ নেই—এ সবাই বলে গেছেন। প্রাণ রক্ষার্থে মান রক্ষার্থে, সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে—আর যে কোন অবস্থাতেই মেয়েদের কাছে মিথ্যে কথা বললে দোষ হয় না। .... আর তা'ছাড়া জীবনে একেবারে যে মিথ্যে বলি নি তা তো নয়—একটা ভাল কাজে না হয় বললুমই।

'মনে মনে মতলব ফেঁদে বেরিয়েছি, সামনেই এক ভণ্ড সন্ন্যিসীর সঙ্গে দেখা, ঐ যে যারা মিষ্টি মিষ্টি ক'রে পাঁচটা কথা বলে, হাত দেখার ভান ক'রে মেয়ে ঠকিয়ে খায়, দেখিস নি? কাশীতে তো দেদার, কলকাতাতেও পথে পথে ঘোরে শুনেছি, চিরদিনই আছে ওরা, ও একটা পেশা, যাই-হোক—পেলুম তো বেটাকে, আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললুম, "ওসব অং বং ছাড়ো বাবা, আমিও এই লাইনের লোক, আমাকে চাল দিতে এসো না, ওসব ভিরকুটি আমি বেশ জানি। যা বলছি মন দিয়ে শোন, লাগসই কতকগুলো মিথ্যে বলতে পারবে? যদি পারো তো গোটা একটা টাকা দোব বকশিশ"!

'একটা টাকা তখনকার দিনে কুবেরের ঐশ্বর্য। লক্ষ্ণৌতে কুড়ি সের গম পাওয়া যেত এক টাকায়, পনেরো ছটাক ঘি, এক পয়সা সের তোফা পাহাড়ে নৈনীতাল আলু......সে বেটা তো ধিনিক্ ধিনিক্ নাচতে শুরু করেছে একেবারে, বলে, যা বলবে তাই করব। আমিও ভেবে দেখলুম আমার তো অন্ধ জাগো না কিবা রাত্র কিবা দিন। পথের লোক পথেই নামব—এর পাপের পয়সা যা পেয়েছি তা থেকে একটা টাকা খরচা ক'রে যদি একটু প্রাচিত্তির ক'রে যেতে পারি—মন্দ কি?'

সন্ন্যিসীটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখে, বেলা তিনটের সময় রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াতে

বলে বাড়িতে এলেন রমেশ ঠাকুর্দা। গিন্নীমাকে গিয়ে বল্লেন, 'মা, একটা কথা বলছি, মনে কিছু করবেন না, আপনার এই বাতের ব্যামোটা সেরে গেলেই, সহজ মানুষ, উঠে-হেঁটে বেড়াতে পারেন—তা এসব ব্যামোতে তো শুনেছি দৈবই ভালো। শুনে এলুম গোমতীর ধারে কে এক সন্ন্যাসী এসেছেন—যাকে যা বলে ফুল দেন, মাদুলি ক'রে পরলে ব্যামো ভাল হয়ে যায়—তিনদিনে। দেখবেন একবার চেষ্টা ক'রে?'

বুড়ি তো সোজা হয়ে বসেছে একেবারে, 'কোথায় বাবা, কোথায়?...কিন্তু আমি তো উঠে যেতে পারব না—তিনি কি আসবেন? কী হবে বাবা, তাঁকে আনবার?'

'মহা বদ মাগী, খিঁচিয়ে ছাড়া কথা বলত না—এখন নিজের স্বার্থে হা-বাবা যো-বাবা। ...যাক গে মরুক গে, "দেখি" এই বলে বেরিয়ে ঘুরে ফিরে এসে—মাগীর কাছ থেকে টাঙ্গাভাড়া বলে দুটো টাকা আদায় ক'রে তিনটের সময় তো আমার সন্ন্যিসী ঠাকুরকে নিয়ে এলুম।... এই জটা, ছাইমাখা। আবার এধারে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা, ছেন্দা না হয়ে যায় কোথা?...ভাল বাঘছাল ছিল বাড়িতে, রামরতিয়া পায়ের ধূলো নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে ভাল ক'রে বসতে দিল, সামনে কোশাকুশি, জল, ফুল সব গুছিয়ে দিল।

'কিন্তু সন্ন্যিসী ঠাকুর দু'মিনিট চোখ বুজে বসে থেকেই তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠল যেন।...আমিই শিখিয়েছি, কিন্তু সত্যি কথা বলছি নাতি, সে য়্যাক্‌টো দেখে আমিই চমকে গেছি একেবারে! গুরুমারা বিদ্যে যাকে বলে। চোখে কি আগুন, ধ্বক্-ধ্বক্ ক'রে জ্বলছে যেন—বলে, "পাপ, পাপ! এই বেটা, আমাকে কোথায় এনেছিস? ভরষ্ট্ হ্যায় ইয়ে আওরৎ, বহুৎ পাপ!...আমার দেহ জ্বলছে এর গায়ের হাওয়া লেগে। আমি এর কিচ্ছু করতে পারব না, যমদূত এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছে—দেখতে পাচ্ছিস না? একটু একটু ক'রে হাসছে।...না, না, আমি আর এ বাড়িতে থাকব না, এক মিনিট নয়—"

'বলতে বলতেই তরতর ক'রে নিচে নেমে এসেছে সন্ন্যিসী, তার তখনকার মুখ-চোখের চেহারা দেখে কে বলবে যে আমার শিখ্‌নেতেই এত কথা বলছে! রোখ্ কি! বুড়ি টাকাপয়সার কথা বলতে এসেছিল, রামরতিয়াকে পাঠিয়েছিল পিছু পিছু—তাকে তেড়ে মারতে উঠল একেবারে, "তোদের বাড়ির পয়সা নোব আমি? কি পেয়েছিস আমাকে?—এর সবেতে পাপ—ঐ মেয়েছেলেটো সাক্‌সাৎ পাপ—এ বাড়ির প্রতি ইঁটে পাপ, আমার শরীর জ্বলে গেল"!

'হবি তো হ—ঠিক সেই সময়ই দুপুরের 'কল' সেরে ফিরছে ডাক্তার, অমনি দেরিই হ'ত, তিনটে-চারটে, সেই আন্দাজেই ঐ সময়টা ঠিক করেছিলুম। ডাক্তার তো বাড়ির মধ্যে সন্ন্যিসী দেখে অবাক। একটু বিরক্তও হ'ল। এসব তখনকার দিনের 'সায়েব'রা পছন্দ করত না।

'তবে যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুলেরও ব্যবস্থা ছিল বৈকি!...একবার ওর দিকে তাকিয়েই সন্ন্যিসী ঠাকুর যেন আবার তিড়িং বিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠল। বলে, "পাপ! পাপ! পাপে জ্বলে গেল আমার শরীর। .....তোর সর্বনাশ হবে, ঐ সাক্‌সাৎ পাপের সঙ্গে আছিস। সতী-লক্ষ্মীর চোখের জল পড়ছে—এক এক ফোঁটা চোখের জলের আগুন নেভাতে এক এক বালতি দেহের লোহু ঢালতে হবে"।

'বলতে বলতেই ছুটে বেরিয়ে গেল সে। ডাক্তারের মুখের যা অবস্থা তখন—কী বলব তোকে, অত বুদ্ধিমান লোক তো—লেখা-পড়া জানা—কিন্তু দৈবকে এমনই ভয় আমাদের—মুখ শুকিয়ে এতটুকুন্ হয়ে গেল। লোকটা ভণ্ড কি খাঁটি সাধু—তা একবার

ভাববার চেষ্টাই করল না। যাকে বলে বসে পড়ল একেবারে।

'তাই কি ছাই—ব্যাপারটা তারিয়ে তারিয়ে দেখব সে জো আছে, রামরতিয়া সাধুকে না পেয়ে আমায়ই পায়ে পড়ে—"যাও মহারাজজী, মহাৎমাকে শুধিয়ে এস কি করলে এ বিমারীর আসান হবে মাজী'র। পাপ কি ক'রে কাটবে"।

'অগত্যা আমাকে ছুটে বেরোতে হ'ল। সাধু তো গ্যাঁট হয়ে মোড়ের বড় বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বকশিশের লোভে। তা দিলুম, আমি খুশী হয়েই দিলুম ব্যাটাকে—বুড়ি যে গাড়ি ভাড়া বলে দু'টাকা দিয়েছিল সে দু'টাকা, আমার নিজের তবিল থেকে যে টাকাটা দেবার কথা ছিল সেটাও—মোট তিনটে টাকাই দিয়ে দিলুম। সাধু তো মহা খুশী, আমার মতো পুণ্যাৎমা সত্যবাদী লোক সে আর নাকি দেখে নি—খুব আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেল।

'আমি ফিরে এসে রামরতিয়াকে বেশ চিন্তিত মুখেই বল্লুম, "যা বলেছে মহাৎমাজী তা কি তোমার মাজী পারবে? বলেছে যদি বাঁচতে চাও কোন তীর্থে গিয়ে বাস করতে—আর হাজার বার রামনাম জপ করতে, তীর্থে গেলে যমদূতরা ছেড়ে দেবে, রামনামে পাতক কাটবে"।

'আমি ফিরেছি শুনে ডাক্তারবাবুও ডেকে পাঠালেন—"কী ব্যাপার এসব রমেশ?" খুব ভারী আওয়াজ, কিন্তু মুখ দেখলুম তখনও সাদা, কপালে ঘাম। বললুম, নির্ভয়েই বল্লুম—আমি তো জানি আজই চাকরি ছেড়ে দেব, আমার আর ভয়টা কী?—"মায়ের অসুখ, উনি বলেছিলেন—তাই ঐ সাধুকে ধরে এনেছিলুম, খুব ভারী সাধু—যাকে যা বলেন তাই হয়, বহুলোকের রোগ সারিয়ে দিয়েছেন—তাই মা গাড়ি-ভাড়া দিলেন—আসতে কি চায়—অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে ধরে এনেছিলুম। তা—ঐ তো শুনলেন, উনি তো রেগে আগুন হয়ে চলে গেলেন, গাড়ি-ভাড়া অব্দি নিতে চান না"...

'এই বলে—সাধু যা বলে গেছে সব খুলে বল্লুম। মার শেষ প্রেসক্রিপশ্যানটা সুদ্ধ। সাহেবের তখন ঘাড় গলা দিয়ে সেই ঠাণ্ডার দিনেও দর দর ক'রে ঘাম গড়াচ্ছে। বেচারীর অবস্থা দেখে মায়া হ'ল। বল্লুম, "একটা কথা বলব ডাক্তার সাহেব? যদি অপরাধ না নেন তো বলি—যা হয়ে গেছে তা হয়েছে—আজই দিদির কাছে চলে যান, সেখানে গিয়ে ক'দিন থাকুন"।

'ভেবেছিলুম—এই রকম আস্পদ্দার জন্যে কড়া ধমক খাব একটা, কিন্তু তখন অতবড় ডাক্তারটা ছেলেমানুষ হয়ে গেছে একেবারে, সে দিক দিয়েই গেল না, শুধু বল্লে, "তুমি কি বলছ রমেশ, তুমি জান না সে কি ক'রে গেছে। এরপর তাকে ঘরে আনলে, কি সেখানে গিয়ে থাকলে লোকে কি বলবে"?

"আমি আর থাকতে পারলুম না—বুঝলি, বলে ফেললুম, "বাবু, আমি সব জানি, চাকরবাকরদের কি আর কোন কথা জানতে বাকী থাকে? না কি এই শহরেরই কোন বাঙালীর জানতে বাকী আছে মনে করেন। এখন যা বলে তখন তার চেয়ে আর বেশী কি বলবে?......আপনি বড় ডাক্তার—মুখ বুজে সব সহ্য ক'রে বাড়িতে ডাকবে। বরং ভুলটা শুধ্রে নিলে—দিনকতক পরে ভুলেই যাবে ব্যাপারটা।...তখন বরং বুক ফুলিয়ে চলতে পারবেন এই শহরে"।

'ভেবেছিলুম নিদেন এবার একটা ধমক খাব—কিন্তু দেখলুম—যে ধমক দিতে পারত সে আর নেই। এতটুকু হয়ে গেছে মানুষটা—। চুপ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে বসে রইল

চেয়ারের ওপর কাঠ হয়ে। মনে হ'ল যেন কেমন চুপ্‌সে গেছে ফুটো বেলুনের মতো।

'আমি সেইদিনই ডাঁট দেখিয়ে কাজ ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সবাই খুব ধর-পাকড় করলে—বুড়ি, রামরতিয়া, বলিরাম, মায় খোদ ডাক্তার সায়েব পজ্জন্ত।...আমি বল্লুম, "না, এত অনাচারের বাড়িতে আমি আর থাকব না, বামুনের ছেলে না জেনে যা করেছি, করেছি—আর নয়।" বলিরামকে বল্লুম, "ভাই, তুমি বলেছিলে—কিন্তু আমি অতটা বিশ্বাস করি নি—এখন মহাৎমার কাছে শুনে বিশ্বাস হ'ল। মাপ করো—আমি মছলীখোর বাহ্‌মন ঠিকই—তবু এ পাপের ভাত আর না"।

'তারপরও ক'দিন লক্ষ্ণৌ ছিলুম, চার-পাঁচদিন, শুনেছি, সাহেব সেই দিনই সুন্দরবাগে বৌয়ের বাড়ি গিয়ে উঠেছিলেন—আর এ বাড়ি আসেন নি। তারপরও খবর পেয়েছি—মাগী অনেক কান্নাকাটি ক'রেও জামাইয়ের মন গলাতে পারে নি আর। তখন রামরতিয়াকে নিয়ে পৈরাগে চলে এসেছে। কাশীতে আসতে সাহস করে নি, বেস্তর চেনা লোক, আপ্ত-কুটুম।......ওর হাতেও ঢের টাকা ছিল, জামাইও শুনেছি মাসোহারা দিত। তবে বেশীদিন নাকি বাঁচেও নি—ওদের অব্যাহতি দিয়ে গেছে তাড়াতাড়ি।'

এই বলে দীর্ঘ কাহিনী শেষ ক'রে নিঃশব্দে খুব খানিকটা হেসে নিয়েছিলেন ঠাকুর্দা। কৃতিত্ব ও কৌতুকের হাসি।

॥ ৯ ॥

উনিশশো বাইশ সালে আমরা কাশী থেকে কলকাতায় চলে এলুম—বলতে গেলে চাটিবাটি তুলে। রমেশ ঠাকুর্দার সঙ্গেও সেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। প্রথম প্রথম দু-একখানা চিঠি আসা-যাওয়া করেছে—তার পর উভয়পক্ষেই উৎসাহ গেছে কমে। রমেশ ঠাকুর্দার যা অবস্থা, এক পয়সার পোস্টকার্ড দেওয়াও তাঁর পক্ষে কষ্টকর। চিঠি লেখার তেমন অভ্যাসও ছিল না তাঁর—তাই আমরা চিঠি দিলেও তার জবাব যেতে তিনমাস লাগত। ফলে আমাদের চিঠি দেওয়াও কমে গেল। অন্য দু-চারজন পরিচিত লোকদের চিঠিতে যা জানা যেত ওঁদের খবর। কিন্তু সে চিঠিও কমে এল ক্রমে। প্রথম প্রথম যে বিচ্ছেদ অসহ বলে মনে হয়—কিছুদিন পরে আর তার কথা মনেও থাকে না।

ঠাকুর্দার সঙ্গে আবার দেখা হ'ল একেবারে উনিশশো বত্রিশ সালে। তখন আমি অকালে কলেজ ছেড়ে কিছু কিছু রোজগারের চেষ্টায় জীবনের ঘাটে ঘাটে ঘুড়ে বেড়াচ্ছি। চেষ্টা করছি তার কোন একটা নিরাপদ কূলে চিরদিনের মতো ভাগ্যের নৌকোটা ভেড়ানো যায় কিনা।

সত্যিই অনেক ঘাটের জল খেয়েছি সেই বয়সেই। অর্থাৎ অনেক কিছুই করেছি—সামান্য দুটো চারটে টাকার জন্যে। সেই রকমই একটা ঠিকে কাজে কাশী গিছলুম সেবার। শুধু কাশী কেন—সারা উত্তর প্রদেশেই ঘোরার কাজ—তখন অবশ্য সংযুক্ত প্রদেশ বলত, ইংরেজীতে ইউ.পি. (এখনও তাই বলে)। এক প্রকাশকের পাঠ্য বই নিয়ে স্কুলে ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ঘুরতে হবে—পাঠ্য করার চেষ্টায়। একমাসের মতো কাজ।

সেটা বৈশাখ মাস তখন। ওদেশে গরমের মুখেই সেসন শেষ হয়। গরমের ছুটির পর নতুন ক্লাসের শুরু। ঐ কাজ নেওয়ার মূলে আসল টানটা ছিল বাল্যের বহু স্মৃতি-জড়িত

কাশীর এবং সে কাশীর মধ্যে আবার ঠাকুর্দার টানটাই বেশী। কৌতূহলই, টান বলা হয়ত ভুল হবে—কেমন আছেন তিনি, ঠিক সেই রকমই কি? আদৌ আছেন কিনা তাই বা কে জানে!

গিয়ে দেখলাম—আছেন, তবে সে মানুষ আর নেই। ভেঙে পড়েছেন একেবারে। আর একদমই খাটতে পারেন না। সারা জীবন দেহটাকে অবহেলা ক'রে এসেছেন, দেহ তার শোধ তুলছে এবার। বয়সও অবশ্য ঢের—ঠাকুর্দা নিজেই বলেন পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর। সেই সঙ্গে এও বলেন যে আরও বেশী হতে পারে। বয়সের নির্ভুল হিসেব তাঁর নেই। বাবা জানতেন, তা বাবার সঙ্গে তো দীর্ঘকাল—পঞ্চাশ বছরেরও বেশী ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে—জন্মদিন বা মাস বছর কিছুই জানার উপায় নেই।

সেই বাড়িতেই আছেন, লক্ষ্মীবাবুর সেই ঘরে। কোথায়ই বা যাবেন। চাকরিবাকরি আর করতে পারেন না, সে কয়লার দোকানও উঠে গেছে। উনি ছেড়ে দিতে ভবানীদাও দোকান তুলে দিয়ে উত্তর কাশীতে চলে গেছেন, সন্ন্যাস নেবার মতলবে।

এবার দেখলাম সতীদিই সোজাসুজি সংসারের ভার নিয়েছেন। কোথায় একটা ঠিকে রান্নার কাজ করেন, সকাল ছটায় চলে যান, নটা সাড়ে নটায় ফেরেন। আবার বিকেলে পাঁচটায় যেতে হয়—ফিরতে রাত আটটা সাড়ে আটটা। শুকো দশ টাকা মাইনে। এতে ক'রে ওঁর অন্য বাড়তি কাজ অনেক কমিয়ে দিতে হয়েছে—যজ্ঞিবাড়ির বা পুজোআর্চার কাজ। কিন্তু উপায়ও নেই। অনিশ্চিতের ওপর ভরসা ক'রে বসে থাকা যায় না—একটা বাঁধা আয় দরকার। আগে তবু—যত কম মাইনেই হোক—ঠাকুর্দার চাকরি একটা ঠেকো ছিল—একটা ভরসা। এখন আর এ ধরনের কাজ নেওয়া ছাড়া উপায় কি? তবু তো এটা পেয়েছেন। বেশির ভাগই দিনরাতের লোক চায়। যেখানে কাজ করছেন তাদের লোক কম, স্বামী আর স্ত্রী, খাওয়ারও তেমন কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

ঝঞ্ঝাট দেখলুম সতীদির বাড়িতেই বেশী। কাজ আগের থেকে অনেক বেড়েছে। ওখান থেকে ফিরে রান্না করতে হয়, বাসনমাজা থেকে শুরু ক'রে ঘরের যাবতীয় কাজ তো আছেই—তার ওপর চেপেছে স্বামীর পরিচর্যা। ঠাকুর্দা ইদানীং একটু যেন অথর্বই হয়ে পড়েছেন। ভোরে উঠে কোমরে তেল মালিশ ক'রে দিলে তবে বিছানা ছাড়তে পারেন। সতীদি শীতের দিনে সকাল বেলাই বাগানে গামছা চাপা দিয়ে এক বালতি জল রেখে যান। সেটা রোদে গরম হয়ে থাকে। কে বলেছে রোদ্রপক্ক জলে স্নান করলে শরীরে বল হয়- -তাই এ ব্যবস্থা। বাইরে থেকে এসে উনুনে আঁচ দিয়েই বুড়োকে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিয়ে নিজে কাপড় কেচে বা স্নান ক'রে নেন—যেদিন যেমন।

এই স্নানটার পর বৃদ্ধ অনেকটা চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। খুটখাট একটু ঘুরেও আসেন কোন কোন দিন, এর কাছে ওর কাছে। বাজার যেতে হয় না—চাকরি সেরে আসার পথেই যা হোক একটু আনাজ কিনে আনেন সতীদি দু'এক পয়সার। দৈবাৎ কোনদিন সিধে পেলে তো কথাই নেই, তাতেই দু'তিনদিন চলে, তবে সেটা আজকাল দৈবাৎই হয়ে উঠেছে। উনি বাঁধা পড়েছেন, যুগের হাওয়াও পালটেছে।...

কাশীর টানটা বেশী ছিল বলেই ওটা শেষের জন্যে রেখে দিয়েছিলুম। ধরে ছিলুম আগ্রা থেকে, ওদিকের শহরগুলো সারতে সারতে কাশী পৌছলুম। এখানে চার-পাঁচদিন বিশ্রাম নিলে ক্ষতি নেই। কাজের কথা যা, কোম্পানীকে লিখে দিয়েছি—আমার কর্তব্য শেষ।

এঁদের বর্তমান অবস্থার কথা কাশীতে পৌছে অনেকের মুখেই শুনেছিলুম। তাই

দুদিনই দেখা করতে গেছি একটু বেলা ক'রে—নটা নাগাদ। বসে গল্প ক'রে এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ হোটেলে ফিরেছি। দ্বিতীয় দিন সতীদি জোর ক'রেই একগাল ভাত খাইয়ে দিলেন। ওঁর হাতের অমৃততুল্য রান্না—না-ও বলতে পারলুম না। মাসখানেক ধরে হোটেলে খাচ্ছি, ওঁর টক দেওয়া মটর ডাল, বেগুন ভাজা আর পোস্তচচ্চড়ি খেয়ে মুখটা ছাড়ল।

সেদিন আসবার সময় সতীদি চুপি চুপি একটা অনুরোধ করেছিলেন, 'যদি এর মধ্যে সময় পাস ভাই—বিকেলে এক-আধদিন আসিস্ একটু। আমি পাঁচটায় বেরিয়ে যাই—সারা সন্ধ্যেটা বুড়ো একা বসে হাপু গেলে। এত পড়ার শখ—তা চোখে তো ভাল দেখতে পায় না আজকাল, দুপুর ছাড়া ছাপার হরফ পড়তে পারে না। আমি বেরোতেও দিই না—চোখে কম দেখে, তাছাড়া বিকেলের দিকটায় কেমন যেন জবুথবু হয়ে পড়ে—একা বেরিয়ে কোথায় এক্কা চাপা পড়বে কি টাঙ্গায় ফেলে দেবে, আজকাল আবার রিক্সা হচ্ছে—বড় ভয় করে।....শরীরটা ওর একেবারে ভেঙেছে। তাও এই গরমের দিনে দেখছিস, তবু একটু মানুষের মতো—শীতে যেন জন্তু হয়ে যায় একেবারে। এ ঘরটাও হয়েছে তেমনি তিনদিক বন্ধ, এক এই পুবদিক খোলা, সকালে যা একটু রোদ আসে—কিন্তু সে তো এই দালানটুকু। ঘরে তো যায় না একফোঁটাও। দুপুর-বেলা ঐ বাগানে গিয়ে বসে থাকে—আমি আবার ঘরে তুলে দিয়ে কাজে যাই—।'

বলতে বলতেই গলার আওয়াজ ভারী হয়ে এল সতীদির।

'তাই তো নিত্যি মা অন্নপূর্ণাকে জানাই, বুড়ো যেন আমার কোলে যায়। নিজের বৈধব্য কামনা কেউ করে না, কোন হিন্দুর মেয়ে করে না অন্তত—কিন্তু আমি করি। আমি জানি আমার দিন একরকম ক'রে কেটেই যাবে—আমি গেলে বুড়োর হাড়ির হাল। ঐ অথব্ব মানুষ, পয়সার জোর নেই, মেজাজও ভালো নয়, খারাপ রান্না একটু মুখে রোচে না—কে দেখবে ওকে?...তোরা বল একটু, বাবা বিশ্বনাথকে জানা—আমার এই প্রার্থনাটুকু যেন শোনেন।'

তাঁর কথামতোই একদিন সন্ধ্যের একটু আগে গিয়ে পড়লুম। ছটা বেজে গেছে তখন, সতীদি কাজে চলে গেছেন অনেকক্ষণ। বৃদ্ধ বাইরের বারান্দায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সেই জলচৌকিটার ওপর বসে, পাশে লম্প হুঁকো আর সাজানো চার-পাঁচটা কল্‌কে। বুঝলুম সতীদিই সব গুছিয়ে রেখে গেছেন—না উঠে খুঁজতে হয়। বোধহয় এই চৌকিটাও পেতে নিজে সযত্নে বসিয়ে দিয়ে গেছেন।

ঠাকুর্দা আমাকে দেখে মহাখুশী। বললেন, 'হ্যা— । বললে বিশ্বাস করবি নি, বসে বসে তোর কথাই ভাবছিলুম। ভাবছিলুম যদি এসে পড়তিস তো ভাল হ'ত। বোস্ ভাই বোস্—কোথায়ই বা বস্‌বি—দ্যাখ ঐ ওদিকে একটা টুল আছে বোধহয়, খুঁজে পাস কিনা—'

'থাক থাক, আপনি ব্যস্ত হবেন না। টুল তো এই সামনেই রয়েছে। বসছি আমি।'

ব্যস্ত হয়ে বৃদ্ধ নিজেই উঠতে যাচ্ছিলেন, আমি জোর ক'রে আবার বসিয়ে দিলুম। তারপর একথা সেকথা—খুচরো আলাপ হ'ল কিছু। আমি কতদিন আর থাকব কাশীতে, ভালরকম একটা চাকরি-বাকরির কতদূর, দাদাদের বিয়ের কোন কথা হচ্ছে কিনা—এই সব।

সাধ্যমতো সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে আমি আমার কথাটা তুললুম, ক'দিন ধরেই মনের :ধ্য যে প্রশ্নটা প্রবল হয়ে আছে। আগেও দেখে গেছি—তবু সার্থকনামা সতীদির খনকার স্বামী-সেবার বোধ করি কোন তুলনা নেই কোথাও। পুরাণের সতীও এই স্বামীর মন সেবা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। শিবের মতো স্বামীর জন্যে দেহত্যাগ করা কি পর্ণা হয়ে তপস্যা করার অর্থ বোঝা যায়—রমেশ ঠাকুর্দার কি আছে? না রূপ, না গুণ, । বিদ্যা—না আর্থিক সঙ্গতি।

সেই কথাটাই তুললুম সরাসরি। বললুম, 'আচ্ছা ঠাকুর্দা, সতীদির এত প্রেম কিসের? ী দেখে এত মজে ছিলেন যে, এখনও সেই প্রথম প্রেমের নেশা কাটে নি—এখনও াতেই মশগুল হয়ে আছেন!'

প্রশ্নটা ভারি ভাল লাগল ঠাকুর্দার। ঐ মুখচোখও আনন্দে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ব খানিকটা হাসলেন দন্তহীন মুখে হ্যা—হ্যা—হ্যা ক'রে। তারপর মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে লেন, 'হুঁ—হুঁ বাবা, এর অত্থ আছে। অমনি কি হয়। অত্থ আছে!'

'সেই অর্থটা কি তাই তো জানতে চাইছি।'

'প্রেম কি এমনি হয় রে। মেয়েরা পীরিতে পড়ে পুরুষ দেখে। অর্জুনের পেছনে অতগুলো ময়ে ঘুরেছিল কেন? দেখতে তো কালো ভূত ছিল। অবিশ্যি হ্যাঁ, মন্দাটে মেয়েছেলে ারা—তারা একটু মেয়েলি ধরনের বেটাছেলে পছন্দ করে। তবে সে আর ক'টা?'

'তা আপনার ঠাকুর্দা খুব পৌরুষ ছিল বলে তো মনে হয় না। আপনিই তো বলেন রীর আপনার কখনও তেমন ভাল ছিল না—কতকটা চিররুগ্ন। আর চেহারা তো ই—তালপাতার সেপাই!'

'হুঁ—হুঁ—তবু ও বৌ আমার বীর্যশুল্কেই জিতে নেওয়া। হয় না হয় তোর ঠানদিকেই জ্ঞেস ক'রে দেখিস!'

'বীর্যশুল্কে জেতা? আপনার? সে আবার কি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

'হুঁ-হুঁ''হুঁ-হুঁ' ক'রে কৌতুকের হাসি হাসেন ঠাকুর্দা। মনে হয় অনেক দিন পরে ভারি স পেয়েছেন মনে মনে। কোন দূর মধুর স্মৃতি সেই অতীতের বর্ণময় ইতিহাস বয়ে নেছে আমার প্রশ্নে। আনন্দের দখিণা বাতাস বইয়েছে।

'ঐ তো বাবা, ভাবছ বুড়োটা চিরকালই এমনি ছিল। হুঁ-হুঁ! হুঁ-হুঁ!'

দুলে দুলে ঘাড় নেড়ে নেড়ে হাসেন রমেশ ঠাকুর্দা।

আমি টুলটা কাছে টেনে এনে—যাকে বলে দৈহিক অর্থেই—চেপে ধরি ওঁকে। দুই াত ধরে বলি, 'ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলুন ঠাকুর্দা, দোহাই আপনার—দুটি পায়ে পড়ি!'

'এই দ্যাখো, পাগল কোথাকার। এর জন্য আবার এত ব্যগত্তা করারই বা কি আছে। বলব না কেন—বলতে কোন বাধা তো নেই, কোন অসৎ কাজ তো করি নি। আর কেই বা জানতে চাইছে এ কথা, এর দামই বা কি। এই পথের ভিখিরী বুড়ো মুখ্যু বামুন আর তার এক পাগল বামনীর গল্প—এই তো!'

তারপর ওরই মধ্যে একটু সোজা হয়ে বসে একবার গলা-খ্যাঁকারি দিয়ে নিয়ে আরম্ভ করলেন ঠাকুর্দা তাঁর কাহিনী।

'মটরাকে তো জানিস। পাঁড়ে-হাউলীর মটরা?...তুইই তো বলছিলি না সেদিন তার কথা? বিয়োলো বোনটাকে ক'টা টাকার জন্যে সাধুর কাছে বেচে দিয়েছিল—সাধুটা ভাল তাই মেয়েটা বেঁচে গেল, খান্‌কী খাতায় নাম লেখাতে হ'ল না।....মটরাটা ছিল পুরুষ বেশ্যা, আগে মদনপুরার এক অল্পবয়িসী মহাজনের কাছে যাতায়াত করত—সে ছোকরার দেদার পয়সা, বাপের মস্ত কারবার বেনারসী শাড়ির, খুব পয়সা যোগাত। তারপর সে অন্য ছেলে একটাকে ধরলে, তাতেই মটরার অত হাত-খাঁকতি, পয়সার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াত, নেশার পয়সায় টান পড়লে আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না।

'যাক গে, যা বলছিলুম, মটরাকে কে প্রেথম বকায় জানিস? তুলসে গুণ্ডা। যখন খুব ছোট, একরত্তি ছেলে—তখনই ওর বারোটা বাজিয়ে দেয় একেবারে। পঞ্চরঙের নেশায় পাকা ক'রে ছেড়ে দেয়। তুলসেও বামুনের ঘরের ছেলে, কিন্তু সে বেটা ছিল মহা বদ। অমন সাংঘাতিক লোক, অত অল্প বয়সে অত বদ আমি আর দুটি দেখি নি। মেয়েছেলের কারবারই ছিল ওর প্রেধান আয়ের রাস্তা। বিশ্বনাথের শিঙ্গারের দিন কি শিবরাত্রির দিন, মানে রাত্তিরে যেদিন ভিড় হবে—সেই সব দিনে দেদার মেয়ে চুরি করত ও, ঐটেই ছিল যাকে তোরা বলিস এস্‌পেসালিটি।

'অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বেটার, তা মানতেই হবে। ঐ তো দেখেছিস বিশ্বনাথের গলি—সরু গলিতে অমন হাজারো লোক—তারই মধ্যে, অতগুলো লোকের চোখের সামনে দিয়ে, চোখের নিমেষে উধাও ক'রে নিত। দ্যাখ দ্যাখ—আর দ্যাখ! আশপাশে যেসব বাড়ি আছে, মন্দিরের দরজা—পিছু নিয়ে এসে ঠিক মওকা পেলেই ঢুকিয়ে দিত। দলের লোকরা ঠিক মোক্ষম জায়গাটিতে খাড়া থাকত, প্রত্যেককে মোটা মোটা টাকা দিয়ে হাত ক'রে রাখত—পুজুরী পাণ্ডা থেকে শুরু ক'রে চাকর দারোয়ান, যেখানে যেমন।

'এই সব মেয়েছেলে নিয়ে বেশির ভাগ সাধু-মোহান্তদের সাপ্লাই করত তুলসে। নতুন ঘোড়াকে ব্রেক করায় জানিস? মানে প্রেথমটা তো বুনো থাকে—বাগ মানতে চায় না, লাগামের ইশারা বোঝে না। সেই সব শিখিয়ে পড়িয়ে বাগ মানিয়ে নেওয়াকে বলে ব্রেক করা। তুলসেও অমনি দিনকতক কাছে রেখে ব্রেক ক'রে বাইরে বেচত। বড় বড় মোহন্তরা সব, গেরুয়া পরে থাকেন, বিয়ে করতে নেই, মেয়েমানুষের বাড়ি যাবেন সে উপায়ও নেই—জানাজানি হয়ে যাবে; ধর, কেউ গেরুয়া পরে ডাল্‌কামণ্ডীতে যাচ্ছে—চারিদিকে তো হৈ হৈ পড়ে যাবে! অথচ ওদের এত পয়সা—এত সুখে ভোগে থাকে—প্রিবৃত্তি খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। সবই ভোগ হচ্ছে যেকালে—মানুষের যেটা সবচেয়ে বড় ভোগ সেটাই বা বাদ থাকে কেন? ওদেরই ঝোপ বুঝে কোপ মারত তুলসে। টাকার অভাব নেই তো। মোটা টাকাই দিত। গোপনে, কেউ জানতে পারবে না, কেচ্ছা কেলেঙ্কার হবে না—এমন ভাবে সবাই দিতে পারে না, তুলসে পারত।'

একটু থেমে—আমার তাড়নায় খেই-হারিয়ে-যাওয়া সূত্র আবার খুঁজে নিয়ে—কাহিনীটা পুরোপুরিই বললেন ঠাকুর্দা।

তুলসে নাকি এ লাইনে একেবারে চোস্ত ছিল। পুলিসের বড় সাহেব থেকে শুরু করে—যাকে যাকে পুজো দেওয়া দরকার সবাইকে টাকা দিয়ে জমিয়ে রাখত। কেউ কিছু দেখেও দেখত না তাই। নইলে চারদিকে পুলিস পাহারা—শিঙ্গারের দিন বিশেষ

ক'রে—তার মধ্যে থেকে দুটো তিনটে মেয়ে পাচার করত তুলসে ফি বছর। এর মধ্যে কিছু কিছু বাইরেও চালান দিত। এ কারবার অনেকেই করে—বিহারে, পাঞ্জাবে, ভূপালে বহু এমন কারবারী আছে—তাদের অনেকের সঙ্গেই নাকি ওর যোগাযোগ ছিল।

রীতিমতো কারবার যাকে বলে। দেখতে দেখতে ডাক-বদলের মতো হাত-বদল হয়ে বহু দূরে চলে যেত। বাঙালীর মেয়ে কাবুল বাসরা আফ্রিকা আরব থেকে শুরু করে ওদিকে আরাকান বর্মা পর্যন্ত চলে যেত—কোথায় কোথায় না ছিল ওর লোক—মেয়েগুলো ইহজীবনে আর দেশভুঁই আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখতে পেত না।...

হাজার হাজার টাকা নাকি রোজগার করত তুলসে ওই কাজ ক'রে। এমন ব্যাপার—অনেক ভালোমানুষ ভদ্রলোকও ওকে প্রশ্রয় দিত, বিপদ আপদ সামলাত। হীরু কাঁসারীও তার ভেতর একজন।

হীরু কাঁসারী! নামটা শুনে আমিও চমকে উঠেছিলুম। সে এর মধ্যে? তাকে তো ভাল লোক বলেই জানতুম। দান-ধ্যান ঢের, যথার্থ পরোপকারী—প্রতাপও খুব, কাশীর তাবড় তাবড় লোক হীরুর কথায় ওঠে-বসে, খোদ অন্নপূর্ণার মোহান্ত ওর বন্ধুর মতো—অথচ সে-ই নাকি চিরকাল তুলসেকে মদৎ দিয়ে এসেছে। সময়ে অসময়ে টাকা দিয়ে, বিপদে আপদে ওপরওলাদের ধরে তাল সামলেছে।

'আসলে টাকা'—ঠাকুর্দা বল্লেন, 'আমার যা মনে হয় তুলসের কারবারে ওর ভাগ ছিল নিশ্চয়, এই দিকটা দেখত কারবারের—কিছু কিছু ভাগও পেত। টাকার জন্যে মানুষ কী না পারে!

'যাকগে মরুকগে—কার ভেতর কি আছে কেউ বলতে পারে না। ঠিক না জেনে কাউকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। যা বলছিলুম, তুলসের কথা। রোজগার করত ঢের, তেমন তেমন মাল পেলে এক চালানেই পাঁচ-সাত-দশ হাজার পর্যন্ত লুটে নিত—কিন্তু এসব রোজগারের টাকা তো থাকে না। ঐ যে বলে না—চিৎপাতের ধন উৎপাতে যায়—কথাটা খাঁটি সত্যি। তাছাড়া ওর খরচও ছিল ঢের, নিজের নেশাভাঙ তো ছেড়েই দাও; বাঁধা মেয়েই ছিল দুটো,—এমনি মাইনে করা লোকও পুষতে হ'ত একগাদা। ঐ দেঁড়শিকে পুল—ওর কাছেই—একটা গোটা বাড়িই ভাড়া করা ছিল তুলসের, বাইরে থেকে তালা-চাবি দেওয়া, জানলা বন্ধ—যাতে দেখলে মনে হয় পোড়ো বাড়ি—তার ভেতর চাকর ঝি বাঁধা গুণ্ডা, এক গাদা লোক থাকত। রীতিমতো একটা—ঐ যে কী বলিস তোরা—এস্টাবিলিশমেন্ট।'

আমি চুপ ক'রেই শুনছিলুম—একটু বাধা দিতে হ'ল এবার। জিজ্ঞেস করলুম, 'দেঁড়শিকে পুল—মানে বিশ্বনাথের গলি? এক্কাওলারা তো ঐ অব্দি যায়। আজকাল রিক্সা হয়েছে তারাও বলে দেঁড়শিকে পুল, কিন্তু যায় তো দেখি ঐ বিশ্বনাথের গলির মোড় পর্যন্ত।'

'হ্যাঁ রে—ঐখানে যে সত্যিই পুল ছিল একটা। আসলে এখন যেটাকে তোর দশাশ্বমেধ রোড বলিস, ওখানে একটা নদী ছিল। কাশীধামে যেমন তেত্রিশকোটি দেবতা আছেন, তেমনি সমস্ত তীর্থও। সর্বতীর্থময়ো কাশীঃ। ঐখানে যে নদী ছিল তাকে বলত গোদাবরী, মাডুয়াডী—ঐ যে এক্কাওলাগুলো চেঁচায় "মাডুয়াডি মাডুয়াডি" বলে—সেইখান থেকে সোজা এসে দশাশ্বমেধে পড়ত নদীটা। তখন ঐখানে মন্দিরে যাবার পথে একটা পুল ছিল, তাকেই বলত দেঁড়শিকে পুল। সে বহুকালের কথা অবিশ্যি—আমিও সে নদী দেখি

নি—শুনেছি। সে নদীও নেই, পুলও নেই, কিন্তু নামটা থেকেই গেছে—দেঁড়শিকে পুল।

'এমন বহু জায়গা আছে। মণিকর্ণিকা যেতে যে বরমনালা পড়ে—এখনকার যেটা চকথানা—তার সামনে দিয়ে সোজা যে গলিটা মণিকর্ণিকা পর্যন্ত চলে গেছে—ওখানেও একটা নদী ছিল, ব্রহ্মনালা বলে, কাশীখণ্ডে তার উল্লেখ আছে। এখন আর সে নদী নেই, নামটা আছে। মণিকর্ণিকা শ্মশানের ওপরদিকে যে জায়গাটা, তাকেই এখন ব্রহ্মনালা ব। বরমনালা বলে। ওখানে পোড়ানোর ভারী কদর, তবে যাকে-তাকে পোড়াতে দেয় না ওখানে পোড়াতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম লাগে।'...

বলতে বলতে যেন একটা ঘোর লাগে তাঁর চোখে, চুপ ক'রে যান একটু, তারপর নিজেই আবার একটু হেসে প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠেন, 'দ্যাখ্—কোথা থেকে কোথায় চলে এলুম। কী যেন বলছিলুম, তুলসের ঐ আপিস বাড়ির কথা! আপিস বাড়িই বলতে হয় আর কি বলব বল? বিশ্বনাথের গলির উল্টো দিকে যে ভূতেশ্বরের গলিটা—কামরূপ মঠের দিকে চলে গেছে, ওর যে দিকে লালগোলার বাড়ি, তার পেছনেই ছিল ঐ আড্ডা যা বলছিলুম, এই সব নানা ব্যাপারে তুলসের হাতে টাকা কখনই জমত না। যত্র আয় তত্র ব্যয় হয়ে যেত। কাজেই কারবার চালু রাখতেই হ'ত। একবার ঐ শিঙ্গারের রাত্তিরেই এক উকীলের বৌকে সাফ করতে গিয়ে প্যাঁচে পড়ল। উকীলের বৌ কি কার বৌ তা তো আর জানে না। সুন্দর মেয়ে দেখেছে এই পজ্জন্ত, ওর যা দরকার। সে উকীলটা খুব বুদ্ধিমান। সে প্রেথমটা একটু খোঁজাখুঁজি করার পর পাণ্ডাদের বাঁকা হাসি দেখেই ব্যাপারটা বুঝে নিল। আর একদম সোরগোল করে নি, ছুটোছুটি চেঁচামেচি পুলিসে খবর দেওয়া—কিচ্ছু না। সেও টাকা ছাড়তে লাগল। টাকায় কি না হয়। পাণ্ডাদের টাকা খাওয়াতেই খবর বেরোল। তার থেকে ওর চেলা-চামুণ্ডাদেরও হদিস পাওয়া গেল, তাদের কিছু খাওয়াতেই সব খোঁজ মিলল।'

তখন সে উকীলবাবু নাকি থানায় গেলেন। সেখানে গিয়ে পরিচয় দিলেন- এলাহাবাদের পুলিস সাহেবের ভাই, নিজেও বড় উকীল। পরিষ্কার বললেন, 'এ আমি সহজে ছাড়ব না, আপনারা যদি আমাকে সাহায্য না করেন—আপনারাই বিপন্ন হবেন।' অগত্যা তাদের দলবল নিয়ে বেরোতে হ'ল—আর চোখ বুজে বসে থাকতে পারল না উকীলবাবু পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ঐ বাড়িতে। ঠাকুর্দা বললেন, 'বাড়িটা থেকে বেরোবার পথ ছিল দুটো। ছাদের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে পাশের বাড়ি থেকেও নামা যেত। সে সব খবর নিয়ে উকীলবাবু আগেই সেখানে লোক মোতায়েন রেখেছিল। একেবারে যাকে বেড়াজাল বলে পুলিস নিয়ে দোর ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখল, চারতলার একটা ঘরে মেয়েটাকে মাজম খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে ফেলে রেখেছে। অত্যেচারের চিহ্ন স্পষ্ট।

'এমনই কপাল তুলসের, সেদিন সেও ওখানে ছিল। খাপসুরৎ মাল পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারে নি—নইলে তার তখন দু নম্বর মেয়ে-মানুষের বাড়ি লঙ্কায় থাকবার কথা। হাতে-নাতে ধরা পড়া যাকে বলে। সে বিরাট মকদ্দমা হয়েছিল। তুলসেকে বাঁচাবার জন্যে কম চেষ্টা করে নি ওর পেট্রনরা, হীরু কাঁসারী নাকি হাজার হাজার টাকা খরচ করেছিল। কিন্তু উকীলবাবুও জবরদস্ত লোক, সাক্ষী প্রমাণ এমনভাবে সাজিয়ে ছিলেন যে কোন হাকিমই তারপর খালাস দিতে পারে না। ঐ বাড়িতে যারা এতকাল তুলসের নিমক খেয়েছে—তাদের দিয়েই, কাউকে ঘুষ দিয়ে, কাউকে ভয় দেখিয়ে সাক্ষী দেওয়াল। সমস্ত কুকীর্তির কথা বেরিয়ে গেল তাদের মুখ থেকে—কাগজে কাগজে লেখালেখি। হয় একগু

তো লোকে বলে দশগুণ তা তো জানিসই। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। নিহাৎ এদের তরফ থেকেও খুব তদ্বির হয়েছিল বলে অল্পে অব্যাহতি পেলে—চার বছরের জেল হয়ে গেল তুলসের।'...

এই পর্যন্ত বলে ক্লান্ত হয়ে চুপ করলেন ঠাকুর্দা।

অনেকক্ষণ বসে রইলেন চোখ বুজে। তারপর কেমন যেন অসহায় ভাবে প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ, কী বলছিলুম যেন—?'

খেই ধরিয়ে দিতে আবার শুরু করলেন বলতে।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে আর এসব কাজে নামতে সাহস করে নি তুলসী। পুলিসের ভয় তো আছেই—তাছাড়া দলবল যারা ছিল, তারা এদিকে ওদিকে ছিটকে গেছে—নিজের নিজের মতো ক'রে খাচ্ছে। তাদের কেউ-ই আর ঘেঁষ দিল না তুলসেকে। যে সব পেট্রনরা টাকা যোগাত এক কাল—হীরু কাঁসারীর মতো লোক, তাদেরও শিক্ষা হয়ে গেছে। কাগজে ওদের নাম বেরিয়েছিল। যদিও ধরা-ছোঁয়ায় ফেলতে পারে নি বলে কোনমতে বেঁচে গিয়েছিল—'তবু ভাল ঘোড়ার এক চাবুক' ঠাকুর্দার ভাষায়, ওদের চৈতন্য হয়েছিল ঐ একবারেই। তারা আর কেউ ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে রাজী হ'ল না। হীরু কাঁসারীর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হ'লে নাকি চিনতে পারে নি, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেছে। এমন কি পুরনো মেয়েমানুষদের কাছে গিয়ে জানল—তারাও অন্য বাবু ধরেছে। কী করবে, তাদেরও তো চলা চাই।

তুলসেরও আর কোন পথ ছিল না রোজগারের—খারাপ পথ ছাড়া। লেখাপড়া শেখে নি যে চাকরি-বাকরি করবে, বামুনের ছেলে পুজোপাঠ ক'রে খাবে—কে দেবে ঐ নামজাদা খুনে গুণ্ডাকে ঠাকুরের পুজো করতে! আর যে এতকাল নবাবী ক'রে এসেছে সত্যিই সে কিছু মুটেগিরি ক'রে খেতে পারে না। ঠাকুর্দার ভাষায়, পাপে যে গলা পর্যন্ত নেমেছে—পাপের পথ ছাড়া তার কর্ম নয়। মানে সাধারণ মানুষের পক্ষে, বাল্মীকি একজনই হয়। সে হওয়া সহজ নয় বলেই তাঁর কথা সকলে মনে রেখেছে। তাঁর নাম প্রবাদ হয়ে গেছে। তাছাড়া তুলসের মাথাটাই ছিল অন্যরকম—দৃষ্টিটা ছিল বাঁকা, সোজা পথ দেখতে পেল না কোনদিনই।

'এবার সে আরও জঘন্য পথ ধরল।' হুঁকোটা সাবধানে দেওয়ালে ঠেসিয়ে রেখে বললেন ঠাকুর্দা, 'বিয়ে করব বলে গরিবের মেয়ে খুঁজে বার করতে লাগল। বাইরেকার মেয়ে সব—ধর, গোরখপুর ছাপরা কি বালিয়া জেলার ছোট শহর কি গ্রামে যে সব বাঙালী পরিবার আছে, তারা মেয়েদের বে দিতে পারে না। এই জায়গায় হয়ত ঐ এক ঘরই, সরকারী চাকরি নিয়ে গেছে। এমনিও জমিজমা নিয়ে থাকে—এমন অনেক আছে অনেক জায়গায়; ওসব দেশে মহকুমা শহরেই হয়ত মোট সাত-আট ঘর বাঙালী, তার মধ্যে দু-তিন ঘরের বেশি বামুন বেরোবে না, তাও আমাদের খিটকেল তো কম নয়—রাঢ়ী আছে, বারেন্দর আছে, শ্রোত্রীয়, বৈদিক, তার মধ্যে আবার দাক্ষিণাত্য বৈদিক—শুদ্ধ শ্রোত্রীয়—কত বলব? কাজেই পাত্তর পাবার জন্যে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি। দেশভুঁই—নিজেদের জাতঘর থেকে অত দূরে কে ওদের জন্যে পাত্তর খুঁজবে? ফলে একো একো মেয়ে দ্যাখো বুড়িয়ে যাবার যোগাড় হয়, তবু বে হয় না।'

তুলসে চারদিকে লোক লাগিয়ে ঐসব মেয়েদের খবর নিতে লাগল। কোথায় কোন্ গ্রাম, স্টেশন থেকে হয়ত সতেরো আঠারো মাইল দূরে—বয়েলগাড়ি ক'রে যেতে হয়।

সেখানে ঐ একটিই বাঙালী পরিবার আছে—সেইখানে লোক লাগিয়ে, অপরের জবানীতে চিঠি দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে লাগল। তারা তো একে চায় আরও পায়। কাশীতে নিজের বাড়ি আছে, ছেলে অর্ডার সাপ্লায়ের কাজ করে, চেহারা ভাল, সঘর—এর চেয়ে ভাল আর কি তারা আশা করবে—'খোট্টার দেশের' বাঙালী মেয়ে? বেশী খোঁজ-খবর নেওয়া তাদের সম্ভব নয়—আর সবচেয়ে বড় কথা, ঘাড় থেকে 'থুবড়ি' মেয়ে নামলেই তারা বাঁচে। খবর নিতে গেলে যদি বাগড়া পড়ে?

'চেহারাটা তুলসের সত্যিই ভাল—আর ভট্চায উপাধি তো—মেয়েদের ঘর বুঝে যেখানে যেমন, সেখানে তেমন হয়ে যেতে লাগল। কোথাও রাঢ়ী, কোথাও বারেন্দর, কোথাও বৈদিক। ব্যস, কেল্লা ফতে। পাঁচ-সাতশ' হাজার টাকা নগদ, একগা গয়না, অন্য দান-সামি্‌গগির বিশেষ নিত না তুলসে, বলত—"আমাদের বামুনের ঘর। ওসব অঢেল, গোচ্ছার বাসন নিয়ে কি করব বলুন, আর খাট বিছানা? সেকেলে বাঙালীটোলার বাড়ি আমাদের, খুপরি খুপরি ঘর, মালে বোঝাই। ওসব রাখব কোথায়? তার বদলে বরং নগদ টাকাটা বাড়িয়ে দিন কিছু—"

'দিতও তারা, হাসিমুখেই দিত। ওসব দেশে যারা পড়ে আছে তাদের অবস্থা খুব খারাপও নয়। তুলসের যাকে বলে অর্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্যে লাভ হ'ত। দূর পথ বলে বেশী বরযাত্রীর কথা উঠত না, গুটি তিন-চার লোক নিয়ে বে করতে যেত, ভাড়া-করা লোক সব—তাদের গাড়ি-ভাড়া ছাড়া বিশ-পঁচিশ ক'রে দিলেই তারা কেতাত্ত হয়ে যেত—দুমাসের সংসার খরচ কাশীর। বে ক'রে এনে দু'চার দিন ঘর-সংসার করত। এক মা ছিল বাড়িতে—তাকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিত এক একদিন—সে যমের মতো ভয় করত ছেলেকে—যা বলত, যেমন শাশুড়িগিরি করতে বলত, তাই করত। আট দিন সোয়ামী সেজে থেকে শ্বশুরের খরচায় জোড়ে শ্বশুরবাড়ি ঘুরে আসার পথেই কোথাও বেচে দিয়ে আসত। খদ্দের সব রেডি—বিহারী, কাবুলী, পাঞ্জাবী, নেপালী—অনেক খদ্দের ছিল ওর। এ একটা আলাদা কারবার—এরও দালাল আছে, মহাজন আছে। কখনও "তার" ক'রে দিত—কলেরায় মরে গেছে, কখনও বা তাকে দিয়ে জোর ক'রে খানকতক চিঠি লিখিয়ে নিত, "অনেকদিন আপনাদের কুশল না পাইয়া চিন্তিত আছি" বাঁধা গৎ। যেন বাপের বাড়ির চিঠি একখানাও পায় নি—কি পাচ্ছে না। এই চিঠি মধ্যে মধ্যে ছাড়ত, তারাও নিশ্চিন্ত ছিল। অনেক সময় বৌকে নিজের বাড়িতেও তুলত না—বেশী বাড়াবাড়ি করলে জানাজানি হয়ে যাবে এই ভয়ে। হয়ত সেই গৌরীগঞ্জে কি ময়দাগিনে কোন বাড়ি ভাড়া ক'রে সেখানে গিয়ে তুললে, তাদের হয় বললে কেউ কোথাও নেই, নয়ত বললে মার সঙ্গে বনে না তাই আলাদা—এইভাবে চালাত সকলের চোখে ধুলো দিয়ে।

'মহা ফন্দীবাজ করে ধূর্তু লোক ছিল তুলসে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক ভেবে সব দিকের আটঘাট বেঁধে কাজ করত। কিন্তু সবেরই একটা সীমা আছে, শেষ আছে। যত বড় ধড়িবাজ আর ধূর্তুই হোক—পাপের পথের এমনই নিয়ম—এক সময় না এক সময় এক একটা ভুল ক'রে বসবেই।

'আসলে অহঙ্কার থেকেই এসব ভুল আসে বেশির ভাগ, ধর্ম কি আইনকে ফাঁকি দিতে দিতে বুক "বলে" যায়—ধরাকে সরা দেখে, ভাবে তাকে কেউ কোনদিন ছুঁতে পারবে না। এই-ই নিয়ম দুনিয়ার। ধর্ম কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে দেখেন, মুখ বুজে সহ্য করেন,

তারপর দুর্বুদ্ধি হয়ে তার ঘাড়ে চাপেন, তাকে দিয়েই তার সব্বনাশের পথ করেন। তুলসেরও হ'ল তাই। বাইরে বাইরে যদ্দিন ছিল এক রকম চলছিল। কারবার ফলাও হচ্ছিল দিন দিন। ছাপরার মেয়ে যে কলেরায় মরেছে একমাস আগেই—বালিয়ার মেয়ের বাপ—যে শহর-বাজার থেকে কুড়ি মাইল দূরে দেহাতী গাঁয়ে পড়ে আছে, তার জানবার কোন হেতু নেই। কাল হল তুলসের কাশীর মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে।'

॥১১॥

অনেকক্ষণ বকে ঠাকুর্দা শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন দেখে আমিই লম্পটা জ্বেলে একটা কলকে ধরিয়ে দিতে গেলুম, উনি তো হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন একেবারে।

'সর সর, ওসব তুই কি বুঝবি। তুই কলকে ধরালে সে তামুক আর আমাকে খেতে হচ্ছে না। এ রসের রসিক না হ'লে চলে? জিনিসটাই মাটি করে বসবি! তোর ঠানদি কলকে সাজিয়ে রেখে দেয়—কিন্তু টিকে ধরাতে দিই না ওকে। তুই রাখ, আমিই ধরিয়ে নিচ্ছি।'

কলকে ধরিয়ে, আমি যে সন্দেশ নিয়ে গিয়েছিলুম তার দুটো গালে ফেলে জল খেয়ে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তামাক টানলেন। তারপর হুঁকো নামিয়ে নিজেই শুরু করলেন আবার।

'এই সময়টাই আমি কাশীতে এসেছি সবে, অত-শত কাশীর মহিমা কিছু জানি না। বলে খাই দাই কাঁসি বাজাই, অত রগড়ের কি ধার ধারি—আমারও হয়েছে তাই। লক্ষ্ণৌ থেকে কাশী আসি যখন তখনও হাতে গোটা-দশেক টাকা আছে, তবে আমি খুব সেয়ানা হয়ে গিছলুম এতদিনে। এখানে এসে একটা দিন ধর্মশালায় থেকে হাতীফট্‌কার কাছে মাসে আট আনা ভাড়ায় একটা ঘর ভাড়া ক'রে নিলুম। রেঁধে খেতে পারি না—তখনকার দিনে হোটেলও তেমন হয়নি, দু'একদিন বাজারের খেয়ে পেট খারাপ হয়ে গেল, শেষে একজনকে ধরে পুঁটের ছত্তরে খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে নিলুম। এক বেলা ওখানে খাই আর এক বেলা যোগে-যাগে চালাই। তখন কাশীতে গরমের দিনে এক পয়সা সের খরমুজ। এক পয়সায় ছ' ডেলা মুঠী গুড়। এক পয়সা খরচ করলে তোফা খাওয়া। এক পয়সায় বেল কিনলে একা খেতে পারতুম না। শীতের দিনে ওসব ছিল না, তেমনি ঐ বিশ্বনাথের গলির মোড়ে কচুরির দোকান—ওখানে এক পয়সা ক'রে এক-একখানা রেকাবির মতো কচুরি। দু' পয়সা খেলেই রাতটা চলে যেত। খেতুম আর গুধুড়ি বাজারে ঘুরে বেড়াতুম। পুরনো দু'একটা পুঁথি পেলে, দু'পয়সা চার পয়সায় যদি হত তো, কিনে নিতুম। নইলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আসতুম।

'তবে এভাবে চলবে না সেটা বুঝেছিলুম। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে শেষ হতে বসেছে তখন। নতুন এসেই ক'টা বজ্জাত পাণ্ডা আর জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলুম। অবশ্য তাতে বেশী খসে নি—ওরাই আমার হিম্মৎ বুঝে ছেড়ে দিয়েছিল—তবু কিছু গেছে প্রেথমটায়।.... কাজেই রোজগারের চেষ্টায় মন দিতে হ'ল। অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে দু'একটা টিউশ্যনিও পেলুম। দু'টাকা এক টাকার টিউশ্যনি, তাও সে টাকা আদায় করতে রক্ত-পাইখানা শুরু হয়।...আর উপায়ই বা কি? অবিশ্যি পুজো যজমানি না করলেও এসে অন্য একটা সামান্য রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল—একটা কোতোয়ালের কাজ পেয়ে গিয়েছিলুম।'—

আমি চমকে উঠলুম, 'কোতোয়াল? মানে পুলিসের কোতোয়াল? সে তো এস.

পি-কে বলে?'

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন ঠাকুর্দা।

'দূর বোকা! আমার কি সেই বিদ্যের জোর ছিল যে পুলিসের কোতোয়ালী করব! এ সে কোতোয়াল নয়।...আর বলবই বা কি? এখনকার ছেলেরা বোধ হয় কেউ-ই জানে না।...ওরে, এই যে কাশীতে এত অধিষ্ঠান দেখিস, অধ্যাপক-বিদেয় ব্রাহ্মণ-বিদেয়—এর একটা নেমন্তন্নর ব্যাপার তো আছে! সে এমনি যার যাকে খুশি করলে চলত না তখন। কাশীতে ব্রাহ্মণদের কতকগুলো সমাজ ছিল—এক এক পাড়ায় এক এক দল। অনেক রকমের ব্রাহ্মণ আছে—এই একটু আগেই তো বলছিলুম—তাদের আলাদা আলাদা সমাজ। এছাড়াও পাড়া ধরে ধরে আলাদা আলাদা দলপতি ছিল, কারও অধিষ্ঠান দেবার ইচ্ছে হ'লে ঐ দলপতিকে আগে জানাতে হ'ত। শুধু ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠান না অধ্যাপকের? শুধু বিদায় না বিচারসভা? ক'জন চাই, এ সব পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে, তারিখটা বলে দিয়ে আসতে হ'ত। তারপর দলপতি ঠিক করতেন কোনদিন কাকে কাকে বলবেন। তিনি এক অনুগত ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে এই নিমন্ত্রণ করতেন, ঐ ব্রাহ্মণকেই বলা হ'ত কোতোয়াল'

'তা কোতোয়াল নাম কেন?' আমি শুধুই, 'এ রকম নেমন্তন্ন করার ব্রাহ্মণ তো আমাদের ওখানেও থাকে দু'একজন, ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে সব জাতের লোক নেমন্তন্ন করা যায়, নিজেদের যেতে হয় না বলে ওঁদের ধরে। এক একজন খুব একটু এক্সপার্ট হয়ে ওঠেন—তাই তাঁদেরই ওপর ভার দেয় সকলে। কিন্তু কৈ, তাদের তো কোতোয়াল বলে না?'

'না, তা বলে না।' ঠাকুর্দাও সায় দিলেন, 'ওটা কাশীরই একচেটে। শব্দটা এসেছে বাদশাহী আমল থেকে। শুনেছি শাজাহান বাদশার বেটা দারা শুকোহ্ কাশীতে এসে ব্রাহ্মণ বিদায়ের অনুষ্ঠান ক'রে সভা ডাকেন, তিনি আর কাকে জানেন? তাই নাকি শহরের কোতোয়ালকে পাঠিয়ে ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেই থেকেই ঐ শব্দটা চলে আসছে।...হ্যা—,যা বলছিলুম, দলপতি তো ফর্দ ক'রে দিলেন, সেই ফর্দ নিয়ে কোতোয়াল বেরোল জানান দিতে। কাকে কাকে নেমন্তন্ন করা হচ্ছে কোতোয়ালই চিনে রাখত—কোন ব্রাহ্মণ হয়ত নিজে যেতে পারবেন না, ছেলেকে পাঠাবেন—ছেলেকে ডেকে কোতোয়ালকে চিনিয়ে দিতেন।...অধিষ্ঠানের দিন কোতোয়াল সেই বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত—চিনে দেখে গৃহস্বামীকে পরিচয় করিয়ে দিত। তিনি অভ্যর্থনা ক'রে ভেতরে নিয়ে যেতেন।...বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় কৈলেসদা—কৈলেস শিরোমণি মশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। আমাদের সমাজের লোক, কথায় কথায় পরিচয় বেরিয়ে গেল—তখন ওঁরও পুরনো কোতোয়াল নেই। তিনি আমাকে কোতোয়াল ঠিক করলেন। ওঁর দলের লিস্টি দিয়ে ঠিকানা দিয়ে বলে দিলেন—ঘুরে ঘুরে সকলকে চিনে আসতে।'

'তা বেতন কত?' জিজ্ঞেস করলুম আমি।

'দূর পাগল, বেতন কি রে! দলপতির কি ঘরে মোটামুটি কিছু আসত যে মাইনে দেবেন? বরং কোতোয়ালেরই কিছু বাড়তি পাওনা ছিল, অধিষ্ঠান যা দেওয়া হ'ত কোতোয়াল তার ডবল পেত। আর পাওয়াই বা কি—অধিষ্ঠান—ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠান বেশির ভাগ বাড়িতেই দেওয়া হ'ত একটা মাটির খুরিতে ছোট এক কুঁদো মিশ্রী, একটা পৈতে আর রুপোর দোয়ানি বা সিকি। কুঁদো মানে—এখানে যে ফেনি বাতাসার মতো মিশ্রীর কুঁদো হয়—সেই। আমাদের দেশের মতো বড় তাল মিশ্রী নয়।

'অধ্যাপক বিদেয় হ'লে আর একটু ভাল ব্যবস্থা হ'ত। পেতলের সরা বা

রেকাবি—যার যেমন সামর্থ্য, মিশ্রীর বদলে হয়ত দুটো কি চারটে সন্দেশ, দক্ষিণেও চার আনার কম নয়। আধুলিও দিত কেউ কেউ। চৌখাম্বার মিত্তির বাড়ি—ঐ যে যাদের সোনার দুগ্‌গোমূর্তি—ওখানে ব্রাহ্মণদের অধিষ্ঠানেও মিশ্রীর বদলে একটা ক'রে চুড়ো সন্দেশ দেওয়া হ'ত।...তবে এসব কি আর কেউ পাওয়ার জন্যে যেত? অধিষ্ঠানে নেমন্তন্ন হওয়া একটা সম্মান। যাবেন, গৃহস্বামী পা ধুইয়ে মুছিয়ে দেবে নতুন গামছায়, বসবেন—মানে ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠান হবে তাঁর বাড়িতে। এই থেকেই অধিষ্ঠান কথাটা এসেছে, আশীর্বাদ ক'রে বিদায় নিয়ে চলে আসবেন, কাজ তো এই। কোতোয়ালের পাওনা ছিল খুরি হ'লে দুখানা খুরি, সরা হলে দুটো সরা—ভেতরের সাজপাট সমেত। তবে কি, তেমন ঘটার কোন ক্রিয়াকলাপ কি শ্রাদ্ধশান্তি হ'লে, পুজো-টুজোয়—এইসব কোতোয়ালদের ধুতি-চাদর পাওনা হ'ত।...ও কাজ কি আমার পাবার কথা? নেহাৎ কৈলেসদা স্নেহ করতেন বলেই—'

কথাটা বলতে বলতেই কেমন যেন আত্মস্থ হয়ে যান রমেশ ঠাকুর্দা। বোধ হয় অতীতের কথা মনে পড়ে সেই স্মৃতির অতলে তলিয়ে যান কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর অল্প দু'এক মিনিট পরেই আবার যেন চমক ভেঙে বাস্তবে ফিরে আসেন।

'বেশ ছিলুম, বুঝলি, বে-পরোয়া, খাওয়ার জন্যে চিন্তা নেই; ভবিষ্যতের ভাবনা নেই—স্বাধীন। ক্রেমে ক্রেমে আরও দু'একটা ছেলে পড়ানো জুটল, ক্রমশ মাসে পাঁচ-ছ' টাকার মতো আয় দাঁড়িয়ে গেল। আরও হতে পারত—তখন তো এখানে বাংলা ইস্কুল ছিল না। অনেকেই মাস্টার খুঁজত—কিন্তু আমার অত লোভ ছিল না। দরকারের বেশী রোজগার করব—তার জন্যে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ভূতের মতো খাটব—ও আমার ধাতে সইত না। অত পয়সার টান থাকলে দেশের বাঁধা যজমানী ছাড়ব কেন?...আর সত্যি কথা বলতে কি, নিজের আখের, ভবিষ্যৎ কি নিজের দু'পয়সা আয় কিসে বাড়বে, এ কোন দিনই ভাবি নি, ঐ চিন্তামণি মুখুজ্জে যখন বাংলা ইস্কুল খুলতে এল—আমি ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পয়সা ভিক্ষে করেছি—একথা একবার মনেও হয় নি যে বাংলা ইস্কুল হ'লে সেখানেই সকলে ছেলেকে দেবে—আমার টিউশ্যনির দফা গয়া হয়ে যাবে।

'যাকগে, মরুকগে—আমার আহাম্মকীর কথা শুনলে তুইও বোকা হয়ে যাবি হয়ত। ... যা বলছিলুম, কাশীতে এসে পর্যন্তই তুলসের কথা শুনছি, কেচ্ছা-কেলেঙ্কার সব, যখন জেলে যায় তাও জানি, জেল থেকে বেরিয়ে এল, এই কারবার করছে—কিছুই শুনতে বাকী ছিল না। ঐ পাড়ায় থাকতুম ঘুরতুম ফিরতুম, বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল—সব কথাই কানে আসত। কিন্তু তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই নি। চোর ডাকাত ছ্যাঁচড়া বদমাইস তো সব দেশেই আছে, তীর্থে তো আরও বেশীই থাকবে—কথায় বলে, আলোর নিচেই অন্ধকার বেশি—আমি তার কি করতে পারি। আমি তো আর দণ্ডমুণ্ডের মালিক নই, ধম্ম বজায় রাখবার ভারও আমাকে কেউ দেয় নি। শুনতুম—দেখতুমও লোকটাকে এই পর্যন্ত। সুন্দর দশাসই চেহারা ছিল। গঙ্গায় চান ক'রে বুকে কপালে চন্দন মেখে গরদের কাপড় পরে যখন উঠে আসত—তখন দেখলে ছেদ্দাই হ'ত, কে বলবে এই লোকটা গুণ্ডা বদমাইস, জেলফেরৎ দাগী আসামী। এক এক সময় আমারও সন্দ হ'ত।

'কিন্তু কিছু দিন পরে আমাকেও মাথা ঘামাতে হ'ল। কুক্ষণে কি সুক্ষণে জানি না—তোর ঠান্‌দি এস্টেজে দেখা দিলেন। রঙ্গমঞ্চে অবতরণ যাকে বলে।'....

বলতে বলতে খানিকটা আপন মনেই হেসে নিলেন। তারপর আবার গল্পের খেই ধরলেন।

হঠাৎ শুনলেন ঠাকুর্দা চৌষট্টি যোগিনীর কাছে একটি নতুন ব্রাহ্মণ পরিবার এসে উঠেছেন, বাংলাদেশের বাস উঠিয়ে চলে এসেছেন তাঁরা—কাশীতেই থাকবেন। নতুন লোক পাড়ায় এলে ঠাকুর্দা যেচেই আলাপ করতেন। এখানেও নিজেই গেলেন। আলাপও হ'ল। শ্রীধর ভট্চায নাম, বর্ধমান জেলায় বাড়ি। সামান্য জমিজমা ছিল, কিছু যজমানীও করতেন—এক ছেলে ওঁর হঠাৎ যক্ষ্মায় পড়ল। সামান্য সঙ্গতি তো, আর রোগও তেমন নয়—যে বাড়িতে ঢুকবে ধনে প্রাণে মেরে যাবে। থাইসিস যে ভাল হবে না সবাই জানে—তবু চিকিৎসাও তো করতে হবে। ওঁকেও করতে হয়েছিল। ভাল ভাল খাওয়ানো, পুরীতে হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাওয়া—যা করার সবই করেছেন। ফলে জমিজমা সমস্তই গেছে, ছেলেটিকেও রাখতে পারেন নি। তাতেই দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন। কিছু ছিলও না আর পৈতৃক ভদ্রাসন ছাড়া, তার আর মায়া করেন নি, বাসনকোসন বেচে কাশীতে চলে এসেছেন, মা অন্নপূর্ণার আশ্রয়ে। স্বামী-স্ত্রী, আর তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে একটি। ভদ্রলোকের বয়স বেশী না, কিন্তু শোকে তাপে শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। তিনটি ছেলে এক বছর দেড় বছরের ক'রে হয়ে মারা যাবার পর ঐ ছেলে, তাকেও রাখতে পারলেন না. এ আঘাত কি কম!

ঠাকুর্দা বললেন, 'একদিন গিয়েই অবস্থা বুঝে নিয়েছিলুম। একেবারে ভাঁড়ে মা ভবানী। আলাপ হওয়ার পর আমিই উয্যুগী হয়ে ভদ্রলোককে কিছু কিছু যজমানী যোগাড় ক'রে দিয়েছিলুম—অধিষ্ঠানে, ব্রত-পার্বণেও যাতে কিছু আদায় হয় সেদিকেও চেষ্টা করতুম। তখন এখানে যাত্রী-তোলা বাড়ি ছিল অনেক, ক'জন বাড়িওলার সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলুম—সধবা, কুমারী-পুজো, ভুজ্যি—এগুলি যাতে ওঁরা পান। নগদ যা পাবে বাড়িওলার—মিষ্টি, থালাবাটি, কাপড়চোপড় এঁদের—এই বন্দোবস্ত হয়েছিল, তাতে এঁদেরই লাভ হ'ত, নইলে আধাআধি ব্যবস্থাই দস্তুর।

'এতেই একরকম ক'রে চালাচ্ছিলেন ভদ্রলোক—কিন্তু ভগবানের মার তখনও শেষ হয়নি, বোধহয় গেল জন্মে বসে বসে শুধুই পাপ ক'রে গেছেন ঐ তুলসের মতো বঞ্চিত ক'রে গেছেন বিশ্বসুদ্ধ মানুষকে,—হঠাৎ একদিন পক্ষাঘাত হ'ল, ঘুম ভেঙ্গে আর উঠতে পারলেন না, বাক্যিও হরে গেল। সে কি অবস্থা রে ভাই—খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি মেয়েটা আছাড়-পিছেড় খেয়ে কাঁদছে, কিন্তু ওঁর স্ত্রীর চোখে জল নেই—বলে না যে, অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর—তাঁরও বোধ হয় তাই হয়েছিল। পাথরের মতোই গুম খেয়ে বসে আছেন।

'লেগে গেলুম কাজে। পাড়ার দু'তিনটি ছেলেকেও লাগিয়ে দিলুম, তার মধ্যে একটি হিন্দুস্থানী ছেলেও ছিল শান্তাপ্রসাদ বলে, এমন প্রাণ দিয়ে পরোপকার করতে আমি আর কাকেও দেখি নি—তারা কিছু কিছু চাঁদা তুলল, আমি পাতালেশ্বর গলির আশু কবরেজকে ডাকালুম মেয়েটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলুম, বললুম, "কান্নার ঢের সময় পারে খুকী—এখন বাপের সেবা করো আগে"। জানি কাজে না লেগে থাকলে মন খারাপ সারবে না। এমনিভাবে র-ব-ঠ ক'রে বছরখানেক চালিয়ে ছিলুম। ছেলেদের বলা ছিল মাসে দু'আনা হিসেবে বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলবে, কাউকে জুলুম করবে না—কেউ না অসুবিধে ক'রে দেয়। মাসে দুগণ্ডা পয়সা দিতে অত কেউ আপত্তি করত না—অথচ

চেনাশুনো মহল ঘুরে মাসে আট-দশ টাকা উঠে যেত তাতে।

'তাতে উপোসটা বাঁচল, আশু কবরেজের হাতে-পায়ে ধরে মনকে আঁখিঠারা গোছের একটা চিকিচ্ছেও হ'তে লাগল—একটা তেল আর বড়ি দিতেন মধ্যে মধ্যে, দাম নিতেন না—কিন্তু তাতে ফল কিছু হ'ল না, হঠাৎ একদিন নাক-মুখ দিয়ে রক্ত উঠে ভদ্রলোক কাশী পেলেন। শোকটা এতদিনে এদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাই স্ত্রী-মেয়ে দু'জনেই শান্ত ভাবে মৃত্যুটাকে মেনে নিল।

'কিন্তু আমাদের ওপর আরও দায় চাপল। টাকা তোলা বন্ধ হয় নি—সংসারটাও চলছিল, এবারে আমার যেটা প্রেধান চেষ্টা হলো মেয়েটাকে পার করা। এমন একটা ছেলে দেখে দিতে হবে— যে শাশুড়িকে সুদ্ধ টানতে পারে, ওঁকে এমন ভিক্ষের ভাতে আর দিন কাটাতে না হয়। পাঁচজনকে বলেও রাখলুম, নিজেও ঘুরতে লাগলুম। তবে আমাদের তো জানিস, যতই সোন্দর মেয়ে হোক, শুধু-হাত কেউ মুখে তুলতে চায় না। ভাল পাত্তর যা দু'একটা পেলুম এত্তখানি খাঁই।'

এর মধ্যে একদিন গিয়ে শুনলেন ঠাকুর্দা—মধ্যে আট-দশ দিন যেতে পারেন নি, এক বুড়িকে নিয়ে প্রয়াগ করাতে গিছলেন এলাহাবাদে—যে, ও মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। পাত্র কে—না ঐ তুলসে।

'বোঝ ব্যাপার! আমি তো অবাক, ওরা না হয় নতুন মানুষ সব শোনে নি, কেউ কি বলেও দেয় নি তুলসে কেমন, কি মতলবে ঐ ফুলের মতো মেয়েটাকে কব্জা করতে চাচ্ছে!...বলতে গেলুম মাকে—শুনতে শুনতে মুখ সাদা হয়ে গেল মানুষটার কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘাড় নাড়লেন। বে নাকি বন্ধ করা যাবে না, কোন উপায় নেই। উনিও নাকি শুনেছেন কিছু কিছু কিন্তু যাদের বলতে গেছেন সবাই বলেছে, 'তুলসে? ও-বাবা, ও আমরা কিছু করতে পারব না। বে বন্ধ করতে গেলে, আটকাতে গেলে আমাদের জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবে। আর ও যখন মন করেছে তখন তোমার মেয়ের আর ছাড়ান-ছিড়েন নেই, মেয়েকে খরচের খাতায় ধরে রাখো।'

কথাটা যে কতখানি সত্য তা তিনিও বুঝেছেন—যারা দেখাশুনো করত, সাহায্য করত তারা কেউ ছায়া মাড়ায় না আর—সবাইকে তুলসে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে। পাড়ায় যে মুদী চাল-ডাল দিত সে আর মাল দেবে না। নগদ টাকা দিলেও নয়। এদিকে সব পথ বন্ধ ক'রে—পুরো একদিন প্রায় অনাহারে রাখবার পর তুলসে নিজেই লোক দিয়ে ঝুড়ি ভর্তি সিধে, আনাজ-কোনাজ একরাশ পাঠিয়ে দিয়েছে। তখন আর না নিয়ে উপায় কি? অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে জানালেন ভদ্রমহিলা।

'মাথায়-আগুন-জ্বলে-ওঠা কথাটা শোনাই ছিল এতকাল।' ঠাকুর্দা বললেন, 'ঐদিন বুঝতে পারলুম। কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হ'ল শুধু আমার মাথায় নয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই বুঝি আগুন জ্বলছে। চারিদিক লাল দেখতে লাগলুম, কিন্তু ওঁকে কিছু বললুম না, শ্রীধর ভট্চাযের পরিবারকে। মেয়েটা দেখলুম ঘরের এক কোণে মেঝেতে পড়ে আছে, উঠলও না—আমার দিকে তাকালও না। বুঝলুম কেঁদেই চলেছে। সারাজীবন যা করতে হবে, তারই রিয়েসাল দিয়ে নিচ্ছে।

'কিছু বললুম না, তার কারণ মেয়েমানুষ জাতকে বিশ্বাস নেই। চানক্য বলেছেন কাজ যা করবে তা মনে মনে ভেবে নিও, কখনও প্রেকাশ করতে যেও না। এতকাল জগৎটাকে

দেখে ঠেকে শিখেছি—কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি।...ওখান থেকে বেরিয়ে লক্ষ্য করলুম তুলসের এক চেলা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে—মানে এ বাড়ির ওপর নজর রাখছে! বুঝলুম ও মেয়ে বেচে অনেক দাম পাবার আশা রাখে, তাই এত আয়োজন। নেহাৎ আমাকে ভয় দেখাতে সাহস করল না তার কারণ—মোটামুটি কাশীর ব্রাহ্মণ সমাজে চেনা হয়ে গেছে, কৈলেসদা ভালবাসেন—আমাকে ঘাঁটাতে গেলে যদি সোরগোল বাধে? তাছাড়া আমাকে আধপাগলা ভিখিরী বলেই ভাবত, আমি যে ওর কোন অনিষ্ট করতে পারব তা মনে করে নি।'

ওখান থেকে বেরিয়ে ওঁরা যে ক'জন বামুনের ছেলে একটা সমিতি মতো করেছিলেন—সবাই ভাল ভাল ঘরের ছেলে, ওদিকে কেদারঘাট মানসরোবর আউদগর্বি থেকে শুরু ক'রে এদিকে গণেশমহল্লা পর্যন্ত—অনেকেই ছিল, শ্রীধর ভট্‌চাযকে সাহায্য করার জন্যেই এককালে এদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন ঠাকুর্দা—এখন এরা বেশ একটা সমিতি করে নিয়েছে 'অন্নপূর্ণা বান্ধব ভাণ্ডার' নাম দিয়ে—তাদের মধ্যে বেছে ক'জনের সঙ্গে গোপনে দেখা ক'রে বলতে গেলেন উনি, সবাই যেন ভূত দেখল একেবারে। প্রথমটা কেউ কানই দিতে চায় না, তুলসের ভয়ে সিঁটিয়ে আছে সকলে। উনি তবু হাল ছাড়লেন না। অনেক ক'রে বোঝালেন। কত লোক আছে তুলসের তাঁবে? ওর তো পয়সা দিয়ে লোক পোষা—কত লোক পুষতে পারে? এঁরা যদি এতগুলো লোক এক হন—ওঁদের সামনে দাঁড়াতে পারবে? ভয়টাকে বড় ক'রে দেখলেই বড় হয়ে যায়, ওঁরাও মানুষ তো। না কি গরু ছাগল? কী করবে, খুন করবে? এত সাহস নেই। একবার জেল খেটে এসেছে—দাগী আসামী।

বলতে বলতে, ধিক্কার দিতে দিতে ওঁদের মন শক্ত হ'ল অনেকটা। তারপর সবাই মিলে মতলব আঁটতে বসলেন। সময় ছিল, সেটা তখন চৈত্র মাস যাচ্ছে। বৈশাখের আগে বিয়ে হতে পারবে না। মানে তুলসের আর চৈত্র মাসই বা কি বৈশাখ মাসই বা কি—কিন্তু এদের কোন্ লজ্জায় বলবে চৈত্র মাসে মেয়ের বিয়ে দাও! চৈত্র মাস বলে তাঁদেরও একটু সুবিধে হয়ে গেল, বুঢ়ুয়া মঙ্গলের মেলা সামনে—সকলেরই মন পড়ে থাকবে গঙ্গার দিকে। গুণ্ডা বদমাইশ লোকেদের মহা-উৎসব—এ সময় সবাই ব্যস্ত থাকে। ভিড়ে দেখাশুনো করা কি কোন লোককে ধরার ভারি সুবিধে।

'ধরলুমও। তুলসের যারা পুরুত নাপিত বরযাত্রী সাজত—অনেক খুঁজে তাদের নামগুলো পেলুম। তারপর পাঁচ-সাতজনে মিলে তাদের এক একে ধরলুম। কাউকে ভয় দেখিয়ে, কাউকে লোভ দেখিয়ে কায়দা করা হ'ল। ভয় দেখিয়েই বেশির ভাগ। এক বেটা শুঁড়ি ছিল, সে-ই নাপিত সাজত, খুব পয়সা পেত তুলসের কাছ থেকে—তাকে আর কোনমতে কায়দা করতে পারি না। হঠাৎ কি খেয়াল গেল, পিরানের মধ্যে থেকে পৈতে বার ক'রে ছিঁড়ে শাপ দিতে গেলুম। যে এতকাল এত কথায় ভয় পায় নি—সে ঐতেই ভয় পেয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গাললে সব কথা খুলে বলবে। বললেও সব, গলগল ক'রে বেরিয়ে এল সব কথা। কাকে কোথা থেকে এনেছে, কোন্ গ্রাম, মেয়ের বাপ কী করে—কোন্ মেয়েকে কলেরা ধরিয়েছে, কাকে থাইসিস, কার বেলা অমুকের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে—এই দুর্নাম দিয়েছে, সব খবরই পাওয়া গেল।

'বাকী ক'জনকে গিয়ে এই খবর একেবারে নামধাম-বিবরণ সমেত সব বলা হ'ল।

কে বলেছে তা বললুম না। শুধু বললুম যে আমরা সব জেনেছি। সাক্ষী-সাবুদ সব মজুত। এবার আর কোনমতেই বাঁচোয়া নেই তোমাদের সর্দারের। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অনিবার্য। তোমাদেরও আট-দশ বৎসর জেল হবে-- পাথর ভেঙ্গে ঘানি টেনে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। যদি অল্পে পার পেতে চাও---রাজার সাক্ষী হও, নিজে থেকে সব স্বীকার করো। তাদের আগেও কিছু কিছু ভয় দেখানো হয়েছে। একজনকে—যে বেটা পুরুত সাজে তাকে অনেক টাকা কবলে লোভ দেখানো হয়েছিল। তবু ইতস্তত করছিল একটু আধটু—আমাদের মামলা সাজানো হয়ে গেছে দেখে এবার ঘাবড়ে গেল। আমি আর তাদের সময় দিলুম না----এক চেনা উকীলের বাড়ি নিয়ে গিয়ে এজাহার লিখিয়ে—সই করিয়ে—চার পাঁচজন সাক্ষীকে দিয়ে দস্তখৎ ও সনাক্ত করিয়ে নিলুম।'

এর পর কি করবেন তাও ঠিক ছিল। তখন এত নতুন সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট এসেছে কাশীতে। খুব বুড়োও না, একেবারে ছোকরাও না। পুলিসের কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে না তা জানতেন এঁরা। যে এতখানি সাহস করে—তার ওসব পীরের দবগায় আগেই সিন্নি চড়ানো থাকে। মিছিমিছি ঘাঁটাতে গেলে—ওরাই হয়ত সাবধান ক'রে দেবে—সটান তাই চলে গেলেন এঁরা সাহেবের কাছে। এঁদের দলে ছিল কাশী নরেশের দেওয়ানের ছেলে বিশ্বনাথ, সে বেশ বলিয়ে কইয়ে ছিল, সাহেবদের মতো ইংরিজী বলতে পারত। সে-ই এদের হয়ে কথা বলল হাকিমের সঙ্গে। সব কাগজপত্র দিয়ে, লোকটা আগেও কী ঘৃণ্য ব্যাপারে লিপ্ত ছিল—সেজন্যে চার বছর জেল খেটেছে জানিয়ে—শেষ পর্যন্ত বলে দিলে, পুলিস ওর কাছে থেকে ঘুষ খায় তা সকলেই জানে, আর তা হাকিম বাহাদুরও বুঝতে পারছেন নিশ্চয়, নইলে এমন সব কাজ করার পরও এতকাল ধরে বুক ফুলিয়ে শহরের মধ্যে বাস করছে কি ক'রে! এখন হাকিম বাহাদুর যদি এর প্রতিকার না করেন তো বোঝা যাবে তিনিও এর মধ্যে আছেন, পুলিস মারফৎ তাঁর কাছেও ঘুষ এসে পৌছয় কিছু---সেক্ষেত্রে এঁদের খবরের কাগজের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। বসুমতীর সম্পাদক কাশীতে এসেছেন, তাঁর কাছেও এর একসেট কাগজপত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে---হাকিম বাহাদুর যদি এই অনাচারের কোন প্রতিকার না করেন তো তিনি বলেছেন এসব খবর বিস্তৃত ক'রে তাঁর কাগজে ছাপবেন। পুলিস আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিষ্ক্রিয়তার খবর সুদ্ধ!

'সব শুনে আর ওদের এজাহার দেখে সায়েবের লালমুখ আরও লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "অত কিছু করতে হবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও। .... তোমাদের ঐ ড্যাম্‌ড্ নেটিভ্ পেপার বসুমতীকে বলো তাকে ভাল খবরই ছাপতে হবে। আমাকে গালাগাল দেবার সুযোগ পাবে না।" সাহেব হয়ত ভাল, হয়ত ভাল না—ঘুষখোর—কিন্তু যাই হোক বসুমতীর নাম করায় কাজই হয়েছে, তখন বসুমতীর খুব নাম, সবাই ভয় করে।

'তা সাহেব দেখালও বটে', বললেন ঠাকুরদা। অসম্ভবই নাকি সম্ভব করেছিলেন। কী ক'রে কি কলকাঠি নেড়েছিলেন তা তিনিই জানেন, মোদ্দা ওঁরা যাওয়ার পর থেকে বারো ঘণ্টার মধ্যে তুলসেকে হাতে হাতকড়া কোমরে দড়ি পরিয়ে ধরে নিয়ে গেল পুলিস, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওর সাঙ্গেপাঙ্গোদের সবাই গিয়ে হাজতে ঢুকল। যারা সাক্ষী দিয়েছিল তাদের একেবারে আলাদা জায়গায় রাখা হ'ল, যাতে তুলসের লোকরা না ভয় দেখাতে পারে। সেইখানেই থামল না পুলিস. --বোধ হয় সাহেবের ধমকেই—সেই বালিয়া ছাপরা

গোরখপুর বেতিয়া—সব জায়গায় খবর চলে গেল—তাদের মেয়েগুলোর কী পরিণাম হয়েছে! সাত-আট দিনের মধ্যে সেসব মেয়ের বাপ বা অভিভাবক কাশীতে এসে পৌছল। এবারও খুব জোর মকদ্দমা হ'ল—তবে এবার দেখা গেল, তুলসেকে বাঁচাতে একটি প্রাণীও এগিয়ে এল না। তুলসে যাদের কাছে খবর পাঠাল তারা সব পরিষ্কার বলে দিল, তুলসেকে তারা চেনে না, কস্মিনকালে তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। ফলে মকদ্দমাও বেশী দিন টানবার দরকার হ'ল না, মাস ছয়েকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। তুলসের মেয়াদ হ'ল সাত বছর। সাঙ্গোপাঙ্গদের কারুর চার বছর কারুর পাঁচ। যারা সাক্ষী দিয়েছিল তাদের নামমাত্র সাজায় ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

॥১২॥

নাটকীয় ভাবে এই পর্যন্ত বলে ঠাকুর্দা আর এক ছিলিম তামাক ধরিয়ে নিলেন। তার পর আমার অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে নিজেই শুরু করলেন আবার।

'তুলসের সেই শেষ। এবার জেল থেকে বেরিয়ে আর কাশী আসে নি। শেষ যে বে করেছিল, গাজীপুরের দিকের এক গাঁয়ের মেয়ে, ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী ক'রে খায়—অনেকগুলো ছেলেমেয়ে—তবু তার একটা পার হচ্ছে ভেবে কোন খবরই করে নি—সে বৌটাকে আর পাচার করবার সময় পায় নি, চারে জীইয়ে রেখেছিল। তার পরই তো এই বিত্তান্ত—মোকদ্দমার সময় বাপ এসে নিয়ে গিয়েছিল, সেইখানেই পড়ে ছিল—সেই সুবাদে তুলসেও গিয়ে সেখানে উঠল। তা সে শ্বশুর ভাল বলেছিল, "যা হবার হয়েছে, এখন এইখানে জমিজমা দেখে দিচ্ছি, চাষবাস করো, খাও।" রাজীও হয়েছিল—কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। গুণ্ডার স্বভাব কোথায় যাবে, চণ্ডালের রাগ—ঐ যারা ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল তাদের ওপর শোধ নেবার ইচ্ছেটা ত্যাগ করতে পারল না।

'একটু সামলে নিয়েই চুপচুপ কাশীতে এল। সেই নাপ্তে বেটাকে আগে শেষ করবে এমনি মতলব ছিল, কিন্তু সে-ও মহা ধুরন্ধর। তুলসে জেল থেকে বেরিয়েছে খবর পেয়ে পঞ্জন্তই তক্কে তক্কে ছিল—লোকও লাগিয়ে রেখেছিল পিছনে—রাত্তিরের গাড়িতে যেমন সিকরোল এসে নেমেছে, ওর দুজন লোক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে লাইনে। তখনই একটা মালগাড়ি আসছিল—খেঁৎলাতে খেঁৎলাতে সাত হাত দূরে টেনে নিয়ে গেল—মানুষটাকে চেনবারই জো রইল না। নিহাৎ পকেটে কি সব কাগজপত্তর ছিল আর ডান উরুতে একটা সাদা জড়ুল—তাইতেই লাশ সনাক্ত হ'ল।...

'বাইবেলে নাকি একটা কথা আছে শুনেছি—পাটনার সেই নিতাইবাবু বলতেন—যে তলোয়ারের জোরে বড় হয় তলোয়ারেই তার সব্বনাশ ঘটে। তা তুলসেরও হ'ল তাই!'

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে বকে ঠাকুর্দা বেশ একটু থকেই গিয়েছিলেন—এবার খানিকটা চোখ বুজে বসে রইলেন। তারপর উঠে আর এক ঘটি জল খেয়ে এলেন আবার।

মায়া হবারই কথা ওঁর অবস্থা দেখে, কিন্তু আমার আর তখন মায়া দেখাতে গেলে চলে না। এখানে থাকার মেয়াদ বেশী দিনের নয়। থাকলেই খরচা, সুতরাং সীমাহীন ইচ্ছা সত্ত্বেও দু'একদিনের মধ্যে পাততাড়ি গুটোতে হবে। কাল যে আবার আসতে পারব ঠিক এই সময়ে—তা বলা কঠিন। যেটুকু জানবার এখনই জেনে নিতে হবে, সতীদি আসবার আগেই।

তাই একটু কেশে, বার দুই মাথা চুলকে বললুম, 'এ তো হ'ল—সতীদিকে উদ্ধার দানবের কবল থেকে, কিন্তু তিনি আপনার কুক্ষিগত হলেন কি ক'রে সেটা তো বললেন না এখনও—?'

'গেরো। কপালে গেরো থাকলে কে খণ্ডাতে পারে বল্! ওর কপালে আছে দুঃখের পেছনে দড়ি দেওয়া তার আমি কি করব। ঝিকে ঝি—রাঁধুনীকে রাঁধুনী, স্যাবাদাসীকে স্যাবাদাসী—আবার ইদিকে রোজগেরে বাবু। আমার পাল্লায় পড়ে সব করতে হবে—এ য় বিধেতা-পুরুষের লেখন ওঁর অদেষ্টে!'

ঠাকুর্দা দারুন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, যেন জ্বলে উঠলেন একেবারে। বললেন, তুলসে তো গেল—বেশ শান্তি হ'ল—আর কোন ভাবনা নাই, আমি উঠে পড়ে লাগলুম ওর জন্যে একটা পাত্তর খুঁজতে। বুঝলুম যে আর নয়, এ আগুন উনুনের মধ্যে পুরতে না পারলে নিস্তার নেই। নিজেও জ্বলবে, পরকেও জ্বালাবে। তুলসেকে তো একটাই পাঠান নি ভগবান সংসারে।

'পাঁচজনকে বলে রাখলুম। বামুনপাড়ায় জনে জনে গিয়ে জানালুম। আমাদের ভাণ্ডারের ছোঁড়াগুলোকেও বললুম; সোন্দর মেয়ে—খুব ভরসা ছিল বুকে—ভাল পাত্তর একটা পাওয়া যাবেই। তা সে দফা উনিই গয়া ক'রে দিলেন। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলেন, বেশ ভেবেচিন্তে, হিসেব ক'রে।...একদিন ওদের খবর নিতে গেছি, ওর মা কেমন যেন অপ্রস্তুত অপ্রস্তুত ভাবে, খুব সঙ্কোচের সঙ্গে ডেকে এক কোণে নিয়ে গিয়ে কথাটা পাড়লেন, "বাবা, তুমি তো পাগলীর পাত্তর খুঁজতে সারা পৃথিবী তোলপাড় করছ—ও তো এক কাণ্ড ক'রে বসে আছে! এখন কী করবে করো। এসব বলাও যায় না, অথচ না বললেও নয়। আমার তো কিছু মাথাতে আসছে না।"।

'আমি তো অবাক। ওঁর কথার ভাবে মনে হ'ল খুব একটা গর্হিত কাজ ক'রে ফেলেছে মেয়েটা—জাত-কুল নষ্ট হবার মতো।...কিন্তু তেমন মেয়ে তো মনে হয় না। আর ঐটুকু মেয়ে!—আমার তখন এমন মনের অবস্থা জিজ্ঞেসও করতে পারছি না—কী কাণ্ড ক'রে বসে আছে!

'বললেন ওর মা নিজেই। আরও একটু লজ্জা-লজ্জা ভাবে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললেন, "ও নাকি বাবা কেদারনাথকে ছুঁয়ে দিব্যি গেলেছে যে তোমাকে ছাড়া নাকি কাউকে বিয়ে করবে না"!

'আমি তো অবাক। কথাটা মাথায় ঢুকতেই আমার বিলক্ষণ দেরি হ'ল। তারপর মনে হ'ল আমি ভুল শুনছি, না হয় ওঁর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। আরও অনেক পর বুঝলুম যে ভুল শুনি নি।

'মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল একেবারে, "সেকি!....কী বলছেন কি! মাথা খারাপ নাকি? না না, ওসব পাগলামি করতে বারণ করুন ওকে! ছি ছি! কি বলছেন। তাছাড়া আমাকে বে—আমি তো ও কাজেই যাব না। সেই জন্যেই তো আরও এমন বাউণ্ডুলে হয়ে আছি। হ্যা—। না চাল না চুলো, একপয়সা রোজগার করি না, এই চেহারা, অন্ধাকারে দেখলে লোকে আঁৎকে ওঠে, খুব পাত্তর খুঁজে বার করেছে বটে"!

'হেসে উড়িয়ে দিতে যাই কথাটা। এদিকেও ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে একরকম। যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন ওর মা। ভেবেছিলুম না জানি কি একটা খুব খারাপ কাজ ক'রে বসে আছে!

'কিন্তু ভদ্রমহিলা হাসিঠাট্টার ধার দিয়ে যান না। বল্লেন, "মেয়ে যে বাবা কোন কথাই শুনছে না—তার কি করি। বলে, উনি আমাকে সব্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন মহাদুর্গতি থেকে রক্ষে করেছেন—ওরকম অবস্থা হ'লে তো মৃত্যু ছাড়া পথ থাকত না কাজেই এ জীবনও ওঁর দেওয়া। আমি সেই দিন থেকেই মনে মনে ওঁকে স্বামী বলে ভেবে রেখেছি—হিঁদুর মেয়ের আবার বিয়ের কি বাকী আছে? তাছাড়া বাবাকে ছুঁয়ে দিব্বি গেলেছি--আমার আর কোন পথ নেই—এখন উনি না নেন, ওঁর ধম্ম ওঁর কাছে আমাকে তাহলে গঙ্গায় ডুবে মরতে হবে, এর পর কনে সেজে আর কাউকে মালা দিতে পারব না।"...ও মেয়ে বাবা সাংঘাতিক, কত বললুম কত বোঝালুম—আমি কি ক বুঝিয়েছি, কিন্তু সে সব ভস্মে ঘি ঢালা। বজ্জাত ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বসে আছে কোন কথাই শুনছে না। বলে না—মোষের শিং বাঁকা যোঝবার বেলা একা, তা এ মেয়েরও হয়েছে তাই"!

'বোঝ ব্যাপার! উনি তো খুব আহ্লাদ ক'রে বললেন। এক কথায় কথার তেইশ মেরে দিলেন। এখন আমি কি করি!...আমি অনেক ক'রে বোঝালুম, পায়ে-হাতে ধরতে গেলুম বলতে গেলে, পাঁচজনকে দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, অনেক গুরুজন প্রবীন লোককে ডেকে আনলুম—মেয়ের সেই এক কথা, তুমি বে না করো—গঙ্গায় গিয়ে উলব। বলি কিছু নেই, পথের ভিখিরী—তা জবাব দেয় "শ্মশানে বাস করে জেনেই তো মা দুগ্গা শিবকে বে করেছিলেন।"—এঁচোড়ে পাকা মেয়ে, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ভারি পাকা হয় নাতি—এ তুমি দেখে মিলিয়ে নিও—শহরের মেয়েদের এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারে। যারা মুখখু তারাই বলে সরলা পল্লীবালা! মরুক গে—আমার যা করবার তা চূড়োন্ত করেছি—কোন চেষ্টা বাকী রাখি নি, তাতেও যখন শুনল না আমার রাগ হয়ে গেল, সোজা বললুম, "মরগে যা! অদেষ্টে দুঃখ না থাকলে এমন বদ বুদ্ধি হবে কেন। কর্ আমাকে বে, কত সুখ, প্রাণে কত রস আছে টের পা একবার!"...মিটে গেল—বিত্তান্ত। সে-ই উনি আমার ঘাড়ে চাপলেন—কিম্বা আমিই ওঁর ঘাড়ে চাপলুম।'

কেন যে এ বদ বুদ্ধি—তাও অবশ্য ঠাকুর্দাই বললেন—আর একটু পীড়াপীড়িতে।

সতীদি নাকি ঐ ঘটনার আগে থাকতেই ওঁর প্রেমে পড়েছিলেন। বাবার অসুখের সময় এবং মৃত্যুর পর রমেশ ঠাকুর্দা যা করেছেন—যে অমানুষিক পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ—ওদের বাঁচিয়ে রাখতে, তা নাকি এই কলিযুগে কেউ কারও জন্যে করে না। আরও পাঁচজনে করেছে ঠিকই, তবে তারাও করেছে ওঁর জন্যে, ওঁর চেষ্টা আর দৃষ্টান্তেই।

সে-ই যেন নতুন দৃষ্টি খুলল সতীদির।

নতুন এক চোখে দেখলেন তিনি রমেশ ঠাকুর্দাকে। তাঁর মনে হ'ল সাক্ষাৎ শিব, স্বয়ং বিশ্বনাথ এমনি ভাঙড় ভোলা ভিখারী সেজে এসেছেন ওদের ত্রাণ করতে।

সেই যে কিশোরী মেয়ের চোখে মায়া ও মোহের অঞ্জন লাগল, ঐ কুৎসিত প্রায়-পৌঢ় ঠাকুর্দা সেই যে পরম কাম্য রমণীমোহন রূপে তার চোখে প্রতিভাত হলেন—সে মায়া, সে ভ্রান্তি আর জীবনে ঘুচল না। ঠাকুর্দার উদার কোমল অন্তরের অসীম ঐশ্বর্যই তিনি দেখেছিলেন সেদিন—তাই বাইরের এই খোলসটা চোখে পড়ে নি। কোনদিনই পড়ে নি জীবনভোর সেই মুগ্ধ দৃষ্টিটিই রয়ে গেছে তাঁর—সেদিনের সে ছবি কোনদিনই মোছে নি।

তার পর যখন সাক্ষাৎ কালান্তক যমের মতো—মূর্তিমান পাপের মতো তুলসে এল তাঁর জীবনে—দেখলেন যাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে—সমস্ত পাড়া সমস্ত পরিচি

লোক---এমনি কি দোকানদাররা পর্যন্ত ওর ভয়ে আড়ষ্ট, জন্তু হয়ে গেছে—কেবল এই শীর্ণ কৃশতনু নিঃস্ব লোকটি ছাড়া।

এই আপাতদুর্বল মানুষটিই শুধু যথার্থ পুরুষের মতো, পুরুষ-সিংহের মতোই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং রক্ষাও করেছিলেন তাঁকে সেদিন—অসম্ভব সম্ভব করেছিলেন।

আবারও নূতন রূপেরই ঘোর লেগেছিল সেদিন সতীদির চোখে।

মদনমোহন সেদিন লজ্জানিবারক শ্রীকৃষ্ণ রূপ, ভাঙড় ভোলা বৃদ্ধ ভিখারী শিব সেদিন ত্রিপুরারি রূপ ধারণ করেছিলেন। তাই বয়স, রূপ, ভরণ-পোষণের সামর্থ্য—কোন কথাই আর ভাববার অবসর পান নি সতীদি!

'তবে একটা কথা বলব নাতি, সে শুনতে আসছে না, তার ধম্ম শুনছে—সেই যে জেদ ক'রে এসেছিল, গলায় মালা দিয়ে—তারপর থেকে টানা এই দুঃখটা ভোগ ক'রে যাচ্ছে, একটা দিন, একটা মিনিটও তার জন্যে মুখে টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করে নি, কি আমাকে গঞ্জনা দেয় নি। এতটা বোধ হয় মা দুগ্‌গাও পারতেন না! অসুখ হয়েছে একশ পাঁচ জ্বর—তার মধ্যে উঠেও আমার ভাত রেঁধে দিয়েছে, আমার আর কারও রান্না মুখে রোচে না বলে।...ওরই কপাল, গেরোর ফের—নইলে ওর যা রূপ-গুণ, রাজার ঘরে পড়বার কথা!'

এই বলে একেবারে চুপ ক'রে গেলেন। বাইরে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, সামনে বাগানের ওপারে হিন্দুস্থানীদের বাড়ির কার্নিশে কবুতররা ফিরে এসেছে, করবীগাছের ডালে কতকগুলো ছোট পাখী আশ্রয় নিয়ে কিচির মিচির করছে—সেই দিকে চেয়ে তাদের দিকে কান পেতে বসে রইলেন যেন। অন্ধকারে ভাল দেখতে পেলুম না, তবু আমি হলপ ক'রে বলতে পারি—চোখ দুটো ওঁর ছলছল করছিল, প্রেমে, স্নেহে, সহানুভূতিতে—পত্নীগর্বে।

হয়ত জলও ঝরে পড়ছিল তোবড়ানো শীর্ণ দুই গাল বেয়ে।

আমিও আর কোন কথা তুললুম না। এখন কথা কওয়াতে যাওয়া মানে ওঁর ওপর অত্যাচার করা। 'আচ্ছা আসি এখন ঠাকুর্দা, বলে পায়ের ধুলো নিয়ে উঠেই পড়লুম একেবারে।

সতীদির আসবার সময় হয়ে এল—তাঁর সামনে আর এ অবস্থায় পড়তে চাই না। তাঁর চোখে কিছুই এড়াবে না, আমাকে বকাবকি করবেন বুড়ো মানুষকে উত্যক্ত করার জন্যে।

॥ গ্রন্থশেষ ॥

পুরাণের সতীর থেকেও ঢের বড় সতী আমাদের সতীদি কিন্তু এ জন্মে বিধাতার কাছ থেকে তাঁর তপস্যার কোন পুরস্কারই পান নি।

একমাত্র এই স্বামী-লাভ ছাড়া তাঁর কোন সাধই পূরণ করেন নি বিশ্বনাথ।

সবচেয়ে যেটা বড় প্রার্থনা ছিল—'তোরা বল, বাবাকে জানা, বুড়ো যাতে আমার কোলে যায়—তোদের পাঁচজনের বাড়ি মেগে আমার দিন একরকম ক'রে কেটেই যাবে—আমি গেলে বুড়োর বড় কষ্ট হবে, না খেয়ে উপোস ক'রে কোথায় মুখ থুবড়ে পড়ে মরবে!'—সেটাও শোনেন নি ভগবান।

এর অনেকদিন পরে, উনিশশো সাঁইত্রিশ কি আটত্রিশ সালে—আজ আর ঠিক মনে নেই—আর একবার দেখা হয়েছিল ঠাকুর্দার সঙ্গে।

ঠানদি যে নেই সে খবর আগেই পেয়েছিলুম, ওপাড়ার সতীশবাবুর মুখে, হঠাৎ একদিন শিয়ালদার বাজারে দেখা হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু ঠাকুর্দার কি হ'ল সে খবর পাই নি। শুনলুম ঠানদি নাকি একদিন চাকরি সেরে রাত্রে ফিরে এসেছিলেন জ্বর নিয়ে। সামান্য জ্বর, পরের দিন বাইরে রাঁধতে যেতে পারেন নি, তবু উঠে বুড়োর রান্না ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন, নিজের জন্যে একবাটি সাবুও। কিন্তু বিকেলে আর উঠতে পারলেন না। সাড়াও দিলেন না কথাও কইলেন না।

ঠাকুর্দা অনেক দিনের লোক, অনেক মৃত্যু দেখেছেন, হেঁট হয়ে নিঃশ্বাস নেবার ধরণ দেখে আর গায়ে হাত দিয়েই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। চিৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে লক্ষ্মীবাবুকে জানালেন ব্যাপারটা। ওঁর চিৎকারে আরও পাঁচজন ছুটে এল। ডাক্তারও ডাকা হল—একজন নয়, খবর পেয়ে দুজন ডাক্তার এসে গেলেন, সতীদিকে সবাই ভক্তি করত, কিন্তু কিছুই করা গেল না। শেষ রাত্রে উষার স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সাবিত্রী চতুর্দশীর দিন সেটা, খবর পেয়ে নাকি পাড়াসুদ্ধ ভেঙে পড়েছিল মেয়ের দল, সিঁদুর দিতে আর প্রসাদী সিঁদুর নিয়ে যেতে।

এ সবই বলেছিলেন সতীশবাবু। কিন্তু বুড়োর কি হ'ল তা বলতে পারেন নি।

কাশীতে পৌঁছে আগে ঐ বাড়িতেই গেলুম। দেখলুম সে ঘরে একটি মোটাসোটা বিধবা বাস করছেন—যে ঘরে ঠাকুর্দা থাকতেন। তিনি কিছু বলতে পারলেন না। ওপরে প্রয়াগবাবুরাও নেই, প্রয়াগবাবু মারা গেছেন, তাঁরা এখন সব ওঁর বড় ছেলের কর্মস্থল কানপুরে চলে গেছেন। লক্ষ্মীবাবুর সঙ্গে আমার খুব একটা পরিচয় ছিল না—তবু অগত্যা তাঁর কাছেই গেলুম।

লক্ষ্মীবাবু অবশ্য নাম বলতেই চিনতে পারলেন। ঠিকানাও দিলেন। তাঁর মুখেই শুনলুম, এতকাল পরে ঠাকুর্দার কে এক সম্পর্কে ভাইঝি-জামাই কাশীবাস করতে এসেছে—তারা খুব ঘেঁষ দেয় নি—এ পাড়ার সকলে গিয়ে বলতে নিহাৎ চক্ষুলজ্জায় পড়েই নিয়ে গেছে বুড়োকে। পীতাম্বরপুরায় থাকেন ভদ্রলোক, হীরেন চক্রবর্তী নাম, কোন সরকারী হাসপাতালের ডেন্টিস্ট ছিলেন, রিটায়ার ক'রে এখানে এসেছেন, দশাশ্বমেধের কাছে কোথায় বুঝি একটা চেম্বারও করেছেন—পেন্‌সনের টাকায় আর যা টুকটাক এখানে আয় হয় তাইতেই চলে।

খুঁজে খুঁজে পীতাম্বরপুরার সে বাড়িতে গেলাম পরের দিন।

অগেই ঠাকুর্দার সঙ্গে দেখা হ'ল। বাড়িটার পথের ওপরে যে ঘর তাতে একটা নিরাবরণ তক্তাপোশ পাতা—অর্থাৎ বাইরের ঘর সেটা, তার পিছনে অন্ধকূপের মতো ঘর—দিনের বেলায় কিছুই ঠাওর হয় না ঘরে কি আছে বা কে আছে—সেইটেই নির্দিষ্ট হয়েছে রমেশ ঠাকুর্দার জন্যে। সেই ঘরের রকে থুম হয়ে বসে আছেন বৃদ্ধ। চিনতে পারলুম আদল দেখে—নইলে চেনার উপায় নেই বিশেষ, আরও রোগা আরও বুড়ো হয়ে গেছেন।

আমায় দেখে, বা বলা উচিত আমার গলা শুনে, সেই প্রায়-দৃষ্টিহীন চোখও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'কে নাতি, আয় আয়। বোস।' বললেন, কিন্তু বসব কোথায়? সেই

ভেবেই তাড়াতাড়ি মেঝেতে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাইরের ঘরে এনে বসালেন। তারপর--কোন কিছু কথা কইবার কি কোন প্রশ্ন করার আগেই ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন।

কী সান্ত্বনা দেব বৃদ্ধকে—কিছুই ভেবে পেলুম না। তাই হাত ধরে পাশে বসিয়ে নীরবে হাতটাই ধরে রইলুম শুধু।

অবশ্য নিজেই শান্ত হলেন, প্রায় তখনই।

সব জানতেও পারলুম অবস্থা। এঁরা বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছেন বটে—লোকগঞ্জনা এড়াতে না পেরে—হাঁড়িতে দিতে পারেন নি। ভাইঝি নাকি স্পষ্টই বলে—''বাপ-মা ভাইদের ফেলে স্বার্থপরের মতো চলে এসেছিলেন, ওঁর সঙ্গে আমাদের কিসের সম্পর্ক? তখন মনে ছিল না যে আত্মীয়দের কখনও দরকারে লাগতে পারে!'

সুতরাং ছত্তরে খেতে যেতে হয় প্রত্যহ!

তবু এই কাছেই নাটকোটার ছত্রে ব্যবস্থা হয়েছে তাই। খুবই কষ্ট হয়, যাবার সময় যতটা না হোক, আসবার সময় যেন দম বেরিয়ে যায়। যেদিন শরীর খারাপ হয় যেতে পারেন না, সেদিন খাওয়াই হয় না।

রাত্রে দয়া ক'রে এরা দুখানা রুটি দেয়, আর ডালের ওপরকার জলটা, তাতেই ভিজিয়ে চটকে খান। ঐ ঘরে পড়ে থাকেন, বিছানার চাদর কি বালিশের ওয়াড় কি পরনের ধুতি—ঝিটা দয়া ক'রে এক একদিন কেচে দেয় তাই। নইলে তেল-চিটচিটে বিছানাতেই পড়ে থাকতে হয়।....ঘরে আলো নেই, সেটা বলেই অবশ্য তাড়াতাড়ি বলেন, 'আমারই বা আলোতে কি হবে বল, চোখে দেখতে পাই না—পড়াশুনো করার তো জো নেই—আমার কাছে আলো থাকাও যা না থাকাও তাই।'

কাউকে দোষ দিলেন না ভদ্রলোক, কোন অনুযোগ কি বিলাপ করলেন না, যেটুকু জানতে পারলুম নিজে খুঁচিয়ে প্রশ্ন ক'রে। কারও সম্বন্ধেই কোন নালিশ নেই, বিধাতার সম্বন্ধেও না। বললেন, 'যেমন করেছি—জীবনকে যেমন চালিয়েছি তেমনিই তো হবে—এর চেয়ে ভালো আর কি হ'তে পারে বল।... যে কাঠ খাবে তাকে আংরাই নাদতে হবে। এ সবই ভেবে দেখা উচিত ছিল। এখন আর হায় হায় ক'রে কি হবে?... বরং ভগবানকে একটা ধন্যবাদ দিই--দয়াই করেছেন তিনি—বামনীকে আগে নিয়ে নিয়েছেন। কিছুই তো পেলে না জীবনে কোনদিন—তবু মরার পর রাজরাণীর মতো যে যেতে পারল—শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে, পাড়া ভেঙ্গে লোক এসে সতীসাধ্বী বলে পায়ের ধুলো নিয়ে গেল—এতেই আমি খুশী। আমার দুঃখকষ্ট সওয়া আছে ঢের—আমার সইবেও, কিন্তু তাকে রেখে গেলে বড় বাজত। ঐ হাত শুধু-ক'রে বিধবা হয়ে পরের লাথি ঝাঁটা খেয়ে বেড়াতে হ'ত--কথাটা ভাবলেই আমার বুকের মধ্যে কেমন করে। বেশ গেছে সে, আমার খুব সন্তোষ এতে।'

আসবার সময় গোটা পাঁচেক টাকা দিতে গেলুম—ঠাকুর্দা নিলেন না। বললেন, 'কী করব বল টাকা নিয়ে? দোকানে গিয়ে কিছু কিনে খেয়ে আসব সে ক্ষ্যামতা তো নেই দেহে! উলটে আমার হাতে টাকা দেখলে এরা ভাববে আরও ঢের লুকনো টাকা আছে কোথাও—আমি মানি না। যেটুকু দয়াধম্ম করে সেটুকুও আর করবে না। ও থাক্। আমার দিন চলেই যাবে। আর কতদিন রাখবে ভগবান, একদিন না একদিন তো যমের মনে পড়বেই। হ্যা— —।

হাসি আর আসে না—হাসির ভঙ্গী করেন শুধু।

এর অনেকদিন পরে ঠাকুর্দার খবর পেয়েছিলুম আবার। মৃত্যু সংবাদ।

শেষটা নাকি পক্ষাঘাতের মতো হয়েছিল, ওরা কোনমতে একটা হাসপাতালে ফেলে দিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, কেউ যেতও না, খবরও নিত না। শেষে তারা ভৈরবী বলে কে এক সন্ন্যাসিনী এসে সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রেখেছিল, সেবাও করেছিল খুব। তবে তার পর আর ঠাকুর্দা বেশীদিন বাঁচেন নি, অল্পেই রেহাই দিয়ে গেছেন ভৈরবীকে।

ভৈরবী নাকি তাঁকে বলেছিল, আমার কাছ থেকেই খবর পেয়ে নিতে এসেছিল তাঁকে, তার সঙ্গে নাকি আমার দীর্ঘকালের পরিচয়।

এ কথা বলার রহস্যটা কি—আমার কোনদিনই আর জানা হয়ে ওঠে নি। যদি কোন দিন ওর সঙ্গে দেখা হয়—জিজ্ঞাসা করব।

দূরের জানলা



উৎসর্গ

বাঁশীকে

দিদা

॥ ১ ॥

গাড়িখানা লাল ধুলো উড়িয়ে যেন একটা আঁধি তুলে সামনে দিয়ে ঢালু রাস্তাটা ধরে নেমে গেল। পার্বতী কপিকলের দড়িটার টান থামিয়ে বেশ খানিকটা হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওই উড়ন্ত ধুলোর দিকে। এখন কোন্ দিক থেকে এল এ গাড়ি?

ওদিকেই বা গেল কেন? 'সর্বেশ্বরীর মন্দির' দেখতে যারা আসে-টাসে, দামী দামী গাড়ি-চড়া বাবুসায়েবরাও আসে, তারা তো ওই গোল পাথরটার পাশ দিয়ে ডাইনে বাঁক নিয়ে চলে যায়, এদিকে যাবে কেন?

পার্বতীর সন্দেহ হল, তাড়াহুড়ো করে টাইমের আগেই এসে যায়নি তো সায়েব? কিন্তু তাই কি সম্ভব? পার্বতী মনে মনে হাসল, সায়েব-মেমসায়েবরা তো ওই ক্যালেন্ডার আর ঘড়ির চাকর! এক মিনিটের এদিক-ওদিক হবার জো আছে নাকি ওদের? বিশেষ করে সরকারী সায়েবগুলোর? ওদের আসা-যাওয়ার দিনক্ষণ সবই তো আগে থেকে সরকারের খাতায় লেখা হয়ে থাকে। যেমন, আরও একটু হাসল পার্বতী, যেমন বিধাতাপুরুষের কলমকাঠিতে মানুষের সারাজীবনের ললাটলিখন লেখা হয়ে যায়।

নাঃ, সরকারী সায়েবের নয়, অন্য কোন ট্যুরিস্ট সায়েবের গাড়ি-ফাড়ি হবে। কারণ নন্দ কাজে যাবার সময় ডাকবাংলোর চাবিটা দিয়ে বার বার করে বলে গেছে পার্বতীকে, বিকেল পাঁচটার গাড়িতে এসে যাবে সায়েব-মেমসায়েব, মনে রাখিস। তার আগে যেন ডাকবাংলো সাফসুৎরো হয়ে যায়, গোসলখানায় জল থাকে।

বিকেল পাঁচটা। তার মানে এখনো সাত ঘণ্টা সময় হাতে। এখন মাত্র বেলা দশটা, গাড়ি-বাড়ির জল দেওয়া সেরে এখন নিজের সংসারের জন্যে জল তুলতে এসেছে পার্বতী রাস্তার ইঁদারা থেকে। অনেক দিনের পুরানো ইঁদারা, এই শহরে যখন নাকি নবাবী রাজত্ব ছিল তখনকার। নবাব-টবাবরাই জনসেবার উদ্দেশ্যে ইঁদারা কাটিয়ে দিয়েছিল।

এখনকার সরকার বাহাদুরও রাস্তায় রাস্তায়, টিপ্‌কল বসিয়েছেন, তবে তার বেশীরভাগই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। কোনটায় জলের বদলে বালি ওঠে, কোনটায় কিছুই ওঠে না—যা ওঠে সেটা একটা ভাঙা যন্ত্রের আর্তনাদ। কোন-কোনটা আবার কবন্ধ-মূর্তিতে বিরাজিত, হ্যান্ডেলগুলো কে বা কারা খুলে নিয়ে চলে গেছে শেয়াল তাড়ানোর মহৎ উদ্দেশ্যে।

আগে এই টাউনটা বাংলাদেশের ম্যাপের মধ্যে ছিল, দেশভাগের পর সীমানা নির্ধারণ নিয়ে যখন লাঠালাঠি চলল, তখন একে বিহারের মানচিত্রের মধ্যে টেনে আনা হয়েছিল।

পার্বতী এখানকারই মেয়ে। ওই লাল ধুলোতেই তার দেহমন গড়া, কিন্তু এখন পার্বতী বাঙালী কি বিহারী সেটা স্থির করা শক্ত। সেটা কি ওই মানচিত্র বদলের ফলশ্রুতি, না পার্বতীর স্বকৃত কর্মের ফল?

বাঙালীর মেয়ে পার্বতীর রেশন কার্ডে নাম কেন পার্বতী রাউত হতে গেল?

কিন্তু সে যাক, ওসব তো পূর্ব ঘটনা, এখন পার্বতী একটু চিন্তায় পড়ল, যদি গাড়িটা সরকারী সায়েবেরই হয়!

আকাশের দিকে একবার তাকাল পার্বতী, যদিও সেটা রাক্ষসের মত খাঁ-খাঁ করে

আগুন ছড়াচ্ছে, তবু এখন যে বেলা দশটার বেশী নয় সেটা জানা হয়ে গেছে। মিশন ইস্কুলের পেটা ঘড়িটায় এই এক-দু মিনিট আগে ঢং ঢং করে দশবার হাতুড়ি পেটা হল।

বালতি দুটো ভরে নিয়ে দু-হাতে চেপে ধরে শক্ত পায়ে ইঁদারার উঁচু পাড়টা থেকে নামল পার্বতী ভাঙাচোরা সিঁড়ি ক'টা ধরে। সেই নবাবী আমলের সিঁড়ির ভগ্নাবশেষই এখনো কাজ চালাচ্ছে, খানিক চুন-সুড়কি মেখে ভাঙা ইটগুলো বসিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে, এমন অনাসৃষ্টি চিন্তা কারো মাথাতেই আসে না।

নন্দ রাউত নিচে দাঁড়িয়েই ভরন্ত বালতিগুলো হিচড়ে হিঁচড়ে টেনে নামাতে পারে, কারণ নন্দর দৈর্ঘ্যটা বেশ পুরুষোচিত, কিন্তু পার্বতী বেচারার নামটাই ভার-ভারিক্কী, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে একেবারে টুনিপক্ষী সমগোত্র। তবে পাড়ার লোক পার্বতীকে টুনি বলে না, দু-চক্ষের বিষ দেখে। তাদের মতে পার্বতী ঢলানি, ঢঙিনী, লোকমজানি।

অবিশ্যি কথাটাকে মিথ্যেই বা বলা যায় কী করে? যে মেয়ে বাপের আড্ডার ইয়ার একটা প্রায় বাপের বয়সী লোককে মজিয়ে বাপের একগলা ঋণ শোধ করিয়ে নিতে পারে বিয়ের লোভ দেখিয়ে, সে কী সোজা ধুরন্ধর!

তাও লোকটা বাঙালী নয়, বেহারী। অবিশ্যি বাংলা কথায় এবং বাঙালীসুলভ আচার-আচরণে সে এখন বাঙালীর কান কাটতে পারে, তবু মূল শেকড়ের ইতিহাস তো আছেই! পার্বতীর শ্বশুরকুলের অন্য সকলকে দেখলেই তো হয়ে আসে পার্বতীর পিতৃকুলের।

পার্বতীর মা পার্বতীর বাপকে সুবিধে পেলেই দোষে, কিন্তু পার্বতী বাপকে আগলায়। বলে, কেন, এতে আমার অসুবিধেটা কী হয়েছে শুনি? বয়েস বেশী বলে কি ও খাটতে অপারগ? রোজগার করতে পারে না? বরং ডবল করতে পারে। ওপারটাইম খাটে অসুরের মতন। একটা চ্যাঙড়া ছোঁড়া বর হলেই বা আমার কী চারখানা হাত-পা বেরোত? বরং তিনি হয়তো বয়েসের দেমাকে আমায় তুচ্ছজ্ঞান করতেন। এ আমি বেশ আছি বাবা, বিদ্ধস্য যুবতী ভার্যা হয়ে!

মা বলে, মরণ! যেমন বাপ তেমনি বেটি, মুখের খিল ছিটকিনি নেই। বলে, আবার অভাব পড়লেই মেয়ের কাছে ছুটে আসে। কালও এসেছিল। পার্বতী ঘর থেকে চাল, গম, গুড়, দুটো টাকা দিয়ে বিদায় করেছে মাকে।

সরকারী সায়েব আসছে ডাকবাংলোয়, এটা একটা আশ্বাসের কথা। টাকা মেলে প্রচুর। নন্দ বলেছে, এখন চলবে কিছুদিন কাজ, জরিপ হবে নতুন করে, বিশ বছর পরে আবার জমি নিয়ে ছটাকের হিসাব চলছে, দু-পক্ষই দাঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে মুখিয়ে আছে। একটু উনিশ-বিশ হলেই হয়।

তা সেই হিসেবটা ঠিক করবে কে? এই দ্যাখ, মুখার্জি সায়েব আসছে কেন তাহলে! সার্ভে অফিসার এন. সি. মুখার্জি?

পার্বতী ব্যাপারটা অনুধাবন করে ফেলে বলেছিল, সায়েবের তো তাহলে বিপদের ভয় আছে!

ভয় বলে ভয়! নন্দ হাতের বিড়িটায় শেষ টান দিতে দিতে অবলীলায় বলেছিল, রীতিমত রিস্কির কাজ, খুন হয়ে যাওয়াও আশ্চর্যি নয়।

পার্বতী আরো জিজ্ঞেসাবাদ করতে চেষ্টা করেছিল খুন কেন হবে বলে। নন্দ রেগে উঠেছিল, ও তুই বুঝবি না বাবা, তোর মাথায় ঢুকবে না। ও নিয়ে তোর এত চিন্তাই বা কেন? আমি তো খুন হতে যাচ্ছি না!

আশ্বাসটা দিয়েছিল বটে নন্দ. তবে এখন সে যে-ভঙ্গীতে ছুটে এল, তাতে মনে হওয়া বিচিত্র নয়, খুনই হতে বসেছে সে।

।২।।

পার্বতী তখন সবে ভিজে কাপড় মেলে দিয়ে শুকনো শাড়ি ব্লাউজ পরে চুল আঁচড়ে টিপ পরে জনতা-স্টোভটা জ্বালিয়েছে চায়ের জল চাপাবে বলে, হন্তদন্ত মূর্তিতে ছুটে এল নন্দ, সব্বোনাশ হয়ে গেছে বাতি, সায়েব এসে গেছে।

পার্বতীর ডাকনাম বাতি, প্রথম প্রথম নন্দ আদর করে বলত মোমবাতি, এখন আর অত আদর নেই। তাছাড়া এই সব্বোনাশের মুহূর্তে তো আদরের প্রশ্ন উঠতেই পারে না!

পার্বতী স্টোভের কানটা মুচড়ে কমিয়ে দিয়ে বলে, এয়েছে তো? আমি ঠিক ধরেছি!

তুই আবার কী ধরলি? নন্দর কণ্ঠে সন্দেহ-মিশ্রিত বিস্ময়।

এই যে একটু আগে যখন ইঁদারার পাড়ে জল তুলছি, দেখি বোঁ করে একখানি গাড়ি চলে গেল ডাকবাংলোর মাঠের দিকে। তখনই সন্দ হল, সায়েব এসে গেল না তো হুট করে!

নন্দ খিঁচিয়ে উঠে বলে, সন্দ হল তো আবার আয়েস করে পাঁড়ি পেতে বসে চা বানাতে লেগেছিস কেন? ছুটে যেতে পারিসনি চাবিটা নিয়ে?

বাপের বয়সী বলে যে পার্বতী নন্দকে খুব একটা সমীহ করে চলে তা মনে করবার হেতু নেই, কাজেই সে তার নিজস্ব পদ্ধতিতেই মুখঝামটা দেয়, লেগেছিস কেন! ওরে আমার কে রে! নিজে পই-পই করে বলে যাওয়া হল না বিকেলবেলা আসবে সায়েব!

আর এই যে বললি আসতে দেখেছিস!

দেখেছি আবার কখন বললাম? গাড়িটা দেখে সন্দ হল সেটাই বলেছি।

তা সেই সন্দর জন্যেই যাওয়া দরকার ছিল।

আহা রে আমার গোসাঁই ঠাকুর, দরকার ছিল! বলি সময়ের ভাত রাঁধার দরকার ছিল না? ঘরে ফিরে যখন দেখতে পরিবার কাক কান নিয়েছে সন্দ করে কাকের পেছনে ছুটেছে, ভাত রাঁধেনি, তখন?

তখন তোর গুষ্টির পিণ্ডি! যা এক্ষুণি, চাবি নিয়ে ছুটে যা।

পার্বতী কিন্তু এই অধীরতাকে গ্রাহ্য করে না, চায়েব জল চাপিয়ে দিয়ে দুধ-চিনি কাছে গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলে, মালির কাছে তো চাবি আছে!

আছে বলে তুই নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকবি? বলি মালি কি মেমসায়েবের খিদমদগারি করতে পারবে?

পারবে না! পার্বতী হি-হি করে হেসে বলে, মূর্ছো গিয়ে পড়ে থাকবে!

দেখ্ পার্বতী, মেজাজ চড়িয়ে দিসনি, তুই যাবি কি না এক্ষুণি! না যাস তো ওই কেটলির গরম জল গায়ে ঢেলে দেব।

দাও না। পার্বতী বিশেষ একটি মুখভঙ্গী করে বলে ওঠে, জীবনভোর পুড়ে মরার থেকে একদিনে পুড়ে মরি।

হুঁ! খুব বোলচাল শিখেছিস। বাপের দুর্দশার কথা ভুলে গেছিস, কেমন? নেমকহারাম আর কাকে বলে?

নন্দর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, ঠিক আছে যাসনে। দীনেশের পরিবার গিয়ে পড়ে কাজ করুক। আমি চললাম, ডিউটির টাইমে চলে এসেছি। ট্যুরে এসে সায়েব যদি অসুবিধেয় পড়ে, একধার থেকে সব অর্ডারলীর ব্যাড রিপোর্ট লিখে দেবে তা মনে রাখিস। চললাম, আমার ভাত রাখিসনি।

কেন, ভাত আবার কী অপরাধ করল?

খিদে নেই। বলে গটগট করে বেরিয়ে যায় নন্দ।

কিন্তু পার্বতী এ রাগে ভয় খায় না। কারণ পার্বতী লোকটার হাড়-হদ্দ জানে। জানে আবার ফিরে আসবে ও। আর এবার খোশামোদের পথ ধরবে।

বাস্তবিকই মাথা গরম করে ফেলে কাজ পণ্ড করবার ছেলে নন্দ নয়। নন্দ জানে সায়েব দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে গোলাম বনে যেতে হয়। তা সে যে বিভাগেরই সাহেব হোক। আর এও জানে সাহেবের সঙ্গে যদি বিবি থাকে, তাহলে নহলাকে দিয়ে তার গোলামী করিয়ে নিতে হয়। বিয়ে করে ইস্তক নিজস্ব নহলাটিকে ওই কাজে লাগাবার তালেই আছে সে। নচেৎ বৌয়ের দেওয়া চায়ের পেয়ালা ফেলে নন্দর সরকারী সায়েবের তত্ত্বাবধান করতে ছোটবার কথা নয়। নন্দ ডাকবাংলোর ভারপ্রাপ্ত কেয়ার-টেকার নয়। তবে নন্দ দায়িত্বটা নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছে বলে আসল কেয়ার-টেকার নিশ্চিন্ত থাকে।

পার্বতীর অনুমানই ঠিক হল, গটগট করে খানিকটা গিয়েই আবার ফিরে এল নন্দ, বলে উঠল, চা খাওয়া হল?

পার্বতী দুটো মোটা মোটা কাঁচের গ্লাসে দু-গ্লাস চা ঢেলে তার উপর দুটো এনামেলের বাটি চাপা দিয়ে দুটো আলু-পিঁয়াজ কুটতে বসছিল, নন্দকে দেখে একটা গ্লাস ওর দিকে ঠেলে দিয়ে অন্যটা নিজের হাতে তুলে নিল।

নন্দ অবশ্যই প্রীত হল, তবু মুখে রাগের ঠাট বজায় রেখে বলল, আমার জন্যে চা বানিয়েছিস যে? আমি কোনদিন আসি এ সময়?

পার্বতী চায়ে ফুঁ দিতে দিতে বলে, তোমার জন্যে কে বলল? অন্য লোকের জন্যে বানিয়েছিলাম, নেহাৎ তুমি এসে পড়লে তাই!

নন্দ যেন হালে পানি পায়, হাসি-হাসি মুখে বলে, আড়ালে আড়ালে চোরাই কারবার চালাতে শিখেছিস বেশ করেছিস, এখন কাজের কথায় আয়। চা-রুটি তো মারলি, যা দিকি এইবার এক ছুটে। বলে আয় তুই-ই থাকবি, যেন অন্য লোকের চেষ্টা না করে।

পার্বতী মুখ ঝুলিয়ে চোখ কুঁচকে নাক তুলে বলে, তা করুক না চেষ্টা। আমার অত সায়েববাড়ি ভাল লাগে না।

সায়েববাড়ি ভাল লাগে না তোর!

না।

নন্দ এবার রোখালো গলায় বলে, বাজে বকিসনি পার্বতী, সায়েববাড়ি ভাল লাগে না তো সায়েববাড়ির মতন বিছানার সাধ হয় কেন? ফুলকাটা চাদর, ঝালরদার বালিশ, মোটা গদি, বলি এসব আমাদের ঘরে মানায়?

পার্বতী মুচকি হেসে বলে, কেন মানাবে না? যদি আমায় মানায় তো, ওই বিছানা কোন্ ছার!

ওঃ, ছুঁড়ির দেমাক দেখ! নন্দ একটু কাছে এসে বলে, তা বলেছিস মিথ্যে নয়, আমার

ঘরে তোকে মানায় না। তুই ওই সব অফিসার সায়েবদেরই যুগ্যি। কিন্তু কপালে নেই রে! তা কী আর করবি—

পার্বতী হেসে উঠে বলে, ইচ্ছে হলে কী না করতে পারি! সায়েবের ঘরেই গিয়ে উঠতে পারি।

নন্দ গম্ভীর হয়, তা—তাই যা তাহলে।

যাবই দেখো একদিন! তোমার ওই মেমসায়েবের মন-যোগানী করতে ঠেলে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া বেরোবে!

মেমসায়েব মন রাখতে যেতে বলি আমি, সায়েবের নয়।

ওই একই হল! সায়েব দেখতে পাবে তো?

দেখলে অমনি তোতে মজে যাবে! নন্দ বিরক্ত হয়, কেবল বাক্‌চাতুরী! যাবি তো যা, এতক্ষণে বেণী হয়তো ওর বেধবা বোনটাকে পাঠিয়ে দিল!

দিল আর অমনি সে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিল! বলি ঐশ্বয্যির মধ্যে তো মেমসায়েবের পেটিকোট কাচা, আর মেমসায়েবের ঘর মোছা। এই তো! এই ঐশ্বয্যি হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে বুড়ো মলো।

বুড়ো বলে এত আক্ষেপ তো মরতে বে করেছিলি কেন? বাপের ধার-দেনা শুধতে—

হঠাৎ কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘরে তালা লাগায় পার্বতী, তারপর পায়ে রবারের চটিটা গলিয়ে চাবির রিং আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে রোদে বেরিয়ে পড়ে নন্দকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। যেন সামনে কোন মানুষই নেই।

নন্দ একটুক্ষণ গুম্ হয়ে তাকিয়ে দেখে বটে, তবে মনটা নিশ্চিন্ত করে নিজের কাজে চলে যায়। বরাবর দেখেছে রাগিয়ে দিলেই পার্বতীর কাছ থেকে সহজে কাজ আদায় করা যায়।

খাঁ-খাঁ রোদ্দুরে পার্বতী যখন ঢালু পথটা দিয়ে নেমে যাচ্ছে, তখন একবার নন্দ ওকে দেখতে পেল নিজের পথ থেকে। লাল ধরনের ছাপা শাড়ি মোড়া ওর ছোট্ট দেহটা যেন দূর থেকে একটা তিরতিরে পাখির মত দেখতে লাগছে।

হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল নন্দর, যেন পাখিটা ওর হাত থেকে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেছে। এ রকম কেন হল বুঝতে পারল না নন্দ। বুকটা এমন খালি-খালি লাগার কারণ কি? তারপর ভাবল অত দূর থেকে বোধহয় কোনদিন দেখেনি পার্বতীকে। সত্যি অত ছোট্ট ও নয়, তাই। বেচারী! এই রোদে নন্দ ওকে অতখানি পথ ঠেলে পাঠাল। পার্বতীকে একটা বেঁটে ছাতা কিনে দিলে হয়!

নন্দর যেন অনুতাপ হতে থাকে এতদিন কিনে দেয়নি বলে। নাঃ, নন্দ অমন রূপসী যুবতী বৌটার জন্যে তেমন কিছুই করে না। পায়ের তলায় ফোসকা পড়ে যায় বলে রেগে-মেগে একদিন জল তুলতে বেরোয়নি পার্বতী। সেইদিন একজোড়া রবারের চটি এনে দিয়েছিল নন্দ, তাও এনে শুনিয়েছিল, হল এইবার বাবুয়ানার শুরু! চটি হয়েছে, এইবার ব্যাগ হবে, চশমা হবে, আরো কত কি হবে!

পার্বতী কিন্তু রাগ করেনি। হেসে ফেলে বলেছিল, হবেই তো! হবে না তো কি, তোমার মতন চিরকাল ওই এক সাজ করে কাটাতে হবে? আহা, সাজের কী ছিরি! বালিশের খোলের মত একটা পায়জামা, আর ঢোলা এক হাফ-হাতা শার্ট! লোকে কত পেন্টুল-ফেন্টুল পরে—

পেন্টুল পরা বরই একটা দরকার ছিল তোর, কেমন? বলে নন্দও হেসেছিল।

॥ ৩ ॥

নন্দ এই সার্ভে অফিসের একজন পুরনো খিদমদ্গার। নন্দকে ফিতে হাতে জমি মাপতে দেখা যায়, অফিসারদের তলপী বইতে দেখা যায়, আবার নন্দকে তাঁবু খাটাবার তদারকি করতেও দেখা যায়। নন্দর নিজস্ব কাজ বাদেও নন্দ সব সময় অন্যদের কাজে নাক গলায়। আসল কথা, অফিসারদের কাছাকাছি আসতে পারার কোন সুযোগই নন্দ সাধ্যপক্ষে ছাড়ে না।

পার্বতী এক-একসময় রেগে আগুন হয়। বলে, অত খোশামুদি করে বেড়াবার তোমার দরকার কি শুনি? সায়েবরা কি তোমায় রাজা করে দেয়? লাভের মধ্যে কী, না নন্দর মতন উপকারী লোক হয় না! নন্দ না থাকলে আমরা চোখে অন্ধকার দেখি—এইটুকু বাক্যির বকশিশ! এই তো?

কথাটা অবশ্য তা নয়, সাঁশালো বকশিশও যথেষ্ট সংগ্রহ করে নন্দ, তবে সে কথা বলে না পার্বতীর কাছে। বলে মাইনে বেড়েছে।

লুকিয়ে বেশ কিছু জমাচ্ছেও। লুকোনোর দরকার, নন্দ জানে মেয়েমানুষ হচ্ছে চিলের জাত। টাকা একবার দেখতে পেলে হয়, চিলের মত ছোঁ দিয়ে নিতে চাইবে। তায় আবার পার্বতীর মতন শৌখিন মেয়েমানুষ!

পার্বতী চৌকিতে ভাল বিছানা পেতে ঘরের শোভা করতে চায়। পার্বতী কাঠখুঁটের ভয়ে জনতা জেলে রাঁধতে চায়। পার্বতী কলাই-করা শানকির বদলে কাচের প্লেটে ভাত খাওয়া চালু করতে চায়। আর পার্বতী যেটা চায় সেটা করে ছাড়ে। অতএব বাড়তি টাকা দেখলেই যে পার্বতী দু-হাতে ওড়াবে তাতে আর সন্দেহ কি! শখের প্রাণ মাঠ-ময়দান যে!

তবু আজ পার্বতীর ক্রমশ ছোট্ট-হয়ে-যাওয়া শরীরটার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে নন্দর মনটা কেমন হায়-হায় করে উঠল। আর নন্দর তাই মনে হল এবার থেকে পার্বতীকে খুব বেশি যত্ন-আদর করতে হবে।

তবে মেমসায়েবরা পার্বতীকে খুব পছন্দ করে থাকেন। যখনই যে মেমসায়েব আসুন, বুড়ী কি ছুঁড়ী, পার্বতী বলতে অজ্ঞান হন। আর যাবার সময় পার্বতীকে নিজেদের প্রসাদী শাড়ি ব্লাউজ কাচের চুড়ি রঙিন মালা দান করে যান।

ভাল ভাল জিনিসই! ভাল ছাড়া খারাপ তাঁরা পাবেনই বা কোথায়?

তা পার্বতীও তো কম ভাল নয়। ওর কাজ-কর্ম থেকে খুঁত বার করা শক্ত। পার্বতী বিবিদের জামা-কাপড় শুধু কেচে শুকিয়ে দেয় না, মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করে দেয়। ঘর-টর এমন ঝাড়-মোছ করে যে বেয়ারা-বয়রা হেরে যায়।

পার্বতী একদা কোন বিবির কাছ থেকে চূড়ো খোঁপা-বাঁধা শিখেছিল, সে শিক্ষা কাজে লাগায়, খোঁপা-বাঁধায় অজ্ঞ মেমসায়েবদের জন্যে।

এইসব গুণের জন্য পার্বতী সায়েব-বিবিদের খুব আদরণীয়। তাছাড়া একটি পরম গুণ পার্বতীর—মাত্রাজ্ঞান। মেমসায়েবরা যতই মাই-ডিয়ার হতে চান, পার্বতী মাত্রা হারায় না। সে ঠিক নিজের সীমারেখার মধ্যে স্থির থাকে। পার্বতী জানে বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। এ গুণটি বিশেষ গুণ, কারণ মেমসায়েবরা নিজেরা দৈবাৎ রসনা শিথিল করে

বসলেও, অধস্তন মানুষটা তার সুযোগ নিয়ে শিথিল হয়ে বসলে রক্ষে থাকে না!

পার্বতীকে ঢালু রাস্তায় মিলিয়ে যেতে দেখার পর নন্দ নিজের কাজে গেল, আর সেইখানে গিয়েই সেই ভয়ঙ্কর খবরটা পেল। রোদে হেঁটে-আসা নন্দর টাক-ধরে-আসা মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঝাপসা হয়ে এল।

মেমসায়েব নেই, শুধু সায়েব! আর কলকাতা থেকে ট্রেনে আসেননি সায়েব, এসেছেন রাঁচি থেকে গাড়িতে! তাই অসময়ে আবির্ভাব! কিন্তু চুলোয় যাক কারণ, সায়েব যে একা—এটাই তো সাংঘাতিক!

নিজের গালে ঠাই-ঠাই করে চড় মারল নন্দ আপন দুর্মতির জন্যে। পার্বতী যেতে চাইছিল না, নন্দই জোর করে পাঠিয়ে দিয়ে এল। মেমসায়েব নেই! তার মানে ডাকবাংলোয় সায়েব একা!

মালি ব্যাটা আছে বটে, কিন্তু সে তো এখন নিশ্চয়ই হঠাৎ সায়েবকে এসে পড়তে দেখে হৈ-চৈ করে কাজ লাগিয়ে দিয়েছে। হয়তো মুরগীর চেষ্টায় গেছে।

কী হবে ভগবান, কী হবে! নন্দ বুঝতে পারে না, ঠিক এই মুহূর্তে তার কোন কর্তব্য আছে কি না! ভেবে পায় না কি করবে! ছুটে চলে যাবে? গিয়ে পড়ে বলবে সায়েবের কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা দেখতে এলাম?

কিন্তু এদিকে যে তার নিজের কাজ পড়ে রয়েছে। এতক্ষণ কাজ কামাই দিয়ে চলে গিয়েছিল। অফিসের কাজে ত্রুটি করে জীবনের আর কোন কাজকে বড় করা সম্ভব কিনা নন্দর জানা নেই, তাই নন্দ ঘামতে ঘামতে কাজই করতে থাকে। কোথায় যেন হাতুড়ি ঠুকে কি কাজ হচ্ছে। নন্দর মনে হতে থাকে হাতুড়িটা তারই বুকে পড়ছে।

॥ ৪ ॥

হাতুড়ি পড়ল পার্বতীর বুকের মধ্যেও, যখন শুনল মেমসায়েব বলে কোন জীবের আগমন ঘটেনি। রোদে এসে পার্বতীর মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল, নিশ্বাসটা দ্রুত পড়ছিল, আর উত্তাপে সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন আগুন ফুটে বেরুচ্ছিল।

এই অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেই পার্বতী ডাকবাংলোর রসুইঘরে উঁকি দিয়ে মালিটার খোঁজ করলে, দেখতে পেল না। শুধু দেখল রান্নাঘরে এক বালতি জল বসিয়ে রেখে গেছে। রাত্রে খাবার কথা সায়েবের, হঠাৎ এখন এসে পড়ায় অবশ্যই লোকটা কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হয়েছে।

রসুইঘর থেকে এদিকে চলে এল পার্বতী, কিন্তু যেন বড় বেশী নিঃশব্দ লাগল জায়গাটা। এসেই শুয়ে পড়েছে নাকি মেমসায়েব? নচেৎ গলা নেই কেন? কোন একটা নতুন জায়গায় এসে পড়ে চুপচাপ থাকবে, মেয়েমানুষ তো এমন জাত নয়! সে হয় উচ্ছ্বসিত হবে, নয় অসন্তোষে মুখর হবে! হয় গোছাতে বসবে, নয় সব কিছু ছড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করে বসে থাকবে! তা ছাড়া ছেলেপুলেকে তো বকবেই। তার সঙ্গে তাদের বাপকেও।

কিন্তু এখন ডাকবাংলোয় বোধ করি ছুঁচ পড়লেও শব্দ হয়।

ছেলেপুলেরও তো ছায়া দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা কী? নেই নাকি? নাকি আনেনি? খোলা বারান্দায় বসে পড়ে পার্বতী একটু কাশল। কোন ফল হল না। পার্বতীর যেন গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল।

এখন বেলা সাড়ে এগারোটা, প্রচণ্ড রোদ্দুর যেন খাই খাই করছে। লম্বা বারান্দাটার লাল টুকটুকে সিমেন্টের ওপর সেই রোদ আগুন হয়ে জ্বলছে। শুধু তার নিচের দিকে জাফরির আড়ালটুকুতে একটু নক্শা কাটা ছায়া।

পার্বতী বিপন্ন চোখে তাকায়, দেখতে পায় সারি সারি তিনটে ঘরের মধ্যে দুটোর দরজায় তালা দেওয়া, তৃতীয়টির দরজায় ভারী পর্দা ঝুলছে। ওই পর্দার ওপারে এখন কোন্ লীলা চলছে কে জানে! পার্বতীর নিশ্বাস দ্রুত হল। হয়তো মেমসায়েবের মাথা ধরেছে, হয়তো সায়েবের কোলে মাথা রেখে যন্ত্রণার লাঘব করছেন মেমসায়েব, হয়তো সায়েব সেই ধরা মাথাটি সযত্নে ধরে আছেন।

দূরে কোথায় ইঁদারা থেকে জল তোলার শব্দ হচ্ছে, কোথায় যেন মহিষের গলার ঘণ্টি বাজছে। মাঝে মাঝে গরম বাতাস এসে গা ঝলসে দিচ্ছে।

কেয়ারি করা ফুলের-বেড়্-দেওয়া কম্পাউন্ডের ঠিক বাইরেই একটা লম্বা তেঁতুল গাছ ঝলসেও ঝিরি ঝিরি করে নাচছে। সেই নাচের ছন্দের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পার্বতী বারান্দা থেকে নেমে আবার রসুইঘরে নেমে যায়। সেখানে একই অবস্থা, মালিটা আসেনি।

মালিটার ওপর রাগে মাথা জ্বলে যায় পার্বতীর। আবার গা-টা ছম্ ছম্ করে ওঠে। একবার কাশে পার্বতী, তারপর উচ্চস্বরে ডেকে ওঠে, মেমসায়েব!

ডাকটা বোধ করি একটু বেশী তীক্ষ্ণই হয়, একটু বেশী সরু।

এবার ফল ফলে। ভারী পর্দাটা নড়ে ওঠে, তারপর সরে যায় একধারে, দরজার কাছে সায়েব এসে দাঁড়ায়।

পার্বতী তাকিয়ে দেখে সায়েবের মাথাটা প্রায় দরজার মাথা পর্যন্ত। যাকে বলে দীর্ঘোন্নত দেহ। পরনে ধবধবে পায়জামা, আর হাতকাটা গেঞ্জি, পায়ে স্যান্ডেল। চোখে চশমা এবং হাতে আঙুল-ঢোকানো একটা বই। শান্ত গভীর স্বরে উচ্চারণ করলেন, কে?

পার্বতীর গলাটা একটু কাঁপল, তবু পার্বতী সাহসের সঙ্গে বলে উঠল, আমি পার্বতী। আমায় মেমসায়েবের কাছে কাজ করতে পাঠিয়েছে।

মেমসায়েবের কাছে! সায়েবের কপালটা কুঁচকে ওঠে, কে পাঠিয়েছে?

পার্বতীর বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছিল, তবু পার্বতী স্পষ্ট গলাতেই বলল, আমার স্বামী।

পার্বতী যদি বলত আমি নিজেই এসেছি, তাহলে হয়তো পত্রপাঠ জবাব হয়ে যেত, দরকার নেই। কিন্তু ওই স্বামী শব্দটা দ্বিতীয় প্রশ্নের সৃষ্টি করল।

সায়েব বলল, নাম কি?

পার্বতী।

আরে না না। তোমার স্বামীর নাম কি?

পার্বতীর হঠাৎ ভারি রাগ হয়ে গেল। আরে না না মানে? পার্বতী এমনই একটা ফ্যালনা মানুষ যে তার নামটা জানাও একেবারে অপ্রয়োজনীয়? তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে 'আরে না না' বলবার মত? মুখ ফিরিয়ে বলল, নন্দ রাউত।

রাউত!

অস্পষ্ট একটা স্বগতোক্তি শুনতে পেল পার্বতী, দেখে মনে হচ্ছিল বাঙালী! পার্বতী ইত্যবসরে প্রশ্ন করে নিল, মেমসায়েবের সঙ্গে দেখা হবে না?

সাহেব একটু ভুরু কুঁচকে বলল, মেমসায়েব এসেছেন, একথা কে বলল?

আসেননি?

না!

তাহলে কাজের দরকার নেই?

না। মানে, এখানেই তো লোক রয়েছে একটা—সায়েবের কণ্ঠে করুণ-করুণ সুর। যেন । বেচারী কাজের প্রত্যাশায় এসেছে তাকে বিমুখ করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত।—আচ্ছা, কে জিজ্ঞেস করতে পারো যদি কোন কাজ থাকে। বলল সেই করুণ-ঘন কণ্ঠ।

পার্বতী হঠাৎ একটা বেয়াদবি করে বসে। তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠে, কাকে? ওই লিটাকে? গলায় দড়ি আমার!

সায়েব কিন্তু এই বেয়াদবিতে রেগে ওঠেন না, বরং সহজ গলাতেই বলে ওঠেন, তুমি া খুব ভাল বাংলা বলতে পারো! আচ্ছা ঠিক আছে। কাজ লাগবে না। শুধু যদি ওই লিটাকে বলে যাও চায়ের কী হল? অনেকক্ষণ হয়ে গেল—

এ মা! চা না দিয়েই বাজারে চলে গেছে লক্ষ্মীছাড়াটা! দেখাচ্ছি মজা! পার্বতীও এই গতোক্তিটুকু করে তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে নেমে যায়।

॥ ৫ ।

ান্নাঘরে এসে এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখে পার্বতী, কোথায় কি আছে। জায়গাটা পরিচিত, কাথায় কি থাকে বা থাকতে পারে জানা, তাই প্রথমেই স্টোভটা জ্বালে। এখানেও সেই নতা স্টোভ। এ যুগের পরম অবদান, কাঙালের ভগবান। গ্রামে-ঘরে যেখানে সেখানে ামান্য প্রয়োজনে বা হঠাৎ প্রয়োজনে কাঠ জ্বালানো ছাড়া গতি ছিল না, জনতা স্টোভ াতি এনে দিয়েছে।

জল গরমের কেটলিটা চাপিয়ে দিয়ে পার্বতী দেখে নেয় কোথায় দুধ-চিনি-চা। চা-চনিটা অবশ্য সাধারণ, দুধটা কনডেন্সড্ মিল্ক। কাল থেকে নিশ্চয় লক্ষ্মণ গোয়ালা দুধ দবে।

চা-টা বানিয়ে ফেলে পার্বতী, পেয়ালা ছাঁকনি সব ধুয়ে মুছে নিয়ে চা-টা ঢেলে নেয়। ারপর কাঁধে আঁচল টেনে সভ্যভব্য হয়ে ওই পর্দাটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে াক দেয়, আপনার চা!

ভেবেছিল এইটুকুতেই কাজ হবে। হলো না। সায়েব বোধহয় হাতের সেই বইটায় ুবে গেছে এতক্ষণে। অতএব আবার ডাকল গলা তুলে, বলল, চা হয়ে গেছে!

পার্বতীর গলাটা মিহি বলে জোরে কথা বললেই তীক্ষ্ণ শোনায়। এবার হঠাৎ হুট করে বরিয়ে এলেন সায়েব, তারপর অবাক হয়ে বললেন, এ কী, ও আসেনি? সেই লোকটা?

পার্বতী মাথা নেড়েই না-আসার খবরটা জানাতে পারত, তবু পার্বতী সৌজন্য করল। বলল, না সায়েব।

কী আশ্চর্য! আচ্ছা এই টেবিলে রেখে যাও, আমি আসছি। সায়েব বাথরুমের দিকে লে যান।

পার্বতী ঘরের মধ্যে ঢুকে একটুকরো কাগজ সংগ্রহ করে সেটা টেবিলের ওপর পেতে তার উপর পেয়ালাটা বসিয়ে রাখে। তারপর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে টেবিলের দিকে।

হ্যাঁ, অবাক হবার কারণ ছিল বৈকি। নিশ্চয়ই ছিল। পার্বতীকে তো এ ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সায়েব, কিন্তু এটা কী করে গেলেন? এটার মানে? এই একতাড়া নোট টেবিলে ফেলে রেখে যাওয়ার?

বই থাকতে পারে, চশমা থাকতে পারে, হাতঘড়িটা পড়ে থাকাও খুব আশ্চর্য নয়, এমন কি পার্সটাও ওই সব সঙ্গীদের সঙ্গে থেকে যেতে পারে দৈবাৎ, কিন্তু স্রেফ্ রবার-ব্যান্ডে আটকানো মোটা নোটের গোছার অর্থ কী!

পার্বতীর সততা পরীক্ষা করতে? কিন্তু কেন? পার্বতীকে তো রাখছে না সায়েব, তবে? মেমসায়েব নেই বলেই কি সায়েব এমনি আলা-ভোলা? তাহলেই তো হয়েছে আর কি! ওই চোট্টা দশরথ মালিটা তো সায়েবের সব ফাঁকা করে দেবে! দশরথকে তো চিনতে বাকি নেই পার্বতীর!

আহা, নির্ঘাত সাহেব প্যান্টের পকেটে রাশি রাশি টাকা রেখে দেবে, আর দশরথ মনের সুখে—। ভেবে হঠাৎ যেন বুকটা করকর করে ওঠে পার্বতীর। একটা সাঁতার-না-জানা লোককে জলে পড়ে যেতে দেখলে প্রাণের মধ্যে যেমন আকুলিবিকুলি করে তেমনি করতে থাকে পার্বতীর।

আবার হঠাৎ একটু রাগও হয়, এমনই যদি বেহুঁশ তবে উচিত হচ্ছে আগেই একজন হুঁশিয়ারের হাতে জান-প্রাণ সমর্পণ করে ফেলা।

ভাবনায় ছেদ পড়ল পার্বতীর, সায়েব এসে ঢুকলেন। ঢুকেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আরে, তুমি আবার কষ্ট করে, ইয়ে—দাঁড়িয়ে থাকবার কী দরকার ছিল, মানে ও তো এখুনি এসেই পড়বে।

পার্বতী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে একটু ব্যঙ্গ হাসির মত গলায় বলে ওঠে, এসে পড়বে বলেই তো চিন্তা! টেবিলে ওটা কী?

সায়েব তাকিয়ে টেবিলের ওপরকার জিনিসগুলো দেখে নিয়ে বলেন, টাকার কথা বলছ?

তাই তো বলছি। ও যদি এসে দেখতো কেউ কোথাও নেই, আর টেবিলে এত টাকা, তাহলে থাকত সবগুলো?

সায়েব চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে মৃদু হেসে বলেন, থাকবে না কেন?

কেন, সেটা কি আর আমি আপনাকে বোঝাব সায়েব?

মেমসায়েবদের আয়াগিরি করার সূত্রে সায়েবদের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস পার্বতীর যথেষ্ট আছে, এমন কি তাদের দাম্পত্যকলহে মধ্যস্থতা করবার সুযোগও পেয়েছে কখনও-সখনও, মেমসায়েবদের প্রশ্রয়ে।

তবে এখন শুধু সায়েব, এইজন্যেই গা-টা একটু ছমছমে লাগছে! অবশ্য চুপচাপ থাকলে সেটা যতটা হয়, কথা কইলে তেমন থাকে না। পার্বতী তাই কথার মধ্যেই শক্তি সঞ্চয় করে।

সায়েব চা-টায় চুমুক দিয়ে 'আঃ' উচ্চারণ করে বলেন, ভাল হয়েছে চা। কিন্তু তুমি যে বললে টাকা দেখলেই ওই লোকটা নিয়ে নিত, সেটা বলা উচিত হয়নি। মানুষকে অত অবিশ্বাস করতে নেই।

পার্বতী একটু বাঁকা হাসি হেসে বলে, না থাকলে নেই। আপনারা কত পাস-টাস করা পণ্ডিত মানুষ, আপনাদের কি আর আমরা—

সায়েব পেয়ালাটায় আর এক চুমুক দিয়ে তেমনি মৃদু হেসেই বলেন, তা এই তো পড়ে রয়েছে, তুমিও তো নিয়ে নিতে পারতে? কই, নাওনি তো?

পার্বতী কী একটা বলতে চেষ্টা করে, পারে না, চুপ করে যায়।

সায়েব আবার বলেন, তার মানে টাকা দেখলেই লোকে নিয়ে নেবে এ ধারণাটা ভুল! তুমি তো নিলেই না, বরং সাবধান করে দিচ্ছ, তবে?

পার্বতী একবার সায়েবের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায়, তারপর বলে, আমার গোস্তাকি মাপ করবেন সায়েব। বলে আবার ঘরে ঢুকে খালি পেয়ালাটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। এবার উঠোনে নেমে যাবে। হয়তো ইঁদারার কাছ থেকে ধুয়ে নিয়ে তুলে রেখে ও চলে যাবে।

সায়েব হঠাৎ ভারি একটা অস্বস্তি অনুভব করেন। মেয়েটাকে কিছু বখশিশ দিলে ভাল হত বোধ হয়। হয়তো তারই প্রত্যাশায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল।

চাঞ্চল্য অনুভব করলেন, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠোনে নেমে এলেন, দেখতে পেলেন পার্বতী চায়ের কাপ-ডিশটা ধুচ্ছে ইঁদারার পাড়ে। একটু ইতস্তত করে ডাকলেন, শোন!

পার্বতী বোধ করি ডাকের কারণটা অনুমান করে, সঙ্গে সঙ্গেই অনমনীয় হয়ে ওঠে সে। তবে সরে আসে।

সায়েব শার্টের পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে ওর দিকে এগিয়ে ধরে বলেন, তুমি তো চা-টা বানিয়ে আমায় খাওয়ালে, এই নাও তুমি মেঠাই খেও।

সায়েবের বোধ হয় ধারণা জন্মে গেছে পার্বতী রাউত হিন্দুস্থানী, তাই মেঠাই শব্দটাই ব্যবহার করেন।

পার্বতী অনমনীয় গলায় বলে, আমি মেঠাই-ফেটাই খাই না।

বাঃ, তাহলে যা খাও—

পার্বতী তীব্র গলায় বলে, একবাটি চা বানিয়ে দু'টাকা বখশিশ পাওয়া আমার অভ্যাস নেই সায়েব, ও আপনি আপনার ওই বিশ্বাসী মালিকেই দেবেন, খুশি হয়ে যাবে।

বলা বাহুল্য, সায়েব ঈষৎ অপ্রতিভ না হয়ে পারেন না। গম্ভীর গলায় বলেন, কিন্তু আমিই বা শুধু শুধু তোমার কাজ নেব কেন?

পার্বতীও গম্ভীরভাবে বলে, ঠিক আছে, তাহলে চার আনা পয়সা দিন। সেটাই ন্যায্য হবে। রেট বাড়াবেন না।

সায়েব একটু চকিত হন বৈকি। মেমসায়েবের আসা-না-আসার খবর না পেয়েই ছুটতে ছুটতে আয়ার চাকরির প্রত্যাশায় এসে দাঁড়িয়েছে অথচ বখশিশ নিতে হাত পাতে না, আবার জ্ঞান দিতে আসে---রেট বাড়াবেন না—এটা তো মজা মন্দ নয়! দু'টাকার জায়গায় চার আনা চায়, অদ্ভুত বটে!

সায়েব ওর দিকে তাকিয়ে দেখেন, সন্দেহ নেই যে রীতিমত সুশ্রী এবং চেহারায় বেশ মার্জিত ভাব, কিন্তু কাজ তো করতে এসেছে মেমসায়েবের আয়ারই। হঠাৎ সম্পূর্ণ অবান্তর একটা কথা বলে বসেন সাহেব, তুমি খুব বাংলা বলতে পারো তো? বাঙালীদের বাড়িতে—, একটু থেমে বলেন, বাঙালীদের অনেক কাছে থেকে শেখা, তাই না?

পার্বতী মুখ তুলে একটু হেসে বলে, আমি তো বাঙালীই। বাঙালীর মেয়ে।

ওঃ! আমি ভাবলাম—

সাহেব কী ভাবলেন পার্বতী সেটা শোনার আগেই দশরথ এসে দাঁড়াল। দশরথের হাতে বাজারে থলি। পার্বতীকে দেখে চকিত হয়ে বলে ওঠে, আরে, পার্বতী দিদি যে! আসি গিলা?

হ্যাঁ, গিলা! বলি এতক্ষণ কোথায় ছিলে বুদ্ধু?

বাজারে গেল না!

কেন, এখন বাজারে কেন রে? সায়েব আসবেন তুই জানতিস না?

দশরথ আস্তে রান্নাঘরের দরজা খুলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাবধানে বাজারের থলি বসিয়ে রান্নাঘরের শেকলটা ভাল করে টেনে বন্ধ করে দেয়। তারপর গলা নামিয়ে বলে, সায়েব তো বিফোর টাইম আসি গিলা!

অবশ্য গলা নামানোর দরকার ছিল না, কারণ সায়েব ততক্ষণে ঘরের মধ্যে চলেই গেছেন।

দশরথ গলা নামায়, কিন্তু কে জানে কোন্ মনস্তত্ত্বে পার্বতী গলা তীক্ষ্ণ করেই বলে, ওঃ, আবার ইংরিজি বুলি হচ্ছে! বিফোর টাইম! তা সায়েব বিকেলে আসবে বলে তুই বাজারটাও বিকেলে করবি? এখন কত বেলা হয়ে গেছে খেয়াল আছে? কখন রাঁধবি, কখন খেতে দিবি?

দশরথ তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, ভাত-মাংস, কেত্তো টাইম লাগবে?

ওঃ, বড্ড যে সাহস! মাংস রাঁধবি, সায়েব দাঁতে টেনে ছিঁড়তে পারবে না, তবেই তো বলি রান্না! কি বলিস?

দশরথ রাগ-রাগ মুখে ইঁদারার পাড়ে গিয়ে পা ধুতে ধুতে গজগজ করে যা বলতে থাকে তার নির্গলিতার্থ অর্থ হচ্ছে, তুমি আমার ওপর সর্দারী করতে এসেছ কেন হে? তুমি আমার মনিব?

কিন্তু মুখে বলে না সেকথা। শুধু চেঁচিয়ে বলে, মেমসায়েব তো ন আসিল।

জানি। পার্বতীও রাগ-রাগ মুখে রান্নাঘরের শেকল খুলে ভিতরে ঢুকে কী যেন দ্যাখে, তারপর চাপা উত্তেজিত স্বরে বলে, এই মুখপোড়া, এই জন্যে তোমার দু-মিনিটে রান্না হয়ে যাবে! ভাল হবে না বলছি দশরথ, এ তোদের পেট নয়!

দশরথ একেবারে কুঁকড়ে যায়। নরম গলায় পার্বতীকে কাকুতি-মিনতি করতে থাকে। কিন্তু পার্বতীকে যে এত জপাতে হবে তা বোধ করি ওর ধারণায় ছিল না। মনে মনে মুণ্ডপাত করতে করতে খোশামোদই করে দশরথ।

হেসে ফেলবার মত খোশামোদ। অগত্যাই 'আচ্ছা বাবা আচ্ছা' বলতে হয়। অগত্যাই হাসতে হাসতে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় পার্বতীকে।

আবার সেই রোদে ঝাঁ-ঝাঁ রাস্তা। এখন তাত আরো বেশী। কারণ সূর্য এখন কেন্দ্রবিন্দুতে। অতএব রোদের দাঁত এখন চরম হিংস্র মূর্তিতে। তবে রক্ষে এই, ফেরার সময় সূর্যের মুখোমুখি পড়তে হচ্ছে না, পিঠ ফিরিয়ে যেতে পারা যাচ্ছে। এখানে ঘাম নেই, শুধুই দাহ। পিঠটা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে শাড়ি-ব্লাউস ভেদ করে।

কিন্তু হঠাৎ এটা কী হলো? ঢালু পথটা পার হয়ে সমতলে ওঠবার মুখে একটা পাক খেয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল কেন পার্বতী?

ঘুরে দাঁড়িয়ে বোধ হয় এক মিনিট সময় শুধু চুপ করে থেমে রইল পার্বতী, হয়তো

কর্তব্য নির্ধারণ করল, তারপর আবার লাল-লাল মুখে তরতরিয়ে ঢালু পথটায় নেমে পড়ল। কিন্তু কেন? পিঠের বদলে মুখটা পোড়াতে?

॥ ৬॥

অথচ তখন ওর ঘরে প্রাণের মধ্যে আগুনের দাহ নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরছে নন্দ নামের আধবুড়ো লোকটা। শুধু প্রাণের মধ্যেই বা কেন, মাথার মধ্যেও তো আগুন জ্বলছে নন্দর! সেই যখন কর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছেছিল তখন থেকেই!

পার্বতীকে মেমসায়েব দেখিয়ে ঠেলে ডাকবাংলোয় পাঠিয়ে দিয়েই অফিসে এসে শুনল নন্দ, মেমসায়েব নেই, শুধু সায়েব। তার মানে পাহারা নেই, শুধুই চোর! আর সেই চোরের হাতে ইচ্ছে করে যথাসর্বস্ব তুলে দিয়েছে নন্দ!

পার্বতী যেতে চাইছিল না, আরাম করে একটু চা খেতে বসেছিল বেচারী, আর নন্দর দুর্মতি নিয়তি হয়ে—

অথচ আসলে নন্দর ও-বিষয়ে কোন ডিউটিই ছিল না। ডাকবাংলোর ব্যাপার ডাকবাংলোর মালির। একাধারে মালি-রাঁধুনী এবং কেয়ার-টেকার ওই দশরথটার দায়িত্ব লাঘব করে দিয়ে মুখ্যু বুদ্ধু নন্দ কি না—

মাথার মধ্যে আগুন জ্বললেও, কাজ বড় বালাই। বিশেষ করে সরকারী কাজ। অতএব সেই আগুন নিয়েই ডিউটি শেষ করতে হয়েছে নন্দকে, তারপর টিফিনের সময় চলে এসেছে। আসেই অবশ্য এ সময়, ভাত খেতে আসে।

ভাবতে ভাবতে আসছে, কে জানে মাগী কতক্ষণে ফিরেছে, রান্না তৈরি হয়েছে কিনা, আর সায়েব কি রকম লোক, কত বয়েস, সেটা জানতেও তাড়া। এসে দেখল কাকস্য পরিবেদনা। দরজায় তালা।

তালার দ্বিতীয় চাবিটা অবশ্য নন্দর কাছেই থাকে, রোদ লাগা অন্ধকার চোখটা বাঁচাতে তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে ফেলে ঢুকে তো পড়ল, তারপর দেখল অন্ধকারটা আর ঘুচছে না নন্দর, সমস্ত ভবিষ্যৎটাই সেই অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে।

সায়েবটা বদ তাতে সন্দেহ কি! বিকেলবেলা আসবার কথা, ট্রেনে আসবার কথা, তা নয় দুম করে এসে পড়া হলো হাওয়াগাড়ি চেপে। বদ মতলব না থাকলে এরকম করবে কেন?

বালতি করে জল ভরে রাখে পার্বতী ইঁদারা থেকে এনে। নন্দ এসে হাত-মুখ ধোয়, খায়, আঁচায়। সেই জল থেকে নন্দ মগ ভরে ভরে মাথায় থাবড়াল। কিন্তু তাতেই বা ঠাণ্ডা কোথায়? জলটাই তো গরম আগুন! মাটির কলসীর ঠাণ্ডা জলটা ঢালল এক ঘটি, মাথায় থাবড়াতে গেল, তারপর হঠাৎ হকচকিয়ে খেয়েই নিল জলটা। অতঃপর কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হয়ে গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ভেবে নিল কী কর্তব্য।

আবার তালা লাগিয়ে ডাকবাংলোর দিকে ছুটবে? কিন্তু গিয়ে কী করবে? যদি দেখে সায়েব ঘরে আটকে রেখেছে পার্বতীকে? নন্দ তখন কী করবে, সায়েবকে খুন করবে?

ভেবেই মনে মনে শিউরে উঠল নন্দ, কী সর্বনেশে চিন্তা! সেই যে কথায় আছে মনের অগোচর পাপ নেই, তা সত্যি! এই সায়েব? মানে ডেপুটি চিফ্, যিনি এখানের কাজকর্ম সম্পর্কে পরিদর্শন করতে এসেছেন, যিনি রিপোর্ট লিখবেন? ইশ!

কিন্তু দিনদুপুরে আটকে রাখবে? দশরথটাও তো রয়েছে! নন্দর মাথার মধ্যে ইঙ্গি চলতে থাকে।

যদি দশরথকে টাকা খাইয়ে এদিক-ওদিক পাঠিয়ে দিয়ে থাকে! নন্দ আবার আঙুলে কর গুনে ঘণ্টা-মিনিটের হিসেব করতে থাকে।

সাড়ে দশটা নাগাদ বেরিয়েছে পার্বতী, যেতে আধ ঘণ্টা। তার মানে এগারোট তারপর? মেমসায়েব নেই দেখে ফিরে আসতে আধ ঘণ্টা। তার মানে সাড়ে এগারোট আর এখন? এখন দেড়টা! এই দু'ঘণ্টা সময় কী হচ্ছে সেখানে?

ঠাণ্ডা জলের প্রভাব প্রায় উবে যাচ্ছে, তবু নন্দ শান্ত হয়ে ভাবতে চেষ্টা করতে থাে এমনও তো হতে পারে দশরথ একটু সাহায্য প্রার্থনা করেছে! দশরথের রান্না ে একেবারে অখাদ্য, যদি দশরথ—

তাহলে অবশ্য কিছুটা দেরি হতে পারে। কিন্তু কতক্ষণ? ওই দজ্জাল মেয়েমানুষটা কাছে একজনের রান্না আবার কী কাজ? তা হলেও সেই তুচ্ছর জন্যেও একটি ঘণ্টা সম ধার্য করে নন্দ। তবুও তো অঙ্কে মিলছে না!

অথচ দরজাটায় তালা লাগিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে যেতেও পারছে না নন্দ। বেরো গিয়েও কে যেন পিছন থেকে টানছে। কে? ভয়? সায়েবের ভয়? হয়তো সেটাই প্রধা তাছাড়াও আছে আর একটা ভয়। টিফিনের পর তো আবার অ্যাটেন্ডেন্স বুক-এ স করতে হবে। দেরি হয়ে গেলেই নাম কাটা!

হাত-বাঁধা-ঘড়িটার দিকে তাকাল নন্দ, আর আধ ঘণ্টা সময় হাতে আছে, এ ডাকবাংলোয় যাওয়া-আসা? এই পেট-জ্বলে-যাওয়া অবস্থায়? সম্ভব না। এত রোদ হলেও সম্ভব করার কথা ভাবা যেত!

তবে কি ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে একগাল খেয়ে অফিসই চলে যাবে? ওই ে সামনেই জনতা স্টোভ, একটা দেশলাইয়ের কাঠি ধরানোর ওয়াস্তা, আনাজপাতি আছে জলের সঙ্গে দিয়ে সেদ্ধ করে নিলেই তো—, দেশলাইটা হাতে তুলে নিল নন্দ

আর সেই সময় হঠাৎ পার্বতীর উপরই রাগে হাত-পা-মাথা জ্বলে উঠল। তুই-ই কেমন মেয়েমানুষ, মেমসায়েব আসেনি দেখেই ছিটকে চলে আসতে পারলি না? উঠো পা দেওয়া মাত্রই কিছু আর সাহেব তোকে ধরে ফেলতে আসেনি! বাচালের বেহদ্দ তে রঙ্গ করছে বোধহয় দশরথটার সঙ্গে! হতে পারে সায়েবেরও সঙ্গে। মেয়েমানুষে বিশ্বা নেই। দেশলাইটা দিয়ে এই সংসারে আগুন দিয়ে চলে যেতে পারলেই ভাল হয়।

কিন্তু পার্বতীর এতাবৎকালের ইতিহাসে অবিশ্বাসের কোন স্মৃতি মনে না পড়া রাগটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। মাগীর কপালে কী ঘটেছে ভাবতে ভাবতে ফস কে একটা কাঠি জেলে জনতাটা জ্বাললো নন্দ।

॥৭॥

রোদের জন্যে জানলাগুলো সব বন্ধ। ঠুক ঠুক করে বন্ধ জানলায় একটা আওয়াজ হলো যেন সাঙ্কেতিক।

আবারও হচ্ছে। বইয়ের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকা মনকে টেনে তুলে আস্তে জানলা খুললেন, অবাক হলেন। বললেন, কী? আবার কী?

পার্বতীর মুখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছিল। পার্বতীর বুকের আঁচলটা তার জোর নিশ্বাসের ধাক্কায় ওঠাপড়া করছিল, পার্বতীকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। সন্দেহ নেই বড় বেশী নার্ভাস হয়ে গেছে পার্বতী। তবু পার্বতী জোর করে সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলে, আপনার পায়ে ধরি সায়েব, ওই দশরথটা আপনাকে যে মাংস খেতে দেবে সেটা খাবেন না।

বলা বাহুল্য, সায়েব আকাশ থেকে পড়েন। সেই আকাশ থেকে পড়া গলাতেই বলেন, কী বলছ!

বলছি—, আবার একটু হাঁপিয়ে নিয়ে একই কথা বলে পার্বতী, ওই দশরথ মুখপোড়া আপনাকে যে মাংস খেতে দেবে, খাবেন না।

দুবার শুনেও সায়েবের যে রুদ্ধ-ম্লান দৃষ্টির কিছু উন্নতি হলো এমন মনে হলো না। তিনি শুধু আরো অবাক গলায় বললেন, কেন বল তো?

ওটা খারাপ মাংস সায়েব। খেলে আপনার অসুখ করবে।

সায়েব একটু কৌতুক বোধ করলেন বৈকি। এবং এটাও একবার মনে না করে পারলেন না, গায়ে পড়তে আসার এ বোধ করি একটা অভিনব কৌশল। বাঙ্গে মেয়েরা অনেক ছলনা জানে। এটাও এক ধরনের ছলনার অভিনয় হযতো। কিন্তু মেয়েটার মুখে সত্যকার ব্যাকুলতা। তাছাড়া এত কষ্ট করে আবার ঘুরে আসা, এর সবটাই কি অভিনয়! অথচ এমন একটা অদ্ভুত অনুনয় করছে। কই যাবার সময় তো বলে গেল না!

সায়েব ঈষৎ গম্ভীরভাবে সেই কথাটাই বলেন, এই কথা বলবার জন্যে এতক্ষণ পরে আবার ঘুরে এলে কেন?

ওই দশরথটার সামনে বললে, ও আমার সঙ্গে ঝগড়া করত সায়েব! তাড়াতাড়ি ভাত দেবে বলে ও রাঁধা মাংস কিনে এনেছে। ওটা খারাপ মাংস।

সায়েব কৌতুকের গলায় বলেন, কী, গরুর মাংস? আমার অভ্যাস আছে।

পার্বতী ওই মুখার্জি-বংশোদ্ভূত সায়েবের মুখে এহেন বচন শুনে মূর্ছা যায় না, বরং অবলীলাতেই বলে, তা জানি। আপনারা বিলেত-আমেরিকা ফেরত। কিন্তু এ তো তা নয়। মুখপোড়া ছোটলোকদের চায়ের দোকান থেকে বিচ্ছিরি জিনিস কিনে এনেছে। লোকে বলে, ওখানে নাকি চুহার মাংস মিশেল দেয়।

সায়েব অবশ্য মাংসের উৎপত্তিস্থলের বিবরণ শুনে শিহরিত না হয়ে পারেন না, তবু ভুরুটা কুঁচকে ওঠে তাঁর, কিসের মাংস মিশেল দেয়?

চুহা, মানে মেঠো ইঁদুরের সায়েব। দেহাতি ছোটলোকেরা তাড়ির সঙ্গে খায়।

সায়েবের মুখ রাগে ঘৃণায় লাল হয়ে ওঠে। বলেন, তুমি জানলে কি করে?

পার্বতী মাথা নামিয়ে লজ্জিত গলায় বলে, দেখে ফেলেছিলাম। আর দেখেই বুঝে ফেলেছিলাম। আমাদের পাড়ায় খায় তো অনেকে!

পার্বতীর নিজের স্বামীর ইয়ার-বন্ধুরাই যে খায় এবং লুকিয়ে-চুরিয়ে পার্বতীর স্বামীও খায় কিনা, এমন সন্দেহ আছে পার্বতীর, সেটা অবশ্য বলে না।

আচ্ছা ঠিক আছে। সায়েব গম্ভীর গলায় বলেন, তুমি যাও। আমি দেখছি।

পার্বতী ব্যাকুল মিনতির স্বরে বলে, আমি বলে দিয়েছি, একথা বলবেন না সায়েব! মনে দুঃখু পাবে লোকটা। দিদি বলে আমায়।

হঠাৎ সায়েব বলে ওঠেন, কিন্তু তুমি যে সত্যি কথা বলছ তার প্রমাণ কি?

পার্বতী অবাক গলায় বলে, আমি শুধু শুধু এতখানি পথ ভেঙে মিথ্যে কথা বলতে আসব?

এই অবাক গলার সামনে সায়েব বোধ করি একটু থতমত খান। তবে সামলেও নেন। মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন, আশ্চর্য কি! শত্রুতা থাকলে লোকে আরো কষ্ট করতে পারে!

কিন্তু ওর সঙ্গে আমার কিসের শত্রুতা?

সেটা আমি কেমন করে জানব? সায়েব কঠিন গলায় বলেন, আমার খাওয়ার ব্যাপারে তোমার তো কোন দায়িত্ব নেই, তুমিই বা হঠাৎ আমার জন্যে—

ও জিনিস আপনাদের পেটে বিষতুল্য হবে যে সায়েব—পার্বতী আবার ব্যাকুল হয়, ছোটলোকদের যা সহ্য হয়, তা কি আপনাদের সহ্য হয়!

সায়েব আবার গভীর গলায় বলেন, ছোটলোকেরাও মানুষ। তাদের শরীর আর আমাদের শরীর একই জিনিস দিয়ে গড়া।

এ কি কথা! সায়েবের মুখে! পার্বতী যেন চমকে ওঠে। পার্বতী বোধ করি কখনো এমন অভূতপূর্ব কথা শোনেনি। পার্বতী বরং বরাবর মেমসায়েবদের মুখে উল্টো কথাই শুনেছে, ও তোদের শরীরেই সয় বাবা, আমাদের দেখলে ভয় করে।.... এই মোটা চাল? এ বাবা ছোটলোকদেরই সয়, আমাদের পেটে এক দানা পড়লে ডাক্তার ডাকতে ছুটতে হবে। নিজেদের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের সুকুমারত্বের এবং বস্তির ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের পাথরত্বের তুলনামূলক সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়েছেন অনেক মেমসায়েব এবং সায়েব।

এহেন কথা আর কখনো শোনেনি পার্বতী। অতএব চমকে ওঠে সে। তারপর আস্তে জানলার গ্রীলটা ছেড়ে দিয়ে হাতের ধুলোটা ঝাড়ে সে। হঠাৎ সায়েবও ছেড়ে দেন গ্রীল।

হ্যাঁ, পরিস্থিতিটা এইরকমই ছিল, একই জানলার গ্রীল হাত দিয়ে চেপে ধরে রয়েছিল দুজনেই। নিচের দিকে পার্বতী, উপর দিকে মুখার্জি সায়েব। জানলার ভিতর দিকে মুখার্জি সায়েব, বাইরের দিকে পার্বতী। পার্বতীর পায়ের নিচে এবড়োখেবড়ো পাথর, সায়েবের পায়ের নিচে মোটা কার্পেট।

তবু সায়েবের মুখ দিয়ে যে একটি মহৎ বাণী উচ্চারিত হয়েছে, সেটি সাম্যের বাণী। পার্বতী তাই ঘাড় নিচু করে বলে, আচ্ছা সায়েব, যা ভাল বুঝবেন করবেন।

সায়েব এবার সহজ গলায় বলেন, না না, তুমি আমার ভালর জন্যে এত কষ্ট করে রোদে-টোদে এসে বারণ করলে, আর খাই! আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে কিছু বলব না, তুমি যেতে পারো।

পার্বতী পিছন ফেরে। পার্বতী আবার চলতে শুরু করে। আর ওর ওই চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন সায়েব বেশ কিছুক্ষণ। বাতিকগ্রস্ত! না হলে আমার জন্যে এত মাথাব্যথা কেন?

সচরাচর এ ধরনের মেয়ে দেখা যায় না। সচরাচর যাদের দেখা যায়, তারা হচ্ছে দশরথ মালি। ভয়ে হোক, স্বার্থে হোক, আর অপরের অনিষ্ট করতেই হোক, সব কিছু পারে তারা। এ মেয়েটা আশ্চর্য!

ওটা কী হচ্ছে? পিঠের দিকে খনখনিয়ে বেজে উঠল যেন প্রশ্নটা। চমকে উঠল নন্দ। হাতায় করে ভাতের হাঁড়ির একটা ভাত তুলে পরীক্ষা করে দেখছিল সেদ্ধ হয়েছে কিনা, হাতাখানা পড়ে গেল হাত থেকে।

আর তখনই খেয়াল হলো নন্দর, ইস্, বাইরের দরজাটা বন্ধ করা হয়নি! নাহলে দরজা না খুলে দিয়ে একটু জব্দ করা যেত!

তবে পুরুষের মানসম্মান বলে তো একটা জিনিস আছে। জলজ্যান্ত স্ত্রীটাকে দেখে সেই জিনিসটা ফুঁসে উঠল। এসেই ভাঙা কাঁসি বাজাচ্ছে! তার মানে ঠিক আছে! ঘটেনি কোন বিপর্যয়! তার মানে এতক্ষণ আড্ডা-ইয়ার্কি দেওয়া হচ্ছিল! আর নন্দ ব্যাটাকে খিদের সময় ঘরে ফিরে দেখতে হলো দোরে তালাচাবি!

নন্দ পড়ে যাওয়া হাতাখানাকে ফের কুড়িয়ে নিয়ে হাঁড়ির কানায় ঠং ঠং করে ঠোকে। যেন অন্য কারো উপস্থিতি টেরই পায়নি।

পার্বতী রবারের চটিটা খুলে রেখে, দাওয়ার ধারে রাখা বালতি থেকে জল নিয়ে হাতে-মুখে দিয়ে হাত-মুখ মুছতে মুছতে কাছে এসে বলে, হয়েছে, সর!

নন্দ তথাপি হাতের হাতা ছাড়ে না, জোর গলায় বলে, ঠিক আছে। দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নেওয়া কিছুই নয়, ও আমি করে নিচ্ছি।

তা তো জানি! পার্বতী আঁচলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলে, তোমার কাছে কোন্ কাজটাই বা কিছু! তবে আমি যখন এসেই গেছি—

মনে মনে বাঁচা গেল ভাব থাকলেও, নন্দ হাত ধুয়ে উঠে এসে তীব্র গলায় বলে, দরকার ছিল না কিছু। ও আমি ঠিক করে নিতে পারতাম।

আহা, আমি কি বলেছি পারতে না? এত শক্ত শক্ত কাজ পারো, সায়েব-সুবোরা তোমার পারা দেখে তাজ্জব হয়ে যায়, তার দুটো ভাতসেদ্ধ করতে পারবে না তুমি? তবে চাকরাণী যখন হাজির হয়েই গেছে তখন কেন আর—

চাকরাণী হতে যাবি কী দুঃখে! নন্দ কুৎসিত মুখে বলে, বল্ মহারাণী! সায়েব-সুবোরা পর্যন্ত আড্ডা দিতে পেলে ছাড়ে না! যাক্, তবু শেষ পর্যন্ত এলি। আমি তো ভাবছিলাম মেমসায়েব সঙ্গে আসেনি, সায়েব তাই তোকে আর ছাড়ল না। আটকে রেখে দিল।

যে সন্দেহটা তীব্র হয়ে আগুনের দাহ সৃষ্টি করছিল, সেটা ওই চির-পরিচিতার সামনে পড়ে যেন সব দাহ হারিয়ে ভস্মস্তূপে পরিণত হয়। তাই এতক্ষণের দুরন্ত সন্দেহকে ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে প্রকাশ করে নন্দ।

কিন্তু নন্দর সেই ভিতরের জ্বালাটা তার মুখের রেখায় যে কুশ্রী ফোস্কার ছাপ এঁকে দিয়েছিল, সেটাকে লুকোতে পারল না নন্দ।

পার্বতীর চোখ বড় তীক্ষ্ণ। পার্বতী সেই তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি দিয়ে ওকে প্রায় বিদীর্ণ করে ফেলে বলে, ওঃ! তাই ভাবছিলে? আর সেই ভাবনা নিয়ে ভাত রেঁধে খাচ্ছিলে?

তা কী করব? পেটের আগুন তো আর কিছু মানবে না!

মানবে না বুঝি? পার্বতী সাবধানে ভাতের ফ্যানটা গালতে গালতে বলে, পরিবারকে কেউ আটকে রেখে বদ-মাইশী করছে ভেবেও পেটের আগুনই বড় হয়ে ওঠে? মাথায় জ্বলে ওঠে না সে আগুন?

নন্দ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে, জ্বলবে না কেন! জ্বলে তো উঠেই ছিল! ইচ্ছে হচ্ছিল কাঠকাটা কুড়ুলখানা নিয়ে ছুটে যাই, দেখি সে কেমন সায়েব, মাথাটা ওই কুড়ুলে দু-ফাঁক হয় কিনা!

ও, ভেবেছিলে? পার্বতী হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে। গড়িয়েই পড়ে, ওরে আমার বীরপুরুষ সোয়ামী রে! হয়েছিল ইচ্ছে। তাই বল। তারপর কুড়ুলখানা নামিয়ে রেখে এস্টোভ জ্বেলে পেটের আগুনের ওষুধ বানাতে বসলে, কেমন?

ওঃ আবার মস্করা হচ্ছে! বলি এতক্ষণ কী হচ্ছিল ওখানে? মেমসায়েব আসেনি সায়েব একা, তোর এতক্ষণ কীসের কাজ?

আহা, একা বলেই তো দুটো গালগল্প করছিলাম। পার্বতী তেমনি ছুরিশানানো গলায় বলে, একা বলে একা, দশরথটা সুদ্ধু তখন হাওয়া! সায়েব বলল, বোসো বোসো, শুনি তোমার নাম কি, বাড়ি কোথায়, স্বামী কি করে!

নন্দ এত কথার মধ্যে ভীষণ গলায় বলে ওঠে, দশরথ কোথায় ছিল?

জানি না তো! বোধ হয় হাটে-ফাটে গেছিল! পার্বতী যেন সমস্ত গুরুত্বকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বলে, আহা, বেচারা সায়েব সত্যি সায়েব! কী চেহারা! কী স্বাস্থ্য-শরীর! ওই চালের খুঁটিটার মতন খাড়া দীর্ঘ। দেখলে ভক্তি আসে।

নন্দ জ্বলে পুড়ে মরতে মরতে শোনে ওর বাক্যচ্ছটা। নন্দ রাগে অন্ধ হয়ে বুদ্ধি হারায়। পার্বতী যে স্রেফ তাকে ক্ষ্যাপাবার জন্যেই বলছে এ খেয়াল হয় না আর, তাই ক্রুদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, ওর কী চেহারা! কী স্বাস্থ্য-শরীর! তা মজেই তো গেছিস্ দেখছি, নিজেকে তাহলে বিকিয়েই এলি বুঝি!

পার্বতী পিছন ফিরে কড়ায় তরকারি নাড়ছিল, এ কথায় মুখ ফিরিয়ে অদ্ভুত ধরনের একটু হেসে বলে, যে পুরুষ-বেটাছেলে বিকিয়ে আসা পরিবারকে গলা টিপে না মেরে তার হাতের রান্না খেতে বসে, তার ঘর করার থেকে যার তার কাছে বিকোনোও মান্যের।

কী বললি? নন্দ হঠাৎ রাগে জ্ঞানহারা হয়ে হাতের কাছ থেকে একটা খুন্তি কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারে পার্বতীর দিকে। লক্ষ্যটা স্থির হলে কী হতো বলা যায় না। তবে রাগে কাঁপা হাতে লক্ষ্যটা ভ্রষ্ট হলো। খুন্তিখানা ঠিকরে গিয়ে পড়ল ওদিকের দেয়ালে।

পার্বতী উঠে গিয়ে ওটা কুড়িয়ে এনে বলে, তবু ভাল, ছিটেফোঁটাও পুরুষের রক্ত গায়ে আছে এখনো, সরকারের গোলামী করে গলে জল হয়ে যায়নি!

তোর বড় মুখ হয়েছে—নন্দ পরনের লুঙ্গিটার কসি গুজতে গুজতে তিক্ত-তীব্র গলায় বলে, দিন দিন বড্ড বাড় বাড়ছে তোর!

পার্বতী থালায় ভাত বেড়ে পাশে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে হি-হি করে হেসে বলে, তা বাড়বে বৈকি। জগতের সব কিছুই তো বাড়ছে। তোমাদের মাইনে বাড়ছে, গরীব-গুরবোর মেজাজ বাড়ছে, বড়লোকের ভয় বাড়ছে, দোকানদারের অহঙ্কার বাড়ছে, দেনদারের সাহস বাড়ছে, আর আমার একটু বাড় বড়বে না? সায়েব-সুবোর নেক্‌নজর পড়লে আরো বাড়বে।

ফের ওই রকম অসভ্য কথা বলছিস? নন্দ ভাতের ওপর ঝোলের বাটিটা উপুড় করে বলে, ফের বললে, জিভ টেনে লম্বা করে দেব বলে রাখছি!

ও মা! ভাবলে দোষ নেই, করলে দোষ নেই, বললেই দোষ? পার্বতী যেন বিস্ময়ের সমুদ্রে ভাসে, নিজেই বললে মেমসায়েব সঙ্গে না থাকলেই সায়েবরা বাঁদীদের দিকেও

দিষ্টি দেয়, তাই আশা করছিলাম—, হেসে লুটোয় পার্বতী।

এইসব বাচাল মেয়েমানুষকে জুতো মেরে শায়েস্তা করতে হয়— বলে নন্দ গরগর করে খেয়ে নিয়ে উঠে পড়ে। লুঙ্গি ছেড়ে পায়জামা পড়ে চিরকুট ময়লা গেঞ্জির ওপর বুশ-শার্টটা চাপিয়ে গট গট করে বেরিয়ে পড়ে।

পিছনে একটা হাসির শব্দ যেন তাকে তাড়া দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায়।

আশ্চর্য! চিরকাল একরকমই গেল। অথচ মুখ্যু ভূত নন্দ কিনা ওই হাসি আর ওই বাচালতা দেখেই মজেছিল। মজে গিয়ে ওই বদ মেয়েমানুষটার বাপের কাছ থেকে একগাদা পাওনা টাকা ছেড়ে দিয়ে ওকে কিনে এনেছিল! খাটতে পারে খুব একথা সত্যি, তবে দোষ বহুত!

প্রধান দোষ তো এই বেহায়াপনা, বাচালামো, অসভ্যতা। তাছাড়া দোষ—সেও নেহাৎ অপ্রধান নয়—নিষ্ফলা তালগাছ। বাঁজা মেয়েমানুষের আবার আদর কি! এতদিন বিয়ে হলো, একটা বাচ্চা-কাচ্চার মুখ দেখাল না!

যতদিন না ওই কচি-কাঁচায় ছেঁকে ধরছে, ততদিনই ওই গ্যাসবেলুনের মতন বাতাসে উড়বে। হেই ভগবান, ওকে এবার একটু জব্দ কর। একটা বাচ্চা কাচ্চা দাও। ভগবানের কাছে যা চাইবার এবং যা না চাইবার, সব কিছুর প্রার্থনা জানিয়ে নন্দ আবার কাজের দিকে ছোটে।

॥৯॥

পড়ন্ত বেলায় বাসার সামনের মাঠে পাতা খাটিয়াটার ওপর বসে পার্বতী ছুঁচ-সুতো নিয়ে জামার টিপকল লাগাচ্ছিল।

গরমকালে নন্দ ঘরের মধ্যে শোয় না। মানে শুতে পারে না। অবাঙালীসুলভ এইটুকুই কেবল আছে নন্দর মধ্যে। বাঙালীদের মতন গরমের রাতে ঘরে পচে মরতে পারে না। নন্দ এই খাটিয়ায় শুয়ে থাকে বাসার সামনের মাঠে।

পার্বতীর তাতে আরাম। পার্বতী গরমের রাতগুলো তবু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। আর এই পড়ে-থাকা খাটিয়াখানাও পার্বতীকে অনেক আরাম দেয়। বিকেলের দিকে যখন বেলা পড়ে আসে, পার্বতী তখন সংসারের মোটা কাজ সেরে নিয়ে চুল বেঁধে পরিপাটি হয়ে সামান্য কিছু ফাল্‌তু কাজ নিয়ে এখানে এসে বসে। এখানে বসলে রাস্তার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত দেখা যায়, দেখা যায় ইঁদারার পাড়ের নানা লীলা। কখনো কখনো মেঠো পথে ধুলো উড়িয়ে ট্রাক যায় লরি যায়, কদাচিৎ বা ভাল ভাল গাড়ি।

জীবনযাত্রার একটা স্পন্দন, চলমান জগতের একটা ছবি—নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে সেদিকে। নন্দ ওভারটাইম খেটে ফেরে রাত করে।

তা সেটাই হয়তো পার্বতীর কাছে স্বস্তির ব্যাপার। নন্দ যদি ওই বিকেল বেলাটাতেই এসে হাজির হতো, আর এই খাটিয়াখানা দখল করে বসে লোমশ হাঁটু দুটোর ওপর লুঙ্গিটা গুটিয়ে তুলে বসে বসে বিড়ি টানত, আর ফরমাশ খাটাত পার্বতীকে, তাহলে পার্বতীর এই আকাশ আর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের মধ্যে নিমগ্ন থাকার অনাস্বাদিত একটা সুখ তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করা হতো না।

নন্দ জানে পরিবার আর পরিচারিকার মধ্যে তফাৎ সামান্যই, তাই নন্দ যতক্ষণ ঘরে

থাকে কেবলই ফরমাশ খাটায় পার্বতীকে। বলে, আদা-মরচি দিয়ে চা বানা...দুটো পেঁয়াজী ভাজ...পিঠটা চুলকে দে...কিংবা পা-টা টেপ আচ্ছা করে।

নন্দর উপস্থিতিটাই যেন একটা প্রচণ্ড স্থূলতা, একটা ক্লেদাক্ত অনুভূতি। তবু ওই নন্দ ছাড়া আর কেউ তো কোথাও নেই পার্বতীর। যে-বাবার ঋণ শোধ করতে তার নিজেকে বেচা, সেই বাপ তো খোঁজও নেয় না। তাছাড়া তারা এখানকার চাটি-বাটি গুটিয়ে অনেকখানিটা দূরেও চলে গেছে।

পাড়াপড়শী বলতেও বিশেষ কিছু নেই। ওদিকে বস্তি, এদিকে ধু-ধু মাঠ।

সামনে রাস্তা। বাচ্চা-কাচ্চা তো নেই-ই। অতএব আকাশ মাটি পৃথিবী নিজে আর নন্দ, এই ক'টা বস্তু নিয়েই পার্বতীর কাজকারবার। ওর মধ্যেই পার্বতী জামা সেলাই করে, পশম বোনে, দেওয়ালে আল্পনা দেয়।

কিন্তু কেন কে জানে আজ শরীরটা বড় ক্লান্ত। অথবা মনটাই। শরীর আর মন, ওরা তো পরস্পরের পরিপূরক। আজ আর কিন্তু কাজ করার ইচ্ছে হচ্ছিল না, তবু ওই বোতাম বসানোটা নিয়ে বসেছে পার্বতী। হাতে একটা কাজ না থাকলে, শুধু আকাশপানে অথবা পথপানে চেয়ে বসে থাকলে নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগে। যদিও এখন হাতের কাজটা হাতেই রয়েছে।

বেলাটা গড়িয়ে প্রায় সোনারঙা হয়ে উঠেছে, ঘরের মধ্যে ঢুকলেই কেরোসিনের আলো জ্বালতে হবে, বাইরে কিছুক্ষণ এই আকাশের আলো মুখে মেখে বসে থাকা যাবে। ওই আলোটা মুখে মাখার দরুন পার্বতীকে যেন একটি সুন্দরী মেয়ে বলে মনে হচ্ছিল। আর সেটা যেন পার্বতী নিজেই অনুভব করতে পারছিল। অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে খুব বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল পার্বতী।

একা থাকলেই পার্বতীকে এই রোগটায় ধরে। এই বিষাদ রোগ। পাঁচজনের মাঝখানে থাকলে অথবা একা নন্দর সামনে পার্বতী বাচাল দজ্জাল মুখরা।

পার্বতী তখন হেসে গড়ায়, ঠাট্টা-তামাশা ভিন্ন কথা বলে না। কিন্তু একা হলেই আস্তে আস্তে চেহারা পালটে যায় পার্বতীর। পার্বতী বিষণ্ণ হয়ে যায়। পার্বতীকে স্মৃতিভারাক্রান্তা বিরহিনীর মত দেখতে লাগে।

তবে কি পার্বতীর অন্য কোন মনের মানুষ আছে? অথবা ছিল? পার্বতী সেই স্মৃতির রোমন্থনে বিষণ্ণ হয়? কিন্তু কই? পার্বতীর অতীত ইতিহাস তো তা বলে না। কুমারী বেলায় পার্বতীর মূর্তি তো স্রেফ্ একটা ডাকাবুকো ডানপিটে ছেলের মত ছিল। পার্বতী গাছে চড়ত, ছিপ্ ফেলে মাছ ধরত, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলত, আর বাড়ি ফিরে দরজা থেকে চেঁচাত, মা, ভীষণ খিদে।

বলা বাহুল্য মা মেয়ের এই আহ্লাদেপনায় স্নেহে বিগলিত হয়ে খাবারের থালা ধরে দিতে ছুটে আসত না। মা আকাশ ফাটিয়ে গাল দিত, এত বড় মেয়েকে দিয়ে সংসারের কোন কাজ হয় না বলে ধিক্কার দিত, এবং কোন্ মুখে ওই ধিঙ্গি মেয়ে খিদে বলে আদর কাড়ায়, সেই প্রশ্ন করত।

পার্বতী কি এতে অভিমানে জর্জরিত হতো? পাগল! পার্বতী অম্লান বদনে মাকে বলত, লজ্জা করতে যাব কোন্ দুঃখে? আমি তো তোমার বাবার ভাত খেতে যাই না, আমি আমার বাবার ভাত খাই। তারপর দুমদাম করে বাসন মাজতে বসত, উঠোন ঝাঁট দিত, ছাড়া কাপড় কাচত, গরুকে খেতে দিত।

বাপ বলত, মেয়েটাকে অত খাটাও কেন?

পার্বতী বলত, তাই বল তো বাবা! নবাবনন্দিনী বসে থাকবেন, আর গরীবের মেয়ে খেটে মরবে!

মায়ের সঙ্গে এমনি খেলার ঝগড়া চালাত পার্বতী। আর বাপকে সালিশ মানত।

তা বাপের ওপর টানটা তার মায়ের থেকে বেশীই ছিল।

তা সেই সহানুভূতিই কাল হলো পার্বতীর। বাপের ঋণ শোধ করতে বাপের নেশার সঙ্গী ওই বাঙালী হয়ে যাওয়া বেহারীটাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে বসল সে। এর মাঝখানে তো আর কোন ইতিহাস নেই।

তবু পার্বতী যখন একা থাকে, পার্বতীকে বিষণ্ণ বিরহিনীর মত দেখতে লাগে। পেয়ে হারানোর আর না পাওয়ার ব্যথাটা কি একই জাতের?

বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল বলেই যেন পার্বতীকে আরো সুন্দরী সুন্দরী লাগছিল। কিন্তু দেখবার লোক কোথায়?

কয়েকটা ছেলে গরু মোষ চরিয়ে ফিরছিল, তাদের নেংটি পরা চেহারাগুলোও যেমন পার্বতীর অতি পরিচিত, পার্বতীর এই হাতে একটা কাজ নিয়ে চুপ করে বসে থাকা মূর্তিটাও তাদের নিত্য পরিচিত।

ইঁদারার ধারে যারা আসে যায়, নিত্যই দেখে পার্বতীকে, তাদেরও কিছু আর নতুন করে মনে পড়বে না পার্বতী দেখতে বড় খাসা। পার্বতী ওই আধবুড়ো নন্দ রাউতটার ঘরে যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা!

ওদের মধ্যে অনেকেই বরং ভাবে, বাবা, এতক্ষণ বসে থাকে, কাজ-কর্ম নেই নাকি ছুঁড়ির? রান্না বাসনমাজা, কাপড় কাচা, জল তোলা, ঝাঁটপাট দেওয়া ছাড়াও কি কাজ থাকে না মেয়েমানুষের? গম ঝাড়া, চাল বাছা, গুল দেওয়া, ঘুঁটে ঠোকা, কাঠ কুচনো, গরুর খড় কাটা, জাবনা দেওয়া গাছপালা দেখা, কত কাজ গেরস্তর। ছবির মত বসে থাকাকেই বলিহারী দিই!

তবে কোন কোন সহানুভূতি-সম্পন্ন মানুষ এ কথাটা বলে, আহা, বাচ্চা-কাচ্চা তো নেই, বাঁজা মেয়েমানুষের সাদাই ঝাড়া হাত পা। একা একা কী আর করবে, তাই বসে থাকে খানিক। নন্দরও তো তেমনি, রোজ রাত করে বাড়ি ফেরা! নন্দ যে শুধু ওভারটাইমই খাটে তা তো নয়, নন্দ নেশার আড্ডাতে ঘুরে আসে কিনা, রাত তো হবেই।

বিধাতার ফের, আজই নন্দ সাত-সকালে বাড়ি ফিরল। আর ফিরল ঠিক তখনই যখন মুখুয্যে সায়েবের সঙ্গে পার্বতী প্রেমালাপে মগ্ন। ঘটনাটার চেহারাখানা প্রায় তাইই হয়ে বসল।

পার্বতীর মুখে চোখে যখন কনে-দেখা-আলো, পার্বতী যখন অকারণেই দীর্ঘশ্বাস ভারাক্রান্ত, তখন সহসা ওই ঢালু রাস্তাটা থেকে উঠে এল সেই সকালের ধুলো ওড়ানো গাড়িটা। অবশ্যই সে গাড়ি পার্বতীর জন্যে আসেনি, কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে পার্বতীর কাছ বরাবর। এবং গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সায়েব বলে উঠলেন, তুমি এখানে থাক?

গাড়ির আবির্ভাবেই পার্বতী সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল, ঈষৎ এগিয়ে এসে হাসি মাখা মুখে বলল, হ্যাঁ, সায়েব—,

এত তাড়াতাড়ি পার্বতীর বিষণ্ণ মুখ হাসি মুখ হয়ে উঠল কি করে, এবং কেনই বা, এটা ভাববার বিষয় হতে পারত, কিন্তু ওটাই পার্বতীর প্রকৃতি। মানুষ দেখলেই পার্বতী যেন তার মনের ঘরের জানলাটায় হাসির পর্দা টেনে দেয়।

সায়েব কিন্তু ওইটুকু কথাতেই সন্তোষ লাভ করলেন না, নেমে পড়ে এগিয়ে এলেন। বললেন, দশরথের দেওয়া সেই মাংস কিন্তু খাইনি আমি।

পার্বতী হেসে ফেলে বলে, সে তো বুঝতেই পারছি, খেলে আর গাড়ি চালিয়ে আসতে হতো না।

তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ বলা যায়।

পার্বতী একটু অভিভূত হয়। এমন একটা কথা যে তার প্রাপ্য হতে পারে এমন প্রত্যাশা ছিল না পার্বতীর। তবে কি না ওই পার্বতী নামের মেয়েটা কখনো কথায় হারে না, তাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে, তা হলে আমার কথা শুনে চলতে হয় আপনাকে।

সায়েবের তো উচিত ছিল এই ধৃষ্টতার পর বোঁ করে গাড়িতে উঠে পড়ে ধুলো উড়িয়ে চলে যাওয়া। তিনি ডেকে একটা কথা বলছেন বলেই কি সমান সমান হয়ে কথা বলতে হবে সার্ভে অফিসের খিদমদ্‌গার নন্দ রাউতের বৌয়ের?

কিন্তু আশ্চর্য, সায়েব তাঁর উচিত কাজটা করলেন না, কথার উত্তর দিলেন। বললেন, কোন্ কথা?

এই যে যেখানে সেখানে খাবেন না, শরীর স্বাস্থ্যর যত্ন করবেন—আর পার্বতী একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলে, আর মেমসায়েবকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবেন।

মুখার্জি সায়েব, অর্থাৎ কি না যাঁর নাম হচ্ছে মানস মুখার্জি, তিনি একবার এই পরিবেশটার দিকে তাকালেন, তারপর পার্বতীর দিকে।

এখন সেই কনে-দেখা-আলোটা শেষ জ্বলা জ্বলে বিদায় নেবার তাল খুঁজছে। ইঁদারায় পাড়ের কোলাহল থেমেছে, আর এখন সেই ছোট ছোট লাঠি হাতে কালো কালো লেংটি মাত্র সার ছোট্ট ছেলেগুলোকেও আর দেখা যাচ্ছে না, আর এখন যেন ট্রাক বা লরীগুলোও কোথায় থমকে বসে আছে। শুধু দূরের থেকে গরু মহিষের গলার ঘণ্টির মৃদু ঠুং ঠুং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

এই স্তব্ধ পরিবেশে পার্বতীকে বেশ দেখাচ্ছে। কে বলবে ভদ্র নয়! অথচ ঘরটা তো পাকা নয়, টিনের চালা। ভদ্রলোকেরা এমন ঘরে থাকে না। তা ছাড়া পরিচয় তো আগেই প্রকাশ পেয়ে গেছে। মেমসায়েবের আয়াগিরি করতে সকালবেলা মরতে মরতে যাবেই বা কেন? কিন্তু আপাতত ওকে খুব ভাল আর ভদ্রই দেখাচ্ছে। অতএব কথা বলতে বিতৃষ্ণা আসবার কথা নয়।

তাছাড়া দূত যেমন অবধ্য, মেয়েছেলেও প্রায় তাই, সায়েবকে অতএব সেই ধৃষ্ট কথারও উত্তর দিতে হয়। শান্ত গম্ভীর গলায় বলেন, মেমসায়েব এলে তুমি কাজ পাও, তাই না?

উত্তরটা শোনা মাত্র পার্বতীর কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। অথচ সায়েব হয়তো ঠিক ওকে নিচু করতেই এমন কথা বলে বসেছেন তাও নয়। আর কোন কথা যোগাল না বলেই বোধ করি।

পার্বতী কিন্তু ও কথার একটা অর্থই খুঁজে পায়। পার্বতী প্রতিশোধ নিতেও দেরি করে

না। পার্বতী রাজহংসী প্যাটার্নে গলাটা বাঁকিয়ে বাঁকা হাসি হেসে বলে, সায়েব বুঝি কখনো কাউকে বিনা স্বার্থে কিছু বলতে দেখেননি?

সায়েব এ ধৃষ্টতারও উত্তর মৃদু হাসির সঙ্গেই দেন, কই মনে তো পড়ে না।

এই মেয়েটাকে যেন ঠিক আয়া ক্লাসের বলে মনে হয় না মুখার্জি সায়েবের। কোথাও যেন আভিজাত্যের কাঠামো আছে। তাই এই উত্তরটা।

পার্বতীও উত্তর দেয়। পার্বতী মনে রাখে না সে নন্দ রাউতের বৌ। যে নন্দ রাউত কেষ্ট বিষ্টু সায়েব-সুবোকে দেখলেই হাত কচলাতে শুরু করে, এবং তেমন দরকার পড়লে জিভ দিয়ে তাদের জুতোর ধুলোও সাফ করে দিতে পারে।

পার্বতী যেন তার সেই অন্য সত্তাটাকে খুঁজে পায়। যেটা তার একান্ত নিজস্ব। যেটা কেবলমাত্র একা থাকলেই তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। সেই সত্তাটার সাহস আছে, সপ্রতিভতা আছে। পার্বতী তাই গম্ভীর হাসি হেসে বলে, সায়েবের তো তাহলে কপাল খুব মন্দ বলতে হবে, ভাল একটা লোক দেখেননি কখনো?

সায়েব কি ওই তুচ্ছ মেয়েটার কথার বাঁধুনীতে আকৃষ্ট হন? তাই গাড়ি থামিয়ে রেখে কথাই চালিয়ে যান...তা হয়তো তাই। তবে আজই প্রথম দেখলাম তখন। সায়েব 'তখন'টার ওপর জোর দিয়ে বলেন, তোমাকেই দেখলাম।

কই আর বিশ্বাস করলেন? পার্বতী উদাস গলায় বলে, এখন তো ভাবছেন একটা আয়াগিরির চাকরির আশায় আমি মেমসায়েবের খোঁজ করছি।

আমার ভুল হয়েছে। মুখার্জি সায়েবের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো কথাটা।

মুখার্জির অধস্তনেরা শুনলে মূর্ছা যেন। কিন্তু এখানে সেই উর্ধ্বতন অধস্তনের প্রশ্ন নেই। প্রায়ান্ধকার পরিবেশে শুধু একটা মেয়ে, যে মেয়েটা যুবতী এবং সুন্দরী। যে মেয়েটা নিম্নশ্রেণীর পরিচয় বহন করলেও ঠিক নিম্নশ্রেণীর নয়।

পার্বতীর মুখ থেকে এখন সেই শেষ সোনার ঝলকটুকু অন্তর্হিত, পার্বতীর মুখে মৃদু ছায়ার আচ্ছাদন, আর পার্বতীর কণ্ঠ এখন বিষণ্ণ।—ভুল নয় সায়েব, ঠিকই, আমরা ছোট মানুষরা যে ভাল কিছু ভাবতে পারি সে আপনারা জানবেন কোথা থেকে? ছোটরা ছোট কথাই ভাববে এই নিয়ম যে।

সায়েব ঈষৎ ব্যগ্রভাবে বলেন, শুধু ছোটরাই ছোট কথা ভাবে না। বড় লোকেরাও ভাবে। বাইরে থেকে যাদের মস্ত বড়-টড় দেখতে লাগে তাদের ভিতরটা যে কি নীচ সংকীর্ণ, তা তোমাদের থেকে আমরা অনেক বেশী জানি, বুঝলে? কিন্তু কিছু মনে কোরো না। আর—আর যদি—না থাক্‌গে—

পার্বতী সহসা হেসে ওঠে। খুব একটা হাসির কথা না হলেও। কারণ পার্বতীর হঠাৎ চোখে পড়ে গিয়েছে ইঁদারার ধারে বড় পাকুড় গাছটার আড়ালে একটা ছায়াশরীর। আর সেই ছায়াশরীরের চোখ দুটোয় বিদ্যুতের তীব্রতা।

পার্বতীর চিরকালের দুর্মতি পার্বতীকে সর্বনাশের পথেই ঠেলে। তাই পার্বতী গলা ছেড়ে হেসে ওঠে থামার পরও যাতে রেশ থাকে তেমন হাসি। পরবর্তী হাল? মার খেয়ে মরাও বিচিত্র নয়, তথাপি পার্বতীর এই দুর্মতির দুঃসাহস।

হেসে উঠে বলে পার্বতী, আপনাদের আবার কথা বলতে এত আটকায় নাকি সায়েব, আশ্চয্যি তো! আপনি না হয়ে আর কেউ হলে অনায়াসেই বলত, আর যদি পারো তো রাতে ডাকবাংলোয় চলে এস।

সায়েব হঠাৎ চমকে ওঠেন। সায়েব এখন আর পার্বতীর মুখটা ভাল দেখতে পাচ্ছেন না, তবু তীব্রস্বরে বলেন, তোমার খুব সাহস তো!

সাহসের যোগানদার তো আপনাদের মতন সায়েব-সুবোরাই। পার্বতী আবার হেসে উঠে বলে—মেমসায়েব সঙ্গে থাকলেও রক্ষে হয় না, তা এ তো আপনার—আচ্ছা সায়েব, আপনি আমায় পাগল-টাগল ভাবছেন না তো?

ভাবতে শুরু করছি।

তাহলে নির্ভয়েই বলি—মানে কথাতেই আছে, পাগলে কী না কয়। বলছি—মেমসায়েবকে আনুন। না আনলে এমন অনেক লোক আছে যারা আপনার পিছনে লাগবে বাজে মেয়েছেলে যোগাড় করে দেবার জন্যে। তার মধ্যে পালের পাণ্ডা হচ্ছে নন্দ রাউত নামের একটা লোক।

নন্দ রাউত! অন্যমনস্কের মত উচ্চারণ করেন সায়েব। আজই ওই নন্দ রাউত শব্দটা কোথায় যেন শুনলেন না? কোথায়? কখন? কার কাছে?

পার্বতী মৃদু গলায় বলে, হ্যাঁ, চিনে রাখবেন লোকটাকে। কালই দেখতে পাবেন অফিসে গিয়ে। বিনা স্বার্থেই ও আপনার জুতো ঝাড়বে, আপনার সুবিধে করে দিতে আসবে।

অন্ধকার নেমে এসেছে, সায়েব আস্তে বলেন, আচ্ছা তোমার কথা মনে রাখব, চিনে রাখব লোকটাকে।

ধীরে ধীরে গাড়িতে গিয়ে ওঠেন, হেড্‌লাইটটা জ্বেলে বেরিয়ে যান। কিন্তু মনটা অন্যমনস্ক, ওই রাউত শব্দটা কোথায় শুনেছেন। আর ওই মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করা হলো না তোমার নাম কি? সকালে কী যেন বলেছিল, একেবারে ভুলে গেছি। হঠাৎ নিজমনে ভুরু কোঁচকালেন সায়েব। আমি কি পাগল? ওর নামে আমার দরকার কী! আমি তো আর ওকে কাজে বহাল করছি না! দূর, অকারণ কতটা সময় গেল, বেলা থাকতে বেরিয়েছিলাম। তবু অদৃশ্য কাঁটার মত খচ খচ করতেই থাকে সেই শব্দটা, এবং অনেকক্ষণের পর দাঁতের গোড়ায় কাঁটার মতই হঠাৎ বেরিয়ে গিয়ে খচখচানি থামে।

নামটা মনে নেই কিন্তু ঐ মেয়েটার পদবীই হচ্ছে রাউত। যার জন্যে ভেবেছিলাম, ও কি বাঙালী নয়? আর নন্দ রাউত ওরই স্বামীর নাম।

আচ্ছা, আশ্চর্য মেয়ে তো! নেহাৎ নিম্নশ্রেণীর নয় বোঝাই যাচ্ছে। মনে হয় যেন ওর কোন অতীত ইতিহাস আছে।

লোকটা ওকে ধরে-টরে আনেনি তো? নারীহরণ ব্যাপারটা তো অন্তকালের। ও সেই শ্লোগানের মত, চলেছে, চলছে, চলবে।

॥১০॥

গাড়ির ধুলোটা নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবার পর বেরিয়ে এল নন্দ গাছের আড়াল থেকে, পার্বতী তখনও দাঁড়িয়ে।

নন্দ এইবার ওকে নেবে এক হাত এটা পার্বতীর জানা, তাই সে তখুনি মাঠ ছেড়ে বাসার মধ্যে ঢুকে যায়নি। বোধ করি শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি কোন একটা তিথি, তাই অন্ধকারটা নামতে না নামতেই আর একটা ফিকে আলোর আভাস ছড়িয়ে পড়েছে

আকাশ থেকে। সেই ফিকে আলোর চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে আছে পার্বতী নামের মেয়েটা, দেখলে একটা মমতা-মমতা ভাব আসাই উচিত। কেননা জ্যোৎস্নার এই নরম আলোয় চেহারার যা কিছু খোঁচ-খাঁচ, যা কিছু ত্রুটি কোথায় যেন ঢাকা পড়ে যায়, যেটুকু দেখা যায় সেটুকু হচ্ছে কমনীয়তা।

হয়তো নন্দকেও তাই দেখাচ্ছিল। রূঢ়তা রুক্ষতাটা কিঞ্চিৎ বর্জিত, কিন্তু যেটুকু রূঢ়তা চেহারা থেকে চলে গিয়েছিল, সেটুকু যেন তার গলার স্বরের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

নন্দ এসেই ওর খোঁপাটা জোরে নাড়া দিয়ে বলে ওঠে, এক বেলাতেই যে খুব জমিয়ে নিয়েছিস দেখছি! বলি কিসের কথা হচ্ছিল এতক্ষণ?

খোঁপাটা নষ্ট করছ কেন? বলে পার্বতী তার পরম দেবতার মুঠো থেকে খোঁপাটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে, আবার ঠিক করতে করতে বলে, আজ যে খুব সাতসকালে আসা হলো দেখছি। পাহারা দিতে বুঝি?

ওঃ চোটপাট! ভেবেছিস আমি কিছু বুঝতে পারিনি?

বালাই ষাট! তুমি আবার বুঝতে পারবে না কি? এত বুদ্ধি ধর তুমি!

রাগ বাড়িয়ে দিসনি বলছি বাতি, ঘরে চল তোকে আজ আমি দেখে নিই।

সুন্দরী তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে সন্দেহবাতিক নন্দর বরাবরই জ্বালা। বিশেষ করে বাঙালীদের সে আদৌ বিশ্বাস করতে পারে না। অথচ টাকার নেশায় ওভারটাইম খাটার অথবা উঞ্ছবৃত্তি করার অভ্যাসটাও মোক্ষম, তাই বাসায় ফিরে বৌকে একবার টাইট দেওয়া তার নিত্য কাজ। কিন্তু আজকের মত এমন হাতে-নাতে ধরতে পারেনি কোনদিন, অতএব ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে কিছু উত্তম মাধ্যম দিতে চায়।

পার্বতী সেটা বোঝে। কিন্তু পার্বতী যে কেন এত নির্ভীক সেটা বোঝাই শক্ত। নন্দর তো সামর্থ্যই নেই বোঝবার, অন্যের পক্ষেও বোঝা কঠিন।

নন্দ যখন ঘরের মধ্যে যেতে বলল, পার্বতী দিব্যি যেন ছলকাতে ছলকাতে বেড়ার দরজা ঠেলে বাসার এলাকার মধ্যে গিয়ে ঢুকল, আর দাওয়ায় উঠেই পিঠের কাপড়টা তুলে ধরে পিঠটা পেতে নন্দর সমানে এসে দাঁড়াল।

রাগে দিশেহারা নন্দ সত্যিই সেই খোলা পিঠটায় গুম্ করে একটা কিল মেরে বলে ওঠে, সব সময় মস্করা? বল বলছি, যে কথা হচ্ছিল এতক্ষণ মুখার্জি সায়েবের সঙ্গে?

পার্বতী দাওয়ায় পাতা চৌকিটায় বসে পড়ে অম্লান বদনে বলে, যে কথা হচ্ছিল, সে কি তোমায় জানাবার মত কথা? হচ্ছিল গোপন কথা।

এই আমার হাতেই একদিন তুই মরবি বাতি! সোজা কথার সোজা জবাব দে বলছি!

তোমার হাতেই তো মরে পড়ে আছি। পার্বতী চড়া গলায় বলে, মরতে এখনো বাকি আছে নাকি আমার? তুমি তো ঘর করছ একটা পেত্নীকে নিয়ে।

ভূতেরা পেত্নীদের নিয়েই ঘর করে—নন্দও হাঁপিয়ে বসে পড়ে বলে, বলি সায়েব-সুবোর কেন পেত্নীদের দিকে দিষ্টি?

পার্বতী অত বড় কিলটার পরও স্বচ্ছন্দে বলে, মেমসায়েব নেই বলে।

ও, তা হলে যা ভাবছি তা মিথ্যে নয়? নন্দ একখানা হাতপাখা নিয়ে জোরে জোরে হাওয়া খেতে খেতে বলে, হচ্ছিল কিছু খারাপ কথা?

ও মা, খারাপ কথা কেন হবে? পার্বতী হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে, ভাল ভাল কথাই তো বলছিল সায়েব!

ভাল কথাটা কী? নন্দ আর একবার ওকে জোরে নাড়া দিয়ে আবার বলে, রাতে ডাকবাংলোয় যেতে বলছিল বুঝি?

হঠাৎ সমস্ত শিথিলতা ত্যাগ করে সোজা হয়ে বসে কড়া ভাবে বলে ওঠে পার্বতী, সবাইকে নিজের মতন মনে কোরো না। ফের যদি এরকম অসভ্য কথা শুনি তো এই সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলে যাব তা বলে রাখছি।

মুহূর্তে নরম হয়ে যায় নন্দ, মিন্‌মিনে গলায় বলে, ওঃ, খুব যে সতীগিরি! বলি বলতে তো পারলি না এখনো অবদি, সায়েব এতক্ষণ কী বলছিল?

পার্বতী অনায়াস সুরে বলে, কেন, গাছের আড়াল থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না?

গাছের আড়াল থেকে মানে? নন্দ যেন আকাশ থেকে পড়ে।

পার্বতী তরল গলায় বলে, তোমায় আবার আমি মানে বোঝাব কী গো? তুমি বলে কত বুদ্ধি ধর! তবে এই ভেবে আশ্চয্যি হচ্ছি কোন্ প্রাণে তুমি বাইরে বাইরে ঘুরে রাতদুপুরে বাড়ি ফেরো! অসতী মেয়েমানুষকে তো আস্কারা দেওয়াই হয় তাতে। আজ হঠাৎ এসে পড়লে তাই হাতেনাতে ধরে ফেললে, রোজই এসব চলে কিনা জানতে পারো না তো।

নন্দ কেঁপে যায়। নন্দ আরো মিন্‌মিনিয়ে বলে, যা মুখে আসছে তাই-ই তো বলে নিচ্ছিস! বলি সত্যিই কি আর তোকে অবিশ্বাস করছি আমি? তবে ওই মট্‌মটে স্যুট পরা সায়েব চকচকে গাড়ি থেকে নেমে নন্দ হতভাগার পরিবারের সঙ্গে কিসের এত কথা কয় সেটা জানতে চাইব না? না, দেখলে মাথায় রক্ত চড়ে উঠবে না?

পার্বতী হি-হি করে হাসে, রক্ত আছে নাকি গায়ে? আমার তো বিশ্বাস শুধু জল!

নন্দ একেবারে মিইয়ে গেছে, নন্দ তাই দার্শনিকের সুরে বলে, জল বলেই এই সরকারী চাকরিতে টিকে আছি রে পার্বতী, সায়েবদের মর্জিমাফিক ওঠ-বোস করে দুটো করে খাচ্ছি। রক্ত থাকলে কি আর—, কথা শেষ করবার ভাষা খুঁজে না পেয়েই বোধ করি নন্দ থেমে যায়।

সেই থামার জায়গাটায় পার্বতী এসে দাঁড়ায়। পরম করুণার গলায় বলে, তা সত্যি! আমারও তাই মনে হচ্ছে। নচেৎ আমি হলে এক্ষেত্রে কি অমনি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সায়েবকে নির্বিবাদে চলে যেতে দিতাম? নিদেন একখানা পাথরের চাঁই মেরে সায়েবের ভবলীলা শেষ করে দিতাম।

সব্বোনেশে কথা বলিসনি পার্বতী—নন্দ শিউরে উঠে বলে, তোর মুখে দেখছি কিছু আটকায় না। সায়েব কে তা জানিস? অ্যাসিস্টেন্ট চীফ—

ওরে বাবা, অতশত ইংরেজি কথা কি বুঝতে পারি? আমি তো সার বুঝি সায়েব বাঙালী—উঁচু-নিচু যাই হোক, সবাই এক-একটা মানুষ। কাটলে রক্ত সকলেরই পড়ে।

ওঃ, সাধুবাবাজীদের মতন কথা হচ্ছে। নে কোথায় কী আছে বার কর। পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছে।

আগুন তো তোমার আজ সারাদিন সর্বাঙ্গেই জ্বলছে। মন এত নিচু কেন?

নন্দ অসহায় গলায় বলে, আমার জ্বালা তুই কী বুঝবি?

সে অবিশ্যি সত্যি, পার্বতী বলে, তোমায় কখন কে লুঠ করে নিচ্ছে, এমন ভয় তো আমার আসবে না জন্মেও।

হুঁ, এই কালোকুচ্ছিত আধবুড়ো লোকটাকে তোর পছন্দ হয় না তা বুঝি—নন্দ শিথিল

গলায় বলে, তবে তখন বললেই ভাল করতিস! বে হয়ে যাবার পর এখন আর অপছন্দ করে করবি কি?

পার্বতী হি-হি করে বলে, সবই করতে পারি। একালে তো আর আমাদের ঠাকুমা-দিদিমাদের কালের মতন বিয়েটা লোহা-পাথর দিয়ে তৈরি নয় যে ভাঙা যায় না?

নন্দ হাতের বিড়িটা মুখে তুলতে গিয়ে হাত নামিয়ে বলে, কী বললি?

কিছু বলিনি, চায়ের সঙ্গে রুটি দেব দুখানা, না মুড়ি খাবে?

খুলো খাব, ঢিল খাব! বিয়ে ভাঙার কথা কি বললি, তাই বল!

বললাম তো, বিয়ে হয়ে গেলেই যে আর কিছুটি করা যায় না, তেমন কাল আর এখন নেই।

ও, তার মানে বিয়ে ভাঙার ফন্দিটা আঁটছিস মনে মনে!

পার্বতী টিন থেকে একবাটি মুড়ি বার করে তেল-নুন মেখে নন্দর সামনে ধরে দিয়ে বলে, তা রাতদিন মার খেয়ে খেয়ে হাড় গুঁড়ো হতে কার ভাল লাগে? পড়ে মার খাবার দরকার তো নেই আর! আইন যখন আছে—

আইন? আইন-টাইনও জানা হয়ে গেছে তাহলে? নন্দ হঠাৎ একটা সম্পূর্ণ উল্টো কাণ্ড করে বসে। হঠাৎ প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠে বলে, আমার মারটাই শুধু তুই দেখতে পাস, কেমন? আর কিছু দেখতে পাস না?

পার্বতী উদাসভাবে বলে, তা যে-বস্তুটা হাড়ে হাড়ে টের পাই সেটাই দেখতে পাব, এর আর আশ্চয্যি কি?

তা বটে। নন্দ মুড়ির বাড়িটা সরিয়ে রেখে শুধু চা-টা হাতে তুলে নেয়।

পার্বতী এটা-ওটা কাজ করে। মুড়িটা সরালে কেন, এ প্রশ্ন করে না। অতএব নন্দর ব্রহ্মাস্ত্রটা মাঠেই মারা যায়। খাওয়ার ওপর রাগ দেখানোটাই তো শেষ অস্ত্র—ব্রহ্মাস্ত্র। মেয়েমানুষ ওতেই জব্দ!

খাও-খাও করে খোশামোদ যদি না-ও করে, নিজে তো খেতে পারবে না গপ্ গপ্ করে! অতএব মর পেট জ্বলে!

নন্দ বোধ করি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর যখন দেখে প্রশ্নটা এলই না, তখন গমগম করে বলে ওঠে, যে মানুষটা রোজ বাড়ির বাইরে খায়, ছ'মাস পরে একদিন বাড়ি এসে খেতে চাইল, তার ভাগ্যে দুখানা রুটি জুটল না! মুড়ি আছে খাও—ব্যস! এই আমার সংসার!

পার্বতী মুড়ির বাটিটা ফের সরিয়ে দিয়ে বলে, যখন শুধোলাম তখন তো বলা হলো না বাবুর, রুটি যেন আকাশ থেকে পড়বে! সময় লাগবে না?

আমার দরকার নেই। বলে নন্দ যেন রাগই দেখাচ্ছে এইভাবে গোগ্রাসে গিলতে থাকে মুড়িগুলো মুঠো মুঠো তুলে নিয়ে।

পার্বতী আর নন্দর দাম্পত্য-জীবনের ছবিটি প্রায় এই-ই। এইভাবেই কাটছে ওদের।

।১১।

মেমসায়েব সঙ্গে থাকা সায়েবরা কখনো মালি ঠাকুর চাকরের সঙ্গে গল্প করেন না, সে-অবস্থায় ওদের সঙ্গে তাঁদের একটি মাত্রই সম্পর্ক—প্রভু-ভৃত্য, একটি মাত্রই

যোগসূত্র—ধমক। দশরথ এসব জানে।

সায়েবরা যদি যথাসময়ে চাকর-বাকরকে ধমক না দেন, মেমসায়েবরাই যে সায়েবদের ধমক দেন, এ অভিজ্ঞতা আছে দশরথের।

ডাকবাংলোর কাজ করে করে অনেক নমুনা দেখতে হয় দশরথকে। তবু মুখার্জি সায়েবকে দেখে মনে হয়নি তার, তিনি আবার দশরথকে ডেকে গল্প করবেন। খুব গম্ভীর আর রাশভারী মতনই দেখতে লেগেছিল।

খাওয়াদাওয়া নিয়েও ঝামেলা নেই। শুধু প্রথম দিনেই বলে দিয়েছিলেন, মাংস-টাংস আমায় দেবার দরকার নেই।

দশরথের বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। তবু বুক বেঁধে বলেছিল খান না?

ঠিক যে খাই না তা নয়, মানে সব জায়গায় খেতে তেমন ইচ্ছে হয় না।

দশরথের মনে হয়েছিল শাপে বর!

কিন্তু ওই পর্যন্তই, পরদিন থেকে দশরথ যে কি পরিবেশন করছে, তাকিয়েও দেখেন না সায়েব। অন্য সায়েব মেমসায়েবদের কাছে রান্নার স্বাদ নিয়ে যে ধিক্কার ধমক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করতে হয় দশরথকে, এখানে তার কিছুই নেই। বাঁ হাতে একখানা বই ধরে পড়তে পড়তে তো খান সায়েব।

সেই সায়েব হঠাৎ আজ বইটা টেবিলের ধারে রেখে প্রশ্ন করে ওঠেন, আচ্ছা দশরথ, নন্দ রাউতকে চেনো তুমি? মানে অফিসের ওই পিয়ন না কি যেন?

দশরথ একগাল হেসে বলে, তা আর চিনব না সায়েব? ওকে এখানের কে না চেনে? তাছাড়া ও তো আমাদের পার্বতীর স্বামী। মানে সেদিন যে মেয়েছেলেটা আয়ার কাজ করব বলে এসেছিল, তারই। ওর নাম হচ্ছে পার্বতী।

ও তাই বুঝি? কিন্তু বলতে পারো অমন বিশ্রী লোকটা কী করে ওই ভাল মেয়েটার স্বামী হলো?

দশরথকে দেখতে যতই বোকা মনে হোক, আসলে বোকা সে নয়। অনেক সময় আত্মরক্ষার্থে বোকা সাজে। দশরথ অতএব এই প্রশ্নের মধ্যে একটি গভীর রহস্যের সন্ধান পেয়ে একটি মধুর রসের আস্বাদ পায়। তাই মহোৎসাহে বলে, কপাল হুজুর! কপাল মন্দ না হইলে বংগালী বেহারীতে বিয়া হয়?

বাঙালী বেহারীতে! সায়েব প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকান।

দশরথ আরো উৎসাহ বোধ করে, তাই তো সায়েব! হউছি তো তাই! পার্বতীদিদি বংগালীর মেয়ে, আর ওই রাউতটা বেহারী!

লোকটা তো বুড়ো!

তো ওটা তো পার্বতীদির বাপর সাঙ্গাৎ—বলে তড়বড় করে পার্বতীর এই শোচনীয় অমন বিবাহের কারণ বর্ণনা করে উপসংহারে বলে, রাউতটা চামার অছি। মেয়েটা অত গুণবতী অছি, তথাপি প্রহার দিয়ে দিয়ে হাড্ডি-গোড্ডি চূণ্য করে দেয়। আবেগের বশে আপন মাতৃভাষার উচ্চারণটা বেরিয়ে আসে তার।

প্রহার? মানে লোকটা স্ত্রীকে মারে?

বিপুল মারে হুজুর! চুল টানি দেয়, মুণ্ড ঠুকি দেয়।

সায়েবের করুণা উদ্রেকের আশায় দশরথ বেশ জোরালো করেই বর্ণনাটা করে। নন্দর ওপর তার রাগও আছে। পার্বতীর সঙ্গে একটু কথা কইতে দেখলেই নন্দ দশরথকে

দাবড়ানি দেয়। অথচ মেমসায়েবদের সূত্রে পার্বতীকে এখানে আসতেই হয়। অর্থাৎ নন্দই আসিয়ে ছাড়ে। তা এক জায়গায় থাকতে হলে দুটো সুখ-দুঃখের কথা হয় না? মেমসায়েবরা যখন অযথা ধমক দেন, তখন দশরথের ইচ্ছে হয় না আড়ালে তাদের দুটো গালমন্দ করে? তা দেয়ালের কাছে করবে নাকি?

একবার একটা কচি বাচ্চা সমেত এক মেমসায়েব এসেছিলেন। পার্বতীকে কিছুতেই ছাড়েননি, দিন চার-পাঁচ রাত্রে থাকতে হয়েছিল, ওই নন্দটা এসে দশরথের ঘরের সামনে খাটিয়া পেতে শুয়ে থাকত।

সেই মেমসায়েব তো পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে ঝুলোঝুলি। একশো টাকা মাইনে দিতে চেয়েছিল। বাড়ির লোকের মত থাকবে বলে লোভ দেখিয়েছিল। যার বাচ্চা-কাচ্চা নেই তার পক্ষে ছোট বাচ্চার কাজ যে খুব আনন্দের একথাও বুঝিয়েছিল। আর মাঝে মাঝে ছুটি দেবে আশাও দিয়েছিল। সেই মিনতির হাত থেকে অতিকষ্টে রক্ষা পেয়েছিল পার্বতী।

কিন্তু নন্দর ধারণা হয়েছিল দশরথই ওই মেমসায়েবকে প্ররোচিত করেছিল। মেমসায়েবের কথা ঠ্যালা যে নন্দর পক্ষে কত কঠিন, সে কথা নন্দই জানে। নন্দ তাই দশরথকে আচ্ছা করে কড়কে দিয়েছিল।

পার্বতী সেবার বলেছিল, বুঝলি দশরথ, আজ তোদের রাউতের পরিবারের ওপর টানের পরীক্ষে হয়ে গেল। সায়েবের কথা ঠেলেছে রাউত।

কিন্তু আজ দশরথের বর্ণনায় সায়েব বিগলিত হলেন কিনা বোঝা গেল না, তিনি চুপ করেই গেলেন। এবং বইটা হাতে তুলে নিয়ে খেতে লাগলেন।

না, চাকর-টাকরদের সঙ্গে এর বেশী গল্প করা চলে না। তবু দশরথ সায়েবের ওই আনত মুখের মধ্যে কোন লিপি আবিষ্কার করে ফেলল, এবং তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারতে লাগল পার্বতীর কাছে গিয়ে সায়েবের করুণার কাহিনী পেশ করতে। অবশ্য যাবার ছুতো একটা আবিষ্কার করে ফেলতে হবে।

ছুতোটা কাজে লাগাতেই পার্বতী হি-হি করে হেসে উঠল, সে কি রে দশরথ, তোর হাতের রান্না খেলে যে মরা মানুষ জীইয়ে ওঠে রে। আর মুখার্জি সায়েব সে রান্না মুখে তুলতে পারছে না? আধপেটা খেয়ে খেয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছে?

দশরথ বিনয় বচনে বলে, এটা পার্বতীর তামাশা! পার্বতী যদি দয়া করে অন্তত একটা বেলাও রান্নাটা করে দিয়ে আসে।

পার্বতী হেসে হেসে বলে, আর কতদিন থাকবে সায়েব?

তা অনেক দিন—, বলে দশরথ সময়টাকে অনিশ্চিতের কোঠায় তুলে দেয়।

পার্বতী ভুরু কুঁচকে বলে, তবে গিন্নী আসছে না কেন? মেমসায়েব?

মেমসায়েব? দশরথ মুখ-চোখের বিশেষ ভঙ্গী করে বলে, সে অনেক গূঢ় কথা!

মনে হয় সেই গূঢ় কথাটি দশরথ ফাঁস করবে না। কিন্তু ফাঁস করবার জন্যেই যে মরে যাচ্ছে সে! অতএব ফাঁস খুলে গাঁটরি ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না।

তা একা দশরথই নয়, এমন মজার কথাটি ফাঁস না করে কে-ই বা থাকতে পারে? পার্বতীও তো পারল না? নন্দর মত একটা শুকনো লোকের কাছেও বলে ফেলল, শুনলাম আজ সায়েবের বিত্তান্ত! মেমসায়েব সায়েবকে ত্যাগ করেছে!

নন্দ ভুরু পাকিয়ে বলে, কে কাকে ত্যাগ করেছে?

মেমসায়েব সায়েবকে। সেই যে ডাইভোস গো!

নন্দ বিরক্ত হয়ে বলে, হেসেই মলো! কী এত হাসির কথা!

ও মা, হাসির কথা নয়? অমন সত্যি সায়েবের মত সায়েব সোয়ামী, হাজার দু'হাজার টাকা কত যেন মাইনে, তাকে ত্যাগ?

নন্দ কড়া গলায় বলে, সায়েবটা নিশ্চয় নষ্ট-চরিত্তির।

দূর, কী যে বল! সায়েব দেশ-বিদেশে ঘোরে, মেমসায়েবের কলকাতা ছাড়াই চলে না—

চলে না কেন শুনি?

আহা, মেমসায়েবও চাকরি করে যে। সে নাকি বলে, তোমার থেকে মাইনে কম বলে কি আমার চাকরি চাকরি নয়, তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তোমার ল্যাংবোট হয়ে ঘুরতে হবে! এই নিয়ে মনান্তর।

হুঁ! বাচ্চা-কাচ্চা নেই?

আছে। একটা মেয়ে। তাকে বোটিঙে না কোথায় রেখে দিয়েছে।

হঠাৎ নন্দ ধমকে দিয়ে ওঠে, বলি তোকে এত খবর সাপ্লাই করল কে শুনি?

পার্বতী ওর ওই হঠাৎ চটে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে অম্লান বদনে বলে, আবার কে? সায়েব নিজেই!

সায়েব নিজে তোকে বলেছে! নিজের ঘরের এই সব কেচ্ছার কথা!

পার্বতী আরো অমায়িক ভাবে বলে, বলল তো।

বলি কখন হলো এত কথা?

গেছলাম যে। দশরথ এসে হাপসে পড়ল ওর রান্না খারাপ, সায়েব খেতে পারছে না, আমি যদি গিয়ে একটু রেঁধে দিই—

শুনেই তুই অমনি ছুটে গেলি কুকুরের মতন?

পার্বতী চোখ বড় করে বলে, ও মা, তা যাব না? সায়েব-সুবোর কাছে আমরা কুকুর ছাড়া আবার কি?

আমরা ওদের কাছে কুকুর!

একশোবার। পার্বতী গা-হাতে আড়ামোড়া ভেঙে বলে, তাছাড়া একটা মানুষের খাওয়া হচ্ছে না শুনলে—

পেরান কেঁদে ওঠে, কেমন? আমি বলে দিচ্ছি বাতি, ওই সাহেবটা পাজীর পাঝাড়া নষ্ট-চরিত্তির। নইলে শুধু শুধু পরিবার ডাইভোস করে! ফের যদি তুই ওদিকে যাবি তোকে জ্যান্ত গোর দেব।

এত বড় শাস্তির ভয়েও কিন্তু ভীত হতে দেখা যায় না পার্বতীকে। অথবা ক্রুদ্ধ। খুব নরম গলায় বলে সে, আর সায়েব যদি নিজে আসে?

নিজে আসবে? সায়েব নিজে আসবে?

ও মা, তা আসতেই পারে। এই তো সেদিন ধরেই ছিল! এটাই তো শহরে যাওয়ার পথ, হরদমই তো যাচ্ছে আসছে এই পথে।

নন্দ হঠাৎ উঠে প্রায় ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, আর হরদম তোর সঙ্গে মোলাকাৎ হচ্ছে, কেমন?

তা হওয়াটা আশ্চর্য কি। বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় পার্বতী।

আশ্চর্য মনস্তত্ত্ব এই পার্বতীর! হরদম বানিয়ে বলে চলে এইরকম সব সর্বনেশে কথা। যেসব কথায় নন্দ ক্ষেপে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারায়, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, সেই সব কথাই ও বেপরোয়া বানাবে। মার খাবে তবু বলবে। কেন? পার্বতীই জানে আর তার সৃষ্টিকর্তাই জানে।

সায়েবটাকে আমি খুন করব। পায়চারি করতে করতে ঘোষণা করে নন্দ, যখন সার্ভে করতে এদিক-ওদিক যাবে, একা পড়বে, শেষ করে ফেলব।

আহা ষাট ষাট! পার্বতী যেন শিউরে ওঠে, অমন সোনার কাত্তিক মানুষটাকে শেষ করে ফেলবে তুমি? বলতে একটু দরদ হচ্ছে না?

দরদ? দরদ তোর হচ্ছে হারামজাদী? দরদে মরে যাচ্ছিস তুই তা দেখতে পাচ্ছি। সব পাপের শেষ করে ছাড়ছি দেখ্ না।

পার্বতী বসে পড়ে অসহায় গলায় বলে, আমারই কপাল! এতদিনে একটা মনের মানুষ জুটেছিল, তাও কপালে সইল না। তোমার হাতে আমাকেও মরতে হবে একদিন তা দেখতে পাচ্ছি।

বেশী ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করতে চেষ্টা করলে মরতেই হবে তা বলে দিচ্ছি বাতি!

পার্বতী গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, সায়েবই যদি খুন হয়, কার ভরসায় আর ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করব? তবে দেখ খুন করবার সময় কেউ সাক্ষীটাক্ষী না থাকে! তাহলেই তো ফাঁসি! আমি তখন আবার দাঁড়াব কোথায়?

নন্দ চলতে চলতে ঝপ করে ঘুরে দাঁড়ায়, ভীষণ স্বরে বলে, আমার ফাঁসির থেকে বড় চিন্তার বিষয় হলো তোর দাঁড়াবার চিন্তা?

তা বড়ই বৈকি। না-পাহারায় একা পড়ে থাকা যুবতী মেয়েছেলের কী দুর্গতি তা তো নিজেই জানো।

পার্বতী মনে পড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে, সেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মরা গণেশ দাসের বৌটার কথা ভাবো। ছুঁড়ীকে শেষে কোন্ যেন সায়েবের বাংলোয় গিয়ে উঠতে হলো! তুমিই তো পথ চিনিয়ে দিয়ে গেছলে গো, মনে নেই?

আমি? আমি পথ চিনিয়ে? দেখেছিস তুই আমাকে ওসব করতে?

পার্বতী তাড়াতাড়ি বলে, আহা দেখব কোথ্থেকে? ওসব কাজ কি আর কেউ দেখিয়ে দেখিয়ে করে? ছুঁড়ী নিজেই বলেছিল তাই জেনেছি।

বলেছিল? তোর কাছে বলতে এসেছিল?

এসেছিল তো! বলল, তোমার সোয়ামীই আমার এই সর্বনাশটি করল!

হ্যাঁ, অবলীলায় এসব মিথ্যে কথা বলে যেতে পারে পার্বতী, মুখে বাধে না। কিন্তু কেন বলে সেইটাই রহস্য। লোকটাকে ক্ষ্যাপানোই কি তা হলে ওর একমাত্র আনন্দ?

নন্দ এতদিন দেখছে ওকে, তবু ধরতে পারে না কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে। তাই ঝপ্ করে মিইয়ে যায়, মিয়োনো গলায় বলে, সববোনাশ! যত সব ইয়ে! এখন তো হারামজাদী সাত বেটাছেলের নাক কেটে বেড়াচ্ছে!

তা বেড়াবে বৈ কি। তাছাড়া আর কী করবে? পার্বতী গলায় এক কলসী সহানুভূতি ঢেলে বলে, বেঁচে থাকতে তো হবে?

হবে! গণেশ দাসের পরিবারটি বেঁচে না থাকলে পৃথিবীর মস্ত লোকসান! বলে নন্দ হাঁড়িমুখে ঘরের মেঝের হাতচারেক জমির মধ্যেই পাক খেতে থাকে।

পার্বতী স্বামীর জন্যে পরিপাটি করে ভাত বাড়ে, জলের ঘটি এগিয়ে দেয়, পিঁড়ি পাতে, তারপর আঁচল ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলে, যাক গে মরুক গে গণেশ দাসের পরিবার, রাউত মশাইয়ের পরিবারটা না আবার বিপদে পড়ে সেটা দেখ, সায়েবকে যদি খুন-টুন কর তো আড়ালে নিয়ে গিয়ে করো।

নন্দ পিঁড়িটি পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে শুধু মাটিতে বসে পড়ে ভাতের কাঁসিটা টেনে নেয়, গব গব করে খেতে খেতে বলে, মারব এমন করে, সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। ওর গাড়িতেই ওর অ্যাক্সিডেন্ট হবে।

ও মা, কী করে? পার্বতী চোখ বড় করে বলে, মন্তর পড়বে নাকি?

কী পড়ব তা এখন তোর কাছে বলতে যাব নাকি? বললে তুই আবার সোহাগ করে লাগিয়ে দিতে যাবি কিনা কে জানে! বলে নন্দ কাঁসির ভাত শেষ করে ফেলে বলে, ভাত দে।

॥১২॥

পরদিন নন্দ যখন অফিসের পোশাক-টোশাক পরে তৈরি হচ্ছে, পার্বতী আস্তে বলে, সত্যিই যেন কোন দুর্মতি করতে যেও না।

ভয় একটু ঢুকেছে পার্বতীর। সোজাসুজি যখন ঘোষণা করেছিল নন্দ ওকে খুন করবে তখন ভয় হয়নি পার্বতীর। তখন ঠিক জানত আওয়াজটা ফাঁকা। কিন্তু ওই গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট ঘটানোর কথা শুনে পর্যন্ত প্রাণটা ধ্বক্ ধ্বক্ করছে। এই কুচক্রী লোকটার মাথায় কুটিল কৌশলের অভাব নেই, ভগবান জানেন তার কোনটা মাথায় খাটিয়ে যা বলছে তাই ঘটিয়ে বসবে কিনা। পার্বতীর একটু মজা করার খেসারৎ দিতে একটা মানুষের প্রাণসংশয় হবে? তাও অমন একটা রাজার মত মানুষ?

আশ্চর্য, অমন একটা মানুষ, যার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বললে মনে আহ্লাদ আসে, সেই মানুষকে তার বিয়ে করা বৌ ত্যাগ দিয়েছে! বিশ্বাসই হয় না!

দশরথও বলেছে, সায়েব তো দেবোতা অছি, মেমসায়েবের বুদ্ধি খারাপ।

আবার এই একটা বুদ্ধি খারাপ লোককে পার্বতী শুধু একটা মজা করবার জন্যে ক্ষেপিয়ে তুলে ওই দেবতার মত মানুষটার পিছনে লেলিয়ে দিল!

আচ্ছা কেনই বা পার্বতী লোকটাকে এত ক্ষ্যাপায়? পার্বতী নিজেই জানে না কেন। ও শুধু ভাবে মজা করছি। কিন্তু ও যদি কোন দিন কোন মনস্তত্ত্ববিদের কাছে গিয়ে প্রশ্নটা তুলত, সে হয়তো উত্তর দিত, ক্ষেপিয়ে দিয়ে যাচাই করতে চেষ্টা করে পার্বতী, ক্ষ্যাপাটা ম্যাড়া না মোষ?

তবে ওসব কথা পার্বতী জানে না। নিজের মনের কথা কেই বা জানে? পার্বতী কিন্তু এখন সত্যিই একটু ভয় পাচ্ছে, তাই আস্তে বলে, তুমি যেন কোন দুর্মতি করতে যেও না।

নন্দ কাল থেকেই থমথমে হয়ে আছে। এখন খিঁচিয়ে বলে, কিসেব দুর্মতি?

ওই যে মুখার্জি সায়েবকে মারা-টারা।

ওঃ, তাই! নন্দ দ্বিগুণ খিঁচিয়ে বলে, তাই টনক নড়েছে। ভাবছিলাম বুঝি তেমন নয়, কিন্তু দেখছি একেবারে মজে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছিস! তোর ওই ভালবাসার লোককে

খতম না করি তো আমার নাম নন্দ রাউত নয়। এ তোদের ভেতো বাঙালীর রক্ত নয়। বটে গটগট করে বেরিয়ে যায় নন্দ।

পার্বতী দাঁড়িয়ে থাকে বোকার মত। পার্বতীর মাথার মধ্যে খুব ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হতে থাকে, পার্বতী অনেক রক্ত দেখতে পায় সেখানে, পার্বতী একটা থেঁতলে যাওয়া দেহকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। পার্বতী দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। বসে পড়ে।

।১৩।।

নন্দ রাউত! অন্য পিয়নরা বলে, সে তো নতুন সায়েবের সঙ্গে বর্ডারে গেছে।

যাওয়াই স্বাভাবিক, কাজ তো বর্ডারেই। সায়েবের সঙ্গে তার পার্সোনাল অর্ডারলি আসেনি, কাজে-কাজেই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো নন্দ।

নন্দই সায়েব দেখলেই হাত পেতে তাদের হাই ধরে। যেখানে জল পড়ে নন্দই সেখানে ছাতা ধরতে যায়। অতএব নন্দ গেছে সাহেবের সঙ্গে বর্ডারে।

বাংলা বেহারের সীমানা নিয়ে যেখানে নতুন করে একটা নির্ধারণ-পর্ব চলছে। বিতর্কিত জায়গাটা সামান্য, কিন্তু দায়িত্বটা অসামান্য। ওই সামান্য থেকেই দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। ওই দায়িত্বটা নিয়েই এসেছেন মুখার্জি সায়েব।

তা সায়েব তো তার খিদমদগারকে নিয়ে গাড়ি চড়ে চলে গেছেন, ওই মেয়েমানুষটা কী করে যাবে সেখানে? যে নাকি নন্দ রাউতকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

জায়গাটা এই অস্থায়ী অফিসটা থেকে কত দূর? তা খুব এতটা নয়।

তবে কি আর একটা মেয়েছেলে হেঁটে গিয়ে তাকে ধরতে পারে? কে জানে তেমন প্রাণের দায়ে পড়লে পারে কিনা। কিন্তু দরকারটা কী? সবাই প্রশ্ন করে।

মেয়েটা বলে, এসে বলব দাদা, বড় বিপদ, এখন বলার সময় নেই।

বিপদ? তাও আবার একটা কমবয়সী মেয়েছেলের!

সবাই মিলে চেষ্টা-টেষ্টা করে একটা ট্রাকে তুলে দিয়ে বেশ খানিকটা পথ বাঁচিয়ে দিল।

কিন্তু এই বাঁচানোটা না বাঁচালেই হয়তো বেঁচে যেত পার্বতী নামের মেয়েটা। বাপের বাড়িতে যার নাম ছিল বাতি, আর ওই আধপাকা চুল আর খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা নীরস কাঠ লোকটাও একদা যাকে সোহাগ করে মোমবাতি বলে ডেকেছে।

জগতে যে যা চায় সে তা পায় না—এটাই সাধারণ রীতি, কিন্তু দৈবাৎ এক-এক সময় সে রীতির ব্যতিক্রম ঘটে বৈকি। আজও ঘটল এই নন্দ রাউত আর মুখার্জি সায়েবের বেলায়।

দু'জনেই একটু নির্জনতা চাইছিল, কার্যক্রমে জুটেও গেল। গাড়িটা ছায়ায় রেখে খানিকটা পায়ে হেঁটে যেতে হচ্ছে সীমানা নির্ধারক অফিসারকে, তার খিদমদগারকেও অতএব যেতেই হয় তাঁর মাথায় ছাতা ধরে ধরে।

মাথায় অবশ্য সোলা হ্যাট, বার বার আপত্তি জানিয়েছেন তিনি ছাতা ধরা সম্পর্কে, কিন্তু নন্দ তো আর ছাড়বার পাত্র নয়। তা ছাড়া নন্দ তো চাইছে একটু নির্জনে নিয়ে গিয়ে ফেলবার।

জায়গাটায় কয়েকটা খুঁটি পোঁতা ছিল, তার ওপারে বেহার। খুঁটিগুলো কে বা কারা উপড়ে ফেলেছে।

হয়তো বিশেষ কোন মতবাদী দল-টল নয়। স্রেফ গরুর গাড়িওয়ালারাই করেছে কাজটা, রাস্তা সংক্ষেপ করতে এবং বিনা লাইসেন্সে ব্যবসা চালানোর পথ সুগম করতে। তেমন অবস্থায় পড়লেই ন্যাকা সাজবে, বলবে জানিনে তো হুজুর, বাপ-দাদার আমল থেকে এই পথেই যাওয়া-আসা করছি।

একটি খুঁটি ওপড়ানো গর্ত পরীক্ষা চলছিল। সায়েব এবং গোলাম দু'জনেই ঝুঁকে পড়েছিল, সায়েব হঠাৎ মুখ তুলে বলে ওঠেন, আচ্ছা রাউত, তোমার দেশ বেহারে?

হঠাৎ প্রশ্নে চমকে ওঠে নন্দ। তারপরই সামলে নিয়ে বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। তবে আমি আর বেহারী নেই সায়েব, বাঙালীই বনে গেছি। আমার ঠাকুর্দার আমল থেকে—

এই সুযোগ। এই মোক্ষম সময়। এই সময়ই ধারে-কাছে কেউ নেই, অতএব এখনই ঝাঁ করে—

নন্দ রাউত তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে দু-হাত কচলে একেবারে গলে যাওয়া সুরে বলে, অফিসে পাঁচজন হুজুর, বলবার জুৎ পাই না, বলছিলাম কি, আপনার যদি...মানে—একা একা থাকেন, তাই—, যতটা ঝাঁ করে বলে ফেলবে ভেবেছিল ততটা হচ্ছে না। লোকটা এদিকে নরম, ওদিকে আবার রাশভারী।

কিন্তু নন্দলাল তো তোমার ভেতরের হাল্কামির খবর জেনে ফেলেছে বাছাধন! তবে আর ভয়টা কি? পরের গোয়ালে ঢুকে বিচুলিতে মুখ দেওয়ার থেকে মাঠের ঘাস খাও না যাদু! নন্দ তেমন ঘাসের মাঠের সন্ধান তোমায় দিতে পারবে। নন্দর নিজের গোয়ালও বাঁচবে।

এইজন্যেই নির্জনতা খুঁজছিল নন্দ। নিজের মাথাটাও রক্ষে হবে নন্দর, আর সায়েবকেও দরকারের সময় দরকারী জিনিসটা যুগিয়ে মনোরঞ্জন করতে পারার আহ্লাদটা পাবে।

সাহেব অবশ্য এককথায় বুঝতে পারেন না, অবাক হয়ে বলেন, কী বলছ?

মানে আর কি—, নন্দ হাত কচলাতে কচলাতে হাতটা প্রায় ক্ষইয়ে ফেলে ঘাড় হেঁট করে হাসি গোপন করে বলে, বলছিলাম কি, যে সব সায়েব এরকম একাট্যাকা এসে ডাক-বাংলোয় ওঠেন, তাঁদের যা কিছু দরকার সবই সাপ্লাই করে থাকে এই নন্দ রাউত আপনার অনুমতি পেলে—

তবু সাহেব অবাক হন। বলেন, কিন্তু আমার তো কই কিছু দরকার নেই!

নন্দ মনে মনে বলে, ন্যাকা! ঘুঘু! কিছু জানো না তুমি! মুখে বলে, আজ্ঞে হুজুর, নেই বললেই নেই, আছে বললেই আছে, তা আমার হাতে স্যার আছে তেমন মেয়েছেলে, যে আপনার মত সায়েব-সুবোর—

শাট্ আপ! হঠাৎ যেন অন্তরালবর্তী কোন বন থেকে বাঘ বেরিয়ে এসে গর্জন করল তোমার এসব কথার মানে?

নন্দর হাত-পা কাঁপতে থাকে। নন্দর হাত দুটো যেন একসঙ্গে আটকেই যায়, আমার দোষ নেবেন না হুজুর, অনেক সায়েব এসব চান-টান, তাই—

তাই তোমাদের অফিস ঘরে সে-সব মজুদ রাখতে হয়, কেমন? বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে!

হঠাৎ নন্দ মাটিতে ভেঙে পড়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে, আমার দোষ নেই সায়েব! আমায় মাপ করবেন সায়েব! ওই সব আগের সায়েব-টায়েবরা—

সায়েব তেমনি ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, খবরদার যেন আর এসব শুনতে না পাই। পাই তা তোমাকে দেখে নেব।

নন্দ আধহাত জিভ বার করে। নন্দ আবার হাত কচলায়।

সায়েব কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থাকেন, তারপর হঠাৎ বলে ওঠেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে মারধর কর?

মারধর! স্ত্রীকে! আমি! আকাশ থেকে পড়া নন্দ হৈ-চৈ করে চেঁচিয়ে ওঠে, বলেছে বুঝি হারামজাদী এইসব কথা আপনার কাছে বানিয়ে বানিয়ে? বিশ্বাস করবেন না হুজুর, একের নম্বর মিথ্যেবাদী মেয়েছেলে—

থাম! সাহেব ধমকে ওঠেন, কে আমার কাছে বানিয়ে বলতে এসেছে!

ওই বদ মেয়েছেলেটার কথা বলছি সায়েব, মানে আমার স্ত্রীর কথা। অতি পাজী আর মিথ্যেবাদী। জন্মেও আমি ওর গায়ে হাত তুলিনি।

কিন্তু আমি শুনেছি যে—

নন্দ রাউতের হৈ-চৈয়ের কাছে কথা এগোয় না। নন্দ প্রবল স্বরে বলে, মিথ্যে শুনেছেন হজুর। স্রেফ মিথ্যে, আমি যদি পরিবারের গায়ে হাত তুলে থাকি তো—, তো কী হতো সেটা বোঝা যায় না, শুধু চেঁচাতেই থাকে নন্দ, সেই হারামজাদী যদি বলে না থাকে তো দশরথ পাজীটা—

হঠাৎ নন্দর চেঁচানি থেমে যায়। নন্দ কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে যায়।

নন্দ কি হঠাৎ ভূত দেখল? অথবা পেত্নী? তা প্রেতিনীর মতই দেখাচ্ছে তাকে। এক গা ঘাম, এক মাথা ধুলো, আর একজোড়া ধক্‌ধকে চোখ নিয়ে যে মেয়েমানুষটা প্রায় আছড়ে এসে সায়েবের জুতোর ওপর পড়ল।

মিথ্যে কথা সায়েব, এই লোকটা একের নম্বর মিথ্যেবাদী। মেরে মেরে শেষ করে দেয় আমায়, ভয়ানক অত্যোচার করে। আর আমি ওর ঘর করব না।

সায়েব কষ্টে জুতো ছাড়িয়ে নিয়ে বিব্রত গলায় বলেন, আরে এটা কী হচ্ছে! ছি ছি! শোন আমি ওকে সেই কথাই—

না না সায়েব, বলে-কয়ে বুঝিয়ে ছেড়ে দিলেও আমি আর ওর ঘরে যাচ্ছি না। আমি আজ জন্মের শোধ ওর ঘর ছেড়ে চলে এসেছি। আপনি আমায় কলকাতায় নিয়ে চলুন, একটা ঝি-চাকরাণীর কাজ জুটিয়ে দেবেন।

কিন্তু আমি—

সায়েব অবশ্যই এই মেয়েটার চেহারা দেখে এবং ইতিহাস শুনে একটু মমতাবোধ করেছিলেন, এবং আজও যে দেশে হাজার হাজার মেয়ে মার খেয়ে স্বামীর ঘর করে, পড়ে মার খায়, এটা ভেবে যেন একটু অভিভূতই হয়েছিলেন। কিন্তু এখন এই পরিস্থিতিতে খুব বিপন্ন-বিপন্নই দেখায় তাঁকে।

কিন্তু পার্বতী নামের সহজ মেয়েটা হঠাৎ যেন ক্ষেপেই গেছে। তাই সে ওই নন্দ রাউতের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করে আবার সায়েবের পায়ের উপর পড়ে বলে, কিন্তু-

টিস্তু শুনব না, আপনি এত বড়, এত উঁচু, আপনি পারবেন না আমায় বাঁচাতে? যদি না পারেন, আপনার ওই গাড়িটার তলায় পড়ে মরব আমি, কেউ ঠেকাতে পারবে না আপনি নয়, আর আপনার পোষা ওই কেন্নোটাও নয়।

কাঠের পুতুলটার মুখ থেকে এবার কথা বেরোয়, এই, কী হচ্ছে কি? সায়েবকে দিক্ করছিস কেন? ওঠ্ বলছি। কিছু মনে করবেন না স্যার, এটা আমারই পরিবার। দেখছেন তো, পুরো পাগল। সাধে কি আর মারধর—এই এখানে এলি কি করে? আশ্চয্যি পাগলীর খেয়াল! যা যা ঘরে যা।

পার্বতী উঠে দাঁড়ায়। পার্বতী পাগলিনীর চোখেই তাকায়, পাগলের গলাতেই বলে, নাঃ! সে ঘরে আর নয়, যে-ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি। একটা কেঁচো-কেনেন্নার দাসীবিত্তি করে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকবার পিবিত্তি আর নেই। হয় মরব, নয় গণেশ দাসের পরিবারের পথ ধরব। ...হি হি হি...সায়েব, লোকটাকে দেখে আপনার কী মনে হচ্ছে? মানুষ তো? হি হি হি...মানুষের মতন দেখতে মাত্তর, আসলে একটা কেঁচো-কেন্নো, একটা গুবরেপোকা। আপনি ওকে জুতো মারলে, ও আপনার জুতোর কাদা মুছিয়ে দেবে।...এই লোকটার হাত থেকে আমি আপনার প্রান বাঁচাতে এসেছিলাম সায়েব! আমার যেমন মরণদশা। ভাবলাম সত্যিই বুঝি গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করিয়ে দিয়ে খুন করে বসে আপনাকে। উঁহু, চমকাতে হবে না। ঢোঁড়া কামড়ায় না।...কই গো, মারলে না সায়েবকে তোমার পরিবারের দিকে কুদিষ্টি দিয়েছে বলে?

নন্দ রাউতের হাত-পা নিস্‌পিস্ করতে থাকে, নন্দর সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দুখানা হাত হয়ে ওর গলা টিপে দিতে চায়, কিন্তু পার্বতীর ভয় নেই, নেই লজ্জাও। পার্বতীর গা থেকে যে আঁচল খসে পড়েছে, সেদিকেও দৃষ্টি নেই।

পার্বতী নন্দর দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের ছুরি বিঁধিয়ে বলে, বেশী চালাকি করতে এসো না বলে দিচ্ছি, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। সায়েবকে নির্জনে কেন ডেকে এনেছিলে? মেয়েছেলে যোগান দেবার ভরসা দিতে?...এটা এমন নিঘিন্নে সায়েব, খুন করব বলে তড়পে এসে পায়ের কাদা চাটে।

ভয়ঙ্কর একটা আশাভঙ্গের জ্বালায় মরীয়া হয়ে উঠলে যেমন বিকৃত ভয়ঙ্কর দেখায় মানুষকে, তেমনি দেখাচ্ছে পার্বতী নামের মিষ্টি চেহারার আমুদে মেয়েটাকে। মজা করে ভিন্ন কথাই কয় না যে।

কিন্তু কেন? কোন্ আশাভঙ্গের দাহে এমন জ্বলছে পার্বতী? সত্যিই কি সে একটা খুনোখুনির দৃশ্য দেখবার আশাতেই অমন করে ছুটে এসেছিল? আর এতক্ষণ ধরে হতভাগা নন্দর মতই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে দুটো মানুষের কথা শুনতে শুনতে সেই প্রত্যাশায় উদ্বেলিত হচ্ছিল? দৃশ্যটা শুরু হয়ে গেলেই সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ত সে রক্ষাকর্ত্রীর মূর্তিতে?

কিন্তু কাকে রক্ষার আশায় অমন উদ্বেলিত হচ্ছিল পার্বতী? সায়েবকে? না তার ওই নিঘিন্নে পিয়নটাকে?

ওর কি সায়েবকে দেখিয়ে দেবার বাসনা হয়েছিল সব মেয়েমানুষই সায়েবের পরিবারের মত নয়? নাকি সায়েবের সামনে আরো একবার জীবন-রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে দাঁড়াতে সাধ হয়েছিল মহিমময়ী মূর্তিতে? কে জানে কি ছিল ওর মনে, বোঝা তো গেল না।

এইমাত্র নটার ভোঁ বেজে গেল, অফিসে বেরোবার আর আধ ঘণ্টা মাত্র বাকি, অথচ রমলা তাকিয়ে দেখলো, এখনো কতো কাজ বাকি। গ্যাস স্টোভের উপর ওর আহার্য বস্তুটা এখনো ফুটছে, স্নান সেরে এসে তবে ঢেলে নেওয়া চলবে। অতএব ঠাণ্ডা হবার সময় আর পাবে না সেই ফুটন্ত অন্ন।

অন্ন না খেচরান্ন!

প্রতিদিনই তো প্রায় ওই চলছে। চাল ডাল আনাজ-পাতি ডিম আলু সব কিছু একসঙ্গে চাপিয়ে দিয়ে একটু নুন ঝাল সহযোগে কোনোমতে গলাধঃকরণ করে নেওয়া। সকালে ওর বেশী আর কিছুতেই কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না।

হবে কোথা থেকে? সব কিছুই তো নিজের হাতে করতে হয়। হতে পারে মাত্র নিজেরই জন্যে, দ্বিতীয় আর কেউ নেই রমলার। এই একখানা ঘরের বিছানাটাও সকালবেলা ঝেড়ে রাখতে হয়, একার চা-টুকুও বানাতে জলটা দুধটা ফুটিয়ে নিতে হয়, একার রান্না রাঁধতেও আয়োজন করে নিতে হয়।

পুরো সংসারের মতই কর্মবন্ধনে বন্দী! স্বাধীনতার মধ্যে শুধু ওই নিত্য খিচুড়ি, দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকলে হয়তো যেটা সম্ভব হতো না। কিন্তু একার ব্যাপারেই বা কতোদিন সম্ভব হবে? পাকস্থলী কি বিদ্রোহ করবে না? রমলা স্নানের ঘরে যেতে যেতে ভাবলো বিজ্ঞাপনের খরচাটা বৃথাই গেল। আজকাল কি 'অভাবী মানুষ' শব্দটা আর নেই? একটা লোকের চেষ্টা করে লোক পাওয়া যায় না? কেউ বুঝি আর খেটে খেতে রাজী নয়? অথচ রমলা ভেবেছিল বিজ্ঞাপনটা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে কর্মপ্রার্থিনী এসে রমলাকে অস্থির করে তুলবে।

কিন্তু কই?

ইস, কতোদিন যে মনের মতো স্নানই করতে পায়নি রমলা! সপ্তাহে একটা রবিবার, তাও সকাল থেকেই এ আসে, সে আসে। তাদের চা কফি বানিয়ে খাওয়াতে আর আড্ডা দিতে বেলা গড়িয়ে যায়, হয়তো আদৌ চানই হয় না। কারণ আবার সেই রান্নাপর্বটি তো আছেই। যে রমলা বলতে গেলে এক গ্লাস জল নিয়ে খায়নি।

'উপকারের মধ্যে তিনি আমার এইটি করেছেন', মনে মনে বলে রমলা, অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছেন অকর্মণ্য করে রেখেছেন।

অবশ্য রমলার আত্মশক্তি রমলাকে বেশী দিন অকর্মণ্য হয়ে থাকতে দেয়নি, রমলা নিজেই নিজের পায়ের তলার বেদী গেঁথে নিচ্ছে, তবে এই নেহাৎ তুচ্ছ নিত্য কাজগুলো বড়ো বিরক্তিকর। এই দু'বেলা রান্নাঘরে ঢোকা, আর সর্বদা সব দিকে দেখা। এর জন্যেই রমলা একটা লোক খুঁজছে। দরকার মতো লোক।

অর্থাৎ স্ত্রীলোক।

কারণ রমলা নিজে যতই আত্মস্থ এবং সাহসী হোক, একেবারে একা বাড়িতে একটা পুরুষলোকে কাজ করছে এটা অস্বস্তিকর। রমলার পক্ষে না হলেও বাইরের লোকের চোখের পক্ষে। নইলে শচীন তো আসতে চেয়েছিল, দিদিমণির সঙ্গে থাকতেও চেয়েছিল। রমলাই নিষেধ করেছে, বলেছে দরকার নেই, ভারী তো কাজ একলাই করে নিতে পারবো।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখছে ওই 'ভারী তো' কাজটা একঘেয়ে হয়ে সত্যিই ভারী ঠেকছে। রাত্রে তো প্রায়দিনই পাঁউরুটির উপর দিয়ে চলছে। যেন দিনগত পাপক্ষয়! যে দিনগুলো বোঝার মতো অর্থহীন।

অথচ এই জীবনই তো চেয়েছিল রমলা। স্বাধীন জীবন! যে জীবনটি একটি আত্মপ্রেমের পরিমণ্ডল রচনা করে আপন বৃন্তে বিকশিত হয়ে উঠে রমলার মহিমা দেখিয়ে দেবে সবাইকে।

রমলার আত্মজন অবশ্য কেউই রমলার এই স্বেচ্ছাচারিতার (তা স্বাধীনতা বস্তুটা তো অপরের চোখে স্বেচ্ছাচারিতাই।) সমর্থক নয়। রমলার মা তো আদৌ নয়, তবু রমলার মা নিতান্তই মাতৃস্নেহের দায়ে পুরনো চাকর শচীনকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রমলা নেয়নি। রমলা বুঝেছিল মায়ের এই ত্যাগটি মারাত্মক ত্যাগ, কারণ শচীনই মার সংসারের কর্ণধার। শচীন পারে না এমন কর্ম নেই, জানে না এমন বস্তু নেই এবং করে না এমন কাজ নেই, সেই শচীনকে ছাড়া!

নাঃ, রমলার ওতে সায় নেই।

তাছাড়া ওই প্রশ্নটাও। যতই শচীন তার পিতৃগৃহের পুরনো লোক হোক, তবু এপাড়ার প্রতিবেশী তো দেখবে আট নম্বর ফ্ল্যাটে শুধু একটি মহিলা আর একটা চাকর।

মহিলাটি যে বৃদ্ধা তাও নয়।

বাপ্‌স! সমাজ দিশেহারা হয়ে উঠবে না?

অতএব ওই নিরাপদ বস্তুটির জন্য বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনটা রমলা তার বাপের বাড়ির ঠিকানাতেই দিয়েছিল, কারণ এখানে তো সে সারাদিনই অনুপস্থিত।

মাকে বলে দিয়েছিল যদি কেউ আসে তুমি বুঝেসুঝে সময়মতো শচীনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও।

কিন্তু এই তো কদিন হয়ে গেল, কোথায় কে? সাধে কি আর ভাবছে রমলা, অভাবী লোক দেশ থেকে উঠে গেল না কি? চাকরির দরকার নেই কারুর?

নাঃ, একেবারে বোধ হয় উঠে যায়নি, আছে চাকরির দরকার অন্তত একজনেরও। সেটা প্রমাণ হলো রমলা যখন তার সেই অপূর্ব খেচরান্নটি পাতে ঢেলে নিয়ে খেতে বসেছে!

বেল্ বাজলো।

রমলা তাড়াতাড়ি থালার উপর আর একটা থালা ঢাকা দিয়ে রেখে দরজা খুলতে গেল। ওই খাদ্য দৃশ্যটি তো বিশেষ গৌরবজনক নয়।

ভেবেছিল পাশের ফ্ল্যাটের মিঠু। মেয়েটা আসে মাঝে মাঝে। দেখে থতমত খেলো, মিঠু নয় শচীন, আর তার পিছনে একটি সুশ্রী সভ্যভব্য মেয়ে। মানে মেয়েলোক।

শচীন তড়বড় করে বলে ওঠে, এই যে দিদিমণি, এই লোক আপনার কাগজের অ্যাড্‌ভারটাইজমেন্ট দেখে এসেছে। এখন দেখেশুনে নিন, কথাবার্তা বলুন, আমি যাই তাড়া আছে।

রমলার অবশ্য ওই মেয়েলোকটিকে দেখে মনে হলো যেন মাথার যন্ত্রণার সময়ে 'সারিডন' পেলো, কিন্তু শচীনের ব্যস্ততায় হাড় জ্বলে গেল তার।

রেগে বললো, কেন, কী রাজকার্য আছে তোমার এখন?

সে এখন বলতে বসলে মহাভারত, শচীন বলে, এখন যেতে হবে দাদাবাবুর সঙ্গে 'ট্যুরে'। অফিসের কাজে মগরা যেতে হচ্ছে দাদাবাবুকে, দিন দুই থাকতে হবে, শচীন ছাড়া আর কে যাবে সঙ্গে?

তা তো বুঝলাম! খুব কাজের মানুষ তুই, কিন্তু আমার এখন কথা বলার সময় আছে? এই সময়ে আনে?

কী করবো দিদিমণি, ও তো এই মাত্তরই এলো। এখন না আনলে দুদিন বসিয়ে রাখতে হতো। শচীনচন্দর মগরা থেকে না ফিরলে তো আর...কথা আর কি? থাকবে, কাজ করবে, খাবে দাবে, মাইনে নেবে, ব্যস এই তো! আচ্ছা চলি।

শচীন ছুটে চলে যায়।

রমলা সেদিকে একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে মায়ের বিবেচনার অভাব সম্বন্ধে অনুক্ত একটি মন্তব্য করে, তারপর ঈষৎ নরম গলায় বলে, এসো ভিতরে এসো।

নরম না হয়ে উপায় কি! গরজ বড়ো বালাই! কিন্তু মার অবিবেচনার সমালোচনা না করে করবে কি বাবা? এখন রমলা ওকে নিয়ে করে কি, খেতে দেয় কি, রাখে কোথায়? এক্ষুনি তো বেরিয়ে যেতে হবে?

মরুকগে, আজ অফিসের বারোটা বাজলো আর কি! তবে দেখতে-শুনতে মন্দ নয়, জামা-কাপড়ও ফর্সা। ভদ্রমতোই। অবিশ্যি চট করে বেশী নরম হওয়া ঠিক নয়, তাই রমলা কণ্ঠস্বরে একটি মাত্রা-যন্ত্র বসিয়ে ফেলে বলে. কোথা থেকে খবর পেলে আমার কাজের লোকের দরকার?

মেয়েটা কোনো উত্তর না দিয়ে হাতের মুঠো থেকে খবরের কাগজের একটু কাটিং বার করে রমলার দিকে এগিয়ে ধরলো।

রমলা অবশ্য হাত বাড়িয়ে নিলো না, কারণ বুঝেই তো নিয়েছে জিনিসটা কী, তাই বললো, ওঃ! কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে? পড়তে পারো তুমি?

একটু একটু।

তা বেশ! আচ্ছা পড়ো তো দেখি আমার সামনে—

এটা একটা কায়দা করলো রমলা। সত্যি পড়তে পারে কিনা দেখা এবং রমলার চাহিদা কী সেটাও মুখোমুখি পরিষ্কার করা।

তা মেয়েটা হারে না, সাবধানে স্পষ্ট স্পষ্ট উচ্চারণে পড়ে. 'গৃহকর্মের জন্য রান্না ইত্যাদি কাজ জানা নির্ঝঞ্ঝাট স্ত্রীলোক আবশ্যক। বৃদ্ধা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। থাকা খাওয়া পঞ্চাশ টাকা।'

হ্যাঁ, এটা লিখেছিল রমলা।

সর্বদা চোখের সামনে একটা বুড়ী ঘুরবে, এটা রমলার অসহ্য। কমবয়সী হলে তবু নিজের প্রসাদী জামা কাপড়-টাপড় দিয়ে সভ্য চেহারা করে নেওয়া যাবে, তাছাড়া শাসনেও রাখা যাবে। বুড়ীগুলো তো মুরুব্বিয়ানায় ওস্তাদ, অথচ চা কফি বানানো বা জলখাবার তৈরি, বাড়িতে হঠাৎ কেউ এলে তার জন্যে চা করে দেওয়া, এসবে শূন্যি! এ মেয়েটা রমলার আদর্শ অনুযায়ী. অন্তত চেহারায় ও বয়সে।

পড়লে তো ভালই, এখন বল কাজকর্ম কি কি জানো?

মেয়েটা রমলাকে একটু চমকে দিয়ে বলে, আপনার কি কি চাই বলুন?

প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন আশা করেনি রমলা, ভেবেছিল, গুজ গুজ করে বলবে 'সব জানি'।

তা নয়, উল্টে প্রশ্ন!

রমলা ঈষৎ ধাতব স্বরে বলে, সবই চাই। রান্না, কাপড়-কাচা, সাবানকাচা, ঘরসাফ্, বাসন ধোওয়া, চা-টা তৈরী,...একটু দম নিয়ে বলে, দরকার হলে খাবার তৈরী।

একসঙ্গে সব কাজগুলোর নাম করতো না রমলা, ভেবেই রেখেছিল সইয়ে সইয়ে ঘাড়ে চাপাবে। কারণ একজনের কাজ আস্ত একটা লোকের পক্ষে কিছুই নয়, বিশেষ করে যে খেতে পারতে পাবে, ভাল বাড়িতে থাকতে পাবে, এবং তার ওপর পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাবে। অবশ্য এর কমে জুতো-সেলাই চণ্ডীপাঠের লোক যে পাওয়া যাবে না সে কথা জানতো বলেই রমলা একেবারে পঞ্চাশ টাকা ধার্য করে দিয়েছে। তবু একে একে সব কাজের নাম করতে বসলে যে শুনতে অনেক মনে হবে, সে জ্ঞানও ছিল রমলার।

কিন্তু এখন ওই মেয়েটার বুকের পাটা দেখে রেগে গিয়েই সব কাজের ফিরিস্তি দিয়ে বসলো বটে, তবে দমাতে পারলো না মেয়েটাকে। সে অনায়াসে ঘাড় কাত করে বললো, পারবো। খাবার-টাবারগুলো একটু বলে দেবেন।

কাজ কিন্তু আমার খুব পরিষ্কার চাই, পারবে?

রেখে দেখুন—মেয়েটা চটপট জবাব দেয়—পছন্দ না হলে ছাড়িয়ে দেবেন।

রমলা ভুরুটা কোঁচকালো।

কথাবার্তা বেশ জানা আছে দেখছি। কানে একটু লাগছে বটে, তবে বোকা হাবার থেকে ভালো। শচীনটারও ছেলেবেলা থেকে কম কথা নয়, বাক্যির জাহাজ—ভাবে রমলা।

মুখে বলে, ঠিক আছে। তা কবে থেকে থাকবে?

কবে থেকে!

মেয়েটা যেন বিস্ময়ের সাগরে ভাসে, কবে থেকে কেন? আজ থেকেই! আমি তো সোজা হাওড়া ইস্টিশান থেকে আসছি।

হাওড়া ইস্টিশন? তাই নাকি? কোথাকার লোক তুমি? মানে তোমার দেশ কোথায়?

ধলভূম।

ধলভূম! সেটা আবার কোনখানে? এইটুকু স্বগতোক্তি করে রমলা সবজান্তার ভঙ্গীতে বলে, ও, কিন্তু তাহলে? আমার তো তাহলে দেখছি তোমার জন্যে অফিসটাই কামাই করতে হবে আজ!

সে কী? মেয়েটা ব্যস্ত হয়ে বলে, না-না আপনি যান!

যাবো কি, এখনো তো খাওয়াই হয়নি।

খাওয়াই হয়নি? কেন? আমার জন্যে? ছি ছি আপনি খেয়ে নিয়ে অফিস যান মেমসায়েব!

রমলা তীক্ষ্ণ গলায় বলে, আমি খেয়ে নিয়ে চলে যাবো? আর তুমি?

আমি? আমার জন্যে আপনি...না না, কী যে বলেন মেমসায়েব! আমাদের একবেলা না হলেও—

মেমসায়েব! হঠাৎ মেমসায়েব বলতে বসলে যে?

তবে কী বলবো?

মেয়েটা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে।

কেন? দেখলে না তোমায় যে পৌঁছে দিয়ে গেল সে কী বললো? 'দিদিমণি' বলবে।

দিদিমণি? বেশ তাই যদি বলতে বলেন তো বলবো।

হ্যাঁ, তাই বলবে। কিন্তু তোমাদের একবেলা না খেলে চলে বলে আমি তো সেটা চলতে দিতে পারি না! আমাকে আজ থাকতেই হবে, তুমি কাজটাজ বুঝে নাও, তোমার মতো রান্না করে নিয়ে খাও।

মেয়েটা এবার পরিষ্কার চোখে তাকিয়ে বলে, কাজ বুঝে নিতে কতোক্ষণ? বাড়ির মধ্যেই তো সব আছে? রান্না করে নিয়েই খাবো না হয়, আমার জন্যে আপনার অফিস কামাই হলো, একথা ভাবতে কষ্ট লাগছে।

রমলা একটা কাজের লোকই খুঁজে মরছিল, বেশ স্মার্টও চাইছিল। কিন্তু এর এই চটপটে কথায় যেন বিরক্তিই বোধ করে। তাই হঠাৎ বলে বসে, বাঃ বেশ বলছো তো! তুমি তো এইমাত্র এলে, আমি তোমার হাতে সব ছেড়ে রেখে চলে যাবো? তুমি যে চুরিটুরি করে পালাবে না, তার বিশ্বাস কী?

বলে ফেলেই ভয় ধরে যায় রমলার। এই সেরেছে, ফস্ করে এ কী বলে বসলাম! একমুঠো টাকা খরচা করে বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক আনিয়ে এই করলাম! এর ফল তো 'পত্র পাঠ বিদায়'! আর কি ও এক মিনিটও দাঁড়াবে? ঠিকরে চলে যাবে। এযুগে লোকের আর কিছু থাক-না-থাক, মানটা তো খুব বেশী আছে!

রমলা বঙ্কিম (শঙ্কিত অবশ্য) দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখলো, মনে হলো মেয়েটার চোখের কোণে যেন একচিলতে আগুন ঝলসে উঠলো। কিন্তু না, রমলার চোখের ভুল। মেয়েটা ঠিকরে বেরিয়ে তো গেলই না, কট্ করে কিছু বলেও বসলো না। বরং মৃদু হেসেই বললো, সে তো কাল পরশু যে কোনোদিনই পারি। রোজ তো আর আপনি আপিস কামাই করে বাড়ি পাহারা দেবেন না?

রমলা হঠাৎ যেন নিভে যায়।

রমলার মনে হয়, রমলা যেন এই মেয়েটার কাছে হেরে যাচ্ছে।

রমলা কি একে বলে দেবে, না তোমাকে দিয়ে আমার চলবে না?

কিন্তু তারপর?

সেই সন্ধ্যায় পাঁউরুটি কিনে বাড়ি ফেরা, আর সকালবেলা উঠেই যুদ্ধে লেগে যাওয়া! বিছানা পরিষ্কার, ঘর পরিষ্কার, চা বানিয়ে খাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে খিচুড়ি চাপিয়েই স্নান করতে ছোটা—সে পর্যায়ে কাপড় কাচা, সাবান কাচা, ভিজে কাপড় মেলে দেওয়া ইত্যাদি। তারপর খাওয়া, টেবিল সাফ্, দরজায় চাবি লাগানো, উঃ! ছেদ নেই!

রমলা নিজেকে সামলায়।

কাল্পনিক কারণে বোকামি করে লাভ নেই। তেমন দেখলে বিদেয় করে দিতে কতোক্ষণ? বন্ডে তো সই করছে না কেউ? তবে এতো যখন মুখ সাপোর্ট্, চোরটোর না হওয়াই সম্ভব। খাঁটিদেরই তেজ হয়। কিম্বা বেশী ঘুঘু! যাকগে, যা হবে হবে!

রমলা তাই গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, ঠিক আছে, থাকো তাহলে। এই দেয়াল-আলমারিটায় চাল-ডাল সব আছে, গ্যাসের উনুনও আছে। জ্বালতে জানো তো?

জানি!

কোথা থেকে শিখলে?

আপনাদের মতোন মেমসায়েবদের কাছে কাজ করেই।

মেমসায়েব বলতে বারণ করেছি তোমায়, মনে পড়ছে না?

কসুর মাপ করবেন দিদিমণি। বেশীর ভাগই মনিবকে মেমসায়েব বলতে হয় কিনা, ওই অব্যেস হয়ে গেছে। আর ভুল হবে না।

ঠিক আছে। বলে রমলা টেবিলের ধারে গিয়ে বসে।

দূর ছাই, মেয়েটা তাকিয়েই আছে। কী জ্বালা! শুধু খিচুড়ি নিয়ে খেতে বসায় লজ্জা আছে বৈকি! অপ্রতিভ ভাবটা চাপতেই বোধ করি রমলা তাড়াতাড়ি বলে, এই আলমারিতেই সব পাবে বুঝলে? চাল-ডাল, নুন-তেল, আলুটালু—

আলু আছে? মেয়েটা ঝপ করে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বলে ওঠে, দেরিই যখন হয়ে গেছে দিদিমণি, একটু বসে খান, দুটো আলু ভেজে দিই, খিচুড়ির সঙ্গে ভাল লাগবে।

তুমি আবার এক্ষুনি কি করে আলু ভাজবে? রমলা ভুরু কোঁচকায়, কোথায় কি আছে—

কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটা এগিয়ে গিয়ে ফস করে গ্যাসের উনুনটা জ্বেলে ফেলে তেলের কড়া বসিয়ে দিয়েছে। হাতের কাছেই অবশ্য সব, কড়াখুন্তি তেল-নুন! বঁটিটাও আবিষ্কার করে ফেলেছে।

কাজেই 'থাক্ থাক্, এখন দরকার নেই' বলতে বলতেই মেয়েটা গরম তেলে আলু নাড়তে থাকে।

বিস্ময়ে পুলকে রমলা প্রায় বিচলিত।

অবস্থাটা যাকে বলে আইডিয়াল। রমলার কল্পনায় এতোটা ছিল না। ভাগ্যে কি আর টিঁকবে? হয়তো—

হ্যাঁ 'হয়তো' আছে বৈকি।

রমলার চাহিদার মধ্যে আরও একটা দরকারী কথা ছিল না? 'নির্ঝঞ্ঝাট'! তা এই স্ত্রীলোকটি যে নির্ঝঞ্ঝাট তার কী প্রমাণ পেয়েছে রমলা? কিছু তো জিজ্ঞেসই করা হয়নি। এমন কি নামটাও। কী আশ্চর্য! অথচ ও রমলার পাতে গরম আলুভাজা পরিবেশন করে ফেললো!

রমলা আড়চোখে চাইলো।

মাথায় তো সিঁদুর!

তাহলেই খুব নির্ঝঞ্ঝাট! নির্ঘাত রোজ একবার করে বাসায় যেতে চাইবে। কিন্তু বাসাই বা কোথায়? বললো যে রেলগাড়ি করে এসেছে?

রমলা স্থিতপ্রজ্ঞ হল। ঠাণ্ডা গলায় বললো, তোমার নামটাই তো জানা হল না এখনো। নাম কি?

মেয়েটা গ্যাস নিভিয়ে সরে এসে বলে, পাহাড়ী!

পাহাড়ী! এই নাম? রমলা একটু হেসে ওঠে, আর কোনো ভালো নাম নেই?

আমাদের আবার ভালো নাম!

পাহাড়ী নিজের প্রতি অবজ্ঞার ভঙ্গী করে।

তা এটা মন্দ নয়।

অহঙ্কারের থেকে ভালো।

ভালো নাম তো থাকেই সকলের একটা! পাহাড়ী কী একটা অদ্ভুত নাম! পাহাড়ের

দেশে জন্মেছিলে বুঝি? বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার প্রশ্ন করে, বাড়িতে কে কে আছে?

যেই থাক—পাহাড়ী অস্পষ্ট গলায় বলে ওঠে, আমার কোন ঝঞ্ঝাট নেই দিদিমণি!

রমলা ভেবেছিল জেরার দ্বারা আবিষ্কার করে নেবে ঝঞ্ঝাট আছে কিনা, তা নয়, ও স্রেফ্ বলে বসলো. আমার কোনো ঝঞ্ঝাট নেই।

ঠিক আছে। রমলার আর কোনো দায় নেই।

রমলা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখে বলে, ইস! আমি তাহলে বেরোচ্ছি। তুমি ভাল করে দরজাটরজা বন্ধ করে—

আপনি একটা কাজ করুন—পাহাড়ী বলে, রোজ যেমন বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে যান, তেমনি দিয়ে যান।

সে কী? তুমি একটা লোক থাকবে, আর আমি তালা বন্ধ করে—

তাতে কি! পাহাড়ী অম্লান বদনে বলে, আমার যা কিছু কাজ সবই তো বাড়ির মধ্যে। বাইরে বেরোনোর দরকার তো নেই। এ বরং ভালই হবে, বাইরের কেউ টের পাবে না যে ভেতরে লোক আছে। কড়া নাড়া দেবে না। নচেৎ কড়া নাড়া দিলে খুলতে হবেই। অথচ আপনার কাউকে আমি চিনি না—কথার উপসংহারে পাহাড়ী একটু হেসে ফেলে বলে, তাছাড়া চুরি-টুরি করে পালাবারও উপায় থাকবে না!

রমলার মুখটা লাল হয়ে ওঠে।

কিন্তু এক্ষেত্রে অপ্রতিভ হওয়া মানেই ছোট হওয়া। তাই রমলা নিজেকে সামলে নিয়ে হাসির ভঙ্গী করে বলে, চুরির মতলব থাকলে পাইপ বেয়েও পালানো যায়। যাক কথাবার্তা বেশ ভালই জানো দেখছি। ঠিক আছে—তাই যাবো, তুমিও অবশ্য ভেতর থেকে বন্ধ করে থেকো। কাজকর্ম যা বোঝাবার ওবেলা এসে বুঝিয়ে দেবো।

পাহাড়ী সায় দিয়ে বলে, তাই ভালো। তবে ঘরসংসারী কাজ, বাঙালীর মেয়েকে আর বোঝাবার কী আছে দিদিমণি! এই করতে করতেই তো বুড়ো হলাম!

যদিও বললো 'বুড়ো হলাম', তবু ওর তারুণ্যের লাবণ্যে ভরা মুখটা যেন হাসির আভায় ঝলমলিয়ে উঠলো।

তালাটা লাগিয়ে টেনে দেখে রমলা ভাবতে ভাবতে গেল, কী জানি কাজটা ভালো করলাম কিনা। একেবারে অজানা অচেনা একটা মানুষকে বাড়ির মধ্যে ভরে রেখে যাওয়া—

কিন্তু কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক যোগাড় করতে হলে জানা-চেনাই বা জুটবে কী করে? এটুকু 'রিস্ক' তো নিতেই হবে। তবু মেয়েটার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়, রমলার অস্বস্তিটা খুব ধরে ফেলেছে। একটু বেশী চালাক।

নির্ঝঞ্ঝাটই বা কেন? মাথায় তো সিঁদুর! বরের ঘর থেকে পালিয়ে এসেছে বোধ হয়। ছেলে-মেয়ে আছে কিনা কে জানে। নেই বলেই মনে হল। চেহারায় খুব বাঁধুনী আছে। আর মার্জিত ভাবও আছে।

একটা ঝিকে ঘিরে প্রায় সারাদিন ধরেই চিন্তায় পাক খেতে লাগলো রমলা।

কিন্তু কেন? 'কাজের লোক লোক' করে তো মরে যাচ্ছিল রমলা! অস্বস্তিটা কোথায়?

আর একটু কম সুশ্রী, আর—আর একটু বেশী বয়েস হলেই যেন ভাল হত, এইটাই অবশেষে মনে হল রমলার।

।১৫।

রমলার ফ্ল্যাটটা তিনতলায়, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রমলা ভাবলো, যদি গিয়ে দেখি তালা ভাঙা, এবং পাখি উধাও! ষড়যন্ত্র ছিল, বাইরে থেকে তালা লাগাবার প্রস্তাবটাও তাই—

উঠে এলো।

দেখলো তালা অটুট।

ব্যাগ থেকে চাবি বার করে খুললো, বেল দিলো, ভিতর থেকে সাড়া দিলো পাহাড়ী, তারপর আস্তে খুলে দিলো। একটু ফাঁক করে দেখে হাট করলো।

সাবধানী আছে বলতেই হবে। এটাই দরকার।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই চোখটা যেন জুড়িয়ে গেল রমলার। অন্য দিন যে অবস্থায় রেখে যায়, এসে সেই অবস্থাই দেখতে পায়। টেবিলে এঁটো থালা, ঘরে ছাড়া কাপড়, মেজেয় ধুলো, এখানে তোয়ালে, ওখানে চটি, সেখানে খালি চায়ের কাপ—দেখে জীবনে বিতৃষ্ণা এসে যায়।

এ একেবারে তকতকে ঝকঝকে করে রেখেছে।

টেবলে চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত, সেটা চোখে পড়লো। আর প্রথম প্রশ্নই করলো পাহাড়ী—গা-হাত ধুতে গরম জল লাগবে তো দিদিমণি? জল গরম করা আছে।

রমলা কি তার অতীতের একটি অধ্যায়ে ফিরে গেছে? যে অধ্যায়ে রমলা শীতের দিনে অফিস থেকে ফিরেই গরম জল প্রস্তুত পেতো!

কিন্তু বিগলিত ভাব দেখানো চলবে না।

রমলা নির্বোধ নয়।

তাই রমলা তার সেই নিজস্ব মাত্রাজ্ঞানের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে, জল গরম করা আছে? দাও তাহলে!

কিন্তু মেয়েটা যেন বিগলিত না করে ছাড়বে না। চায়ের সঙ্গে কুচো নিমকি! নিত্য বিস্কিট খেয়ে খেয়ে বিস্বাদ জিভে অমৃত স্বরূপ মনে হল। একটু প্রসন্ন হাসির প্রসাদ বিতরণ করে বললো রমলা, নিমকি করলে কি করে? জিনিস-টিনিস তো কিছু—

নিমকির আর জিনিস কি দিদিমণি, ঘি, নুন আর ময়দা, তিনটেই ছিল। ভেবেছিলাম একটু হালুয়া করে রাখবো, তা সুজি দেখতে পেলাম না।

চায়ের সঙ্গে আমি মিষ্টি খাই না—বলে রমলা ব্যবহারে একটু মানবিকতার স্পর্শ লাগালো, ভাত খেয়েছিলে?

পাহাড়ী ঘাড় নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

তোমার চা রাখোনি?

আপনার হোক!

বাঃ, একসঙ্গেই তো করে নিতে পারতে। একটা বড়ো দেখে কাঁচের গ্লাস-টাস নিয়ে চা করে খেয়ে নাও।

পাহাড়ী বলে, আচ্ছা।

এতোক্ষণে পাহাড়ীর দিকে চোখ পড়ে রমলার, আর খেয়াল হয় সেই সকালে যা পড়েছিল এখনো তাই পরে আছে। তখন তবু বেশ চোস্ত দেখাচ্ছিল, এখন সারাদিনের কাজেকর্মে কোঁচকানো মলিন।

আচ্ছা মেয়েটা যে কাজ করতে এলো তা হাতে পুঁটুলি জাতীয় কিছু তো ছিল না! তার মানে একবস্ত্রে এসেছে! এ কী আশ্চর্য! দ্বিতীয় অন্তত একপ্রস্থও দরকার, এটা ওর খেয়ালে আসেনি? ও কি ভেবেই এসেছিল, কলকাতায় পা দিয়েই চাকরি পেয়ে যাবে? আর মনিবরা ওর জন্যে শাড়ি জামা গুছিয়ে রেখে দেবে?

একটু বিরক্তিই এলো, তবু গলার স্বরে সেটা ফোটাতে পারল না, একটু লজ্জা হল। এতো ভালো করে কাজকর্ম করে মরেছে সারাদিন! তাই রমলা আলগা গলায় বললো, পাহাড়ী, তোমার কাপড়চোপড় আনোনি?

পাহাড়ী অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে আস্তে মাথা নাড়লো।

কী আশ্চর্য! বদলে পরতে হবে এটা ভাবোনি?

পাহাড়ী হঠাৎ পরিষ্কার গলায় বলে ওঠে, যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, তখন কিছুই ভেবে আসিনি দিদিমণি।

রমলা ওর এই স্পষ্টোক্তিতে একটু চমকে না উঠে পারে না। চমকে ওর দিকে তাকিয়ে দেখে একটুক্ষণ, তারপর বলে, রাগ করে ঘর ছেড়ে এসেছো বুঝি?

রাগ করে? না, পাহাড়ী একটু হেসে বলে, রাগ করে নয়।

তবে এক কাপড়ে বেরিয়ে আসার মানে? মেয়েছেলে, ওটা তো ভাববে! কে তোমার জন্যে শাড়ি-জামা নিয়ে বসে আছে?

পাহাড়ী এবারও একটু ঘাড় ফিরিয়ে ধরা-ধরা গলায় বলে, কেউ থাকে কিনা তাই দেখতেই বেরিয়েছি।

ওঃ! রাগ নয় বৈরাগ্য! মনে মনে উচ্চারণ করে রমলা, তারপর একটু হেসে মুখে বলে, তাহলে তো দেখাতেই হয়—থাকে।

বলে উঠে গিয়ে বাক্স খুলে বেছে বেছে পুরনো অথচ দেখতে ভালো (খারাপ দেখতে পাবেই বা কোথায় রমলা?) একটা শাড়ি, ব্লাউস আর সায়া নিয়ে ওর সামনে রেখে বলে—এই নাও পরে ফেলো।

এতো দামী শাড়ি—কুণ্ঠিত প্রশ্ন পাহাড়ীর, ছেঁড়া-খোঁড়া কিছু নেই?

রমলা হেসে ফেলে, নাঃ, নেই বাপু! ওর থেকে সস্তাও নেই, ওই পরতে হবে তোমায় কষ্ট করে!

হঠাৎ কী হল রমলার?

ওর গলার সেই 'মাত্রা-যন্ত্রটা' গেল কোথায়? হঠাৎ এমন হালকা ঘরোয়া সুরে ঝিয়ের সঙ্গে কথা বলছে রমলা? আশ্চর্য তো!

দিন যায়!

ক্রমশই সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটতে থাকে, বাড়তে থাকে। তুমি থেকে 'তুই'তে নামে। সকালবেলা চা খেতে খেতে এবং পা নাচাতে নাচাতে রমলা অনায়াসে ওকে জিজ্ঞেস

করে, তা মাথায় তো সিঁদুর দেখছি, স্বামী-টামী তো আছে, এতো কিসের ঝগড়া হল? ছেলেমেয়েও তো নেই বলেছিস! তবে?

পাহাড়ী ওজন রেখে মৃদু হেসে উত্তর দেয়, ঝগড়া নয় দিদি, সে তো বলেইছি, আসলে ঘেন্না। নিজের ওপর নিজের ঘেন্নায় বেরিয়ে পড়লাম। দাসত্বই যদি করতে হয় তো বিনি মাইনেয় কেন? একটা অমনিষ্যির কাছে পড়ে মার খেয়ে কেন?

রমলার এখন কিছুই করতে হয় না, রমলা যেন তার পূর্ব জীবনের আরাম-আয়েসের স্বাদ পাচ্ছে। রমলা বুঝি ওর এই নিঃসঙ্গ জীবনের অর্থহীনতার গ্রাস থেকেও কিছুটা মুক্তি পাচ্ছে!

কিন্তু কেন?

কেবলমাত্র আরাম-আয়েসে?

নাকি একটা মানুষের অনলস সেবা, আন্তরিক যত্ন, আর বিনীত সাহচর্যই রমলাকে এমন প্রসন্ন শান্তি এনে দিয়েছে? হয়তো তাই। জেদের বশে একক জীবন বরণ করে নিয়ে রমলা শূন্য একখানা ঘরে সংসার পেতে যেন জীবনের ব্যঙ্গমূর্তি রচনা করে বসেছিল। সে সংসারে না ছিল শ্রী, না ছিল শৃঙ্খলা। অতিথি-অভ্যাগত এলে শুধু দু'পেয়ালা চা করে তাদের সামনে ধরে দিতেই, কথার আপ্যায়নে তুষ্ট করবার সময় পেতো না রমলা। এখন পরিচ্ছন্ন সংসারশ্রী!

রমলা বসে গল্প করে, চা এসে যায়, তার সঙ্গে 'টা'-ও। অল্পের মধ্যে কেমন বৈচিত্র্য আনতে পারে পাহাড়ী!

একদিন মেজদি এলো।

সঙ্গে অবশ্যই মেজ জামাইবাবু।

তিনি বললেন, কোন পাহাড় থেকে এই অমূল্য পাহাড়ী ফুলটি আবিষ্কার করলে বাবা?

রমলা বললো, বিধিদত্ত!

তোর বিধাতা চিরদিনই তোর 'ফর'-এ!

বললো মেজদি।

চিরদিনই 'ফর'-এ? রমলা ব্যঙ্গ হাসিতে ঠোঁট বাঁকায়।

মেজদি কিন্তু জোর দিয়ে বলে, নিশ্চয়! নয় কেন? গোড়া থেকে ভেবে দ্যাখ। তবে তুই যদি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুলের কোপ বসাস, সে আলাদা।

স্বামীত্যাগিনী রমলাকে ওর পিতৃবংশের আত্মীয়কুল ত্যাগ করেনি বটে, তবে সমর্থনও করে না কেউ। বাড়ি বয়ে এসে হক্-কথা শুনিয়ে যায়।

রমলার মাও তাই।

একদিন দুপুরবেলা মা এসে হাজির।

রমলা তখন অফিসে।

এখন আর অবশ্য বাইরে থেকে চাবি লাগিয়ে যায় না রমলা, কারণ পাহাড়ীকে বেরোতে হয় নানা কাজে। বাজার করতে, দোকান করতে, লন্ড্রী থেকে কাপড় আনতে।

তা তখন অবশ্য পাহাড়ী ছিল বাড়িতে।

'মাসিমা' 'মাসিমা' করে খুবই যত্ন করে তাঁকে পাহাড়ী। তবু রমলার মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

সারাদিন ধরে ওর গতিবিধি কাজকর্ম দেখেন, এবং জেরার চোটে ওকে নাজেহাল করে ছাড়েন।

পাহাড়ী মনে মনে বলে, তোমার উকিলবাবু হওয়া উচিত ছিল বুড়ী! তবে হারবার মেয়ে তো সে নয়। হাস্যবদনে সব কথারই জবাব দেয়।

তা বলে রমলার মা হাসিতে ভোলেন না, সব বুঝে ফেলেন। তাই মেয়ে এলে প্রথম সম্ভাষণের পালা চুকিয়েই বলেন, কোথা থেকে না কোথা থেকে উড়ে আসা উটকো একটা ঝিকে এতো পছন্দ কেন তোর বুঝেছি! রতনে রতন চিনেছে! উনিও বরকে থোড়াই কেয়ার করে চলে এসেছেন স্বাধীন জীবন পেতে!

রমলা হেসে ফেলে বলে, সারাদিন ধরে ও বুঝি তোমায় ওর জীবনকাহিনী শুনিয়েছে?

হ্যাঁ, ও শোনাতে যাবে! রমলার মা চাপা গলায় বলেন, তেমন বোকা নয় ওটি! ঘুঘু নম্বর ওয়ান! আমিই কথার ছলে জিজ্ঞেস করে করে বুঝলাম। তবে এও বলি, এতোটা ছেড়ে দেওয়াও ঠিক নয় রমি। ও তো দেখলাম তোর বাক্স-সুটকেসও দিব্যি খুলছে-টুলছে।

বাঃ, না খুললে আমার শাড়ি-টাড়ি গুছিয়ে রাখবে কি করে? কাচে, ইস্ত্রী করে, তুলে রাখে, বার করে দেয়, সবই তো করে!

তা বেশ! ভালো! একদিন সর্বস্ব নিয়ে ভেগে না পড়লেই হল!

যায় যদি তো ভাববো আমারই বোকামির ফল!

সেটা ভাবলেই সব ফিরে পাবে?

রমলা একটু হেসে বলে, যা যায় তা কি আর ফিরে পাওয়া যায় মা? তবে নিজের বোকামিতে গেছে ভাবতে পারলে কষ্ট কম!

মা একটু চুপ করে থেকে নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, ওই করেই কষ্ট কমাও মা! কি আর বলবো।

রমলা সেদিকে তাকায়।

রমলা মার পিঠটা জড়িয়ে ধরে হালকা গলায় বলে ওঠে, তা আমাকে কি তুমি খুব দুঃখে পড়ে আছি দেখছো?

না! খুব সুখেই আছো দেখছি!

দেখছো তো? তাহলেই হল! রমলা হেসে ওঠে, মেজদি মেজজামাইবাবু তো তাই বলে গেল। বললো, দিব্যি আছো বাবা! দেখে হিংসে হচ্ছে!

বললো অম্নি এই কথা?

বললো তো! বললো, আমারও যদি তোর মতন একটা মোটা মাইনের চাকরি থাকতো তো, কে চিরকাল ধরে বিনি মাইনের দাসত্ব করে মরতো!

মার বুদ্ধির ঘরে প্রাচুর্যটা যতো না থাক, উত্তেজনার ঘরে আছে। তাই মা তীব্র স্বরে বলেন, সেটা সত্যি বলেনি, তোকে ঠাট্টা করে বলেছে।

রমলা হেসে বলে, জীবনের কোনটাই বা ঠাট্টা নয় মা! জীবনটাই তো একটা ঠাট্টা!

তুমি নিজেই নিজের জীবনটা ঠাট্টার করে তুলেছো! সবাই জানে স্বামীর বদলির চাকরি হলে, সব মেয়েমানুষকেই তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হয়! সেকালে বরং স্বামীর সঙ্গে বাসায় যাওয়াটা নিন্দের ছিল বলে মেয়েগুলো বুক ফেটে মরতো। আর তুমি মেয়ে 'আমার চাকরিটা আমি ওর জন্যে ছাড়বো কেন'? বলে স্বামীকে ছাড়লে! কী বলবো বল!

রমলা মার উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে খুব নিরীহ গলায় বলে, সেকালে কেন বাসায় যাওয়া নিন্দের ছিল মা?

নিন্দের ছিল—তখনকার সমাজব্যবস্থা সেই রকম ছিল বলে! মা রেগে রেগে বলেন, তা সেদিন তো আর নেই?

সেদিন নেই, অন্যদিন এসেছে! রমলা বলে, এক এক দিনের এক এক রকম চেহারা মা, আমার কাছে নিজের সব কিছু ঘুচিয়ে শুধু স্বামীর পিছন পিছন ঘুরে রান্না-ভাঁড়ারের জীবনটাই 'ঠাট্টার জীবন' বলে মনে হয়।

মা আরো উত্তেজিত হন, তোমার সবই উল্টো সৃষ্টি! আবহমান কালই তাই করে এসেছে মেয়েমানুষ!

তা কেন বলছো মা? আবহমান কালের ইতিহাস তো অন্য কথাই বলে! স্বামীরা বাণিজ্যে গেছে, স্ত্রীরা ঘরে বসে ঠাকুর-দেবতার পায়ে ধর্ণা দিয়েছে। স্বামীরা রাজদরবারে, নবাব দরবারে, শেঠজীর দরবারে চাকরি করতে গিয়েছে, স্ত্রীরা বছরে দু'বছরে একবার দেখতে পেয়ে ধন্য হয়েছে। আর এই সেদিনও স্বামীরা বাসায় গেলে স্ত্রীরা যেতে পায়নি বলে বুক ফেটে মরেছে। তবে আর আবহমান কাল মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলো কবে? এই সম্প্রতিই ঘুরছে। নইলে চিরকালই মেয়েরা স্বামীর থেকে সংসারকেই বেশী মূল্য দিয়েছে। এখন অন্য মূল্যবোধ এসেছে।

সেই অন্যটা আর কী? মা রেগেটেগে চেঁচান, অহঙ্কার! অহমিকা, হামবড়াই! অমন দেবতুল্য জামাই আমার, তাকে মনঃকষ্ট দিয়ে তুমি একা সংসার করে, সুখে থাকার বাহাদুরি দেখাচ্ছো, হুঁঃ!

মা তর্কে হেরে রেগে থেমে যান।

তারপর যাবার সময় বলে যান, ওই ঝিটা সম্পর্কে সাবধান থাকিস, ওকে তো আমার মোটেই ঝি-ঝি মনে হল না! কে জানে কী মতলবে কে—

মার অমূলক ভয়ের বহরে রমলা মনে মনে হাসে। তবে ওরও মনে হয়—ঝি ও কোনোকালেও নয়। ভাল ঘরেরই মেয়ে। কিম্বা কেউ কেউ একটা সহজাত আভিজাত্য নিয়ে জন্মায়—যে কোনো কুলেই জন্মাক, পঙ্কে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাদের।

কিন্তু—

মার সঙ্গে তর্কে জিতলেও রাত্রে কেন ঘুম আসে না রমলা নামের নতুন মূল্যবোধে সচেতন মেয়েটার?

না, ঘুম আসে না।

দেবতুল্য একটা মানুষের মূর্তি বারে বারে রমলার ঘুমের চেষ্টার উপর ছায়া ফেলে। তার মুখ আরক্ত, কণ্ঠস্বর গাঢ়।

সে ছায়া রমলার কাঁধের উপর হাত রেখে বলছে, আমাকে ছাড়বে, তবু তোমার জেদের পাগলামি ছাড়বে না?

তোমায় ছাড়ছি একথা ভাবছো কেন? এই যে তুমি পুরো একটি বছর আমেরিকায় কাটিয়ে এলে, তখন তো কতো দূরে থাকলাম!

তখন তুমি আমার বাড়ি, আমার সংসার, সব কিছুর মধ্যে 'আমার' হয়ে ছিলে।

রমলা সেই ছায়ামূর্তির মূর্তিটাকে প্রশ্ন করেছিল, শুধু তোমার বাড়িতে, তোমার সংসারেরর মধ্যে থাকলেই তবে 'তোমার' হওয়া যায়? তা নইলে নয়?

ওটাই তো প্রমাণ।

বাইরের ঘটনার মধ্যে থেকে তুমি প্রমাণ খুঁজবে?

তুমি আমার মা-বাবা, আমার সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করে অন্যত্র থাকবে, একা থাকবে, তার মধ্যেই বা সান্ত্বনা কোথায়?

আমি চলে যেতে চাইনি, তোমার মা-বাবাই আমাকে চলে যেতে বাধ্য করেছেন!

ছায়ামূর্তিটার হাত স্খলিত হয়ে পড়ে রমলার কাঁধ থেকে। একটা গম্ভীর কণ্ঠ শোনা যায়, আমার মা-বাবা যে এতো খারাপ তা আমার জানা ছিল না!

রমলা যেন হেসে উঠেছিল।

বলেছিল, সব কিছুই কি গোড়া থেকে জানা যায়? আমিও যে এতো খারাপ তাই কি জানা ছিল তোমার?

তর্কে হারে না রমলা।

কারো সঙ্গেই না।

সেদিনও হারেনি। বুঝিয়ে দিয়েছিল, বয়সে বড়ো হলেই যা খুশী বলা যায় এটা সভ্য নীতি নয়। ছোটদেরও আত্মসম্মান আছে।

কেউ যদি অভিভাবকের মর্যাদা ভুলে কেবলমাত্র গুরুজনের ভূমিকার অহঙ্কার নিয়ে ঘোষণা করতে পারে—আমাদের বয়েস হয়েছে, দিনকালও খারাপ, সারাদিন বাইরে ঘোরা চাকুরে বৌয়ের দায়িত্ব নেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন, উনি বরং বাপের বাড়ি গিয়ে থাকুন—তাহলে স্বভাবতই ছোটরও আত্মসম্মানের প্রশ্ন আসে।

ক্ষীণ প্রতিবাদ একটা উঠেছিল তবু।

তোমার মা-বাবা ও—

হ্যাঁ, তাঁরাও বলেছেন এখানে কেন? শ্বশুরবাড়িতে থাকাই তো ভালো। অর্থাৎ দুপক্ষই নিজের বাড়িটা ক্লীয়ার রাখতে চাইছেন। অতএব দেখতে চেষ্টা করবো নিজেই নিজের দায়িত্ব বহন করা যায় কিনা।

হাতটা আবার বেষ্টন করে ধরেছিল—কিন্তু আসলে যার ওই দায়িত্বটা বহন করার কথা, তাকে কেন বঞ্চিত করছো? কেবলমাত্র আমার উপার্জনে দুজনের অন্ন কুলোবে না?

ও-কথা তো আগেই হয়ে গেছে। অনেক আগে। অন্নটাই সব নয়!

অতএব এই ছোট্ট ফ্ল্যাট, অকিঞ্চিৎকর আসবাবপত্র, একটি খিদমদগারিনী। রমলার শ্বশুরের অনেক দাস-দাসী, রমলার শ্বশুরের বাড়িতে কতো আসবাবের ঘটা! রমলার শ্বশুরের দরজায় 'হাতি বাঁধা'! রমলা দীর্ঘ পাঁচটি বছর ধরে সেই ঐশ্বর্যের অংশীদার হয়েই থেকেছে। কিন্তু রমলার মাথায় ভূত চাপলো। সন্তানের আবির্ভাব না ঘটায় রমলা নিঃসঙ্গ কর্মহীন দিনগুলো সহনীয় করতে কাগজে দরখাস্ত দিয়ে দিয়ে একটা চাকরি বাগিয়ে বসলো।

রমলা সেধে সমস্যা ডেকে আনলো।

রমলা ইচ্ছে করে জীবনের ছন্দটি ভাঙলো। সেই শান্ত-ছন্দ জীবনে রমলার অসুবিধেটা কি হচ্ছিল, এটাই কেউ ভেবে পায় না। রমলার স্বামীও পায়নি। তাই নিজে সে স্ত্রীকে একটা স্বাধীন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে না গিয়ে বলে গিয়েছিল, বেশ, তোমার যেভাবে

থাকতে ইচ্ছে হয় থাকো, তবে আমি ধরে নিচ্ছি আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কের বন্ধনটা তুমি ইচ্ছে করেই অস্বীকার করছো!

কোনো মেয়ের কি নিজের মতো করে থাকবার অধিকার নেই?

থাকবে না কেন, নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু সেই অধিকার থাকাটাকে কিনতে হয়, তাই না? অনেক দাম দিয়ে কিনতে হয়!

রমলার কথাই ঠিক, রমলার অনেকটা দাম দিয়ে কিনেছে সেই অধিকার। কিন্তু রমলা কি তখন সেটাই 'শেষ কথা' বলে ভেবেছিল? রমলা কি মনে করেছিল সত্যিই ওই সম্পর্ক বন্ধনটা মিথ্যে হয়ে যাবে? রমলার স্বামী রমলার এই ফ্ল্যাটের ঠিকানায় চিঠি লিখে লিখে 'সাবধানতা'র শিক্ষা দেবে না? আর পাগলামির ভূতটা নামাবার অনুরোধ করবে না?

রমলা কি ভেবেছিল, রমলার স্বামী ছুটিতে কলকাতায় এসে কলকাতার সকলের সঙ্গে দেখা করবে, শুধু রমলার সঙ্গে নয়?

রমলা যা ভেবেছিল, তা হয়নি। যা ভাবেনি, তাই হয়েছে। অতএব রমলা আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে গেছে। রূঢ় হয়ে গেছে, রুক্ষ হয়ে গেছে।

কিন্তু বিনিদ্র রাত্রি অনেক উল্টোপাল্টার হিসেব রাখে।

আর সে ছোট-বড় সকলেরই রাখে।

তুচ্ছ বলে কাউকেই অবহেলা করে না।

'পাহাড়ী' নামের তুচ্ছ একটা মেয়ের নামও তার খাতায় ওঠে।

কিন্তু মেয়েটার নাম কি সত্যিই 'পাহাড়ী'?

না ওটা তার নামের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র?

কে জানে!

তবে দেখা যাচ্ছে—বাবার জন্মে যে রকম ঘরে সে না শুয়েছে, সে রকম মোজাইক মেজে, কাঁচের জানলা, শৌখিন পর্দাদার ঘরে ফর্সা বিছানায় শুয়েও সে আজ সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারছে না। তার বিদূষী রূপবতী মনিবানীর মতোই জেগে জেগে একটা মূর্তির ছায়া দেখছে।

কী করছে মূর্তিটা?

একটা আধময়লা লুঙ্গি আর একটা পিঠছেঁড়া ময়লা চিট গেঞ্জি পরে উবু হয়ে বসে রান্না করছে না? তা তো হবেই— এখন আর ময়লা পরতে কী? শাসনকর্তা তো নেই? তাছাড়া কেচেকুচে ফর্সা করে দিচ্ছেই বা কে? অফিসের সায়েবের কাজে যতোই চৌকোস হোক, এসব ব্যাপারে তো হাড় অকমর্ণ্য।

কিন্তু রাঁধছেটা কী?

কী আবার? শুধু 'ভাতে-ভাত' ছাড়া আর কী? নেহাৎ না খেলে নয় তাই পিণ্ডির মতো দলা পাকিয়ে—

ভাবতে গিয়ে পাহাড়ীও যেন বিছানায় দলা পাকিয়ে যায়, বালিশটা যে মাথা রাখবার জন্যে সেটা ভুলে বালিশটাকে মুখে চাপা দিয়ে পড়ে থাকে।.....তবু সেই চাপা দেওয়া চোখের সামনে ঘুরতে থাকে লোকটা—ইঁদারা থেকে জল এনে ঝনাৎ করে বসায়, থালা-ঘটি মাজে, অথবা খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ভরা মুখ নিয়ে বসে বিড়ি খায়।

ঘর সাফ?

না, সে সব করতে দায় পড়েনি তার।

যতো পেরেছে বিড়ি খেয়েছে, আর যতো বিড়ি খেয়েছে ততো পোড়া দেশলাইকাঠি আর বিড়ির শেষটুকরো ঘরে ছড়িয়ে রেখেছে।

হয়তো চালের টিনটা ঢাকা দিয়ে ইট চাপা দেয় না। মেঠো ইঁদুরগুলো এসে সব চাল ধ্বংস করে যায়। হয়তো গুড়ের কৌটো ঢাকা দিতে ভুলে গিয়ে তার মধ্যে আরশোলার অবাধ প্রবেশাধিকার ঘটায়।

কিন্তু সেই ভাঙাচালা রান্নাঘরটায় বসে রেঁধেই কি খায় সে? হয়তো সে খাটুনিটুকু খাটে না।

হয়তো কিছু পয়সার বিনিময়ে অর্জুনের রেস্টুরেন্টে ভাত খায়, যেখানে মেঠো ইঁদুরের মাংসও পিঁয়াজ রসুন দিয়ে রান্না হয়। আর ওই লোকটা—

পাহাড়ী খুব চেষ্টা করে লোকটাকে ঘেন্না করতে, কিন্তু কেমন যেন পেরে ওঠে না! ঘেন্নাটা যেন উল্টে এসে নিজের ওপরই পড়ে!

সকালবেলা অবশ্য কেউ কারো বিনিদ্র রাত্রির খবর পায় না। মনিবানী যথারীতি সাজসজ্জা করে চায়ের টেবিলে বসে মহোৎসাহে প্রশ্ন করেন, আজ কী রাঁধছিস?

চাকরাণী যথারীতি ছিমছাম মূর্তিতে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বলে, আপনিই বলুন কী খাবেন?

ও বাবা! ওসব বলতে-টলতে পারবো না! তুই বুঝে করবি!

চাকরাণীও হাসি-হাসি মুখে বলে, বেশ, তবে আমি আগে থেকে বলবোই না। খেতে বসে দেখবেন।

খেতে বসে মনিবানী দেখে অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই!

হেসে হেসে তারিফ করে করে খায় আর বলে, নিজে রেঁধে খেয়ে যেতে আমার কোনোদিন অফিসে লেট্ হত না। তোর হাতে খেয়ে রোজ লেট্!

চাকরাণীও হেসে হেসে বলে, বেশ, কাল থেকে আপনার নিয়মে রোজ খিচুড়ি চলুক।

নিত্য খিচুড়ির গল্পটা রমলা নিজেই করেছে ওর কাছে।

গল্প না করে উপায় কি! কথা বলার তো একটা লোক চাই! কথা বলতে না পারলে যে আপন মনোভারই পাথর হয়ে বসে দম আটকে আনে। কেউ না থাকলে ঝি-চাকরও কথার সঙ্গী হয় বৈকি। দুধের অভাবে ঘোল, মধুর অভাবে গুড়!

কিন্তু নিজস্ব কথা কেউ কাউকে স্পষ্ট করে বলতে বসে না। ঝি জানে তার মনিবানী চাকরির জন্যে কলকাতায় আটকে আছে, বর বিদেশে, আর মনিবানী জানে ঝিটা তার অত্যাচারী স্বামীর ঘর করতে না পেরে পালিয়ে এসেছে।

কিন্তু ঝিটা যেন আরো কিছু জানে। অথবা জেনেছে। সেই জানার কথাটা বলি কি না বলি বলে কতোদিন যেন কাটলো। শুধু রমলা যখন অফিসে থাকে, তখন প্রায় প্রতিদিন পাহাড়ী রমলার সুটকেস খুলে একটা ফটোর অ্যালবাম বার করে বসে। অ্যালবামটার একটা নামকরণও করেছে সে—'যুগল মিলন'।

তা মুখ্যু একটা ঝি হলেও রসবোধ আছে তার। নামকরণটা ভালই করেছে।

প্রায় আগাগোড়াই শুধু ওই যুগলমূর্তিরই ছবি। পাতার পর পাতা। কোনোটা বসে, কোনোটা দাঁড়িয়ে। কোনোটা আধ-বসে। কখনো বাইরে, কখনো ঘরে, কখনো বারান্দায়,

কখনো বাগানে, কখনো সমুদ্রকূলে, কখনো পাহাড়ের কোলে। আবেশের ভঙ্গী, আবেগের ভঙ্গী।

তাছাড়া—একা রমলার ছবিও অনেক—চুল বাঁধছে, বই পড়ছে, কুকুরছানা নিয়ে খেলা করছে!

পাহাড়ীর কি দেখে দেখে হিংসে হয়? বোধ হয় না। পাহাড়ী শুধু যেন অবাক হয়। .....এতো ভালোবাসা, এতো গলাগলি সব মুছে যায়? পাহাড়ী নিজের কথাও ভাবে। কিন্তু পাহাড়ীর জীবনে এসব কোথায়?

এক এক সময় পাহাড়ীর চোখ জ্বলে ওঠে, ওই ছবিগুলোর মধ্যে থেকে দুজনের একজনকে অপসারিত করে আর একজনের ছবিকে বসিয়ে দেখে—যে ছবিটা তখন আয়নায় ছায়া ফেলছে। আবার হঠাৎ সচেতন হয়ে খাতাটা বন্ধ করে ফেলে, জিভ কাটে, দু'হাত তুলে ঠাকুরের কাছে নমস্কার জানায়। কিন্তু পাহাড়ীর স্বভাবে আছে একটা সর্বনেশে দুষ্টুমি-বুদ্ধি, তাই একদিন সন্ধ্যাবেলা রমলা যখন চা খাচ্ছে, পাহাড়ী সেই অ্যালবামখানা এনে সামনে ধরে বলে, সুটকেস গোছাতে বসে এটা দেখতে পেয়ে ছবিগুলো দেখে নিয়েছি দিদি!

দিদি হেসে ফেলে বলে, বেশ করেছো, খুব ভালো করেছো, এখন রেখে দাও তো!

কী চেহারা! যেমন আপনি, তেমনি সায়েব! যেন হরগৌরী!

ওঃ, খুব যে কথা জানিস দেখছি! দুপুরবেলা বুঝি ওই কর্ম হয়?

বকার ভঙ্গীতেই বলে বটে, তবু রমলার কণ্ঠে কোথায় যেন পুলকের সুর ফোটে। হয়তো এই মেয়েটার কাছে নিজের বসন্তের দিনের, ঐশ্বর্যের দিনের পরিচয়টা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় প্রচ্ছন্ন একটা গৌরব অনুভব করে সে। মেয়েটা রমলাকে শুধুই একটা কেরানী পুরুষের মতো দেখছে, রমলার যেন আর কোথাও কিছু নেই, কোথাও কিছু ছিল না, তবু তো বুঝলো রমলা একটা মূল্যহীন কেরানি মেয়ে মাত্র নয়।

কিন্তু রমলার সেই চাপা পুলকে উজ্জ্বল মুখটা মুহূর্তে 'কাঠ' হয়ে যায়।

রমলা চমকে ওঠে।

রমলা দেখে অ্যালবামটা তুলে রাখবার লক্ষণ না দেখিয়ে মেয়েটা নিমগ্ন ভাবে বলছে, এই সায়েবকে আমি দেখেছি—

সায়েবকে আমি দেখেছি!

রমলার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চড়াৎ করে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে যায়।

রমলার কণ্ঠ থেকে একটা তীব্র স্বর যেন ঠিকরে ওঠে, দেখেছো? মানে?

মানে আর কি, সায়েবের কুঠিতে কাজ করতে যেতে হয়েছিল। আহা! সায়েব তো নয় দেবতা!

রমলার মধ্যে আরও একবার সেই বিদ্যুৎ-প্রবাহের ক্রিয়া ঘটে। আর সেই চকিত আলোয় রমলা যেন এই মেয়েটার স্বামীর ঘর থেকে একবস্ত্রে চলে আসার সূত্র আবিষ্কার করে বসে।

রমলার মুখটা আরো কাঠ হয়ে ওঠে, আর রমলার গলার স্বর আরো কর্কশ। রমলা সেই গলায় বলে, সেই কুঠিটা কোথায় শুনি?

আমাদের ধলভূমে। সরকারী ডাকবাংলোর কুঠিতে—

রমলা ওই মেয়েটার মুখে যেন বেশ একটু আত্মপ্রসাদের হাসি দেখতে পায়, রমলা তৎক্ষণাৎ নিজেকে অনেকটা উঁচুতে তুলে নেয়।

রমলা হেসে উঠে বলে, কাকে দেখে মরেছিস তার ঠিক নেই, এ বাড়ির সাহেব এখন বিলেতে আছে।

বিলেতে?

হুঁ! অফিসের কাজে পাঠিয়েছে!

মিথ্যার জাল দিয়েই যদি আবরণ টানতে হয় তো সে জালের বুনুনিটা যতো ঠাসবুনুনি হয় ততোই ভালো।

পাহাড়ী বোকা নয়, পাহাড়ীও চট করে অবস্থা বুঝে নেয়, অতএব পাহাড়ী আলগা গলায় বলে ওঠে, এ মা! আমি কী বোকা গো! ছবিগুলো দেখে পর্যন্ত ভাবছি সেই সাহেব আর এই সাহেব এক! অনেক সময় এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের এমন মিল থাকে! নাক মুখ চোখ সব যেন সেই সাহেব বসানো! যমজ ভাইয়ের মতোন।

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি?

না, তা ঠিক নয়।

দুজনেই ভাবছে ওকে বোকা বোঝালাম!

রমলার 'সায়েব' বিলেতে আছে, অফিসের কাজে অফিস থেকে পাঠিয়েছে তাকে, অতএব রমলা অলসভাবে 'তার মতন সায়েবের' প্রসঙ্গ আলোচনা করতে পারে। তাই চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে কৌতুকের গলায় বলে, ধলভূম ধলভূম করিস, বলি জায়গাটার একটা নাম আছে তো?

নাম যে আছে তা কি আর জানে না পাহাড়ী? ওই ঝাপসা করে রাখাটা তো তার ইচ্ছাকৃত। কিন্তু এখন বলতেই হয়।

ঘাটশিলা বলে তো।

ঘাটশিলা? ঘাটশিলার মেয়ে তুই?

মেয়েও বলতে পারেন, বৌ-ও বলতে পারেন দিদি!

ওঃ, একই জায়গায় বুঝি বিয়ে হয়েছিল? তা ওই যমজ ভাইয়ের মতন সায়েবটিকে দেখলি কোথায়? ওখানে থাকে বুঝি?

খুব কৌতুকের একটা কথা বলেই হেসে ওঠে রমলা প্রশ্নের সঙ্গে।

না সরকারী সায়েব, ইঞ্জিনীয়ার সায়েব, রাস্তা তৈরি হচ্ছে তাই দেখতে গেছে, কাজ হয়ে গেলে আবার অন্যত্র চলে যাবে।

তা সায়েবটি খুব ভালো কেমন? অনেক বকশিশ-টকশিশ দেয় বোধ হয়?

পাহাড়ী হাসি চেপে উদাস-উদাস গলায় বলে, শুধু শুধু বকশিশ দিতে যাবে কেন? আমি কি ওর কাজ করেছি?

ওমা কাজই করিসনি? তবে যে বললি—

হ্যাঁ, পাঠিয়েছিল আমার বর, কাজ করতে, তা সায়েব ভাগিয়ে দিলো, বললো, মেমসায়েব নেই, মেয়েছেলের কাজ লাগবে না।

রমলা যেন সহানুভূতিতে গলে পড়ে, আহা! ভাগিয়েই দিলো? তা মেমসায়েবটি নেই কেন? বিয়েই করেনি বুঝি?

পাহাড়ী সংযত গলায় বলে, বড়ো মানুষদের ঘরের খবর আমরা কী জানবো দিদি!

তবে মালি মুখপোড়া বলছিলো—মেমসায়েব কলকাতায় চাকরি করে, তাই আসতে পারে না। ছবিগুলো দেখে আমি গাধার মতন ভাবলাম আপনিই বুঝি সেই মেমসায়েব!

তুমি সত্যিই একটি গাধা! যাক লন্ড্রী থেকে কাপড়গুলো এনেছিলি?

হু!

কী রান্না করে রেখেছিস?

ফুলকপি চিংড়ি মাছ দিয়ে ডালনা, কিমার তরকারি, বেগুনভাজা, আর—

ও বাবা, আবারও আর? নাঃ তুই আমায় খাইয়ে খাইয়েই কুমড়ো করে তুলবি দেখছি।

রমলা হালকা হয়ে হেসে হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়।

ঢুকবে না কেন?

পাহাড়ীদের দেশের সরকারী সায়েবের চেহারাটায় যদি রমলার অ্যালবামের কোনো ছবির সঙ্গে 'অবিকল' মিল থাকে, তাতে রমলা হেসে গড়িয়ে পড়া ছাড়া আর কি করতে পারে? ব্যাপারটা কম মজার নাকি?

ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সেই মজার বিষয়টা ভাবতে ভাবতে রমলা ক্রমশ কাঠ থেকে ইস্পাত হতে থাকে।

তবু খুব জোর কথাটা মুখে এসে গিয়েছিল। থতমত খেয়ে গেছে মেয়েটা। কিন্তু—

হ্যাঁ, ওই 'কিন্তু'টা ভাবতে ভাবতেই তো ইস্পাত হয়ে ওঠা।

সায়েব ভাগিয়ে দিয়েছে।

সেটাই সম্ভব।

ওছাড়া অন্য কিছু ভাবা সম্ভব নয়। কিন্তু তুই? তুই কি ভেগে আসতে পেরেছিলি? তুই নিশ্চয় সেই দেবতার মন্দিরের ধারেকাছে ঘুরঘুর করেছিস, আর সেই জন্যেই তোর বর তোকে দূর করে দিয়েছে।

কিন্তু আরও একটা 'কিন্তু'ও যে কাঁটা ফোটাচ্ছে! 'লোক চাই'এর বিজ্ঞাপনটা পাহাড়ীকে কে দিয়েছিল?

সে কথা জিজ্ঞেস করাতে পাহাড়ী বলেছিল, 'একজন সায়েব বলেছিলেন, কাজ করতে চাও তো কলকাতায় চলে যাও, এইতে নাম-ঠিকানা সব লেখা আছে, যাকে দেখাবে সে বুঝিয়ে দেবে।'

তখন 'সায়েব' শব্দটাকে আদৌ গুরুত্ব দেয়নি রমলা, জানে ওরা হয় 'বাবু' বলে নয় 'সায়েব' বলে।

আমি আমার বাপেরবাড়ির ঠিকানায় বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলাম, রমলা ভাবে—ও সেটা দেখেছে। ও তা হলে ইচ্ছে করে এই মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে! কেন? আমার অসুবিধে দূর করতে করুণা করে? নাকি আমার ওপর পাহারা বসাতে? একা আমি কীভাবে জীবন কাটাচ্ছি তাই দেখতে?

ওই মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্কটাই বা কীসের?

মনের অগোচর পাপ নেই, 'অসম্ভব' মনে করেও একটা ক্রূর আর নীচ সন্দেহ অনবরত পাক খেতে থাকে রমলার মনের গভীরে।

কিন্তু আবারও 'কিন্তু'।

'সম্পর্ক'টা যদি অবৈধ হয়, তাহলে ওকে অন্য দেশে চালান করবার উদ্দেশ্য কী? শুধু মমতা? ওর অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে?

যাক মেয়েটা ধরতে পারেনি!

যতোই হোক, রমলার বুদ্ধির কাছে কী আর ও?

ওই ভেবেই নিশ্চিন্ত থাকে রমলা।

ভাবতেই পারে না, ওই মুখ্যু মেয়েটা ধরে ফেলেছে প্রথম দিনেই।

এই একা থাকা চাকরি করা মেয়ে, স্বামীকে অস্বীকার করে 'মেমসায়েব' না হয়ে দিদিমণি হতে চায়, এ আর কে হবে?

তাছাড়া প্রথম দিনে চাকরের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবার সময় রমলার মাও কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন বৈকি। মেয়ে যে তাঁর মস্ত বড় লোকের বাড়ির বৌ, তার শ্বশুরের যে মস্ত বাড়ি, মস্ত গাড়ি, একগাদা দাসদাসী এবং তাঁর জামাই যে মস্ত বড় চাকুরে, কেবলমাত্র মেয়ের একগুঁয়েমির জন্যেই যে তার চাকরি করা, একা থাকা, এ সমস্তই তিনি সামান্য সময়ের মধ্যেই বলে নিয়েছেন।

বলবেন না?

এই ঝিটা তাঁর মেয়েকে কেবলমাত্র একটা 'খেটে খাওয়া' মেয়ে বলে জানবে? জানবে না তার কতো মহিমা?

রাত্রি অনেক হয়ে গেছে।

স্থানীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে, কিছুদূরে গিয়ে তাঁবু ফেলে থাকতে হবে কিছুদিন, তাই ডাকবাংলোর সংসারকে গুটিয়ে ফেলে সুটকেসে ভরছিলেন মুখার্জি সায়েব, ভোরবেলাই রওনা দিতে হবে, হঠাৎ পায়ের কাছে যেন একটা বন্যজন্তু এসে আছড়ে পড়লো।

সায়েব! আপনি তো চলে যাচ্ছেন, ওকে কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে যান সায়েব!

একটা বুড়োধাড়ি লোকের কর্কশ ভাঙা গলার আর্তনাদ প্রায় জানোয়ারের মতই লাগলো।

কে, কে?

চমকে উঠলেন মুখার্জি সায়েব, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, ওঃ তুমি! নন্দ? এত রাত্রে?

কী করবো হুজুর, প্রাণের দায়ে। হঠাৎ শুনলাম আপনি কাল ভোরেই যাত্রা করবেন। আপনি চলে গেলে ওর ঠিকানা তো আর পাবো না হুজুর, ওকে জন্মের শোধ হারিয়ে ফেলবো।

মুখার্জি সায়েব একটুক্ষণ ওই কান্নায় কুৎসিত মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকেন, খুব অদ্ভুত লাগে।

লোকটাকে কি ঘৃণা করবেন তিনি?

কিন্তু ঘৃণাটা আসছে না তো!

তবু জোর করে প্রায় ধমকের সুরে বলে ওঠেন, কান্না থামাও, ভালভাবে কথা বল।

আর ভালো!

নন্দ আবার হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে, ভালো বলে আর কিছু আছে নাকি আমার?

সেই সব্বনাশী মেয়েছেলেটা আমার দফা গয়া করে দিয়ে গেছে। খেতে পারিনে, ঘুমোতে পারিনে, কাজে মন বসাতে পারিনে, রাতদিন ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছি। নন্দ আপিস কামাই করছে, এ দৃশ্য এর আগে কেউ কখনো দেখেনি সায়েব!

কিন্তু তোমার স্ত্রী তো ইচ্ছে করে তোমায় ছেড়ে চলে গেছে—

জানি হুজুর! কিন্তু তার দোষ নেই হুজুর, আমার মতন অত্যোচারী স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবে না তো কী? সে আমায় ঠাকুরের মতন সেবা করেছে, আর আমি তাকে মিথ্যে সন্দেহ করে মারধর করেছি, কিন্তু এই নাক-কান মলছি হুজুর, আর নয়। আর তার গায়ে হাত তুলছি না।

মুখার্জি সায়েব স্বভাব-গম্ভীর মানুষ, কিন্তু এই হাউড়ে লোকটার জন্যে স্বভাব ছাড়া বেশী কথাই বলেন, অথবা বলতে হয় তাঁকে, কিন্তু তোমার সন্দেহটা যে মিথ্যে সে কথাই বা কে বললো? সত্যিও তো হতে পারে?

নন্দ আধহাত জিভ কেটে কানে হাত দেয়—না হুজুর, না। সে মেয়ে একদিকে, আর খাঁটি সোনা একদিকে, তুল্যমূল্য। সে কথা আমি খুব জানি। তবে নিজেই সে মন্দ কথা বলে রাগ চড়িয়ে দেয়। বয়েসটা খারাপ, একটু বাচাল আছে। আর আমাকে রাগিয়ে দেওয়াই যেন তার আমোদ! বুঝি সব, তবে মুখ্যু ছোটলোক তো, মেজাজের ঠিক রাখতে পারিনে, আর এমন হবে না হুজুর, আপনি শুধু একবার তার পাত্তাটা—

কিন্তু আমিই যে তার পাত্তা জানি এ কথাই বা ভাবছো কেন? আমি তো তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসিনি? ঘটনাটা তোমার সামনেই ঘটেছিল। তুমি ওকে 'পাগল' বলে চালাতে গেলে, তাতেই ও ক্ষেপে গিয়ে আমায় বললো, সায়েব, আমায় ওর হাত থেকে বাঁচাও, ও মারে-ধরে...তারপর কী হল তুমিই বলো? আমি তো তখন আর দেখিনি!

নন্দ মাথা নিচু করে বলে, মানছি হুজুর, আমি একটা রাক্ষস। তারপর আপনার আড়ালে ওকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে পাথরে মাথা ঠুকে দিয়েছিলাম, ও সেই রক্তমাখা মাথায় সরকারী হাসপাতালে গিয়ে উঠেছিল।.....কিন্তু আপনি দয়ার অবতার হুজুর, জানি হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়েছিলেন, তার ইসপেশাল ওষুধ ইঞ্জেকশনের জন্যে আলাদা খরচা দিয়েছিলেন—

মুখার্জি সায়েব ওর কথার মধ্যেই পায়চারি করছিলেন, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, তোমার স্ত্রী তোমাকে ঘৃণা করে কেন জানো? এর জন্যে! অন্য লোক হলে এক্ষেত্রে আমাকে এসে খুন করে যেতো। তোমাকে হঠাৎ এত রাত্রে এভাবে আসতে দেখে আমি তাই-ই ভেবেছিলাম। হয়তো আমায় খুন করে ফেলতেই--

হুজুর!

নন্দ আবার তার সেই আধহাত জিভটা বাইরে এনে ফেলে, এ কী বলছেন স্যার!

আবেগে নন্দর মুখ থেকে 'হুজুরে'র বদলে 'স্যার' বেরিয়ে যায়।

ঠিকই বলছি—মুখার্জি সায়েব দৃঢ় গলায় বলেন, অন্য যে কেউ তাই করতো। আর তুমি এসে পায়ে পড়ছো। অথচ তোমার বিশ্বাস আমি তোমার স্ত্রীকে অন্যত্র সরিয়ে রেখেছি—

নন্দ ঘাড় গুঁজে অস্ফুটে বলে, আপনি মা-বাপ হুজুর, দেবতা—

ঠিক আছে, ওই মালি জানে কোথায় আছে তোমার বৌ। মালির জানা একটা লোকই তাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে এসেছে, একটা বাড়িতে কাজকর্ম করছে সে।

হ্যাঁ, সেটা জানেন মুখার্জি সায়েব।

কাজকর্ম করছে সে।

মুখার্জি সায়েবের ভায়রাভাই বেশ ফলাও করে চিঠি লিখে জানিয়েছেন তাঁকে—'এ যুগে আর বিরহ-টিরহ নেই ভায়া, শ্রীমতী দিব্যি আছেন। অফিস করছেন, বাড়ি ফিরছেন, বন্ধুজনের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। আবার যা ফার্স্ট ক্লাস একখানি পরিচারিকা পেয়েছেন, তাকে সখী বললেই ভালো হয়। একাধারে সর্বগুণসম্পন্না। তোমার শ্যালিকা ঠাকুরাণী তো বোনের ওই মনোরম অবস্থাটির জন্যে রীতিমত ঈর্ষান্বিত! গিন্নীরা চাকরিতে ঢুকে একদিকে বেকার সমস্যা বাড়াচ্ছেন, আর অন্যদিকে কর্তাদের হুট্-আউট করছেন। সাধে কি আর সেকালে লোকে মেয়েদের বিদ্যানাস্তি করে রেখেছিল! অনেক ভেবেচিন্তেই করেছিল। ভাগ্যিস আমার গিন্নীটির বিদ্যের ডিগ্রী-ফিগ্রীর বালাই নেই!'

ব্যঙ্গই।

তবু মুখার্জি সায়েব পরম স্বস্তি অনুভব করেছিলেন চিঠিটা পেয়ে। স্বস্তি পেয়েছিলেন, যাক পার্বতী নামের সেই দিশেহারা মেয়েটা পায়ের তলায় একটু মাটি পেয়েছে। আবার ওই নন্দ হতভাগার ঘরে ফিরে এসে মার খেয়ে সংসার করতে হবে না।

কিন্তু ততোধিক স্বস্তি কি ওই মেয়েটার মনিবানীর জন্যে হয়নি?...জেদ করে একা আছে, হয়তো অনভ্যস্ত খাটুনি খেটে কষ্ট হচ্ছিল, হয়তো শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, নইলে চট করে কেউ কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়? কিন্তু ওর অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মা একটা লোক যোগাড় করে দিতে পারেন নি? নাকি রমলার পছন্দ হয়নি? তা এক্ষেত্রে অবশ্যই অপছন্দর কথা উঠবে না। পার্বতী রমলার কাছে কাজ করতে গেছে শুনে মুখার্জি সায়েব যেন পরম শান্তি বোধ করছেন।

আশ্চর্য বৈকি!

রমলা তো তাঁর কোনো মানমর্যাদা রাখেনি। ভালবাসার মান নয়, পারিবারিক সম্পর্কের মান নয়, সর্বোপরি স্বামীর অধিকারের মান পর্যন্ত নয়। মুচকি হেসে বলেছিল, অসম্ভব বাসি হয়ে গেছে কথাগুলো, ওসব মনুর আমলে চলতো!

তবু স্বস্তি।

রমলা একটা কাজের লোক পেয়েছে বলে, একটা সঙ্গিনী পেয়েছে বলে।

তা রমলাও স্বস্তিতে ছিল বৈকি।

ওই সঙ্গিনীকে পেয়ে পর্যন্ত পরম স্বস্তিতেই ছিল। কিন্তু সে স্বস্তির ঘরে ঘুণপোকা ধরেছে গতকাল থেকে।

প্রথমে ভয়ানক একটা অক্রোশ নিজের উপরই হচ্ছিল---অ্যালবামটা আমি খোলা সুটকেসে রেখেছিলাম কেন, ওকে আমি অতটা অধিকারই বা দিয়ে মরেছি কেন? ও যখন বললো, আমি ছবিগুলো দেখে নিয়েছি, তখন ধমক দিইনি কেন? তাছাড়া অ্যালবামটাই বা যত্ন করে সঙ্গে এনেছিলাম কেন? ওদের বাড়িতে তো আমার সব কিছুই পড়ে আছে—আমার শখ-শৌখিনের জিনিস, দামী দামী শাড়ি-গয়না। নেহাৎ যেগুলো বিয়ের সময় বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া---শাড়ি জামা জুতো ব্যাগ ট্রাঙ্ক সুটকেস, সেইগুলোই তো নিয়ে এসেছি। তাছাড়া যা আছে নিজের কেনা।

রমলাকে কেউ বলেনি 'তুমি কিছু নিয়ে যেও না'---রমলাকে বরং ওর ননদ বলেছিল,

চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাচ্ছো তুমি! এর পরে দেখবে ব্যবধান বেড়েই চলবে, তখন আর কিছু নিতে পারবে না, লজ্জা করবে।

রমলা বলেছিল, বেনারসী শাড়ি, জড়োয়া গহনা, এসব না হলেও মানুষের দিন চলে যায় খুকু—

দিন তো মানুষের এক বস্ত্রেও চলে যায়, খুকু রেগে বলেছিল, তার মধ্যে খুব গৌরব নেই। তাছাড়া যে মেয়ে বর ছাড়ে তবু চাকরি ছাড়ে না, তার মুখে বৈরাগ্যের কথাও মানায় না।

তোমাদের সংসারে আমিই যে হঠাৎ ভীষণ-রকম বেমানান হয়ে গেছি খুকু, আমার মুখে কোনো কথাই মানাবে না।

খুকু রাগ করে চলে গিয়েছিল বরের বাড়ি।

একদিন দোকানে দেখা হয়েছিল খুকুর সঙ্গে। কথা কয়নি, না দেখার ভান করেছিল।

ব্যবধান বেড়েই চলে বৈকি!

রমলা নিজেও তো এগোয়নি।

মন একবার ভাঙলে জোড়া লাগা শক্ত।

তুচ্ছ ওই ঝিটার ব্যাপারেও তো দেখছে, অত প্রসন্নতা ছিল ওর ওপর, কাল থেকে ওকে দেখলে রাগ ধরছে। অথচ সে-ভাবটা প্রকাশ করাও চলছে না।

পাহাড়ী যে কেন নিজের ক্ষতি নিজে ডেকে আনলো।

হয়তো ওইটাই রোগ পাহাড়ীর। নিজের ক্ষতি নিজে ডেকে আনা।

কিন্তু রমলার বিরূপতা বাড়বার যে আরো এক প্রকাণ্ড কারণ অপেক্ষা করছিল, তা চাকরাণী মনিবানী দুজনের একজনও কি জানতো?

রমলা অফিস থেকে ফিরে দেখলো, মানে দেখে জ্বলে উঠলো কুদর্শন একটা আধবুড়ো লোক—শ্রীহীন সাজসজ্জায় আরো কুদর্শন রমলার ফ্ল্যাটের দরজায় 'আই-হোল'এ চোখ রেখে ভিতরটা দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

আপাদমস্তক জ্বলে উঠবে এটা অসঙ্গত নয়, সেই জ্বলা গলাতেই রমলা প্রায় চীৎকার করে উঠলো, কে?

লোকটা চমকে তিন হাত ছিটকে সরে এসে সহসা আভূমি নত হয়ে প্রণাম করতে এলো।

থাক্।

রমলা কঠিন গলায় বলে, ওখানে কী দেখছিলে?

না না, দেখিনি তো কিছু, কিছু তো দেখা যাচ্ছিল না!

বেশ ঘাবড়েই গেছে লোকটা।

অতএব ওকে আর ভয় করবার দরকার নেই, দরকার ভয় করাবার। তাই আরো রুক্ষ গলায় বলে, কিছু দেখা যায় না, তা আমি জানি। কিন্তু তুমি দেখার চেষ্টা করছিলে। কে তুমি?

লোকটা মূঢ়ের মত বলে, আমি নন্দ, পার্বতীর স্বামী!

নিজের খাসমহলে নন্দ চৌকোসের রাজা, কিন্তু পরিস্থিতিটা যে বড় গোলমেলে হয়ে গেল। হতভাগা বাড়ির দরজায় একটা কড়া নেই যে নাড়া দিয়ে ভেতরের লোককে জানান

দেবে। ধাক্কা দেবে কি দেবে না ভাবতে ভাবতে দেখলো দরজায় ওই গোল ফুটোটা, চোখটা রেখেছে মাত্তর—সঙ্গে সঙ্গে এই বজ্রপাত! মেমসায়েব চিনতে ভুল হয় না নন্দর, কতো দেখলো! কে যে 'কর্তার গিন্নী আর কে যে সায়েবের মেমসায়েব', তা নন্দ এক নজরেই বুঝে ফেলতে পারে।

তাই নন্দ 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হয়ে গেল। যা বললো, তা বেশ প্রাঞ্জল হল না।

রমলা তীব্র কণ্ঠে বলে, ভুল বাড়িতে খুঁজতে এসেছো, এ বাড়িতে পার্বতী বলে কেউ নেই। চলে যাও। অন্য বাড়িতে খোঁজগে।

কিন্তু ওইটুকুতেই কি বিদায় নেবে নন্দ নামের নির্লজ্জ বেহায়া মানসম্মান-জ্ঞানহীন লোকটা?

অতএব বিনয়ে গলে হাত কচলে বলে, আপনি বোধ হয় ওকে আয়া বলেন? মানে এ বাড়িতে আয়ার কাজ করে তো?

আমি বলছি তুমি বাড়ি ভুল করেছো, যাও। তবু দাঁড়িয়ে রইলে? তার মানে তোমার অন্য মতলব আছে! যদি না যাও আমি কিন্তু এক্ষুনি পুলিসে খবর দেব।

নন্দ আস্তে গুটিগুটি দুটো সিঁড়ি নেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই দরজার ঘণ্টি টেপেন মেমসায়েব। আর সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে ধরে দাঁড়ায় মেমসায়েবের আয়া।

হঠাৎ চোখটা জ্বলে ওঠে তার, সেও তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠে, কে? কে?

বলে মেমসায়েবকে প্রায় ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে, তুমি এখানে যে?

যে নামছিল তার আর নামা হয় না। সে হঠাৎ সিঁড়িতেই বসে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলে, এই তো তুই। আর আমায় ভাগিয়ে দিচ্ছিল—

পার্বতী তীক্ষ্ণ গলায় বলে, গলায় দিতে দড়ি জোটেনি বুঝি?

বল বল যা খুশি বল আমায়—নন্দ তেমনি গলায় বলে, এই নাক মলছি কান মলছি—

॥ ১৬ ॥

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া গলায় রমলা বলে, তার মানে? এক্ষুনি যাবে মানে?

অপরাধিনী মাথা নিচু করে বলে, ওর তো কলকাতায় থাকার জায়গা নেই, দু'ঘণ্টা বাদ একটা গাড়ি আছে, তাতেই যেতে হবে।

তাতেই যেতে হবে!

তার মানে যেতেই হবে?

রমলার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন একটা অপমানের শক্ লাগে। রমলার এতদিনের মমতা, প্রশ্রয়, আশ্রয়দান—সব কিছু মুহূর্তে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? ওই লক্ষ্মীছাড়ার মতো লোকটা জয়ী হয়ে গেল রমলার ওপর?

রমলা ধাতব গলায় বলে উঠলো, ও যাবে যাক, তোমাকে যেতেই হবে কেন?

উপায় কি দিদিমণি, দেখলেন তো? গালমন্দ, যাচ্ছেতাই করতে বাকি রেখেছি কিছু? শ্যাল-কুকুরের মতন দূর দূর করলাম, তবু নড়লো? সেই এক খোঁট ধরে বসে আছে—'তোকে না নিয়ে ফিরবো না'! বলে কিনা 'একটিবারের জন্যে দ্যাখ'....মানে উনি

ভালো হবেন। হুঁঃ! ওর কথায় আবার বিশ্বাস! কথায় আছে স্বভাব যায় না মলে—

তবুও তো যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বসছো!

ওই তো অদেষ্ট!

অদেষ্ট মানে? তুমি যেতে না চাইলে, ও তোমায় জোর করে নিয়ে যেতে পারে?

ওর ঠাকুরদাদারও সে সাধ্যি নেই, পাহাড়ী আত্মস্থ গলায় বলে, কিন্তু যাবো না-টা বা বলতে পারছি কই? কী হাল হয়েছে দেখলেন তো? যেন পাগল না ছন্ন, আর না খেয়ে খেয়ে হাড্ডিসার! আগে তো দেখেননি, দেখলে বুঝতে পারতেন! এদিকে তো বাবুর এই হম্বি-তম্বি, কিন্তু ক্ষ্যামতা ওই পর্যন্ত! এক মুঠো চাল ফুটিয়ে খাবার মুরোদ নেই। আর কিছুদিন এভাবে চললে যমের বাড়ি যেতে তো বেশীদিন লাগবে না। আমায় জব্দ করতেই এই কৌশলটি করেছে আর কি!

রমলার মুখে আসছিল, ও যমের বাড়ি গেলেই বা তোমার ক্ষতিটা কি? তুমি তো ওকে ত্যাগ করেছো—তবে সেটা আর মুখ থেকে বের করলো না, অন্য পথে গেল।

বললো, এক্ষুনি 'যাবো' বললেই যাওয়া যায়? তুমি একটা চাকরি করছো তা মনে রেখো!

পাহাড়ী মাথা নিচু করে বলে, সে কথা মনে করে খুব লজ্জা পাচ্ছি দিদিমণি, কিন্তু এখানে যে ওর থাকবার ঠাঁই নেই! তা হলে বলে-কয়ে দুটো দিন রাখতাম, আপনি একটা লোক খুঁজে নিতেন—

আমি কোথা থেকে খুঁজে নিতে যাবো? দু'দিনে লোক পাওয়া যায়? তা হলে ওকেই বলো একটা লোক খুঁজে এনে দিয়ে, তবেই যেন তোমায় নিয়ে যায়।

পাহাড়ী হেসে ফেলে।

লোক বলতে এই একজনাকেই জানে ও। 'মেমসায়েব' শুনলেই ঠেলে ঠেলে পাঠিয়ে দেয়।

রমলার হঠাৎ মনে হয় পাহাড়ীর কাছে সে যেন নিচু হয়ে যাচ্ছে। কেন মনে হয় জানে না। তাই গলাটা আরো ধাতব করে বলে, বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই, তবে জেনে রেখো ইচ্ছে করলে আমি তোমাকে আটকাতে পারি। তুমি আমার কাছে কাজ করতে এসে নাম ভাঁড়িয়েছিলে কেন? একটা ছদ্মনাম তৈরি করেছিলে কেন? জানো এটা বেআইনী?

পাহাড়ী প্রায় হেসে উঠে বলে, আইন বেআইন কি আর আমরা জানি দিদিমণি? পর্বতের সহজ মানে 'পাহাড়' এটা জানি, তাই পার্বতীকে সহজ করে পাহাড়ী বলেছি। ডাকতে সুবিধে।

ওঃ, খুব চালাক দেখছি! কিন্তু ওই লোকটা যে তোমার সত্যি স্বামী তার প্রমাণ কি? আমি যদি বলি ও একটা বাজে লোক, কোনো মতলবে তোমরা—

এই সময় নন্দ আসছিল এগিয়ে, দরজার বাইরে থেকে বলতে যাচ্ছিল, মেমসায়েব, দেখলে তাই মনে হয় বটে, আমি ওর যুগ্যি নই—

কিন্তু কথাটা মাঝপথে থামিয়ে দেয় পার্বতী একটি ইশারায়, খুব শান্ত গলায় বলে, আমরা ছোটলোক, আমাদের সম্পর্কে যা খুশিই ভাবতে পারেন আপনারা দিদিমণি, কিন্তু বাজে লোক হলেই বা আপনার আটকাবার কী আছে? বাজে লোকের সঙ্গেও তো কতো মেয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়? আমি তো নাবালক নই?

আঃ কী বকছিস পার্বতী! যা মুখে আসছে বলছিস যে! নন্দ অসহিষ্ণু হয়ে ধমকে ওঠে।

হঠাৎ নরম হয়ে পার্বতী বলে, মাপ করবেন দিদিমণি, অন্যায় হয়ে গেছে। এরকম হঠাৎ চলে গেলে আপনার খুব কষ্ট হবে বুঝতে পারছি, কিন্তু ওই লক্ষ্মীছাড়া লোকটার কষ্ট দেখেও তো স্থির থাকা যাচ্ছে না। চিরজন্মের শত্রু আমার, আমাকে না খেয়ে ওর শান্তি নেই। কত স্বস্তি-শান্তিতেই ছিলাম আপনার কাছে, সে-সুখ সইবে কেন আমার কপালে? না গেলে ও মরে আমায় জব্দ করে ছাড়বে। দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন—

হঠাৎ নন্দ বলে ওঠে, তার চাইতে আপনিও সায়েবের কাছে চলে আসুন না মেমসায়েব? ওই মেয়েছেলেটাই আপনার পায়ের গোলাম হয়ে কাজ করবে—

লোকটা তার বুদ্ধি অনুযায়ী কথাই বলে। কিন্তু রমলা ওর ধৃষ্টতা দেখে চমকে ওঠে। রমলার চোখ দিয়ে আগুন ঝরে।

রমলা কড়া গলায় বলে, পাহাড়ী তোমার জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাও।

পাহাড়ী মৃদু গলায় বলে, আমার তো কোনো জিনিসপত্র নেই দিদি, আমি তো এক কাপড়েই এসেছিলাম।

ওঃ ঠিক আছে।

বলে ঝনাৎ করে দরজাটা বন্ধ করে দেয় রমলা, পাহাড়ী যে হেঁট হয়ে প্রণাম করতে আসছিল, সেটা লক্ষ্যমাত্র না করে।

আর দরজাটা বন্ধ করার পর রমলার মনে পড়লো, ওর মাইনেটা দিয়ে দেওয়া দরকার ছিল, একেবারে মুখের উপর ছুঁড়ে। কিন্তু এখন কি আবার রমলা সিঁড়ি ভেঙে ছুটে নেমে ওকে ডেকে আনতে যাবে?

অসম্ভব।

রমলার মনে হল ওই ছোটলোক দুটো স্ত্রী-পুরুষ রমলাকে যেন দু'পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

॥ ১৭ ॥

রেলগাড়িতে উঠে গুছিয়ে বসার পর নন্দ একটু নড়েচড়ে গলা ঝেড়ে বলে ওঠে, তুই ওখানে গিয়ে—বুঝলি বাতি, সায়েবকে পটিয়ে-পাটিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিবি। যাতে—সায়েব মেমসায়েবকে নিয়ে যায়—

আমি? সায়েবকে পটিয়ে-পাটিয়ে?

পার্বতীর তীব্র তীক্ষ্ণ স্বর রেলের বাঁশিকে পরাস্ত করে।

নন্দ থতমত খেয়ে বলে, আহা রাগ করছিস কেন? সায়েব তোর কথা শোনে তাই বলছি—

কবে দেখলে, সায়েব আমার কথা শুনছে বাধ্য ছেলে হয়ে?

আহা, না মানে—

থাক্ তোমাকে আর মানে বোঝাতে হবে না।

বলে একটুক্ষণ থেমে থেকে আস্তে বলে, সায়েব মেমসায়েবরা আমাদের মতন এমন হ্যাংলা নয়, বুঝলে?

আমরা হ্যাংলা?

না তো কী! লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে তোমার মতন এসে ধর্ণা দিতে পারবে সায়েব?

তার মানে ওদের প্রাণে ভালোবাসা-টাসা নেই?

পার্বতী উদাসভাবে বলে, থাকবে না কেন, খুব আছে। মান খোওয়া যাবার ভয়ে চেপে রাখে। জানলায় বসে তাকিয়ে থাকবে, তবু দোরটা খুলে ডাকতে পারবে না। ওইটুকুর অভাবে ক্রমশই দূরে চলে যাবে।

যে যেমন



বশিষ্ঠ সেন

আমি ভদ্রলোককে চিনতাম না। সে-কথা গৌরাঙ্গবাবু আগেই বলেছিলেন।

বললেন —আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম-ধাম বললেও চিনতে পারবেন না। আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। আপনার সময় হবে কি?

বললাম—সময়ের প্রশ্ন পরে, আগে দেখা করার উদ্দেশ্যটা বললে আমার একটু সুবিধে হয়—

ভদ্রলোক বললেন—আমার নাম গৌরাঙ্গমোহন সেন। আমার বয়স আপনার চেয়েও বেশি। আমি একজন বিজনেসম্যান। বিরাট কারবার আমার। এককালে আরো বিরাট ছিল, এখন কারবারটা ছোট হয়ে এসেছে। তেমন প্রফিট্‌ নেই।...এ ছাড়া আর কী জানতে চান বলুন?

বলে গৌরাঙ্গবাবু চুপ করলেন।

বললাম—আসল কথাটাই তো আপনি বললেন না। আপনার মত বিরাট লোক আমার মত ক্ষুদ্র লোকের সঙ্গে কেন দেখা করতে চাইছেন সেইটেই জানতে চাই—

ভদ্রলোক বললেন—সেটা টেলিফোনে বলতে পারা যাবে না, সামনে গিয়ে সব বলবো। আপনার কখন সময় হবে তাই শুধু বলুন। ঘণ্টা কয়েক সময় আমায় দিতে হবে দয়া করে—

এ-রকম নাছোড়বান্দা মানুষের পরিচয় টেলিফোনে এর আগেও পেয়েছি। নানা লোকের নানা দাবী। নানান চাহিদা। অবশ্য এ-ধরনের আবদার বা দাবী আর যার কাছেই খারাপ লাগুক, আমার খারাপ লাগে না। আমার আবার সময়ের দাম কী? সময় নিয়েই তো আমি কারবার করি। সময়ের গতি-পথ লক্ষ্য করি। সময় মিলিয়ে নিই ইতিহাসের ঘড়ির সঙ্গে। তারপর সেই কথাগুলো কাগজের ওপর লিখে যাই। তা কেউ পড়ে, আবার কেউ পড়ে না। তা না-পড়লেও ক্ষতি নেই কিছু। ক্ষতি নেই এই জন্যে যে এ কাজ তো অনেকটা আত্মপ্রকাশের মতন। কেউ না-ই বা পড়লো, আমার কথাগুলোকে তো প্রকাশ করা হয়ে গেল। তারপর আজ না পড়ুক, কাল কারো চোখে পড়তে পারে। কাল না হোক পরশু।

ফুল তার আপন গরজেই ফোটে। কেউ দেখলো না বলে কি তার ফোটা বন্ধ থাকে? আমারও ঠিক তেমনি।

তাই একটু ভেবে বললাম—আপনি যেদিন খুশি আসুন, আমি অত ব্যস্ত লোক নই আপনাদের বিজনেসম্যানদের মত! আমার কাছে সময়ের কোন দাম নেই—

টেলিফোনের ভেতরেই ভদ্রলোকের হাসির শব্দ শুনতে পেলাম।

বললেন—আপনি সত্যিই ক্ষণজন্মা পুরুষ—

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—সে কি মশাই, আপনি বলছেন কী? সাধারণ ডাল-ভাত খাওয়া মানুষ আমি, আমাকে অমন করে বলছেন কেন?

ভদ্রলোক বললেন—ওই যে আপনি বললেন আপনার কাছে সময়ের কোনও দাম নেই। কথাটা বড় ভালো লাগল মশাই । আজকাল সবাই বলে সময় নেই। সত্যি কারোর সময় নেই। ছোটবেলায় পড়েছিলুম— 'Time is Money"। আমার নিজেরও সময় নেই। আমি নিজেও সকলকে ওই কথা বলে থাকি। কিন্তু আমার জীবনে আপনিই প্রথম বললেন—আপনার সময় আছে...যাক, তাহলে কবে আসবো?

—যেদিন খুশি।

—তাহলে সেই কথাই রইল। আমি আপনার কাছে হঠাৎ একদিন চলে যাবো। তারপর হয় আপনার বাড়িতে বসে, আর নয় তো কোথাও দূরে নিরিবিলিতে গিয়ে আমার কথা বলবো—

—দূরে মানে? দূরে কোথায়?

ভদ্রলোক বললেন—সে যেখানে হোক। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো সোজা নেতারহাটে চলে যেতে পারি, কিম্বা কাছাকাছি ডায়মন্ডহারবারের 'সাগরিকা'য়। আর যদি চান তো প্লেনে বেনারসে চলে যেতে পারি, ভারি তো দেড় ঘণ্টার জার্নি—কিম্বা দার্জিলিং—

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। মনে হলো যেন খুব শাঁসালো পার্টি।

বললেন—এ-সব কথা বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। আপনার কিছুই ভয় নেই। আমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর দেখবেন আমি অত্যন্ত নিরীহ লোক। তবে আমার জীবনের একটা দোষ আছে, যাকে বলতে পারেন ব্ল্যাক-স্পট্—

—কী?

ভদ্রলোক বললেন—আমি বড়লোক। মানে আমার কয়েক মিলিয়ন টাকা আছে। আমি একজন কোটিপতি। এ-ছাড়া আমার চরিত্রে আর কোনও দোষ নেই—

এ তো এক অদ্ভুত কথা। এ-রকম কথা তো এর আগে আর কখনও কোনও বড়লোক বলেনি।

বললাম—সেটাকে চরিত্র-দোষ বলছেন কেন?

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই, আজকাল ওইটেই মানুষের চরিত্রের বড় ডিফেক্ট, ওই বড়লোক হওয়া। বাড়ি হওয়া, গাড়ি হওয়া, বড়লোক আজকাল সবই দোষ বলেই গণ্য করে সবাই।

বললাম—তাই নাকি?

ভদ্রলোক বললেন—আপনি তা জানেন না বুঝি? আপনি লেখক মানুষ। এত বই লিখেছেন আর এত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, আর এই সোজা কথাটা জানেন না? তাই তো কথাটা আগের থেকেই আপনাকে জানিয়ে রাখলুম। শেষকালে আপনারও হয়ত খারাপ লাগতে পারে আমার পরিচয় পেয়ে।

বললাম—না না, আপনার সে ভয় নেই, আপনি আসুন একদিন—

ভদ্রলোক বললেন—ঠিক আছে, নমস্কার—

—নমস্কার—বলে আমিও ফোন ছেড়ে দিলাম।

***

এ ঘটনাতে আমি অবশ্য অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার অবাক হবার কারণটা ছিল আলাদা। টেলিফোন থাকলেই নানারকম অচেনা লোকের প্রস্তাব আবদার অনুরোধ শুনতে হবে বৈকি। কিন্তু এ যেন একটু অন্যরকম আবদার! তখনও চেহারা দেখিনি গৌরাঙ্গ সেনের, কিন্তু শুধু কথা শুনেই বুঝেছিলাম এ একটা বিশিষ্ট চরিত্র। মানুষের চেহারা চাল-চলন সব কিছু দেখে চরিত্র বার করা সোজা। কিন্তু টেলিফোনে নিজের মুখের কথায় যিনি নিজের চরিত্রটা অন্যের সামনে খুলে ধরেন তাঁকে তো বিশিষ্ট বলতেই হবে!

তা শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি এলেন।

একেবারে হঠাৎই এলেন। বয়েস হয়েছে অনেক। কিন্তু যৌবনের স্বাস্থ্যটা সেই বয়সেও বজায় রেখেছেন।

বললেন—দেখুন আমার ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, পাইলস্, বাত, ওসব কিছু নেই। আপনি আমার চেয়ে মনে হচ্ছে কুড়ি বছরের ছোট, কিন্তু পাঞ্জা কষে আপনাকে এখনও হারিয়ে দিতে পারি। লড়বেন পাঞ্জা?

ভদ্রলোক পাঞ্জাবির হাত গুটিয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আমি হাসলাম। বললাম--বসুন—

ভদ্রলোক বললেন—না বসবো না, আপনি আপত্তি না করেন তো চলুন বেরিয়ে পড়ি—

বললাম—কিন্তু আপনার প্রবলেমটা কী?

—এক কথায় বলবো?

—বলুন, এক কথাতেই বলুন।

ভদ্রলোক বললেন—আমি হেরে গেছি—

বলে হো-হো করে হেসে উঠলেন। বিরাট দশাসই চেহারার একটা লোককে অমন করে হাসতে দেখে আমার খুশি হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তা হলাম না। আমার মনে হলো ভদ্রলোক যেন হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

ভদ্রলোকের চেহারা দেখে মনে হলো যেন তিনি সত্যিকারের বড়লোক। বড়লোক হলেই যে জামা-কাপড় দামী হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। বড়লোকত্ব কারো গায়ে লেখা থাকে না। সেটা আচার-আচরণেই বোঝা যায়। গৌরাঙ্গবাবু আমার ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলুম যে তিনি সত্যিই বড়লোক। বড়লোক শুধু টাকায় নয়, হৃদয়বৃত্তিতেও।

বললেন—চলুন, কোথাও বাইরে যাই—

বললাম—কোথায় যাবো?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—আরে মশাই গাড়ি রয়েছে, গাড়িতে পেট্রলও রয়েছে, পকেটেও টাকা আর চেক বই রয়েছে। কোথায় যাবো সেটা গাড়িতে বসেই ভাবা যাবে—

বললাম—কিন্তু আপনি আমাকে চেনেন না, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে আপনার এত আগ্রহই বা কেন? আপনার বন্ধুবান্ধব আছে। তাদের সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারতেন—

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—আপনাকে আমি চিনি না? কী বলছেন আপনি? আপনার

লেখা পড়েই তো আপনাকে আমি চিনে ফেলেছি। লেখে তো সবাই। বাংলা দেশে কি লেখকের অভাব আছে? কিন্তু এক-একজন লেখক থাকে যার লেখা পড়লেই তাকে দেখতে ইচ্ছে করে। শরৎবাবুকেও আমার দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাঁকে তো আর দেখা সম্ভব নয়। আর সব লেখক কি তাদের লেখার মধ্যে ধরা দেয়? যারা লেখার মধ্যে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দেয় তাদেরই পাঠকের দেখতে ইচ্ছে করে। আমি মশাই সাহিত্য-ফাহিত্য কাকে বলে বুঝি না। ও-সব কলেজের মাস্টাররা ভালো বলতে পারে। যে-লেখা পড়ে তার লেখককে দেখতে ইচ্ছে করে, আমার কাছে সে-ই বড় লেখক—

তারপর একটা চুরোট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন।

বললেন—আর বন্ধুবান্ধবের কথা বলছেন? বন্ধুবান্ধবের আমার অভাব নেই। এখুনি বলুন না, আমি এখান থেকে টেলিফোন করে দিচ্ছি, পঞ্চাশজন বন্ধু এসে আপনার এখানে হাজির হয়ে যাবে। কিন্তু তারা তো হৈ-হল্লা চায়, হৈ-হল্লা করবার টাকা যতদিন আমার থাকবে ততদিন তারাও থাকবে, তারপর টাকা ফুরিয়ে গেলে তারা আর থাকবে না—

ভদ্রলোকের কথা শুনতে শুনতে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল, বোধহয় এর পেছনে কোনও মেয়েমানুষ আছে। এই টাকা, এই ঐশ্বর্য, এই গাড়ি, এ তো যে-কোনও নারীর পক্ষেই কাম্য। তার ওপর আছে সাহিত্য-প্রীতি। অর্থাৎ রসিক মানুষ! যে মানুষ সাহিত্য ভালোবাসে না, বুঝতে হবে সে রসিক নয়। যারা অর্থবান তারা সাধারণত সাহিত্য-পাঠে রস পায় না। কিন্তু অর্থবান মানুষ হলেও গৌরাঙ্গবাবু যখন সাহিত্যরসিক তখন বুঝতে হবে এর পিছনে কোন নারী আছে।

গাড়িতে চলতে চলতে আমি তাঁর পাশে বসে বসে এই সব কথাই ভাবছিলুম। তিনি বলেছেন তিনি হেরে গেছেন। কীসে হেরেছেন? জীবন-যুদ্ধে? জীবন-যুদ্ধ কথাটা আজকাল বড় বেশি চলছে! জীবনের যুদ্ধটা বরাবরই ছিল। আজকাল প্রতিযোগিতা বেড়েছে বলে যুদ্ধের তীব্রতাটাও বেড়েছে। কিন্তু যদি হেরেই যাবেন তাহলে এত বড় গাড়ি চালাচ্ছেন কি করে? চেহারা-চালচলন দেখে তো বোঝা যাচ্ছে না তিনি পরাজিত। পরাজিত মানুষের হাবভাব দেখলেই বোঝা যায়। যারা হেরে যায়, তারা কথা কম বলে, ভাবে বেশি। আর যারা জীবন-যুদ্ধে জেতে তারাই ঠিক তার উল্টোটা করে। তারা ভাবে কম, কথা বলে বেশি। গৌরাঙ্গবাবু যখন এত কথা বলছেন তখন হেরে যাওয়া লোকের দলে তো নন তিনি।

হঠাৎ একবার বললাম—আপনি যে বললেন আপনি হেরে গেছেন?

গৌরাঙ্গবাবু একমনে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গাড়ি চালাতে গৌরাঙ্গবাবু খুবই এক্সপার্ট মনে হলো। অনেকে গাড়ি চালায়, কিন্তু দেখে বোঝা যায় চালাতে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু গৌরাঙ্গবাবুকে দেখে মনে হলো তিনি যেন গাড়ি চালাচ্ছেন না, কোথাও কোনও মেয়ের কাঁধে হাত দিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণে চলেছেন।

বললাম—সেই কথা বলতেই তো চলেছি—

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় চলেছেন?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—বলুন তো কোথায় চলেছি?

বললাম—কী জানি! এইটুকু বুঝতে পারছি যে কলকাতা শহর ছাড়িয়ে এসেছি আমরা—

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—সে তো আমিও জানি না। তা ছাড়া কোথায় চলেছি তা

ভাববোই বা কেন? আমার তো আর কোনও কাজ নেই হাতে যে অমুক তারিখে অমুক সময়ে অমুক জায়গায় পৌঁছতেই হবে। আপনি তো ফ্রি!

একটু থেমে বললেন—আর তা ছাড়া, সারা জীবনে আমি কখনও ভেবেচিন্তে কোনও কাজ করিনি মশাই! এমনি করে জীবনের গাড়িটাকেও একদিন নিরুদ্দেশ ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যেখানে সে যায় যাক। প্ল্যান করে নকশা কেটে জীবন চালানোতে আমি বিশ্বাস করিনি মশাই। ওতে ঠিক রোমাঞ্চ থাকে না লাইফে।

একটু থেমে আবার বললেন—আর প্ল্যান করে চলবো বললেই কি লাইফ সেই প্ল্যান অনুযায়ী চলে? আমার জানাশোনা কত লোক কত প্ল্যান করেছিল। শেষকালে দেখেছি তাদের সব প্ল্যান একদিন বানচাল হয়ে গেল। এই দেখুন না, আমি ছোটবেলায় ভেবেছিলুম একজন বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় হবো। খুব মন দিয়ে ফুটবল খেলতুম। কিন্তু বর্ষায়-কাদায় খেলে কিনা জানি না, একদিন আমার এমন টাইফয়েড্ হলো যে সে প্রায় মরো-মরো অবস্থা। শেষ কালে যখন তিন মাস ভুগে অনেক কষ্টে সেরে উঠলুম তখন ডাক্তার বললে—ফুটবল খেলা চিরকালের মত ছাড়তে হবে। আমার হার্ট নাকি উইক। অথচ এখন আমার হার্ট দেখিয়েছি, এখন তারা বলে আমার মত স্ট্রং হার্ট খুব কম লোকেরই আছে। কিন্তু এখন তো আর নতুন করে ফুটবল খেলা শুরু করতে পারি না। সে বয়সও আমার নেই—

বলে হাসতে লাগলেন।

বললেন—তারপর ভেবেছিলুম উকিল হবো। কালো গাউন পরে জজের সামনে প্লিড্ করবো, এ আমার বহুদিনের শখ! ইন্ডিয়ার মত বড় বড় লীডার, সবাই ছিল প্লীডার কিংবা ল'য়ার। কিন্তু তাতেও গোলমাল বাধলো। আই.এস্-সি পাস করার পর একটা চাকরি পেয়ে গেলাম আসামে। নগদ টাকার লোভ ছাড়তে পারলাম না। টাকাটা ভালই পেতাম। চা-বাগানের চাকরি। উপরিও ছিল, কিন্তু তার ফলে হল কি, আইন পড়ার সুযোগ আর এলো না। চা-বাগানে চাকরি করার পর সেই জঙ্গলে পড়বার মত কলেজ কোথায়?

সত্যিই গৌরাঙ্গবাবুর কথা শুনে মনে হলো প্ল্যান করে জীবন চালানো যায় না। জীবন তার নিজের প্ল্যানেই চলে। প্ল্যান-কর্তার সব কিছু প্ল্যান তখন বানচাল হয়ে যায়।

—তারপর দেখুন, আমি বরাবর ড্যাশ ভালোবাসি। কবে একদিন রাজা হবো, কবে একদিন উজির হবো, তার জন্যে ছোটবেলা থেকে অঙ্ক কষে মেপে মেপে জীবন-যাপন করবো, তাতে আমার বিশ্বাস নেই। আমি যা চাইবো তা তখুনি পাওয়া চাই। এক মুহূর্তের মধ্যে তা যদি না পাই, তবে আর তা চাইবো না। চেষ্টা করে কষ্ট করে যা পেতে হয় তার দিকে আমার কোন লোভ নেই। ফুলুক্‌সে পাবার দিকে আমার বরাবরের লোভ। আমি কষ্ট করবো না, চেষ্টা করবো না, অথচ সব জিনিস আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে, এই আমি চাই। তাই যা কিছু আমি জীবনে পেয়েছি সব বিনা চেষ্টায়—

আমি ভদ্রলোকের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—বলেন কী? বিনা চেষ্টায় কিছু পাওয়া যায়?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—যায়। বইতেই শুধু লেখা থাকে বিনা চেষ্টায় কিছু পাওয়া যায় না। এই আমার জীবনই তার প্রমাণ। আমি এখনও ইনকাম-ট্যাক্স ওয়েলথ-ট্যাক্স মিলিয়ে বছরে আশি হাজার টাকা দিই গভর্মেন্টকে। আয় আমার কম নয়। কিন্তু এর জন্য

আমাকে কষ্টও করতে হয় না, চেষ্টাও করতে হয় না, পরিশ্রমও করতে হয় না। আমার এই সব প্রপার্টি এসেছে বিনা পরিশ্রমে—

তারপর একটু থেমে চুরোটটা টেনে নিলেন।

ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—আমার কাছে যারা কাজ করে তারা প্রচুর খাটে, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, কিন্তু তবু দিনে দশ টাকার বেশি মজুরি পায় না। আমি তাদের খাটিয়ে দিনে উপায় করি দশ হাজার টাকা—

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম।

বললাম—কী করে?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—ভাববেন না আমি ব্ল্যাক্ করি। জোচ্চুরিও করি না। ফার্মের মালিক হিসাবে আইনত আমার যা প্রাপ্য তাই-ই আমি নিই। আমার স্টাফকেও আমি ফাঁকি দিই না।

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। আমি সাহিত্য করি। সাহিত্য আমার পেশা। ওসব টাকাকড়ির আমদানি-রপ্তানী আমার বোঝবার কথাও নয়। আমি চুপ করে শুনতে লাগলাম গৌরাঙ্গবাবুর কথা। কিন্তু বুঝতে পারলাম না কী তাঁর বক্তব্য, কী তাঁর দুঃখ।

❋❋❋

গাড়ি তখনও চলছে। গাড়ি যখন শহরতলী ছাড়িয়ে আরো নির্জন রাস্তায় পড়লো তখন গৌরাঙ্গবাবু গাড়ির স্পীড় বাড়িয়ে দিলেন।

বললেন—আশি স্পীড় তুলবো?

হঠাৎ এই কথায় একটু বিব্রত হলাম। বললাম—তার মানে?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—এখন তো স্পীড় চলছে সত্তর, আমি এর পরে আরো অনেক স্পীড় তুলতে পারি। একশো কুড়ি পর্যন্ত স্পীড় তুলতে পারি, দেখবেন?

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম—না, অত স্পীড় আমি ভালোবাসি না।

—কেন? স্পীড়কে আপনি ভয় করেন?

বললাম—হ্যাঁ, অত স্পীড় আমার ভালো লাগে না।

—সে কী মশাই? আপনিও দেখছি সেকেলে লোক?

আমি আর কী বলবো! এ নিয়ে গৌরাঙ্গবাবুর সঙ্গে তর্ক করা সময় নষ্ট বলে মনে হল আমার কাছে। স্পীড় ভালো কি মন্দ এ নিয়ে সারা পৃথিবীতে দুদল লোক দুই মতাবলম্বী হয়ে গেছে। জেট্ আর অ্যাটমের যুগে এই স্পীডের বিরুদ্ধে কিছু বলাও বিপজ্জনক।

না, গৌরাঙ্গবাবু গাড়ির স্পীড বাড়ালেন না।

বললেন—আপনি ঠিকই বলেছেন, আগে আমি স্পীডকেই ভালোবাসতুম। মনে হতো বেগ না থাকলে লাইফ কী? দুর্দম বেগই তো জীবন! কিন্তু এখন আমি আবার মত বদলিয়েছি, এখন আমি আর গাড়ির স্পীড় বাড়াই না। ভেবে দেখেছি ওতে মানুষের কল্যাণ নেই—

বললাম—কীসে বুঝলেন?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—সেই ঘটনাটা বলতেই তো আপনার কাছে এসেছি।

আমি বললাম—দেখুন, আপনি নিশ্চয় কালিদাসের মেঘদূত পড়েননি?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—না মশাই, মাফ করতে হবে। আমার লেখাপড়ার সীমা খুবই কম। আপনাকে বলতে আমার লজ্জা নেই। যাকে বলে লেখাপড়া জানা লোক, আমি তা নই। মিথ্যে কথা বলব কেন? আমি বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস পড়েও বাঙলাটা ঠিক বুঝতে পারি না। রবি ঠাকুরের কথা তো ছেড়েই দিন, তাঁর নাম শুনেই শুধু তাঁকে নমস্কার করি—

তারপর একটু থেমে গলাটা নামিয়ে বললেন—অথচ মজা কি জানেন, আমি অন্তত দশবার রবীন্দ্র-জয়ন্তীর ফাংশনে সভাপতি হয়েছি—

কথাটা শুনে মজা লাগল আমার।

বললাম—তাই নাকি?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—তা হবো না কেন? আমারই তো অফিস, আমার অফিসের স্টাফই তো রবীন্দ্র-জয়ন্তীর ফাংশন, করে খুব পোলাউ-মাংস খাওয়া হয়, গান-বাজনা-নাচ-থিয়েটার হয়। আমি পাঁচশো টাকা চাঁদা দিই।

—আপনি সভাপতি হয়ে লেকচার দেন তো?

গৌরাঙ্গবাবু হাসলেন।

বললেন—তা দিই—

বললাম—রবি ঠাকুরের লেখা তো আপনি পড়েননি! তাহলে কী লেকচার দেন?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—লেকচার দেওয়া কি শক্ত কাজ মশাই? গরম-গরম কথা বলা মানেই তো লেকচার। আমি বলি ঃ রবি ঠাকুর মস্ত বড় কবি ছিলেন; তিনি বিশ্বকবি। নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তাঁরই তৈরি শান্তিনিকেতন ইউনিভার্সিটি। তিনি চরিত্র গঠন করবার কথা বলেছেন। মানুষের চরিত্রটিই হচ্ছে আসল, চরিত্রবলই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বল। যে চরিত্রবান কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা সবাই রবি ঠাকুরের মত চরিত্র-গঠন করতে চেষ্টা করো। এই সব কথা এক ঘণ্টা ধরে বলি। তারপর যখন বসে পড়ি তখন চারদিকে চট্‌পট্‌ করে প্রচুর হাততালি পড়ে—

বললাম—কিন্তু আপনাকে তো প্রত্যেক বছরেই সভাপতি হতে হয়?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—তা হয়।

—সাহিত্যিকদের কোনবার ডাকেন না? তারা বুঝি আসে না?

—না মশাই, আপনি কিছু মনে করবেন না। একটা পোস্টকার্ড লিখে দিলেই তারা এসে হাজির হয়। সভাপতি পাওয়া আজকাল খুব সোজা হয়ে গেছে। কিন্তু আমি দেখলাম অত ঝামেলার দরকার কি? এক কাপ চা, আর একটা সিঙাড়াই বা খরচ করি কেন? আমিই সভাপতি হয়ে যাই। তাতে চা-সিঙাড়ার খরচটা বাঁচে, আর আমারও লেকচার দেওয়া হয়ে যায়। খবরের কাগজে নামও ছাপানো যায়।

গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ রাস্তার পাশে একটা জায়গায় গাড়ি নিয়ে গিয়ে ভেড়ালেন। দেখলাম সেটা একটা চায়ের দোকান।

বললেন—আসুন, এখানে একটু চা খেয়ে নিই—

—এখানে?

গৌরাঙ্গাবাবু বললেন—এতেই তো মজা! চারদিকে এই মাঠে, আর সামনে লম্বা

রাস্তা চলে গেছে, নিজের গাড়ি, ট্যাঙ্কে ভর্তি পেট্রল, আর কী চাই?

—কিন্তু ভাত?

—সামনে একটা-না-একটা হোটেল পড়বেই। এই যে লরিগুলো চলছে, এগুলোর ড্রাইভাররাও তো কোথাও-না-কোথাও ভাত খায়। তাই সে-সব বন্দোবস্ত আছেই। সেখানেই খেয়ে নেব। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, আপনি শুধু আমার কথাগুলো শুনুন, আর কিছু করতে হবে না—

চা এল। মাটির পবিত্র ভাঁড়ে চা আর অপবিত্র তেলেভাজা।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—খেয়ে নিন, কলকাতার বাইরে যা খাবেন, তাই-ই অমৃত। কোনও পাপ নেই এতে।

দোকানদার একটা লম্বা কাঠের বেঞ্চি পেতে দিলে। তারই ওপর বসলাম দু'জনে। বেশ মিষ্টি রোদ লাগছে গায়ে। এতক্ষণ গাড়ির ভেতরে বসে বসে যেন বন্দী-জীবন যাপন করছিলাম। এবার উদার আকাশের উন্মুক্ত আবহাওয়ায় যেন মুক্তি হলো আমাদের।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন--দেখুন, কেমন জায়গায় নিয়ে এসেছি আপনাকে! আপনি এ-জায়গায় আগে এসেছেন?

বললাম—না। এটা কোন্ জায়গা?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—তা জানতে চেষ্টা করবেন না। এ কোন্ জেলা, কোন পরগণা, কী এর কুলজী, এখানে ধান-চাল কত হয়, এখানকার বামুন-কায়েত ক'ঘর, এখানে মাছের দর কত, তা জানলে বিপদ। সব মজা উবে যাবে। সে সব বিষয়ী লোকরা ভাবুক, তারা হিসেব কষুক। এখন আমরা সে সবের উর্ধ্বে। আমরা এখন পৃথিবীর মানুষ, পৃথিবীর অধিবাসী, এইটুকু জেনে রাখাই ভালো। তার বেশি ভাবলে আমাদের এখানে আসাটাই মাটি হয়ে যাবে—

বলে ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিলেন।

বললেন—আমার একজন সরকার ছিল। সরকার মানে এমন কিছু বড় পোস্ট নয়। তার নাম ছিল বশিষ্ঠ—

আমি নামটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—বাঙালী?

—হ্যাঁ। আমারও প্রথমে ওই সন্দেহ হয়েছিল মশাই। বশিষ্ঠ নাম বাঙালীর হয় নাকি? তা যেদিন প্রথম বশিষ্ঠ আমার কাছে চাকরির জন্যে এলো, সেদিন আমিও ওই একই কথা জিজ্ঞেস করলুম—তুমি বাঙালী?

বশিষ্ঠ বললে—হ্যাঁ, আমি বাঙালী। বশিষ্ঠ সেন।

তা আমার একটা বিশেষ স্বভাব আছে। কোনও নতুন লোককে চাকরি দেবার আগে আমি তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে নিই। এটাই আমার নিয়ম। বরাবরই এ নিয়মটা আমি মেনে এসেছি। আমি তখন কোরাসিয়া কোলিয়ারির মালিক। কোরাসিয়া কোথায় জানেন তো?

বললাম—না।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—কেন, আপনার তো জানবার কথা! আপনি মধ্যপ্রদেশ নিয়ে অনেক গল্প-টল্প লিখেছেন, আমি পড়েছি তা। চিরিমিরির নাম শুনেছেন?

বললাম—তা শুনেছি।

—কোরাসিয়া তার পাশেই। সেও মস্ত বড় কোলিয়ারি। বাঙলা দেশের কোলিয়ারির ত নয়। রাণীগঞ্জ আসানসোলে যে-সব কোলিয়ারি দেখেছেন সে-সব আন্ডার গ্রাউন্ড। াটির তলায় নামতে হয় ক্রেন দিয়ে। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের কোলিয়ারি হলো মাটির ওপর। র থেকে সে কোলিয়ারি দেখলে মনে হবে বুঝি পাহাড়। আসলে পাহাড়ই বটে, কিন্তু সে-াহাড় পাথরের নয়, কয়লার। আদিকাল থেকে কয়লা জমে জমে পাহাড় হয়ে আছে খানে। তার ওপরে গাছ-পালা জঙ্গল-বাড়ি-বসতি হয়ে সে যেন একেবারে দার্জিলিং য়ে গেছে। দূর থেকে অন্তত তাই-ই মনে হবে।

কেমন করে যে এই আমি কোলিয়ারির মালিক হয়ে গেলুম, সে অন্য গল্প। তার সঙ্গে ামার এ-গল্পের কোনও যোগাযোগ নেই। সে আর একদিন বলবো।

বলে গৌরাঙ্গবাবু চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে শেষটুকু খেয়ে খালি ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

বললাম—এ কি, তেলেভাজাগুলো খেলেন না, চা শেষ করে ফেললেন?

গৌরাঙ্গবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন। দোকানের খাবারের দাম মিটিয়ে দিলেন।

বললেন—চলুন—

বললাম—তেলেভাজা যদি খাবেনই না তো কিনলেন কেন?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—শুধু চায়ের আর দাম কত? কিচ্ছু না। তাই তেলেভাজাও কনলুম, তাতে ওকে কিছু পয়সা দিয়ে খুশি করা হলো। সংসারে বাঁচতে গেলে এ-রকম ানধ্যান করতে হয় মশাই। এরই নাম ঘুষ। আপনি এমনি করে যত ঘুষ দিতে পারবেন ত সংসারে উন্নতি করতে পারবেন।

গৌরাঙ্গবাবু তখন আবার গাড়ি চালাতে আরম্ভ করেছেন।

বললাম—এসব ধারণা কি আপনার ঠিক?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—এতদিন তো ঠিকই ছিল, কিন্তু হঠাৎ সব বেঠিক হয়ে গেল শাই। সেই কথা বলতেই আজ আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখুন—সাক্‌সেসফুল লোকেরও যে কত যন্ত্রণা থাকতে পারে, সেই কথাটাই পৃথিবীকে জানিয়ে দিন। গরীব লোকের দুঃখের কথা তো সবাই লিখেছে। ও পড়ে আর কোনও মজা হয় না। যারা আন্‌সাক্‌সেসফুল, তাদের দুঃখ কষ্টের মধ্যে টুইস্ট্‌ কোথায়? তারা তো দুঃখ পেতেই জন্মেছে, আবার দুঃখের মধ্যেই তারা মারা যাবে। কিন্তু আমরা যদি দুঃখকষ্ট পাই? আমাদের সব সাকসেস্‌ যদি একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যায়?

বলে ভদ্রলোক এক হাতে আধপোড়া জ্বলন্ত সিগারেটটা ধরে অন্য হাতে গাড়ি চালাতে লাগলেন।

* * *

আশ্চর্য! এমন কাহিনী যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে শুনতে হবে তা আগে ভাবিনি। সে কোথাকার কোন্‌ কোলিয়ারি! কোলিয়ারিটা মধ্যপ্রদেশের মধ্যে। বিলাসপুর থেকে ট্রেন বদলে গিয়ে নামতে হবে অনুপপুরে। আবার অনুপপুরে গাড়ি বদলে বিজুরি হয়ে

চিরিমিরি। স্টেশনের নাম চিরিমিরি। ও-লাইনের একেবারে শেষ স্টেশন।

প্রথম যেদিন বশিষ্ঠ সেনের সঙ্গে দেখা সে-চেহারাটার কথা তখনও গৌরাঙ্গবাবুর মনে আছে। চিরকাল মনে থাকবে। ময়লা আধছেঁড়া ধুতি আর পাঞ্জাবি। তখনকার দিনে ধুতিই পরতো বশিষ্ঠ।

অনেক প্রশ্নের পর গৌরাঙ্গবাবু একটা ছোট প্রশ্ন করলেন—কোনও ক্যারেকটার সার্টিফিকেট আছে তোমার?

বশিষ্ঠ বললে—না—

—তা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট না পেলে আমি তোমাকে কি করে চাকরি দেব?

বশিষ্ঠ বললে—ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দরকার হবে আমি জানতুম না। নাহলে যতগুলো চাইতেন ততগুলো দিতে পারতুম।

—কি করে?

বশিষ্ঠ বললে—আজকাল ওগুলো কিনতে পাওয়া যায়।

গৌরাঙ্গবাবু ছেলেটার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন—কি করে জানলে তুমি যে ওগুলো কিনতে পাওয়া যায়? তুমি কিনেছ কখনও?

বশিষ্ঠ বললে—না, যারা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দেন তাদের ক্যারেকটার সার্টিফিকেট কে দেবে? তাই আর কিনতে ভরসা হয়নি।

গৌরাঙ্গবাবুর মনে হলো এমন আশ্চর্য লোক আগে তিনি যেন কখনও দেখেননি। বড় অদ্ভুত কথা বলে ছেলেটা।

বললেন—বড় বড় লোক সম্বন্ধে তোমার তো দেখছি খুব ভালো ধারণা নেই—

বশিষ্ঠ বললে—না, তা ভাববেন না, বড় বড় লোক সম্বন্ধে আমার খুবই শ্রদ্ধা আছে কিন্তু যারা আমার কাছে বড় বড় লোক, তারা কেউই বিখ্যাত নন। তারা সৎ, সত্যবাদী। তাদের মধ্যে কেউ মিস্ত্রী, কেউ কেরাণি, কেউ ভিখিরি, কেউ বা মুদিখানার মালিক। তাদের সার্টিফিকেট কি আপনি নেবেন? তাদের কথা কি আপনি বিশ্বাস করবেন? আপনি যাদের সার্টিফিকেট বিশ্বাস করবেন তারা কেউ বা মিনিস্টার, কেউ বা প্রফেসার, কেউ বা বিলেতফেরত, আবার কেউ বা পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ, তাদের নিজেদেরই ক্যারেকটার নেই, তাই তারা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট বেচেন—

গৌরাঙ্গবাবুর কেমন সন্দেহ হলো। ছেলেটা জোচ্চোর নাকি! এ ধরনের কথা যারা বলে সাধারণত তারা সৎ মানুষ হয় না। জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কে কে আছে সংসারে?

বশিষ্ঠ বললে—ছিল সবাই, কিন্তু এখন আর কেউ নেই—

—কেউ নেই কেন? মারা গেছেন?

বশিষ্ঠ বললে—না, সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে—

—কেন? ত্যাগ করেছে কেন?

বশিষ্ঠ বললে—ত্যাগ করেছে, কারণ আমি সংসারী নই বলে।

—সংসারী মানে?

—মানে আজকালকার পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারি না বলে। আমার তো

সেই জন্যেই এত জ্বালা। এই ময়লা জামাকাপড় দেখছেন। অথচ আমি একটু কৌশল করলেই আপনার কাছে চাকরির জন্যে এসেছি, রীতিমত ফরসা জামাকাপড় পরে আসতে পারতুম। তা করিনি। মনে হয়েছে ওটা ভণ্ডামি। আমার যা আছে আমি তাই পরেই এসেছি। এতে আপনি চাকরি দেন দেবেন, আর না-হয় হতাশ হয়ে চলে যাব। তা ছাড়া আর কী করতে পারি আমি?

গৌরাঙ্গবাবু সেইদিনই চাকরি দিয়ে দিলেন বশিষ্ঠকে। সেইদিন থেকে বশিষ্ঠর মাইনে হয়ে গেল দেড়শো টাকা। প্লাস আরো কিছু টাকা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স।

ম্যানেজার একদিন জিজ্ঞেস করলেন—ও কে স্যার? কোত্থেকে আনলেন ওকে?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—কেন, লোকটা ভালো নয়?

ম্যানেজার বললে—না, তা নয়। খুব অনেস্ট ছেলেটা। কাজে মোটে ফাঁকি দেয় না। মিথ্যে কথা বলে না।

—কাজকর্ম ভালো করে শিখে নিয়েছে?

ম্যানেজার বললে—শিখছে। কাজ শেখবার খুব আগ্রহ। নিজের কাজ ছাড়াও অন্য কাজ শেখবার দিকে ঝোঁক।

ভালো। গৌরাঙ্গবাবুর মনে হলো, ভালোই তো! তিনি যে ভুল লোক বাছেননি তার জন্যে নিজের বুদ্ধিরই তারিফ করলেন। তিনি তাহলে লোক চিনতে পারেন!

বললেন—ওর দিকে একটু নজর রাখবেন আপনি—

তা এমনি করেই বশিষ্ঠ সেন কোরাসিয়া কোলিয়ারিতে চাকরি পেয়ে গেল। কাজ শিখে নিতে লাগলো। আস্তে আস্তে সব কাজই করতে লাগলো ভালো ভাবে। শেষকালে এমন হলো যে বশিষ্ঠ না হলে কোলিয়ারির কাজই চলে না।

❋ ❋ ❋

এতক্ষণ গল্প শুনছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম—কী করে?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—সেই তো মজা মশাই! লোকে একদিনের জন্যেও তো অফিস কামাই করে, একদিনের জন্যেও তো লোকে ফাঁকি দিতে চায়! তাও দেবে না বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ অফিসে পাঁচ মিনিট আগে আসবে, তবু দু'মিনিট দেরি করে আসবে না। দেখুন যে-লোক অফিস কামাই করে না, সে-লোকের চরিত্র সম্বন্ধে বরাবর আমার একটা সন্দেহ আছে।

—কেন?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—আমি সে-সব লোকদের বিশ্বাস করি না। কাজে যে ফাঁকি না দেয়, অফিস যে কামাই না করে—সে লোক তো নরম্যাল নয়। সে লোক অ্যাব্‌নরম্যাল। সে মানুষ নয়, অমানুষ। অর্থাৎ তার ইমাজিনেশনের অভাব। অন্তত আমার তাই ধারণা।

বললাম—আপনার তো দেখছি অদ্ভুত ধারণা!

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—অদ্ভুত বলুন আর যাই বলুন, সেই ধারণা নিয়েই আমি এই কোটিপতি হয়েছি আজকে। আমার যা সাক্‌সেস্ দেখছেন, এ ওই অদ্ভুত ধারণার জন্যে। অন্য লোক যে যাই বলুক আমি আমার নিজের ওই প্রিন্সিপল্ নিয়েই এতদিন চলে এসেছি। আমি বিশ্বাস করি সততা বলতে আপনারা যা বলেন আসলে সেটা চরিত্রের

একটা অ্যাব্‌নরম্যালিটি। মানুষ তো আসলে অ্যানিমেল, সুতরাং মানুষকে মেরেই মানুষ নিজে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এ সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই চলে আসছে। সকলে সকলের সঙ্গে লড়াই করেছে। তাতে যে জিতেছে সে-ই রাজা হয়ে বসেছে। সেই যুগ থেকে এই আমাদের যুগ পর্যন্ত এই-ই চলে আসছে। এখন মুখের কথায় লোকে বলে ডেমোক্রেসি। কিন্তু এ তো সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মবোক্রেসির ছদ্মনাম।

তা সে যাই হোক। একদিন হঠাৎ ম্যানেজারের অসুখ হলো। লম্বা অসুখ। অসুখের জন্য লম্বা ছুটি নিতে হলো তাকে। সে জায়গায় কে কাজ করবে? কাজ করবার লোকের অবশ্য অভাব নেই। কিন্তু ম্যানেজারের কাজ?

ততদিনে বশিষ্ঠ যে অত কাজ শিখে ফেলেছে গৌরাঙ্গবাবুর জানা ছিল না।

সেদিন বশিষ্ঠ সেন নিজেই এসে হাজির হলো গৌরাঙ্গবাবুর কাছে।

এসে বললে—আপনি শুনছি ম্যানেজার মশাই-এর জায়গায় লোক খুঁজছেন? যদি আপনার আপত্তি না থাকে তো আমি সেখানে কাজ করতে পারি—

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—তুমি কি পারবে?

বশিষ্ঠ বললে—কিন্তু ম্যানেজার মশাইয়ের সব কাজ তো এতদিন আমিই করে এসেছি—

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—তুমি করে এসেছ? কই, আমি তো জানতাম না?

বশিষ্ঠ বললে—আপনি অফিসে খোঁজ নিতে পারেন, কিম্বা ম্যানেজার মশাইয়ের কাছে চিঠি লিখেও জানতে পারেন।

—কিন্তু ওঁর কাজ তুমি করবে কেন?

বশিষ্ঠ বললে—আমি সব ডিপার্টমেন্টের সব কাজই শিখে নিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম ম্যানেজার মশাইয়ের কাজটাও শিখে নিই। আমি নিজে থেকে ওঁকে সাহায্য করতুম। উনিও চাইতেন আমি ওঁকে সাহায্য করি। আমার বেশি কাজ করতে ভালো লাগে।

গৌরাঙ্গবাবু তাজ্জব হয়ে গেলেন। সাধারণত স্টাফ তো ফাঁকি দিতেই চায়। যে যত কম কাজ করে বেশি মাইনে আদায় করতে পারে তারই চেষ্টা করে সবাই। কিন্তু বশিষ্ঠ সেন হল আলাদা জাতের লোক।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—এতো কাজ কর কেন তুমি?

বশিষ্ঠ বললে—কাজ করতে আমার বড় ভালো লাগে যে।

—কেন, কাজ করতে তোমার এত ভালো লাগে কেন? সবাই তো কম কাজ করতেই চায়। তোমার এরকম হলো কেন; কাজ দেখিয়ে মাইনে বাড়িয়ে নিতে চাও তুমি?

বশিষ্ঠ বললে—না। মাইনে আমি বেশি চাই না।

—তার মানে? ম্যানেজারের কাজ করলে তো তোমাকে মাইনে বেশিই দিতে হবে।

বশিষ্ঠ বললে—না, মাইনে বাড়াতে চাইনে আমি। আমি এখন যা পাই, তাই-ই দেবেন। এক পয়সাও বেশি দিতে হবে না আমাকে।

—তবে কি কাজ শিখে নিতে চাও? কাজ শিখে নিয়ে অন্য কোলিয়ারিতে বড় চাকরিতে যেতে চাও?

বশিষ্ঠ বললে—না, সে রকম কোনও ইচ্ছে আমার নেই।

গৌরাঙ্গবাবু আরও অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—শুধু কাজের জন্যে কাজ করতে

চাও, এ-রকম তো হয় না। একটা কোনও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে তোমার। সেটা কি?

বশিষ্ঠ বললে—বিশ্বাস করুন, আমি শুধু কাজই করতে চাই, আমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই—

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—এ আমি বিশ্বাস করি না, নিশ্চয়ই তোমার কোনও উদ্দেশ্য আছে—

বশিষ্ঠ বললে—আপনি যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে আমার কিছু বলবার নেই।

বলে চলে যাচ্ছিল। গৌরাঙ্গবাবু তাকে আবার ডাকলেন।

বললেন—শোন—

বশিষ্ঠ আবার এল।

গৌরাঙ্গবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কত মাইনে পাও?

—দু'শো। সব মিলিয়ে।

গৌরাঙ্গবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—বাড়িতে তোমার ক'জন মেম্বার?

বশিষ্ঠ বললেন—কেউ নেই, আমি একলা—

—কোথায় থাকো?

—এখানকার বাঙালীদের মেসে।

—কত খরচ পড়ে সেখানে মাসে?

বশিষ্ঠ বললে—সব মিলিয়ে একশো টাকার মতন। তারপর জামা-কাপড় জুতো বা অন্য কিছু, সে সব আলাদা—

—হাতে কত বাঁচে?

বশিষ্ঠ বললে—একটা লাইফ ইনসিওর করেছি। তাতে মাসে কুড়ি টাকা চলে যায়। সব বাদ দিয়ে কোনও মাসে পনেরো-কুড়ি হাতে থাকে। কোনও মাসে বা তাও থাকে না। কিন্তু আমি দেনা করি না। দেনা করবার মত অবস্থা হলেও আমি কোনরকমে কষ্টেসৃষ্টে তাই দিয়েই সে মাসটা চালিয়ে নিই।

—কোনও নেশা আছে তোমার? সিগারেট কি বিড়ি কি তামাক?

বশিষ্ঠ বললে—আমার নেশা করতে ভালো লাগে না। জীবনে কখনও আমি সিগারেট-বিড়ি-পান ছুঁইনি।

এবার গৌরাঙ্গবাবু ভয় পেয়ে গেলেন।

বললেন—আচ্ছা তুমি যাও, আমি ভেবে দেখি—

বশিষ্ঠ নমস্কার করে চলে গেল।

* * *

গাড়ি হু-হু করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে গল্পও চলেছে।

আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম—আপনি তাকে ম্যানেজারের চাকরি দিলেন?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—বশিষ্ঠ চলে যাবার পর আমি অনেক ভাবলুম মশাই। আমার সত্যিই ভয় হলো বশিষ্ঠর কথা ভেবে।

—কেন, ভয় হলো কেন?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন--ভয় হবে না? যে লোক কাজ করতে ভালোবাসে, যে লোক মাইনে বাড়তে চায় না, যে লোকের কোনও অ্যাম্‌বিশন নেই, যে লোক সিগারেট-বিড়ি খায় না; যে কখনও দেনা করে না, তাকে ভয় হবে না? সে তো ডেঞ্জারাস লোক! এ তো ঠিক আমার উল্টো—

বললাম—আপনার উল্টো হলেই বা, কিন্তু ডেঞ্জারাস লোক কেন?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—ডেঞ্জারাস নয়? যে লোক কাজে ফাঁকি দেয় না সে-লোক ডেঞ্জারাস নয়? কী বলছেন আপনি? যে কাউকে ফাঁকি না দেয় সে তো ডাকাত!

—তার মানে?

—তার মানে হার্ডেন্‌ড্‌ ক্রিমিন্যাল! মানুষ কি গরু না গাধা যে সারাদিন মোট বইবে? মানুষের তো মন বলে একটা পদার্থ আছে? যার মন নেই, সে-ই তো জানোয়ার। মানুষ যে হবে সে আকাশের চাঁদের দিকে চেয়ে একটু উদাস হবে, শীতের সকালবেলা তার রোদ পোয়াতে ইচ্ছে করবে, একদিন ইচ্ছে হলো ঘুম থেকে দেরি করে জাগবে। তা নয় গরু-গাধার মত কাজ! এই তো আমি। আমি এত বড় মিলিওনেয়ার হয়েছি। আমি কি বরাবর কাজ করেছি? মোটেই করিনি। যত কাজ করেছি তার চেয়ে বেশি ফাঁকি দিয়েছি। কত দেনা করেছি জানেন? বছরের পর বছর দেনায় ডুবে থেকেছি। লক্ষ লক্ষ টাকার দেনা। তা ছাড়া ইন্‌কাম-ট্যাক্স ফাঁকি কম দিয়েছি? গভর্মেন্টকে যে কত লাখ টাকা ফাঁকি দিয়েছি তাঁর ঠিক নেই! কিন্তু কই, আমি ধরাও পড়িনি, জেলও খাটিনি। তাতে তো আমার লাভই হয়েছে আখেরে!

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—আমি বিশ্বাস করি—পৃথিবীতে যত লোক গ্রেট হয়েছে তারা সবাই ফাঁকিবাজ। তারা নিজেকে ফাঁকি না দিলেও হয়ত গভর্মেন্টকে ফাঁকি দিয়েছে। নয়তো স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়েছে, নয়তো ছেলেমেয়েকে ফাঁকি দিয়েছে। কিম্বা হয়তো অন্তত নিজেকে ফাঁকি দিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাউকে ফাঁকি না দিলে গ্রেটম্যান হওয়া যায় না। আপনি কী বলেন?

বললাম—আমি ওদিক দিয়ে জিনিসটা কখনও ভাবিনি—

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—ভাববেন, ভালো করে ভেবে দেখবেন, একেবারে খাঁটি লোক সংসারে অচল। পৃথিবী অ্যাবসলিউট্‌ ট্রুথকে কখনও সহ্য করে না। আসলে মানুষ ভেজালই ভালোবাসে। আর ভেজাল আছে বলে পৃথিবীটা এত ভালো জায়গা। আমি যদি অনেস্ট সত্যবাদী হতুম, তো আজ এত সাক্‌সেসফুল ম্যান হতে পারতুম না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয়ই করে বলতে পারি।

বললাম—কিন্তু তাকে কি ম্যানেজারের পোস্টটা দিলেন?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—দিলাম। কিন্তু অনেক ভাবার পর। ভাবলাম এতদিন তো আমার নিজের ইচ্ছে অনুযায়ীই চলেছি। এবার দেখি না সৎ লোকের দ্বারা কেমন কাজ হয়। আমার নিজের মধ্যেই একটা লড়াই চলতে লাগলো কদিন ধরে। চাকরিটা বশিষ্ঠকে দেব কি দেব না। ততদিনে বশিষ্ঠর আর সেই ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড় নেই। ততদিনে সে আরো ভদ্র হয়েছে। স্টাইল করে না, কিন্তু সাদাসিধে ফরসা পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে অফিসে আসে।

তারপর গল্প করতে করতে গৌরাঙ্গবাবু আবার থামলেন।

তারপর বললেন—আমার গল্পতে আপনি রস পাচ্ছেন কি না জানি না। কারণ এ রাম-শ্যাম যদু-মধুর গল্প নয় যে দু'চারটে সেক্স-টাচ্ থাকবে। কিম্বা একটা মোটা ক্রাইম রস থাকবে। সে-সব কিছুই নেই এতে। আপনি এসব নিয়ে কখনও অবশ্য গল্প লেখেন না। কিন্তু ওসব ছাড়াও তো আরো অনেক সমস্যা আছে জীবনে। তা নিয়ে আপনারা তো কই লেখেন না! আমার মনেও তো অনেক সমস্যা আছে। এই সব সমস্যা নিয়েই বা আপনারা গল্প লিখবেন না কেন?

আমি আর কী বলবো! শুধু বললাম—আমার কথা থাক, আপনার কথা বলুন—

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—কেন এ-কথা বলছি তার কারণ আমার জীবনে মশাই স্ত্রীলোক কোনও সমস্যাই নয়। অথচ আপনাদের গল্পে দেখেছি সেইটেই সবচেয়ে বড় সমস্যা। আসল সমস্যাটা হলো আমার নিজেকে নিয়ে। আমি নিজেই গল্পের নায়ক, আর আমার মন গল্পের নায়িকা। বশিষ্ঠ তো শুধু আমার একজন স্টাফ নয়, বশিষ্ঠ তো আমার আর একটা সত্তাও বটে। আমি সেই বশিষ্ঠকে নিয়ে বড় মুশকিলে পড়লুম। বশিষ্ঠ হলো সততার প্রতিমূর্তি আর আমি ঠিক তার উল্টো। এই দুটোতে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল।

তারপর চুরোটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—এখন সমস্যা হলো, কোন্‌টা ঠিক? সততা না চালাকি? চরিত্র না অসাধুতা?

ক'দিন মোটে আমি ঘুমোতে পারলুম না। ছোটবেলা থেকে এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই আমি বড় হয়েছি। আমি চারদিকের আবহাওয়া দেখেই বুঝেছিলুম সততা দিয়ে বড় হওয়া যায় না। ওটা ঘুর-পথ। আসল পথ হচ্ছে চালাকি। আসলে চালাকি শব্দটা ঠিক শব্দ নয়। ইংরিজিতে ওটাকে বলা হয় ট্যাক্ট্। আমি ওই ট্যাক্ট্ দিয়েই আমার ব্যবসাকে দাঁড় করিয়েছি। আর ব্যবসা থেকেই আমি বড়লোক হয়েছি। আমি ক্লায়েন্টদের কাছে মিথ্যে কথা বলেছি, ইন্‌কাম-ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছি, ভেতরের আসল কথাটা চেপে রেখে বাইরে ছদ্মবেশ ধারণ করেছি। তবেই তো আমি অত বড় কোলিয়ারির মালিক হয়েছি।

তা যাক গে, শেষ পর্যন্ত আমি বশিষ্ঠকে প্রমোশন দিলুম। বশিষ্ঠই হলো আমার কোলিয়ারির নতুন ম্যানেজার।

আমাদের কোলিয়ারির ম্যানেজার বলতে গেলে অনেক কিছু। দায়িত্ব তার যেমন অনেক, কাজও তেমনি তার কম নয়।

আগেকার ম্যানেজার ঠিক সময়ে আসতো, আর ঠিক সময়েই বাড়ি চলে যেত। এক মিনিট দেরি করত না অফিস ছাড়তে। তার কাজও ছিল নিখুঁত। কোথাও কোন ফাঁক ছিল না। কিন্তু ফাঁকি ছিল।

আমি তার রেগুলারিটি পছন্দ করতাম বটে, কিন্তু তার ফাঁকিটাও আমার খারাপ লাগতো না। বরং বলতে গেলে তার ফাঁকির জন্যেই আমার কোম্পানী বড় হয়েছিল। সেই জন্যেই আমার কোলিয়ারির সমস্ত কাজের ভার তার ওপরেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। সে অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যেত টেনিস খেলতে, তারপরে ক্লাবে গিয়ে বসতো হুইস্কির বোতল নিয়ে।

কিন্তু বশিষ্ঠ আলাদা জাতের।

আমি অফিসে এসে দেখতাম বশিষ্ঠ আমার আগেই এসে অফিসে হাজির হয়েছে।

আমি বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলাম—বশিষ্ঠ সাব কখন এসেছে?

বেয়ারা বললে—অনেক সকালে।

ঠিক কখন সে অফিসে আসে তা জানবার জন্যে কেয়ারটেকারকেও জিজ্ঞেস করলাম। কেয়ারটেকার বললে—ভোর বেলা। ভোর ছটার সময়।

আরো অনেক তথ্য শুনলাম। শুনলাম ভোর ছটার সময় বশিষ্ঠ এসে নিজেই ঘরের দরজা খুলে ডাস্টার দিয়ে পরিষ্কার করে নেয় নিজের চেয়ার-টেবিল। তারপর কাজ করতে বসে। তারপর থেকে কখনও যায় ভেতরে ওয়ার্কারস্‌দের কাজ দেখতে কখনও নিজের টেবিলে এসে স্টেনোগ্রাফার ডেকে ডিক্‌টেশান দেয়।

তারপর সন্ধ্যে সাতটা-আটটা পর্যন্ত তার চলে এইরকম। তখন সে তার মেসে যায়। মেসে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাকি আবার আসে। আবার নিজের ঘরে বসে। তখন তার স্টেনো নেই। সে একলাই চিঠি লেখে, একলাই সে-চিঠি আবার নিজে টাইপ করে। তারপর কত রাত্রে বাড়ি যায় কেউ জানে না।

এ-ঘটনা আমার কাছে অবাক লাগলো।

এক মাস এমনি চলার পর আমি বশিষ্ঠের মাইনে বাড়িয়ে দিলাম আরো দু'শো টাকা।

আমি একদিন বশিষ্ঠকে জিজ্ঞেস করলাম—হাউ ইজ এভরিথিং?

বশিষ্ঠ বললে—সব ঠিকই চলছে।

জিজ্ঞেস করলাম—অ্যাকাউন্টস্ ব্রাঞ্চটা দেখছো?

বশিষ্ঠ বললে—অ্যাকাউন্টস্‌টা আমি নিজেই সুপারভাইজ করছি।

—পিট্?

বশিষ্ঠ বললে—পিট্-এ আমি রোজ যাই।

—সব ঠিক চলছে তো?

—সব ঠিক চলছে।

আমিও খবর রাখতুম সত্যিই সব ঠিক চলছে কিনা। সবাই মানছে বশিষ্ঠকে। সবাই খুশি তার কাজে, কোথাও কোনও গোলমাল নেই। বেশ পরিষ্কার কাজ। ভালো ড্রাফট্ লিখতে পারে বশিষ্ঠ। অফিসের বাইরেটা আগে নোংরা ছিল। সেখানে বাগান করে দিলে বশিষ্ঠ। সে বাগানে আস্তে আস্তে ফুল ফুটতে লাগলো।

তা ভালই। সবাই খুশি থাকলেই আমি খুশি।

কে না চায় শান্তি! শান্তিতে যদি টাকা আসে তাহলে কেন ডিস্‌টার্ব করতে যাবো প্রতিষ্ঠানকে? বেশ চলছে চলুক না! আমিও নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে দিলুম।

একদিন বশিষ্ঠ এসে বললে—অ্যাকাউন্টসে অনেক গোলমাল ছিল—

জিজ্ঞেস করলুম—কি গোলমাল?

বশিষ্ঠ স্টেটমেন্ট দেখালে আমাকে। অ্যাকাউন্টস সিস্টেমটার গোলমাল দেখালে। কী করলে জিনিসটা সহজ হয় তাও দেখালে। আমি তার ব্রেন দেখে অবাক হয়ে গেলুম।

বললাম—তুমি যা ভালো বোঝ তাই করো—

বশিষ্ঠ ফাইল নিয়ে চলে গেল। আর কিছু বললে না।

দেখলাম সৎ লোক দিয়েও তাহলে কাজ হয়। এটা আমার কাছে একটা আবিস্কার। আমার সারা জীবনের ধারণা যেন আস্তে আস্তে বদলে যেতে লাগলো। এও আমার কাছে এক আত্মদর্শন। আপনি বুঝতে পারবেন না আমার সে কী মনের অবস্থা। আমি যেন নতুন

করে জন্ম নিলাম পৃথিবীতে। আমার মনে হতো তাহলে লোকে যা বলে তা সত্যি! তাহলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, গীতা সব সত্যি! একদিন ও-সব বুজরুকি বলে উড়িয়ে দিতুম, এতদিন পরে আবার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো। মনে হলো যেন এতদিন আমি ভুল পথে চলেছি।

আমি দু'দিন অফিসে গেলাম না। ভাবলাম আমি না-গেলে হয়ত অফিস অচল হয়ে যাবে। অফিস অচল হয়ে গেলেই যেন আমি খুশি হতুম। অন্তত তাহলে আমার পথটাই ঠিক বলে গণ্য হতো।

কিন্তু না, দু'দিন ছুটির পর যখন আমি অফিসে গেলাম তখন দেখলাম অফিস ঠিক আগের মতই চলছে। কোথাও কোনও অসুবিধে হয়নি। কোথাও কোনও পান থেকে এতটুকু চুন খসেনি।

তারপর আরো পরীক্ষা করলুম বশিষ্ঠকে।

এক মাস অফিসে গেলাম না আমি। ভাবলাম এবার ঠিক অচল হয়ে যাবে সব। এবার অন্তত বশিষ্ঠ আমার কাছে দৌড়ে আসবে। বলবে—আর পারছি না স্যার।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! প্রতিদিনই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকতুম। কিন্তু বশিষ্ঠ একদিনও এলো না। কেয়ারটেকারকে টেলিফোন করে জেনে নিতাম—কেমন চলছে অফিস।

উত্তর পেতাম—সমস্ত ঠিক চলছে—

আমার অস্বস্তি আরো বেড়ে যেতে লাগলো। তবে কি বশিষ্ঠই ঠিক, আর আমিই ভুল?

এক মাস পরে আবার অফিসে এলুম একদিন। দেখলাম বাইরের বাগানটায় আরও ফুল ফুটেছে। অফিস আরো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কাজ-কর্মে কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। সব নিশ্চিন্তে নির্বিবাদে চলছে।

আমার হঠাৎ মনে হলো আমি যেন এখানে একেবারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছি। আমার নিজের প্রতিষ্ঠানেই আমি অপাঙ্‌ক্তেয়। আমি না থাকলেও সব চলবে।

❋❋❋

গাড়ি চালাতে চালাতেই গৌরাঙ্গবাবু আমার দিকে চাইলেন।

বললেন—বলুন তো এর চেয়ে ডেঞ্জারাস প্রব্‌লেম আর কী হতে পারে! আমি নেই, আমার না-থাকার জন্যে কোথাও কারোও অসুবিধে হবে না, এ ভাবনাটা কী ভয়াবহ! বশিষ্ঠ কাজ-কর্ম ভালো চালাচ্ছে, এর জন্যে আমি তাকে কোথায় প্রশংসা করবো তা নয়, আমার রাগ হতে লাগল বশিষ্ঠের ওপর। বশিষ্ঠ কি আমাকে অস্বীকার করছে? বশিষ্ঠ কি দেখাবে আমি একজন সাইফার? আমার অস্তিত্বের কোনও মূল্য নেই তার কাছে? আমি তাহলে কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ চালিয়েছি? এই যে আমাকে এত স্টাফ সেলাম করে, এর কি কোনও কারণ নেই? আমি না এলে কি বশিষ্ঠ খুশি হয়? এই যে এতদিন আমি আসিনি, কই বশিষ্ঠ তো আমার কাছে এসে বললেও না যে আমি না আসতে সে খুব মুশকিলে পড়েছিল; তার খুব অসুবিধে হয়ছিল?

একদিন হলো কি, হঠাৎ একটা ক্রেন ছিঁড়ে বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হলো।

আমি তখন বাড়িতে ঘুমোচ্ছি। মাঝরাত। হঠাৎ সাইরেনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঘন ঘন বাজছে। আমি বুঝতে পারলাম কোনও কোলিয়ারিতে অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়েছে। এই রকম সময়ে সাইরেন বাজানোই নিয়ম। ওকে বলে ডেঞ্জার সিগন্যাল। আপনি যদি কখনও ও-অঞ্চলে যান তো দেখবেন পাশাপাশি অনেকগুলো কোলিয়ারি। এখন কাদের সাইরেন বাজছে কী করে বুঝবো। বলতে গেলে সব সাইরেনের আওয়াজই প্রায় একরকম। আর তা ছাড়া তখন তো আমার ঘুমের ঘোর ভালো করে কাটেওনি।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। তুলতেই বশিষ্ঠেব গলা।

—স্যার, অ্যাক্‌সিডেন্ট!

—কী হয়েছে?

—ক্রেনটা ছিঁড়ে গেছে।

—ক্যাজুয়েলিটি কত?

—বলতে পারছি না। তবে খুব বেশি নয়।

—তুমি কখন খবর পেলে?

বশিষ্ঠ বললে—আমি তো তখন ছিলুম এখানে—

বললাম—আমি এখুনি যাচ্ছি—

বশিষ্ঠ বললে—না স্যার, আপনার কষ্ট করবার দরকার নেই। আপনি ধীরেসুস্থে আসুন, আমি সব ব্যবস্থা করেছি। আমি সব জায়গায় ওয়্যার করে দিয়েছি অলরেডি—

আমি রিসিভার রেখে দিলাম। কিন্তু আমার ভালো লাগলো না তার কথাগুলো। আগেও অনেকবার অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়েছে। কোলিয়ারিতে অ্যাক্‌সিডেন্ট হওয়া নতুন কিছু নয়। কিন্তু তখন আমার আগেকার ম্যানেজার বলেছে—এখুনি চলে আসুন স্যার, সর্বনাশ হয়েছে—

তখন সেই ম্যানেজারের কথাও আমার ভালো লাগেনি। আমাকেই যদি এত ব্যতিব্যস্ত হতে হবে, তাহলে মোটা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার রাখার দরকার কী?

কিন্তু সেদিন মনে হলো এই নতুন ম্যানেজার আমাকে আসতে বারণ করছে কেন? তবে কি আমি কেউ না?

যাহোক, আমি তবু তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে স্পটে গেলুম। গিয়ে দেখি অদ্ভুত কাণ্ড। বশিষ্ঠ সব ম্যানেজ করেছে। আমি ছিলুম না, তবু কোনও দিকে কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। মেডিক্যাল অফিসার, ইনস্‌পেক্টার অব্‌ মাইন্‌স সবাইকে খবরাখবর দিয়ে কাজ সেরে রেখেছে—

বশিষ্ঠ হয়তো ভেবেছিল তার কাজ দেখে আমি খুব খুশি হয়ে তাকে অভিনন্দন জানাবো, তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবো।

কিন্তু আমি কিছুই করলাম না।

কিছুদিন বাদে যথারীতি সব ঝামেলা মিটে গেল। আমায় কোনও কিছু করতে হলো না, আমার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগলো না। যা কিছু করবার তা সে-ই করলে।

বলে গৌরাঙ্গবাবু চুরোটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

***

গৌরাঙ্গবাবু এবার আমার দিকে ফিরে বললেন—চলুন, এবার একটু কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। লাঞ্চএর টাইম হয়ে গেছে। আপনার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।

বললাম—খিদে পাক আর না-পাক, সময় মত খেয়ে নেওয়া ভালো—

গৌরাঙ্গবাবু হঠাৎ গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে একটা রেল-স্টেশনের পেছনে গিয়ে থামলেন।

বললেন—গাড়িতেও ফুয়েল নিতে হবে, পেটেও ফুয়েল নিতে হবে—

আমি চেয়ে দেখলাম বর্ধমান স্টেশন। বিরাট ডাইনিং হল্। সেখানেই লাঞ্চের অর্ডার হলো। গাড়িটা পেট্রল-পাম্পে ফিরে গিয়ে তেল ভর্তি করে, হাওয়া-টাওয়া চেক্ করে আবার ঢোকা হলো হলের ভেতর। ততক্ষণে সব তৈরি।

গৌরাঙ্গবাবু একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে বসলেন।

বললেন—খাওয়ার ব্যাপারে আমি একটু লিবারেল মশাই। আমার কোনও বাছ-বিচার নেই। আমি সব খাই। দরকার হলে বিফ্ খেতেও আমার আপত্তি নেই, তা ছাড়া রাত্রে আমাকে হুইস্কিও খেতে হয়।

বললাম—রোজ?

—হ্যাঁ, রোজ। আমি তো আপনাকে বলেইছি জীবনে আমি কোনও স্ক্রুপল্ মানি না। দরকার হলে গড়-গড় করে আমি ডাহা মিথ্যা কথা বলতে পিছপা হইনি। আর মিথ্যে কথা বলা যে খারাপ তাও আমি মানি না। আসলে মানুষকে তো বাঁচতে হবে। বাঁচার জন্যে যা করা উচিত তা করতে গেলে ন্যায়-অন্যায় ভাবলে তো চলবে না। আগে মানুষের জীবন ছিল সোজা। কম্‌পিটিশন ছিল না, এত যন্ত্রপাতিরও অস্তিত্ব ছিল না, তখন ওই গীতা উপনিষদ মহাভারতের উপদেশ মেনে চলা সম্ভব হতো, তখন ঘড়ি দেখবারও দরকার হতো না। কিন্তু ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা জীবন। কোথাও যদি পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছে তো দেখবেন অন্য লোক আপনার জায়গায় গিয়ে গ্যাঁট্ হয়ে বসে পড়েছে। সে কিছুতেই আর নড়বে না সেখান থেকে। তখন তাকে সরাতে গেলে আপনাকে লাঠি মেরে তাকে সরাতে হবে। এই তো জীবন। সুতরাং মিথ্যে কথা বলতে হবে, জাল-জোচ্চুরি করতে হবে, অন্য লোকের মাথায় লাঠি মারতে হবে। দরকার হলে সবই করতে হবে আত্মরক্ষার জন্যে। আর তা না করে আপনি যদি অহিংসার বাণী প্রেমের বাণী আওড়ান তো আপনাকেই পিছিয়ে পড়তে হবে, আপনাকেই হটে আসতে হবে।

বললাম—কিন্তু আপনার বশিষ্ঠ তো কাজ ভালো করেই করছিল। কাজে তার কোনও খুঁত ছিল না। তাহলে আপনার রাগ কীসের তার ওপর?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—ওই যে, অনেস্টি। ওর ওই সততাই ছিল আমার চক্ষুশূল। একটা পয়সা ঘুষ নেবে না, একটা টাকা মাইনে বাড়াতে বলবে না, এটা কি ভালো! ধরুন আপনার একটি সুন্দরী মেয়ে আছে, আপনি তাকে গান শেখাতে চান। এমন গানের মাস্টার যদি বিনাপয়সায় তাকে গান শেখাতে চায়, তাতে আপনি রাজি হবেন? না কারো রাজি হওয়া উচিত?

আমি চুপ করে রইলাম। যুক্তিটা যেন অদ্ভুত মনে হলো আমার কাছে। এ যেন ঠিক যুক্তিহীন উকিলের জেরা।

—আর তা ছাড়া কোনও মানুষের লোভ থাকবে না এটাও আমার ভালো লাগে না। পৃথিবীতে অনেক মানুষ থাকে যাদের কোনও অ্যামবিশন নেই। তারা বেশ চাকরি করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুমোচ্ছে। আসলে তারা তো আমার কাছে মানুষই নয়। হয় তারা জানোয়ার, আর নয়তো জড় পদার্থ। তাদের কথা আমি ধর্তব্যেই আনি না। কিন্তু যাদের অ্যাম্‌বিশন আছে, তারা যদি নিজের অ্যাম্‌বিশনকে সার্থক করতে চায় তো অন্যকে সরিয়ে নিজেকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবেই, ভিড় ঠেলতে হবেই, ভিড় ঠেলবার জন্যে গুঁতোগুঁতি করতে হবেই। অর্থাৎ সবাই সবাইকে গুঁতোগুঁতি করবে। সেখানে যদি কেউ বলে তুমি ফাউল করছো, তাহলে কি কেউ সে-কথা শুনবে?

দেখুন, আমাদের কয়লার ব্যবসাতেও কম্‌পিটিশন, অনেক সমস্যা আছে। সে-সব আপনি শুনলেও বুঝতে পারবেন না। তেমনি স্টাফের ব্যাপারেও অনেক সমস্যায় পড়তে হয়, যাকে সব সময় ঠিক ন্যায় বলা চলে না। সেই সব সময়ে আমি হলে কী করি? ন্যায়-অন্যায় তখন বুঝি না। আমার স্বার্থটাকেই তখন বড় করে দেখি।

কিন্তু এখানেই আমার সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হলো বশিষ্ঠের।

একজন স্টাফের ছেলে মরে গিয়েছিল। সেই ব্যাপারে সে কোনও খবরাখবর না দিয়ে দেশে চলে গিয়েছিল। অফিসে কোনও ইনটিমেশনও দেয়নি।

আমি তার চাকরি খেয়ে দিয়েছিলুম।

সেদিন বশিষ্ঠ আমার কাছে এলো। বললে—স্যার, জীবন মাইতিকে চাকরি থেকে আপনি ডিসচার্জ করে দিলেন!

বললাম—হ্যাঁ, সে খবর না দিয়ে অ্যাবসেন্ট হয়েছিল—

বশিষ্ঠ বললে—কিন্তু আমি যে তাকে কথা দিয়েছিলুম তার চাকরি যাবে না—

বললাম—তা কেন তাকে তুমি সে-কথা দিতে গেলে?

বশিষ্ঠ বললে—তার ছেলে মারা গিয়েছিল। তখন শোকে অস্থির হয়েছিল সে, তাই সে আর এদিকের কথা ভাববার সময় পায়নি।

—কিন্তু প্রত্যেকের সুবিধে-অসুবিধের কথা ভাবলে কোম্পানি তো চলবে না! কোম্পানি আগে, তারপর তার স্টাফের ছেলে।

বশিষ্ঠ বললে—কিন্তু ওরাই তো আমাদের কোম্পানিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, কোম্পানিকে রসদ যোগাচ্ছে—

আমি বললাম—ও-রকম হাজার হাজার লোক চাইলেই পেয়ে যাবে। জীবন মাইতি যদি মরে যায় তো কোম্পানি কি সেজন্যে অচল হয়ে যাবে বলতে চাও?

বশিষ্ঠ বললে—কিন্তু যারা এই কোম্পানির সেবা করে আসছে এতদিন ধরে, তারা কেউ না?

আমি বললাম—সকলের সব সুবিধে দেখতে গেলে তো কোম্পানিকে ফতুর হয়ে যেতে হয়!

বশিষ্ঠ বললে—কিন্তু কোম্পানির ডেবিট-ক্রেডিট তো আমি দেখি, তাতে কিন্তু কোম্পানির ফর্টি পার্সেন্ট প্রফিট রয়েছে এখনও।

—কিন্তু ট্যাক্স, রিজার্ভ-ফান্ড, ওই সব—

বশিষ্ঠ বললে—ও-সব বাদ দিয়েই আমি বলছি। ফিগার তো আমি দেখছি, জীবন মাইতিই হোক আর বিজয় সিকদারই হোক, তাদের দুঃখ-কষ্টও আমাদের দেখতে হবে।

তাতে যদি প্রফিট ফর্টি পার্সেন্ট থেকে নেমে এসে টুয়েন্‌টি পার্সেন্টেও ঠেকে তাতেও আমাদের অনেক লাভ—

আমার মেজাজটা চড়ে গেল। বললাম—তোমাকে আমার লাভ-লোকসানের কথা ভাবতে হবে না বশিষ্ঠ, আমি যা বলছি তাই করো—

বশিষ্ঠ খানিকটা গুম্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বোধ হয় একটু ভেবে নিয়ে বললে—কিন্তু কোম্পানির লাভ-লোকসান দেখাও তো আমার কাজ।

আমি বললাম—আমি যা করতে বলবো সেইটে করাই তোমার কাজ। আমার হুকুম তামিল করা ছাড়া আর তোমার কোনও কাজ নেই।

এরপর ভেবেছিলাম বশিষ্ঠ আর কিছু উত্তর দেবে না। আমার সামনে থেকে চলে যাবে। কিন্তু না, তেমনি দাঁড়িয়েই রইল ঠায়।

আমি আমার নিজের কাজ করতে করতে বললুম—আইন আইনই, আমি যে আইন করেছি সেই আইন সকলকেই মেনে চলতে হবে। ইন্‌ডিসিপ্লিন চলবে না কোরাসিয়া কোলিয়ারিতে—

বশিষ্ঠ বললে—আমার একটি অনুরোধ শুনুন, স্যার। ছেলের অসুখের জন্যে দেশে গিয়েছিল ও। সেখানে গিয়ে ওর ছেলে মারা গেল। মানুষের ছেলে মারা যাবার পর কি তখন কারো জ্ঞান থাকে? একে কি আপনি ইন্‌ডিসিপ্লিন বলবেন?

—আইন ভাঙা মানেই তো ইন্‌ডিসিপ্লিন। তা ছাড়া ওকে আর কী বলবো?

বশিষ্ঠ বললে—কিন্তু আইনের ওপরেও তো আর একটা আইন আছে!

আমি বললাম—সে কোন্‌ আইন?

বশিষ্ঠ বললে—যে আইনে আকাশে চন্দ্র-সূর্য ওঠে, যে আইনে গাছে ফুল ফোটে, যে আইনে মানুষ জন্মায়, মরে, বড় হয়—সেদিকটাও এম্‌প্লয়ার হিসেবে আমাদের তো দেখতে হবে। আমরা যে আইন করেছি সে তো আমাদের নিজেদের সুবিধের জন্যে। ওদের সুবিধের জন্যে তো আমরা কোনও আইন করিনি—

বশিষ্ঠের মুখ থেকে কথাগুলো যেন উপদেশের মত শোনালো। আমাকে যেন সে উপদেশ দিচ্ছে মনে হলো।

তারপর আমি নিজের ফাইলের মধ্যে মুখ গুঁজে রাগ চাপবার চেষ্টা করলুম। দেখলুম বশিষ্ঠ তখনও আমার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। যেন আমার কাছে কথা আদায় না করে সে যাবে না। আমি তবু আমার মুখ তুললুম না। আমি সেই একইরকম ভাবে কাজ করে যেতে লাগলুম। তারপর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন কোনও উত্তর পেলে না, তখন একসময়ে সে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে চলে গেল।

গৌরাঙ্গবাবু থামলেন।

আমার দিকে চেয়ে বললেন—এ কি, আপনি যে কিছুই খেলেন না?

বললাম—আমার খাওয়া হয়ে গেছে—

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—সে কী মশাই, আপনাকে এতদূর টেনে এনে তো তাহলে ভারি কষ্ট দিলুম!

বললাম—না, কিছু কষ্ট নেই, আপনি বলুন—

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—গল্পটা শুনে আপনার ভালো লাগছে তো? এ তো একেবারে নিরিমিষি গল্প, এতে কোনও স্ত্রী-চরিত্র নেই, খুন-খারাবি নেই, ড্রামাও নেই! আপনাদের কি এসব ভালো লাগবে? আমি আপনাকে টেলিফোন করবার আগেই ভেবেছিলাম আপনি আমাকে আমল দেবেন কিনা।

বললাম—কেন?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—ভাবলাম পাগলের প্রলাপ শোনবার সময় কি আপনাদের আছে? অবশ্য আমার নিজের কাছে এটা পাগলের প্রলাপ নয়। আমি নিজে ভুক্তভোগী বলেই মনে হয়েছে এর চেয়ে বড় সমস্যা বুঝি পৃথিবীতে আর কিছু নেই। কারণ এটা যে আত্মসম্মানের প্রশ্ন। আমি নিজে কোলিয়ারির মালিক। আমার হুকুম তামিল করবার জন্যে হাজার হাজার লোক মুখিয়ে আছে। আমি সেলাম পাবার জন্যেই জন্মেছি। আমি কেন ছোট হবো আমার স্টাফের কাছে! অবশ্য বলতে পারেন ছোট-বড়র প্রশ্ন এতে কোথায়? বশিষ্ঠ তো বরাবর আমার মর্যাদা রেখেই কথা বলেছে? কিন্তু তবু আমার মনে হলো বশিষ্ঠ যেন আমার চোখে বড্ড বড় হয়ে উঠেছে।

কেউ বড় হবে, এ আমি কেমন করে সহ্য করবো?

আসলে দেখুন, আমরা বোধ হয় সবাই-ই আত্মকেন্দ্রিক। বিশেষ করে আমি তো বটেই। আমার নিজের ভালো হওয়া ছাড়া আর কী ভাববো। আমারই খেয়ে মানুষ হবে, আবার আমাকেই এসে উপদেশ দেবে এটা তো কারোরই ভালো লাগবার কথা নয়! বিশেষ করে আমার মত মানুষের তো ভালো লাগবেই না।

বলে গৌরাঙ্গবাবু আবার বললেন—আমি কিছু অন্যায় বলেছি, আপনিই বলুন?

বললাম—ন্যায় অন্যায় আমি জানি না, আমি চরিত্রের কথা জানি। বশিষ্টের যা চরিত্র সে তা করেছে, আপনার যা চরিত্র আপনি তাই-ই বলছেন।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—তা হলে আপনি কি বলতে চান তার মতে মত দেওয়াই আমার উচিত ছিল?

বললাম—আপনি মালিক, আপনি কেন তার কথায় সায় দেবেন? আপনি আপনার নিজের মতেই চলবেন!

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—ঠিক বলেছেন। ঠিকই বলেছেন আপনি—

তারপর খেতে খেতে বললেন—আমি তার কথা আর শুনলাম না। আমি ঠিক করলাম আমি এর প্রতিশোধ নেব। আমি সেইদিনই জীবন মাইতির নামে ডিসচার্জ লেটার লিখে ইসু করে দিলাম। আজকালকার যুগে এ-রকম করলে হয়ত ধর্মঘট বা ঘেরাও একটা কিছু হতো। কিন্তু তখনকার যুগ আলাদা। তখন মাথা নিচু করে সবাই সব কিছু সহ্য করতো।

কিন্তু আশ্চর্য, হঠাৎ ভেতর থেকে আমি খবর পেলাম যে, যে-লোককে আমি ডিসচার্জ করে দিয়েছি বশিষ্ঠ ভেতরে ভেতরে সেই জীবন মাইতিকেই টাকা দিয়ে সাহায্য করছে। মাসে মাসে নাকি তার ফ্যামিলিকে দু'শো টাকা করে দিচ্ছে—

সেদিন আমি রেগে গিয়ে ডেকে পাঠালাম বশিষ্ঠকে।

বশিষ্ঠ আসতেই জিজ্ঞেস করলাম—আমি যা শুনছি তা কি সত্যি?

বশিষ্ঠ বললে—আপনি কোন্ কথা শুনেছেন?

বললাম—তুমি নাকি জীবন মাইতির ফ্যামিলিকে মাঝে মাঝে টাকা দিয়ে সাহায্য করছো?

বশিষ্ঠ স্বীকার করলে। বললে—হ্যাঁ।

বললাম—আমি তাকে ডিসচার্জ করেছি, আর তুমি আমার ম্যানেজার হয়ে তাকে ব্যাক্‌ডোর দিয়ে সাহায্য করছো—এটা কি ভালো? এটা কি ঘুরিয়ে আমাকে অপমান করা নয়?

বশিষ্ঠ বললে—জীবন মাইতির ফ্যামিলিকে আমি যদি সাহায্য না করি তো তারা উপোস করবে। একটা ফ্যামিলি উপোস করে মারা যাবে, আমি মানুষ হয়ে সেটা চোখ দিয়ে দেখবো কী করে!

—কিন্তু লোকে কী ভাববে? এই-ই ভাববে তো যে তোমার ইচ্ছে ছিল না তুমি তাকে ডিসচার্জ করবে, আমি জোর করে তোমাকে দিয়ে ডিসচার্জ লেটার ইসু করিয়ে দিয়েছি?

বশিষ্ঠ বললে—না, সেটা ভাবা তাদের অন্যায়। আমি কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে তাকে ডিসচার্জ করেছি, আর একজন মানুষ হিসেবে তাকে চ্যারিটি করছি—

যুক্তি সে যাই দিক, আমার কিন্তু মনে হলো বশিষ্ঠ আমারই চাকরি করে আমাকেই প্রকারান্তরে অপমান করতে চাইছে।

সেদিন আর কিছু বললাম না। বশিষ্ঠ তার কামরায় চলে গেল। আমি সেইদিন থেকে বশিষ্ঠকে তাড়াবার বন্দোবস্ত করতে লাগলাম। বশিষ্ঠ যেন দিন-দিন আমার চোখে অসহ্য হয়ে উঠছিল। তার সমস্ত গুণগুলো আমার চোখে দোষ হয়ে উঠতে লাগলো।

তারপর ক'দিন ধরে ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে কাটতে লাগলো আমার। আমার বাড়িও আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতে লাগলো। উঠতে বসতে আমার মনের মধ্যে একটা প্রতিশোধের বাসনা জেগে উঠতে লাগলো। আমি মরিয়া হয়ে উঠলুম।

তারপর একটা পথ আবিষ্কার করলুম।

অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টটা বরাবরই ম্যানেজারের আওতার মধ্যে ছিল। ওটা একটা অর্ডার দিয়ে তার হাত থেকে নিজের হাতে নিলুম। তখন থেকে অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট-এর সোজাসুজি মালিক হলাম আমি।

দেখুন, মডার্ন যুগে অ্যাকাউন্টস-ই হচ্ছে সব। হিসেবের কারচুপিতে লাভকে লোকসানে পরিণত করা যায়, লোকসানকে লাভে। এই বর্তমান যুগকে সেইজন্যেই বলা যায় হিসাবের যুগ! এককালে যেমন ইতিহাসে 'স্টোন-এজ্' ছিল, মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই স্টোন-এজ্-ই আবার একদিন ব্রোঞ্জ-এজ্-এ পরিণত হয়েছে। এইরকম করে করে এসেছে অ্যাটম-এজ্। তারপরে সবচেয়ে শেষে এসেছে অ্যাকাউন্ট্স্-এজ্। এটা হিসেবের যুগ। টাকাকড়ির সঙ্গে কারো দেখা-সাক্ষাৎ নেই, কিন্তু হিসেবের খাতা নিখুঁত রাখতে হবে। হিসেবের গরমিল হলেই সর্বনাশ। হিটলার ওই হিসেবের জাল ফেলেই একদিন রাইনল্যাণ্ডকে নিজের কুক্ষিগত করেছিল। হিসেবের নানা ডিপার্টমেন্ট, তার মধ্যে একটি ডিপার্টমেন্টের নাম হলো স্ট্যাটিস্টিক্স। তিন রকম মিথ্যে চলছে সংসারে। একটা হচ্ছে মিথ্যে কথা, আর একটা ডাহা মিথ্যে কথা, আর তিন নম্বর মিথ্যে কথা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স্।

বলে গৌরাঙ্গবাবু থামলেন।

বললাম—তারপর?

গৌরাঙ্গবাবু তখন খাওয়া শেষ করেছেন। আমিও আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিলাম। তিনি খাওয়ার বিল্ চুকিয়ে আমাকে নিয়ে বাইরে এলেন। তাঁর গাড়ি তখন তেল-জল নিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ঝকঝক্-তক্‌তক্ করছে।

তিনি আবার একটা নতুন চুরুট ধরিয়ে স্টিয়ারিং ধরলেন।

বললেন—চলুন, এখন কোথাও যাই, যেখান থেকে আর আজ বাড়ি ফেরা যাবে না।

বললাম—কিন্তু আমি যে তৈরি হয়ে আসিনি!

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—জামা-কাপড়ের কথা ভাবছেন তো? সে রাস্তায় প্রচুর পাওয়া যাবে। আসানসোলের সামনে দিয়েই তো যাবো। এখানকার ব্যাঙ্কে আমার প্রচুর টাকা আছে। দশ হাজার টাকা তুলে নেব ওখানে থেকে।

—কিন্তু যাবেন কোথায়?

—চলুন দিল্লি, কিম্বা বোম্বাই, কিম্বা যেখানে আপনার খুশি। হাজারিবাগের জঙ্গলের ভেতরে কোনও ডাকবাংলোয় গিয়ে আমরা একমাস কাটাতে পারি। আমার আর কিছু ভালো লাগছে না। এমন করে জীবনে আমি আমার স্টাফের কাছে হেরে যাবো, এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। জিততেই যদি না পারলুম, তো কেন বেঁচে আছি! আমার মনে হয় সংসারে টিক্‌টিকি হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।

বললাম—হারলেন কোথায় আপনি? আপনি তো বশিষ্ঠকে একদিন ডিসচার্জ করে দিলেন?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—কী করে বুঝলেন আপনি?

বললাম—আপনার কথা থেকেই বুঝলাম তাকে আপনি ডিসচার্জ করে দিয়েছিলেন।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—এরপর ডিসচার্জ না করে দিয়ে আর কী করি বলুন? আমারই কর্মচারী হয়ে আমারই বিরুদ্ধাচরণ করা, এ আমি কেমন করে সহ্য করবো? অভাবে পড়লে মানুষ অনেক সময় ভিক্ষেও করে, পরের পাও চাটে। কিন্তু আমি কেন তা করবো? আমার কিসের অভাব? টাকা ফেললে কি ম্যানেজারের অভাব হয় কোলিয়ারিতে? চাকরির জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক হাঁ করে বসে আছে। এমন প্রতিযোগিতা আর কোনও ক্ষেত্রে নেই বোধ হয়। নামের প্রতিযোগিতা, খ্যাতির প্রতিযোগিতা, অস্তিত্বের প্রতিযোগিতা, বিলাসিতার প্রতিযোগিতা চারদিকে। সুতরাং আমার যখন মোটা মাইনে দেবার ক্ষমতা আছে, তাহলে কেন আমি পয়সা দিয়ে আমার নিজের অপমান কিনবো? আপনি বলতে পারেন এ আর অপমান কীসের! বরং তাকে নিয়ে তো আমার উপকারই হয়েছে! কিন্তু ওই যে বললুম, আমি অন্য জাতের মানুষ। আমি আসলে অহঙ্কারী, আমি আসলে মিথ্যে কথার ভক্ত, আমি কলা-কৌশল-কারসাজির বশ। আমার ভালো লাগতো না যে কেউ সৎ উপায়ে বড় হবে, সৎপথে আমার ওপরে টেক্কা দেবে। রাগটা আমার তখন থেকেই ছিল। কিন্তু যেদিন শুনলুম সে আমারই ডিসচার্জ-করা স্টাফকে টাকা দিয়ে সাহায্য করছে, সেইদিন আমার আর সহ্য হলো না। আমি একটা চিঠি লিখে তার চাকরি খতম করে দিলাম।

গৌরাঙ্গবাবু থামলেন।

✻✻✻

আমি বললাম—তারপর?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—তারপর আর কী! তারপর তার জায়গায় বেশি মাইনে দিয়ে অন্য একজন ম্যানেজার আনলুম বাইরে থেকে। জাতে মারহাট্টি। তার নাম পরাশর। এ একবারে অন্য জাতের লোক। দুঁদে লোক। আমার স্টাফ একে দেখে একেবারে যমের মতো ভয় করতো। বশিষ্ঠের আগে যিনি ছিলেন তিনি সেই যে অসুখের জন্যে ছুটি নিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর আর তিনি ফিরলেন না। তার কিছুদিন পরেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

বললাম—কিন্তু বশিষ্ঠ সেন আপনার ডিসচার্জ-লেটার পেয়ে আপনার কাছে এল না?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—না। কারণ বশিষ্ঠ জানতো আমার কাছে দরবার করলেও আর কোনও লাভ হবে না তার। সে বুঝেছিল সে অন্যায় করেছে। যদিও আমি স্বীকার করি মানবতার দিক থেকে সে ঠিকই করেছিল। কিন্তু মানবতা কথাটা তো সংসারে অচল! বইতে পড়তে ওটা ভালো শোনায়। সংসারে ওটা মানায় না বটে, কিন্তু বইতে লিখলে হাততালি পাওয়া যায়। কিন্তু হাততালি বড়, না পেট বড়?

গৌরাঙ্গবাবু বলতে বলতে আবার থামলেন। মনে হলো তিনি যেন হাঁফাচ্ছেন।

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। তিনি একমনে গাড়ি চালাচ্ছেন। সামনে লম্বা রাস্তাটা চোখের সামনে ধু-ধু করছে। দুপাশের বিস্তীর্ণ ক্ষেত দূরের ঝাপ্সা পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রামগুলোর কাছে গাড়িটার স্পীড একটু কমে আসে। একটা গরু কি দুটো ছাগলছানা চাপা পড়তে পড়তে অলৌকিক ভাবে বেঁচে যায়। রাস্তার মুর্গীগুলো পাখা ঝাপ্টিয়ে পাশের নর্দমার ধারে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।

গৌরাঙ্গবাবুর দিকে চেয়ে মনে হলো তিনি যেন কী নিয়ে খুব ভাবছেন। হয়ত সেদিনকার সেই বশিষ্ঠ তাঁর সারা মন জুড়ে বসে রয়েছে।

কিন্তু আমি ভাবছিলাম আমাকে এ গল্প বলবার তাঁর কীসের দরকার ছিল? আমি কে? আমি তো দুজনের কাউকেই চিনি না। তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ আমার একটা অদ্ভুত কথা মনে হলো। মনে হলো আসলে বশিষ্ঠের সঙ্গে গৌরাঙ্গবাবুর হয়ত কোনও তফাৎ নেই। আসলে দুজনেই এক। একই শরীরের মধ্যে দুটো মানুষের অস্তিত্ব একাকার হয়ে জড়িয়ে আছে। গৌরাঙ্গবাবুর মনের মধ্যেই একজন বশিষ্ঠ লুকিয়ে আছে। দুজনের ঝগড়া চলেছে একজনের মনের মধ্যে। একজন গৌরাঙ্গবাবু আর একজন গৌরাঙ্গকে ডিসচার্জ করছে, আবার আর একজন গৌরাঙ্গর চাকরি যাচ্ছে।

রাস্তার একটা সাইনবোর্ডে একটা বাংলোর হদিস লেখা ছিল।

গৌরাঙ্গবাবুর সেটা নজরে পড়তেই বললেন—একটা ডাকবাংলো আছে দেখছি এখানে—চলুন তো ভেতরে গিয়ে দেখে আসি—

বলে আর আমার সমর্থনের অপেক্ষা না করে একটা পাশের রাস্তার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এ রাস্তাটা সরু। উঁচু-নিচু, এবড়ো-খেবড়ো। গাড়ি দুলতে লাগলো, লাফাতে লাগলো।

জিজ্ঞেস করলাম—এখানে কি রাত কাটাবেন নাকি?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—রাত কাটাবো কিনা সে পরে ভাববো, আগে জিনিসটা তো দেখে আসি?

গাড়ি চলেছে তো চলেছেই। এঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে একেবারে জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। চারিদিকে বড় বড় শাল গাছ কি বুনো কোনও গাছ আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দিনের বেলাতেও বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা।

বললাম—এ যে একেবারে জঙ্গল দেখছি—

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—এইরকম জায়গাই তো খুঁজছিলাম আমি। দেখি না কী অবস্থা ডাকবাংলোর—

রাস্তাটা এঁকতে বেঁকতে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছলো যেখানে বেশ সাজানো একটা বাংলো। সামনে সাদা সাইনবোর্ডে নাম-ধাম স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে।

গৌরাঙ্গবাবু তাঁর বিরাট গাড়িটা নিয়ে একেবারে উঠোনে ঢুকিয়ে দিলেন। উঠোনের পাশেই বিরাট এক খাদ। সেই খাদের ভেতর দিয়ে ছোট একটা নদী চলে গিয়েছে। দেখলাম উঠোনের একধারে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। বোঝা গেল বাংলোর ভেতরে কোনও লোক আছে।

আমাদের গাড়িটা দেখেই একজন বেয়ারা দৌড়ে এসেই সেলাম করলে।

—সেলাম হুজুর!

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—কামরা খালি আছে?

বেয়ারাটা যা বললে তাতে বোঝা গেল ফরেস্ট-অফিসার একটু পরেই চলে যাবে। তখন দুটো কামরাই খালি হয়ে যাবে। আর আধ ঘণ্টার তোয়াক্কা।

আর কথা নেই বার্তা নেই, গৌরাঙ্গবাবু সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে চারটে দশ টাকার নোট বেয়ারাটার হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন—মুর্গী পাওয়া যাবে?

চারটে দশ টাকার নোট একসঙ্গে দেখে বেয়ারাটা প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবারই যোগাড় মনে হলো। তার ওপর সাধারণত এখানে যারা আসে তারা বেশির ভাগই গভর্মেন্টের অফিসার। তারা দান-ধ্যানে কৃপণ প্রকৃতির মানুষ। দু টাকা বকশিশ দিয়েও বেয়ারাদের কৃতার্থ করে না কখনও। তারা নিজেরা পেয়ে পেয়ে এত অভ্যস্ত যে দেবার কথা তাদের মাথায়ই আসে না।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—আসুন, আজ রাতটা এখানেই কাটানো যাক—

আমি বললাম—কিন্তু সঙ্গে যে কিছুই আনিনি—

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—সঙ্গে আনার কী দরকার? এখানে পয়সা দিলে সবই যোগাড় হয়ে যাবে, দেখবেন। পয়সার এমনই গুণ! দাঁত মাজার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিছানা কম্বল বালিশ মায় মেয়েমানুষ পর্যন্ত এরা গভর্মেন্ট অফিসারদের যোগাড় করে দেয়।

কথাটা মিথ্যে নয়। বেয়ারাও গৌরাঙ্গবাবুর কথায় হেসে ফেললে।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—সেকালের সাহেব বেটাদের আরাম-তরিবতের জন্যেই তো এগুলো তৈরি হয়েছিল। আর একালে মিনিস্টাররা এখন এইগুলো ভোগ-দখল করছে।

বেয়ারাটাও বললে—হ্যাঁ হুজুর। এখানে সব পাওয়া যায়। দূরের গাঁয়ে রেজা-মেয়েরা আছে। বখশিশ পেলেই তারা এখানে এসে রাত কাটিয়ে যায়—

গৌরাঙ্গবাবু সব শুনে-টুনে বললেন—ঠিক আছে। আজ রাতটা এখানেই কাটানো যাক—

বলে বেয়ারাকে হুকুম দিয়ে দিলেন তাঁর কী-কী দরকার। বেয়ারা খুশি হয়ে চলে গেল।

খানিক পরে ফরেস্ট-অফিসার ভদ্রলোকও বেরোলেন। সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও ছিল। হয়ত স্ত্রী, কিম্বা হয়ত স্ত্রী নয়। দেখে মনে হলো ইউ-পি কিম্বা বেহারের লোক। আমাদের দিকে এক পলক চেয়ে নিয়ে দু'জনে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। তারপর গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বাংলোর এলাকার বাইরে চলে গেল।

* * *

ঘটনাটা কতকাল আগের। কিন্তু মনে পড়লে আজো গা'টা শিউরে ওঠে। সত্যিই এমন হবে তা কি জানতুম!

মানুষের মনের মধ্যে অনেক জটিল তত্ত্ব লুকিয়ে থাকে তা জানতুম। একই মানুষ, একটা মানুষের ভিতরেই একাধারে একজন বড়লোক, আবার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন একেবারে নিঃস্ব ফকির মিলে-মিশে থাকতে দেখেছি। মেয়েদের মধ্যে অনেককে দেখেছি একাধারে সতী, আবার সঙ্গে সঙ্গে অসতী! একদিকে স্বামীর সমস্ত কর্তব্য নিষ্ঠাভাবে করে যাচ্ছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে পরপুরুষের সেবা করছে পরম আন্তরিকতার সঙ্গে। স্বামীর কর্তব্যেও কোন ত্রুটি নেই, আবার পরপুরুষের সেবাতেও কোথাও কোনও ফাঁকি নেই।

কিন্তু এ বড় অদ্ভুত লোক। এই গৌরাঙ্গবাবু। গৌরাঙ্গবাবু জানতেই পারছেন না যে যে-বশিষ্ঠকে নিয়ে তাঁর এত অশান্তি, সে বশিষ্ঠ আর কেউ নয়, তিনি নিজেই। বশিষ্ঠ তাঁরই আর একটা সত্তা। তাঁর মধ্যেকার দ্বিতীয় গৌরাঙ্গবাবু।

এক গৌরাঙ্গবাবু বলছেন—সৎ পথে কোনও উন্নতি হয় না—

আর এক গৌরাঙ্গবাবু বলছেন—সততাই একমাত্র পথ।

আমি গৌরাঙ্গবাবুকে দেখতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম এরকম মানুষ তো আমি আগে দেখিনি কখনও। এ তো এক দুর্লভ দৃশ্য! আমার যেন ক্রমেই ভালো লাগতে লাগলো গৌরাঙ্গবাবুকে। মনে হলো এও যেন পাহাড় বা সমুদ্র দেখছি। অথচ তাঁকে যে আমার ভালো লাগছে এ তিনি বুঝতেও পারছেন না।

তখন আমরা ডাকবাংলোর ভেতরে বেশ গুছিয়ে বসেছি। বাংলোর বেয়ারা আমাদের কোনও অভাবই রাখেনি। দূরের গ্রাম থেকে সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছে। সাবান থেকে আরম্ভ করে গরমজল, মাথায় মাখবার তেল, তোয়ালে, কম্বল, বালিশ চাদর সবই যোগাড় করেছে সে। চা'ও তৈরি করে দিয়েছে। কোথা থেকে বিস্কুটও এনে হাজির করেছে।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—দেখলেন তো টাকা থাকলে সবই যোগাড় হয়! এই জঙ্গলের মধ্যেও আপনি ব্রিটেনিয়া বিস্কুট পেয়ে গেলেন—

চা-জলযোগ কোনও কিছুরই ত্রুটি হল না।

বেয়ারাটা তদারক করছিল আমাদের।

বললে—আর কিছু লাগবে হুজুর?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—যা লাগবে সব তোমার কাছে চেয়ে নেব। এখন তুমি ভালো

করে মুরগীর কারি আর ভাত বানিয়ে দাও। যাও—

বেয়ারাটা খুশি হয়ে চলে গেল। কথায় কথায় টাকা ছড়ালে মনে হয় এ যুগে বনের বাঘকেও বশ মানানো যায়।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—এখানে বসে বসে বহুদিন পরে আমার সেই কোরাসিয়া কোলিয়ারির বাংলোর কথা মনে পড়ছে। সেই নিরিবিলি, সেই জঙ্গল, সেই সব কিছু। কিন্তু তফাৎ শুধু একটা। সেখানে শান্তি ছিল না, এখানে যেন একটু শান্তি পাচ্ছি। অথচ আপনি হয়ত বলবেন শান্তি তো আমি চাইনি কখনও। সত্যিই আমি কখনও শান্তি চাইনি জীবনে। আমি জানি টাকা চাইলে শান্তি চাইতে নেই। তা আমি যখন সেই টাকাই চেয়েছিলুম, তবে আর আমি শান্তি চাইবো কেন?

তারপর একটু থেমে বললেন—এখন সেই আমি আর আজকের এই আমিতে অনেক তফাৎ মশাই। এখন আমি আর সেই আমি নেই। এখন আমি মানুষ। এখন আমি হেরে গেছি। আমাকে আজ বশিষ্ঠ হারিয়ে দিয়েছে—

বলে গৌরাঙ্গবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

জিজ্ঞেস করলুম—তার মানে?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—বিশ্বাস করুন আমার সেই ডিসচার্জড ম্যানেজার আমাকে পথে বসিয়ে দিয়েছে, আমাকে গো-হারান হারিয়ে দিয়েছে—

বলে তিনি ইজিচেয়ারটার ওপর হেলান দিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। আমার মনে হলো তিনি যেন বড় কষ্ট পাচ্ছেন মনে মনে। এমন কষ্ট যা তিনি সহ্য করতেও পারছেন না।

❋❋❋

আস্তে আস্তে সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত হল। তখনও গৌরাঙ্গবাবুর কথা শেষ হল না।

বললেন—আসুন এখানেই থেমে যাই—

বললাম—কেন? বাকিটা এখনই শেষ করুন না?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—আমার গল্প শেষ হবে, কিন্তু আমি? আমি কী নিয়ে থাকবো? আমার তো শেষ হবে না? আমি সারা-জীবন এই যন্ত্রণা নিয়েই কাটাবো? আমার হেরে যাওয়ার যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্তি পাবো কী করে?

বললাম—সে আর কী করবেন। জীবন শেষ করা তো আপনার হাতে নয়। গল্প শেষ করা আপনার হাতে হতে পারে, কিন্তু আপনার জীবনের সৃষ্টিকর্তা যে আপনার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

বেয়ারা এল। বললে—ডিনার তৈয়ার হুজুর—

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—এখন এত সকাল-সকাল খাবো কী করে রে? এখন নয়, পরে হবে, পরে ডাকবো—

বেয়ারাটা চলে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—একটা অনুরোধ করবো আপনাকে? কিছু মনে করবেন না

তো? আমি একটু ড্রিঙ্ক করবো!

আমি হাসলুম। বললুম—ড্রিঙ্ক করবেন করুন না, তাতে আমার বলবার কী আছে? আপনার ড্রিঙ্ক করার নেশা থাকলে আমি কেন আপত্তি করবো? আর আপত্তি করলেই বা আপনি শুনবেন কেন?

গৌরাঙ্গবাবু খুশি হলেন। তারপর উঠে গিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে এলেন। বেয়ারাকে ডেকে সোডা বরফ গ্লাস আনতে হুকুম দিলেন। আর বললেন—পোট্যাটো চিপ্‌স্‌ বানাতে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—আমার আবার একটা বদ্‌ অভ্যেস আছে মশাই, আমি একলা বসে বসে কিছুতেই ড্রিঙ্ক করতে পারি না, আমার সঙ্গে কাউকে থাকতে হবে, ড্রিঙ্ক করতে হবে—

বললাম—এখানে কে খাবে?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—যে কেউ হোক, আপনি খেলেও চলবে—

বললাম—আমি খেতে পারতুম, কিন্তু...

গৌরাঙ্গবাবু মাথা নেড়ে বললেন—বুঝতে পেরেছি, ডাক্তারেরা বারণ করেছে ড্রিঙ্ক করতে। শুধু একলা ডাক্তার আমাকেই বারণ করেনি। যেন আমার লিভার লোহার। যেন আমি বিষ খেয়েও হজম করতে পারি—

বললাম—যদি জানেনই যে বিষ তাহলে খান কেন?

—কেন খাই?

গৌরাঙ্গবাবু নিজের মনেই যেন নিজের প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজতে লাগলেন। আমি তাঁর দিকে চেয়ে তাঁকে ভালো করে দেখতে লাগলুম।

বাইরে তখন বেশ ঘন রাত। জানলার বাইরে কিছুই দেখা যায় না। বড় বড় আকাশ-ছোঁয়া গাছ স্তব্ধ হয়ে যেন গৌরাঙ্গবাবুর কাহিনী শুনছে। বলছে—তারপর কী হল? তারপর? বশিষ্ঠ সেনকে তো তুমি ডিসচার্জ করে দিলে! কিন্তু তাতে কি বশিষ্ঠ সেনের সর্বনাশ হল? তাকে কি শেষ পর্যন্ত উপোস করে মরতে হলো?

খাদের নীচে পাহাড়ী নদীর তোড় বেড়েছে। তোড়ের শব্দ এই ডাকবাংলোর ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে। যেন অনেক উঁচু থেকে খুব নিচুতে জলের ধারা একটানা পড়ে চলেছে। বিকেলবেলা এই তোড় এখানে এসে পাহাড়ী ঝরণার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

বেয়ারা এসে দুটো গ্লাস বরফ সোডা সব কিছু দিয়ে গেল। গৌরাঙ্গবাবু দুটো গ্লাসেই হুইস্কি ঢাললেন। তারপর বরফ সোডা যা মেশাবার মেশালেন।

বললেন—সামান্য দিয়েছি, একটু খান। আর খান আর না-ই খান, সামনে গেলাসটা নিয়ে বসে থাকুন, তাতেই আমার চলবে। আমি ভেবে নেব আমি একলা নই, আমার সঙ্গে কেউ একজন আছেই—

বলে তিনি গেলাসে চুমুক দিলেন।

বললেন—লিখবেন তো আমার গল্পটা? বলুন, দয়া করে লিখবেন কিনা—

আমি বললুম—দয়ার কথা বলছেন কেন? আমরা তো গল্পই খুঁজে বেড়াই। আর তা ছাড়া এটা যেমন আমার নেশা, তেমনি আবার একমাত্র পেশাও তো বটে—

গৌরাঙ্গবাবু খুশি হলেন।

বললেন—আপনার ওপর আমি খুব কৃতজ্ঞ মশাই। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আপনার কথা মনে রাখবো। আমার নিজের মধ্যে যে যন্ত্রণা চলছে তা যদি আপনি একটুও কল্পনা করতে পারেন, এক ফোঁটাও অনুভব করতে পারেন, তাহলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক। জানেন, শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই সেই কোরাসিয়া পাহাড় থেকে আমি এসেছি। হঠাৎ কী জানি একদিন কী করে আপনার একখানা বই আমার হাতে এসে পড়েছিল। বইটা আরম্ভ করার পর যতদিন না পড়া শেষ হল, আমার কাজ-কর্ম সব বন্ধ হয়ে রইল। আমি ভাবলাম আমার কাহিনী যদি কাউকে বলতেই হয় তো সে আপনি। একমাত্র আপনিই আমার দুঃখ বুঝবেন বলে মনে হল। তাই সেই সুদূর মধ্যপ্রদেশ থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কলকাতায় এলুম। এসে আপনাকে খুঁজে বার করলুম—

বললাম—হয়ত এ আমার সৌভাগ্য—

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—সৌভাগ্য আপনার নয়। আমার—

বললাম—কেন?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—সৌভাগ্য, কারণ আপনি আমার এত অত্যাচার সহ্য করছেন। আমি কি কম অত্যাচার করছি আপনার ওপর? দেখুন না, কোথায় আপনি আপনার বাড়িতে বসে কলম নিয়ে কাজ করে যাবেন, তা নয় আপনাকে কোথায় কোন্ জঙ্গলের মধ্যে টেনে এনে আমার নিজের স্বার্থসিদ্ধি করছি! সমানে বসে মদ খেয়ে মাতাল হচ্ছি—

বললাম—তারপর কী হল বলুন?

গৌরাঙ্গবাবু তখন বেশ টলছেন। পর পর অনেক গ্লাস হুইস্কি শেষ করেছেন ঘন ঘন।

বললেন—তারপর সেই বশিষ্ঠকে আমি আমার কোম্পানির খাতা থেকে নাম কেটে দিলুম। চিঠিটা তার হাতেই গিয়েছিল ঠিক, কিন্তু চিঠিটা পেয়ে সে আমার কাছে আর এল না। একটু তদ্বির কি তদারক, কিম্বা খোসামোদ কিছুই করলে না। সেদিনকার টেবিলে তার যে-সব কাজ-কর্ম ছিল সব শেষ করে নিঃশব্দে সে বাড়ি চলে গেল।

তাতে আমিও যেন বাঁচলুম।

* * *

মনে হল আপদ দূর হল।

কিন্তু মানুষের বিধাতার রসজ্ঞান এমনই প্রখর যে তিনি যেন সে-সময়ে মনে মনে হাসলেন। আগে যদি আমরা পরের ঘটনা জানতে পারতুম তো আমরা সকলেই একটু সাবধান হবার চেষ্টা করতুম। মিলটন যদি জানতেন যে শেষ বয়সে তাঁকে অন্ধ হয়ে কাটাতে হবে, তাহলে কি তিনি অত লেখা-পড়া করতেন? রাজা দশরথ যদি জানতেন তাঁর নিজের ছেলেকে একদিন বনবাসে পাঠাতে হবে, তাহলে কি আর হরিণশিশু শিকার করতে যেতেন?

তা হঠাৎ সেই সময় একটা অঘটন হল কোরাসিয়াতে—

বলে গৌরাঙ্গবাবু আবার হুইস্কি ঢালতে লাগলেন গেলাসে।

বললাম—কী অঘটন ঘটল?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন—কোরাসিয়ার পাশের একটা কোলিয়ারি ছিল তার নাম ঝাড়খণ্ড। ঝাড়খণ্ড কোলিয়ারি। আয় কম, কয়লার কোয়ালিটিও খারাপ। হঠাৎ শুনলাম সেই ঝাড়খণ্ড কোলিয়ারি আরো অনেকখানি জায়গা লীজ্‌ নিয়েছে।

খবরটা শুনে আমি একটু অবাক হলুম।

আমার নতুন ম্যানেজার পরাশরকে ডাকলুম।

বললুম—ঝাড়খণ্ড কোলিয়ারি কি হঠাৎ এক্‌স্‌প্যান্ড করছে নাকি ওরা?

পরাশর বললে—তা জানি না, তবে ওরা নতুন একটা ম্যানেজার রেখেছে, সে খুব এক্সপার্ট।

বললাম—কোত্থেকে এল সে? নাম কী তার?

পরাশর বললে—শুনেছি একজন বাঙালী—

বাঙালী? আমি একটু চমকে উঠলুম।

বললুম—নাম কী বল তো তার?

পরাশর বললে—আমি খোঁজ নিয়ে এসে বলব—

পরের দিন পরাশর খোঁজ নিয়ে এল। বললে—ওদের নতুন ম্যানেজারের নাম স্যার, মিস্টার বি সেন। শুনলাম আগে নাকি মিস্টার সেন আমাদের এই কোলিয়ারির ম্যানেজারই ছিল।

বশিষ্ঠ সেন! ঝাড়খণ্ড কোলিয়ারির ম্যানেজার বশিষ্ঠ সেন!

আমার মাথায় যদি আকাশ ভেঙে বাজ পড়ত, তাহলেও এত চমকাতুম না।

পরাশর বললে—খুব তুখোড় লোক স্যার মিস্টার সেন।

—কী করে জানলে তুমি?

পরাশর বললে—আমি যে আজ তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিলুম। আলাপ-পরিচয় হল। আপনার কথাও উঠল। আপনার নাম করে মিস্টার সেন বললেন—অমন মানুষ হয় না, একেবারে দেবতা।

বললুম—বশিষ্ঠ বললে ওই কথা?

পরাশর বললে—হ্যাঁ স্যার।

আমি শুনে আরও অবাক হয়ে গেলাম। আমি যাকে কেন্নোর মতন ঘেন্না করেছি, সে আমার ম্যানেজারের কাছে আমার প্রশংসা করেছে? তাহলে তো সত্যিই বশিষ্ঠ সেন একজন খাঁটি ধড়িবাজ! আমার যদি নিন্দে করত সে তাহলেই আমি খুশি হতুম। কিন্তু তার মুখে আমার প্রশংসা শুনে আমার আরো খারাপ লাগল। ভাবলাম এ-রকম তো ছিল না বশিষ্ঠ আগে। আগে তো সে সত্যি কথাই বলতো। মিথ্যে কথা বলতে সে শুরু করলে কবে থেকে? আমি তাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াতেই কি সে এমন আমূল বদলে গেল?

দিনকতক পরে আরো অনেক খবর পেলাম। বশিষ্ঠ সেন নাকি ঘন ঘন দিল্লি যাতায়াত করছে। শুধু তাই নয়, কিছুদিনের মধ্যেই মহাসাড়ম্বরে নতুন একটা পিট্‌ ওপন্‌ করলে। তাতে মিনিস্টার থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ার সব ভি. আই. পি-দের নেমন্তন্ন করে চিঠি দিলে। একদিন সেই চিঠি নিয়ে আমার কাছেও এল।

বশিষ্ঠকে দেখে আমি যেন ঠিক চিনতে পারলাম না।

দেখি সাজ-পোশাক তার বদলে গেছে। দামী গ্যাবার্ডিনের সুট্‌ পরেছে। বুকে একটা গোলাপ ফুলের কুঁড়ি লাগানো। গায়ের রং যেন আরো ফর্সা হয়েছে। চলায় বলায় কওয়ায়.আরো স্মার্ট।

বশিষ্ঠ আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি কিন্তু দয়া করে যাবেন স্যার। আপনি না গেলে আমি মনে খুব কষ্ট পাবো—যাবেন তো?

বলতে হল—যাব—

—থ্যাঙ্কিউ! বলে খুশি হয়ে চলে যাচ্ছিল।

আমি পেছন থেকে ডাকলুম। বললুম—বশিষ্ঠ, শোন—

বশিষ্ঠ ফিরে দাঁড়াল। তারপর সামনে এসে জিজ্ঞেস করলে—বলুন স্যার?

আমি বললুম—বশিষ্ঠ, তুমি আমার এখানে ম্যানেজার ছিলে একদিন, সে-কথা তোমার মনে আছে?

বশিষ্ঠ বললে—নিশ্চয়ই মনে আছে! চিরকাল আমার মনে থাকবে সে-কথা। ফর দ্যাট্‌ আই অ্যাম্‌ গ্রেটফুল টু ইউ স্যার—

আমি অবাক হয়ে গেলাম বশিষ্ঠের চাল-চলন দেখে, তার ইংরিজী কথা বলার ধরন-ধারণ দেখে। তার যে এত পরিবর্তন হয়েছে তা আমি ভাবতেও পারিনি। এই ক'মাসেই যেন সে অন্য মানুষ হয়ে গেছে!

আমি আর কোনও কথা বললাম না। সভায় যাবো কি যাবো না তারও কোন স্পষ্ট আভাস দিলুম না। আমি আমার স্বাভাবিক মালিকোচিত গাম্ভীর্য নিয়ে চুপ করে রইলুম। আমার মনে পড়ল আমার নতুন ম্যানেজার পরাশরের কথাগুলো। তুখোড় লোক! সত্যিই সে খুব তুখোড় হয়েছে। কিন্তু এ সে কেন হলো? এ পরিবর্তন কেন হলো তার?

অথচ এতে তা আমার খুশি হওয়ারই কথা। আমি তো চেয়েছিলুম বশিষ্ঠ এইরকম হোক, এই রকম তুখোড়, মিথ্যেবাদী, অসৎ, চালবাজ হোক। আমি নিজে যা, বশিষ্ঠ তাই হোক, এই তো আমি চেয়েছিলুম। তাহলে আমার ক্ষোভ করবার কারণ কী থাকতে পারে?

দেখতে দেখতে কিন্তু ঝাড়খণ্ড কোলিয়ারি ধাপে ধাপে বড় হয়ে উঠতে লাগল।

আমি পরাশরকে একদিন ডাকলুম। ডেকে জিজ্ঞেস করলুম—এ সব কে করছে পরাশর? এ সমস্তর পেছনে কে আছে?

পরাশর বললে—ওই বশিষ্ঠ সেন। ও যে খুব ধড়িবাজ ছেলে স্যার। ভেরি ক্যানিং—

বললুম—কিন্তু আগে তো অত কানিং, অত ধড়িবাজ ছিল না ও—

পরাশর বললে—তা জানি না, শুনছি নাকি পাশের মুণ্ডাগড় কোলিয়ারিটাও ওরা কিনে নিচ্ছে—

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিছু বলবার ক্ষমতা তখন আর আমার ছিল না।

সেদিন রাস্তা দিয়ে গাড়িতে করে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ দেখি সামনের দিক থেকে আর একটা গাড়ি আসছে। আমার চেয়েও বিরাট গাড়িটা। বোঝা গেল এম্‌ব্যাসী থেকে কেনা 'ফরেন কার'। সে-গাড়িটার কাছে আমার গাড়িটা কানা হয়ে গেল। আমি দেখলাম গাড়ির ভেতর চুপ করে হেলান দিয়ে বসে আছে বশিষ্ঠ। বসে বসে ঠিক আমারই মতন চুরোট টানছে—

গাড়িটা পাশ দিয়েই চলে গেল। কিন্তু তার মধ্যেই যা দেখবার আমি দেখে নিলাম। সেইটুকুতেই আমার মনটা বিষিয়ে উঠল।

সেদিন বাড়িতে গিয়ে হুইস্কির বোতলটা খুলে বসলুম। অন্য দিন আমার বরাদ্দ থাকে চার কি বড়জোর পাঁচ পেগ। কিন্তু সেদিন একেবারে দশ পেগ খেয়ে ফেললুম। অবশ্য শেষকালে খেয়ালই ছিল না কত পেগ খেলুম। দশও হতে পারে পনেরো পেগও হতে পারে। তখন আর আমার জ্ঞান নেই।

* * *

হঠাৎ বেয়ারাটা এসে বলল—ডিনার তৈয়ার হুজুর—টেবিল লাগাব?

গৌরাঙ্গবাবুর তখন বেশ নেশা হয়েছে। চোখ লাল হয়েছে করমচার মত। হাত কাঁপছে। বোতল থেকে গেলাসে ঢালতে গিয়ে বার বার বাইরে পড়ে যাচ্ছে হুইস্কি। একবার চেয়ারটায় হেলান দিচ্ছেন কিন্তু তাতেও যেন ক্লান্তি দূর হচ্ছে না। তাই আবার সোজা হয়ে উঠে বসছেন। বুঝতে পারলাম নেশা তাঁর ব্রেনে গিয়ে ঠেকেছে তখন।

বেয়ারার কথা তাঁর কানে গেল না।

আমি চেঁচিয়ে বললাম—এখন খাবেন গৌরাঙ্গবাবু?

গৌরাঙ্গবাবু যেন ঘুমোতে ঘুমোতে উত্তর দিলেন—অ্যাঁ?

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—আপনি খাবেন গৌরাঙ্গবাবু? বেয়ারাটা আমাদের খাওয়া হলে তবে ওর বাড়ি যাবে। অনেক দূরের গ্রামে ওর বাড়ি—

শেষ পর্যন্ত গৌরাঙ্গবাবু বললেন—আমি খাবো না আজকে, আপনি খান, আমার ক্ষিদে নেই—

মহা মুশকিলে পড়া গেল গৌরাঙ্গবাবুকে নিয়ে। আমি জীবনে অনেক মাতাল দেখেছি। মাতালের সংস্রবে এসে অনেক কিছু শিখেছি। এমন ঘটনা আমার কাছে নতুন নয়। বেয়ারাকে বলে আমি গৌরাঙ্গবাবুকে পাশের ঘরে বিছানার উপর শুইয়ে দিলাম। বুঝলাম যে রাতটা আমার এমনিই কাটবে। কোনও রকমে রাতটা কাটলে সকালে আবার গৌরাঙ্গবাবু স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন। এ-সব অভিজ্ঞতা আমার আছে।

গৌরাঙ্গবাবু বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর গায়ে একটা কম্বল ঢাকা দিয়ে আমি বাইরে চলে এলাম। বাইরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। বাইরে এসে বেয়ারাকে বললাম—তুমি আমার খাবার দাও, দিয়ে তারপর তোমার গাঁয়ে চলে যেও। রাত্তিরে আমাদের আর কিছু দরকার হবে না—

বেয়ারাটা টেবিলে আমার খাবার দিলে। আমি যা-পারি খেয়ে নিলাম। সে খাওয়া মানে খাওয়াই। মানে যাকে বলে নিয়ম রক্ষে। খাওয়া সেরে উঠতেই বেয়ারা টেবিল পরিষ্কার করে বাইরে চলে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—বাইরে আমাদের গাড়ি রইল, কিছু চুরি-টুরি হবে না তো?

বেয়ারা বললে—কিছু ভাবনা নেই, এখেনে চোর-টোর কিছু নেই।

বললাম—ঠিক আছে, তুমি কাল ভোরবেলাই এসে হাজির হবে।' ভোরবেলাই আমাদের চা চাই—

আমার কথা শুনে বেয়ারা সেলাম করে চলে গেল।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম গৌরাঙ্গবাবু তখনও তাঁর ঘরে ঘুমোচ্ছেন। বেয়ারা যথাসময়ে আমার চা এনে দিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। তৈরি হতে আমার বেশি সময় লাগেনি। বাথরুমে সাজ-সরঞ্জামের কিছু অভাব ছিল না। বেয়ারাটা বখ্‌শিশের লোভে গরম-জল থেকে আরম্ভ করে দাঁত মাজার সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। কোনও কিছুরই অভাব রাখেনি। আমি কোথায় কলকাতার লোক, কোন্ চক্রে কার সঙ্গে জুটে গিয়ে এ কোথায় চলে এলাম তাই ভাবছিলাম।

তারপর সকাল ছটা বাজলো, সাতটা বাজলো, আটটা বাজলো। তখনও গৌরাঙ্গবাবুর ঘুম ভাঙে না দেখে একটু অবাক হয়ে গেলাম। কাল রাত্রে অত মদ খেয়েছেন, সুতরাং দেরিতে ঘুম ভাঙাই স্বাভাবিক। কিন্তু মনে হলো, এত দেরি তো হওয়ার কথা নয়।

আমি বেয়ারাটাকে বললুম—সাহেবের চা তৈরি করে ডাকতে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। বেয়ারাটা ঘরে চা দিতে গিয়ে সেখান থেকেই একেবারে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এসেছে—বাবু, সর্বনাশ হয়েছে—সাহেব মারা গেছে—

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি তার কথা শুনে। বোধ হয় তখন আর মাথারও ঠিক ছিল না। তাড়াতাড়ি দৌড়ে ঘরে গিয়ে দেখলাম বেয়ারাটা যা বলেছে ঠিক তাই। গৌরাঙ্গবাবুর মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। মুখে-চোখে যন্ত্রণার চিহ্ন। দেখে মনে হলো প্রাণ বেরোবার আগে তিনি বোধহয় খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন।

আমার মুখে তখন কথা বন্ধ হয়ে গেছে। বুদ্ধিও বোধহয় লোপ পেয়েছিল। এ-অবস্থায় যে আমার কী করণীয় তাও যেন আমার মাথায় আসছিল না।

মনে আছে আমি বেয়ারাটার দিকে চেয়ে শুধু বলেছিলুম—এখানে ডাক্তার পাওয়া যাবে?

এ-গল্প এখানে শেষ হলেই বোধ হয় ভালো হতো। কিন্তু তা হল না। জীবন শেষ হলেই তো আর গল্প শেষ হয় না। অনেক সময় জীবন যেখানে শেষ হয়, গল্প সেখান থেকেই শুরু হয়। জীবনকে কেন্দ্র করেই গল্প গড়ে ওঠে অবশ্য, কিন্তু গল্প জীবনকে অতিক্রম করে আরো দূর-ভবিষ্যতের দিকে হাত বাড়ায়। তাই জীবন নশ্বর হলেও, গল্প অবিনশ্বর।

তাই এ-গল্প শেষ হয়েও শেষ হল না।

হল কি, একদিন হঠাৎ এক মহিলা এসে আমার বাড়িতে হাজির। মোটামুটি বেশ বয়েস হয়েছে। মাথার সিঁথিতে সিঁদুর। আমি তাঁকে চিনতে পারলাম না।

বললাম—আপনি কে?

মহিলাটি বললেন—আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।

বললাম—কী চাই আপনার, বলুন?

মহিলাটি বললেন—একটি বিশেষ কাজে আপনার কাছে এসেছি। আমার স্বামী যেদিন মারা যান, আপনি সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন—খবরের কাগজে দেখেছি—

আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—গৌরাঙ্গবাবু আপনার স্বামী?

মহিলাটি বললেন—না, তিনি আমার আগেকার স্বামী!

আমাকে আবার ধাক্কা খেতে হল। আমি সোজা হয়ে বসলাম। আরো ভালো করে লক্ষ্য করলাম মহিলাটিকে। দেখলাম মাথায় সিঁথিতে সিঁদুরটা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে তখনও।

মহিলাটি নিজেই নিজের কথা স্পষ্ট করে খুলে বললেন—শেষ জীবনে আমার সঙ্গে আমার স্বামীর বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল—

আমি বললাম—দেখুন, আমার সঙ্গে গৌরাঙ্গবাবুর মাত্র সামান্য কয়েক ঘণ্টার আলাপ। বেশি কিছু জানি না তাঁর সম্বন্ধে।

বলে সেদিনকার সব ঘটনা একে একে বলে গেলাম। কেমন করে কী অবস্থায় তিনি মারা গেলেন, তাও বললাম। পুলিসের কাছে খবর যাওয়ার পর কী কী হল তাও সবিস্তারে জানালাম।

মহিলাটি সব শুনলেন।

তারপর বললেন—দেখুন, ওঁর কোলিয়ারিটা এখন অচল অবস্থায় আছে। সেটারও কিছু একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ওর ছেলে আমার কাছেই থাকে এখন। সে চায় সে বাবার কোলিয়ারিটা চালাবে। আমি শুধু জানতে এসেছিলাম মারা যাবার আগে উনি আমার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি না।

বললাম—না, আমি জানতুমও না গৌরাঙ্গবাবুর স্ত্রী কেউ আছেন—তিনিও আপনার সম্বন্ধে কিছু বলেননি।

মহিলাটি আমার কথা শুনে খুশি হলেন কিনা জানি না। তিনি উঠলেন। বললেন—ঠিক আছে, তাহলে আমি আসি—আপনাকে মিছামিছি কষ্ট দিলুম—শুধু একটা অনুরোধ, আমি যে আপনার কাছে এসেছিলুম, এ-কথা বাইরের লোকদের যেন বলবেন না।

আমি বললাম—ঠিক আছে, কথা দিলুম বলবো না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে?

মহিলাটি বললেন—বলুন?

বললাম—আপনি কি আবার বিয়ে করেছেন?

মহিলাটি বললেন—হ্যাঁ, আপনি তো আমার সিঁথির সিঁদুর দেখে তা বুঝতে পেরেছেন!

তাঁর স্বামী কে সে-কথা জিজ্ঞেস করবার কৌতূহল হচ্ছিল খুব। কিন্তু কী করে সে-কথা জিজ্ঞেস করি তাই-ই তখন ভাবছিলাম।

মহিলাটি নিজে থেকেই হঠাৎ বললেন—তিনি ঝাড়খণ্ড কোলিয়ারির মালিক—

—তাঁর নাম বলতে কি আপনার আপত্তি আছে?

মহিলাটি বললেন—না, না, আপত্তি হবে কেন? তাঁর নাম বশিষ্ঠ সেন—

আরতি বোস

সত্যিই, সংসারে যে যেমন সে তেমনিই। একজনের সঙ্গে আর একজনের কোনও রকম মিল থাকলেই তো আমাদের পৃথিবী গতানুগতিক হয়ে যেত। আর গতানুগতিক নয় বলেই তো এ-পৃথিবী আজো নতুন। মনে হয় আমাদের পৃথিবী বোধহয় রোজই সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে জন্ম নেয়। তাই এ-পৃথিবীতে যেমন সেনরাও জন্মায়, তেমনি আবার আরতি বোসরাও রাণী সাজে।

এ সেই আরতি বোসের গল্প।

আরতি বোসের বাড়িতে যদি যেতে চান তো সোজা গেলে গলির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আর যদি গলি এড়াতে চান তো বড় রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। বড় রাস্তা দিয়ে যাবারও অনেক অসুবিধে আছে। দু'পাশে বড় বড় বাড়ি। আর সবগুলো বাড়িই জাঁদরেল বাড়ি। জাঁদরেল বাড়ি মানে খুব যে চারতলা-পাঁচতলা বাড়ি তা নয়। বেশ আধুনিক ডিজাইনের গ্রিল্ দেওয়া, কংক্রীটের বাহারে বাড়ি। জানালায় পর্দা, দরোজায় কুকুর।

এক কথায় শৌখিন পাড়া।

এককালে জায়গাটা খালি ছিল। না ছিল একখানা বাড়ি, না ছিল একটা মানুষ। তার মানে এদিকে কারো আসবার দরকারই ছিল না। সন্ধ্যের পর তো কেউ আসতেই পারতো না। এলে ফিরে যেতে পারবে কি না সে ভয়ও ছিল।

লোকে বলে এ সব বাড়ি ডাক্তার বিধান রায়ের কীর্তি।

ডাক্তার বিধান রায় চেয়েছিলেন কলকাতার বাইরে কাছাকাছি একটা দু'টো শহর গড়ে উঠুক। কলকাতার ভিড় তিনি কমাতে চেয়েছিলেন। অফিস কারখানা ফ্যাক্টরির কিছু কিছু যদি বাইরে গড়ে ওঠে তো কলকাতার লোকেরাও সেখানে যাবে। সেখানেও বসতি গড়ে উঠবে। মাঝখানে যে ফাঁকটি রইল সেখানে চাষের জমি। সেখানে থাকবে ক্ষেত-খামার। যাতে কলকাতার বাজারে শাক্-সবজির যোগান ঠিক থাকে।

তা এই রকম করেই গড়ে উঠলো এই 'আজাদ-নগর' কলোনী।

সস্তায় জমি বিলি হল গভর্নমেন্ট থেকে। বাঁধা দরের জমি। সেই জমির দাম নগদে না দিলেও চলতো। কিস্তিতে অল্প অল্প টাকা দিয়ে কুড়ি বছরে জমির মালিক হয়ে যাও। তখন আরাম করে পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখল করো।

কিন্তু এতগুলো লোক এলে হাসপাতালও দরকার, স্কুলও দরকার। আর শুধু ছেলেদের স্কুলই নয়, মেয়েদের স্কুলও দরকার। কারণ স্থানীয় অধিবাসীদের ছেলেমেয়েদের বছরে বছরে সংখ্যাও বেড়েছে।

এই অবস্থাতেই আজাদ-নগরের গার্ল স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস হয়ে এসেছিল আরতি। আরতি বোস।

বেশ মোটা-সোটা গোলগাল চেহারা রংটা কালো হোক, কিন্তু হেড্ মিস্ট্রেস হতে গেলে যা-যা কোয়ালিফিকেশন্ থাকা দরকার সবই ছিল আরতি বোসের।

ইন্টারভিউ-এ কমিটির মেম্বাররা নানা প্রশ্ন করলেন। নাম, ধাম, সার্টিফিকেট, বংশ-

পরিচয়, লেখা-পড়া, স্মার্টনেস, সব দিক দিয়েই জুৎসই ক্যান্‌ডিডেট মিস আরতি বোস।

একজন মেম্বার জিজ্ঞেস করলেন—আপনি বিয়ে করেননি কেন?

মিস আরতি বোসের ঠোঁটটা জবাব দিতে গিয়েও কেমন যেন কেঁপে উঠলো। কিন্তু সে কেবল এক মুহূর্তের জন্যে।

তারপরেই বললে—আমি লেখাপড়া নিয়েই ছিলুম কিনা, তাই...

মেম্বারটি তাতেও ছাড়লেন না। বললেন—কিন্তু একটা কথা, যদি ধরুন আপনি বিয়ে করেন তখন কি আপনি চাকরি ছেড়ে চলে যাবেন?

এর উত্তর কী দেবে আরতি! হঠাৎ এর জবাব দিতে একটু দেরি হল।

অন্য একজন মেম্বার এ-প্রশ্নে আপত্তি করলেন। বললেন—সে কথা জিজ্ঞেস করা উচিত নয় এখন। বিয়েটা বড়, না চাকরিটা বড়?

এবার আরতি বোস বললে—আমি না-হয় তিন বছরের মত গ্যারান্টি দিতে পারি। কিংবা বড়জোর লিখে দিতে পারি যে বিয়ে করলেও আমি তিন বছরের মধ্যে আজাদ-নগর গার্লস স্কুলের চাকরি ছেড়ে চলে যেতে পারবো না—

তা শেষ পর্যন্ত তাই-ই হল। মেম্বাররা চাকরি দিলেন আরতি বোসকেই। আরো যারা যারা ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল তারা সবাই হতাশ হয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল। রয়ে গেল শুধু আরতি—আরতি বোস।

এই যে আজ আজাদ-নগর গার্লস স্কুলের এত নাম-ধাম, এত খ্যাতি, এত ছাত্রী এ সবই ওই হেড্ মিস্ট্রেস আরতি বোসের জন্যে। এর সমস্ত কৃতিত্ব ওই আরতি বোসের।

আজাদ-নগর কলোনীর সবাই জানে আরতি বোসের কাছে তাদের ছেলে-মেয়েদের দিলে আর কোনও দুর্ভাবনা নেই। মেয়ে তাদের মানুষ হবেই।

আরতি বোস স্কুলে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কোনও মেয়ের ক্ষমতা নেই যে ক্লাসে গোলমাল করে, কিংবা হৈ-হৈ করে বেড়ায়। প্রতিদিন আরতি বোস ক্লাসের হাজ্‌রি খাতাগুলো নিয়ে নিজে পরীক্ষা করে দেখে। কে কতদিন গর-হাজির হল। বেশিদিন গর-হাজির হলেই ছাত্রীর গার্জেনের কাছে চিঠি দেবে। গার্জেন আসবেন, তাঁরা কৈফিয়ৎ দেবেন। হাজ্‌রি-খাতায় সে কৈফিয়ৎ নোট করা হবে। তবে রেহাই পাবে ছাত্রী।

আজাদ-নগর কলোনী যেমন আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে, আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আজাদ-নগর গার্লস স্কুলও আকারে আয়তনে বড় হয়েছে। ইজ্জতও বেড়েছে তার। হায়ার-সেকেন্ডারি বোর্ডের রেজাল্টও ভাল হয়েছে ক্রমে ক্রমে। পঞ্চাশটির মধ্যে পঞ্চাশটিই ফার্স্ট ডিভিশন।

মাসে মাসে কমিটির মিটিং হয়।

দেবব্রতবাবু কমিটির প্রেসিডেন্ট। রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট অফিসার। এককালে জুডিসিয়াল সেক্রেটারি হিসেবে জাঁদরেল মানুষ বলে কেরানীকুলে সুনাম ছিল। বা দুর্নামও বলা যায় তাকে। তিনি বরাবর একটা ধারণা নিয়েই জীবন কাটিয়েছেন যে সব মানুষ ফাঁকিবাজ। এই ফাঁকি জিনিসটাই তিনি জীবনে মোটে দেখতে পারেননি। তিনি যেমন নিজেও ফাঁকি দেননি, কেউ তেমনি ফাঁকি দিচ্ছে এটা দেখতে চাইতেন না।

বলতেন—সব মানুষ ফাঁকিবাজ হলে দেশের যে সর্বনাশ হয়ে যাবে হে—

আরো বলতেন—বাঙালীদের এই এক স্বভাব, একবার ফাঁকি দিতে পারলে আর কেউ ছাড়বে না।

সেই দেবব্রত সরকারকে লোকে বলতো সরকার সাহেব। সরকার সাহেব তখন ছিলেন একেবারে পাক্কা সাহেব। কাঁটা চামচে দিয়ে খাওয়া, সুট-টাই-মোজা-হ্যাট থেকে শুরু করে বাড়িতে মুসলমান খানসামা বাবুর্চি পর্যন্ত রেখেছিলেন। যখন গোটা দেশ স্বদেশী আন্দোলনে উত্তাল তখন তাঁর বিলিতি খানা কিংবা বিলিতি বিলাস-দ্রব্য, দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসটুকু পর্যন্ত সব ছিল মেড্-ইন্-ইংলন্ড। লোকে বলে সন্ধ্যার পর অফিস থেকে বাড়িতে গিয়ে নাকি বিলিতি হুইস্কি না খেলে তাঁর ঘুমই আসতো না। কিংবা বোধহয় খানা হজমই হতো না।

এ হেন সরকার চাকরি থেকে রিটায়ার করবার পর এইখানে এই আজাদ-নগরে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পাঁচ বিঘে জমি নিয়ে বাড়ি করলেন। আর সেই যে রিটায়ার করলেন, আর সাহেবরা দেশ ছেড়ে চলে গেল, তখন একেবারে দিশী হয়ে গেলেন। একেবারে ঘোরতর স্বদেশী। লম্বা সাদা লংক্লথের পাঞ্জাবী, খাটো ধুতি। গলায় একটা এণ্ডির চাদর। আর মুখে বাংলা ভাষা।

আজাদ-নগর কলোনীর নতুন বাসিন্দারা সে সরকার সাহেবকে দেখেননি। দু'একজন মানুষ যারা তাঁকে সেই অবস্থায় দেখেছে, তারা এখানে বাড়ি করলো। তখন সরকার সাহেবকে দেখে তারা অবাক। তখনই তারা ঠিক করলো যে ছেলেদের স্কুল হয়েছে, একটা মেয়েদের স্কুলও দরকার।

তা সেই তখনই দেবব্রতবাবুকে প্রেসিডেন্ট করে একটা কমিটি খাড়া করা হল।

দেবব্রতবাবু বললেন—একটা আদর্শ স্কুল করতে হবে।

আদর্শ বলতে তিনি কী বোঝেন তাও বুঝিয়ে দিলেন। এই আজকাল যে চারিদিকে ফাঁকি বেড়ে গিয়েছে এটা রোধ করতে হবে। কাজে ফাঁকি, চরিত্রে ফাঁকি, জীবন-যাপনে ফাঁকি, কথাবার্তায়-আচরণে ফাঁকি। এর আমূল সংস্কার চাই।

তাই যখন মেয়েরা ইন্টারভিউ দিতে এল তখন সকলকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

বলতে গেলে তিনিই প্রধানত আরতি বোসকে পছন্দ করলেন।

পছন্দ করার একটা প্রধান কারণ হল আরতি বোসকে দেখতে খুব সুন্দরী নয়। দেবব্রতবাবুর ধারণা ছিল সুন্দরী হলেই তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাবে হেড্-মিস্ট্রেসের। আর একবার বিয়ে হলেই স্কুলের দিকে নজর দেওয়া কমে যাবে। স্বামী সংসার ছেলেমেয়েদের দিকেই বেশি লক্ষ্য থাকবে। আর ওদিকে ইস্কুল তাঁদের গোল্লায় যাবে।

তারপর বাড়ির খবরাখবর নিয়ে দেখলেন আরতি বোসের বাবা নেই, মা-ও নেই। ভাই-বোনের ঝামেলাটাও নেই। আর তা ছাড়া বাড়িতে ছাপোষা লোকও কেউ নেই যাদের ভরণ-পোষণ করতে হয় আরতি বোসকে।

যতগুলো গুণ থাকা দরকার একজন হেডমিস্ট্রেসের পক্ষে তার সবগুলোই ছিল আরতি বোসের।

সুতরাং আরতি বোসই চাকরি পেয়ে গেল। আর তার থাকবার ব্যবস্থাও করে দিলে স্কুল-কমিটি।

তা বাড়িটা মন্দ নয়। একা মানুষ থাকবার পক্ষে যথেষ্ট ভালো। ঠিক বড় রাস্তার ওপরে নয়। গলিপথ দিয়ে গেলে অবশ্য তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। কিন্তু বড় রাস্তা দিয়ে গেলে একটু ঘুর পড়ে।

তাতে আরতি বোসের কোনও অসুবিধে ছিল না। কারণ সে তো পায়ে হেঁটেই চলতো। যারা পায়ে হেঁটে চলে তাদের কাছে রাস্তাটা গলিপথ না রাজপথ তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার হয় না।

সারাদিন স্কুলের হাড়ভাঙা কাজের পর যখন আরতি বেঁটে ছাতাটা নিয়ে বাড়ি ফিরতো তখন আশেপাশের বাড়ি থেকে কেউ কেউ চেয়ে দেখতো। বেঁটে ছাতার আড়ালে সব সময় তার মুখটা দেখা যেত না বটে, কিন্তু তবু এক-একজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাতো।

আচম্কা একটা মেয়ের পায়ে হাত দেওয়া দেখে প্রথমটা আরতি চম্কে উঠতো। তারপর মুখটার দিকে নজর দিয়ে দেখেই চিনতে পারতো।

বলতো—উমা নাকি? আমি চিনতেই পারিনি—

উমার মাথায় আধ-ঘোমটা, সিঁথিতে সিঁদুর। গায়ে-গতরে বেশ মোটা-সোটা। রংটাও ফরসা হয়ে গেছে বেশ।

উমা তখনও হাসছে। হাসি নয় তো যেন অহঙ্কার। অহঙ্কারের একটা আলগা উচ্ছ্বাস। সে-উচ্ছ্বাসটা সারা শরীরে একটা হিল্লোল তুলে উমাকে যেন একেবারে অপরূপ করে তুলেছে।

—কবে এলে তুমি?

উমা বললে—আজকে। আপনি কেমন আছেন আরতিদি?

আরতি সে-কথার ধার দিয়ে গেল না। বললে—শ্বশুরবাড়ি কেমন লাগছে? বর পছন্দ হয়েছে তো?

জবাব দিতে গিয়ে উমার গাল দুটো যেন লজ্জায়-লাবণ্যে-লাস্যে বড় মিষ্টি হয়ে উঠলো।

বললে—হ্যাঁ—

আরতি বললে—ভালোই হয়েছে। এবার মন দিয়ে সংসার করো, সুখী হও, এই আশীর্বাদই করি—

এর পর আর কিছু কথা বলবার থাকে না। ছাত্রীর সঙ্গে হেড-মিস্ট্রেসের আর কী কথাই বা থাকবে!

এই উমা! কোনও দিন ক্লাসে লেখা-পড়া পারেনি। বরাবর ফেল করতো আর প্রত্যেক বছর উমার বাবা এসে প্রমোশন দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতেন।

সুধীরবাবুও এককালে গভর্নমেন্ট অফিসে ভালো চাকরি করতেন। প্রভিডেন্ট্ ফান্ডের টাকা পেয়ে এই বাড়ি করেন। দু'তিনটি মেয়ের বিয়ে দিতে তখনও বাকি। তাদের নেহাৎ না-পড়ালে নয় তাই পড়ানো। এক-একটা মেয়েকে একটু পড়িয়েই বিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজতেন।

আরতি বোসের এটা ভালো লাগতো না।

বলতো—মেয়েদের লেখাপড়াটা কি শুধু বিয়ের জন্যে সুধীরবাবু? লেখাপড়া শেখার কি অন্য কোনও উপযোগিতা নেই? লেখাপড়া শিখলে মন উদার হয়, তারপর সন্তানদের কথা ভাবুন, সবাই শিক্ষিত হলে দেশের আর সমাজের কত মঙ্গল—

মধ্যবিত্ত সুধীরবাবুর এসব উপদেশ শুনতে ভালো লাগতো না। তিনি বার বার পীড়াপীড়ি করতেন মেয়েদের প্রমোশনের জন্যে, আর আরতি তাদের প্রমোশন দিত না।

আসলে কমিটি প্রধান হলেও প্রেসিডেন্ট দেবব্রতবাবু আরতি বোসের কথার ওপর কথা বলতে চাইতেন না।

তিনি বলতেন—তুমি মা যা ভালো বুঝবে তাই করবে। স্কুলের ব্যাপারে তোমাকে পুরো ক্ষমতা দেওয়া রইল। তবে মেজর ব্যাপারগুলো দেখবে কমিটি—স্কুলের আয়-ব্যয়, উন্নতি-অবনতি— ও সব আমরা দেখবো—

আরতি বলতো—কিন্তু আপনি আমার ওপর এত ভার চাপিয়ে দিলেন, আমি কি এত ভার সইতে পারবো?

—খুব পারবে মা, খুব পারবে! তোমার এই বয়সে যদি না পারবে তো আমি বুড়ো মানুষ পারবো? এ কি একটা কথা হল?

তা সেই দিন থেকে প্রেসিডেন্টের হুকুম পেয়ে আরতি বোসই বলতে গেলে আজাদ-নগর গার্লস স্কুলের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে ক্লাস প্রমোশনের ব্যাপারটা। প্রমোশনের ব্যাপারে যদি কেউ কমিটির প্রেসিডেন্ট্ বা মেম্বারদের কাছে যেত তো তাকে সবাই বলে দিতেন—এ-সব আমাদের ব্যাপার নয়, ওর জন্যে আপনি হেড্-মিস্ট্রেসের সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন—

আসলে হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট যখন ভালো হচ্ছে তখন হেড-মিস্ট্রেসের ওপর কথা না বলাই ভালো। সেই জন্যেই আজাদ-নগর কলোনীর অধিবাসীদের কাছে আরতি বোসের একটা আলাদা ইজ্জত ছিল, একটা আলাদা মর্যাদা। এতদিন ধরে এই স্কুল আরতি চালিয়ে আসছে, এর মধ্যে একদিনের জন্যে এতটুকু খুঁত কেউ বার করতে পারেনি। স্কুলে কোনও গোলমাল, বিশৃঙ্খলা বা অশালীনতা কেউ দেখতে পায়নি। যখন কলকাতা শহরের সব স্কুলে হরতাল, মারামারি, বোমবাজি চলেছে, এই গার্লস স্কুলে সে-সবের নামগন্ধও কেউ দেখেনি। সেই দু'তিনটে বছর যে আরতি বোসের কী অশান্তি গেছে তা বাইরের কেউ জানতে পারেনি।

তারপর আবার চারদিকে শান্তি ফিরে এসেছে। আজাদ-নগর কলোনীর সমস্ত অধিবাসীরা আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠেছে।

ভেবেছে—যাক্, এখানে যে কোনও গণ্ডগোল হয়নি এটাই একটা সৌভাগ্য!

দেবব্রতবাবু লাঠি ঠক্-ঠক্ করতে করতে হেঁটে গিয়ে হাজির হলেন হেড্-মিস্ট্রেসের বাড়ি।

গিয়ে বাইরের দরজায় কড়া নাড়লেন।

ভেতর থেকে একজন বুড়ি ঝি-মানুষ এসে দরজা খুলে দিলে।

দেবব্রতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আরতি? আরতি কোথায়? আজাদ-নগর গার্লস স্কুলের হেড্-মিস্ট্রেস? ভেতরে বলো গিয়ে আমি স্কুলের প্রেসিডেন্ট্ দেবব্রতবাবু এসেছি—

ঝি-মানুষটা আর কিছু না বুঝুক, এইটুকু শুধু বুঝলো যে ইনি একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক।

মাথার ঘোমটা আর একটু টেনে দিয়ে বললে—দিদিমণি তো বাড়িতে নেই—

—বাড়িতে নেই? একটু অবাক হয়ে গেলেন দেবব্রতবাবু।

—কোথায় গেছেন?

—ইস্কুলে।

স্কুলে! শুনে একটু অবাক হয়ে গেলেন। রবিবার। ছুটির দিন। ছুটির দিন দেখেই

দেবব্রতবাবু এসেছিলেন। ছুটির দিনে হেড্-মিস্ট্রেসকে নিশ্চয় বাড়িতে পাওয়া যাবে ভেবেছিলেন।

ঝি-মানুষটি বললে—আমি দিদিমণিকে ডেকে আনবো?

দেবব্রতবাবু ছড়িটা নিয়ে আবার উঠলেন।

বললেন—না থাক, তুমি আবার কেন কষ্ট করতে যাবে। আমি পরে আবার একদিন আসবো—বলে তিনি আবার ঘর থেকে রাস্তায় বেরোলেন। একবার ভেবেছিলেন নিজের বাড়ির দিকেই ফিরে যাবেন। কিন্তু আবার ভাবলেন পায়ে পায়ে স্কুলে গেলেও হয়।

এসেছিলেন গলিপথটা দিয়ে। কিন্তু যাবার সময় বড় রাস্তাটা দিয়ে চলতে লাগলেন।

❋ ❋ ❋

তিনি যখন প্রথম এখানে বাড়ি করেন তখন এ-সব মাঠ ছিল। কোনও দিন যে এখানে আবার এমন ঘন-বসতি শহর হবে তা ভাবেননি। ছেলেও এখানে বাড়ি করতে আপত্তি করেছিল। কলকাতা থেকে এত দূরে কে থাকবে, তারপর যখন কলকাতাকেও ত্যাগ করা যাবে না। যে যেখানেই থাকুক কলকাতায় তো তাকে দিনান্তে একবার আসতেই হবে। একটা সামান্য টুথ-ব্রাসের জন্যেও সেই দৌড়ে কলকাতায় যাও।

কিন্তু না, আস্তে আস্তে সবই হল।

শুধু তুচ্ছ টুথ-ব্রাস কেন, এই আজাদ-নগর কলোনীতে বসে টেলিফোন করলেই তোমার বাড়িতে বাজারের সব জিনিস এসে হাজির হবে। জুতো থেকে আরম্ভ করে মাছ পর্যন্ত কিছু বাকি থাকবে না।

তা ভালোই হয়েছে। কলকাতা শহরের সব কিছু সুবিধেগুলো যেমন এখানে আছে, কলকাতা শহরের অসুবিধেগুলো একটাও নেই। এ-পাড়া ও-পাড়া যাবার জন্যে কয়েকখানা সাইকেল রিক্‌শাও আছে। ইদানীং একখানা ট্যাক্সিও পাওয়া যায়।

দেবব্রতবাবু চারপাশের বাড়িগুলো দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন। বেশ বাড়ি করেছে সবাই। সবারই অবস্থা ভালো। ভালো বাড়ি করবে না-ই বা কেন? লোক কম তাই রাস্তাঘাটও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। যেতে যেতে দেখলেন এক জায়গায় কে একটা কলার খোসা ফেলে রেখেছে। এটা খারাপ। কেউ পা লেগে পিছলে পড়ে যেতে পারে।

পাশের বাড়ির বীরেনবাবুকে গিয়ে ডাকলেন—মিস্টার সান্ন্যাল, মিস্টার সান্ন্যাল—

ডাকাডাকিতে মিস্টার সান্ন্যাল বেরিয়ে এলেন। গায়ে ড্রেসিং গাউন, পায়ে স্লিপার।

দেবব্রতবাবুকে দেখে মুখে হাসি বেরোল।

বললো—গুড্ মর্নিং মিস্টার সরকার, আসুন—

দেবব্রতবাবু বললেন—না, এখন আর আসবো না। এই জিনিসটা দেখাবার জন্যে আপনাকে ডাকছি।

মিস্টার সান্ন্যাল বুঝতে পারলেন না। বললেন—কি জিনিস?

দেবব্রতবাবু ছাড়ানো কলার খোসাটা দেখিয়ে বললেন—এই দেখুন, কী রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক সব আজাদ-নগরের। যেখানে-সেখানে রাস্তায়-ঘাটে কলার খোসা ফেলে রেখে দেয়। এখন যদি পা পিছলে পড়ে গিয়ে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে? তখন তো আমাদের এই আজাদ-নগরেরই দোষ হবে!

মিস্টার সান্ন্যালও দেখলেন কলার খোসাটা।

তারপর বললেন—কখন কে ফেলে যায় তা তো দেখতে পাই না। আর আমি তো বাইরের দিকে চোখ রাখি না সব সময়। তাছাড়া আমার বাড়ির কেউ খোসা ফেলেনি। আমার বাড়িতে কলাই আসেনি বাজার থেকে প্রায় দশ-বারোদিন হল।

দেবব্রতবাবু বললেন—না, আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু এই অভ্যেসটা খারাপ। এর একটা বিহিত করতে হবে।

তারপরে একটু থেমে বললেন—আর সব খবর ভালো তো? ব্লাডপ্রেসার কেমন আছে আপনার?

মিস্টার সান্ন্যাল বললেন—পরশু থেকে একটু হাই হয়ে আছে।

দেবব্রতবাবু বললেন—খাবার অত্যাচারটা করবেন না। একটু ড্রিঙ্ক কমিয়ে দিন—

মিস্টার সান্ন্যাল বললেন—এ বয়সে তো একেবারে কমাতে পারবো না ওটা, তিন পেগের বেশি খাই-ই না।

—একেবারে ছেড়ে দিতে পারলেই ভালো হতো। তা, আর একটু কম করুন।

মিস্টার সান্ন্যাল বললেন—চেষ্টা তো করি। তবে একেবারে ছাড়া সম্ভব হবে না, তাতে উল্টো রেজাল্ট্ হবে। ছেড়ে দিয়ে দেখেছি যে—

—তাহলে যেমন খাচ্ছেন, তেমনিই খেয়ে যান।

বলে আর দাঁড়ালেন না। লাঠিটা নিয়ে আবার চলতে লাগলেন।

মিস্টার সান্ন্যাল বললেন—এখন চললেন কোথায়?

—ওই স্কুলের দিকে। হেড্-মিস্ট্রেস বাড়িতে নেই, স্কুলে গেছেন। সামনে পরীক্ষা আসছে তো, তাই দু'একটা জরুরী কাজের কথা বলতে যাচ্ছি—

মিস্টার সান্ন্যাল আবার নিজের ঘরের ভেতর ঢুকে যেমন 'স্টেট্স্ম্যান' পড়ছিলেন তেমনি আবার পড়তে লাগলেন।

স্কুলে যখন দেবব্রতবাবু পৌঁছলেন তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। দারোয়ান গেটে পাহারা দেয় অন্যদিন। ছুটির দিন বলে সেও গর-হাজির। হঠাৎ নজরে পড়লো স্কুলের বাগানের মধ্যে কাদের একটা গরু ঢুকে পড়ে ফুলগাছে মুখ দিচ্ছে।

দৃশ্যটা দেখতে পেয়েই দেবব্রতবাবুর মাথাটা গরম হয়ে গেল। কী আশ্চর্য! এত কষ্ট করে কলকাতা থেকে ফুলের বীজ, গাছের সার এনে বাগান করেছেন দেবব্রতবাবু, সবই কি গরুকে খাওয়াবার জন্যে!

—হ্যাট্ হ্যাট্—

লাঠিটা নিয়ে গরুটার দিকে তেড়ে গেলেন দেবব্রতবাবু।

তারপর চিৎকার করতে লাগলেন—মধু, মধু, মধু—

মধু স্কুলের দারোয়ান। ছুটির দিন। সেও ছুটি পেয়ে কাজে ঢিলে দিয়েছে। ভাবতেও পারেনি যে ছুটির দিনেই প্রেসিডেন্ট স্কুলে এসে হাজির হবেন। হয়ত তখন খানা বানাতে গেছে কিংবা বাজারে শাক-সবজি কিনতে গেছে।

দেবব্রতবাবু আবার ডাকতে লাগলেন—মধু, ও মধু—

যখন ডেকে ডেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না, তখন নিজেই গরুটার দিকে তাড়া করে চললেন। আর এমনই বেয়াড়া গরু যে যত তাড়া খায় ততই বাগানের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাক খায়। কিছুতেই বাগান ছেড়ে পালায় না।

শেষকালে দেবব্রতবাবু হাঁপিয়ে উঠলেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে আবার চিৎকার করলেন—মধু, মধু ওরে কোথায় গেলি?

কোথায় মধু, তার তখন টিকির পর্যন্ত সাক্ষাৎ নেই!

কিন্তু তখন শব্দটা গিয়ে পৌঁছেছে স্কুলের অফিস-ঘরের ভেতর আরতি বোসের কানে।

আরতি বোস সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। দেবব্রতবাবুর গলা তার চিনতে ভুল হবার কথা নয়।

একগাদা কাগজ-পত্র সামনে ছড়ানো ছিল। অনেক কাজ বাকি পড়ে গেছে। এই ছুটির দিনে ভেবেছিল বাকি কাজগুলো তুলে দেবে।

চেয়ার থেকে উঠে তাড়াতাড়ি কাগজগুলো চাপা দিলে।

তারপর জানালা দিয়ে নিচে উঁকি দিয়ে দেখেই অবাক। দেখলে দেবব্রতবাবু লাঠি নিয়ে একটি গরুকে তাড়া করে চলেছেন, আর গরুটা তাড়া খেয়ে ফুলবাগানের মধ্যে কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

আরতি বোস কী করবে প্রথমে বুঝতে পারলে না। মধুই বা কোথায় গেল? সে এ-সময়ে কোথায় গেল? রবিবার! তারও ছুটির দিন! কিন্তু বাড়িতেই বা তা-বলে থাকবে না কেন?

সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে আরতি বোস নিচে নামতে লাগলো।

তখন একেবারে বাগানের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে আরতি।

দেবব্রতবাবু আরতি বোসকে দেখে যেন অকূলে কূল পেলেন।

বললেন—আরতি, মধু কোথায় গেল?

আরতি লজ্জায় পড়লো। বললে—আজ তো ছুটির দিন, তাই...

দেবব্রতবাবু বললেন—তা ছুটির দিনে তো তুমিও এসেছ। তুমি কেন এসেছ?

আরতি বোস যেন আরো লজ্জায় পড়লো।

বললে—আমার কথা আলাদা—

—কেন? তোমার কথা আলাদা কেন?

দেবব্রতবাবু বললেন—কিন্তু তুমি আর মধু আলাদা কেন? তুমিও স্কুলের কর্মচারী, মধুও কর্মচারী। মাইনের তফাৎ হতে পারে। সে তো কাজের তারতম্যের ব্যাপার। কিন্তু কম মাইনে পেলে কি তুমি কম কাজ করতে?

এদিক থেকে চিন্তা করেনি কখনও আরতি বোস। প্রেসিডেন্টের কথায় কী বলবে বুঝতে পারলে না। মধুর গাফিলতির কথা ভেবে বললে—ও হয়ত বাজারে গেছে, ওকে তো সংসার করে খেতে হয়—

—তা সংসার তুমি করো না?

—তা অবশ্য করি, কিন্তু আমার তো রান্নাবানা করবার লোক আছে! আমি তো ওর চেয়ে বেশি মাইনে পাই!

এ-কথাটার উত্তর এক মিনিটে খুঁজে বার করতে পারলে না দেবব্রতবাবু। হঠাৎ থমকে গেলেন। ওদিকে তখন গরুটা গেট খোলা পেয়ে কখন বাইরে বেরিয়ে গেছে তা কেউই টের পায়নি।

আরতি বোস হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে বললে—আমি গেটটা বন্ধ করে দিয়ে আসছি,

আপনি ওপরে উঠুন—

বলে গেটটা নিজেই বন্ধ করে দিয়ে দেবব্রতবাবুকে ওপরে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

হেড্-মিস্ট্রেসের ঘরের চারিদিকেই বই-পত্র। একটা ভারতবর্ষের ম্যাপ। কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীর অয়েল পেন্টিং টাঙানো। কয়েকজন বিখ্যাত মহিলার ছবি।

—তুমি বসো।

আরতি বোস বসলো।

দেবব্রতবাবু খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। একটু পাখার হাওয়ার তলায় বসে ঠাণ্ডা হয়ে নিয়ে বললেন—আমি তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে আসছি—

আরতি বোস অপরাধীর মত বললে—আজ ছুটির দিন তাই ভাবলুম কাজগুলো একটু এগিয়ে নিই—

—ভালোই করেছ। তা আমি যে-কথা বলতে এসেছি তোমাকে। এবারের পরীক্ষা কবে হচ্ছে? প্রশ্নপত্রগুলো যেন ভালো করে দেখে দেওয়া হয়।

আরতি বোস বললে—আমি তো আপনার কাছে সে-জন্যে যেতাম। আপনি কেন আবার এত কষ্ট করে আসতে গেলেন?

দেবব্রতবাবু বললেন—তাতে কী হয়েছে, আমি কি বলতে চাও একেবারে অথর্ব হয়ে গিয়েছি? আমি যখন নিজে চাকরি করেছি তখন এক-একদিন বারো ঘণ্টা পর্যন্ত একনাগাড়ে কাজ করে গিয়েছি, তা জানো? এই তুমি যেমন আজকে এই ছুটির দিনে অফিসে কাজ করতে এসেছ। আমিও তেমনি কত রবিবারে নিজে অফিসে গিয়েছি। চাপরাসী নেই, সুইপার নেই, আমি অফিসে ঢুকে নিজে টেবিল-চেয়ার সাফ্ করেছি, জানালা খুলেছি, তারপর কাজে বসেছি—আমার কাছে আগে কাজ, তারপর অন্য সব কিছু।

আরতি কথাগুলো শুনতে লাগলো। কী আর বলবে!

দেবব্রতবাবু বলতে লাগলেন—আমি চাই সবাই তোমার মতন হোক আরতি। তুমি যেমন করে নিজের জীবন দিচ্ছ স্কুলের পেছনে, এমনি যদি সবাই দিত...

নিজের প্রশংসা শুনে আরতি বোসের মুখটা আরো কালো হয়ে গেল।

এ প্রশংসা দেবব্রতবাবু আগেও অনেকবার করেছেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই তার লজ্জা হয়েছে। কিন্তু ফাঁকা বাড়িতে বসে দেবব্রতবাবুর মুখ থেকে এত প্রশংসা শুনতে যেন আরও লজ্জা করতে লাগলো।

বললে—আপনি পরীক্ষার কথা বলছিলেন!

দেবব্রতবাবু বললেন—হ্যাঁ, বলছিলাম পরীক্ষাটা একটু এগিয়ে আনলে কেমন হয়? আমাদের প্রতিবার পরীক্ষা হচ্ছে ফেব্রুয়ারী মাসে। শীত থাকতে থাকতে। তাই খাতা দেখতে অত দেরি হয়। খাতা দেখতে দেরি হলে আবার নতুন ক্লাস আরম্ভ করতেও দেরি হয়ে যায়।

আরতি বোস বললে—আপনি যদি বলেন তাহলে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি করতে পারি।

—তা তাই-ই হোক। আমি কমিটিকে সেই রকমই নির্দেশ দেব।

—আর প্রশ্নপত্রের কথা কী বলছিলেন?

দেবব্রতবাবু বললেন—বলছিলাম, সব প্রশ্নপত্র ফাইনাল হবার পর আমাকে একবার দেখাবে। আমি যখন প্রেসিডেন্ট্। আমি পাস করে দিলে তবে পরীক্ষার হল-এ ছাত্রীদের দেওয়া হবে।

—তা বেশ।

দেবব্রতবাবু বললেন—তার কারণটা হল—গতবারে প্রশ্নপত্র শক্ত হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। অভিভাবকরা আমার কাছে অনেকে অভিযোগ করেছেন। আমি তাঁদের কথা দিয়েছিলাম এবারে আমি নিজে প্রশ্নপত্র দেখে দেব। ক্লাসে যা পড়ানো হয়েছে, তাই থেকেই শুধু কোশ্চেন করা হবে।

আরতি বললে—সে তো খুব ভালো কথা।

—হ্যাঁ, আমি এই কথা দুটো বলতেই তোমার কাছে এসেছিলাম। এখন চলি—

বলে উঠে দাঁড়ালেন। আরতি বোসও উঠছিল।

দেবব্রতবাবু বললেন—না, তোমাকে উঠতে হবে না, তুমি তোমার কাজ করো—

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। আবার সেই বাগান। আস্তে আস্তে বাগানের গেটের কাছে এসে গেটটা খুললেন। বাইরে বেরিয়ে গেটের আংটিটা আবার পরিয়ে দিলেন। তারপর বাগানটার দিকে একবার দেখলেন। ফুলগাছগুলো সব মাটি হয়ে গিয়েছে। কত যত্নে তিনি বীজ আনিয়ে মধুকে দিয়ে পুঁতিয়েছিলেন। সব নষ্ট হয়ে গেল।

তারপর আর দাঁড়ালেন না।

সোজা রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

❋ ❋ ❋

এ-সব প্রথম দিককার কাহিনী। যখন এই আজাদ-নগর গার্লস স্কুল প্রথম হয়েছিল তখন অনেক কাজ প্রেসিডেন্ট্ নিজেই করতেন। যে-সব কাজ তাঁর করার কথা নয়, তাও করতেন। আসলে স্কুলের আজকের এই উন্নতির জন্যে বোধহয় দেবব্রতবাবু আর আরতি বোসের কৃতিত্বই সব চেয়ে বেশি।

বহুদিন আগে এই চাকরির শুরুতে আরতি বোসের চুক্তি ছিল তিন বছরের জন্যে তাকে এখানেই থাকতে হবে। বাইরের স্কুলে বেশি মাইনের চাকরি পেলেও সে চলে যেতে পারবে না।

কিন্তু কই, আরতি বোস যেতে পেরেছে?

তার কি বিয়ে হয়েছে?

তার কি বাইরের স্কুলে বেশি মাইনের চাকরি হয়েছে?

একবার দেবব্রতবাবু স্কুল-কমিটির মিটিং-এর পর হেড্-মিস্ট্রেসের সঙ্গে অফিসঘরে বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন,—আচ্ছা আরতি তুমি তো এত বচ্ছর কাজ করছো, কখনও তো ছুটি নাওনি? এসব ব্যক্তিগত কথা সাধারণত দেবব্রতবাবু কখনও খুলে বলতেন না। কিন্তু সেদিন হয়ত স্কুলের হায়ার-সেকেন্ডারী পরীক্ষার ফলাফল দেখে খুবই খুশি হয়েছিলেন। তাঁর তখন খুবই খুশি-খুশি মেজাজ।

আরতি বোস বলেছিল—ছুটি তো নিতে ইচ্ছে করে খুব, কিন্তু এত কাজ, ছুটি নিলে সেই তো আবার আমাকেই একলা এসে সব বাকি কাজ তুলতে হবে, তখন?

দেবব্রতবাবু বলেছিলেন—বাঃ রে, স্কুলের কাজের জন্যে তোমার পাওনা ছুটিটাও তুমি নেবে না? এটা ভালো নয়। অবশ্য আমি যতদিন অফিসে কাজ করেছি, ততদিন

আমিও ছুটি নিইনি, তা জানো?

বলে তিনি আরতি বোসের মুখের দিকে চাইলেন।

আরতি বোস আর কী বলবে? দেবব্রতবাবু তাঁর চাকরি জীবনে কখনও ছুটি নিয়েছেন কি না তা আরতি বোসের তো জানবার কথা নয়।

দেবব্রতবাবু তখনও বলে চলেছেন—তা একদিন আমার চিফ্ সেক্রেটারি হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করলে—সরকার, তুমি তোমার এতদিনের সারভিস্ লাইফে একদিনও ছুটি নাওনি দেখছি—

আমি অবাক হয়ে গেলাম চিফ্ সেক্রেটারির কথা শুনে।

বললাম—কেন স্যার? ও-কথা হঠাৎ জিজ্ঞেস করছেন কেন?

চিফ্ সেক্রেটারি বললেন—আমি আজকে সকলের পার্সোন্যাল-ফাইল দেখছিলাম। দেখতে দেখতে হঠাৎ তোমার ছুটির শীটটা নজরে পড়লো। সেখানে দেখলাম একেবারে ব্ল্যাঙ্ক—ভাবলাম এটা কী করে হল, তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম। সত্যিই তুমি ছুটি নাওনি নাকি?

আমি বললাম—না—

চিফ্ সেক্রেটারি আমার কথায় অবাক। তিনি জীবনে অনেক অফিসের অনেক স্টাফ দেখেছেন কিন্তু এমন স্টাফ আর কখনও দেখেননি। তারপর আমাকে বললেন—তুমি ছুটি নাও সরকার, ছুটি নিয়ে কোথাও দিন-কতক গিয়ে বিশ্রাম নাও, তাতে তোমার স্বাস্থ্য ভালো হবে, মনও ভালো হবে, আর তোমার কাজও ভালো হবে তাতে—

আমি জবাবে বললাম—না স্যার, আমার ছুটি নেবার কোনও দরকার নেই, আমার স্বাস্থ্য ভালো আছে, মনও ভালো আছে। আর কাজ কি আমি খারাপ করছি?

চিফ্ সেক্রেটারি সেদিন আমার কথায় অবাক হয়েছিলেন। আর কিছু বলেননি।

গল্পটা বলে দেবব্রতবাবু বললেন—তোমারও দেখছি ঠিক আমারই মতন। আমি ভাবলুম হয়ত তুমি লজ্জায় ছুটি চাচ্ছো না—

আরতি বললে—না, লজ্জা ঠিক নয়। আমার এত কাজ ফেলে আমি কোথায় যাবো? বরং, অফিসে স্কুলের কাজ করতে করতে সব ভুলে থাকতে পারি—

দেবব্রতবাবু বললেন—তোমার কোনও আত্মীয়স্বজন নেই?

আরতি বোস বললে—না—

—দূর-সম্পর্কের?

আরতি বোস বললে—না দূর-সম্পর্কেরও কেউ নেই—

তারপরে হয়ত মনে পড়ে গেল। বললে—না, একজন আছে—

—কে?

আরতি বোস বললে—আমার পিসীমা। কিন্তু তিনিও খুব গরিব—কলকাতায় থাকেন বাসাবাড়িতে—আর তাঁর অবস্থাও তত ভালো নয়—

দেবব্রতবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন—সেখানেই না-হয় কিছুদিন কাটিয়ে এসো—

আরতি বোস বললে—গেলে হয়, তবে কাজ এত যে গেলে শেষকালে আমাকেই তো সব আবার এসে জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হবে—

এসবও আগেকার কথা।

আগেকার এমনি অনেক কথাই আছে। তখন এই আজাদ-নগর গার্লস স্কুলের সবে গোড়াপত্তন। তখন এই আজাদ-নগর কলোনীই এ-রকম ছিল না। এখানে এত বাড়িও ছিল না, আর এই গার্লস স্কুলেও এত ছাত্রী ছিল না। আগে গোড়ায় জানলা দিয়ে অনেক দূর দেখা যেত। আরতি বোসের বরাবরের একটা নিয়ম আছে—ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে স্নান সেরে এসে শাড়ি বদলে সূর্য-প্রণাম করা। সেই সূর্যটাও আর দেখা যায় না জানলা থেকে। চারদিকে এত বাড়ি হয়ে গেছে যে মাঝে মাঝে ধোঁয়ার গন্ধও নাকে আসে। রাস্তায় মাঝে মাঝে ময়লা জমে থাকে। কলার খোসা পড়ে কত দুর্ঘটনাও ঘটে গেছে রাস্তায়। কিন্তু এর প্রতিকার করবারও উপায় নেই আর। এত লোক, এত ভিড়, এ যেন আর ভাবতেই পারা যায় না।

তবু এসব দিকে আরতি বোসের বেশি খেয়াল থাকে না। যখন সে স্কুলের অফিস-ঘরে বসে কাজ দেখে তখন আর কিছু মনে থাকে না। তখন মনেও থাকে না আজাদ-নগর কলোনীতে কত লোক বাড়ছে, কিংবা তার বাড়ি থেকে যে সকালবেলার সূর্য দেখা যায় না, তা-ও মনে থাকে না। তখন কেবল মনে থাকে কাজ আর কাজ!

স্কুল যখন ছুটি হয়ে যায়, সবাই যখন বাড়ি চলে যায়, যখন সমস্ত বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যায়, তখনও আরতি বোস নিজের কাজে ডুবে থাকে। মনে হয় যেন চব্বিশ ঘণ্টার বদলে আটচল্লিশ ঘণ্টায় দিন হলেই ভালো হত। হয়ত তাতেও তার কাজ শেষ হবার নয়।

অনেকে জিজ্ঞেস করতো—এত কি কাজ আপনার?

আরতি বোস বলতো—কাজের কি শেষ আছে আমার? আমি না দেখলে তো কাজই হয় না—

—কেন?

আরতি বোস বলতো—কাজ হয় না তার কারণ মন দিয়ে কেউ কাজ করে না—। নইলে কাজে অত ভুল পাই কেন? একটা চিঠি সই করবার আগে আমি যে সমস্ত ফাইলটা ভালো করে পড়ে নিই। ফাইলটা সমস্তটা না পড়লে চিঠিটা সই করবো কী করে বলুন? সব দোষ তো শেষ পর্যন্ত আমারই ঘাড়ে এসে পড়বে। লোকে বলবে—তুমি চিঠিতে সই করবার সময় একবার ফাইলটাও পড়োনি?

তা সেই আরতি বোসই আবার বাড়িতে অন্য রকম।

বাড়িতে আবার পুজোর একটা ঘর আছে। সেইখানে বসে পুজো করতেই অনেক সময় কেটে যায়। পুজো করবার সময় আবার স্কুলের কথাও মনে থাকে না তার।

মঙ্গলা বার বার এসে দেখে ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অথচ দরজায় ধাক্কা দিতেও পারে না। তাতে দিদিমণির পুজোর ব্যাঘাত হবে।

আরতি বোস যে পুজোর ঘর থেকে কখন বেরোবে তার ঠিক নেই। সন্ধ্যেবেলা সেই যে পুজোর ঘরে ঢুকবে তারপরে দু'ঘণ্টার মধ্যে আর বিরক্ত করবার হুকুম নেই তার।

তখন যদি কেউ দেখা করতে আসে মঙ্গলা বলে—এখন তো দেখা হবে না, এখন দিদিমণি পুজোয় বসেছেন—

মঙ্গলার কথায় অনেকে অবাক হয়ে যেত। বড়-দিদিমণি তো বিয়েই করেনি, তার আবার এত পুজো করার বাই কেন গো?

কিন্তু অনেকে আবার তার পুজো করার স্বভাব দেখে খুশিও হত। দিদিমণিদের মনে যদি একটু ধর্মভাব থাকে তাহলে তো ভালোই। দিদিমণিদের দেখেই ছাত্রীরা শিখবে। দিদিমণিরাই

ছাত্রীদের আদর্শ। তারা যেমন আচার করবে ছাত্রীদের আচরণও সেইরকম হবে।

সেই পুজো করবার সময়টুকুতেই আরতি বোস যেন নিজেকে খুঁজে পায়। তখন সে নিজের অন্তরের অন্তস্থলে ডুব দেয় খানিকক্ষণের জন্যে। পুজোর ঘরে তার আর কিছুই নেই। কোনও ঠাকুর-দেবতার ছবিটবিও নেই সেখানে। তবু ফাঁকা একটা ছোট্ট একটুখানি ঘর। সেই একটুখানি ঘরের মধ্যে একজনই শুধু কোনও রকমে বসতে পারে। সেখানে বসে নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রার্থনা করে শুধু।

বলে—আমাকে আরো শক্তি দাও মা, যেন আমি আমার সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি। কষ্ট তো আছেই, যন্ত্রণাও তো আছে, সংসারে বেঁচে থাকতে গেলে ও-সব অস্বীকার করলে চলবে না। সে-সব তোমারই দান বলে আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু শুধু একটা প্রার্থনা ও-সব দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা যেন তোমারই দেওয়া বলে মাথা পেতে সহ্য করতে পারি। দুঃখের যন্ত্রণা যেন এমন অসহ্য না হয়ে উঠতে পারে যাতে তোমার ওপর আমার অবিশ্বাস জন্মায়। প্রার্থনা করি সুখে-দুঃখে যেন তোমার ওপর আমার বিশ্বাস অচল-অনড় থাকে...

বার বার এই কথাগুলোই মনে মনে আবৃত্তি করে যায় আরতি বোস। প্রতিদিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। হাজার কাজের মধ্যে একদিনও এর কখনও ব্যতিক্রম হয়েছে তা মনে পড়ে না।

সত্যিই কত দিন হয়ে গেল! কতদিন হয়ে গেল তার! কতদিন ধরে এই স্কুল চালাচ্ছে, আরো কতদিন চালিয়ে যাবে। তারপরে এই আজাদ-নগর গার্লস স্কুল একদিন হয়তো আরো বড় হবে। তখন হয়ত স্কুল-কমিটি তাকে বলবে—এবার তোমাকে আমাদের দরকার নেই, এবার তুমি অবসর নাও—

তখন?

তখনকার কথা ভাবতেই আরতি বোসের কেমন আতঙ্ক হয়। সেই অবধারিত রিটায়ারমেন্টের অমোঘ দিনটা। যখনই কথাটা মনে আসে তখনই মনে মনে ওই প্রার্থনাটা আবৃত্তি করে। খানিকক্ষণ আবৃত্তি করলেই কেমন শান্ত হয়ে যায় মনটা। তখন আস্তে আস্তে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করে সে পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

তখন এক মুহূর্তে আরতি বোস আবার হেড-মিস্ট্রেসে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

তখন আবার মাথার মধ্যে ঢোকে স্কুলের যত ভাবনা।

❋❋❋

উমার চেহারা দেখে প্রথমে আরতি চিনতে পারেনি। না-চিনতে পারারই কথা। স্কুলের ভালো-ভালো মেয়েদেরই তবু মনে রাখা যায়। কিন্তু হাজার হাজার মেয়েদের মধ্যে উমার মত একজন সাধারণ মেয়েকে—

তবে চিনতেও বেশি দেরি লাগলো না।

উমা যেন আরো মোটা হয়েছে। আর দু'দিন বাদেই যেন গিন্নী-বান্নী হয়ে উঠবে একেবারে।

কেমন যেন অবাক লাগলো আরতির। এই সেদিনকার একটা ছোট্ট মেয়ে। ফ্রক পরে স্কুলে আসতো, আর পড়া না-পারার জন্যে দিদিমণিদের কাছে বকুনি খেত। সেই মেয়েই

আজ একেবারে বিয়ের গর্বে রাজ-রাজেন্দ্রাণী হয়ে উঠেছে। সবে স্নান করে এলোচুলে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মাথার চুলগুলো তখনও ভিজে। সিঁদুরটা সিঁথির মাঝখানে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।

সেই সিঁদুরটাই যেন আরতির চোখে বেশি করে নজরে পড়লো। যেন উমা তার অতীতের সব পড়া না-পারার অগৌরব ওই সিঁদুরের ঔদ্ধত্যে ঢেকে দিতে চাইছে। যেন বলতে চাইছে—আমাকে তোমরা যত তাচ্ছিল্যই করো আরতিদি, আমি তুচ্ছ নই। আমার খুব ভাল জায়গাতেই বিয়ে হয়েছে। আমি সুখী, আমি সৌভাগ্যবতী। আমি তোমাকেও টেক্কা দিয়েছি আরতিদি। তোমরা অত লেখাপড়া শিখে যা না লাভ করেছ—আমি লেখাপড়া না শিখে তাই পেয়েছি—

আরতি বললে—আশীর্বাদ করি তুমি আরো সুখী হও উমা, শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামীর প্রিয় হও।

উমা বললে—আমার তো শ্বশুর-শাশুড়ি নেই আরতিদি, আমার শ্বশুর-বাড়িতে বলতে গেলে আর কেউ নেই, শুধু আমি আর ও। শুধু আমাদের দুজনকে নিয়েই আমাদের সংসার—

আরতি বললে—তাহলে কি করে তোমাদের সময় কাটে? ছেলে-মেয়ে হয়েছে নাকি?

উমা হাসলো। বললে—না—

'না' বলার মধ্যেও যেন একটা উদ্ধত অহঙ্কার প্রকাশ পেল উমার গলায়। বললে—ও যে ছেলে-মেয়ে চায় না—

—কেন? তোমার স্বামী ছেলে-মেয়ে চায় না?

উমা বললে—না। ও বলে, ছেলে-মেয়ে এখন এত তাড়াতাড়ি না আসাই ভালো। এখন একটু আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যায় তবু। নইলে সেই তো আজ এটার অসুখ, কাল ওটার পেট-খারাপ—

—তাহলে কি নিয়ে সময় কাটাও?

উমা বললে—বা-রে, কলকাতায় সময় কাটাবার জিনিসের কোনও অভাব আছে নাকি? থিয়েটার, সিনেমা, ক্লাব কত কী আছে—সে কি আর এই আজাদ-নগরের মত?

কলকাতা যে আজাদ-নগরের মত নয় তা আরতি বোসের মত আর কে জানে? ছোটবেলাতেও তো কলকাতাতেই কাটিয়েছে সে।

শুধু ছোটবেলা কেন! এম-এ পাস করা পর্যন্ত তো সেখানেই কেটেছে তার!

তবে আশ্চর্য! যে-কলকাতা থেকে পালিয়ে এখানে এসে আরতি বেঁচেছে, উমা এই আজাদ-নগর থেকে সেই কলকাতায় গিয়েই আবার বেঁচে গেল! একজন কলকাতা ছেড়ে বাঁচলো আর একজন কলকাতায় পৌঁছে বাঁচলো। যে-কলকাতা একদিন আরতির কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল, উমা সেই কলকাতায় গিয়েই ষড়ৈশ্বর্য পেল!

তাহলে আসলে জায়গার মধ্যে কোন দোষ বা গুণ নেই। দোষ বা গুণ সবই মানুষের মনের। এই মনটা নিয়েই মানুষের যত জ্বালা। উমা বললে—আপনি কলকাতার মেয়ে হয়ে আজাদ-নগরের মতন জায়গায় কী করে এতদিন আছেন ভাবতে পারি না আরতিদি। আমার কিন্তু কলকাতা ছেড়ে আর আসতে ইচ্ছে করে না—

আরো সব অনেক কী কথা গড় গড় করে বলে যেতে লাগলো উমা, সমস্তটা কানেও গেল না, কেবল মনে পড়তে লাগলো কলকাতার কথা। সেই কলকাতা! কতকাল কলকাতা

দেখেনি সে। উমার কথায় যেন আবার পুরনো কথাগুলো তার মনে পড়তে লাগলো।

কিন্তু মুখে সে কথা বলতে পারলে না।

শুধু জিজ্ঞেস করলে—তোমার শ্বশুরবাড়িটা কলকাতার কোন্ পাড়ায়?

উমা বললে—কালীঘাটে—

কালীঘাট নামটা শুনে এক মুহূর্তের জন্যে আরতি বোস যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। আর কোন কথা বলতে তার ভয় লাগলো।

কিন্তু উমা ছাড়লো না। বললে—কালীঘাটে কখনও গেছেন?

আরতি বোস বললে—হ্যাঁ—

উমা বললে—সেই কালীঘাটে একটা রাস্তা আছে, ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন—আমার শ্বশুরবাড়ি সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে।

—ও—

বলে আরতি বোস এড়িয়ে চলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ উমা বললে—ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে এক ভদ্রলোক আছেন, তিনি আপনাকে চেনেন কিন্তু—

—আমাকে? কে?

উমা বললে—হ্যাঁ, তার নাম শুভাশিসদা, শুভাশিস সরকার। তিনি আপনার কথা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেমন আছেন, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন, এইসব—আপনি চেনেন তাঁকে?

আরতি বোস ছোট্ট করে বললে—হ্যাঁ চিনি—

উমা বললে—শুভাশিসদাও তাই বলেছেন। তিনি বলেছেন আমার নাম করলেই তোমাদের বড়দিদিমণি চিনতে পারবেন—

আরতি বোস বললে—আচ্ছা এবার চলি, কেমন?

উমা তখনও ছাড়লো না। বললে—তিনি একদিন আসবেন এখানে বলেছেন—

আরতি বোস অবাক হয়ে গেল। বললে—তাই নাকি?

—হ্যাঁ বড়দিদিমণি, আপনার কথা খুব বললেন তিনি। জানতেন না তো যে আমার বাপের বাড়ি আজাদ-নগরে, তখন আমাকে তাঁদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেলেন, শুভাশিসদা এত ভালো লোক কী বলবো বড়দিদিমণি! আপনার ছাত্রী বলে আমারও খাতির খুব বেড়ে গেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আপনার কথা সব জিজ্ঞেস করেন কেবল—।

আরতি বোস এর পর কী বলবে বুঝতে পারলে না।

তারপর একটু থেমে বললে—তুমি আর কতদিন আছ এখানে?

এ প্রশ্নটা যেন নেহাৎ করতে হয় তাই করা। এর জবাব আশা না করেই প্রশ্নটা করেছিল আরতি। কিন্তু উমা যেন জবাব দিতেই তৈরি ছিল এ প্রশ্নের। বললে—আমার এখানে মোটে ভালো লাগে না আরতিদি, কলকাতা ছেড়ে এখানে থাকতে মোটে ভালো লাগে না—ওর আসার কথা আছে কাল, এলেই চলে যাবো, অনেকগুলো নতুন সিনেমা এসেছে কলকাতায়। খবরের কাগজে দেখলুম—

আরতি বললে—ঠিক আছে, আমি এখন আসি উমা, তুমি সুখী হয়েছ শুনে খুশি হলুম, আমি চলি।

যাবার উদ্যোগ করতেই উমা আবার নিচু হয়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে।

আরতি তাকে হাত তুলে আশীর্বাদ করে আবার তার নিজের বাড়ির রাস্তা ধরলে।

যেতে যেতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলো আরতি। এমন তো হয় না। এমন তো কোনও দিনই হয়নি তার। এই এত বছর এখানে এই করে তো কখনও নিজের মনে সংশয় উদয় হয়নি। কেন উমার সঙ্গে দেখা হলো তার! কে-না-কে সুধীরবাবুর মেয়ে! লেখাপড়ায় কাঁচা ছিল বরাবর। প্রমোশনের জন্যে ধরাধরি করতেন সুধীরবাবু প্রতি বছর। প্রতি বছরই বলতেন—উমাকে প্রমোশন দিয়ে দিন মিস বোস, ও তো আর বি-এ এম-এ পাস করে চাকরি করবে না আপনাদের মতন! একটা ভালো মত পাত্র পেলেই ওর বিয়ে দিয়ে দেব, তখন ও সংসার করবে—এই লেখাপড়া তো কোনও কাজে লাগবে না ওর জীবনে—

তা সেই মেয়েই এই উমা। সত্যই সুধীরবাবুর কথা ফলেছে শেষ পর্যন্ত। উমা ফরসা হয়েছে। আরো মোটা হয়েছে। চোখে-মুখে কেমন একটা চঞ্চলতা ফেটে পড়ছে। ওর স্বামীর কথা বলতে গিয়ে লজ্জায় কেমন লাল হয়ে উঠছিল। বিয়ের দিন উমার বরকেও দেখেছিল আরতি। সত্যিই চমৎকার দেখতে। যে-উমা মোটে লেখাপড়া করতে পারতো না, শেষকালে হায়ার সেকেন্ডারিটাও পাস করতে পারেনি, তারই অত ভালো বরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল!

আর তা ছাড়া আসলে তো উমাও তাই চেয়েছিল, উমার বাবা সুধীরবাবুও তাই চেয়েছিলেন। বিয়ে করে সংসার করাই ছিল উমার আদর্শ। তাই-ই সে পেয়েছে।

ভাবতে ভাবতে আরতি নিজের বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলো।

মঙ্গলা দরজা খুলে দিতেই আরতি জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁরে, আমার কোনও চিঠি এসেছে?

—না তো দিদিমণি?

এ-প্রশ্নটা আরতি বাড়িতে ফিরে এসেই করে। কার চিঠি যে আসবে, কেন আসবে, কী জন্যে কে তাকে চিঠি দিতে যাবে, কী খবর সে পেতে চায় তাও জানে না আরতি, তবু প্রশ্নটা করে। আর প্রত্যেকবারেই মঙ্গলা উত্তর দেয়—না তো দিদিমণি!

সেদিন অনেকক্ষণ ধরে পুজোর ঘরের মধ্যে কাটলো আরতি বোসের।

মঙ্গলা বার বার এসে দেখে গেল। পুজোর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ! অন্য দিন ঘণ্টা দুয়েক পরে দরজা খোলে দিদিমণি, সেদিন সাড়ে ন'টা বেজে গেল তবু দরজা খুললে না। একবার ভাবলে, দরজায় টোকা দেবে নাকি? দরজায় ধাক্কা দেবে? নাকি পুজো করতে করতে দিদিমণি ঘুমিয়ে পড়েছে!

কিন্তু না, আরতি বোস নিজেই পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। যখন বেরিয়ে এল তখন রাত দশটা বাজে।

দিদিমণির মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে মঙ্গলা। মুখটা কেমন গম্ভীর-গম্ভীর। বললে—খাবার দেব দিদিমণি?

আরতি বোস বললে—দে—

বলে তার নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। তারপর শাড়ি বদলে যখন খেতে এল তখনও তেমনি গম্ভীর-গম্ভীর। অন্য দিন দিদিমণি খেতে বসে অনেক কথা বলে। বাজারে মাছ কী রকম পাওয়া যায়, কত দাম, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মঙ্গলাকে জিজ্ঞেস করে। বিশেষ করে পরের দিন কী রান্না হবে তারও নির্দেশ দেয়। সকালবেলা উঠেই মঙ্গলা বাজারে

চলে যাবে। তখন আরতি বোস বাথরুমে। তখন জিজ্ঞেস করার সময়ও থাকে না কারো। তাই রাত্রে খাবার সময় আগাম জিজ্ঞেস করে রাখে।

একবার সেই খাবার ফাঁকেই মঙ্গলা জিজ্ঞেস করলে—কালকে কী মাছ আনবো দিদিমণি?

আরতি বোস নিজের মনে খেতে খেতেই বললে—যা ইচ্ছে আনিস—

অথচ মাছ না হলে যে আরতি বোস খেতে পারে না সেটা জানে মঙ্গলা। কথাটা দিদিমণির কাছে শুনে তাই মঙ্গলা একটু অবাকই হয়ে গেল।

আরো কথা বলবার বা শোনবার ইচ্ছেও ছিল মঙ্গলার। কিন্তু কিছুই হলো না। আরতি বোস খেয়ে নিয়ে নিঃশব্দে তার নিজের শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। তার কিছুক্ষণ পরে বাইরের জানলা দিয়ে দেখা গেল আলোটা নিভিয়ে দিলে।

মঙ্গলা দেখে একটু অবাক হয়ে গেল। হয়ত ইস্কুলে কোনও দিদিমণির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। কিংবা কাজের ঝামেলায় দিদিমণির মেজাজ বিগড়ে গেছে।

কিন্তু পরের দিন আবার যথাসময়ে আরতি বোস ঘুম থেকে উঠেছে। তার আর ব্যতিক্রম নেই। সকালবেলা উঠেই স্নান সেরে নিয়েছে। তারপর ছাদে চলে গিয়েছে সূর্য-প্রণাম করতে। সূর্যটা তখনও আকাশে ভালো করে ওঠেনি। তা হোক, তবু সূর্য-প্রণাম না করে দিনের কাজ তো শুরু করা যাবে না।

সেই তখন থেকেই আরতি বোসের দৈনন্দিন কাজ শুরু হয়ে যাবে। তখন থেকে সারাদিন মাথার মধ্যে কেবল স্কুল আর স্কুল। তখন চা খেয়ে একেবারে সোজা চলে যেতে হবে প্রেসিডেন্টের বাড়ি। সেক্রেটারি অবশ্য আছেন, কিন্তু আজাদ-নগর গার্লস স্কুলের নিয়ম অন্য রকম। প্রেসিডেন্ট দেবব্রতবাবুই সব। সেই দেবব্রতবাবুকে গিয়ে কাগজপত্র খাতা-ফাইল সব দেখিয়ে আনতে হবে। কিছু সই-সাবুদ করার থাকলে তা করিয়ে নিতে হবে। দেবব্রতবাবু আবার তেমনি অন্য স্কুলের প্রেসিডেন্টের মত নন। অন্ধভাবে তিনি কিছুতে সই করবেন না। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এটা কী, ওটা কী, এটা এখানে কেন হলো, ওটা ওখানে কী করতে এলো। এমনি নানান প্রশ্ন। তিনি রিটায়ার্ড মানুষ। আরতি বোসের সঙ্গে কথা বলতে পারলে আর ছাড়তে চাইবেন না আরতি বোসকে।

দেবব্রতবাবু কাগজগুলোতে সই করতে করতে বললেন—পরীক্ষার ব্যাপারটা নিয়ে কিছু ভেবেছ?

আরতি বোস বললে—ভেবেছি। আপনার কথাই ঠিক। এবার টিচারদের সবাইকে বলে দিয়েছি প্রশ্নপত্র করে যেন আমার কাছে দেয়।

দেবব্রতবাবু বললে—হ্যাঁ—তুমি ওগুলো সব আমাকে দেবে। আমি নিজে দেখে 'ও-কে' করে দিলে ছাত্রীদের পরীক্ষায় বসতে দেবে—

ততক্ষণে সই-সাবুদ করা হয়ে গিয়েছে।

আরতি বোস উঠছিল। বললে—আমি আসি তাহলে—

দেবব্রতবাবু বললেন—হ্যাঁ, একটা কথা বলতে আমি ভুলে গিয়েছি তোমাকে, শোন। কাল তোমাকে আর আমার বাড়িতে আসতে হবে না, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে। আমার ছেলে কাল জার্মানী থেকে আসছে—

এ-কথার উত্তরে আরতি বোসের কিছু বলবার ছিল না।

কিন্তু দেবব্রতবাবুর বোধহয় আরো কিছু বলবার বাকি ছিল। তিনি বলতে লাগলেন—তুমি আমার ছেলেকে দেখনি তো? দেখেছ ছেলেকে?

আরতি বোস বললে—না—

দেবব্রতবাবু বললেন—তা কী করেই বা দেখবে! সে তো এখানে কখনও আসেনি। ছোটবেলা থেকেই সে বাইরে বাইরে লেখাপড়া করেছে। প্রথমে দার্জিলিঙে, তারপর কলকাতায়। তারপর স্কলারশিপ্ নিয়ে ফরেনে চলে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে রিসার্চ করে ডক্টরেট পেয়েছে। এখন ইণ্ডিয়ায় চাকরি নিয়ে এসেছে। ইণ্ডিয়া গভর্মেন্ট তাকে অনেক খোসামোদ করে ডেকে এনে দিল্লীতে চাকরি দিচ্ছে—

আরতি বোস বললে—দিল্লীতে?

দেবব্রতবাবু বললেন—হ্যাঁ, দিল্লীতে। আর দিল্লীতে থাকাই তো ভালো মা। দিল্লীই তো ইন্ডিয়ার রাজধানী, প্রথম বয়েসে রাজধানীতে থাকাই ভালো। তাতে বড় বড় লোকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা যায়। ভি-আই-পি-দের চাক্ষুষ দেখাশোনা চেনা-জানা হয়। তাদের ক্লোজ টাচে আসা যায়। আর সারাজীবন যখন চাকরিই করতে হবে তখন রাজধানীতে থাকাই তো ভালো—

আরতি বোস 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বললে না।

কিন্তু দেবব্রতবাবু তবু ছাড়লেন না। নিজের ছেলের গুণপনা প্রচার করতে পেলে কোন্ বাপই বা ছাড়ে।

বললেন—আর তাছাড়া, আমি একটা কাজ করেছি। ছেলের বিয়েটাও দিয়ে দিয়েছি। নইলে শেষকালে বিলেতে গিয়ে কোথায় কোন্ হেঁজিপেঁজি এক মেমকে বিয়ে করে আনবে! তাই বাঙালী মেয়ে দেখে একটা বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। নইলে আজকাল আবার অন্য স্টেটের মেয়েরাও ভালো ছেলেগুলোর পেছনে লেগেছে, তা সে যে-জাতেরই হোক। ছেলে-মেয়ের একটু সকাল সকাল বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ভালো, কী বলো! আমি ঠিক করিনি?

কথাটা আরতি বোসের বুকে গিয়ে যেন খট্ করে বিঁধলো। তার মনে হলো কথাটি যেন তাকে লক্ষ্য করেই বলা হলো। কিন্তু সে যে এখনও বিয়ে করেনি সে কি বিয়ে করতে অনিচ্ছুক বলে, না তাকে কেউ বিয়ে করেনি বলে? নাকি সংসারে তার বিয়ে দেবার কেউ নেই বলে? কোন্টা সত্যি তার জীবনে? ভাবতে ভাবতে তার সমস্ত মাথাটা গতকালকার মত আবার গরম হয়ে উঠলো। তবু কয়েক ঘণ্টা পুজোর ঘরে একমনে ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে তার মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছিল। উমার কথাগুলো শুনেও ঠিক তার এমনি হয়েছিল। কেন এ-রকম হয় তার আজকাল?

দেবব্রতবাবু বুঝতে পারলেন তিনি মিছামিছি তাঁর নিজের ব্যক্তিগত কারণে আরতি বোসকে আটকে রেখেছেন।

বললেন—না না, মিছামিছি তোমাকে আর আটকে রাখবো না—তুমি এসো, তোমার স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাবে—

আরতি বোস ছাড়া পেয়ে দেবব্রতবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেন মুক্তি পেল।

***

কিন্তু আশ্চর্য, কেন যে সেদিন আরতি গলিপথ দিয়ে তার বাড়িতে গিয়েছিল কে জানে! যে-রাস্তা দিয়ে গেলে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় সে-পথে তো কখনও যায়নি! তাহলে কেন সে সেদিন ও-পথে হাঁটতে গিয়েছিল।

আর ওখান দিয়ে না গেলে তো উমার সঙ্গে দেখাও হতো না তার। আর উমার সঙ্গে দেখা না হলে এত পুরানো কথা মনেও পড়তো না।

সত্যিই সেই সব পুরানো স্মৃতি আর সেই সব পুরানো দিন!

শুভাশিস তার জীবনে সোজা পথে এসেছিল বলেই হয়তো আরতি বোস আজ এখানে এমন করে এই আজাদ-নগর গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হয়েছে আজ। নইলে তো এখন সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে কারো রান্নাঘরের মধ্যে কিংবা কোনও আঁতুড়ঘরের কোণে দিন কাটাতে হতো তাকে।

শুভাশিস বলতো—তাহলে আমি কী করবো?

আরতি বলতো—তুমি? তুমি কী করবে তা আমি কি জানি? তুমি কি আমার হুকুম মেনে চলবে?

শুভাশিস বলতো—তা এতদিন আমি কি তোমার কোনও হুকুম অমান্য করেছি?

শুভাশিস ওই এক-রকমের ছেলে। শুভাশিসকে কেন যে ভগবান সংসারে পুরুষমানুষ করে পাঠিয়েছিল কে জানে!

পিসীমা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ রে, ও কে? ও ছেলেটা কে তোর? কী করতে আসে তোর কাছে?

আরতি বলতো—ও একটা ছেলে—এমনি আসে।

পিসীমা বলতো—তা তো বুঝলুম। কিন্তু ও তোর বন্ধু?

আরতি বলতো—বন্ধু না ছাই। বন্ধু হলে আমি ওর সঙ্গে এমনি করে কথা বলি? তুমি ওকে বলে দাও পিসীমা যে আমার এখন শরীর খারাপ, আমি দেখা করতে পারবো না—

পিসীমা বলতো—তা এই সক্কালবেলা আমি মিথ্যা কথা বলবো?

আরতি বলতো—তা মিথ্যে কথা বলতে দোষ কী!

পিসীমা বলতো—আমি এই সকালবেলা গঙ্গাস্নান করে এলুম, হাতে হরি-নামের ঝোলা রয়েছে, এই অবস্থায় মিথ্যে কথা কারোর মুখে বেরোয়?

আরতি বলতো—তোমার ইচ্ছে হয় বলবে, না ইচ্ছে হয় না বলবে, আমি এখন যেতে পারবো না—

পিসীমা আর কী করবে! সদরে গিয়ে বলতো—না বাছা, তার সঙ্গে এখন দেখা হবে না, তার শরীর খারাপ।

শুভাশিস তখনও চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আরতির কথাগুলো পিসীমার মুখ দিয়ে শুনে শুভাশিস বুঝলো। তারপর যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে আবার চলে গেল।

তখন আরতি খুব ছোট। ছোট বলতে অপরিণত-বুদ্ধি। কিসে নিজের ভালো কিসে নিজের মন্দ তা বুঝতে পারতো না। তখন কেবল ভাবতো কী করে ভালো করে স্কুলে পাস করবে, কী করে পরীক্ষায় ফার্স্ট হবে। তারপর তার পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া দেখে

সবাই তাকে বাহবা দেবে, সবাই বলবে—বাঃ, কী চমৎকার মেয়ে আরতি—

শুভাশিস সরকার। ছোট নাম। মানুষটা আরো ছোট। ক্লাসের এক বন্ধুর বাড়িতে প্রথম দেখে শুভাশিসকে। তার বন্ধু সরসী তার নিজের জন্মদিনে আরতিকে নেমন্তন্ন করেছিল। সেখানে আরো অনেকে এসেছিল। সে-আসরে শুভাশিস এসেছিল গান গাইতে।

সরসী পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল—এই হচ্ছে আমার মাসতুতো ভাই শুভাশিস, আর এ হচ্ছে আমার ক্লাসের বন্ধু আরতি। আরতি বোস—

ছেলেটা হাতজোড় করে নমস্কার করেছিল আরতিকে।

আরতিও নমস্কার করেছিল। বলেছিল—আপনি বেশ গান করতে পারেন, আপনার গান আমার খুব ভালো লাগলো—

শুভাশিসের মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। নিজের গানের প্রশংসা শুনে শুভাশিসের সেদিন এত লজ্জা হয়েছিল যে এর জবাবে মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয়নি তার।

জন্মদিনের পার্টি সেদিন সেখানেই খতম হয়ে গিয়েছিল। তারপর যে-যার বাড়ি চলে গিয়েছিল খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ করে।

এ-রকম কত ঘটনা ঘটে মানুষের জীবনে। এই সব সামান্য ঘটনা যখন ঘটে ঠিক তার পরের মুহূর্তে আবার তা চিরকালের মত জীবন থেকে মুছে যায়। এই সব ছোট ছোট ঘটনা বা দুর্ঘটনা নিয়েই তো মানুষের জীবন। এই ঘটনাসমষ্টিই তো মানুষকে একদিন মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ করে দেয়, আবার কখনও বা মানুষকে অতল গহ্বরে নামিয়ে দিয়ে অমানুষ করে তোলে।

কিন্তু আরতি বোসের বেলায় তা হলো অন্যরকম।

আর অন্যরকম হলো বলেই এই আরতি বোসকে নিয়ে আজ এই গল্প লেখবার প্রচেষ্টা। নইলে কোথাকার কোন্ আজাদ-নগর, আর কোথাকার কোন গার্লস স্কুল, তা নিয়ে কার মাথাব্যথা করবার এত দায়!

সেই সামান্য ঘটনার বোধহয় দু'দিন পরেই একদিন আরতিদের বাড়ির দরজায় একটা টোকা পড়লো।

পিসীমা ভেতর থেকে বললে—কে?

বাইরে থেকে উত্তর এল—আমি—

পিসীমা ঝাঁঝিয়ে উঠলো—এই সাত-সকালে আবার ঘুঁটেওয়ালা এসেছে রে! আমি পই-পই করে বললুম ঘুঁটে নেব না, তবু...

তারপর দরজা খুলতে খুলতে পিসীমা বক-বক্ করছিল—তুমি সক্কালবেলা কী করতে এলে শুনি? তোমাকে আমি পই-পই করে বলেছি না যে আমার ঘুঁটের দরকার নেই...

কিন্তু মুখের কথাটা অসমাপ্ত রেখেই পিসীমা হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বললে—কে? কে তুমি? কাকে চাও?

বুড়ি পিসীমার বয়স হয়েছে। চোখে ভালো দেখতেও পায় নায়। কিন্তু এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে যাকে ঘুঁটেওয়ালা বলে এত বকাঝকা করছে আসলে সে লোকটা ঘুঁটেওয়ালাই নয়। অন্য কেউ।

ছেলেটা জিজ্ঞেস করলে—আরতি বোস আছেন?

পিসীমা অবাক হয়ে গেল। তার ভাইঝিকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে কে কথা বলে!

তারপর বাড়ির ভেতরের দিকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বললে—ওরে আরতি, তোকে কে ডাকছে দেখ্—

তখনও আরতির ভালো করে ঘুম ভাঙেনি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে ঘুমের জড়তা ভাঙছিল।

ডাক শুনে বাইরে এসে শুভাশিসকে দেখেই অবাক।

—ওমা, আপনি!

আরতি যত না লজ্জায় পড়েছে, শুভাশিস তার চেয়েও বেশি লজ্জায় পড়েছে।

বললে—আমি বোধহয় একটু অসময়ে এসে পড়েছি। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন। আমি যাই, আর একদিন বরং আসবো—

আরতি বললে—না, তাতে কী হয়েছে, আমার বরাবর দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যেস। আপনি যাবেন না, বসুন, আমি একটু মুখে-চোখে জল দিয়ে আসি—

শুভাশিসের তবু আড়ষ্টতা গেল না।

বললে—না না, আমার ভারি লজ্জা করছে, আমার আর একটু দেরি করে এলেই ভালো হতো—

শেষকালে আরতিও ছাড়বে না, শুভাশিসও আসবে না। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা কাটাকাটির পর আরতিরই জয় হলো। শুভাশিসকে এনে ঘরে বসালো। মাত্র একখানা ঘর পিসীমার বাড়িতে। একটা ঘরে পিসী-ভাইঝি দু'জনের শোওয়া, আর একটা ঘরে ছোট সংসারের যাবতীয় টুকিটাকি, বাক্সপ্যাঁট্‌রা, সব কিছু সরঞ্জাম।

মেঝের উপর একটা মাদুর পেতে শুভাশিসকে বসতে দিলে আরতি। তারপর নিজে তাড়াতাড়ি কলতলা থেকে মুখ-হাত-পা-চোখ ধুয়ে এসে সামনে বসলো।

জিজ্ঞেস করলে—আমাদের বাড়ি খুঁজে বার করলেন কী করে?

শুভাশিস বললে—সরসীর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছিলুম—

আরতি বললে—তা হঠাৎ আমার ঠিকানা নিতে গেলেন কেন?

এর জবাব সেই মুহূর্তে দিতে পারলে না শুভাশিস। জবাব দিতে যেন সঙ্কোচ হতে লাগলো তার।

আরতি বললে—কই, জবাব দিচ্ছেন না যে!

শুভাশিস বললে—আমার একটা কথা জানবার ছিল আপনার কাছে—

—বলুন না, কী কথা?

শুভাশিস বললে—সেদিন যে আপনি বললেন আমার গান আপনার খুব ভাল লেগেছে, তা সত্যিই আমার গান ভাল লেগেছিল আপনার?

আরতি বললে—বা রে, আপনি তো দেখছি ভারি অদ্ভুত লোক—

—কেন?

—অদ্ভুত নয়? এই সামান্য কথাটা জিজ্ঞেস করতে আপনি এত কষ্ট করে আমাদের বাড়িতে এলেন? আপনি থাকেন কোথায়?

—কালীঘাটে।

আরতি বললে—ওমা, সেই কালীঘাট থেকে এখানে এলেন এই সামান্য কথাটা জিজ্ঞেস করতে! এ-কথাটা তো আপনি সরসীকে দিয়েও জিজ্ঞেস করতে পারতেন! এর জন্যে আপনার নিজের আসার কী দরকার ছিল!

এতক্ষণে যেন শুভাশিস লজ্জায় পড়লো। এই সামান্য কারণে সরসীর বন্ধুর বাড়িতে আসা এবং এত ভোরবেলা আসাটা যে অন্যায় হয়েছে তা যেন সে বুঝলো।

বললে—সত্যিই আমি বুঝতে পারিনি, আমি বড় অসময়ে এসে পড়েছি, আমি বরং এখন উঠি--

—না, উঠবেন কেন, আপনি বসুন।

বলে আরতি নিজেই উঠলো। তারপর বললে—আপনি ভোরবেলা এসেছেন, নিশ্চয়ই পেটে কিছু পড়েনি, আমি আপনার জন্যে কিছু খাবার ব্যবস্থা করি—

—না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না—বলে শুভাশিস আপত্তি করতে যাচ্ছিল। কিন্তু আরতিও ছাড়বে না। ভেতরে গিয়ে শুভাশিসের জন্যে জলখাবারের বন্দোবস্ত করে এল। মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিজের পরনের শাড়িটাও বদলে নিয়ে তারপর মাথার চুলটা আঁচড়ে মুখটা ঘষে-মেজে এল।

এসে আবার সামনে বসলো।

বললে—আপনি দেখছি খুবই লাজুক ছেলে—

শুভাশিস বললে—না, লাজুক নই, আমার খুব গায়ক হবার ইচ্ছে। জানেন, আমি দিন-রাত গান গাইতে ভালবাসি। আমার গান অনেকের ভাল লাগে না, কেউ কেউ ভাল বলে—

ইতিমধ্যে জলখাবার এল। শুভাশিস বললে—আপনি এত আদর-আপ্যায়ন করলে কিন্তু আর কখনও আসবো না।

আরতি বললে—আজকে আপনি প্রথম এসেছেন তাই, নইলে শুধু চা দিয়ে অতিথি-সৎকার করে ছেড়ে দিতুম—নিন, খেয়ে নিন—

শুভাশিস বললে—চা-ও আমাকে দিতে হবে না। আমি চায়ের ভক্ত নই তত—

বলে খাবারগুলো মুখে পুরে দিতে লাগলো। খেতে খেতে নিজের গানের কথা একনাগাড়ে বলে যেতে লাগলো। বাড়িতে কেউ তার গান গাওয়া পছন্দ করে না। পাড়াতেও কেউ তার গান গাওয়ার প্রশংসা করে না।

বললে—সেদিন যে গানগুলো শুনলেন না, ওগুলো সবই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কাউকে না জানিয়ে শিখেছি।

—আপনার গুরু কে? কার কাছে গান শেখেন আপনি?

শুভাশিস বললে—কারোর কাছে না। আমি নিজেই আমার গুরু। আমি রেডিও রেকর্ড শুনে শুনে কপি করি। লোকেও জানতে পারে না। রাস্তার ধারে দোকানের রেডিওতে গান শুনি। আর তারপর গঙ্গার ধারে চলে যাই, সেখানে কেউ থাকে না, সেখানে গলা ছেড়ে গান গাইলেও কেউ জানতে পারে না।

শুভাশিসের কথা শুনতে শুনতে আরতি সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছেলেটাকে ভালোও লেগে গিয়েছিল খুব। সেদিন খানিকক্ষণ বসার পর শুভাশিস বাড়ি চলে গিয়েছিল। কিন্তু সম্পর্কটা সেখানেই শেষ হয়নি। তারপরও এসেছিল। তারপর আরও অনেক দিন এসেছিল। শেষকালে সরসীও জানতে পারতো না যে শুভাশিস আরতির সঙ্গে অত মেলামেশা করে। কখনও কলেজের ক্লাসের পর, কখনও শীতের দিনের দুপুরবেলা। আবার কখনও গঙ্গার ধারে। সুযোগ পেলেই শুভাশিস গান শোনাতো, আর আরতি শুনতো।

শুভাশিস প্রত্যেকবার গান শেষ করে জিজ্ঞেস করতো—আচ্ছা তোমার কি মনে হয়, আমার গান হবে?

আরতি বলতো—নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু পেট চালাবে কী করে? একটা চাকরিবাকরি তো কিছু করা চাই!

শুভাশিস বলতো—কেন, গান গেয়ে তো কত লোক পেট চালায়, আমিও না-হয় তেমনি করেই চালাবো—

আরতি বলতো—কিন্তু তার আগে? যতদিন না নাম হয় ততদিন? ততদিন তো পেট চলা চাই!

শুভাশিস বলতো—তার আগে একটা রেকর্ড-কোম্পানীর সঙ্গে আজকাল দেখাশোনা করছি। প্রথমে অবশ্য পঞ্চাশ টাকার মতন নিজের পকেট থেকে দিতে হবে। সে রেকর্ড যদি বিক্রী হয় তাহলে অনেক টাকা হবে। তখন হয়তো লোকে স্বীকার করবে যে শুভাশিসটার কিছু দাম আছে—

তখনকার দিনে আরতির যখনই অবসর হতো শুভাশিস তার পেছন পেছন ঘুরতো। কলেজের বাইরে ধু-ধু করছে রোদ্দুর, সেইখানে শুভাশিস একলা দাঁড়িয়ে আছে। কখন আরতি বেরোবে, তার আশায় দাঁড়িয়ে থাকতো। এমনি মাসের পর মাস। বছরের পর বছর।

আসলে পাগলামির শেষ ছিল না শুভাশিসের।

কখনও একটা কি দুটো টাকা পেলেই আরতির জন্যে কোনও একটা জিনিস আনতো পকেটে করে।

বলতো—তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি আরতি—

—কী জিনিস?

শুভাশিস বলতো—কী জিনিস তুমি আন্দাজ করো তো?

আরতি বলতো—বা রে, তুমি লুকিয়ে কী জিনিস এনেছ আমি কি করে জানবো? আমার কি দিব্যদৃষ্টি আছে?

শুভাশিস আরতিকে খুব ঠকাতে পেরেছে এমনি ভাবে পকেট থেকে জিনিসটা বার করে দেখাতো।

আরতি দেখতো। বলতো—আরে, এ তো চকোলেট, এ আবার তুমি আমার জন্যে আনতে গেলে কেন! আমি কি বাচ্চা মেয়ে যে চকোলেট খাবো!

শুভাশিস বলতো—তুমি যে সেদিন বলেছিলে, চকোলেট খেতে তোমার খুব ভালো লাগে?

কবে একদিন আরতি কথায়-কথায় বলেছিল যে সে ছোটবেলায় খুব চকোলেট খেতে ভালোবাসতো, সে-কথাটা যে শুভাশিস এতদিন মনে করে রাখবে তা কে জানতো!

আরতি বললে—সে তো ছোটবেলাকার কথা। ছোটবেলায় তো সবাই চকোলেট খেতে ভালবাসে। এখন কি আমি আর সেই ছোট আছি? এখন তো আমি বুড়ো ধাড়ি—

শুভাশিস রাগ করতো, বলতো—তুমি ধাড়ি না ছাই, তুমি কখনও ধাড়ি হতে পারো না। আমার কাছে তুমি এখনও কচি আছো আরতি। চিরকাল তুমি আমার কাছে কচি থাকবে, কখনও পুরনো হবে না—

আরতি বলতো—ও সব তোমার মুখ-রাখা কথা। সত্যি বলো তো এত জিনিস থাকতে চকোলেট কিনতে গেলে কেন?

শুভাশিস বলতো—সত্যি বলছি, তোমাকে অনেক দিন থেকে আমার একটা কিছু দিতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু দোকানে যে জিনিসই কিনতে যাই তারই অনেক দাম চেয়ে বসে। শেষকালে আজ পুরনো খবরের কাগজ বেচে তিনটি টাকা পেয়েছিলুম, তার মধ্যে একটা টাকা রইল বাসভাড়ার জন্যে আর দু'টাকা দিয়ে এই চকোলেট—

আরতি শুভাশিসের কাণ্ড শুনে অবাক। বললে—এত জিনিস থাকতে এই চকোলেট! অন্য কিছু পেলে না?

শুভাশিস বললে—দু'টাকার মধ্যে আর কী পাবো বলো?

এর জবাব আরতি আর কী দেবে! এর পরে আর কোনও কথা হয়নি ও নিয়ে। সেই চকোলেট গঙ্গার জলের ধারে বসে দুজনে খেয়েছিল, আর তারপর অনেক রাত হলে পর আবার যে-যার বাড়ি চলে গিয়েছিল।

পিসীমা প্রায়ই বকতো—হ্যাঁ রে, এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকিস তুই! কী এত কাজ বল তো তোর!

আরতি বলতো—বা রে, আমি তো তোমাকে বলেছি আমি কী কাজ করি—

পিসীমা মনে করতে পারতো না। বলতো—কী কাজ করিস তুই?

আরতি বলতো—তুমি জানো না আমি টিউশানি করি?

—তা এই রাত দুপুর পর্যন্ত মেয়ে পড়াতে লাগে? তুই এত রাত করে এলে আমার ভয় করে না? দিনকাল কি ভালো?

আরতি বলতো—তা টাকা উপায় করতে গেলে কি ও-সব ভাবলে চলে? আগে টাকা, তবে তো অন্য কিছু। টিউশানি না করলে কোত্থেকে শাড়ি-ব্লাউজ, খাওয়া, কলেজের মাইনে চলবে?

শেষকালে হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড করে বসলো শুভাশিস।

একদিন সন্ধ্যেবেলা একটা কাগজে মোড়া বাণ্ডিল নিয়ে এসে হাজির।

এসে বললে—এটা তোমার জন্যে এনেছি আরতি—

আরতি বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে বললে—এটা কী? কী আছে এতে?

শুভাশিস বললে—খুলেই দেখ না—

আরতি ওপরের সুতোটা খুলে ফেলে দেখে—একটা চান্দেরী শাড়ি। শাড়িটা ভারি চমৎকার দেখতে। বললে—হঠাৎ এটা আমাকে দিলে যে?

শুভাশিস বললে—হঠাৎ বলছো কেন? তোমার জন্মদিন আজকে, তা জানো না?

—আমার জন্মদিন?

আরতির নিজেরও মনে ছিল না তার নিজের জন্ম-তারিখটা।

বললে—তা আমার জন্ম-তারিখটা তুমি জানলে কী করে?

—বা রে, সেই যে সরসীর জন্মদিনে তুমি গিয়েছিলে, তখন তুমিই তো সরসীকে তোমার জন্ম-তারিখটা বলেছিলে, মনে নেই?

আরতি শুভাশিসের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

—তা সে কথা তো বলতে গেলে কারোরই মনে নেই, আমারও মনে থাকে না সব সময়ে। আর তুমি এমনই পাগল যে সেটা মনে করে রেখে দিয়েছ!

শুভাশিস যেন নিজের স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতার প্রমাণ দিতে পেরে গর্ব বোধ করলে।

বললে—তোমার জন্ম-তারিখ আমি কখনও ভুলে যেতে পারি? তাহলে আর তুমি

আমাকে পাগলা বলো কেন?

আরতি বললে—না, আমি তোমায় ঠাট্টা করে পাগল বলতুম, এখন দেখছি তুমি সত্যিই একটা আস্ত পাগল। আমার মত তুচ্ছ মেয়ের কথা তুমি এত ভাবো।

তারপর একটু থেমে বললে—তা এ শাড়ির দাম কত নিলে?

শুভাশিস বললে—খুব বেশি নয়। টাকার অঙ্ক শুনে তোমার কী লাভ! পঁচাত্তর টাকা। শাড়িটা তোমার পছন্দ হচ্ছে কিনা তাই আগে বলো।

আরতি বললে—জিনিসটা তো ভালো, কিন্তু পঁচাত্তর টাকা দিয়ে তুমি আমার জন্যে শাড়ি কিনতে গেলে কেন? এত টাকা কোথায় পেলে?

শুভাশিস চুপ করে রইলো।

তারপর অপরাধীর মত বললে—আমি একটা চাকরি করি।

—চাকরি? কী চাকরি? কত টাকার মাইনের চাকরি?

শুভাশিস বললে—পঁচাত্তর টাকা।

আরতি অবাক হয়ে গেল। যেন আকাশ থেকে পড়লো সে।

বললে—কী কাজ? কেরানীগিরির চাকরি কেন নিতে গেলে তুমি? তুমি যে বলেছিলে তুমি গায়ক হবে? গান গেয়েই টাকা উপায় করবে?

শুভাশিস সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে গেল। বললে—কিন্তু আমি কী করবো? গান শিখতে গেলেও তো টাকা লাগবে! বিনা পয়সায় গান শেখায় কেউ! সে-টাকাই বা আমি কোথায় পাবো? মাসে অন্তত তিরিশ টাকা দিতে হবে গানের মাস্টারকে। সেই টাকাটা তো অন্তত আমি কেরানীগিরির চাকরি করে উপায় করতে পারবো: তা এই টাকাটা হচ্ছে আমার প্রথম মাসের মাইনে। প্রথম মাসের মাইনেটা আমি খরচ না করে তাই দিয়ে তোমার জন্যে এই শাড়িটা কিনে আনলুম—

আরতি বললে—তা আমার জন্যে শাড়ি কিনতে তোমাকে কে বললে?

শুভাশিস বললে—কে আবার বলবে! তোমাকেজীবনের প্রথম চাকরির প্রথম মাসের মাইনে দিয়ে শাড়ি কিনে দেব, এ কি আর আমাকে কেউ শিখিয়ে দেবে! না শিখিয়ে দেবার জিনিস! তোমার কাছে থাকতে যে আমার ভালো লাগে এ কি কেউ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল!

এর পর আরতির আর কী বলবার থাকতে পারে?

আরতি বললে—তুমি সত্যিই পাগল! তুমি সত্যিই একটা আস্ত পাগল—

শুভাশিস বললে—তবু তুমি আমাকে পাগল বলছো?

আরতি বললে—পাগল বলবো না তো কী বলবো! পাগল না হলে আমার মত একটা তুচ্ছ মেয়ের জন্যে তুমি তোমার জীবনটা নষ্ট করছো! আমি একটা সামান্য মেয়ে বই তো কিছু নই। আমার না আছে কোন রূপ, না আছে কোনও গুণ, আমার সঙ্গে মিশে সময় নষ্ট না করে তুমি যদি এম-এ পরীক্ষা দিতে তাহলে আরো কত বড় চাকরি পেতে। তেমন রেজাল্ট করতে পারলে কোনও কলেজে একটা প্রফেসারি পেতে পারতে। তা নয়, দিনরাত আমার কথা ভাবা, আমার সঙ্গে মেশা, একে পাগলামি বলবো না তো কী বলবো! যাও, কাল থেকে তুমি আর আমার বাড়িতে আসবে না। আমি তোমাকে তোমার জীবনটা নষ্ট করতে দেব না। যাও—

বলে আরতি শুভাশিসকে সেইখানে রেখেই সোজা নিজের বাড়িতে চলে এসেছিল।

***

বাড়িতে আসতেই অন্য দিনের মত পিসীমা দরজা খুলে দিয়েছে।

কিন্তু ভাইঝির মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেছে পিসীমা। অন্যদিন কত হাসি-খুশি থাকে ভাইঝি। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ-পা ধুয়ে খেতে দিতে বলে। কিন্তু মেয়ের মুখটা যেন কেমন গম্ভীর গম্ভীর। পিসীমার সঙ্গে একটা কথাও না বলে সোজা খাটের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়লো। এমন তো হয় না। আর এত সকাল-সকাল তো কখনও বাড়ি ফেরে না ভাইঝি!

পিসীমা আরতির কাছে গিয়ে বললে—কী রে, আজ যে এত সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে এলি?

আরতি উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে ছিল। পিসীমার কথার কোনও উত্তরই দিল না।

পিসীমা আবার বললে—কী রে, কথার জবাব দে? কী হলো তোর? চাকরি চলে গেছে?

আরতি বললে—না—

পিসীমা বললে—তাহলে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে এলি কেন? তুই তো রোজ মেয়ে পড়াতে যাস! পড়ানো শেষ হয়ে গেল?

আরতি তবু বললে—না—

—তাহলে? তা মেয়েরা বুঝি পাস করে গেছে? নাকি মেয়েদের পরীক্ষা হয়ে গেছে? তা তুই অত ভাবছিস কেন? আমার কি টাকার অভাব ভেবেছিস! তুই ভাবছিস তোর চাকরি চলে গেছে, তুই খেতে পাবি না? ওরে তা নয়, তোর পিসেমশাই আমার নামে ব্যাঙ্কে যে-টাকা রেখে গেছে তার সুদ থেকে আমাদের পিসী-ভাইঝির দুজনের খুব ভালো করে পেট চলে যাবে। তোর কিছু ভাবনা নেই। নে ওঠ্, খেয়ে নে—

তবু আরতি উঠলো না। আরতির কেবল মনে হতে লাগলো তার জন্যে আর একটা জীবন কেন নষ্ট হবে? শুভাশিস ম্যাট্রিকে কত ভালো রেজাল্ট করেছিল, বি-এ পরীক্ষাই শুধু খারাপ হয়ে গিয়েছিল শুভাশিসের। তা খারাপ তো হবেই। সমস্ত দিন রাত আরতির কথা ভাবলে কেউ ভালো করে পাস করতে পারে?

তা সেই যে বি-এ পরীক্ষা দেবার পর শুভাশিসের মন খারাপ হয়ে গেল, তার পরে আর পড়তো না। আরতি অনেকবার বলেছিল—তুমি এম-এটা পড়ো, পড়ে ভালো করে পাস করো। পড়লেই ফার্স্ট ক্লাস পাবে।

শুভাশিস বলতো—আমার আর কিছু ভালো লাগে না আরতি—

আরতি অবাক হয়ে যেত। জিজ্ঞেস করতো—কেন, ভালো লাগে না কেন? ভালো না-লাগার কারণ কী?

শুভাশিস বলতো—বই নিয়ে পড়তে বসলেই কেবল বইয়ের পাতার ওপর তোমার মুখটা ভেসে ওঠে—

আরতি বলতো—তা আমিই যদি তোমার লেখাপড়ার বাধা হই তো তাহলে আমার কাছে তুমি আর এসো না।

শুভাশিস বলতো—তাও তো অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারি না যে। তোমার জন্যে আমার গান গাইতেও মন লাগে না, লেখাপড়াতেও মন লাগে না—

ঠিক এমনি সময়ে একদিন হঠাৎ সরসী তাদের বাড়িতে এল। সরসী এমনিতে কখনও আসে না। তার কবে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল! তখন সে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতো। শ্বশুরবাড়িও ছিল তার কলকাতার বাইরে। বলতে গেলে বহু বছর দেখাই হয়নি তার সঙ্গে।

সরসী এসেই বললে—তোর সঙ্গে একটা কথা আছে ভাই আরতি—

এতদিন পরে দেখা পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। বিয়ের পর আর দেখা হয়নি। কিন্তু বিয়ে করলে যে কেউ এত বদলে যায় তা সরসীকে দেখেই প্রথম বুঝেছিল আরতি। বিয়ের এতদিন পরে দেখা, কোথায় সে দুটো ভালো কথা শোনাবে, তার শ্বশুরবাড়ির গল্প করবে, নয়ত তার স্বামীর গল্প, তা নয়, সরসীর মুখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল আরতি।

আরতি জিজ্ঞেস করলে—অত তাড়াহুড়ো কেন তোর? এতদিন পরে এলি, একটু বোস্, দুটো মিষ্টি কথা শোনা, তা নয়, শুধু যাই-যাই করছিস কেন?

সরসী বসলো না।

বললে—না ভাই, আজকে আর বসবো না, অন্যদিন বরং হাতে অনেক সময় নিয়ে এসে বসবো তোর কাছে, আজ একটা বিশেষ কাজে এসেছি তোর কাছে—

—বিশেষ কাজ? আমার কাছে?

সরসী বললে—হ্যাঁ—

—কী বিশেষ কাজ রে?

সরসী বললে—তুই শুভাশিসকে চিনিস?

আরতির চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে এল। কী যেন সন্দেহ হলো তার। ভালো করে সরসীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে।

—কী রে, কথা বলছিস না যে? আমার কথার জবাব দে?

আরতি বললে—হ্যাঁ, চিনি।

সরসী বললে—শুধু চিনিস তাই-নয়, খুব ভালো করেই চিনিস—

আরতি বললে—কেন? ওকথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

সরসী বললে—কারণ আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি। তুই বল্ যে ভালো করে তুই শুভাশিসকে চিনিস!

—হ্যাঁ, ভালো করেই চিনি।

সরসী বললে—তা কই, আমাকে তো তুই কখনও তা বলিসনি? আমার চেয়ে কি শুভাশিস তোর বেশি আপনার হলো? তুই আমার বন্ধু হয়ে আমারই এত বড় সর্বনাশ করবি তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি—

আরতি বললে—আমি তোর সর্বনাশ করেছি?

—তা সর্বনাশ করিসনি? শুভাশিস তো আমারই ভাই। আমার মাসিমার একমাত্র ছেলে। আমি তোর সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলুম। সে কত ভালো গান গাইতে পারতো! সেই গানও ও ছেড়ে দিলে। মেসোমশাই একটা চাকরি করে দিয়েছিল শুভাশিসকে, সেটাও সে তোর জন্যে ছেড়ে দিলে। আর কত ভালো স্টুডেন্ট ছিল ও, তা জানিস? বি-এতে অনার্স নিয়ে পাস করেছিল। এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবার জন্যে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে জমা দিলে না। সে-টাকা দিয়ে সে তোকে চান্দেরী শাড়ি কিনে দিয়েছে—

আরতি সরসীর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

বললে—কে তোকে এ-সব কথা বলেছে?

সরসী বললে—কে আবার বলবে, আমার মাসিমাই বলেছে—আমার মাসিমা তো মিথ্যে কথা বলতে যাবে না। আমার মাসিমা তোকে চেনেই না, আর মিছিমিছি তোর নামে মিথ্যে কথা বলতে যাবেই বা কেন আমার মাসিমা?

আরতির চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। মুখ দিয়ে তখন আর তার কথা বেরোচ্ছে না। শাড়ির আঁচলটা দিয়ে নিজের চোখ দুটো ঢেকে ফেললে। সরসীর সামনে তার যেন মুখ দেখাতেও লজ্জা হচ্ছিল।

সরসী বললে—কী রে, চোখ ঢাকলি যে? চোখ ঢাকলেই কি তোর মান ঢাকা যাবে? শুভাশিসের মতন ছেলের এই অধঃপতনের জন্যে কোথায় তুই আমার কাছে ক্ষমা চাইবি, তা নয় কাঁদছিস? কাঁদতে তোর লজ্জা করে না?

আরতি আঁচলে মুখ চাপা দিয়েই বললে—তুই আর কিছু বলিসনি আমাকে সরসী, আমি আর সহ্য করতে পারছি না—আমাকে তুই আর কিছু বলিসনি ভাই—

সরসী বললে—তুই তোর নিজের দিকটাই দেখছিস কেবল, কিন্তু শুভাশিসের কথাটা একবার ভেবে দেখ্ তো—তার কতখানি সর্বনাশ হলো তোর জন্যে! তার জীবনটা যে নষ্ট হয়ে গেল একেবারে!

আরতি বললে—কিন্তু আমিই কি তার জন্যে দায়ী? শুভাশিস আসে কেন আমার কাছে? তাকে আমার কাছে আসতে বারণ করতে পারে না তোর মাসিমা?

সরসী বললে—মাসিমার কথা যদি শুভাশিস শুনতো তাহলে তো আর কোনও ভাবনাই ছিল না। শুভাশিস তোর ফোটো নিয়ে পুজো করে, তা জানিস? তোকে সে ঠাকুর-দেবতার মত ভক্তি করে। মোট কথা, তোর জন্যে সে পাগল। তুই তাকে কী ওষুধ-বিষুধ খাইয়েছিস কে জানে!

আরতি বলে উঠলো—তুই বিশ্বাস কর্ সরসী, আমি কিছুই করিনি—

—কিন্তু তুই যদি কিছু না-ই করবি তাহলে আমার মাসিমা কত সুন্দরী মেয়ে পছন্দ করে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে তবু শুভাশিস বিয়ে করছে না কেন?

আরতি বললে—শুভাশিস কেন বিয়ে করছে না তা আমি কী করে জানাবো? সেটাও কি আমার দোষ?

—নিশ্চয়ই। তাহলে তুই যদি শুভাশিসের ভালোই চাস তো তাকে তাড়িয়ে দিতে পারিস না? তোর সঙ্গে মিশতে বারণ করতে পারিস না?

আরতি বললে—আমি বারণ করলে শুভাশিস শুনবে কেন?

—বারণ করলে যদি না শোনে তো তাকে তাড়িয়ে দিবি। তার ভালোর জন্যেই এটা তোর করা উচিত। সেটুকুও তুই করতে পারবি না? তোর স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তুই এতগুলো জীবন নষ্ট করবি?

আরতি কিছুক্ষণ কোনও কথা বললে না। কী যেন সে ভাবতে লাগলো কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ মাথা তুললো। সরসীর চোখের দিকে চোখ রেখে বললে—ঠিক আছে সরসী, তুই যা বলছিস তাই-ই হবে—

সরসীর মুখে যেন এতক্ষণে হাসি ফুটলো। বললে—সত্যি বলছিস ভাই? সত্যিই তুই তাকে তাড়িয়ে দিবি? তোর কাছে আসতে বারণ করবি?

আরতি বললে—হ্যাঁ, তুই যা-যা বলেছিস আমি তা-ই করবো—

—জানি তোর খুব কষ্ট হবে, কিন্তু আর একটা লোকের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তোর

এটুকু স্বার্থত্যাগ করা উচিত ভাই। তুই ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভেবে দেখিস আমি যা বলেছি তা এতটুকু অন্যায় বলিনি—

আরতি বললে—না, অন্যায় কিছু তুই বলিসনি। তুই এখন যা, এর পর থেকে আমি কারো পথের বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। আমি তোকে কথা দিচ্ছি আমি কখনও আমার সঙ্গে আর কারো জীবনকে জড়িয়ে পড়তে দেব না—আমি তোকে এই কথা দিলুম—তুই এখন যা—

সরসী খুশি হয়ে চলে গেল।

কিন্তু আরতি তখন আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। সরসী চলে যাবার পরই একেবারে সোজা শোবার ঘরের তক্তপোশটার ওপরে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। তার মনে হলো যেন জ্বর এসেছে তার। সমস্ত পৃথিবীটা যেন জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে—

পিসীমা রান্না করতে করতে ঘরে এসে ভাইঝিকে ওই অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে গেল।

বললে—কী রে, এই অবেলায় শুয়ে পড়লি যে অমন করে? আজ মেয়ে পড়াতে যাবি নে?

কোনও জবাব দিলে না আরতি সে-কথার।

পিসীমা আবার ডাকলে—ওরে, ও আরতি, কী হলো তোর? শরীর খারাপ হলো নাকি?

তবু কোনও উত্তর দিলে না সে।

পিসীমা এবার আরতির কপালে হাত ঠেকালে।

বললে—এ কী, গা যে তোর পুড়ে যাচ্ছে রে। জ্বর এলো নাকি তোর?

হ্যাঁ, সত্যিই সেদিন জ্বরই এসেছিল আরতির। জ্বরেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলো সমস্ত দিন। কিন্তু পরের দিন সে উঠলো।

বললে—পিসীমা, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি—

পিসীমা তো অবাক! বললে—আবার এই অবস্থায় তুই মেয়ে পড়াতে যাচ্ছিস? দুদিন না গেলে কী হয়? শেষকালে যদি রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে-টড়ে যাস?

আরতি পিসীমার কথা সেদিন শোনেনি। সোজা চলে এসেছিল এখানে। এই আজাদ-নগর কলোনীতে।

আর পরের দিন শুভাশিস ঠিক যথাসময়ে এল।

দরজার কড়া নাড়তেই পিসীমা দরজা খুলে দিলে। বললে—তুমি এসেছ বাবা? কিন্তু আরতি তো নেই—

শুভাশিস অবাক হয়ে গেল। বললে—নেই?

পিসীমা বললে—না।

— কোথায় গেছে? কবে আসবে?

পিসীমা কিছুই জানে না। বললে—তা তো জানি না বাবা, একদিন জ্বর হয়েছিল, কিচ্ছু খেলে না, শুধু শুয়ে পড়ে রইল। তার পরদিন সকালবেলা উঠে আমাকে বললে একটু বাইরে যাচ্ছি। তা সেই যে গেল তো গেল, আর আসেনি।

—কিচ্ছু খবর দেয়নি? কোনও চিঠি-পত্র পাননি তার?

পিসীমা বললে—না।

তারপরে আবার শুভাশিস একদিন এল। আবার এই একই উত্তর। তার পরেও আবার একদিন এসেছিল শুভাশিস। তখনও সেই একই উত্তর। কোনও খবর নেই আরতির। কোনও চিঠি আসেনি আরতির কাছ থেকে।

***

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে আবার উমার সঙ্গে দেখা।

সুধীরবাবুর মেয়ে। সেই যে-মেয়ে কেবল বছর বছর ফেল করতো। তারও বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হয়ে বেশ মোটাসোটা গিন্নী-বান্নি হয়েছে। অথচ কী অদ্ভুত যোগাযোগ, বিয়ে হলো কিনা সেই একেবারে শুভাশিসদের পাড়ায়!

আরতি জিজ্ঞেস করলে—আর কতদিন আছো এখানে?

উমা বললে—আসছে মঙ্গলবার দিন ওর আসার কথা আছে। ও এসেই আমাকে পাটনায় নিয়ে যাবে।

আরতি বললে—পাটনায়? কেন? তোমার শ্বশুরবাড়ি তো কলকাতায়, কালীঘাটে—

উমা বললে—এতদিন তো কালীঘাটেই ছিলুম। এবার যে ও বদলি হয়ে গেল পাটনায়। সেখানে কোয়ার্টার ঠিক করে আমাকে নিতে আসবে—আমাকে চিঠি লিখেছে কোয়ার্টার পেয়ে গেছে—

এর পর আরতি আর কী বলবে বুঝতে পারলে না।

উমাই বললে—জানেন বড়দিদিমণি, শুভাশিসবাবুর কাছে আপনার সব কথা শুনেছি—

আরতি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে—আমার সম্বন্ধে? কী শুনেছ?

—শুভাশিসবাবু বলেছেন আপনি নাকি খুব ভালো ছিলেন। আমিও শুভাশিসবাবুকে বলেছি দিদিমণির মতন ভালো টিচার আমাদের আজাদ-নগরে আর কেউ নেই—

—তিনি জানেন যে আমি আজাদ-নগরে আছি?

উমা বললে—আগে জানতেন না, আমার কাছেই তিনি প্রথম শুনলেন—।

—শুনে কী বললেন?

উমা বললে—কিছু বললেন না, শুধু শুনলেন। তারপর আমি তাঁকে অনেকবার বললুম আজাদ-নগরে একবার চলুন না। তিনি রাজি হলেন না। বললেন—না, আমার সময় হবে না—

—সময় হবে না বললেন? কেন, কীসের কাজ অত তাঁর?

উমা বললে—বাঃ, কত কাজ শুভাশিসবাবুর। তাঁর যে গান শেখাবার ইস্কুল আছে, অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাঁর। কত ছেলেমেয়ে তাঁর কাছে গান শিখতে আসে। তাঁর একুশ নম্বর সন্তোষ গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে গেলে দেখবেন কত ছেলে-মেয়ে গান শিখছে তাঁর কাছে। বিয়ে-থা করেননি শুভাশিসবাবু, ওই ওদের গান শিখিয়েই সময় কাটিয়ে দেন—

এর পরে আর বেশি কথা হলো না। আরতি বাড়ি চলে এল, সেদিনও বাড়িতে গিয়ে অনেকক্ষণ পুজোর ঘরে কাটালো।

মঙ্গলা বাইরে থেকে অনেকবার দেখে গেল। পুজো যেন আর শেষ হয় না দিদিমণির। দিন-দিন যেন পুজোর মাত্রা বাড়িয়েই চলেছে দিদিমণি।

শেষ পর্যন্ত যখন পূজোর ঘর থেকে আরতি বেরুলো তখন তার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। এ কী-রকম চেহারা হয়েছে দিদিমণির!

মঙ্গলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে—তোমার শরীর ভালো আছে তো দিদিমণি?

আরতি বললে—কেন, ও-কথা কেন বলছিস তুই?

মঙ্গলা বললে—তোমার মুখের চেহারাটা যেন কেমন ভার-ভার দেখছি কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি—

আরতি বললে—না, ও কিছু না, সারাদিন স্কুলে ধকল গেছে কিনা। অনেক কাজ পড়েছে যে স্কুলে, একলা তো আমাকেই সব করতে হয়।

বলে পুজোর কাপড় বদলে নিয়ে খেতে বসলো।

তারপর যখন অনেক রাত হলো তখন বিছানার ওপর শুয়ে খোলা জানলার বাইরে আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে রইল। চেয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল ওই তারাদের মধ্যে হারিয়ে গেলে বেশ হতো। তাহলে বেশ কেউ আর তাকে খুঁজে পেতো না। নিজেও তাহলে আর নিজেকে সে খুঁজে পেতো না। একেবারে জীবনের অতলে তলিয়ে যেতে গেলে ও ছাড়া যেন আর কোনও পথই নেই আর। নিজেকে বিকিয়েই তাহলে সে আবার নিজেকে খুঁজে পেতো। তখন তাহলে সে আবার নতুন করে তার জীবনের যাত্রা শুরু করতে পারতো। অর্থাৎ নিজেকে সে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারতো।

কিন্তু রাত তো আর চিরস্থায়ী নয়। রাত, তা সে দুঃখেরই হোক বা সুখেরই হোক, একসময়ে সে ভোর হয়ই। ভোর হলেই আবার যত অপার্থিব দায়িত্বগুলো শিং নেড়ে তাড়া করে আসে। তারা সবাই দল বেঁধে এসে শাসায়—আমাদের দাবী মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর মতই ওই পার্থিব দায়িত্বগুলোর স্বভাব। তারা সব-সময় নাছোড়-বান্দা। তাদের দাবী অস্বীকার করে এমন মানুষ আজও মানুষের সমাজে কেউ জন্মায়নি। সেই কারণেই ইচ্ছে না-থাকলেও সামাজিকতা করতে হয়, চোখের জল মুছে পরের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে হাসতে হয়, আবার পরকে সহানুভূতি দেখানোর জন্যে কাঁদতেও হয়। আর শুধু কি তাই? এই যে প্রতিদিন রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা, এই অবশ্য-প্রয়োজনীয় আর অবশ্য-করণীয় তুচ্ছ কাজগুলো সমাধা করতে হয় সেও তো সেই পার্থিব দায়িত্বের তাড়নাতেই।

তা পরের মঙ্গলবারেই উমা বাড়িতে এসে আরতির পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে বিদায় নিয়ে গেল।

বললে—আশীর্বাদ করুন বড়দিদিমণি, যেন সুখী হতে পারি। নতুন জায়গায় বদলি হয়ে যাচ্ছি তো, তাই একটু ভয় করছে—

আরতি বললে—আশীর্বাদ করছি, তুমি সুখী হও উমা। তবে আমার আশীর্বাদে তোমার ফল হবে কিনা জানি না।

উমা বললে—নিশ্চয় হবে, আপনার মত বিদ্বান মানুষের আশীর্বাদ কখনও না ফলে পারে?

আরতি কিন্তু জবাব দিলে না এ-কথার। আর কী জবাবই বা দেবে! কী জবাবই বা দেবার ছিল তার! আরতি বিদুষী, তার এই পরিচয়টাই সকলের কাছে বড় হলো। তার ছাত্রী, স্কুলের কমিটির প্রেসিডেন্ট, কমিটির মেম্বার, কারো কাছে তার আলাদা অস্তিত্বই

নেই। সে মানুষ নয়, সে শুধু বিদুষী। সে একটা যন্ত্রবিশেষ। আর কোনও সংজ্ঞা নেই, আর কোনও ব্যাখ্যা নেই।

পরের দিন আর প্রেসিডেন্টের বাড়ি যাওয়ার কাজ নেই। প্রেসিডেন্ট দেবব্রতবাবু তাকে একদিনের জন্যে অব্যাহতি দিয়েছেন। সেদিন তাঁর ছেলে-বউ জার্মানী থেকে আসবে, তাই তিনি ব্যস্ত থাকবেন।

সুতরাং আরতির ছুটি। সেদিন একটু দেরি করে বেরোলেও চলবে। নইলে অন্যদিন দেবব্রতবাবুর বাড়িতে গিয়ে প্রোগ্রেস-রিপোর্ট দেখাতে হয়। তাছাড়া অন্য কোনও বিশেষ কাগজপত্র দেখাবার থাকলে বা সই করাবার থাকলে তাও প্রেসিডেন্টের সামনে হাজির করতে হয়। প্রেসিডেন্ট এককালে সরকারী অফিসে যে-ভাবে কাজকর্ম চালিয়ে এসেছেন এখন এখানে স্কুলের কাজও ঠিক সেই ভাবেই চালান। কিছু না পড়ে তিনি সই করবেন না। ফাইলটা একেবারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বেন। দরকার হলে পাশে নোট লিখবেন। তারপর আরতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যখন দেখে-পড়ে-বুঝে-শুনে পুরো নিঃসন্দেহ হবেন তখন সই করবেন তিনি। তার আগে নয়।

এই নিয়মই চলে আসছে বরাবর। সেই যেদিন প্রথম আরতি এই আজাদ-নগর কলোনীতে হেড্-মিস্ট্রেস হয়ে এসেছিল সেইদিন থেকেই। তখন স্কুল ছিল ছোট, ছাত্রীসংখ্যাও ছিল কম। এখানে এত বাড়ি-ঘরও ছিল না। তারপর আস্তে আস্তে এখানকার বসতি বড় হলো, আর বসতি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলও বড় হতে লাগলো। স্কুল যত বড় হতে লাগলো আরতিরও তত নেশা লেগে গেল কাজে। কাজেরও একটা নেশা আছে। সবাই কাজের মধ্যে নেশার আমেজ পায় না। যে পায় সে-ই তলিয়ে যায়, সে-ই ডুবে মরে। সে কাজ ছাড়া আর সব কিছুই ভুলে যায়। তাকেই বলে নেশা। সেই নেশাই এতদিন পেয়ে বসেছিল আরতিকে। বলতে গেলে সেই নেশার ঝোঁকে সে একেবারে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে। ভুলে গিয়েছিল সরসী-শুভাশিসকে। আর সে যে আরতি তাও যেন প্রায় ভুলে গিয়েছিল। সে ছিল শুধু আজাদ-নগর গার্লস-স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস্ আর সকলের বড়দিদিমণি। বলতে গেলে এইটেই ছিল তার একমাত্র পরিচয়।

কিন্তু উমার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই আবার যেন মনে পড়তে লাগলো সব।

পুজো আগেও করতো আরতি। কিন্তু আগে যত মনোযোগ দিয়ে পুজো করেছে এখন আর তত মনোযোগ হয় না। পুজো করতে করতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। আবার সেই সব পুরনো দিনের টুক্‌রো-টাক্‌রা স্মৃতি মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় সেই সরসীর জন্মদিনে শুভাশিসের গানের প্রশংসা করা। তার পর থেকে একে-একে সমস্ত ঘটনাগুলো চলন্ত ছবির মত এক-এক করে চোখের সামনে ভেসে যায়। উমার কথাগুলোও মনে পড়ে। উমা বলেছিল—শুভাশিসবাবু গানের স্কুল নিয়েই পড়ে আছে এখন।

অথচ শুভাশিস কী-ই না হতে পারতো!

অত সাধের গান, সেই গানও কিনা ছেড়ে দিলে সে আরতির জন্যে।

স্কুলে নিজের ঘরে গিয়ে বসলো আরতি।

অন্যদিন কোনও মেয়েকে যদি দেখতো পাশের মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে তো আরতি ধমক দিত। অফিস-ঘরের বাইরে মেয়েরা হৈ-হল্লা করলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বলতো—কী হচ্ছে, এত গোলমাল করছো কেন তোমরা?

মেয়েদের ক্লাসে গিয়ে আরতি বার-বার এক কথাই বলতো।

বলতো—তোমরা সবাই বড় হলে এক-একজন আদর্শ-চরিত্র মানুষ হবে আমি এই দেখতে চাই। আমি চাই তোমাদের দেখে যেন অন্য মেয়েরা প্রেরণা পায়। তারা যেন তোমাদের অনুসরণ করে। তোমরা আমাদের জাতির, আমাদের সমাজের, আমাদের দেশের ভরসা। তোমাদের উন্নতির জন্যেই এই স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তোমরা যদি আদর্শ-চরিত্র হয়ে গড়ে ওঠো তো তবেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে—

আরো সব কত ভালো ভালো কথা বলতো আরতি। মেয়েরা এক কান দিয়ে সে-সব শুনতো, আর অন্য কান দিয়ে তা বেরিয়ে যেত।

কিন্তু এ-সব কথা বলতে আরতির নিজেরই ভালো লাগতো। কথাগুলো সে যেন তাদের উদ্দেশে বলতো না, বলতো নিজেকে। নিজেকে কথাগুলো বলে সে যেন বড় আনন্দ পেত।

সেদিন আর তা হলো না। সেদিনও মেয়েদের গোলমাল কানে আসতে লাগলো বাইরে থেকে। অফিসের ঘরে বসে কাজ করতে করতে একবার মনে হলো উঠে গিয়ে ওদের গোলমাল থামিয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু উঠতে আর মন চাইল না। যেমন বসে ছিল তেমনিই বসে রইলো নিজের জায়গায়।

❋ ❋ ❋

দেবব্রতবাবুর বাড়িতে সেদিন উৎসব। উৎসবের আবহাওয়া।

অনেক দিন পরে দেবব্রতবাবুর ছেলে-বউ বাড়িতে এসেছে। অনেকদিন তারা বিদেশে ছিল। আজ আবার ফিরে এসেছে। আবার চলে যাবে দিল্লীতে। মাত্র এক সপ্তাহ কাটাবে বাবার কাছে। এই কদিনই যা বিশ্রাম।

দেবব্রতবাবু নিজে দমদম এয়ার-পোর্টে গিয়েছিলেন ছেলে-ছেলের বউকে আনতে। সেখান থেকে ছেলে-বউকে সঙ্গে করে আজাদ-নগরের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। বাড়িসুদ্ধ তাদের নিয়েই ব্যস্ত। সকাল থেকেই বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগতের ঢেউ চলেছে। সকলেই অভিনন্দন জানাতে এসেছে। দলে-দলে তারা আসে আর কিছুক্ষণ আনন্দ প্রকাশ করে চলে যায়। দেবব্রতবাবুর ছেলের প্রতিষ্ঠা যেন দেবব্রতবাবুরই প্রতিষ্ঠা। আর শুধু দেবব্রতবাবুর প্রতিষ্ঠাই নয়, যেন সমস্ত আজাদ-নগরের প্রতিষ্ঠা।

সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে দেখে দেবব্রতবাবুর পুত্রবধূর দিকে। এত বছর জার্মানীতে কাটিয়েও যে-মেয়ে এত সরল, এত সহজ, এত স্বাভাবিক থাকতে পারে এটা দেখেই সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়।

নীলা বলে—আমি মেমসাহেব হতে যাবো কোন দুঃখে মিস্টার ব্যানার্জি, আমি তো জাতে বাঙালী—

মিস্টার ব্যানার্জি বলেন—সে-কথা তোমার মত ক'জন মনে রাখতে পারে মা? তুমিই তো প্রথম বিলেত যাওনি, তোমার মত কত মেয়েই তো আগে ওদেশে গেছে। আমি তো তাদেরও দেখেছি, তারা তো সবাই মাথার চুল ছোট করে ছেঁটে ফেলেছে, পোশাক-আশাকেও তারা মেমসাহেব হয়ে গেছে—

দেবব্রতবাবু বলেন—আমার বউমা সেদিক থেকে আদর্শ চরিত্র মিস্টার ব্যানার্জি—

মিস্টার ব্যানার্জি বললেন—আমি তো তাই দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি, এ যুগেও কোনও মেয়ে কারো পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকায়, এটা তো একটা তাজ্জব ব্যাপার—

দেবব্রতবাবু বলেন—না, শুধু আপনি নন মিস্টার ব্যানার্জি, আমার এখানে আজ যত গেস্ট্‌স্‌ এসেছে সবাইকে নীলা এই রকম পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে—

দেবব্রতবাবুর পুত্র-পুত্রবধূ এতদিন পরে বিদেশ থেকে এসেছে, তাই বাড়িতে উৎসবের ঘটাটা একটু বেশি। আর তা ছাড়া তারা থাকতেও আসেনি এখানে। দিল্লীতে চলে যাবে। সেখানেই চাকরি হয়েছে ছেলের। সেখানে গিয়ে তারা তাদের সংসার পাতবে নতুন করে।

সকাল থেকেই বিভিন্ন লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে বাড়িতে। সবাই দেবব্রতবাবুর প্রতিবেশী। সবাই একবাক্যে দেবব্রতবাবুর পুত্রভাগ্যকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন।

তড়িৎ নিজেও সকলের সঙ্গে সবিনয়ে কথা বলতে লাগলো।

বললে—আমার ইচ্ছে ছিল কলকাতাতেই থাকবো, তাহলে মাঝে-মাঝে আজাদ-নগরে আসতে পারতুম। কিন্তু কলকাতায় আমার কাজের স্কোপ নেই। এতদিন জার্মানীতে যা কিছু শিখেছি কলকাতায় চাকরি করলে সব ভুলে মেরে দেব—

প্রথম দিনটা কোথা দিয়ে যে কাটলো কেউই জানতে পারলে না, কিন্তু আরতি বোস স্কুলে যাবার পথে চেয়ে দেখলে প্রেসিডেন্টের বাড়ির সামনের বৈঠকখানায় বেশ ভিড়। সন্ধ্যেবেলা যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে তখনও তেমনি ভিড় লেগে আছে।

কিন্তু পরের দিন প্রোগ্রেস-রিপোর্ট নিয়ে যাবার আগে দশবার ভাবলে আরতি। এত ভিড়ের মধ্যে কি প্রোগ্রেস-রিপোর্ট দেখবার সময় হবে প্রেসিডেন্টের!

আরতির চিরকালের স্বভাব নিজেকে আড়াল করে রাখা। বিশেষ করে লোক-সমাজে। এই যে স্কুলে গিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সে কাটায় সেও তো নিজেকে আড়াল করবার জন্যে। স্কুলটাই তার একটা আশ্রয়। এই আশ্রয়ের আড়ালেই সে এত বছর ধরে নির্বাসন দিয়ে দিনগত পাপক্ষয় করছে। দেবব্রতবাবুর বাড়ি গিয়ে সে যে রোজ প্রোগ্রেস-রিপোর্ট দেখিয়ে আসে তাতে তার আড়ালের দেয়াল ভেঙে চুরমার হয় না। কারণ আরতি যখন সেখানে যায় তখন দেবব্রতবাবু একলাই থাকেন। একলা তাঁর বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজে তিনি চোখ বোলান। দেবব্রতবাবুরও খেয়াল থাকে ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় সকাল নটার সময় হেড্-মিস্ট্রেস আসবে। বলতে গেলে তিনি তৈরি হয়েই থাকেন আরতির জন্যে। আরতিও তৈরি হয়ে তাঁর বৈঠকখানায় ঢোকে এই ধারণা নিয়ে যে দেবব্রতবাবু ছাড়া আর কেউই দ্বিতীয় ব্যক্তি সেখানে থাকবে না।

এই নিয়মই এত বছর ধরে চলে আসছে। এই নিয়মেই আরতি সরকার এতদিন ধরে তিলে তিলে গড়া তার আড়ালের দুর্গের মধ্যে গা ঢেকে বাস করে আসছে।

কিন্তু এবার?

এবার বৈঠকখানায় হয়ত অনেক লোক থাকবে। হয়ত দেবব্রতবাবুর ছেলেও থাকবে। প্রেসিডেন্ট হয়ত আরতির সঙ্গে তার ছেলের পরিচয় করিয়ে দেবেন। তখন নিয়মমত আরতিও তাকে নমস্কার করবে, দেবব্রতবাবুর ছেলেও উত্তরে একটা শুকনো প্রতি-নমস্কার করবে।

এই সব প্রাণহীন সৌখিন আদব-কায়দাগুলোই আরতির মোটে ভাল লাগে না।

তবু যেতে হবে। পরের দিন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সকাল নটার সময় আরতি গিয়ে হাজির হলো।

দেবব্রতবাবু তাঁর নিজের চেয়ারে বসে ছিলেন। বসে বসে যথানিয়মে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আরতির খুব ভাগ্য ভালো যে তখনও আর কেউ এসে পৌঁছোয়নি। হয়ত আর একটু পরেই সবাই এসে পৌঁছোবে। তার আগেই আরতি কাজ সেরে চলে যাবে। তাহলে আর অকারণ শিষ্টাচারে সময় নষ্ট করতে হবে না। তখন একেবারে সোজা আবার তার স্কুলের অফিসঘরে গিয়ে নিজেকে কাজে ডুবিয়ে রাখতে পারবে।

আরতিকে দেখেই দেবব্রতবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

বললেন—এসো—

রিপোর্টটা তৈরিই ছিল। সেটা সামনে এগিয়ে দিলে আরতি।

দেবব্রতবাবু বললেন—জানো আরতি, আমার তড়িৎ এসেছে।

আরতি বললে—হ্যাঁ, আপনি তো বলেছিলেন তিনি আসবেন...

দেবব্রতবাবু কাগজগুলো দেখতে দেখতে বললেন—কালকে অনেকে এসেছিলেন আমার বাড়িতে, মিস্টার ব্যানার্জি তো অনেকক্ষণ ছিলেন এখানে। অনেক গল্প করলেন তড়িতের সঙ্গে।

এদিকে হাতে কাজও চলছিল আর মুখে কথাও হচ্ছিল—প্রত্যেকটা কাগজে যখন সই করা হয়ে গেল তখন আরতি সেগুলো নিয়ে চলে আসছিল।

হঠাৎ কে যেন ভেতর দিক থেকে ঘরে ঢুকলো।

দেবব্রতবাবু আরতির দিকে চেয়ে বললেন—এই যে, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আরতি, এই-ই হচ্ছে আমার বউমা....

আরতি দেবব্রতবাবুর পুত্রবধূর দিকে চেয়ে নমস্কার করতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালো।

নীলা বললে—আরে, আরতি, তুই?

আরতিও অবাক! এই সেই নীলা। যে ক্লাসে বরাবর ফেল করতো। নীলাও বলতে গেলে ওই উমার মত ছিল। নীলার বাবা দিল্লীতে বড় চাকরি নিয়ে চলে গেল। তারপরে আর দেখা হয়নি আরতির সঙ্গে। এখন সেই নীলাই এত ফরসা হয়ে গেছে, এত সুন্দর হয়েছে! হেয়ারস্টাইল বদ্‌লে এমন করে মুখের আদলটাই বদ্‌লে ফেলেছে যে তাকে একেবারে চেনা যায় না।

নীলা বললে—তুই এখানে কী করতে? এতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি—

দেবব্রতবাবু এতক্ষণ অবাক হয়ে সব লক্ষ্য করছিলেন।

বললেন—বউমা, তুমি আরতিকে চেনো নাকি? এ তো আমাদের এখানকার গার্লস স্কুলের হেড্-মিস্ট্রেস—

নীলা বললে—তাই নাকি! আমরা যে এক কলেজে এক ক্লাসে পড়েছি। আরতি আমাদের ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট হতো। সে যে এখানকার গার্লস স্কুলের হেড্-মিস্ট্রেস তা তো জানতুম না।

ইতিমধ্যে পাড়ার কোন একজন ভদ্রলোক এসে হাজির। দেবব্রতবাবু তাঁকে অভ্যর্থনা করে ঘরে বসালেন।

নীলা বললে—আয় ভাই আরতি, ভেতরের ঘরে আয়, তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে—

আরতি বললে—কিন্তু আমার যে ভাই এখন স্কুল, এখনি স্কুল বসবে—

—তা হোক, একদিন স্কুল দেরি করে বসলে কীসের ক্ষতি! এতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা, আমি তোকে ছাড়ছি না—

বলে টানতে টানতে একেবারে বাড়ির ভেতরের একটা নিরিবিলি ঘরে গিয়ে আরতিকে বসালো।

দেবব্রতবাবুর বাড়ির ভেতরে এর আগে কখনও যায়নি আরতি। কিন্তু ভেতর-বাড়ির যে-ঘরখানায় তাকে নিয়ে গিয়ে নীলা বসালো সেটা বড় সাজানো। নীলার জিনিসপত্রে ভরা ঘরখানা।

আরতির মনের মধ্যে তখনও কেবল সেই অতীতের নীলার চেহারাটা ভেসে উঠছিল। সেই নীলা এই দেবব্রতবাবুর ছেলের বউ! এ কী করে সম্ভব হলো! এই পুত্রবধূরই এত প্রশংসা শুনেছিল সেদিন দেবব্রতবাবুর মুখে! ভালোবেসে নাকি বিয়ে হয়েছে এদের। দেবব্রতবাবুর হীরের টুকরো ছেলে শেষকালে এই নীলাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে! এ যে কল্পনাও করা যায় না!

কথা বলতে বলতে হঠাৎ একসময় নীলা বললে—হ্যাঁ রে, তোর এখনও বিয়ে হয়নি?

আরতি কী বলবে বুঝে উঠতে পারলে না।

বললে—আমি যাই এখন ভাই, পরে একদিন আসবো—

নীলা বললে—তুই আমার কথাটার উত্তর দিচ্ছিস না কেন? এত বয়স হয়ে গেল তোর, এখনও কাউকে ধরতে পারলি না? এর পরে যখন আরো বয়েস হবে তখন কী করবি? শেষ জীবনটার কথাও তো মেয়েদের ভাবতে হয়...

আরতি উঠে দাঁড়ালো। বললে—আমি আসি ভাই এখন...

নীলা কিন্তু তবু ছাড়বার পাত্রী নয়। বললে—আমি তোকে ভালো কথাই বলছি ভাই আরতি, তুই কিন্তু বড় বোকামি করছিস, এখনও সময় আছে তোর। তাহলে এত লেখাপড়া করতে গেলিই বা কেন? কী লাভ হলো তোর এতে? কেউই বিয়ে করতে চাইলে না তোকে?

আরতি তখন প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বললে—পরে কথা বলবো ভাই, আমি আসি...

বলে উঠে দরজার দিকে চলে আসছিল। নীলাও সঙ্গে সঙ্গে এলো।

বললে—শেষ পর্যন্ত তো বিয়েতেই মেয়েদের জীবনের ক্লাইমেক্স, তাহলে অত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে লাভটা কী হলো তোর? স্কুলের মেয়েদের পড়িয়েই তোর স্বর্গলাভ হবে? এই আমার কথা ভাব না, আমি তো ফেল-করা মেয়ে, কিন্তু এখন? এখন কি সে-সব আমার গায়ে লেখা আছে? বল্?

তারপর যখন আরতি বাইরে বেরিয়ে আসছে তখন নীলা বললে—আবার একদিন আসিস কিন্তু, এক মাস আছি, তার পরে দিল্লী চলে যাবো, তখন আর কবে দেখা হবে কে জানে—

আরতি তখন পালাতে পারলে বাঁচে। তার মনে হলো কে যেন তাকে ধরে পিঠে চাবুক মেরে ছেড়ে দিলে। অথচ কেন যে নীলার সঙ্গে দেখা হতে গেল কে জানে! সে তো এতদিন বেশ নিশ্চিন্তই ছিল। বেশ স্কুল আর স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। হঠাৎ গায়ে পড়ে এত অপমান খেতে কেন সে বাড়ির ভেতরে গিয়েছিল!

দেবব্রতবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে সোজা স্কুলের রাস্তা ধরল।

❋❋❋

সেদিনও দেবব্রতবাবু যথারীতি সকালবেলা নিজের বৈঠকখানা ঘরে বসে ছিলেন। ভোরবেলাই খবরের কাগজ এসেছে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে নিয়ে খবরের কাগজ পড়াটা তাঁর নিত্যকর্মের মত। সেদিনও তিনি তাই পড়ছিলেন।

হঠাৎ আরতি ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকেছে। তার হাতে একটা কী কাগজ।

দেবব্রতবাবু এই এত ভোরবেলা আরতিকে দেখে অবাক হয়ে গেছেন।

বললেন—এ কী, আরতি তুমি! এত ভোরে! ওটা কী?

আরতি বললে—আমার ছুটির দরখাস্ত—

—ছুটি!

দেবব্রতবাবু চমকে উঠলেন আরতির কথা শুনে। আরতি ছুটি নেবে! আগে কতদিন তিনি নিজেই তাকে ছুটি নিতে বলেছেন, কিন্তু তবু ছুটি নিতে চায়নি সে। আর আজ সে কিনা নিজে থেকে ছুটির দরখাস্ত নিয়ে এসেছে।

বললেন—হঠাৎ ছুটি নিচ্ছ যে?

—কাল রাত্রে পিসীমার চিঠি পেয়েছি, তাঁর অসুখ তাই তাঁকে দেখতে যাচ্ছি—

—কত দিনের ছুটি?

—পনেরো দিনের।

দেবব্রতবাবু দরখাস্তখানা ভালো করে মন দিয়ে পড়লেন। তারপর ছুটি মঞ্জুর করে সই করে দিলেন।

বললেন—এই প্রথম তুমি ছুটি নিচ্ছ, আমি তোমার দরখাস্ত না-মঞ্জুর করতে পারি না। কিন্তু এই পরীক্ষার আগে চলে যাচ্ছো, স্কুলের কী হবে বুঝতে পাচ্ছি না—

আরতি দরখাস্তখানা নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

দেবব্রতবাবু আবার বললেন—দরখাস্তখানা তাহলে তুমি ফাইলে ফুঁড়ে রেখে দিও, আর কল্যাণী বোসকে বলে দিও যেন তোমার চার্জ বুঝে নেয়—

আরতি আর দাঁড়ালো না। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সারা আজাদ-নগর কলোনী তখনও ভালো করে জাগেনি। আরতি আবার নিজের বাড়িতে গেল। মঙ্গলাকে ডেকে চা-জলখাবার তৈরি করতে বললে। ততক্ষণে সুট্‌কেসটা গুছিয়ে নিলে সে। কয়েকখানা শাড়ি, কটা ব্লাউজ। আর টাকা। ট্রাঙ্কটা খুলে দেখলে কত টাকা আছে তাতে। তিন হাজার টাকার মত হলো। তার এত বছরের সম্বল। সমস্ত টাকাটা নিজের ব্যাগের মধ্যে পুরে নিলে সে। তারপর নিজের পরনের শাড়িটা বদলে নিলে। এতদিন পরে দেখা হবে। খুবই অবাক হয়ে যাবে হয়ত। হয়ত চিনতে কষ্ট হবে তার। শুভাশিস হয়ত কল্পনাই করতে পারবে না এত বছর পরে আরতি আবার তার কাছেই গিয়ে হাজির হবে!

শুভাশিস হয়ত বলবে—তুমি আসবে আমি জানতুম—

আরতি বলবে—একদিন তোমাকে না বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার খেসারত দিতে এসেছি শুভাশিস, তোমার পঁচাত্তর টাকা দামের চান্দেরী শাড়ির ঋণ শোধ করতে এসেছি—

শুভাশিস বলবে—আমি সে-সব কথা ভুলে গেছি—

আরতি বলবে—হ্যাঁ, ভুলে যাওয়াই ভালো। শুধু ভুলে যেও তাই-ই নয়, আমার

সমস্ত ভুলও ক্ষমা কোরো—

শুভাশিস বলবে—যে ভুলতে পারে সে ক্ষমাও করতে পারে—

আরতি বলবে—আমি কিন্তু ভুলতে পারিনি তাই নিজেকে এখনও ক্ষমাও করতে পারিনি—

শুভাশিস হয়ত জিজ্ঞেস করবে—তাহলে তুমি আসতে গেলে কেন? আমি তো তোমাকে আসতে বলিনি—

আরতি উত্তরে বলবে—এলুম নিজেকে ক্ষমা করবো বলে। আমার আমিকে ক্ষমা না করতে পারলে যে আমি আর বাঁচতুম না। নিজের অপরাধের আগুনে আমি যে তিলে তিলে পুড়ে মরছিলুম। একমাত্র তুমিই আমাকে বাঁচাতে পারবে সেই ভরসাতেই তোমার কাছে এলুম। তুমি ছাড়া আর যে আমার কেউ নেই—

শুভাশিস হয়ত তার কথা শুনে তাকে সান্ত্বনা দেবে, আর আরতি তার বুকে মুখ লুকিয়ে শুধু কাঁদবে। শুভাশিসের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে তার খুব ভালো লাগলে।

ট্রেনটা কখন যে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছেছে তা আরতির খেয়াল ছিল না। সে তখন নিজের কল্পনায় স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে।

হঠাৎ যখন খেয়াল হলো দেখলে কামরার সব লোক প্ল্যাটফরমে নেমে গেছে। সে একলা বসে আছে এক কোণে।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে আরতি সুটকেসটা টানতে টানতে বাইরের প্ল্যাটফরমের ওপর নামলো।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আর একটু পরেই চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে। একটা কুলির মাথায় সুটকেসটা চাপিয়ে আরতি বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। একটা ট্যাক্সি ডেকে বললে—চলিয়ে—

ট্যাক্সি-ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে—কোথায়?

আরতি বললে—কালীঘাট, সন্তোষ গাঙ্গুলী লেন—

ট্যাক্সিটা ছুটে চললো হু হু করে। সমস্ত কলকাতাটা যেন তখন আরতির চোখের সামনে থরথর করে কাঁপছে। ট্যাক্সি এত আস্তে আস্তে ছুটছে কেন? ট্যাক্সিটা কি পুরনো? একটা নতুন ট্যাক্সি দেখে উঠলেই ভালো হতো!

কিন্তু তখন আর উপায় নেই।

তবু আরতি বললে—আর একটু জোরে চালাও ড্রাইভারজী, আমার বড় জরুরী কাজ আছে—

ট্যাক্সি আরো জোরে চললো। লোহার ইঞ্জিনে আর কত শক্তি আছে? আরতির মনের সঙ্গে তাল রেখে সে ছুটতে পারবে কেন?

শেষকালে যখন সন্তোষ গাঙ্গুলী লেনে পৌঁছুল তখন রাস্তার আলোগুলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আরতির চোখের সামনে।

ওই তো শুভাশিসের বাড়িটা! একুশ নম্বর সন্তোষ গাঙ্গুলী লেন। আর একটু, আর একটু এগিয়ে চলো ড্রাইভারজী! আর এক পা!

কিন্তু কাছাকাছি যেতেই দেখলে বাড়িটার সামনে অনেক গাড়ি আর অনেক লোকের ভিড়। একটা বড় বাতি জ্বালিয়ে জায়গাটা আলোয় আলো করা হয়েছে। কিন্তু এত আলো কেন? এত গাড়ি কেন? আর এত ভিড়ই বা কেন?

ট্যাক্সিওয়ালাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে আরতি সেই গলির ভেতরেই নেমে পড়লো। আরতিকে দেখে একজন এগিয়ে এসেছে।

বললে—আসুন, আপনি কোত্থেকে আসছেন?

সে-কথার জবাব না দিয়ে আরতি বললে—শুভাশিসবাবুর বাড়িতে যাবো—

ছেলেটি বললে—হ্যাঁ, আসুন না, ওই তো শুভাশিসবাবুর বাড়ি—

আরতি বললে—যে শুভাশিসবাবুর গানের স্কুল আছে—

ছেলেটি বললে—হ্যাঁ, আমি তো শুভাশিসদারই ছাত্র।

আরতি বললে—কিন্তু এখানে এত লোক কেন? এত ভিড় কীসের? এত আলো?

ছেলেটি বললে—শুভাশিসদা বহু লোক নেমন্তন্ন করেছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী তো, কাউকে বাদ দেয়নি। বিয়েতেও অনেক লোক হয়েছিল, আজ বৌভাত, আরো বেশি লোক আসবে—

—বিয়ে? বৌভাত? আরতি যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। কার বিয়ে? কার বৌভাত?

ছেলেটি অবাক! বললে—হ্যাঁ, পরশুদিন শুভাশিসদার বিয়ে গেছে, আর আজ শুভাশিসদার বৌভাত। শুভাশিসদার এক ছাত্রীর সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে। সুমিত্রা সেনের গান শুনেছেন তো? তিনি তো শুভাশিসদারই ছাত্রী···

আরতির পায়ের নীচের মাটি যেন দুলে উঠলো।

তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিটার ভেতরে গিয়ে বসে আরতি টাল সামলে নিলে। তারপর ড্রাইভারকে বললে—চলিয়ে—

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে—কাঁহা?

আরতি বললে—ট্যাক্সি ঘুরিয়ে আবার বড় রাস্তায় চলো—

ছেলেটি ব্যাপার দেখে অবাক। জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, আপনি চলে যাচ্ছেন যে? শুভাশিসদা কিন্তু রাগ করবেন, আমাকে সকলকে বসাতে বলে গেছেন—

আরতি বললে—আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি, বেশি দেরি হবে না—

ট্যাক্সিটা তখন আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। তারপর বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

এবার ড্রাইভার আবার জিজ্ঞেস করলে—কাঁহা যাইয়েগা আভি?

আরতি শুধু বললে—সিধা—

সোজাই চলতে লাগলো ট্যাক্সি। হু-হু করে চলতে লাগলো।

কোথায় যাবে এখন সে? সে তো পনেরো দিনের ছুটি নিয়েছে। পনেরো দিন সে কোথায় কাটাবে? একবার মনে পড়লো পিসীমার কথা। এতদিন পরে পিসীমাও তাকে দেখে খুব অবাক হয়ে যাবে হয়ত। তা পিসীমার কাছে যাওয়াই ভালো। অন্তত রাতটার মতন তো একটা আশ্রয় পাওয়া যাবে সেখানে।

কোথায় কালীঘাট আর কোথায় জোড়াসাঁকো!

ট্যাক্সিটা যখন জোড়াসাঁকোর কাছাকাছি এসেছে তখন আরতি বললে—এখানে থামাও—

ট্যাক্সি থামলো। আরতি ভাড়া মিটিয়ে দিতেই ট্যাক্সিটা চলে গেল। সুটকেসটা নিয়ে আরতি নিজেই গলির ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল। হঠাৎ আব একটা ট্যাক্সি আসতে সেটাকে থামালে।

কী যে খেয়াল হলো আরতির কে জানে! ট্যাক্সির দরজা খুলে ভেতরে বসে বলে উঠলো—চলুন, কালীঘাট—

ট্যাক্সিটা হু-হু করে কালীঘাটের দিকেই চলতে লাগলো। আবার সেই একই রাস্তা, একই গন্তব্যস্থান! কিন্তু কেনই বা সে আবার কালীঘাট যাচ্ছে!—শুভাশিসের সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখা না করে তার ফিরে আসা ঠিক হয়নি। এবার সে আবার সেই শুভাশিসের বাড়িতেই যাবে। দেখা করবে শুভাশিসের সঙ্গে। বলবে—আমি তোমার বউ দেখতে এলুম শুভাশিস, আমাকে তোমার বউ দেখাও—

মনে মনে শুভাশিসের মনের অবস্থাটা কল্পনা করতে চেষ্টা করলে আরতি। শুভাশিস কি কষ্ট পাবে? কিংবা লজ্জা?

কালীঘাট মন্দিরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল ট্যাক্সিটা।

হঠাৎ আরতির মনে হলো একেবারে খালি হাতে শুভাশিসের বউ দেখতে যাওয়া উচিত নয়। একটা কিছু উপহার কিনে নিলেই ভালো হয়।

আরতি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললে—এখানে একটু থামুন তো—

ট্যাক্সিটা থামলো। আরতি বললে—আপনি এখানে একটু দাঁড়ান, আমি এই দোকান থেকে একটা জিনিস কিনে নিই।

বলে পাশের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দোকানের শো-কেসে অনেক ভালো ভালো শৌখিন জিনিস সাজানো রয়েছে।

দোকানদার বললে—বিয়ের উপহার দেবার মত কিছু জিনিস আছে আপনার?

দোকানদার বললে—আছে বৈকি। এই দেখুন না, এই হাতীর দাঁতের সেটটা, এর দাম আশি টাকা—

—অন্য রকম কিছু?

—তাও আছে। এইটে নিন, কাট্-গ্লাসের সরবত-সেট্। পঁচিশ টাকার মধ্যে হয়ে যাবে আপনার। খুব ভালো দেখতে, অনেকে কিনে নিয়ে যায়।

—অন্য কিছু?

দোকানদার এক-এক করে অনেক জিনিস দেখালো। কোনওটা দশ টাকার, কোনওটা পনেরো টাকার, কোনওটা বা তিরিশ টাকা দামের।

আরতি জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা আপনার কাছে রূপোর সিঁদুর কৌটো আছে?

—হ্যাঁ, খুব ভালো সিঁদুর কৌটো আছে। এই দেখুন—

বলে একটা সিঁদুর কৌটোর ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে আরতির সামনে এগিয়ে ধরলে।

আরতি কৌটোটার ঢাকনা খুলে দেখলে।

বললে—এর ভেতর সিঁদুর নেই তো?

দোকানদার বললে—সিঁদুর আমি পুরে দিচ্ছি—

তারপর সিঁদুর-ভরা কৌটোটা নিয়ে দাম মিটিয়ে দিয়ে আরতি আবার এসে বসলো ট্যাক্সিতে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার আবার জিজ্ঞেস করলে—এবার কোথায় যাবেন?

আরতি বললে—একবার মন্দিরের সামনের দরজার কাছে নিয়ে চলুন তো এক মিনিটের জন্যে—

ট্যাক্সি-ড্রাইভার ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে উল্টো রাস্তা ধরে মন্দিরের প্রাঙ্গণে গিয়ে আরতিকে

নামিয়ে দিলে। আরতি বললে—আপনি একটু দাঁড়ান এখানে, আমার সুটকেসটা রইল, আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।

বলে একেবারে সোজা মন্দিরের ভেতরে ঢুকে গেল। একেবারে মার মূর্তির সামনে নিচু জায়গাটায় দাঁড়িয়ে সিঁদুর কৌটোটা খুললে। তারপর আঙুলের ডগায় সিঁদুর নিয়ে মায়ের মুখের দিকে চাইলে। আর তারপর আঙুলটা বুলিয়ে দিলে নিজের সিঁথির ওপর। আর কেউ না দেখুক, মা তো দেখলো, মা তো সাক্ষী রইল! তাহলেই হলো। বিশ্বচরাচরের যত প্রাণী যত মানুষ যত জীব আছে তারা কেউ না জানুক তাতে কোনও ক্ষতি নেই। একমাত্র তুমি সাক্ষী থেকো মা। আমার কোনও অপরাধ নেই। আমি মরতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমিই আমাকে আজ বাঁচালে। আমি মরে গিয়ে নতুন করে আবার বেঁচে উঠলুম। আর যেন কখনও আমাকে মরতে না হয়। তোমার আশীর্বাদে আমার ফাঁকিটাই আজ সত্যি হয়ে উঠুক।

বলে আরতি অনেকক্ষণ ধরে সিঁদুর-মাখানো সিঁথিটা সেই বেদীর ওপরে ঠেকিয়ে রাখলো।

❋ ❋ ❋

সেদিনও দেবব্রতবাবু যথারীতি বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। পুত্রবধূ এসে শ্বশুরের সামনে চা রেখে দিলে।

বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াতেই সেদিকে নজর পড়লো দেবব্রতবাবুর। এত ভোরে আবার কে এল!

নীলাও দেখলে গাড়িটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গাড়ি থেকে যে নামলো তাকে দেখে সকলেই অবাক। গাড়ি থেকে নামছে আরতি। আরতি বোস।

আরতি হঠাৎ গাড়ি করে কোত্থেকে এল!

গাড়ি থেকে নামতেই আরতি গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকলো।

দেবব্রতবাবু মুখের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে আর কোন কথা নেই তখন।

নীলাও যেন নির্বাক হয়ে গেছে আরতিকে দেখে। আরতি একটা দামী বেনারসী শাড়ি পরেছে, হাতে নতুন চুড়ি, গলায় সোনার ভারি সীতাহার!

দেবব্রতবাবু একবার জিজ্ঞেস করলেন—তোমার পিসীমার অসুখ কেমন আরতি?

নীলা জিজ্ঞেস করলে—তুই বিয়ে করেছিস নাকি আরতি?

আরতি বললে—হ্যাঁ, সঞ্জয় আর ছাড়লে না ভাই। একেবারে নাছোড়বান্দা—

নীলা বললে—সঞ্জয়! সঞ্জয় কে?

আরতি বললে—সঞ্জয়কে তুই চিনবি না। আজ কুড়ি বছরের পরিচয় তার সঙ্গে। কুড়ি বছর ধরে আমাকে সাধাসাধি করছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি। এবার আর পারলুম না। পিসীমাকে দেখতে কলকাতায় গিয়েছিলুম, কিন্তু সে জোর করে আমাকে বিয়ে করে নিলে। কারণ তারও তো আর সময় নেই।

নীলা বললে—তার মানে? সময় নেই কেন তার?

আরতি বললে—সময় কী করে থাকবে। সঞ্জয় আমেরিকায় চলে যাচ্ছে কিনা, আমাকেও তাই সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। নতুন চাকরি পেয়ে গেল আর আসছে তেরো তারিখে সেই চাকরিতে রিপোর্ট করতে হবে সেখানে।

নীলা বললে—চাকরি? কত টাকা মাইনে?

আরতি বললে—আপাতত ন'হাজার করে মাসে, তারপর বাইশ হাজার টাকার গ্রেড্, আমি দেখলুম আমি যদি বিয়ে না করি তো সঞ্জয় চাকরিটা নেবে না! তা আমার জন্যে সঞ্জয় নিজের জীবনটা নষ্ট করে দেবে এটা ভাবতে আমার কষ্ট হলো, তাই রাজি হয়ে গেলুম ভাই—

নীলা আরতির কথাগুলো শুনে আরো হতবাক হয়ে গেল।

তারপর একটু সামলে নিয়ে বললে—তুই তাহলে এ চাকরি ছেড়ে দিবি?

আরতি বললে—তাছাড়া আর উপায় কী? কুড়ি বছর ধরে সঞ্জয়কে এড়িয়ে এসেছি। এবার আর পারলুম না ভাই। আর তাছাড়া আর কতদিন সে আমার আশায় বসে থাকবে বল্!

তারপর দেবব্রতবাবুর দিকে চেয়ে বললে—আমি আর এখানে চাকরি করতে পারবো না, সেই কথাটা বলতেই আজ আপনার কাছে এসেছি। আমার প্রভিডেন্ট্ ফান্ডের টাকা আর এ মাসের মাইনেটা যদি তাড়াতাড়ি স্যাংশান করে দেন তো আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। যতদিন আমি এখানে চাকরি করেছি ততদিন আপনার মতন প্রেসিডেন্ট পেয়েছি বলেই আমার কোন অসুবিধে হয়নি। এখান থেকে চলে যেতে আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আর তো কোনও উপায় নেই।

দেবব্রতবাবু বললেন—না না, তোমার ভালো হয়েছে এটা জেনেও তো আমি খুশি। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব আজই। তুমি কবে যেতে চাও?

আরতি বললে—আপনি যেদিন আমার পাওনা মিটিয়ে দেবেন সেই দিনই চলে যাবো—

দেবব্রতবাবু বললেন—ঠিক আছে—

আরতি আর দাঁড়ালো না সেখানে। তাড়াতাড়ি আবার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর আবার তার নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠলো।

* * *

হাওড়া স্টেশনে সেদিন অনেক ভিড়। বুকিং অফিসের সামনে মস্ত বড় লাইন পড়েছে। তারই শেষ প্রান্তে আরতি একটা সুটকেস নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে লাইনটা এগিয়ে চলেছে। সামনের লোক এক-এক করে টিকিট কাটছে আর লাইন থেকে সরে যাচ্ছে।

যখন আরতি এসে জানলার সামনে দাঁড়ালো তখন পেছনে আরো লম্বা লাইন।

ভেতর থেকে বুকিং-ক্লার্ক জিজ্ঞেস করলে—কোথাকার টিকিট দেব?

আরতি বললে—বোম্বাই—

বুকিং-ক্লার্কটা অবাক হয়ে গেল। বললে—বোম্বের টিকিট এখন কোথায়? সে তো রাত্তিরে পাবেন!

আরতি বলল—তাহলে মাদ্রাজের টিকিট দিন—

বুকিং-ক্লার্ক ভদ্রলোক এবার আরতির মুখের দিকে চেয়ে বললে—আপনি পাগল না মাথাখারাপ? মাদ্রাজ মেল এখন কোথায়? কোথায় যাবেন আগে ঠিক করে ভেবে বলুন।

আরতি জিজ্ঞেস করলে—তাহলে এখন কোথাকার টিকিট বিক্রি হবে?

বুকিং-ক্লার্ক ভদ্রলোক বললে—এখন এলাহাবাদের ট্রেন আছে একটা—

আরতি বললে—তাহলে তাই দিন, এলাহাবাদের টিকিটই দিন—

—কখানা?

—একখানা।

এলাহাবাদের একখানা টিকিট নিয়ে প্লাটফরমের গেট পেরিয়ে আরতি ট্রেনে উঠে বসলো। কোথায় এলাহাবাদ তাও জানে না আরতি। তা না জানুক, জীবনের ঠিকানাই কি কেউ জানে? তবু তো মানুষ সেই জীবন নিয়েই লড়াই করে চলেছে যুগ-যুগ ধরে। তাহলে এলাহাবাদে যেতে দোষ কী?

ট্রেন ছেড়ে দিলে—

***

এই হলো আরতি বোসের কাহিনী। আরতি বোস শেষ পর্যন্ত এলাহাবাদে গিয়েছিল কিনা তা জানি না। হয়ত গিয়েছিল, কিম্বা হয়ত যায়নি। অথবা এলাহাবাদ থেকে অন্য আর কোথাও চলে গিয়েছিল। সংসারে এই রকম আরতি বোস কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে কে তার হিসেব রাখে? এই আরতি বোস আর বশিষ্ঠ সেনদের নিয়েই তো সংসারের চাকা অনন্তকাল ধরে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে গড়িয়ে চলেছে। কখনও সে চলা মন্থর হয়েছে আবার কখনও বা দ্রুত, কিন্তু তার চলা তো কখনও থেমে থাকেনি। এই আরতি বোস আর বশিষ্ঠ সেনদের কাহিনী খবরের কাগজের পাতায় কোনও দিন ছাপা হয়নি, ইতিহাসের পাতাতেও কখনও তাদের জায়গা হয়নি, কিন্তু তারা চিরকালই সংসারে আছে। যে যেমন সে তেমনি ভাবেই আছে, তেমনি ভাবেই থাকবে চিরকাল। বার বার বিভিন্ন দেশে তারা জন্মাবে কিছুদিনের জন্যে তারা হাসবে, ভালবাসবে, আবার চোখের জলে ভাসবে। আর তারপর একদিন অন্য সকলের মত তাদের অস্তিত্বও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেউ তাদের মনে রাখবে না, কেউ তাদের কথা মনে রেখে কাঁদবেও না। শুধু হয়ত কোনও সাহিত্যিক তাদের কথা ভেবে তাদের ভালবেসে নিজের সাহিত্যের মধ্যে তাদের সুখ-দুঃখের নক্‌শা এঁকে যাবে। সে-সাহিত্য কেউ দয়া করে পড়লেও পড়তে পারে, আর না পড়লে তাও বিস্মৃতির মেঘে ঢাকা পড়ে যাবে। কিন্তু সংসারের চলা তা বলে কখনও থামবে না। এই বশিষ্ঠ সেন আর আরতি বোসরা বার বার পৃথিবীতে আসবে আর যে যেমন আছে ঠিক তেমনি ভাবেই থাকবে চিরকাল। আকাশের রং যেমন নীল, অরণ্যের রং যেমন সবুজ, বশিষ্ঠ সেন আর আরতি বোসরাও তেমনি চিরকাল সজীব থাকবে। আকাশ আর অরণ্যের মত তারাও আর কখনও বদলাবে না। সংসারের এই উত্থান-পতনের নাগরদোলায় তারা দুললেও যে যেমন ঠিক তেমনিই থাকবে।

স্বর্ণচাঁপার দিন



উৎসর্গ

মাধবী ও চন্দনকে—

॥ ১ ॥

ইঁট-কাঠ-পাথরের দানবপুরী যেন পলকে অন্তর্হিত হল। পরিবর্তে দু'পাশে সবুজের সমারোহ। কাকচক্ষু জলটলমল দীঘি, অবারিত দিগন্তের বিস্তার।

জানলার ধারে বসে দেখতে দেখতে অমিয় মুগ্ধ হয়ে গেল।

জীবনে এই প্রথম, যদিও বয়স আঠারো পার হয়েছে, হায়ার সেকেন্ডারির জলধি পার হয়ে বি. এস্. সি'র চড়ায় সবে পা ঠেকিয়েছে, তবু কখনও শহরের বাইরে যায়নি। যাবার প্রয়োজন হয়নি।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই এই শহরে—ট্রামে, বাসে, ট্যাক্সিতে, বাড়ির মোটরে তাদের নাগাল পাওয়া যায়। যখন ইচ্ছা যাওয়া যায়, ফিরে আসাও সম্ভব একদিনের মধ্যে। মাঝে মাঝে বাইরেও অবশ্য রাত কাটিয়েছে।

মামার বাড়ি ভবানীপুরের বনেদীপাড়ায়। চার মামা। চারজনই কৃতি। অমিয়কে পেলে সহজে ছাড়ে না। অন্তত দিন তিনেক আটকে রাখে। অন্য সব আত্মীয়রাও ধারে-কাছে।

রেলে চড়া এই প্রথম।

কথাটা স্বীকার করতে অমিয় যথেষ্ট লজ্জা পেল, কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই, এর আগে সে কোন ট্রেনে চড়েনি। দু'একবার স্টেশনে এসেছে বন্ধুবান্ধবকে নামাতে বা তুলে দিতে, কিন্তু নিজে এমনভাবে গদিতে হেলান দিয়ে স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে লৌহদানবের গতির সঙ্গে নিজের মনকে ছুটিয়ে দিতে পারেনি।

প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি মুহূর্ত নতুন বিস্ময়ের দ্বার খুলে দিচ্ছে। নতুন রংয়ের প্রলেপে তার হৃদয় দিশাহারা।

মা-বাপের একমাত্র সন্তান। কাজেই বাড়িতেও সঙ্গীর যথেষ্ট অভাব। খেলাধূলায় আসক্তি কম। পাঠ্য-অপাঠ্য পুস্তকের বাইরের জগতের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। শুধু বৃত্তি নিয়েই নয়, তৃতীয় হয়ে পরীক্ষায় পাস করেছে।

মনে আছে অমিয়র।

পাসের খবর, কৃতিত্বের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

বাপ ফেরেন অনেক রাতে। বেলুড়ে লোহার যন্ত্রপাতির কারখানা। ছোট ছোট যন্ত্রপাতি। কারখানা বন্ধ হবার পরও বাপ অনেকক্ষণ বসে থাকেন। চিঠিপত্র লেখেন। অনেকগুলো ফোন করেন, ফেরার মুখে মহাজনদের গদিতে ঘুরে তবে বাড়ি আসেন।

কিন্তু সে-রাতে অমিয় ঘুমাল না। বাপের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। মা কয়েকবার তাগাদা দিয়েছিলেন।

তুই শুয়ে পড়্ না, আমি বলব তোর রেজাল্টের কথা।

অমিয় বলল, না।

বেশ, তুই-ই বলিস। কাল সকালে বলিস।

এবারেও অমিয় মাথা নাড়ল।

না মা, খবরটা বাসি হয়ে যাবে।

মা হেসে সরে গেলেন।

অমিয়র একটু বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হতেই টান হয়ে বসেছিল। মোটরের আওয়াজ কানে যায়নি।

অমিয়কে দেখে বাপও একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

একি রে, তুই এখনও জেগে?

অমিয় কোন উত্তর দেয়নি। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বাপকে প্রণাম করেছিল।

অমিয়র বাপ যে একেবারে আন্দাজ করতে পারেননি, এমন নয়।

হাসতে হাসতে বলেছিলেন, কি, অমিয়বাবুর ফার্স্ট ডিভিসন নিশ্চয় হয়েছে? ক্লাসের সেরা ছেলে যখন?

কি হয়েছে অমিয় বলেছিল। সোজাসুজি বাপের দিকে চোখ না ফিরিয়ে। অন্য দিকে চেয়ে।

অমিয়র বাপ পকেট থেকে দুটো একশ টাকার নোট বের করে ছেলের হাতে দিয়েছিলেন।

হঠাৎ অমিয় হাততালি দিয়ে উঠল।

তারের ওপর পাশাপাশি গোটাচারেক লাল রঙের ছোট ছোট পাখী। এমন সুন্দর এতগুলো পাখী অমিয় এর আগে খাঁচার বাইরে দেখেনি।

হাততালি দিয়ে অমিয় লজ্জা পেল।

আড়চোখে ট্রেনের কামরার দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হল। না, লজ্জা পাবার কিছু নেই। কামরার মধ্যে অমিয় ছাড়া যাত্রী মাত্র দু'জন।

একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক নিদ্রাভিভূত। আর সুবীর স্পোর্টস্ ম্যাগাজিনের পাতায় বিভোর।

অমিয় আবার বাইরের দিকে চোখ ফেরাল।

এভাবে বাড়ি থেকে একলা বের হবার কল্পনাও সে কখনও করেনি। সুবীর ওভাবে জিদ না করলে হ'তও না কোনদিন।

সুবীরের সঙ্গে অমিয়র পরিচয় মাত্র বছরখানেকের। বাইরের স্কুল থেকে পাস করে সে শহরে এসেছে। সুবীরও ফার্স্ট ডিভিসন, কিন্তু বৃত্তি পায়নি। রসায়নে অনার্স নিয়ে পড়ছে। অমিয় পদার্থ-বিজ্ঞানে।

অমিল দু'জনের মধ্যে প্রচুর। ইতিমধ্যে সুবীর খেলাধূলায় নাম করেছে। কলেজ স্পোর্টস্-এর অনেকগুলো প্রাইজ কুক্ষিগত করেছিল। আর অমিয় কোনদিন মাঠেই পা দেয়নি। লেখা-পড়ার ব্যাপারে দু'জনের খুব মিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশাপাশি বসে আলোচনা করে। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সামনের সারিতে গিয়ে বসে। অবসর সময় গঙ্গার ধারে, কিংবা লাইব্রেরিতে।

সুবীর হোস্টেলে থাকে। অমিয় ছুটির দিন মাঝে মাঝে যায় সেখানে। দুজনে নানা গল্পগুজব করে।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হতে সুবীরই কথাটা পাড়ল।

এবার দেশে গিয়ে ছুটিটা কাটিয়ে আসি। দুটো মাস এ শহরে বসে কি করব?

অমিয় সুবীরের বিছানায় শুয়েছিল। সুবীরের দিকে চেয়ে বলল, দেশ?

এমন একটা শব্দের সঙ্গে তার যেন কোন পরিচয় নেই। তারা চারপুরুষ এই শহরের বাসিন্দা। যে রাস্তায় তাদের বাড়ি---অন্নদা মুখার্জি লেন, সেই অন্নদা মুখার্জি তার প্রপিতামহ। ইংরাজের আমলে সুতোর ব্যবসা করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তাদের কোন পুরুষে কেউ চাকরি করেননি। পিতামহের চুন আর ইঁটের গোলা ছিল, আর বাপের লোহার যন্ত্রের কারখানা।

ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে অমিয় চাকরি করুক, এটাও তার বাপের ইচ্ছা নয়। অমিয় বৈজ্ঞানিক হয়ে তাঁর কারখানায় যোগ দিক। মিশ্র ধাতু দিয়ে এমন কিছু গড়ে তুলুক, যাতে যন্ত্রগুলো দীর্ঘায়ু হয়।

অমিয় হাসে, তা'হলে তো রসায়নে অনার্স নিলেই ভাল হত বাবা!

অমিয়র বাবা থতমত খেয়ে আস্তে আস্তে বলেন, না, না, ফিজিক্সও ভাল। ফিজিক্সে ডক্টরেট পেলেও আমার কারখানার সাহায্য হবে। মোট কথা, তোমার মেধা আমি আর কাউকে পেতে দেব না। আমার কাজে লাগাব।

সুবীর অমিয়কে বলেছিল, হ্যাঁ, দেশ, মানে আমার গ্রাম পাগলাপোতা।

সে আবার কোথায়?

শেয়ালদা থেকে ঘণ্টা আটেকের পথ।

তারপর সুবীরের যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এইভাবে বলল, তুমিও চল না আমার সঙ্গে। এখন তো আর পড়ার চাপ নেই।

উত্তেজনায় অমিয় বিছানার ওপর উঠে বসেছিল।

আমি? আমি যাব তোমার সঙ্গে?

হ্যাঁ, কি হয়েছে? আমাদের বাড়িতে কোন অসুবিধা হবে না। প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই মাকে তোমার কথা লিখি। মাও লিখেছে, এবার ছুটিতে তোর বন্ধুকে এখানে নিয়ে আসিস সুবি।

সুবীরের বাড়ির কথা অমিয় ভাবছে না, সে ভাবছে নিজের বাড়ির কথা, বাড়ির লোকজনের কথা।

এই শহর থেকে সুবীর অন্য কোথাও যাবে এটা ভাবতেই সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কিন্তু তার মা-বাবা কি অনুমতি দেবেন তাকে বাইরে যাবার জন্য? চোখের আড়াল করবেন?

আমাকে কি ছাড়বে বাড়ি থেকে?

অমিয়র কণ্ঠে হতাশার রেশ।

আমি গিয়ে মাসীমা আর মেসোমশাইকে বলে অনুমতি নিয়ে আসব। একটু এদিক ওদিক না বের হলে ভাল লাগে কখনও? ইঁট-কাঠ-পাথরে মানুষের দমবন্ধ হয়ে যায়।

সত্যি তাই। সুবীর ঠিক বলেছে। মাঝে মাঝে নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে অমিয় ভেবেছে। শহরে দৃষ্টিও যেন সীমিত। চার-পাঁচ হাত দূরে দৃষ্টি আটকে যায় পাশের বাড়ির দেয়ালে। কোথাও সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। একেবারে মাপা জীবনযাত্রা। পরিমিত এলাকার মধ্যে চলাফেরা। প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে।

সুবীর অসাধ্যসাধন করেছিল।

প্রথমে অমিয়র মার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। লজ্জায় অমিয় সঙ্গে আসেনি। বাইরের ঘরে বসেছিল।

কথাটা শুনে অমিয়র মা ভ্রূ কুঁচকেছিলেন।

অমিয় তো কোন দিন কোথাও যায়নি সুবীর। ও কি আমাদের ফেলে থাকতে পারবে?

ছেলেকে মাঝে মাঝে কোল থেকে সরিয়ে দিতে হয় মাসীমা, বিশেষ করে যখন সে কোলের চেয়েও আকারে বড় হয়ে যায়।

অমি—অমি কি বলছে!

অমির তো যাবার খুব ইচ্ছা, অবশ্য যদি আপনাদের মত হয়।

সে বলেছে সে আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে?

শেষদিকে অমিয়র মার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল।

ভারি তো দেড় মাসের ব্যাপার মাসীমা! আমি অমিয়কে বলে দেব, প্রত্যেক সপ্তাহে আপনাকে একখানা করে চিঠি দেবে।

অমিয়র মা সোজাসুজি কিছু বললেন না।

ঘর থেকে সরে যেতে যেতে কেবল বললেন, তুমি একবার ওঁকে বলে দেখ সুবীর। উনি যা বলবেন তাই হবে।

সুবীর নিরুপায় হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

অমিয় বাইরের ঘরে বসেছিল। সুবীরকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠল।

কি হল, মা কি বললে?

মাসীমা বললেন, মেসোমশাইকে জিজ্ঞাসা করতে। তিনি যা বলবেন, তাই হবে।

অমিয় কৌচের ওপর বসে পড়ল। ভগ্নোৎসাহ হয়ে।

তারপর নিস্তেজ কণ্ঠে বলল—বাবা অফিস-ঘরে রয়েছে। বলে দেখ।

সুবীরও ভেবেছিল, আশা নেই। অমিয়র মা যখন বিশেষ ইচ্ছুক নন, তখন বাবাও হয়তো মত দেবেন না।

তবু সে আস্তে আস্তে অফিস-ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ভাগ্য ভাল সুবীরের! অমিয়র বাবা একলাই ছিলেন। টেবিলে বসে কি একটা হিসাব করছিলেন।

দরজায় দাঁড়িয়ে সুবীর বলল, আসব মেসোমশাই?

অমিয়র বাবা মুখ তুললেন। টেবিলের ওপর রাখা চশমাটা চোখে দিয়ে বললেন, আরে এস এস, সুবীরবাবু, বল কি খবর?

সুবীর টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল, তারপর নীচু গলায় কথাগুলো বলল।

আশ্চর্য কাণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে অমিয়র বাবা রাজী হয়ে গেলেন।

বেশ তো, খুব ভাল কথা। মাঝে মাঝে বাইরে বের হওয়া খুব ভাল। দশখানা বই পড়ে যা না শেখা যায়, একবার দেশ-ভ্রমণে গেলে অনেক কিছু জানা যায়। তার ওপর তোমরা রয়েছ, ওর কোন কষ্টও হবার কথা নয়।

সব ঠিক হয়ে গেল।

তারপর জিনিসপত্র কেনা-কাটা আরম্ভ হয়ে গেল।

মা সঙ্গে সঙ্গে রইলেন। সতর্ক করে দিতে লাগলেন পদে পদে।

খুব সাবধান, গ্রামে কিন্তু খুব ঠাণ্ডা। সর্বদা গায়ে চাদর জড়িয়ে থাকবে। ঝোপঝাড়ের দিকে একেবারে যাবে না। পুকুরের ত্রিসীমানায় নয়। সময়ে খাওয়া-দাওয়া করবে। কোন অনিয়ম নয়।

সুবোধ বালকের মতন অমিয় প্রতিটি কথায় ঘাড় নেড়ে গেল।

অস্বীকার করে লাভ নেই, শেয়ালদা স্টেশনে পা দিয়ে অমিয়র হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর হয়েছিল। লোকের ভিড়, কুলির হৈ-চৈ, ইঞ্জিনের যান্ত্রিক শব্দ, এসবের সঙ্গে সে আগেই পরিচিত ছিল, কিন্তু এতদিন শুধু দর্শকমাত্র। প্ল্যাটফর্মের এই দৃশ্যের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু এবারে সে দর্শকমাত্র নয়। সে আরোহী। এ নাটকে তার অংশ আছে। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

দু'জনেই ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট করেছিল।

অন্যবার যখন সুবীর একলা যায়, তখন সেকেন্ড ক্লাসেই যাতায়াত করে। অযথা এতগুলো টাকা খরচ করা তার কাছে অর্থহীন মনে হয়।

কিন্তু এবারে অমিয়র বাবা লোক দিয়ে টিকিট কিনে দিয়েছেন। দুখানা ফার্স্ট ক্লাস। ট্রেনে একটু হাত-পা ছড়িয়ে যাওয়াই ভাল।

আসল কথাটা সুবীরের বুঝতে অসুবিধা হ'ল না। পাছে অমিয়র কষ্ট হয়, তাই এই রাজকীয় ব্যবস্থা।

ট্রেন স্টেশনের এলাকা ছাড়তেই অমিয়র পিছনে ফেলে আসা বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজন সব বিস্মৃত হয়ে গেল। নতুন এক জগৎ, তার বিচিত্র বর্ণ আর বিচিত্রতর রহস্য নিয়ে দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হ'ল।

অমিয় জানলার ধার থেকে সরল না। রোদের তীব্রতা বাড়তেও চুপচাপ বসে রইল। প্রতি মুহূর্তে যে দৃশ্যান্তর হচ্ছে, সেদিকে চোখ মেলে।

একসময় বই ছেড়ে সুবীর উঠে পড়ল। অমিয়র পাশে গিয়ে বসল।

আর দেরি নয়।

কিসের?

আকাশের গোধূলির অপূর্ব রঙের খেলা দেখতে দেখতে অমিয় প্রশ্ন করল।

পাগলাপোতা পৌঁছবার। মাঝখানে আর দুটো স্টেশন মালঞ্চকর আর চকদীঘি।

আবার অমিয়র বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। মা-বাবার কথা। কারখানা থেকে এই সময় বাবার ফেরার কথা নয়। মা একলা চুপচাপ বসে থাকে। মায়ের এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তে অমিয় কাছে কাছে থাকে। কলেজের মজার মজার গল্প বলে, কিংবা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের নতুনতম কাহিনী।

এখন কিন্তু মা একেবারে একলা। ঠাকুর-চাকরের সংসারে মা যেন দ্বীপের মতন বিচ্ছিন্ন।

আমার মা তোমাকে দেখে ভারি খুশি হবে।

কেন?

প্রশ্নটা অর্থহীন, কিন্তু কিছু একটা বলা দরকার বলেই যেন অমিয় কথাটা বলে।

বাঃ রে, কেন আবার, তুমি কলেজের রত্ন! বৃত্তি-পাওয়া ছেলে। তোমার কথা আমি যে প্রত্যেক চিঠিতে মাকে লিখি।

॥ ২॥

পাগলাপোতা এল।

দুজনেই তৈরি হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। কামরার অন্য ভদ্রলোকটি আগেই নেমে গেছে।

জানলা দিয়ে মাথা নীচু করে বাইরের দিকে দেখেই অমিয় হতাশ হল।

সার সার কয়েকটা ঘোড়ানিমগাছ। টালিছাওয়া ছোট একটা ঘর। গোটাচারেক কেরোসিনের আলো। অন্ধকারকে আরো যেন বীভৎস করে তুলেছে।

ছোট ছোট নানা রংয়ের নুড়ি বিছানো প্ল্যাটফর্মের ওপর।

ওই যে বাবা!

সুবীরের কণ্ঠের সুরে যেন নতুন আমেজ।

কোথায়?

এদিক-ওদিক চেয়েও অমিয় কাউকে দেখতে পেল না।

ওই যে স্টেশনের বাইরে! গরুর গাড়ির পাশে!

কথার সঙ্গে সঙ্গে সুবীর আঙুল দিয়ে দেখাল।

এবার অমিয় দেখতে পেল।

স্টেশনের বাইরে বাঁশঝাড়ের পাশে ছই-ঢাকা একটা গরুর গাড়ি। তার কাছে দীর্ঘ চেহারার একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

ইনি সুবীরের বাবা! অমিয় আশ্চর্য হল, কারণ সুবীর মাঝারি আকৃতির, রোগাটে ধরনের ছেলে। অথচ তার বাপ তো বেশ দীর্ঘ! রীতিমত হৃষ্টপুষ্ট।

ট্রেন সম্পূর্ণ থামবার আগেই সুবীর নেমে পড়ল। তার হাতে শুধু একটা সুটকেস।

অমিয় কিন্তু ট্রেন সম্পূর্ণ থামতে তবে নামল। খুব সাবধানে পা ফেলে।

প্ল্যাটফর্মে লোক বিশেষ নেই। জনচারেক।

স্টেশনের বাইরে দাঁড়ানো দীর্ঘকায় লোকটি প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। সুবীর গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই, তিনি একটা হাত তার মাথার ওপর রাখলেন।

বাবা, এই অমিয়!

অমিয় হাতের সুটকেসটা নামিয়ে রেখে প্রণাম করল।

সঙ্গে সঙ্গে সুবীরের বাবা দুটো হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

এস অমিয়। তুমি তো ক্লাসের সেরা ছেলে। এদেশে তোমার মতন ছেলেরই আজ দরকার।

অমিয় লজ্জায় অনেকক্ষণ মুখ তুলতে পারল না।

গাড়োয়ান দু'জনের জিনিস তুলে নিল।

প্রথমে সুবীরের বাবা, পিছনে সুবীর আর অমিয় চলতে শুরু করল।

স্টেশনের এলাকা পার হয়ে গরুর গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল।

সুবীর গাড়ির মধ্যে উঠে বসল।

অমিয় ইতস্তত করছে দেখে সুবীরের বাবা বললেন, কি হল, উঠে পড়!

সুবীর হাসল, অমিয় গরুর গাড়িতে এর আগে আর কোন দিন ওঠেনি বাবা। তাই ওর ভয় করছে। তাই না অমিয়?

না, না, ভয়ের কি আছে!

প্রবলবেগে মাথা নেড়ে সব ভয়, সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলার ভান করে অমিয় গাড়িতে ওঠবার চেষ্টা করল।

তার আগেই সুবীর নিজের একটা হাত প্রসারিত করে দিল।

সবশেষে উঠলেন সুবীরের বাবা।

গাড়ির মধ্যে মোটা করে খড় বিছানো। এমন কি হেলান দেবার জায়গায় পর্যন্ত খড়ের বালিশ।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। দুটো গরুর মাঝখানে ঝোলানো হ্যারিকেন। স্বল্প দ্যুতি। ভাল করে পথ দেখাও দুষ্কর। দু'পাশে বাঁশঝাড়, আকন্দর ঝোপ।

এত দেরি করলে কেন আসতে?

গাড়ির মৃদু-মন্দ দোলানিতে অমিয়র ঝিমুনি এসেছিল। সুবীরের বাবার কণ্ঠস্বরে সে চমকে উঠল।

প্রশ্নটা সুবীরকে। সুবীরই উত্তর দিল।

এই যে অমিয়র জন্য দেরি হয়ে গেল!

আবছা অন্ধকার। ভাল করে কারও মুখ দেখবার উপায় নেই, কিন্তু অমিয়র মনে হল সুবীরের বাবা যেন অমিয়র দিকে ফিরে দেখলেন।

অমিয়র জন্য কেন?

সুবীর বলল, অমিয় জীবনে এই প্রথম ট্রেনে উঠল। এর আগে কলকাতার বাইরেই আসেনি। তাই মাসীমা আর মেসোমশাইকে বলে রাজী করাতে সময় নিল।

অমিয় অনুভব করল, একটা হাত তার পিঠের ওপর এসে পড়ল। সামান্য একটু সস্নেহ আকর্ষণ।

তোমার আর ভাই-বোন নেই বুঝি?

অমিয় মাথা নাড়ল। মুখে বলল, না, কিন্তু মুখ থেকে কোন শব্দ বের হ'ল না।

সেই জন্য তোমার মা-বাবা তোমায় চোখের আড়াল করতে চান না। সুবি, দেখো, তোমার বন্ধুর যেন কোন অযত্ন না হয়।

লজ্জায় অমিয় মাথা নীচু করে ফেলল।

ঢালু জমি বেয়ে খুব দ্রুতগতিতে গরুর গাড়ি নামছে। অমিয় প্রাণপণ শক্তিতে পাশের কাঠের হাতল আঁকড়ে ধরল।

আধ ঘণ্টার ওপর। ঘন অন্ধকার নামল দু'পাশের ঝোপ-ঝাড়ের ওপর। নীল আকাশ কালোবর্ণ হয়ে এল। এখানে ওখানে জোনাকির মেলা। ওপরে পাণ্ডুর চাঁদের ফালি।

বাঁকটা ঘুরতেই চারপাশের চেহারা অনেক বদলে গেল। ঝোপ-জঙ্গল উধাও। ধানক্ষেত, তরি-তরকারির বাগান, কলা গাছের জটলা।

সুবীর বলল, অমিয়, এই দেখ পার্বতী!

অমিয় মাথা নীচু করে দেখল। দেখবার চেষ্টা করল। উল্টোদিকে।

ম্লান চাঁদের আলোয় যতটুকু দেখা সম্ভব, সেইটুকুই দেখল। বিরাট নদী। পার দেখা যায় না। ছোট ছোট ঢেউয়ের ওঠা-নামা। মনে হবে নদীর বুকে হাজার রূপোর টুকরো ছড়ানো।

নদী! অমিয়র বিস্মিত প্রশ্ন।

উপনদী বলতে পার। এখান থেকে দশ মাইল দূরে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে।

গঙ্গা অমিয় দেখেছে অনেকবার। কলকাতার গঙ্গা। ডিঙ্গি সাম্পান জাহাজ কন্টকিত, আবর্জনাবাহিনী। শীর্ণা-দুঃস্থা রমণীর মতন শঙ্কিতাও।

কিন্তু এ নদী অনেক অবারিত, অনেক দুর্বার।

একমনে মুগ্ধ চোখে অমিয় পার্বতীর রূপসুধা পান করছিল, হঠাৎ অনেকগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত চিৎকারে চমকে ঘুরে বসল।

প্রকাণ্ড একটা লোহার গেট। তার সামনে লাঠি আর লণ্ঠন হাতে গোটাতিনেক লোক।

সুবীর বলল, এই আমাদের বাড়ি।

সুবীর লাফিয়ে নেমে পড়ল। তারপর সুবীরের বাবা। একেবারে পিছনে অমিয়।

একটা সাদা বাড়ির কাঠামো। মস্ত বড়, রীতিমত প্রশস্ত একটা বারান্দা। প্রায় পার্বতী নদীর ওপর। আধো-অন্ধকারে মোটা মোটা থামগুলো অস্পষ্ট দেখা গেল।

খোঁকাবাবু!

বুড়ো দারোয়ান একজন সুবীরকে প্রায় কোলে তুলে নেবার চেষ্টা করল।

লজ্জায় সুবীর এঁকে-বেঁকে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করল।

মুখে বলল, লছমন, আমি কি আগের মতন বাচ্ছা আছি নাকি যে তুমি কোলে নেবে?

তুমি বুঝি মস্ত বড় হয়ে গেছ! ওই তালগাছের মতন।

দারোয়ান হাত দিয়ে পিছনের বাগানের দিকে দেখাল।

সবাই চলতে শুরু করল। অমিয় পিছনে। সব চেয়ে শেষে দারোয়ান, ঠাকুর, চাকরবাকর।

চওড়া সিঁড়ি লাল রংয়ের। দু'পাশে দুটি পরী। একদিকের পরী অবশ্য ভগ্নদেহ। সিঁড়িতে ওঠার সময় সুবীর অমিয়র পাশে এসে দাঁড়াল। সিঁড়ির চাতালে বিরাট একটা বাঘের মুখ। আলোয় চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। লোল জিহ্বা, মনে হচ্ছে শোণিতসিক্ত।

এই বাঘটা আমার ঠাকুরদা শিকার করেছিলেন।

আন্দাজে অমিয় প্রশ্ন করল।

সুন্দরবনে?

হ্যাঁ, আগে ঠাকুরদার ওখানে জমিদারি ছিল। বছরে বার-চারেক যেতেন।

হঠাৎ সুবীরের কণ্ঠস্বর বদলে গেল। ব্যাকুল একটা তৃষ্ণার সুর ধ্বনিত হল কণ্ঠে।

মা!

অমিয় চোখ তুলে দেখল।

ম্লান নয়, হ্যাজাকের তীব্র চোখ-ধাঁধানো আলো।

একরাশ কুঞ্চিত কেশ পিঠের ওপর ছড়ানো। গোল সিকি সাইজের সিঁদুরের টিপ। আরক্ত গৌরবর্ণ। উজ্জ্বল আয়ত দুটি চোখ। বাঙ্ময়। পরনে চওড়া লালপাড় শাড়ি, লাল ব্লাউজ।

সুবীর ছুটে গিয়ে সেই মাতৃমূর্তিকে প্রণাম করল।

তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই অমিয়র দিকে ফিরে বলল।

অমিয়, আমার মা!

অমিয় নীচু হয়ে পা ছুঁতে যাবার আগেই সুবীরের মা তাকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখটা

ুলে চিবুকে হাত দিয়ে বললেন, দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাকে দেখি ভাল করে। তুমি তো ়ারের টুকরো ছেলে। সুবী দু'পাতা চিঠি লেখে, তার মধ্যে এক পাতা তোমার কথায় ভরা।

অমিয় কিছুক্ষণ আর মাথা তুলতে পারল না।

সুবীর এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে বলল।

নিভা কই মা?

এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, তোদের গাড়ি এসে দাঁড়াতেই ভেতরে পালিয়েছে।

দাঁড়াও ধরে নিয়ে আসি ওকে!

সুবীর দ্রুতপায়ে অন্তঃপুরের দিকে ছুটল।

অমিয় জানে। সুবীরের কাছেই শুনেছে।

নিভা সুবীরের বোন। ভাই-বোনে যেমন ভাব, ঝগড়াও তেমনই! নিভার আর একটা ক নাম আছে। সুবীর বলেছিল। এই মুহূর্তে অমিয়র মনে পড়ছে না।

সুবীরের মা অমিয়র হাত ছাড়েননি। তার হাত ধরেই ভেতরবাড়ির দিকে নিয়ে চললেন।

বড়ো একটা খাট জানলার একপাশে। মেহগনি কাঠের মজবুত টেবিল। টেবিলের পায়াগুলোয় সাপের আকৃতি। একটা মাঝারি আলমারি। কোণে আলনা।

এটা সুবীরের ঘর। তোমরা দুজনেই থাকতে পারবে। নাও, মুখ-হাত ধুয়ে নাও। স্নান করবে নাকি?

না, এখন আর স্নান করব না।

বেশ, তাহলে মুখ ধুয়ে নাও।

তুলসী, অ তুলসী!

প্রৌঢ়া একটি পরিচারিকা এসে দাঁড়াল।

নতুন দাদাবাবুকে স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দাও তো!

তুলসী পাশের একটা দরজা খুলে দাঁড়াল।

স্নানের ঘর একেবারে সংলগ্ন। বড় বড় বালতিতে জল টলমল করছে। সেলফ-এ সাবান, ব্রাশ, দাঁতের মাজন। এদিকে ব্র্যাকেটে বিরাট সাইজের নতুন গামছা। কল নেই। এদিক-ওদিক চেয়ে অমিয় হতাশ হল।

তারপর সাবান দিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে ফেলল। ঠাণ্ডা জল। মনে হল সারাদিনের ক্লান্তি যেন মুছে গেল। পথশ্রমের সব চিহ্ন অপসারিত।

স্নানের ঘর থেকে বাইরে বের হয়েই অবাক হয়ে গেল।

আলনায় তার জামাকাপড়-প্যান্ট সাজানো। সুটকেসটা খাটের তলায় রাখা। টেবিলের ওপর তার কলম আর ডায়েরী।

যে সময়টুকু সে স্নানের ঘরে ছিল, তার মধ্যেই কে তার সুটকেস খুলে কাপড়-জামা সাজিয়ে রেখেছে।

হয়েছে? দরজায় সুবীর এসে দাঁড়াল।

দাঁড়াও, চুলটা আঁচড়ে নিই!

দেয়ালে টাঙানো বড় একটা আয়নায় চুল আঁচড়ে নিয়ে অমিয় সুবীরের পিছন পিছন বাইরে এসে দাঁড়াল।

এস। সুবীর বারান্দা পার হয়ে বাঁদিকের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পাশাপাশি তিনটি কার্পেটের আসন পাতা। ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে জল।

সুবীর বসল। অমিয়কে বসাল পাশে।

অমিয় বলল, আর একটা আসন কার?

বাবার। বাবা ঠাকুরঘরে গেছে, এখনই এসে পড়বে।

অমিয়দের বাড়ি খাবার ব্যবস্থা টেবিল-চেয়ারে। মাঝে মাঝে কাঁটা-চামচও ব্যবহার করে।

ঠাকুরঘর একটা আছে বটে, কিন্তু শুধু সেটা ঠাকুরের ঘর নয়। অকেজো হাঁড়িকুড়ি, বেতের ধামা, সাজি, অমিয়র ছেলেবেলার প্যারাম্বুলেটর সব আছে সে-ঘরে। দেওয়ালে গোটাতিনেক পট। বিশেষ পালাপার্বণে, অথবা বাড়িতে কারো অসুখ-বিসুখ হলে মা ঠাকুরঘরে ঢোকে।

মা, আমরা এসে গেছি!

সুবীরের চীৎকারে অমিয়র চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

যাই রে, হয়ে গেছে।

এদিকের দরজা দিয়ে সুবীরের বাবা এসে ঢুকলেন। পরনে গরদের জোড়। ঠাকুরঘর থেকেই সোজা চলে এসেছেন।

আসনে বসে বললেন, তোমাদের পরীক্ষা কেমন হল?

প্রশ্নটা ঠিক কাকে কিংবা কে আগে কথা বলবে সেটাই অমিয় ভাবতে লাগল।

সুবীরই উত্তর দিল—আমার পরীক্ষা মোটামুটি একরকম হয়েছে। কোয়েশ্চেন পেপার একটু দীর্ঘ হয়েছিল। বিশেষ করে কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার।

একটু দম নিয়ে সুবীর আবার বলল—অমিয়র পরীক্ষা ভালই হয়েছে। ও তো ভাল ছেলে। পরীক্ষা ওর কাছে কিছুই নয়।

একটা প্রতিবাদ করা উচিত, অন্তত ভদ্রতার খাতিরে, এই ভেবে উত্তর দিতে গিয়েই অমিয় থেমে গেল।

সুবীরের মা ঘরে ঢুকছেন। দু'হাতে দুটি কাঁসার থালায় স্তূপীকৃত সাদা লুচি।

বোধ হয় নিজেই লুচি ভাজছিলেন, আগুনের তাপে সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। ঘামে চূর্ণ কুন্তল কপালে আটকে রয়েছে।

অমিয় অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

একটা থালা অমিয়র সামনে আর একটা সুবীরের সামনে নামিয়ে রেখে বললেন, ওমা, তুমিও এসে গেছ! দাঁড়াও, তোমারটা নিয়ে আসি।

খেতে বসে কোন কথা হল না।

অমিয়র মা সামনে বসে খাওয়া তদারক করলেন। তরি-তরকারি পাচকই নিয়ে এল। অমিয় মাথা নেড়ে, হাত নেড়েও নিষ্কৃতি পেল না। বাড়িতে সচরাচর যা খায়, তার প্রায় দ্বিগুণ খেতে হল তাকে।

খাওয়া শেষ হতে সুবীরের বাবা বললেন, যাও তোমার বন্ধুকে নিয়ে একটু বাগানে গিয়ে বস, আর যদি ক্লান্ত মনে কর তাহলে বরং শুয়ে পড়।

অমিয় বলল, না, ক্লান্তি আর কি! সারাটা পথ তো গরুর গাড়িতেই এসেছি।

সুবীর হাসল, ঠিক আছে, তাহলে চল বাগানে গিয়ে একটু বসি।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে পার্বতী নদীর পাশ দিয়ে দুজনে হাঁটতে লাগল। আকাশে জ্যোৎস্না আরো উজ্জ্বল। চারিদিকে দুগ্ধধবল আস্তরণ।

ধারেকাছে কোথাও অজস্র ফুল ফুটেছে। বাতাসে মদির সুরভি।

একটু এগিয়ে সুবীর বলল—এস, এইখানে বসি।

ঠিক নদীর পারে লাল রংয়ের সিমেন্টের বেদী। দু'পাশে। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে পার্বতী নদীর জল পর্যন্ত। সিঁড়িগুলোর রংও লাল।

দুজনে বসল পাশাপাশি।

রেডিওর নব্ খুব অল্প ঘুরিয়ে দিলে যেমন অস্পষ্ট সঙ্গীত ভেসে আসে, নদীর স্রোতে তেমনই দূরাগত সঙ্গীতের আভাস।

বেশ কিছুক্ষণ অমিয় কথা বলল না। বলতে পারল না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই অনাবিল সৌন্দর্যরাশির দিকে চেয়ে রইল।

তারপর খুব মৃদু কণ্ঠে বলল, এই নদীতে তোমরা স্নান কর না?

হ্যাঁ করি বৈকি। আগে যখন এখানে ছিলাম, তখন তো রোজ করতাম, কেবল বর্ষাকাল ছাড়া।

কেন, বর্ষাকালে নয় কেন?

বর্ষাকালে পার্বতী নদী মহানদী হয়ে যায়। দারুণ স্রোতের টান, আর কি গর্জন! স্নান করা যায় না।

তোমার বাবা কি এখানেই চাকরি করেন, না কোন ব্যবসা-বাণিজ্য?

কোনটাই নয়। আমাদের অনেক জমিজমা ছিল, বেশির ভাগ গভর্নমেন্ট নিয়ে নিলেও এখনও কিছু আছে, তাতেই চলে যায়। তাছাড়া বাবার বোধ হয় কোম্পানির কাগজও কিছু আছে, যার সুদ পান।

অমিয় আর কিছু বলল না। চাকরি বা ব্যবসা কিছুই না করে একটা লোক কিভাবে দিনাতিপাত করে, সেটা সে শহরের ছেলে, তার জানা নেই। জীবিকার জন্য যেখানে উদয়াস্ত অক্লান্ত পরিশ্রম, বিরামহীন ছুটোছুটি, তিলে তিলে রক্তক্ষরণ, সেখানে এই নিশ্চিন্ত আরামের রহস্য তার অজানা।

সে অন্য প্রশ্ন করল।

তুমি তো রিসার্চ করবে পাস করলে, তাই না?

সেরকম তো ইচ্ছা আছে। জানি না কি হবে! বাবার ইচ্ছা আমি সয়েল কেমিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করি, যাতে এদেশের কৃষিশিল্পের উন্নতি হয়।

খুব ভাল কথা। তোমার বাবার বোধ হয় ইচ্ছা, এদেশের উৎপাদন যাতে বাড়ে, এমন কিছু কর। দেশের উন্নতি কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত একথা অনেক মনীষীই বলেছেন। অবশ্য বিদেশের মনীষীরা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিছু করার চেষ্টা বিশেষ হয়নি। রাতারাতি কৃষিপ্রধান একটা দেশকে নেতারা শিল্পকেন্দ্রিক করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন।

তাই তো বাবা বলেন। বেদের যুগ থেকে এদেশে ধানের চাষ হয়ে আসছে, অথচ কি করে নতুন উপায়ে, নতুন পদ্ধতিতে ধানের চারা রোপণ করতে হবে সেটা আমাদের শেখাতে বিশেষজ্ঞ আসছেন জাপান থেকে!

ঠিক বলেছেন। এছাড়া আরো একটা কথা ভাব—

হঠাৎ অমিয় থেমে গেল। কথা শেষ করতে পারল না।

প্রথমে মনে হল পিছনের লতাকুঞ্জের অন্তরাল থেকে বুঝি কোন নিশাচর পাখী ডেকে উঠল। বাতাস কাঁপিয়ে অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠস্বর।

দাদা!

অমিয় এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল।

বাবা বলছে এবার শুতে এস। রাত হয়েছে।

অমিয়র কানে ঝরাপাতার মর্মরধ্বনি এল। মনে হল পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে কে যেন সরে গেল।

কে? অমিয় সুবীরের দিকে চোখ ফেরাল।

আমার বোন নিভা। চল, উঠি।

এ বাড়িতে পা দিয়েই অমিয় একবার নিভার নাম শুনেছিল। এই আবার শুনল। শুধু নাম নয়, কণ্ঠও।

অবারিত জ্যোৎস্নাধারার সঙ্গে, আলোছায়ার রহস্যময় পরিবেশের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের কোথায় একটা মিল আছে।

একবার অমিয়র মনে হ'ল, মানুষ নয়, অশরীরী সুমিষ্ট শুধু একটা কণ্ঠস্বর।

যেতে-যেতেই অমিয় প্রশ্ন করল—তোমার বোন কি পড়ে?

স্কুলে যায় না, এখানে মেয়েদের ভাল স্কুল নেই। বাড়িতেই পড়ে। মার কাছে, বাবার কাছে, পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে।

সেদিন আর কোন কথা হল না। দুজনে শোবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

মা অপেক্ষা করছিলেন।

বললেন, তোমরা দু'জনেই নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। শুয়ে পড়।

সুবীর আর অমিয়র পিছনে মাও ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। মাথার বালিশ ঠিক করে দিলেন। হাত দিয়ে ঝেড়ে দিলেন বিছানার চাদর।

অমিয়র শিয়রে দাঁড়িয়ে বললেন, এখন অমিয়র নিশ্চয় মার কথা খুব মনে পড়ছে?

বালিশে মুখ গুঁজে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাথা নেড়ে অমিয় বলল, না, না।

মুখে না বলল বটে, কিন্তু মনে মনে ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল, সুবীরের মা কি অন্তর্যামী! মনের কথাটা ঠিক কি করে টের পেলেন?

এই সময়, রাতে যখন বিছানায় অমিয় শোয়, তখন মা তার মাথা কাছে এসে বসেন। হাত দিয়ে চুলে বিলি কাটেন। অমিয় ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত। খুব ছেলেবেলার অভ্যাস, কিন্তু বড় হয়ে পর্যন্ত এ অভ্যাস তার যায়নি।

সত্যিই এই মুহূর্তে মার কথা খুব বেশি মনে পড়ছে। তার উনিশ বছরের জীবনে এই প্রথম বাইরে আসা। মাকে ছেড়ে থাকা। মার স্নেহ-মমতার আওতার বাইরে চলে আসা। প্রত্যক্ষ স্পর্শের বাইরে।

অমিয় ভেবেছিল নতুন জায়গায় ঘুম আসবে না, কিন্তু শোবার কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। সুবীরের সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারল না।

॥ ৩ ॥

যখন ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে বিছানার ওপর। বেশ চড়া রোদ। সুবীর পাশে নেই। কখন উঠে গেছে।

অমিয় বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল।

পার্বতী নদীর ওপর দিয়ে কয়েকটা নৌকা চলেছে। গোটা দুয়েক জেলেডিঙ্গি, একটা পালতোলা।

জানলার গরাদ দুটো আঁকড়ে ধরে অমিয় নিবিড় বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

কী, শরীর ভাল আছে তো? সুবীরের গলা।

অমিয় ফিরে দাঁড়াল।

কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, ভালই আছে। উঠতে একটু দেরি হয়ে গেল।

আমি তোমাকে ওঠাচ্ছিলাম, মা-ই বারণ করল। বলল, বোধ হয় ক্লান্ত। ওঠানো ঠিক হবে না।

সুবীরের পরনে হাফশার্ট আর হাফপ্যান্ট।

এ কি পোশাক?

বাবার সঙ্গে মাইল-দুয়েক বেড়িয়ে এলাম। মর্নিং-ওয়াক। কাল থেকে তোমাকেও বেড়াতে যেতে হবে।

অমিয় হাসল। ঠিক আছে। বেড়াতেই তো এসেছি!

এস, মুখ ধুয়ে খাবে এস।

এবার বারান্দায় আসন পাতা হয়েছে। পর পর তিনটে। অমিয় আর সুবীর বসল

সুবীরের মা এসে দাঁড়ালেন।

অমিয়র দিকে ফিরে বললেন—অমিয়, বাড়িতে কি খাও সকালে? চা-বিস্কুট কিংবা চা-পাঁউরুটি, তাই না?

মাথা নিচু করেই অমিয় মাথা নাড়ল।

এখানে আমরা কিন্তু পাড়াগাঁয়ের মানুষ, তোমাকে একেবারে গাঁয়ের খাবার খাওয়াব।

বলে মা আর দাঁড়ালেন না। বারান্দা পার হয়ে ভিতরের ঘরের দিকে চলে গেলেন। একটু পরেই আবার এসে দাঁড়ালেন। পিছনে পাচকের হাতে প্রকাণ্ড একটা থালা। সেই থালাটা সে নামিয়ে রাখল।

তিন বাটি ধূমায়মান দুধ। তিনটে সাদা রেকাবিতে প্রচুর মুড়ি, নারকেল আর তিনটে বড় সাইজের সন্দেশ। তিনটে আসনের সামনে সবগুলো সাজিয়ে রাখল।

তোমার যদি চা খাওয়ার অভ্যাস থাকে, বল অমিয়, সে ব্যবস্থাও আমাদের আছে।

এবার অমিয় মুখ তুলল। মায়ের চোখে চোখ রেখে বলল, না, অভ্যাস আমার নেই। বাড়িতে মাঝে মাঝে আমি দুধও খাই।

দুধও যে খায় সেটা প্রমাণ করার জন্যই অমিয় নিচু হয়ে দুধের বাটিতে চুমুক দিতে গিয়েই 'উঃ' করে থেমে গেল।

মা হাঁটু মুড়ে অমিয়র পাশে বসলেন।

আহা বাছা রে, পুড়ে গেল মুখটা!

জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো বোলাতে বোলাতে অমিয় বলল, না, পুড়ে যায় নি।

নাও, মুড়ি গালে দাও।

অমিয় মুড়ি আর নারকেল চিবোতে লাগল।

আমাকে আর একটু নারকেল দাও মা। তুমি অমিয়কে বেশি দিয়েছ।

সুবীর আঙুল দিয়ে অমিয়র রেকাবির দিকে দেখাল।

অমিয় হাসল। মাও হাসলেন।

কি হিংসুটে ছেলে বাবা! নিজের চাই বললেই হয়!

মা চলে যেতে যেতে অমিয় তৃতীয় আসনটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—তোমার বাবা আসবেন না? দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!

ওটা বাবার জন্য নয়। বাবা বেরিয়ে গেছেন, দুপুরের আগে ফিরবেন না। ওখানে নিভা বসবে।

মা ফিরে এলেন রেকাবিতে নারকেল নিয়ে। শুধু সুবীরকে নয়, অমিয়কেও দিলেন।

সুবীর বলল, নিভা কোথায় গেল মা?

মেয়েকে তো বলছি আসতে। লজ্জাতেই খুন হচ্ছে! দাঁড়া, ডেকে নিয়ে আসি।

মা সরে গেলেন।

একটু পরেই মা ফিরলেন, একটা হাতে নিভার হাত শক্ত করে ধরা।

মেয়ে লজ্জাতে গেল! দাদাদের কাছে আবার লজ্জা কি রে? নে, বস!

অমিয় মুখ তুলে দেখল। আনত দুটি চোখ, আরক্ত মুখ, লজ্জাবনতা একটি কিশোরী। একমাথা কুঞ্চিত কেশ, রং যেন নিকষিত হেম।

এই নিভা! আগের রাতে আধো অন্ধকারে যাকে ভাল করে দেখতে পায় নি! দেখতে পায় নি, কিন্তু কণ্ঠ শুনেছে।

গ্রামোফোন রেকর্ডে শোনা একটা গানের কলি অমিয়র মনে পড়ল।

এখনও তারে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশি শুনেছি!

নিভা আসনে বসবার আগে একটা কাণ্ড করে বসল।

হঠাৎ টিপ করে অমিয়কে প্রণাম করল।

অপ্রস্তুত, হতবাক অমিয় প্রায় চীৎকার করে উঠল।

এ কি, আমাকে কেন?

সুবীরের মা বললেন, কেন, কি হয়েছে? দাদাকে প্রণাম করবে না?

খেতে খেতে আর কোন কথা হ'ল না।

অমিয় এইটুকু বুঝতে পারল, তার পাশে বসার জন্য নিভা স্বস্তিতে খেতে পারছে না। থালার ওপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে কোনরকমে মুড়ির গ্রাস মুখে দিচ্ছে।

প্রথমে সুবীর উঠে পড়ল।

অমিয়র খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিভা পাশে বসে তখনও খাচ্ছে বলে সে উঠল না। উঠতে পারল না।

সুবীরের মা সরে গেছেন সেখান থেকে। তাঁর অনেক কাজ বাকি। এসময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তাঁর চলে না।

বারান্দায় পাশাপাশি শুধু অমিয় আর নিভা। খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও চুপচাপ এভাবে বসে থাকতে অমিয়র ভারি সঙ্কোচ হ'ল। অথচ হঠাৎ উঠে যাওয়াটাও বোধ হয় ভদ্রোচিত হবে না।

অনেক কষ্টে সাহস সংগ্রহ করে আড়চোখে নিভার দিকে চেয়ে অমিয় বলে ফেলল—আমি উঠব?

নিভার মাথাটা প্রায় মাটি ছোঁয়ার দাখিল। মনে হ'ল এক মুঠো আবির কে যেন তার সারা মুখে ছড়িয়ে দিল।

কোনরকমে আস্তে আস্তে সে মাথাটা কাত করল।

অর্থাৎ অমিয় উঠতে পারে।

অমিয় উঠে পড়ল।

সিঁড়ির কাছবরাবর যেতেই অমিয় দেখতে পেল সুবীর একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। ওপর দিকে চেয়ে।

অমিয়র সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে হাত নেড়ে অমিয়কে ডাকল।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে অমিয় সুবীরের পাশে দাঁড়াল।

গাছটার কাছে এসে অমিয় চিনতে পারল, সেটা বকুল গাছ। তলাটা গোল করে বাঁধানো। এটাও সিমেন্টের।

অমিয় কাছে আসতে সুবীর জিজ্ঞাসা করল।

একটা কথা সত্যি বলবে?

কি কথা?

তোমার খেতে খুব কষ্ট হ'ল, তাই না? মুশকিল এখানে শহরের মতন পাঁউরুটি পাবার উপায় নেই!

অমিয় সুবীরের একটা হাত চেপে ধরল।

তোমার কি মাথা খারাপ? এমন খাবার খারাপ লাগবে? এসব জিনিস আমরা শহরে পাচ্ছি কোথায়?

একটু থেমে, প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টায় অমিয় বলল, এখন তোমার কি প্রোগ্রাম?

চল নদীর ধার ধরে হেঁটে আসি। কোনদিন তো গ্রাম দেখনি! গ্রাম দেখবে।

অমিয় রাজী।

দু'জনে হাঁটতে শুরু করল। একেবারে পার্বতী নদীর কিনারা দিয়ে।

রোদের তাপ কম। আকাশের বুকে ছড়ানো-ছিটানো মেঘের টুকরো। বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ। হাঁটতে অমিয়র একটুও কষ্ট হ'ল না। বরং ভালই লাগল। শহরের মতন যানবাহন-কণ্টকিত পথে শঙ্কিত পদক্ষেপ নয়, প্রতি মুহূর্তে পরমায়ু রক্ষার প্রয়াস তো নয়ই। স্বচ্ছন্দ গতি। গল্প করতে করতে অনায়াসে অন্যমনস্ক হওয়া যায়। আশঙ্কার কারণ নেই।

ওই দেখ আমাদের স্কুল। রজনী নিকেতন। সুবীর আঙ্গুল তুলে দেখাল।

গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো সাদা রঙের কোঠাবাড়ি দেখা গেল। চারপাশে বাঁশের বেড়া।

অমিয় দাঁড়িয়ে পড়ল।

এই স্কুল থেকে তুমি হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছ?

না, সুবীর মাথা নাড়ল, এই স্কুলে সাত ক্লাস পর্যন্ত আছে। এখান থেকে পাস করে মাইল-দুয়েক দূরের বড় স্কুলে পড়তে যেতাম।

কি রে, সুবী নাকি?

অমিয় চমকে ঘাড় ফেরাল।

খালি গা, পরনের ধুতিটা লুঙ্গির মতন জড়ানো। হাতে লাঠি। এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ ঝোপের পাশ থেকে বেরিয়ে এল।

হ্যাঁ দাদু, আপনি ভাল আছেন?

নত হয়ে সুবীর প্রণাম করল। সঙ্গে সঙ্গে অমিয়কেও ইশারা করল।

অমিয় প্রণাম করতেই বৃদ্ধ দুটি চোখের ওপর একটা হাত দেখে অমিয়কে দেখবার চেষ্টা করল। নাবিকরা জাহাজের ডেক থেকে যেভাবে দূরের দ্বীপ দেখে সেই ভঙ্গীতে।

এটি কে, চিনতে পারলাম না তো!

এর নাম অমিয় মুখোপাধ্যায়। আমার সঙ্গে পড়ে। খুব ভাল ছেলে। স্কলারশিপ পাচ্ছে।

বা, বা, জলপানি পাচ্ছ! বাহাদুর ছেলে! বেঁচে থাক বাবা, বংশের মুখোজ্জ্বল কর। তা এখানে কি উদ্দেশ্যে? বেড়াতে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আর বাবা, গ্রামে কি আর সে শ্রী আছে, না সম্পদ আছে? এ তো মরুভূমি। গ্রামের সব মানুষ যদি শহরের দিকে ছুটে যায়, তাহলে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি আর হবে কি করে?

লোকটি যেমন আচমকা দেখা দিয়েছিল, তেমনই আচমকা ঝোপের আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

সুবীর সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, বয়স মানুষকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

সুবীরের এই আকস্মিক দার্শনিকতার অর্থ অমিয় বুঝতে পারল না। তাই সে বলল, একথা বলছ কেন?

যাঁকে দাদু বললাম, ইনি কানাই দত্ত। একসময়ে ইংরাজরা এঁর ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপত। অহিংস নীতি নয়, হিংসা নীতি। বোমা-বারুদের ব্যাপার। জীবনের বেশীর ভাগ সময় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কাটিয়েছেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু এ স্বাধীনতায় ইনি সন্তুষ্ট নন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। দেশের লোকের দুঃখ-দারিদ্র্য যদি না ঘুচে থাকে, তাহলে খবরের কাগজের এ স্বাধীনতা অর্থহীন। এদেশী সরকার এঁকে একটা মাসোহারা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ইনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

চলতে চলতে সুবীর এ কাহিনী বলছিল। অমিয় শুনছিল।

সুবীরের কথা শেষ হতেই অমিয় দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরে দেখল। ঝোপের অন্তরালে মিলিয়ে যাওয়া লোকটাকে যদি আর একবার দেখতে পায়। শান্ত গাছপালা, নির্জীব এই তৃণভূমির সঙ্গে যে লোকটার অন্তরপ্রকৃতির সাদৃশ্য কম। বেশি মিল পার্বতী নদীর সঙ্গে।

গর্জন-মুখরিত, অশান্ত, বিক্ষুব্ধ পার্বতী।

অমিয় বিজ্ঞানের ছাত্র। ইতিহাস তার পাঠ্য ছিল না, কিন্তু ইতিহাসের অনেক বই সে পড়েছে। গ্যারিবল্ডি, নেপোলিয়ঁ, ডি ভ্যালেরার বীরত্বের অধ্যায়। এদেশের তিলক, লাজপত, নেতাজীর বৈপ্লবিক সাধনার কথা। দেশের প্রান্তে প্রান্তে বহুবার দাবানল জ্বলে উঠেছে। সেই দাবানলের এঁরাই স্ফুলিঙ্গ।

গ্রামের অখ্যাত অজ্ঞাত বীর সৈনিকের দল।

রাজনীতির ব্যাপারে অমিয়র প্রত্যক্ষ কোন আকর্ষণ নেই। তবে পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে রাজনীতির পাঁচালী অনবরত শোনানো হচ্ছে। ইচ্ছা না থাকলেও কানে আসে। জাগ্রত চেতনা তার পরিবেশকে উপেক্ষা করতে পারে না। যে দেশে বাস করে, যে মানুষদের মধ্যে, তার সম্বন্ধে, তাদের সম্বন্ধে জানতে হয়, ভাবতে হয়। অনেকের মুখেই এ ধরনের আক্ষেপ শুনেছে।

দেশের অবস্থার পরিণতি ঘটছে। দেউলে হয়ে গেছে দেশটা, কৃষিপ্রধান একটা দেশকে রাতারাতি শিল্পপ্রধান উপমহাদেশ গড়ে তোলবার হাস্যকর প্রচেষ্টায়। মানুষ খুশি নয়। দেশের বুকে তাই হাহাকার, তাই বিক্ষোভ।

অমিয় বাবার কাছ থেকে অন্য কথা শুনেছে।

তিনি বলেছেন, এত দিনের পরাধীন একটা দেশ এক মুহূর্তে সমৃদ্ধ হতে পারে না। তার জন্য আরও স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন। সব বিষয়েই আমরা সরকারের মুখাপেক্ষী। আমাদের সব সমস্যার সমাধানের চাবি যেন কেবল তাদেরই হাতে। এই চিন্তা, এই মনোভাব আমাদের আরো দুর্বল, আরো নিশ্চেষ্ট করে তোলে। ছোট ছোট শিল্প, ছোট ছোট প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে দেশকে উন্নীত করতে হবে। তার অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় করতে হবে।

কি হ'ল, চল! সুবীর তাড়া দিল।

বিব্রত অমিয় দ্রুত পা চালাল।

কি ভাবছিলে?

তোমার দাদু ভাবনার খোরাক দিয়ে গেলেন।

কি রকম?

দেশের জন্য যে এঁরা এত ত্যাগ করলেন, কি হল দেশের অবস্থা? জগৎসভায় আমরা নামের প্ল্যাকার্ড ছাড়া আর কি আহরণ করতে পারলাম?

সুবীর কি ভাবল, তারপর বলল, কৃষিউন্নয়ন ছাড়া এ দেশের উন্নতির কোন পথ নেই। গান্ধীজী যে বলতেন back to village, তার মানে এই নয় যে গ্রামের জীবন গ্রহণ কর। তার অর্থ, গ্রামকে উন্নীত কর। ভারতবর্ষের কৃষিসম্পদ আর বনজ সম্পদের মধ্যেই তার উন্নতি নিহিত। শিল্পসমৃদ্ধি শুধু জীবনের জটিলতা বাড়ায়। মানুষকে অলস করে।

জানে না অমিয়? এদেশের প্রকৃত মুক্তি কিসে তা তার ধারণার বাইরে। তার বাবা বলেন শিল্প-প্রচেষ্টায়, সুবীরের বাবা বলেন, কৃষির উন্নতিতে। হয়তো দুজনেই ঠিক, কিংবা দুজনেই ভ্রান্ত।

এসব কথা চিন্তা করে এখন লাভ নেই। তার সামনে অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎ তাকে পাড়ি দিতে হবে। অধ্যয়নই তার একমাত্র সাধনা। অন্য কোনদিকে দৃকপাত করা, অন্য কথা চিন্তা করা তার পক্ষে অন্যায়।

পেন্নাম, দাদাবাবু।

অমিয় মুখ তুলল।

সুবীরের সামনে তিনজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। শতচ্ছিন্ন কাপড় হাঁটুর ওপর। উর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই। পাঁজর-প্রকট চেহারা।

এই দুলু, পরাণ—ভাল আছ সব?

ভাল আর কোথায় দাদাবাবু? গত দু'বছর অজন্মা গেল। আগে জমিদারের আমলে তবু কেঁদে-কেটে পড়লে খাজনা মাপ হ'ত, এখন তো আর তা হবার যো নেই। গলায় গামছা দিয়ে কড়ি আদায় করে নেবে। হাল-গরু, বীজধান বেচে মহাজনের ঋণ শোধ করতে হয়। এতটা পথ যখন এসেছেন, তখন একটু বসবেন আসুন।

সামনেই গোটাকয়েক কুঁড়েঘর। গোলপাতার চাল, মাটির দেওয়াল। গোবর-নিকানো উঠান।

সুবীর আর অমিয় দাওয়ায় গিয়ে বসল। চাটাইয়ের ওপর।

দুটো থালায় মুড়ি এল। তেল-নুন মাখা। সঙ্গে কাঁচালঙ্কা।

অমিয় বলল, আমি আর পারব না ভাই। তুমি বলে দাও।

সুবীর ফিসফিস করে বলল, অন্তত দু'এক মুঠো মুখে দাও, নইলে এরা মনে দুঃখ পাবে।

॥ ৪ ॥

যখন সুবীর আর অমিয় ফিরল তখন রোদ বেশ প্রখর। এলোমেলো হাওয়ায় শুকনো পাতা ঘূর্ণির আকারে উড়ছে। দুজনের মুখই আরক্ত। স্কুল, মন্দির, পুরানো একটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, যার ঐতিহাসিক খ্যাতি ছিল, সব দেখা হয়ে গেছে। দুই বন্ধুতে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করতে করতে ফিরছিল।

নীচের সিঁড়িতেই মার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

তাঁকে দেখেই মনে হল তিনি যেন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন।

কিরে, এত দেরি? উনি কখন থেকে স্নান করে অপেক্ষা করছেন!

সুবীর হাসল, অমিয়কে সব দেখিয়ে আনলাম মা। রজনী নিকেতন, দুলুদের বাড়ি, এমন কি দাদুকে পর্যন্ত।

যাও, যাও, স্নান করে এসো দু'জনে। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

আমরা এখনই নদী থেকে স্নান করে আসছি মা। সর, গামছাটা নিয়ে আসি।

নদী থেকে? অমিয় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে পার্বতী নদী। ওপার দেখা যায় না এমনই অগাধ বিস্তার। সূর্যের আলোতে এত প্রদীপ্ত যে চেয়ে থাকা যায় না।

আমি বাড়িতেই বরং স্নান করব।

খুব মৃদুকণ্ঠে থেমে থেমে অমিয় বলল।

সুবীর সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠেছিল। অমিয়র কথা কানে যেতেই থেমে গেল। স্মিতহাস্যে প্রথমে অমিয়র দিকে, তারপর মায়ের দিকে দেখল।

মা এক হাত দিয়ে অমিয়কে কাছে টেনে নিলেন।

হ্যাঁ, তোমায় নদীতে স্নান করতে হবে না। তুমি বাড়িতেই স্নান কর।

তারপর সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দায় পা দিয়ে মা আবার বললেন, তুমি বুঝি সাঁতার কাট না অমিয়?

অমিয় ঘাড় নাড়ল, না। আমি তো কোনদিন শহরের বাইরে যাইনি। অবশ্য শহরেও সাঁতার শেখার সুযোগ আছে, অনেক জায়গায় শেখায়, কিন্তু আমাকে বাড়ি থেকে যেতে দেয়নি।

মা আর কোন কথা বললেন না। অমিয়কে ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

এবারেও তিনটি আসন, একটিতে সুবীরের বাবা বসে আছেন।

পরিষ্কার দিনের আলোয় তাঁকে ভাল করে দেখবার সুযোগ অমিয় পেল।

দীর্ঘ, বলিষ্ঠ চেহারা, পরিশ্রমী, সেটা তাঁর পেশীপুষ্ট দেহেই প্রকট। রঙ একসময়ে গৌর ছিল, ইদানীং তামাটে।

পাশাপাশি নিজের বাবার ছবিটা অমিয়র মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল।

দীর্ঘ চেহারা, কিন্তু এতটা বলিষ্ঠ নয়। চোখে পুরু পাওয়ারের চশমা। সারা মাথায় চুলের সংখ্যা কম, যে কয়টি আছে তার বেশিতেই রূপালী ছোপ।

একদিন আমার খামার দেখতে চল অমিয়—খেতে খেতে সুবীরের বাবা বললেন।

অমিয় কোন উত্তর দিল না। সুবীরের দিকে চোখ ফেরাল।

গোটা দুয়েক ট্রাক্টর এনেছি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস করার চেষ্টা করছি। গতবারে আখের ফলনটা খুব ভাল হয়েছিল। এখানে একটা সুবিধা, পার্বতী নদীর কল্যাণে জলের কোন অসুবিধা নেই। এদেশে জলই একটা সমস্যা। সরকার বড় বড় বাঁধ তৈরি করলেন, তাতে চাষীদের যে খুব সুবিধা হ'ল এমন তো মনে হয় না। বরং মাঝে মাঝে বাঁধ ভেঙে বেচারীদের খেত ডুবিয়ে আরো কষ্ট বাড়িয়ে দেয়।

সুবীরের বাবা কথা শেষ করে উচ্চহাস্য করলেন।

কাল খুব ভোরে উঠেই রওনা হয়ে যাব।

কিসে যাব? সুবীর প্রশ্ন করল, তুমি তো ঘোড়ায় যাবে। আমরা?

তোমরা গরুতে। সুবীরের বাবা হাসতে হাসতে বললেন, চৈতনকে বলে দেব, ভোরবেলা গরুরগাড়ি নিয়ে আসবে। ভোরে রওনা হলে সন্ধ্যার আগে ফিরে আসতে পারবে।

॥ ৫ ॥

পরের দিন ভোরে সেজেগুজে নীচে নেমেই অমিয় অবাক হয়ে গেল।

ঘোড়ার পিঠে সুবীরের বাবা। পরনে প্যান্ট নয়, ধুতি মালকোঁচা দেওয়া। গাছের নীচে সুবীর আর নিভা।

সুবীরের পরনে শার্ট আর ফুলপ্যান্ট। নিভার অঙ্গে টকটকে লাল শাড়ি। সেই রঙেরই ব্লাউজ। নিভাও তাদের সঙ্গে যাবে এমন কথা অমিয় শোনেনি। কেউ বলেনি।

এবারের ব্যবস্থা আরও ভাল। খড়ের তাকিয়া গরুর গাড়ির মধ্যে। দু'ধারে কাপড় টাঙানো। বোধ হয় রোদ আটকাবার জন্য।

প্রথমে নিভা উঠে একধারে বসল। অন্যধারে সুবীর আর অমিয়। পাশাপাশি। অমিয় মুশকিলে পড়ল। মুখ তুলতে গেলেই নিভার সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছে। কথা বলতে পারছে না।

সুবীরের বাবা গাড়ির আগে আগে ঘোড়া ছোটালেন। লালচে ধুলোর ঘূর্ণি। তার পিছন পিছন গরুর গাড়ি চলল।

কিছুক্ষণ পর মেঠো পথ ধরে দু'পাশের গাছের জটলা পার হয়ে গাড়ি চলবার পর সুবীর বলল, জান অমিয়, আজ আমরা খামারে গিয়ে বনভোজন করব।

বনভোজন?

হ্যাঁ, ওই দেখ না। সুবীর আঙ্গুল দিয়ে দেখাল।

গাড়োয়ানের পাশে বড় একটা টুকরি। ওপরটা কাপড় দিয়ে ঢাকা।

মতলবটা কার জান?

কার?

আমার ভগ্নীর।

অমিয় সামনের দিকে চোখ তুলেই লজ্জায় পড়ে গেল। নিভা একদৃষ্টে তার দিকেই চেয়ে রয়েছে। চোখে চোখ পড়তেই দুটি গালে রক্তের ছোপ।

তাড়াতাড়ি সে চোখ নামিয়ে নিল। দৃষ্টি নত করার আগে অমিয় লক্ষ্য করল, নিভার ঠোঁটের প্রান্তে চাপা হাসির ঝিলিক।

অমিয় আর সুবীর যে কলেজে পড়ে সেখানে সহশিক্ষার প্রচলন। ক্লাসে অনেক মেয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে নিভার কোথাও কোন মিল নেই। কলেজের মেয়েরা বাকপটু, সবজান্তা ধরনের, আর নিভা সারল্যের প্রতিমূর্তি। মুখে-চোখে কোথাও অভিজ্ঞতার কোন ছাপ নেই। একবার বোধ হয় নিভার কণ্ঠস্বর শুনেছে। কাছাকাছি দেখেছে দু'একবার।

অমিয়র ইচ্ছা হল একবার কথা বলে। কি ক্ষতি? পাশে তো সুবীর রয়েছে! এতটা পথ চুপচাপ যাওয়ার কোন মানে হয় না।

একটু যেতেই নাতিবৃহৎ একটি গাছ। বেগুনি রঙের ফুলে আচ্ছন্ন।

অমিয় উঁকি দিয়ে দেখেই বলল, ওটা কি ফুলের গাছ? ভারি চমৎকার রঙ তো!

অমিয় বিশেষ কাউকে জিজ্ঞাসা করেনি। কথাটা মনে উচ্ছ্বাসের বশেই বলে ফেলেছিল।

সুবীর ছইয়ে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছিল। নিভা একটা হাত গালের ওপর রেখে বাইরের দিকে চেয়েছিল। সে একটু ঘুরে বসেছিল, সম্ভবত অমিয়র একেবারে মুখোমুখি বসাটা এড়াবার জন্য।

জারুল।

কণ্ঠস্বর নয়, যেন সঙ্গীতের সুর। অন্তত অমিয়র তাই মনে হল।

সারা শরীরে একটা অভূতপূর্ব শিহরণের স্রোত। তার প্রশ্নের উত্তরে নিভা কথাটা বলেছে।

ভারি চমৎকার রঙ।

অমিয় আবার বলল। নিভার সুডৌল গালের দিকে দৃষ্টি রেখে।

এবার নিভা ফিরে দেখল। প্রথমে ঘুমন্ত সুবীরের দিকে, তারপর অমিয়র চোখে চোখ রাখল।

বলল, এ রঙটা আমারও খুব ভাল লাগে।

পছন্দের একটা রাখীবন্ধন হয়ে গেল। অমিয়র যে রঙ প্রিয়, নিভারও তাই।

অমিয় বিজ্ঞানের ছাত্র। রঙের রহস্য তার অজানা নয়। সূর্যরশ্মি যে সাত রঙ বহন করে আনে তার মধ্যে থেকে বিশেষ একটা রঙ কেন গাছপালা, ফুল, কোরক, আহরণ করে নেয় তা বিশ্লেষণ করতে অমিয় সক্ষম। প্রয়োজন হলে স্পেক্ট্রামের মাধ্যমে সবই বোঝাতে পারবে।

অমিয়র আর নিভার হৃদয় বিভিন্ন রঙের ভাণ্ডার থেকে বিশেষ একটি রঙই বেছে নিয়েছে এই একাত্মবোধ স্মরণ করেই অমিয় পুলকিত হয়ে উঠল।

তুমি জারুলের রঙ ভালবাস তো লাল রঙের শাড়ি-জামা পরেছ কেন?

অমিয় একটু একটু করে সাহসী হচ্ছে।

তার অনুজা নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে বাধ্য হয়েই কলেজের সহপাঠিনীদের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। তারা এলে কথা বলেছে।

পিককের কেমিস্ট্রি বইটা আপনি নিয়েছেন লাইব্রেরি থেকে। অনেকদিন হয়ে গেল,

এবার ফেরত দিন, আমরা পড়ব না!

কিংবা, থিয়োরি অফ লাইট বইটা কোথাও থেকে যোগাড় করে দিতে পারেন? ডক্টর শাস্ত্রীর লেখা। অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স-এর হেড।

চেষ্টা করব। ওটা আমিও এখনো পড়িনি।

অল্প কথার উত্তর।

এভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে কোন মেয়ের সঙ্গে প্রকৃতির রূপবর্ণনায় মাতেনি।

নিভা হাসল। প্রবালরাঙা ঠোঁটের ফাঁকে কুন্দশুভ্র দাঁতের সারি।

বা রে, ভালবাসি বলে আমাকে সেই রঙ পড়তে হবে তার কি মানে? গাছে, পাতায়, পরের গায়ে এই রঙ ভালবাসি।

হেসে নিভা মুখ ফেরাবার আগেই অমিয়র চোখে পড়ে গেল।

আশ্চর্য, রঙ নিয়ে এত কথা বলে যাচ্ছে, আর এটাই চোখে পড়েনি?

অমিয়র শার্টের রঙ হালকা বেগুনি। জারুলের ফুলের রঙ।

এই দেখ, এদিকে দেখ!

অমিয়র কণ্ঠে অনুরোধের আমেজ।

নিভা অবাক হল। ভ্রূদুটো তুলে বলল, কি, কি দেখব?

অমিয় নিজের শার্টের দিকে আঙ্গুল দেখাল।

এটাও তো জারুল ফুলের রঙ।

মোটেই না। জারুল ফুলের রঙ আরো গাঢ়। আপনার শার্টের রঙ অনেক হালকা।

সুবীর উঠে পড়ল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে।

নিভার শেষদিকের কথার কিছুটা তার কানে গিয়েছিল।

একবার অমিয়র দিকে একবার নিভার দিকে চেয়ে বলল, কিরে, কি ঝগড়া শুরু করেছিস? গাঢ়, হালকা কি ব্যাপার?

পরনের শাড়ির রঙের ছোপ নিভার দুটি গালে লাগল। তাড়াতাড়ি মুখটা বাইরে দিয়ে সে চুপচাপ বসে রইল। ফিরল না।

অমিয় বলল, জারুল ফুলের রঙের কথা কি হচ্ছিল?

জারুল ফুল এল কোথা থেকে?

আসেনি। পথের পাশে একটা গাছে অজস্র ফুটেছিল। চমৎকার রঙ। তাই বলছিলাম।

অ—।

পকেট থেকে রুমাল বের করে সুবীর বলল, কি গরম পড়েছে! গলা শুকিয়ে কাঠ। নিভা একটু জল দে তো!

নিভা উঠে গাড়োয়ানের পাশ থেকে একটা জলের বোতল তুলে নিল। গ্লাসে জল ভরে সুবীরকে দিল।

সুবীরের খাওয়া শেষ হতে নিভা অমিয়র দিকে চেয়ে বলল, আপনাকে দেব এক গ্লাস?

অমিয় কোন উত্তর দেবার আগেই সুবীর উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। এত জোরে যে গাড়োয়ান পিছন ফিরে একবার দেখে নিল।

বাবাঃ, অমিয়কে তুই আবার আপনি বলতে আরম্ভ করেছিস! অমিয় আমার চেয়েও ক'মাসের ছোট যে!

নিভা কোন কথা বলল না। কোন উত্তর নয়। উত্তর দেবার মতন কিছু ছিলও না।

সে জল গড়িয়ে অমিয়র দিকে এগিয়ে দিল।

অমিয় গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়েই মুশকিলে পড়ল। গাড়ি জোরে ঢালু জমি বেয়ে ছুটতে শুরু করেছে। টাল সামলাতে না পেরে গ্লাসের জলের প্রায় সবটুকুই অমিয়র শার্টের ওপরে গিয়ে পড়ল। ভিজে উঠল শার্টের অনেকখানি।

এবার নিভা শরীর দুলিয়ে হেসে উঠল। একসময়ে অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, এবার শার্টের রঙটা জারুল ফুলের মতন হয়েছে কিন্তু!

এসে গেছি। আর একটুখানি।

সুবীর কাপড়ের ঘেরাটোপ তুলে বাইরের দিকে চেয়ে বলল।

অমিয়ও নীচু হয়ে দেখল।

সবুজ গাছপালার সার। মাঝে মাঝে কিসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ফাঁকে ফাঁকে টোকা মাথায় কয়েকজনকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল।

গাড়ি থামল। গাড়োয়ান নেমে দাঁড়াল।

প্রথমে সুবীর নেমে নিভার দিকে হাত বাড়াল—

নে হাত ধর, না হলে সেবারের মতন মাঠের ওপর গড়াগড়ি দিবি।

যাও!

সুবীরের প্রসারিত হাতটা ঠেলে দিয়ে আরক্তমুখে নিভা নেমে পড়ল। খুব সাবধানে।

অমিয় নামল সব চেয়ে শেষে। নেমে চারদিক দেখেই অবাক হয়ে গেল।

এপাশে-ওপাশে গাছপালা। ছোট বড় মাঝারি। সব গাছের নামও অমিয় জানে না।

এগুলো কি গাছ? বাঁদিকের ঘন বাঁশের মতন গাছগুলোর দিকে অমিয় আঙ্গুল দিয়ে দেখাল।

আখ গাছ। যাকে সাধু ভাষায় বলে ইক্ষু। সুবীর হাসতে হাসতে বলল।

সে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাবাকে আসতে দেখে থেমে গেল।

একটা ঝাঁকড়া আমগাছের তলায় সুবীরের বাবা এসে দাঁড়ালেন। কাপড় হাঁটুর ওপর তোলা। গায়ে খাকি হাত-কাটা শার্ট।

এসো, এদিকে এস সব।

তিনজনে তাঁকে অনুসরণ করল।

সব ক্ষেত ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়। সে চেষ্টাও তারা করল না। মোটামুটি আসল জায়গাগুলো দেখল। তুলো গাছ, আখ গাছ, নানারকমের ডাল, সবজীর চারা। মাঝে মাঝে বিরাট কূয়া, তা থেকে নলে করে জল সরবরাহের ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে পুকুরের মতন করে জল আটকাবার আয়োজন করা হয়েছে।

অমিয় জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, পার্বতী নদী থেকে জল আনা হয় না?

সুবীরের বাবা বললেন—কতকগুলো গাছে পার্বতীর জল ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে সে-জলে চুনের ভাগ বেশি, অর্থাৎ তোমাদের বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলে ক্যালসিয়াম কারবোনেট।

তার মানে, আস্তে আস্তে ভেবে ভেবে অমিয় বলল, যেখান থেকে পার্বতী নদীর উৎপত্তি, সেখানে কোথাও লাইম ডিপজিট আছে। জলের সঙ্গে লাইম আসছে।

সম্ভবত। সুবীরের বাবা সায় দিলেন, তারপর সুবীরের দিকে ফিরে বললেন, তুমি

অমিয়কে কাঁচের ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখাও, আমি কৃষাণদের সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কথা বলে আসছি।

একসার বিলাতি সুপারি গাছের মাঝখান দিয়ে ঘাসে-ঢাকা পথ। ধারে ধারে কয়েকটা বাতাবি লেবুর গাছ। কচি পাতার অদ্ভুত গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে।

অমিয়র ভারি ইচ্ছা করল, এই ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দেয়। চুপচাপ করে ভিজে সোঁদা মাটি আর নাম-না-জানা কুঁড়ির ঘ্রাণ নেয়। শহরের কোথাও এই কোমলতা নেই।

বাঁদিকে।

সুবীরের গলার শব্দে অমিয়র হুঁশ হল।

সবাই বাঁদিকের জামরুল বাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল।

মস্ত বড় কাঁচঢাকা ঘর। কাঁচ ভাল করে দেখাই যায় না। তার ওপর অনেক রকমের লতা উঠেছে। থোকা থোকা লাল আর হলুদ রঙের ফুল।

সুবীর কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। পিছনে বাকি দুজন।

রাশি রাশি টব। নানা সাইজের। সিঁড়ির মতন ধাপ। তার ওপর থাকে থাকে বসানো। গাছের পাশে পাশে একটা করে কাঠি পোঁতা। তার ওপর ছোট কাগজে কি লেখা।

অমিয় ভেবেছিল, কলকাতায় শিবপুর বোটানিক্যাল বা এগ্রি-হর্টি-কালচারাল বাগানে যেমন দেখেছে, গাছের নাম-ধাম বংশ-পরিচয় লাটিন ভাষায় লেখা থাকে। দন্তস্ফুট করাই মুশকিল, এখানেও নিশ্চয় তাই।

কিন্তু একটা গাছের কাছে গিয়েই তার ভুল ভাঙল।

কমলালেবুর গাছ। শিলং থেকে আনা। নতুন পদ্ধতিতে সার দিয়ে গাছের সাইজ ছোট আর ফলের সাইজ বড় করার চেষ্টা হচ্ছে। এইরকম সব কাগজেই পরিষ্কার বাংলা ভাষায় লেখা।

ঘুরে ঘুরে অমিয় দেখতে লাগল।

নিভা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। অনেকবার এসব দেখেছে বলে তার উৎসাহ কম।

হঠাৎ সুবীরের খেয়াল হ'ল।

তোমরা অপেক্ষা কর। আমি গাড়োয়ানকে দিয়ে খাবারের ঝুড়িটা নিয়ে আসি। এখানে বসে খাওয়া যাবে।

সুবীরের পিছন পিছন অমিয়ও বাইরে আসছিল, সুবীর হাত নেড়ে বারণ করল।

তুমি থাক, নিভা একলা রয়েছে।

অবশ্য এখানে একলা থাকতে কি আর অসুবিধা নিভার! এ তো তাদেরই ক্ষেত। চারিদিকে তাদেরই লোক।

তবু সুবীর বারণ করাতে অমিয় রয়ে গেল।

একেবারে কোণের দিকে কচুপাতার মতন বিরাট পাতাওয়ালা একটা গাছ। মাঝখানে সরু একটা কাণ্ডে অজস্র গেরুয়া রংয়ের ফুল ফুটেছে। কাগজে গাছের নাম লেখা— বাতিকা।

নিভা কাছেই ছিল। একটা গাছের পাতা নিয়ে দু-আঙ্গুলে ঘষে গন্ধ শুঁকছিল। তার দিকে ফিরে অমিয় বলল, এ গাছটার তো অদ্ভুত নাম। এত সুন্দর ফুল, কিন্তু নামটা ভারি বিশ্রী।

পায়ে পায়ে নিভা এগিয়ে এল।

গাছটার দিকে একবার উঁকি দিয়ে দেখে বলল, এ গাছটা বাবা জাঞ্জিবার থেকে

এনেছে। তিনটে এনেছিল, দুটোকে বাঁচানো গেল না। মরে গেল। এটা বহু যত্নে বেঁচেছে। এটা বাতের ওষুধ।

বাতের ওষুধ! তাই বুঝি এর নাম বাতিকা?

হ্যাঁ, কি একটা বিদঘুটে বিদেশী নাম ছিল, উচ্চারণ করা যেত না। বাবা নাম রেখেছে বাতিকা। একটা ফুল দু'হাতে টিপে দেখুন!

অমিয় সাবধানে একটা ফুল ছিঁড়ে দু'হাতে টিপে দেখতে গেল, কিন্তু ফুলটা ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপর্যয় ঘটল।

চীৎকার করে নিভা অমিয়কে জড়িয়ে ধরল। সজোরে।

এ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেমন আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে অগ্নিবৃষ্টি শুরু হলে তার সঙ্গে লাভার তরল স্রোত, গলিত মৃত্তিকা চারদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়, পারিপার্শ্বিক সব কিছু থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে, মাটির নতুন ফাটলের ক্ষত থেকে জলের ধারা বেরিয়ে আসে, সমস্ত জায়গাটায় একটা আমূল পরিবর্তন হয়—তেমনই অমিয়র স্নায়ুতন্ত্রীতে, শিরায়-উপশিরায়, দেহের কোষে-মেদে-মজ্জায় যেন একটা তীব্র আলোড়ন শুরু হল। পুরোনো চাঞ্চল্যহীন ফাটলের মধ্যে থেকে এক অনুভূতির স্রোত তার সমস্ত সত্তায় পরিব্যাপ্ত হল।

অনেকক্ষণ অমিয় নিজেকে ভুলল, পরিবেশ ভুলল, একটা হাত দিয়ে নিভাকে জড়িয়ে ধরা যে অন্যায় সে বোধও ভুলে গেল।

যখন খেয়াল হল, তখন নিভাও নিজেকে সামলে নিল।

অগোছাল শাড়িটা ঠিক করে দূরে সরে দাঁড়াল।

সব কিছু বুঝতে অমিয় বেশ একটু সময় নিল।

পুষ্পস্তবকের মধ্যে একটা গিরগিটি আত্মগোপন করে ছিল, সেটা তার জানবার কথা নয়। সে ফুলে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গিরগিটিটা লাফ দিয়ে নিভার শাড়ির ওপর গিয়ে পড়েছিল। নিভার পক্ষে বিচলিত হয়ে ওঠাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, কারণ গিরগিটিট রীতিমত ভয়ালদর্শন।

অমিয় বুঝতে পারল, তার সর্বশরীর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। দেহের সমস্ত শোণিত মুখে এসে জমেছে। কৈশোরের বাকল ছিঁড়ে নবযুবক আত্মপ্রকাশ করছে। অসহ্য এই যৌবনের দাহে অমিয় বুঝে অঙ্গারে পরিণত হবে।

সুবীর যখন এসে দাঁড়াল, তখন দু'জন দু'দিকে।

একেবারে কোণের দিকে অমিয় একটা ক্যাকটাস নিরীক্ষণ করছে, আর নিভা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দরজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

সুবীরের পিছন পিছন গাড়োয়ান ঢুকল। এক হাতে জলের কুঁজো, অন্য হাতে খাবারের ঝুড়ি।

জিনিসগুলো মেঝের ওপর নামিয়ে দিয়ে গাড়োয়ান চলে গেল।

কই রে নিভা, জিনিসগুলো ভাগ কর! কিসে কি আছে, আমি জানিই না!

ধীরপায়ে নিভা এগিয়ে এল। মাটির দিকে চেয়ে। মেঝের ওপর বসে কলাপাতা বের করে খাবারগুলো তিন ভাগ করে ফেলল। লুচি, পটলভাজা, আলুর তরকারি, মিষ্টি ঝুড়ির মধ্যে ছোট ভাঁড়ও ছিল। তাতে কুঁজো থেকে জল ভরে দিল।

অমিয়ও অস্বাভাবিক গম্ভীর।

খেতে খেতে সুবীর একবার জিজ্ঞাসা করল—কেমন দেখলে?

অমিয় অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎ যেন সচেতন হ'ল এইভাবে বলল, ভালই তো, বেশ ভাল।

বাবার ইচ্ছা এম. এস্-সি পাশ করে আমিও বাবার সঙ্গে যোগ দিই। আমার সয়েল কেমিস্ট্রি পড়ার খুব ইচ্ছা।

অমিয় কোন উত্তর দিল না। ম্লান হাসল।

সারাক্ষণ নিভা মাথা নিচু করে খাচ্ছিল। একটি কথা তো নয়, মুখ তুলে কারো দিকে দেখল না পর্যন্ত।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে সুবীর বলল, চল, ফলের বাগানটা ঘুরে আসি। তারপর একটু বিশ্রাম করে ফিরে যাব।

অমিয় সুবীরের পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। পিছিয়ে যেতে তার সাহস হ'ল না। কি জানি যদি নিভার সঙ্গে চোখাচোখি হয়।

এত নরম হয় মেয়েদের দেহ! যেন ফুলের মালার মতন! স্পর্শে এত মাদকতা। ল্যাবরেটরিতে অসাবধানে অমিয়র বিদ্যুতের তাবে একবার হাত লেগে গিয়েছিল। সমস্ত রোমকূপ শিহরিত হয়ে উঠেছিল। সমস্ত দেহের মূল ধরে কে যেন সবেগে নাড়া দিয়েছিল।

এও ঠিক তাই। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তার বেশি নয় কিন্তু সেইটুকুর মধ্যেই অমিয়র মনে হয়েছিল যেন হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ তার শরীরের কোষে কোষে সঞ্চারিত হয়ে গেল। কিন্তু এ বিদ্যুতের দাহ নেই, দীপ্তি আছে, আর আছে সুখকর এক অনুভূতি।

যে অনুভূতি স্থায়ী হোক চিরন্তন হোক, এমন একটা কামনা বার বার তার মনে রূপায়িত হয়ে উঠল।

একেবারে কোণের দিকে ফলের বাগান।

আতা আছে, কুল, বাতাবিলেবু আর গোলাপজাম, জামরুলের ঝোপ। এখন এসব ফলের সময় নয়। শুধু গাছ আর গাছ।

আরো দক্ষিণে সার সার আমগাছ। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আনা আমের চারা এখানে লাগানো হয়েছে। আলফান্সো থেকে গোলাপখাস। মুর্শিদাবাদের বেগমপসন্দ-ও আছে।

ঘুরে ঘুরে অমিয় সব দেখল। সুবীরও দেখল।

ফিরে আসার সময় সুবীরের খেয়াল হল।

আরে, নিভা কোথায় গেল?

অমিয় এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখল।

বলল, আমাদের পিছনেই তো ছিল!

দুজনে এগিয়ে গেল। ফলের বাগান শেষ হতেই নজরে পড়ে গেল।

একটা ঝাঁকড়া জামরুল গাছের নীচে চুপচাপ বসে আছে। গালে হাত দিয়ে। এত তন্ময় যে সুবীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেও খেয়াল হল না।

কি রে, এখানে বসে আছিস?

নিভা চমকে উঠল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, পা ব্যথা করছে।

সুবীর উচ্চরোলে হেসে উঠল।

এস অমিয়, নিভাকে আমরা কোলে করে নিই। ওর পা ব্যথা করছে।

কথাটা নিছক পরিহাস, কিন্তু অমিয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত আরক্ত হল।

নিভা চেঁচিয়ে উঠল, কি অসভ্যতা কর দাদা, ভাল লাগে না!

সুবীরও একটা কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু দিল না। কাঁচা রাস্তার ওপর সুবীরের বাবাকে দেখা গেল।

এই যে, এদের একটা করে দাও।

সুবীরের বাপের পিছনে একটা চাষী। হাতে ডাবের কাঁদি। শহরে মাঝে মাঝে অমিয় ডাব খেয়েছে। বিশেষ করে পরীক্ষার সময় বাড়ির নির্দেশ ছিল, রোজ একটা করে ডাব খাবার।

কিন্তু এত মিষ্টি জল অমিয় এর আগে আর পান করেনি। পুরো একটা ডাবের জল পান করতে গিয়ে সে হিমসিম খেয়ে গেল। বিশেষ করে একপেট খাবার পর।

সুবীরের বাবা বললেন—এস তোমাকে নারকেল গাছগুলো দেখিয়ে নিয়ে আসি।

অমিয় সুবীরের বাবাকে অনুসরণ করল।

একেবারে নদীর ধারে সার সার নারকেল গাছ। উচ্চতায় অমিয়র চেয়ে বোধ হয় একটু বেশি। অথচ ডাবের কাঁদি প্রায় মাটি স্পর্শ করেছে।

এই দেখ গাছের নীচে কি প্রচুর নুন দিতে হয়েছে!

কেন?

নারকেল গাছ শিকড়ে স্যালাইন চায়। এইজন্যেই সমুদ্রের ধারে নারকেল গাছের ভিড় দেখা যায়।

অমিয় বিড়বিড় করে বলল, কমন সল্ট নারকেল গাছের পক্ষে প্রয়োজনীয়। মানুষের রক্তেও লবণ আছে, তাই তার স্বাদ নোনা। সেই রক্ত কিসের স্পর্শে উত্তাল, উদ্দাম হয়ে ওঠে!

সুবীরের বাবা নারকেল পাতায় পোকা নিবারণের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার সে সম্বন্ধে বলে যাচ্ছিলেন, কিছু অমিয়র কানে খানিকটা গেল, অনেকটা গেল না।

কিছু সহপাঠীর ফিসফাস কথাবার্তার রেশ তার কানে ভেসে আসত। নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে আলোচনা। কোন বিশেষ বিশেষ সহপাঠিনীর দেহতত্ত্বের বর্ণনা।

এতদিন সে-সব কথা রহস্যময়, অর্ধস্বচ্ছ মনে হয়েছিল, সে সব কথার নিগূঢ় অর্থ এখন অমিয়র বোধগম্য হচ্ছে।

একবার অমিয় ভাল করে ভাবতে চেষ্টা করল। বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করল প্রকৃত অবস্থা।

সেই চরম মুহূর্তে, পুলকানন্দের শিখরে অমিয়ও কি আচমকা নিভাকে বেষ্টন করেছিল? ইচ্ছা করে নয়, একেবারে হঠাৎ। ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু নিভা কি বিশ্বাস করবে?

পুরোপুরি বিকাল হবার আগেই গাছপালার জন্য জায়গাটা ছায়াঘন হয়ে উঠল। শুকনো পাতার মর্মর। গাছের ডালে ডালে কীট-পতঙ্গের নানারকম ডাক।

গরুরগাড়িতে তিনজন বাড়ির দিকে রওনা হ'ল।

সারাটা পথ সুবীরই কথা বলে গেল। তার বাবা প্রায় একক চেষ্টায় কিভাবে এত বড় একটা জিনিস গড়ে তুলেছেন তার লোভনীয় ইতিহাস।

মাঝে মাঝে অমিয় হাঁ-না বলল।

নিভা একটি কথাও নয়। একেবারে কোণের দিকে চুপচাপ বসে রইল।

গাড়ির মধ্যে অন্ধকার। দুটো গরুর মাঝখানে ছোট একটা হারিকেন। স্বল্প আলোয় যাত্রাপথের কিছুটা মাত্র আলোকিত হচ্ছে। দু'পাশে জমাট অন্ধকার। বাইরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের কিছুটা গাড়ির মধ্যেও হানা দিয়েছে।

নিভাকে দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে শুধু তার চুড়ির নিক্কণ শোনা যাচ্ছে। মশা তাড়াবার জন্য সে বোধ হয় হাত নাড়াচ্ছে।

কবার শুধু অমিয় বলল—তোমাদের এখানে মশা খুব!

সুবীর বলল, চারদিকে ঝোপঝাড়-ডোবা। এই সবই তো মশার স্বর্গ।

তোমাদের বাড়িতে কিন্তু বিশেষ মশা নেই।

বাড়ির চারপাশ সর্বদা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া চারদিক অবারিত, সেই জন্য প্রচুর বাতাস। বাতাসে মশা থাকতে পারে না।

অমিয় কিছু বলল না। সে শুধু বসে বসে ভাবতে লাগল, এমন কি কথা বলা যায় যার উত্তর নিভার মুখ থেকে পাওয়া যেতে পারে! একটা সহজ সরল উত্তর পেলে অন্তত কাঁচঘরের মধ্যের অপ্রীতিকর ঘটনাটা যে সে মনে রাখে নি, ঘটনাটা যে নিতান্ত আকস্মিক এ বিষয়ে অমিয় স্থিরনিশ্চয় হতে পারে।

কিছু বলা যায় না, নিভা হয়তো মনে করেছে, অমিয় ইচ্ছা করেই ফুলের বৃন্তটা হাত দিয়ে নাড়িয়েছিল। গিরগিটিটাকে দেখতে পেয়েও। যাতে গিরগিটিটা লাফিয়ে নিভার গায়ে পড়ে, তাকে বিব্রত করে।

নিভা যে এতটা বিচলিত হয়ে কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত এমন ব্যাপার করবে সেটা হয়তো অমিয় বোঝে নি।

নিভাকে কোথাও একলা পেলে অমিয় যে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে তাও সম্ভব নয়, কারণ ও ঘটনার পুনরুল্লেখ করা অমিয়র পক্ষে সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ পর অমিয়র খেয়াল হ'ল।

সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ চেয়ে দেখল, সুবীরও ঘুমাচ্ছে। নিভা ছইয়েতে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। অস্পষ্ট একটা কাঠামো। তার মুখ-চোখ দেখা যাচ্ছে না। বাইরের ম্লান জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছে নিভা শাড়ির আঁচলটা মুখে চাপা দিয়েছে।

একটু পরেই অমিয় অনুভব করল। তৃষ্ণায় তার তালু শুকিয়ে কাঠ। দুপুরবেলা লুচি খেয়ে, প্রচুর ঘোরাঘুরি করে তৃষ্ণা পাওয়াটা অবশ্য স্বাভাবিক।

জলের কুঁজো গাড়োয়ানের কাছে। তার কাছ থেকে জলের কুঁজোটা চেয়ে নিয়ে অনায়াসেই জল খেতে পারে, কিন্তু যেভাবে অসমতল পথ দিয়ে গাড়ি ঝাঁকুনি দিতে দিতে চলেছে, জল কতটা মুখে পড়বে সেটাই বিচার্য। বেশীটাই জামাকাপড় ভিজিয়ে দেবে।

কিন্তু তৃষ্ণা অসহ্য হয়ে উঠেছে। অমিয় আর পারছে না। আস্তে আস্তে এগিয়ে গাড়োয়ানের পিছনে গিয়ে বলল ভাই, শুনছ?

গাড়োয়ান চালাতে চালাতেই পিছন ফিরে দেখল।

বলুন বাবু!

কুঁজোটা একটু দাও তো এদিকে?

গাড়োয়ান হেসে উঠল।

খালি কুঁজো নিয়ে যাচ্ছি বাবু। কুঁজোয় একফোঁটা জল নেই।

তাহলে?

ডাব আছে বাবু। ডাব খান না।

ডাব? কিন্তু কে কেটে দেবে?

গাড়োয়ান কোন উত্তর দিল না। তার বসবার আসনের তলায় হাত দিয়ে খড়ের মধ্যে থেকে একটা কাটারি বের করল। ঝুড়ি থেকে বেছে একটা ডাব নিয়ে মুখটা কেটে অমিয়র হাতে দিল।

গাড়ি ঢিমেতেতালায় চলছিল, গাড়োয়ান ডাব কাটায় ব্যস্ত ছিল বলে। এবার গাড়োয়ান গাড়ির গতি দ্রুত করল।

অমিয়র কোনদিকে দৃষ্টি নেই। এক চুমুকে জলটুকু শুষে নিয়ে বলল, আঃ!

তারপর ঘুরে বসে গাড়ির পাশের কাপড়টা তুলে ডাবটা তুলে ফেলে দিতে গিয়েই নজরে পড়ল।

চাঁদের আলোর তেজ বেড়েছে। ভিতরের সব কিছু এখন খুব অস্পষ্ট নয়। বেশ দেখা যাচ্ছে আঁচল সরিয়ে নিভা ওর দিকেই চেয়ে আছে। বাইরের জোনাকির দীপ্তির সঙ্গে সে দৃষ্টির অদ্ভুত মিল।

অমিয় জিজ্ঞাসা করল, তুমি ডাব খাবে?

নিভা কোন উত্তর দিল না। শুধু মাথাটা নাড়ল। একদিক থেকে আর একদিকে।

তার মানে, না। ডাবে তার প্রয়োজন নেই। সে তৃষ্ণায় কাতর নয়।

অমিয় চেয়েছিল, নিভা একটা উত্তর দিক।

তার কণ্ঠস্বরে মেজাজটা বোঝা যাবে। সে অমিয়র প্রতি বিরক্ত হয়ে আছে কিনা অবশ্য বিরক্ত যদি হয়েই থাকে, তাহলে অমিয় নাচার। সত্যিই সে কোন দোষ করে নি তার কোন অপরাধ নেই। কেউ যদি অযথা তার সম্বন্ধে কিছু ভেবে বসে থাকে তাহলে সে কি করবে? কি করতে পারে?

অমিয় ভেবেছিল পরিশ্রান্ত দেহটা বিছানায় ছোঁয়ালেই ঘুম আসবে। কিন্তু এল না অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করল।

পাশে সুবীর নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে পাশবালিশ আঁকড়ে।

বিরাট খাট। খাট নয়, পালঙ্ক। কাঠের ওপর নানারকম অলঙ্করণ। দু'দিকে দুটো পরী মাথার ওপর হাত তুলে।

আগের দিনের কারুকার্যে পরীর প্রাধান্য খুব বেশি। কলকাতাতেও অনেক বনেদী বাড়ির গেটে পাঁচিলে অমিয় পরীর মূর্তি লক্ষ্য করেছে।

নিদ্রাহীন দুটো চোখ তুলে অমিয় পরীর মূর্তি দেখতে লাগল।

জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। দিনের আলোর মতন প্রখর। দেখতে কোন অসুবিধা হ'ল না। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে লজ্জার ছায়া নামল অমিয়র দুটি চোখে। সঙ্কোচে সে দুটি চোখ নিমীলিত করল।

নারীদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পষ্ট। নিপুণ শিল্পীর হাতে বাস্তব রূপ পেয়েছে।

এতদিন এসব অমিয় অন্যভাবে লক্ষ্য করে- সেছে। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। ফটো, ছবি, প্রাচীরপত্রে বহুবার চোখ পড়েছে।

কিন্তু তার দৃষ্টি আর নিরাসক্ত নয়। স্পর্শের পরশপাথরে সব কিছু অন্য রূপ নিয়েছে। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রক্তকণিকায় নতুন উন্মাদনা।

হঠাৎ-ই যেন পরীর মুখটা বদলে নিভার মুখে পরিণত হ'ল। দেহটাও নিভারই।

॥৬॥

পরের দিন সকালের দিকে অমিয় আর সুবীর পড়ার টেবিলে বসেছিল। অমিয় সঙ্গে করে খানতিনেক পাঠ্যপুস্তক এনেছিল। ইচ্ছা যে কদিন এখানে থাকবে মাঝে মাঝে বইগুলোর পাতা ওল্টাবে। কিছু নোট্স্ নেবে।

জানলার বাইরে সুবীরের মা এসে দাঁড়ালেন।

অমিয় পাঠে তন্ময় ছিল। সে মাথা তুলল না।

অমিয়!

এবার অমিয় বই সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বাড়িতে বোধ হয় কোন চিঠি লেখ নি। তোমার পৌছানো সংবাদটা দেওয়া দরকার।

লজ্জিত হ'ল অমিয়। একেবারে তার খেয়াল নেই। খাম পোস্টকার্ড দুই-ই সঙ্গে এনেছে। কি লিখবে, কাকে লিখবে—আসতে আসতেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছে।

বাবাকে লিখবে না। মাকে লিখবে। মাকে লিখলেই বাবা জানতে পারবে। বেশি নয়, ছোট্ট ক'লাইনের চিঠি। মায়ের উদ্বেগ দূর করার জন্য যেটুকু দরকার।

অমিয় মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল—না, চিঠি দেওয়া হয়নি। আজ দিয়ে দেব।

হ্যাঁ, আজকেই দিয়ে দিও। তোমার খবর না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা ভাববেন তো।

জানলা থেকে সরে যাবার আগে মা মুচকি হেসে চলে গেলেন।

এ বিষয়ে দুটি বন্ধুতে তো ভারি মিল।

শেষের কথাগুলো অমিয়র কানে যায়নি।

সে বলল, মিলের কথা মাসীমা কি বললেন?

সুবীর হেসে বলল, ওই যে, কলকাতায় গিয়ে আমিও চিঠি দিতে ভুলে যাই কিনা। মার চিঠি গেলে তবে খেয়াল হয়, তাই।

অমিয় চেয়ার ছেড়ে সরে যেতে যেতে বলল, সত্যি আমার চিঠি লেখা দরকার। মা-বাবা নিশ্চয় খুব ভাবছেন।

তুমি এখনই লিখে রাখ। দুপুরবেলা কারো হাতে দিয়ে দিলে সে একেবারে স্টেশনে ট্রেনে ফেলে দিয়ে আসবে।

অমিয় প্রথমে সুটকেস খুলে একটা পোস্টকার্ড বের করল। তারপর ভাবল, না, পোস্টকার্ড বড্ড খোলামেলা, বড্ড নগ্ন। কি লিখেছে সকলেই পড়ে নিতে পারবে। এমন কি যে লোকটা নিয়ে যাবে পোস্টকার্ড, সে যদি লেখাপড়া জানা লোক হয় তো পড়তে পড়তেই যাবে। এ যেন মা আর ছেলের মাঝখানে আর একজনের ছায়া এসে পড়া। গোপনতা থাকে না। পবিত্রতাও নয়।

অমিয় খাম বের করে টেবিলে ফিরে এল না। সুবীরের সামনে লিখতে অসুবিধা হবে। এটা ঠিক মাকে লিখতে গেলেই চোখের সামনে মনের সামনে মার অস্পষ্ট মূর্তিটা ভেসে আসবে। কি জানি অমিয়র দুটো চোখে, চোখের কোণে যদি জল জমে ওঠে! সুবীর চোখ

তুলে দেখলেই বুঝতে পারবে, জানতে পারবে।

অমিয় পালঙ্কের ওপর বসল।

সামান্য ক'লাইনের চিঠি লিখতে অমিয়র বেশ সময় লাগল। এর চেয়ে ল্যাবরেটরিতে একটা গোলমেলে এক্সপেরিমেন্ট কিংবা আলো সম্বন্ধে দুরূহ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে তার হয়তো এতটা অসুবিধা হ'ত না।

জীবনের এই প্রথম চিঠি। প্রথমে সম্বোধন নিয়েই মুশকিলে পড়ে গেল। শুধু মা লিখতে পারলেই বোধ হয় সে বাঁচত, কিন্তু চিঠি লেখার একটা রীতিপদ্ধতি আছে। তাই অনেক ভেবে লিখল, পূজনীয়াসু মা—

জায়গাটার কথা, খাওয়া-দাওয়ার কথা, সুবীরের মা-বাপের যত্ন-আদরের কথা সব লিখল। কেবল নিভার কথাটা কিছুতেই লিখতে পারল না। একবার নামটা লিখেও কলম বুলিয়ে নামটা ঢেকে দিল। তাও অমিয়র মনে হল যে পড়া যাচ্ছে, চেনা যাচ্ছে।

চিঠিটা শেষ করে খামের মুখটা বন্ধ করে ঠিকানা লিখে অমিয় সুবীরের কাছে ফিরে এল।

হয়ে গেছে চিঠি লেখা।

দাও, যে যাবে তাকে দিয়ে আসি।

সুবীর চলে গেল।

আর পড়তে অমিয়র ভাল লাগল না। রোদের খুব তেজ নেই। পার্বতী নদীর জলের আওয়াজ ছাপিয়ে দূর থেকে আর একটা আওয়াজ ভেসে আসছে খট্-খট্-খট্।

এটা কিসের আওয়াজ অমিয় জানত না। সুবীরই তাকে বলেছে।

কাঠঠোকরা পাখি শক্ত ঠোঁট দিয়ে গাছের কাণ্ড ফুটো করে চলেছে। নিজের বাসা করবার জন্য নয়, গাছের বল্কলের মধ্যে পোকামাকড় ধরে খাবার জন্য।

অমিয় বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

নীচে উঠানের একপাশে সার সার গোটাতিনেক গরু। এবার রোজকার মতন তাদের মাঠে নিয়ে যাবে। চাকর-বাকরেরা এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করছে।

সুবীরের বাবা নেই। ভোরবেলাই তিনি খামারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছেন।

এখানে সব কিছুতে যেন একটা শৃঙ্খলা। ঘড়ির কাঁটার মতন একভাবে কাজ হয়ে যাচ্ছে।

শহরে কিন্তু কেবল বিশৃঙ্খলা আর হৈ-চৈ। ট্রাম আর বাস কোনটাই ঠিক সময়ে আসা-যাওয়া করে না। ফলে জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে বিদ্বেষের আর অসন্তোষের মেঘ ধূমায়িত হয়ে ওঠে।

মানুষের জীবনেও কোন শৃঙ্খলা নেই। মাঝে মাঝে মজুররা গোলমাল করে। আটকে যায় কারখানার চাকা। অমিয়র বাপের কপালে চিন্তার বাড়তি আঁচড় ফুটে ওঠে। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করেন। সেই সঙ্গে মায়েরও দুশ্চিন্তা বাড়ে।

কোন জরুরী কাজে বের হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথে ট্রাম বাস মোটর থেমে থাকে। এগোবার উপায় নেই। পিছোবারও নয়। ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। সামনে মিছিল চলেছে। বুভুক্ষার মিছিল।

এখানে সব কিছু যেন প্রকৃতি-নির্ভর। শাসনভার প্রকৃতির ওপর ন্যস্ত।

পিছন ফিরেই অমিয় অবাক হয়ে গেল।

আলুলায়িত কুন্তল, কপালে চন্দনের টিপ, পরনে গরদ, হাতে কাঁসার রেকাবিতে স্তূপীকৃত নানা রংয়ের ফুল।

নিভা পুজোর ঘর থেকে বের হচ্ছে।

দু'জনের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশি নয়।

কিছু একটা বলা দরকার, কিন্তু কি বলবে ভাবতে ভাবতে নিভা ঠোঁট মুচকে হাসল।

অমিয়র বুক থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল। সেও হাসল।

আপনার বন্ধু কোথায়?

সুবীর চিঠি নিয়ে নীচে গেছে।

চিঠি?

হ্যাঁ, আমি মাকে চিঠি লিখেছি, সেই চিঠিটা নিয়ে গেছে।

নিভা আরো কয়েক পা এগিয়ে এল।

আমাদের কথা লিখেছেন মাকে?

নিভার কথা আটকে গেল। বোধ হয় আমার বলতে গিয়ে সামলে নিয়ে আমাদের বলল।

অমিয় ঘাড় নাড়ল।

নিভার হাসি এবারে আরো স্মিত।

লিখেছেন এখানে একটা মেয়ে থাকে, সে গিরগিটিকে ভীষণ ভয় করে?

পলকের জন্য অমিয়র মুখে আবিরের খেলা। দুটো ঠোঁট থর্‌থরিয়ে কেঁপে উঠল। একটু বুঝি দ্রুততর হল হৃদস্পন্দন।

অমিয় বলল, গিরগিটিকে আমিও খুব ভয় পাই। ওভাবে আচমকা লাফিয়ে পড়লে গায়ে সবাই ভয় পেত।

আপনি ঠাকুর-দেবতা মানেন তো?

কেন বল তো?

শুনেছি বৈজ্ঞানিকরা এসব কিছু মানে না। তারা বলে, সব নাকি প্রকৃতি।

আমি মানি, কারণ প্রকৃতিকে সৃষ্টি করল কে?

তবে হাঁ করুন।

হাঁ করব! অমিয় বিস্মিত হল।

ঠাকুরের চরণামৃত। খাবেন তো?

অমিয় কোন কথা না বলে হাঁ করল।

বাবা, অত উঁচুতে আমি নাগাল পাই কি করে?

তাহলে নীল-ডাউন হব?

নিভা হাসল, অতটা বলব না। একটু নীচু হলেই চলবে।

অমিয় একটু নীচু হল।

সাবধানে কমণ্ডলু থেকে জলটা অমিয়র মুখে ঢেলে দিল।

শুধু জল নয়, তাতে চন্দনের গন্ধ আছে, আরো একটা কিসের সুবাস।

বা রে, একলা অমিয়কেই খাওয়াচ্ছ? আমিই বাদ?

সুবীর সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল।

একটু রক্তিম হল নিভা। হাতটা একটু কেঁপে চরণামৃতের কিছুটা অমিয়র গালে পড়ে গেল।

নিভা ঘুরে সুবীরের দিকে ফিরে বলল।

তুমি তো আবার ভগবান মানো না!

সুবীর ছুটে নতজানু হয়ে নিভার সামনে বসল।

ওরে বাবা, এখনও কত পরীক্ষা দিতে হবে, ভগবান মানি না মানে?

চরণামৃত পান করা হলে সুবীর বলল, বা রে, শুধু জল, ফলটল দাও!

মা নিয়ে আসছে।

নিভা সরে গেল।

সুবীর এসে অমিয়র পাশে দাঁড়াল।

খুব ভাল লাগল অমিয়র। গুমোট আবহাওয়াটা যেন অনেকটা তরল হয়ে গেছে। নিভা খোলাখুলিভাবে মিশছে, কথা বলছে—তার মানেই ঘটনাটা তার মনে কোন স্থায়ী রেখাপাত করে নি। এটা যে আকস্মিক, কারো দোষ নেই—না, নিভার, না অমিয়র, সেটা সে বুঝতে পেরেছে।

তা না হলে, যে কদিন অমিয় এখানে থাকত তার বেশ অসুবিধা হত। এ পরিবারের সঙ্গে সহজভাবে মেশার পক্ষে কোথায় একটা অসুবিধার প্রাচীর থাকত। ভুল-বোঝাবুঝির ফাটল।

একটু পরেই সুবীরের মা এসে দাঁড়ালেন।

কাঁসার থালার ওপর দুটো কলাপাতা। নানারকমের ফল, ছানা, মিছরি আর কিশমিশ।

কী, সব চরণামৃত খেয়েছো?

অমিয় আর সুবীর দুজনেই ঘাড় নাড়ল।

খেতে বস। আমি জল নিয়ে আসি।

একটা জিনিস এ কদিনেই অমিয় লক্ষ্য করেছে। বাড়িতে পাচক দাস-দাসী থাকা সত্ত্বেও সুবীরের মা নিজে প্রায় সব সময় আহার্য পরিবেশন করেন।

মা সরে যেতে সুবীর বলল, অমি, তোমাকে যে দিনতিনেক একলা থাকতে হবে!

একলা?

একলা মানে আমি থাকব না।

সেই তো, একলাই হল! কেন, তুমি কোথায় যাবে?

আমি বাবার সঙ্গে পিসিমার বাড়ি যাব। নৌকোয় এখান থেকে ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। রামগোবিন্দপুর। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার পথে কোন বাধা ছিল না, কিন্তু আমরা একটা অপ্রিয় কাজ করতে সেখানে যাচ্ছি। তার মধ্যে আর তোমাকে নিয়ে যেতে চাই না।

অপ্রিয় কাজ?

এইটুকু বলেই অমিয় থেমে গেল। বেশি কৌতূহল প্রকাশ করাটা সমীচীন হবে না। সুবীরদের পারিবারিক ব্যাপার। সে সম্বন্ধে তার কোন রকম উৎসাহ না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু সুবীর বলল।

ইতিমধ্যে মা এসে দু'গ্লাস জল রেখে গেছেন। রেখে আর দাঁড়ান নি। আবার চলে গেছেন রান্নাঘরের দিকে। ব্যস্ত পায়ে।

আমার পিসিমার চার ছেলে। কোন ছেলেই বিশেষ মানুষ হয় নি। এখন চারজনে আলাদা হতে চায়। এই নিয়ে বছর খানেকের ওপর অশান্তি চলেছে। কাল পিসিমার চিঠি এসেছে বাবার কাছে। প্রতিদিন হৈ-হল্লা চিৎকার আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না। তার

চেয়ে সম্পত্তি চার ভাগে ভাগ হয়ে যাক। যার যা ইচ্ছা করুক। এতদিন পিসিমা ইচ্ছা করেই ছেলেদের কথায় কান দেন নি। জানতেন, বুঝতে পেরেছিলেন আলাদা হলে কেউ সম্পত্তি বাখতে পারবে না, নষ্ট করে ফেলবে। উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেবে। যতদিন পিসিমার তাঁবে আছে ততদিনই ভাল। কিন্তু ছেলেরা এখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। একসঙ্গে এক ছাদের তলায় তারা থাকবে না।

তাই বাবাকে যেতে হবে সম্পত্তি ভাগ করে দেবার জন্য। যাতে ভাইয়ে ভাইয়ে গণ্ডগোল না হয়।

সুবীর যাচ্ছে অন্য কারণে। একেবারে ছোট ছেলেটি সুবীরের বয়সী। একসময়ে দুজনের খুব অন্তরঙ্গতাও ছিল। তাকে বোঝাবার ভার সুবীরের ওপর।

এ কদিন আমি কি করে কাটাব? অমিয় সত্যিই চিন্তান্বিত হল।

কেন মা থাকবে, নিভা থাকবে। কথা বলার লোকের অভাব হবে না। তিনদিনও হয়তো লাগবে না। যদি ভালোয় ভালোয় সব মিটে যায়, তাহলে দুদিনেই ফিরে আসব।

অমিয় আর কিছু বলল না। বলার আর কি থাকতে পারে? অমিয়র যদি হয়ই একটু কষ্ট, তা বলে এদের পারিবারিক কাজকর্ম তো সেজন্য আটকে থাকতে পারে না।

চল বাগানে যাই।

কলাপাতার ওপর গ্লাস চাপা দিয়ে দুজনে নেমে এল।

বাগানের মধ্যে ঢুকতে যাবার মুখেই কানে এল বীণানন্দিত কণ্ঠ। সুরেলা, মাধুর্যময়। কশ্চিৎকান্তা বিরহগুরুণা, স্বাধিকার প্রমত্তা, শাপেনাস্তঙ্গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।

নিভার কণ্ঠ।

অমিয় সুবীরের দিকে চোখ ফেরাল। সুবীর বলল, পণ্ডিতমশাই এসেছেন। নিভাকে পড়াতে।

অমিয় জানলার দিকে দেখল। নিভাকে দেখা গেল না। গৌরকান্তি এক বৃদ্ধকে দেখতে পেল। ইনিই বোধ হয় পণ্ডিতমশাই।

খুব নীচু ক্লাসে অমিয়কে সংস্কৃত পড়তে হয়েছিল। সংস্কৃতের ক্লাস মানেই ফাঁকির ক্লাস। সেটা ছাত্রেরা যেমন বুঝত, শিক্ষকও তেমনি বুঝতেন। সংস্কৃতে অমিয় কোনদিন কোন আকর্ষণ অনুভব করে নি।

কিন্তু নিভার কণ্ঠে মেঘদূতের শ্লোক যেন নতুন রূপ নিল।

বাবা নিজে এসব খুব চর্চা করে। বিজ্ঞানে আগ্রহ থাকলে হবে কি, বলে প্রকৃত ভারতবর্ষকে চিনতে হলে সংস্কৃত জানা খুব দরকার। পরীক্ষায় পাস করার মতন সংস্কৃত জানা নয়, যতটা সংস্কৃত জানা থাকলে এদেশের জ্ঞানভাণ্ডার করায়ত্ত হয়, সেই পরিমাণ বিদ্যা।

তুমিও ভাল সংস্কৃত জান?

ভাল জানি না। তবে ছেলেবেলায় আমিও পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে পড়েছি। পণ্ডিতমশাই বলেন, আমার চেয়ে নিভার সংস্কৃত উচ্চারণ অনেক ভাল। রসগ্রহণেও ওর কৃতিত্ব বেশি।

নিভার সম্বন্ধে আর কোন কথা হল না। দুজনে বাগানে গিয়ে নামল।

আমার কি ইচ্ছা হয় জান অমি?

কি?

আমি বেশ তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যেন বাবাকে সাহায্য করতে পারি। দেখেছ, বাবা কি রকম উদয়াস্ত পরিশ্রম করে? একটু একটু করে বয়স তো হচ্ছে। আমি বুঝতে পারি, বাবা ক্লান্তি অনুভব করে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

তোমাদের তো ছোট ফ্যামিলি। বোনের বিয়ে আর তোমার মানুষ হওয়া, কি বল?

অমিয়র কথার ঢংয়ে সুবীর হেসে ফেলল।

তোমার কথাগুলো ঠিক পীতাম্বর খুড়োর কথার মতন মনে হচ্ছে।

তার মানে?

মানে, বেশ বুড়োটে কথা আয়ত্ত করেছ।

দুজনেই হেসে উঠল।

সুবীর বলল, তোমাদের ফ্যামিলি তো আরও ছোট। তুমি তো সবেধন নীলমণি।

অমিয় হাসতে হাসতে বলল।

এতদিন মনে হয় নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একটা বোন থাকলে বেশ হত। তার সঙ্গে ঝগড়া, ভাব, খুনসুটি করে সময় কাটত।

সত্যি অমি, নিভাটা না থাকলে যে আমি কি করতাম তার ঠিক নেই। বিশ্বাস কর, কলকাতায় গেলে মা-বাবার জন্য যত না কষ্ট হয়, তার চেয়ে বেশি কষ্ট হয় নিভার জন্য। ওর বিয়ে হয়ে গেলে আমি যে কি করব!

কেন অমিয় নিজেই জানে না, তার বুকের মধ্যে হৃদস্পন্দন একটু দ্রুত হল। আচমকা ধাক্কা লাগলে, আঘাত লেগে শরীরের মাংস ছিঁড়ে গেলে যেমন চিনচিন করে, অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে শিরায়, তেমনই একটা বেদনা বোধ করল অমিয়।

বলল, নিভার বিয়ে হয়ে যাবে নাকি?

প্রশ্নটা করেই ভুলটা উপলব্ধি করেছিল।

তার আগেই সুবীর হেসে উঠেছে।

বা রে, মেয়েছেলে বিয়ে হবে না! অবশ্য বিয়ে মেয়ে-পুরুষ দুজনেরই হয়, তবে মেয়েদের বিয়ের কথাবার্তা অনেক আগে থেকেই হয়।

একটু থেমে সুবীর বলল।

নিভার তো বিয়ের কথা এর মধ্যেই হচ্ছে, দু'একটা সম্বন্ধও এসেছে।

আবার সেই যন্ত্রণাটা অমিয় অনুভব করল।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, এর মধ্যে বিয়ের সম্বন্ধ! বয়স কত নিভার?

নিভার নামটা উচ্চারণ করতে অমিয়র ভালই লাগল।

সুবীর হিসাব করল।

আমার চেয়ে নিভা তিন বছরের ছোট। তার মানে বয়স পনের হ'ল বৈকি। বাবা বলে, দেখতে দেখতে বছর দুয়েক কেটে যাবে।

একটা সম্বন্ধ তো পিসিমাই পাঠিয়েছেন। ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর। আমরা দেখেছি, কিন্তু বাবার আপত্তি।

কেন?

ছেলেটির জমিজমা বাড়িঘর অনেক। কিছু করতে হয় না, করার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু লেখাপড়া একেবারে শেখেনি। বাবা বলে, ধনবান মূর্খ হলে আরও ভয়ঙ্কর।

অমিয়র মনে হ'ল তার বুক থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেল।

শুধু একটু স্পর্শ, যে স্পর্শে অনিচ্ছাকৃত নিবিড়তা ছিল। নতুন এক আস্বাদে অমিয়র মন-প্রাণ ভরিয়ে দিয়েছিল। তার বেশি কিছু নয়। এইটুকুর ওপর নির্ভর করে যে জাল বোনে, বোনার চেষ্টা করে—সেও কম মূর্খ নয়!

তাছাড়া, অমিয়র সংসারজীবনে প্রবেশ করার এখনও বহু দেরি। সামনের পথ উপল বিষম। কত উত্থানপতন কণ্টকিত।

এই সময় এ সব চিন্তাও পাপ। এতে ক্ষতি হয়, মানুষ আদর্শচ্যুত হয়।

অমিয় অন্য প্রসঙ্গ শুরু করল।

কাল তোমরা কখন যাচ্ছ?

ভোরবেলা। তোমার সঙ্গে দেখাই হবে না। তুমি তখন ঘুমাবে।

না, কাল আমি সকালে উঠব। তোমাদের যাওয়া দেখব।

বেশ তো উঠো। কোন অসুবিধা নেই। আমরা তো ওই ঘাট থেকেই রওনা হব।

সুবীর আঙুল তুলে সামনের ঘাটের দিকে দেখাল।

আমি জীবনে কোনদিন নৌকো চড়ি নি।

আমরা ফিরে আসি। একদিন নৌকোয় শিবমন্দির দেখতে যাব।

শিবমন্দির?

হ্যাঁ, দ্বাদশ শিবমন্দির আছে। বাবাই দেখাশোনা করে, মানে খরচপত্র দেয়। এখান থেকে নৌকোয় আধ ঘণ্টার পথ।

অমিয় কিছুক্ষণ চেয়ে দেখল সুবীরের দিকে। তারপর বলল, তুমি তো ঠাকুর-দেবতা মান না, শুনলাম!

উত্তর দেবার আগে সুবীর একবার এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখল, তারপর বলল।

তোমার কাছে বলতে সঙ্কোচ নেই, বিজ্ঞান কি ঈশ্বরকে প্রতি পদে সরিয়ে দিচ্ছে না? আগে মানুষ যে রহস্য ভেদ করতে পারত না, সে রহস্যের কিনারা করছে। উত্তর দিচ্ছে। আজ আমরা বসন্তের প্রতিষেধক হিসাবে টীকা নিই, শীতলার পূজা দিই না বা তাঁর চরণামৃত পান করি না।

কিন্তু এইমাত্র যে তুমি চরণামৃত পান করে এলে?

সুবীর বিব্রত হল। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে বলল।

কারো বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া উচিত নয় অমি। আমি ওই চরণামৃতটুকু পান না করলে মার মনে আঘাত লাগত। মা ভাবত, ছেলে আমার ধর্মে আস্থাহীন হয়ে যাচ্ছে। কাজেই পান করেছি বলে চরণামৃতের শক্তির প্রতি আমার বিশ্বাস আছে এ ভাবার কোন কারণ নেই। তুমি—তুমি নিশ্চয় এসবে বিশ্বাস কর?

কি জানি আমি ঠিক ওভাবে কখনও চিন্তা করি নি। তবে আমার মনে হয় পৃথিবীময় এই যে এনার্জি, এর নিশ্চয় একটা উৎস আছে। অবলম্বনহীন হয়ে কিছু থাকতে পারে না। হঠাৎ কিছুর বিকাশ হয় না। জানি না, হয়তো আমি ফিজিক্স-এর ছাত্রের মতন কথা বলছি।

বলতে বলতে অমিয় থেমে গেল।

ঝোপের আড়ালে বাগানের কাঁচা সড়কের ওপর পণ্ডিতমশাই আর নিভাকে দেখা গেল।

পণ্ডিতমশাই হাত-মুখ নেড়ে কি বলে চলেছেন, আর নতমুখে নিভা শুনছে। নিভার চুলে একরাশ বকুল ফুল ঝরে পড়ল। তার খেয়াল নেই। আলোচনায় সে নিবিষ্টচিত্ত।

বাইরে যাবার পথের পাশেই সুবীর আর অমিয় বসেছিল। ওরা ঘুরে ঘুরে সেদিকেই এল।

কাছে আসতে সুবীর দাঁড়িয়ে উঠল। তার দেখাদেখি অমিয় উঠে দাঁড়াল।

সুবীর পণ্ডিতমশাইকে প্রণাম করল।

পণ্ডিতমশাই মাথায় হাত রাখলেন।

তারপর বাবা সুবীর, অধ্যয়ন কেমন চলছে?

ভালই।

সুবীর সরে যেতে অমিয় প্রণাম করল। পণ্ডিতমশাই দুটো চোখ কুঞ্চিত করলেন।

এটি কে? আমার পরিচিত কেউ বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে নিজের দৃষ্টিশক্তির ওপর আমার খুব আস্থা নেই।

না পণ্ডিতমশাই, একে আপনি দেখেন নি। আমার সহপাঠী, ছুটিতে এখানে বেড়াতে এসেছে।

পণ্ডিতমশাই মুখ তুলে অমিয়কে পর্যবেক্ষণ করে বললেন, কি না বাবা তোমার?

অমিয় নাম বলল।

ব্রাহ্মণ!

পণ্ডিতমশাই দুটো হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গী করলেন।

খুব ভাল ছেলে পণ্ডিতমশাই। বৃত্তি পাচ্ছে।

তা তো হবেই। চেহারাতেই প্রতীয়মান হচ্ছে। সুগৌর বর্ণ, পদ্মপলাশ লোচন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এ যে বিদ্বানেরই চেহারা, বাবা সুবীর। সুখী হও বাবা, সুখী হও। দরিদ্রের প্রতিপালক হও, অন্যায়ের হন্তারক হও।

শেষের কথাগুলো পণ্ডিতমশাই চলতে চলতে বললেন।

অমিয় লজ্জায় কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। বিশেষ করে নিভার সামনে এভাবে তার সৌন্দর্য বর্ণনা করায়।

পণ্ডিতমশাই রাস্তায় গিয়ে উঠতে সুবীর বলল।

জানো অমিয়, পণ্ডিতমশাইয়ের বয়স প্রায় পঁচাত্তর। এখনও দু মাইল হেঁটে নিভাকে পড়াতে আসেন। এঁর কাছে প্রচুর হাতে-লেখা পুঁথি আছে। হ্যারিকেনের আলোয় কিছুদিন আগেও সেই সব পুঁথি বেশ পড়তে পারতেন। আজকাল চোখে ছানি পড়াতে একটু অসুবিধা হয়েছে।

অমিয় সুবীরের কথাগুলো শুনল বটে, কিন্তু তার চোখ রইল রাস্তার দিকে।

পণ্ডিতমশাইকে বিদায় দিয়ে এই পথেই নিভা ফিরে আসবে। যাবার সময় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিশ্চয় কথা বলবে সুবীরের সঙ্গে। নিভা যদি নাই বলে, সুবীরই ডাকবে তাকে। নিভা যদি দাঁড়ায়, তাহলে অমিয় দু-একটা কথা বলবে।

-এটা কি অন্যায়? পাপ?

সুবীরের বোন তো তারও বোন। স্বচ্ছন্দে কথা বলতে কিসের অসুবিধা? সঙ্কোচেরই বা কি কারণ?

অমিয় নিজের মনকে ধমকাল। অযথা জটিল চিন্তা করে সব ব্যাপারটা ঘোরালো করে তুলছে। নিভা তো সহজভাবেই তার সঙ্গে কথা বলছে। সোজাসুজি তার দিকে চোখ তুলে দেখছে। তবে তার এই বিব্রত ভাব একেবারেই অর্থহীন।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর অমিয়র খেয়াল হল, নিভা ফিরল না। বোধ হয় বাগানের মধ্যে অন্য কোন পথ দিয়ে ওপরে চলে গেছে।

তারপরই অমিয় লজ্জা পেল। সুবীর তার এই অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করেছে কিনা কে জানে? হয়তো প্রশ্ন করেছে, উত্তর পায় নি।

অবশ্য সুবীর যদি কিছু বলে, তখন বললেই হবে যে বাড়ির জন্য মন-কেমন করছিল। মার কথা, বাবার কথা ভাবছিল। সেটা নিশ্চয় স্বাভাবিক।

॥ ৭ ॥

পরের দিন সুবীরের ঠেলাঠেলিতে অমিয়র ঘুম ভেঙে গেল।

অমিয় যখন বিছানার ওপর উঠে বসল, তখনও আবছা অন্ধকার রয়েছে। ভাল করে আলো ফোটে নি।

এই ওঠ, আমরা একটু পরে রওনা হব।

চোখ মুছে অমিয় দেখল, এত ভোরেই সুবীর স্নান সেরে নিয়েছে! কিছুটা পোশাক পরাও হয়ে গেছে।

এত সকালে?

হ্যাঁ, একটু অন্ধকার থাকতেই যাত্রা করলে রোদটা বিশেষ লাগবে না। ভোরের হাওয়ায় হাওয়ায় পাল তুলে দিব্যি এগিয়ে যাওয়া যাবে।

বাইরে থেকে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সুবী!

যাই মা।

তোয়ালে নিয়ে অমিয় তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে পড়ল। একটু পরেই চোখে-মুখে জল দিয়ে বের হয়ে এল।

চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল।

লাল শানবাঁধানো ঘাটের পাশে বিরাট একটা নৌকো। পাল তোলা। ভিতরে রীতিমত বসবার ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজন হলে শোবারও।

মাঝি নৌকোর পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে। দুজন চাকর ঝুড়িবোঝাই তরিতরকারি তুলে দিচ্ছে নৌকোর ওপর।

ঘাটের সিঁড়িতে সুবীরের মা, বাবা, সুবীর আর নিভা।

অমিয় ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

পুবের আকাশ সবে রাঙা হতে আরম্ভ হয়েছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। ছেঁড়া মেঘের কোণে কোণে আবীরের প্রলেপ। জলেও লালচে ছায়া। মৃদু-মন্দ বাতাস বইছে।

অমিয়কে দেখে সুবীরের বাবা হাসলেন।

এস অমিয়, তোমার জন্য তোমার বন্ধু যেতে পারছে না।

অমিয় হাসল। সুবীরও।

মিনিট দশেক সুবীরের মা আর বাবা ফিসফিস করে কথা বললেন, তারপর সুবীর বাবার পিছন পিছন নৌকোয় গিয়ে উঠল।

নৌকোর ওপর দুটি মোড়ায় দুজনে বসল।

মাঝি দড়ি খুলে দিতেই সরসর করে নৌকো অনেকটা দূরে চলে গেল। আর একজন মাঝি দাঁড় বাইছে।

নৌকো নদীর প্রায় মাঝবরাবর যেতে অমিয় দেখল, সুবীরের মা গলায় আঁচল দিয়ে আকাশের দিকে হাত জোড় করে বিড় বিড় করে কি বললেন, তারপর একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন চলমান নৌকোর দিকে।

অমিয় নিভার দিকে চোখ ফেরাল।

নিভা একটা গাছের ডালে হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

অমিয় ঘাটের চাতালে বসে পড়ল।

নদীর বাঁকে যখন নৌকো অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন যেন সুবীরের মার চেতনা হল। তিনি অমিয়র দিকে চেয়ে হেসে বললেন, অমিয়বাবুর তো বড় কষ্ট, বন্ধু এরকমভাবে চলে গেল!

অমিয় একবার চোখ তুলে সুবীরের মায়ের দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

সুবীরের মা এগিয়ে এসে একটা হাত অমিয়র কাঁধে রাখলেন।

চল বাবা, ওপরে চল। এই নিভা, অমিয়দাকে ওপরে নিয়ে যা।

সুবীরের মা ওপরে গেলেন না। তিনি বাগানের মধ্যে ঢুকলেন।

নিভা অমিয়র পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, এখনও পুরো সকাল হয়নি। আপনি কি আর একটু ঘুমিয়ে নেবেন নাকি?

সলজ্জভাবে অমিয় ঘাড় নাড়ল, না, না, আর ঘুমোব না।

তা হলে ওপরে চলুন। দুধ খেয়ে নেবেন।

দুজনে ওপরে উঠল। নিভা আগে, অমিয় পিছনে।

আজ আর বারান্দায় আসন পাতা নেই। পরিবর্তে গোটা দুয়েক বেতের মোড়া। আগে এগুলো বোধ হয় অন্য ঘরে ছিল।

একটা বেতের মোড়ার ওপর অমিয় বসল।

নিভা সোজা চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

একটা কথা অমিয়র মনে পড়ে গেল। কদিন এখানে এসেছে, এ বাড়িতে কোন খবরের কাগজ চোখে পড়ে নি। অথচ কলকাতায় সকালে উঠেই খবরের কাগজের পাতার ওপর চোখ না বোলালে যেন দিনই আরম্ভ হত না। রাজ্যজোড়া গোলমালের খবর, রাশিয়া আর আমেরিকার চাঁদে রকেট পাঠাবার প্রতিযোগিতা, আরো কত রকমের সংবাদ। অন্তহীন বৈচিত্র্য।

অথচ খবরের কাগজ না পেয়ে খুব যে অসুবিধা হচ্ছে এমন নয়। আজ সুবীর নেই বলেই বুঝি খবরের কাগজের কথাটা মনে পড়ে গেল।

মানুষ অভ্যাসের দাস।

নিভা ফিরে এল হাতে দুধের বাটি, রেকাবিতে গোটাকয়েক মিষ্টি।

আচ্ছা নিভা!

দুধের বাটি নামাতে গিয়ে কিছুটা দুধ চলকে উঠল। মিষ্টির রেকাবিটা যখন নামাল, তখনও তার হাত রীতিমত কাঁপছে।

অমিয় বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখল। হঠাৎ কি হল নিভার?

এ নাম ধরে তো সবাই ডাকে অনবরত। মা, বাবা, সুবীর, পণ্ডিতমশাই। কিন্তু এই মানুষটার কণ্ঠে এ নাম এত মধুক্ষরা কি করে হল?

শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে নিভা জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলছিলেন আমাকে?

হ্যাঁ, বলছিলাম। তোমাদের বাড়ি কোন খবরের কাগজ আসে না?

হ্যাঁ, আসে।

কি কাগজ?

নিভা মুখ টিপে হাসল।

যে কাগজ আসে তা আপনার পড়তে ভাল লাগবে না।

কেন?

কাগজের নাম কৃষি-বিজ্ঞান।

নিভার সঙ্গে অমিয়ও হেসে উঠল।

অন্য দিনের মতন নিভা অমিয়র সামনে থেকে সরে গেল না। বারান্দায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

দুধের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে অমিয় বলল, আজ তোমার পণ্ডিতমশাই আসবেন না?

না, তিনি সপ্তাহে তিন দিন আসেন। আজ তাঁর আসার দিন নয়।

আজ তুমি আমার কাছে পড়বে?

একটু একটু করে অমিয় সহজ হবার চেষ্টা করল। দুজনের মাঝখান থেকে জড়তার বাধা অপসারিত না হলে ভারি অসুবিধা।

সুবীর নেই, প্রয়োজন হলে নিভার সঙ্গেই যখন কথাবার্তা বলতে হবে!

বেশ তো, পড়াবেন। দাদার কাছে শুনেছি আপনি খুব ভাল ছেলে। জলপানি পেয়েছেন। দিনরাত নাকি পড়ার বইয়ের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকেন।

এবার অমিয় লজ্জায় পড়ল। ঘাড় নেড়ে বলল, না, না, মোটেই তা নয়। সুবীর তোমাকে বাড়িয়ে বলেছে। আমি তোমাকে পড়াব মানে তুমি পড়বে, আমি শুনব।

নিভা দুটি ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল—আমি কি পড়ব?

কাল সকালে যেটা পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে পড়ছিলে!

ওঃ, মেঘদূতম। সংস্কৃত আপনার ভাল লাগে বুঝি?

শুনতে—পড়তে নয়। কি চমৎকার পড় তুমি! আমি চোখের সামনে যেন নির্বাসিত যক্ষকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

আহা!

নিভা শাড়ির আড়ালে মুখ লুকাল।

কি, শোনাবে না?

কাল যখন পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে পড়ব, আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে শুনবেন।

উঁহু, লুকিয়ে শুনব না। দেবভাষা তোমার সামনে বসে শুনব। আর তা নয়তো গান শোনাতে হবে।

বারান্দায় অন্য কোণে সুবীরের মাকে দেখা গেল। হাতে কতকগুলো তরিতরকারি নিয়ে উঠছেন। সম্ভবত বাগান থেকে নিজের হাতে তুলে এনেছেন।

অমিয়র কাছে এসে দাঁড়ালেন।

অমিয়, নিভা সব ঠিক দিয়েছে তো?

অমিয় ঘাড় নাড়ল।

হ্যাঁ, একটু বেশিই দিয়েছে।

কি বল, বেশি কোথায়? এই তোমাদের খাবার বয়স! আর এ তো বাইরের কিছু নয়। ঘরের গাইয়ের দুধ আর বাড়িতে তৈরি মিষ্টি।

অমিয় কিছু বলল না। মিষ্টি মুখে তুলতে লাগল।

তুমি দুপুরবেলা ঘুমাও বুঝি? মানে ঘুমানো অভ্যাস আছে?

না, দুপুরে আমি ঘুমোতে পারি না।

বেশ, আজ তাহলে তোমার কাছে এসে তোমাদের কলকাতার কথা শুনব। তোমার মা-বাবার কথা। অবশ্য সুবীরের কাছে অনেকটাই শুনেছি, কিন্তু তোমার মুখ থেকে শুনব।

অমিয় ঘাড় নাড়তে গিয়েই থেমে গেল।

বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে নিভা হাসিতে ভেঙে পড়েছে। সারা মুখ আরক্ত। খোঁপা খুলে ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের ওপর।

কি হ'ল রে?

সুবীরের মার দৃষ্টি রীতিমত সন্দিগ্ধ।

হাসতে হাসতেই নিভা বলল—আচ্ছা মা, দুপুরবেলা দু'চোখ খুলে তুমি কলকাতার গল্প শুনতে পারবে? পেটে ভাত পড়লেই তো তোমার দুটি চোখ বুজে আসবে আর নাকের নানারকম বাজনা শুরু হবে!

কপট ক্রোধে সুবীরের মা তর্জনী তুললেন।

থাম্! আমার কখখ্নো নাক ডাকে না।

॥ ৮ ॥

সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর অমিয় টেবিলের ওপর একটা বই নিয়ে পড়ছিল। তার নিজের বই।

সুবীরের অনেক বই রয়েছে আলমারিতে, টেবিলের ওপর, কিন্তু সে-সব বেশির ভাগই রহস্যকাহিনী। যেটা অমিয় একেবারেই পছন্দ করে না। বৈজ্ঞানিক ভুলক্রটিতে ভরা আজগুবী উপাখ্যান।

বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে খাতায় নোটস্ লিখছিল তন্ময় হয়ে। একটু পরে মাথা তুলেই দেখতে পেল জানলার ওপারে নিভা।

অমিয়র সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নিভা বলল।

বাবা, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি আপনার খেয়ালই নেই! পড়ার সময় আপনার কোনদিকে নজর থাকে না। তাই আপনি ক্লাসের সেরা ছেলে!

এ প্রশংসার অমিয় কোন উত্তর দিল না।

সে বলল, এস, ভিতরে এস। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

পায়ে পায়ে নিভা ভিতরে এল। টেবিলের একটা কোণ ধরে দাঁড়াল।

কি, মা ডাকছেন আমাকে?

না না, নিভা ঘাড় নাড়ল, মা এখন মনের আনন্দে ঘুমোচ্ছে। বললাম না তখন আপনাকে, দুপুরবেলা মা চোখ খুলে রাখতে পারে না।

অমিয় মুচকি হাসল, তুমি ঘুমোও না?

না, আমি আলো থাকলে ঘুমোতেই পারি না! কিছুক্ষণ শুয়েছিলাম, কিন্তু ভাল লাগল না, তাই আপনার কাছে চলে এলাম।

ভালই করেছ। বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বাইরে এলোমেলো বাতাসে গাছের পাতাগুলো কাঁপছে। আরো দূরে কোথাও গাছের বাকলে পাখী ঠক্‌ঠক্ করে চঞ্চুর ধার পরীক্ষা করে চলেছে। এসময় পার্বতী নদীর শব্দ স্তিমিত। শান্ত মেয়েটির মতন দুপুরের রৌদ্রে নিজেকে মেলে শুয়ে আছে।

বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে অমিয় ঘরের মধ্যে দেখল।

নিভার কপালে অল্প ঘামের বিন্দু। নাকের ডগাতেও। চুলের গোছা এলোখোঁপার ধরনে বাঁধা। টানা দুটি চোখে অপূর্ব মমতার ছাপ। ঠোঁটের প্রান্তে চাপাহাসির আভাস।

প্রথম প্রথম নিভা কাছে আসত না, কথাও বলত না। চকিতের জন্য দেখা দিয়েই সরে যেত। অচেনা কুমারীর পক্ষে সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক।

তারপর আজকাল কথা বলে। সেই ব্যাপারের পর আজকাল বেশি করেই কথা বলছে, কাছে আসছে। বোধ হয় সেদিনের লজ্জা ঢাকবার জন্যই।

তাছাড়া সুবীর নেই, যাবার সময় সুবীরই হয়তো বোনকে বলে গেছে অমিয়কে সঙ্গ দেবার জন্য, যাতে সে নিঃসঙ্গ বোধ না করে।

আচ্ছা আপনার তো বোন নেই, তাই না?

বইটা মুড়ে রেখে অমিয় বলল, না, বোন নেই, ভাইও নেই।

আপনার বড্ড একলা মনে হয়, না?

উঁহু, বরং মা-বাপের আদরে কোন ভাগীদার নেই ভাবতে ভালই লাগে।

ওমা, কি হিংসুটে আপনি! আমার তো দাদা না থাকলে খারাপ লাগে।

অমিয় দেখল, নিভা টেবিলের ওপর নিজের হাত-দুটো প্রসারিত করে দিয়েছে। সরু লম্বা আঙ্গুল। এরকম আঙ্গুলকেই অমিয়র মা বলে, চাঁপার কলির মত আঙ্গুল? কে জানে! আঙ্গুলের গড়নের কথা অমিয় জানে না, কিন্তু নিভার গায়ের রঙ চাঁপার মতন। কনকচাঁপা।

তোমার নামটা কিন্তু ভারি মিষ্টি।

আমার পুরো নামটা তো আপনি জানেন না। শুধু নামের অর্ধেকটা শুনেছেন!

তোমার পুরো নাম?

হ্যাঁ, আমার পুরো নাম চিত্রনিভা। একজন শুধু আমাকে পুরো নামে ডাকেন।

আশ্চর্য! ঠিক বুকের মাঝখানটায় অমিয়র যেন জ্বালা করে উঠল। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে। পুরো নাম ধরে ডাকা মানেই যেন মানুষটাকে পাওয়া।

কে ডাকে পুরো নাম ধরে?

আমার পণ্ডিতমশাই। তিনি বলেন, অয়ি চিত্রনিভে!

অমিয় হাসল।

তোমার আঙুলগুলো কিন্তু ভারি সুন্দর।

অমিয় নিভার আঙুলগুলোর দিকে চোখ রেখে বলল।

আপনার আজ কি হয়েছে বলুন তো? আমার নাম সুন্দর, আমার আঙুলগুলো সুন্দর, সব সুন্দর দেখছেন!

কি করে নিভাকে বোঝাবে অমিয়—পুরুষমানুষের এমন একসময় আসে যখন সব

কিছু ভাল বলতে ইচ্ছা করে। চারপাশের সব কিছু সুন্দর দেখে, সবুজ চশমা চোখে দিয়ে বাইরের সব কিছু সবুজ দেখার মতন। যৌবন নতুন রঙের প্রলেপ মাথায় চোখে, বুকে নতুন প্রীতির আমেজ আনে।

কেন, তোমার আঙুলগুলো বুঝি সুন্দর নয়?

অমিয় নিজেও ভাবেনি। আচমকা সামনে ঝুঁকে পড়ে একটা হাতে নিভার আঙুলগুলো তুলে নিল। আস্তে চাপ দিল। সত্যি কি নরম আর বিদ্যুৎবাহী!

নিভার সারা মুখে লালের ছোপ। সে তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখল। অবশ্য ভয়ের কোন কারণ নেই। এসময় কেউ এখান গিয়ে আনাগোনা করে না। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। প্রায় সবাই ঘুমের কোলে অচেতন।

আহা, আপনি যেন কি!

একটু জোর দিয়ে নিভা হাতটা ছাড়িয়ে নিল। হাই তুলল মুখে হাতচাপা দিয়ে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে, শুতে যাই।

অমিয়কে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই নিভা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হাতে মাথাটা চেপে অমিয় চুপচাপ বসে রইল। মনে হ'ল আজকের হাওয়াটা যেন বেশ গরম। এভাবে চেয়ারে বসে থাকতে ভাল লাগল না। নিভা সব আনন্দ, সব স্বাচ্ছন্দ্য, সব প্রাণময়তা যেন মুছে নিয়ে গেল।

অমিয় বুঝতে পারল, নিভা পালাল। অমিয়র দৃষ্টি থেকে, তার স্পর্শ থেকে।

নিজেকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করল অমিয়। কেন এমন হয়? সুবীরের সঙ্গে একান্তে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছে। নিকটসান্নিধ্যে। কত রকমের অবোলতাবোল কথা। কাজের—অকাজের।

কিন্তু নিভা কাছে এলে কেন এমন ভাব হয় মনের? ভয় করে, অথচ ভাল লাগে। একেবারে শিশু নয় অমিয়। নারী পুরুষের সম্পর্ক, তাদের আকর্ষণের কথা তার অজানা নয়। পূর্বরাগের ব্যাপারেও তার পরোক্ষ জ্ঞান আছে। অধীত পুস্তকের মাধ্যমে।

নিভাকে তার ভাল লাগে। ভাল লাগছে।

সহপাঠিনীরা কেমন অনাবৃত, অতিমাত্রায় সাহসিনী।

প্রেমাস্পদের হাত ধরে ঘোরাঘুরি করে। নিজেদের ভাল লাগাকে প্রকাশ করে উলঙ্গভাবে। লাইব্রেরিতে, রেস্তোরাঁয়, পার্কে তারা এ সব বিষয়ে বড় বেশি সোচ্চার।

কিন্তু নিভার কুণ্ঠা, সরমজড়ানো সম্ভ্রম, পাতলা কুয়াশার আস্তরণের মতন উজ্জ্বল আলোকে আচ্ছন্ন রাখার প্রয়াস অমিয়র ভাল লাগে। অবারিত নয়, উদ্দাম নয়, অর্ধস্ফুট কলির মতন এখনও সুবাস-সর্বস্ব হয়নি, রহস্যময়তা রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে। তার ভীরুতাই বুঝি তার সৌন্দর্য।

একদিনেই অমিয়র যেন ক্লান্তি এসে গেল। সুবীর না থাকাতে বেশ একটু অসুবিধা। অবশ্য সুবীরের মা প্রহরে প্রহরে খোঁজ নিচ্ছেন। কিন্তু তবু সুবীরের সঙ্গে যেমন বাইরে বের হওয়া যায়, হাঁটা যায় গ্রামের পথ ধরে, কোন বিষয় নিয়ে তর্কের অবতারণা—আর কারো সঙ্গে তো এসব চলে না।

বিকালে রোদের তাপ কমতে অমিয় সিঁড়ি দিয়ে নেমে পার্বতী নদীর ধারে এসে বসল। শানবাঁধানো চাতালের ওপর নয়, এদিকে সবুজ ঘাসের ওপর।

একটা সজনে গাছের ডালে অজস্র ফুল নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে নদীর জলের ওপর। তার ঠিক নীচে অমিয় বসে পড়ল।

দু-একটা জেলেডিঙ্গি চলেছে নদীর মাঝখান দিয়ে। মাঝিরা গান গাইছে। গানের কথা এত দূর থেকে শোনা যাচ্ছে না, শুধু একটা সুরের মায়া তরঙ্গভঙ্গের ওপর দিয়ে চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

বাবা, আপনি এখানে! আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান!

অমিয় পিছন ফিরে দেখল নিভা এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ি। পায়ে আলতা। সুন্দর করে কবরী রচনা করেছে। কপালে কুঙ্কুমের টিপ।

অমির উত্তর দিল না। মৃদু হাসল।

আপনি জলখাবার খাননি? মা ডাকছেন আপনাকে।

আজ আর জলখাবার খেতে ইচ্ছে করছে না। বস না এখানে!

দাঁড়ান, আসছি।

নিভা দ্রুতপায়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিনিটি দশেক—তার বেশি নয়। তার মধ্যেই নিভা ফিরে এল

হাতে থালার ওপর সরবতের গ্লাস আর একটা রেকাবিতে ফল আর মিষ্টি।

একি, ছি ছি! তুমি কষ্ট করে এখানে এসব আনতে গেলে কেন?

অমিয় বিব্রত কণ্ঠে বলল।

তাতে কি হয়েছে? আমরা তো কতদিন এখানে বসে বসে বিকেলের খাবার খাই। বাবা, মা, দাদা আর আমি।

অমিয় আর কিছু বলল না। রেকাবিটা টেনে নিল।

মাঝখানে একটু ব্যবধান রেখে নিভা বসল পা মুড়ে।

তোমারটা?

আমি খেয়েছি।

উঁহু, তা হবে না। তোমাকেও খেতে হবে।

অমিয় ফলের একটা টুকরো তুলে নিয়ে নিভার মুখের কাছে ধরল।

সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, আমি খেয়েছি।

বিশ্বাস করছি। তা হলেও এত আমি খেতে পারব না। তুমি সাহায্য কর।

নিভা আর আপত্তি করল না। ফলের টুকরোটা হাতে নিল।

খেতে খেতেই অমিয় স্মরণ করিয়ে দিল।

কি কথা ছিল মনে আছে?

কি কথা?

বলেছিলে বিকালে গান শোনাবে।

নিভা পিছন দিকে দেখল। কেউ নেই। এদিকে কারো আসবার কথাও নয়। তবু নিভা বলল, কে শুনতে পাবে—আমার ভারি লজ্জা করে!

লজ্জা আবার কি? পাখিরা সকাল-সন্ধ্যা গান শোনায়, তারা কি লজ্জা করে? বেশ তুমি আস্তে-আস্তেই গাও।

মাথাটা নীচু করে নিভা হাত দিয়ে কয়েকটা ঘাস ছিঁড়ল, তারপর খুব চাপা গলায় গাইতে আরম্ভ করল ঃ

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর, আমার সাধের সাধনা।...'

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রতিটি কলি বার-দুই গাইল। শহরে এ গান কেমন লাগত অমিয়—বলতে পারবে না—অজস্র রেডিও-কণ্টকিত গলিতে গলিতে, উচ্ছল সঙ্গীতের পরিবেশে।

কিন্তু এই প্রাকৃতিক পরিবেশে, নদী আকাশ বনানীর আবেষ্টনীতে সহজ সরল অন্তরের এই সুরেলা প্রকাশ অমিয়র কানে অদ্ভুত সুন্দর ঠেকল।

সে হাঁটুর ওপর মুখটা রেখে চুপ করে শুনল। নদীর জলে জলতরঙ্গের আভাস। বাতাসেও হালকা বাঁশির রেশ।

গান থামতে অমিয় বলল—কি চমৎকার তোমার গলা! তুমি কারো কাছে গান শেখো বুঝি?

না, নিভা মাথা নাড়ল, মার কাছে আগে শিখতাম—এখন নিজে-নিজেই গাই।

সত্যি ভারি মিষ্টি লাগল।

আপনার ভাল লেগেছে?

অমিয় একটা দুঃসাহসের কাজ করল। নিভার দিকে একটু হেসে বলল, আচ্ছা তুমি আমাকে আপনি বল কেন? সুবীরকে যেমন তুমি বল, সেইরকম তুমি বলতে পার না?

পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বিচিত্র বর্ণের মেঘ নদীর কূল ছুঁয়ে ছুঁয়ে। পরপারের গাছপালার ওপর রঙের পাণ্ডুবর্ণ।

সেই রঙের আঁচড় নিভার মুখে-চোখে।

বাবা আর মা যা বলেছে তা যদি হয় তো আমিও তুমি বলব।

অমিয় বিস্মিত হ'ল। সুবীরের মা-বাবা আবার কি বলল তার সম্বন্ধে?

কি বলেছেন তোমার বাবা আর মা?

দু'হাতের তালুতে নিভা মুখ ঢাকল।

যান, আমি বলতে পারব না! আমার লজ্জা করে।

লক্ষ্মীটি, বল। প্লীজ!

নিভা মুখ তুলল না।

অমিয় একবার ওদিক-ওদিক দেখল। না, ধারেকাছে কেউ নেই।

সে একটা হাত দিয়ে নিভার বাহুমূল স্পর্শ করল।

এই, বল—বলবে না?

নিভা এঁকেবেঁকে অমিয়র কাছ থেকে দূরে সরে গেল। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

অমিয় নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

আজ দুপুরেও নিভা এভাবে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। এবারেও তাই।

কি বলেছেন সুবীরের মা আর বাবা? যা বলেছেন তার সঙ্গে নিভার কি সম্পর্ক?

অমিয় উঠে দাঁড়াল। পায়ের কাছে গ্লাস আর রেকাবিটা পড়ে রয়েছে। নিভা চলে গেল। এগুলো কি এভাবেই পড়ে থাকবে এখানে?

অমিয় বাড়ির দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ল।

বিরাট একটা মল্লিকার ঝাড়। বাঁশের মাচা আশ্রয় করে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। তার একদিকে লতাগুচ্ছের একপাশে নিভা দাঁড়িয়ে। নিভার ধারণা, তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আত্মগোপন করতে পেরেছে মল্লিকা-বল্লরীর অন্তরালে।

পা টিপে টিপে অমিয় কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

পিছন থেকে দুটো হাত দিয়ে নিভার দুটো কাঁধ আঁকড়ে ধরে বলল।

এইবার!

নিভা পালাবার চেষ্টা করল—পারল না। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, এই ছেড়ে দিন, কে দেখতে পাবে।

আগে বল কথাটা? তোমার মা আর বাবা কি বলেছেন?

আগে ছাড়ুন, তারপর বলব।

অমিয় ছেড়ে দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল। কিন্তু পালাবার পথ আগলে।

শাড়ির আঁচল দিয়ে বার বার নিভা মুখটা মুছে নিল। বলার চেষ্টা করেও যেন বলতে পারছে না। শেষকালে অনেক কষ্টে থেমে থেমে উচ্চারণ করল কথাগুলো।

মা বলছিল বাবাকে, দুজনে বেশ কিন্তু মানায়!

অমিয় জেনেও না জানার ভান করল।

কার সঙ্গে কাকে মানায়?

নিভা আচমকা ধাক্কা দিয়ে অমিয়কে সরিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ অমিয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নিভার সঙ্গে তাকে খুব মানায়—এই কথাটাই সুবীরের মা আর বাবা বলেছেন। তার মানে তাঁদের মনের গোপন আশা বুঝি এই যে, নিভা অমিয়র অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী হবে—সুখ-দুঃখে চিরসাথী।

বধূরূপে নিভাকে কল্পনা করার চেষ্টা করল অমিয়। মাথায় ঘোমটা, সীমন্তে সিঁদুর, পরনে বেনারসী। আজকাল কেউ পায়ে নূপুর পরে না। এমন কি নিভার মতন আলতার রেখাও পায়ে আঁকে না।

কিন্তু তবু অমিয়র মনে হ'ল নূপুর পড়লে নিভাকে ভালই মানাবে। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাবার সময় শব্দ হবে ঝুন ঝুন ঝুন। নিভার অবস্থিতি বুঝতে খুব অসুবিধা হবে না।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামতে অমিয় সরে এল।

ধীরপায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সিঁড়িতে পা রেখে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে বুকের স্পন্দন যেন দ্রুততর হচ্ছে, সেটা অনুভব করতে পারল।

চাতালের ওপর সুবীরের মা দাঁড়িয়ে।

অমিয়কে দেখে বললেন, বন্ধুর জন্য মন খুব খারাপ, তাই না অমি? সুবীও যাবার সময় অনেকবার বলেছে, অমি কি করে একলা থাকবে?

অমিয় কোন উত্তর না দিয়ে একেবারে উপরে উঠে এল।

কথা বলবার অমিয়র উপায় নেই। সারা শরীর কাঁপছে। অব্যক্ত একটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠেছে শরীরের গ্রন্থি।

এ সুখাবেশ তুলনারহিত। ভাল পরীক্ষা দিয়ে এলে, কিংবা সাফল্যের সংবাদ পেলে ঠিক এ ধরনের আনন্দ হয় না। এ আনন্দের জাত আলাদা।

অমিয় কাছে দাঁড়াতেই সুবীরের মা হেসে উঠলেন।

এ কি, কোথায় গিয়েছিলে?

অমিয় শঙ্কিত হ'ল। মল্লিকাকুঞ্জের মধ্যে নিভাকে অন্বেষণ করতে যাওয়াটা কি সুবীরের

মার চোখে পড়েছে? বারান্দা থেকে তিনি দেখেছেন কিছু?

কেন বলুন তো! খুব নিস্তেজ গলায় অমিয় উচ্চারণ করল।

সুবীরের মা অমিয়র খুব কাছে সরে এলেন। তারপর তার মাথায় হাত দিতে একরাশ মল্লিকা ফুল ঝরে পড়ল।

সেই দিকে চেয়ে অমিয় বলল—ওই যে মল্লিকা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম! বাতাসে ফুলগুলো মাথায় ওপর ঝরে পড়েছে।

সুবীরের মা হাসতে হাসতেই বললেন—সে আমি বুঝতে পেরেছি। আমি কি বলছি ফুল তুমি চুলে গুঁজেছ!

অমিয় আর কিছু না বলে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। নিজের ঘর মানে যে ঘরে সে আর সুবীর শোয়।

কিছুটা গিয়েই কথাটা মনে পড়ে গেল। ফিরে দাঁড়িয়ে বলল। গ্লাস রেকাবি নদীর ধারে পড়ে আছে।

নদীর ধারে?

হ্যাঁ, নিভা আমার জন্য খাবার নিয়ে গিয়েছিল।

ওঃ, ঠিক আছে। তুলসীকে বলছি নিয়ে আসতে।

অমিয় আর দাঁড়াল না। ঘরের মধ্যে ঢুকে চেয়ারে বসল—একটু পরেই উঠে বাথরুমে ঢুকে মুখ-হাত ধুয়ে আবার এসে বসল চেয়ারে।

॥ ৯ ॥

পরের দিন নিজের নোটবইটা খুলে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করল। সংযত করার প্রয়াস করল নিজেকে।

এই ধরনের এলোমেলো চিন্তা খুবই ক্ষতিকর। ছাত্রদের পক্ষে অধ্যয়ন তপের সামিল এ তুলনা সেকালে যেমন সত্য ছিল, একালেও তেমনই। রঙ নিয়ে আলপনা আঁকার বয়স এটা নয়। নিভার মা-বাবা কি বলেছেন, সেটাই জপমালা করা মুর্খামির পরিচায়ক। অমিয়র সামনে শুধু একটি স্বপ্ন উজ্জ্বল হয়ে থাক্, সে স্বপ্ন তার জীবনকে ঘিরে। সফল কৃতী জীবন।

সে জীবনের আশেপাশে নিভার মতন মেয়েদের ছায়া পড়াও অন্যায়।

একটু পরেই অমিয়র খেয়াল হ'ল নোটবই খুলে এতক্ষণ সে অর্থহীন কথাই চিন্তা করছিল। বইয়ের একটি অক্ষরও তার মাথায় ঢোকেনি।

টান হয়ে বসতে গিয়েই পিছনের পদশব্দ কানে এল। খুব আস্তে বারান্দা থেকে কে ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। কে আসছে বুঝতে অমিয়র একটুও অসুবিধা হ'ল না। কে জানে, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর, আমার সাধের সাধনা......' এ গানটা নিভা অমিয়কে লক্ষ্য করেই গেয়েছে কিনা!

সন্ধ্যার মেঘ মানে বিচিত্র রঙে রঞ্জিত মেঘের স্তূপ, কিন্তু সে রঙ, সে মেঘ যে ক্ষণস্থায়ী একথা কে বলে দেবে নিভাকে?

পায়ের শব্দ আরো কাছে। নোটবইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে অমিয় পড়ার ভান করল। চেয়ার টানার শব্দ। নিভা বুঝি পাশের চেয়ারটা টেনে বসল।

একটু একটু করে মেয়েটার সাহস বাড়ছে। প্রথমে সামনেই আসত না, তারপর নেপথ্য থেকে কণ্ঠস্বর শোনাল, এখন তো অনেক এগিয়েছে। অন্তরঙ্গ কথা বলারও চেষ্টা করছে।

তোমার পড়ার ক্ষতি করলাম বোধ হয়?

কণ্ঠস্বরে অমিয় চমকে মুখ ফেরাল।

না, নিভা নয়—নিভার মা। পাশের চেয়ারে বসেছেন।

হাত দিয়ে নোটবইটা সরিয়ে দিয়ে অমিয় তাড়াতাড়ি বলল, না, না, আমি পড়ছিলাম না। একলা একলা ভাল লাগছিল না, তাই বই নিয়ে বসেছিলাম।

সুবীরের মা হাসলেন।

আমার আজ ছুটি। নিভা আজ আমাকে রান্নাঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কথাটা মিথ্যা জেনেও অমিয় বিস্মিত হবার ভান করে বলল, কেন?

ও বুঝি কি নতুন তরকারি রাঁধবে। আমি থাকলে ওর লজ্জা করবে। তাই ভাবলাম তোমার কাছে একটু বসি।

ভালই করেছেন।

অমিয় নিজের চেয়ারটা ঘুরিয়ে সুবীরের মার মুখোমুখি হবার চেষ্টা করল।

তোমার বাবার তো বিরাট কারখানা!

বিরাট নয়—মাঝারি এক যন্ত্রপাতির কারখানা আছে বেলুড়ে।

তোমার বাবাই সব দেখাশোনা করেন?

না, আরো লোক আছে। টেকনিক্যাল কাজ জানা অনেক লোক—ইঞ্জিনীয়ার, ফোরম্যান, মিস্ত্রিরা।

তুমি বড় হয়ে সেই কারখানাই দেখবে?

বাবার তাই ইচ্ছা। আমি কারখানার নতুন কোন বিভাগ গড়ে তুলি। নানা রকমের ধাতুর সংমিশ্রণে নতুন ধাতুর সৃষ্টি সম্ভব। নতুন ধাতু খুব জোরালোও যেমন হতে পারে তেমনি বিশেষ কাজের উপযোগী। বাবা চান, আমি রিসার্চ করে তেমন কোন নতুন ধাতু আবিষ্কার করি যা লোহা বা ইস্পাতের চেয়েও মজবুত।

অমিয় যখন কথাগুলো বলছিল, তখন সুবীরের মা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়েছিলেন। স্বভাবলাজুক ছেলেটি এই সময় যেন চেহারা পালটে ফেলে। জ্বলে জ্বলে ওঠে দুটি চোখ, আবেগে দুটো ঠোঁট থরথরিয়ে কাঁপে।

মনে হয় এ কথাগুলোর পিছনে বিশ্বাসের মাটি রয়েছে, সেই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে অমিয় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলছে সব কিছু।

বাবার সঙ্গে বহুবার এ নিয়ে অমিয়র আলোচনা হয়েছে। তার বাবা ঠিক কি চান সেটা যেন অমিয়র নখদর্পণে। শুধু বছরের পর বছর পাস করা নয়—প্রাইজের বই বা পদক কুক্ষিগত করে পরীক্ষার বেড়া টপকানোই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়।

নতুন কিছু করতে হবে, প্রজ্ঞার আলোকপাতে নতুন সৃষ্টি কিংবা পুরাতনের নবরূপায়ণ।

ওঁরও ইচ্ছা, সুবী চাষবাসের কাজে ওঁকে সাহায্য করুক।

হ্যাঁ, সুবীর আমাকে বলেছে সে কথা। খুব ভাল তো। মাটিই তো সোনা।

কি জানি, এমনিই তো লোকটা উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন। একটু বিশ্রামের সময় পান না, তারপর ছেলেটারও ওই এক হাল হবে।

পরিশ্রমই তো আনন্দের উৎস। জানেন মাসিমা, ল্যাবরেটরিতে যখন পরীক্ষা করে সফল হই, মানে আমাদের পরীক্ষা সামান্য ব্যাপার, গবেষণা তো নয়—তাতেই কত আনন্দ বোধ হয়। আর নিজের কাজে আনন্দ তো বেশি হবেই।

ও আনন্দ জানি না অমিয়, আমার শুধু এই ভেবেই আনন্দ, ছেলে দূরে যাবে না চাকরি করতে। এইখানেই আমার কাছে থাকবে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। সুবীরের মা নয়, অমিয়ও না। দুজনে চুপচাপ বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইল। সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তায় অভিভূত হয়ে।

তারপর সুবীরের মা বলল। খুব মৃদুকণ্ঠে। প্রায় অস্পষ্ট সুরে।

মেয়েকে তো চিরদিন কাছে রাখতে পারব না। সে চলে যাবেই। মনের মতন পাত্রের হাতে পড়ে এইটুকুই কামনা করব।

অমিয় সাহস সঞ্চয় করল। একটানা অনেক কথা বলে নিজের ওপর ভরসা ফিরে এসেছে।

নিভা তো ছোট। এখনই ওর বিয়ের কথা ভাবছেন কেন?

ছোট আর কোথায়! পনেরো পার হয়েছে। তোমার মেসোমশাইয়ের একটু তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার ইচ্ছা, অবশ্য যদি সৎপাত্র পাওয়া যায়।

অমিয় কিছু বলল না। এরপর তার কিছু বলাও শোভা পায় না।

বস অমিয়, আমি একবার রান্নাঘরের দিকে যাই। দেখি মেয়েটা কি কাণ্ড করছে!

সুবীরের মা উঠে গেলেন।

অমিয়ও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়াল। কোথা থেকে একটা ঘুঘুর ক্লান্ত উদাস কণ্ঠ বাতাসে ভেসে আসছে। একটানা।

অমিয়র আবার নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। মা আর বাবার কথা। বাবা নিজের কারখানায় ব্যস্ত। মা চুপচাপ বসে আছেন কৌচে কিংবা সোফায়। অমিয় এখানে আসুক, এত দূরে—এটা তার মার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। তিনি ভেবেছিলেন, অমিয়র বাবাই বারণ করবেন। অমিয়র যাওয়া হবে না। কিন্তু অমিয়র বাবা যে এক কথায় এভাবে রাজী হয়ে যাবেন, তা তিনি ভাবতেই পারেননি।

বলা যায় না, এই নিয়ে দুজনের মধ্যে হয়তো কথা কাটাকাটি হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন দেশভ্রমণের উপকারিতার কথা, আর মা বিদেশ-বিভুঁইয়ের হাজার অসুবিধার ফিরিস্তি দিয়েছেন।

কি, আজ স্নান বন্ধ নাকি?

নিভার কণ্ঠ শুনে অমিয় ঘুরে দাঁড়াল।

আঁচলটা কোমরে জড়ানো। কপালে ঘামের মুক্তা, চুল এলোমেলো। কোন প্রসাধন করেনি কিন্তু নিভা, তবু তাকে অপরূপ মনে হ'ল।

অমিয় হাসি চেপে বলল—আজ স্নান করব কিনা ভাবছি।

ওমা, কেন?

স্নান সেরে এলেই তো আবার খেতে বসতে হবে।

বসবেন! না খেয়ে থাকবেন নাকি?

সেই জন্যই ভয় করছে। আজকের রান্না নাকি মারাত্মক হয়েছে। মুখে দিলেই অজ্ঞান।

প্রথমে নিভা বুঝতে পারেনি। অমিয় যে এ ধরনের কথা বলবে, বলতে পারে, তা

সে আশাই করেনি। কথাগুলো ভাল করে শুনে নিভা ক্ষেপে গেল।

দুই বন্ধু ঠিক একরকম! মানুষের পিছনে লাগতে পারলে আর কিছু চান না। কেন, আমি বুঝি রাঁধতে জানি না?

সংস্কৃত করে বলব?

নিভা অবাক চোখে চেয়ে রইল।

অমিয় বলল, ফলেন পরিচিয়তে।

বেশ, আপনি স্নান করে আসুন তো!

অমিয় ঘরের মধ্যে ঢুকল। অন্য দিন এর চেয়ে দেরিতে খেতে বসে। কিন্তু সুবীরের বাবা নেই, সুবীর নেই—কাজেই খাওয়া-দাওয়ার পাট বোধ হয় তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে চায়।

অমিয় ভেবেছিল, সে আর নিভা দুজনে পাশাপাশি খেতে বসবে, কিন্তু এসে দেখল মোটে একটি আসন পাতা হয়েছে। আসনের কাছে নিভা দাঁড়িয়ে।

তুমি বসবে না?

আপনি বসুন। আমি মার সঙ্গে বসব।

অমিয় আর কিছু বলল না। আসনের ওপর বসে পড়ল।

সুবীরের মা এলেন থালা নিয়ে। থালার ওপর তরকারির বাটি বসানো। নিভা আসনের কাছে বসল হাতে পাখা নিয়ে।

অমিয় হাত নেড়ে বারণ করল—না, না, পাখার দরকার হবে না। বেশ হাওয়া দিচ্ছে।

হাওয়া অবশ্য ছিল, কিন্তু অল্প।

অমিয় বারণ করতে নিভা পাখাটা রেখে দিল।

অমিয় নিভার মার দিকে চেয়ে বলল—নিভা কোন্ তরকারিটা রেঁধেছে মাসিমা?

নিভা ছুটে মার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুটো হাত দিয়ে তাঁর একটা হাত জাপটে ধরে বলল, বলবে না মা, খবরদার বলবে না।

না, না--বলব না। মা হাসতে লাগলেন।

অমিয় বলল, ঠিক আছে, আপনি কিছু বলবেন না। আমি মুখে দিয়েই বুঝতে পারব।

ডালমাখা ভাতের গ্রাস মুখে তুলেই অমিয় একবার মা আর মেয়ের দিকে দেখল। দুজনেরই মুখ নয়—যেন মুখোশ। কোন অনুভূতির আঁচড়ও নেই।

তারপর বেগুনভাজা, সজনেডাঁটার চচ্চড়ি। কিছুই বোঝা গেল না। মা রেঁধেছেন, না মেয়ে!

তারপরের ব্যঞ্জনটি অমিয়র অতি প্রিয়। এঁচোড়ের তরকারি। এতে লবণ না দেওয়া থাকলেও তার ভাল লাগবে। শেষপাতে দুধ আর সন্দেশ।

খাওয়া প্রায় শেষ হতে অমিয় বলল—কোন্টা তোমার রান্না ঠিক করে বল তো?

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নিভা বলল।—দুধটা। ওটা আমি ফুটিয়েছি।

মেয়ের কথায় মাও হেসে উঠলেন।

অমিয় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে মা বললেন, এঁচোড়ের তরকারিটা তোমার কেমন লাগল সত্যি করে বল।

অমিয় নিভার দিকে চোখ ফেরাল। নিভা অন্য দিকে চেয়ে রয়েছে।

অমিয় বলল, না, নিভা কিন্তু মন্দ রাঁধে না।

দুপুরে নিভা অমিয়র ঘরে ঢুকল।

অমিয় জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল, পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল।

আপনি ঘুমাবেন নাকি?

না। অমিয় ঘাড় নেড়ে চেয়ারের ওপর বসল।

নিভাও বসল উল্টোদিকের চেয়ারে।

কাল মা কি বলছিল আপনাকে?

তুমি আড়ি পেতে শুনছিলে বুঝি?

মোটেই না। আমি এসেছিলাম, দেখলাম মা বসে আপনার সঙ্গে কথা বলছে।

অমিয় এদিক-ওদিক দেখল, নিভার মা আসছে কিনা, তার পর বলল, আমার মা-বাবার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। আমি বড় হয়ে কি করব। এই সব।

আপনাদের মস্ত বাড়ি, তাই না?

তোমাদের মতন এত বড় নয়। এতখানি জমি তো নয়ই।

তবু সে তো শহরের বাড়ি!

তোমার বুঝি শহর খুব ভাল লাগে?

আমার শহরের কথা মনে নেই। খুব ছেলেবেলায় একবার কলকাতায় গিয়েছিলাম। খুব ভিড় আর ভীষণ শব্দ—এইটুকুই শুধু মনে আছে।

বেশ তো চল আমার সঙ্গে। আমাদের বাড়ি।

ধ্যাৎ, অসভ্য।

নিভা আঁচলের অনেকখানি মুখে পুরে দিল। লজ্জায় সারা মুখে সিঁদুরের আভা।

কথাটা বুঝতে অমিয় বেশ সময় নিল। এমন কি বলেছে অমিয় যে নিভা এত সঙ্কুচিত হ'ল! অল্প অল্প করে অন্ধকার কেটে যাওয়ার মতন কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ অমিয়র সামনে ফুটে উঠল। এক রাতের মা-বাবার কথার পরিপ্রেক্ষিতে নিভা বুঝি সব কিছুর বিচার করছে। অমিয়র সঙ্গে শহরে যাওয়ার সেই অর্থই নিভা বুঝেছে।

কেন, অমিয় নিজেকে সামলে নিল, তুমি আমি আর সুবীর তিনজনে যেতে পারি শহরে! সুবীরের হোস্টেলে তো মেয়েদের থাকতে দেয় না, কাজেই তোমাকে আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে।

নিভা কি বুঝল কে জানে, তার মুখের রঙ স্বাভাবিক হ'ল। চাপা গলায় বলল, মা আমাকে যেতে দেবে না। মার সঙ্গে ছাড়া আমি কোথাও যাই না।

অমিয় চেয়ারে হেলান দিয়ে একদৃষ্টে নিভাকে দেখল। সত্যি যদি নিভা যেত তার সঙ্গে! মার সামনে দাঁড়িয়ে বলত, কে এসেছে দেখ মা। সুবীরের বোন। মা নিভার চিবুক ধরে আদর করে বলতেন, বাঃ, কি সুন্দর দেখতে রে মেয়েটি! যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা। আর কি বলতেন মা? আর কি ভাবতেন? যে কথা সুবীরের মা আর বাবা বলাবলি করেছেন—সেই কথা তার মা-বাবাও ভাবতে পারেন, বলতে পারেন।

কি ভাবছেন? নিভার প্রশ্নে অমিয় সচেতন হ'ল।

বলল, ভাবছি শহরে গিয়ে এই গাছপালা, পার্বতী নদী, পাখির ডাক, প্রজাপতির সঞ্চরণ সব মনে পড়বে। তোমার মা বাবা, তোমার কথা। ইট-কাঠের বন্দীশালায় বসে

এসব ভাবতে খুব ভাল লাগবে। এত রঙ আমরা শহরে দেখতে পাই না।

নিভা হাসল। মৃদু শান্ত হাসি।

পড়াশোনার মধ্যে ডুবে গেলে আপনি সব রঙের কথাই ভুলে যাবেন।

বেশ দেখো। আমি তোমাকে, মানে তোমার মাকে চিঠি লিখব। কিন্তু তুমি তো আমার কথা রাখলে না!

কি কথা? নিভা একটু যেন বিস্মিত হ'ল।

আমাকে 'আপনি' বলতে বারণ করেছিলাম যে। সুবীরকে যেমন 'তুমি' বল, তেমনই আমাকেও 'তুমি' বলবে।

এর পরের বার যখন আসবেন তখন বলব। ঠিক বলব—দেখবেন।

অমিয় কি একটা বলতে গিয়েই থেমে গেল।

নীচে থেকে সুবীরের মার গলা।

নিভা!

যাই মা।

নিভা উঠে গেল।

চিন্তার আঁচড় পড়ল অমিয়র কপালে। এভাবে তার সঙ্গে নিভা একলা নিরালায় বসে কথা বলছিল বলেই বুঝি তার মা তাকে ডাকলেন। ছি, ছি! অমিয় নিভাকে ডাকেনি, আসতে বলেনি,—তবু সে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেল।

একটু পরে নিভা আবার ঘরে ঢুকল। হাতে একটা খাম।

আপনার চিঠি!

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে অমিয় খামটা নিল। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে পড়তে শুরু করল। মা লিখেছেন। অমিয়র চিঠির উত্তর।

পড়তে পড়তেই অমিয়র ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। শেষের ক'লাইনের ওপর সে আবার চোখ বোলাল।

দাদু এসেছেন। অমিয়র দাদু অর্থাৎ অমিয়র বাবার মামা। লক্ষ্ণৌতে অধ্যাপনা করতেন। অমিয় তাঁর নাম শুনেছে কিন্তু কোনদিন চোখে দেখেনি। অবসর গ্রহণ করে দাদু লক্ষ্ণৌতেই ছিলেন। তিনি অমিয়কে দেখতে চান। খুব বেশিদিন থাকতে পারবেন না। কতকগুলো বই কেনার ব্যাপারে কলকাতায় এসেছেন। অমিয় যেন পত্র পেয়েই রওনা হবার ব্যবস্থা করে. নয়তো দাদুর সঙ্গে দেখাই হবে না। তাঁর বয়স হয়েছে—আবার দেখা হবে কিনা স্থিরতা নেই।

অমিয় মুখ তুলল। দেখল নিভা অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

অমিয় বলল, মার চিঠি। আমাকে চলে যেতে লিখেছে।

কারো অসুখ-বিসুখ নয় তো?

না। অমিয় মাথা নাড়ল, অসুখ নয়। আমার দাদু এসেছেন লক্ষ্ণৌ থেকে। বেশিদিন থাকবেন না। আমাকে দেখতে চান।

শাড়ির আঁচলটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে নিভা বলল, আপনি কবে যাবেন?

দেখি সুবীর আসুক। তোমার বাবা আসুন, তাঁদের বলে দেখি।

নিভা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। অমিয়র কোনদিকে দৃষ্টি নেই, একমনে মার চিঠি পড়ছে।

একসময়ে নিভা উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল। অমিয় লক্ষ্যই করল না।

অনেকবার চিঠিটা পড়ে খামের মধ্যে বন্ধ করতে যাবার সময় অমিয়র খেয়াল হ'ল, সামনের চেয়ার খালি। নিভা কখন উঠে গেছে।

চিঠিটা হাতে নিয়েই অমিয় বারান্দায় এসে দাঁড়াল। খর-মধ্যাহ্নের তাপে গাছপালাও যেন মুহ্যমান। পাখির কাকলী শোনা যাচ্ছে না। পার্বতী নদীর ওপর যেন রূপার পাত কেউ ফেলে রেখেছে।

এই মুহূর্তে নিজেকে অমিয়র ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হ'ল। শহরের জন্য, আত্মীয়বর্গের জন্য প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠল।

॥ ১০ ॥

পরের দিন সকালে হৈ-চৈ চিৎকারে অমিয়র ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে চোখে-মুখে জল দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দেখল, ঘাটে নৌকো লাগানো। সুবীর, তার বাবা-মা চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে। একটু দূরে নিভা।

এত তাড়াতাড়ি যে সুবীর ফিরে এল! চাকরবাকরেরা সবাই ঝুড়িবোঝাই মালপত্র নামাচ্ছে নৌকো থেকে। তাদের চিৎকারই অমিয়র কানে গিয়েছিল।

অমিয় সিঁড়ি দিয়ে নামতেই মাঝপথে সুবীরের সঙ্গে দেখা হ'ল। সেও ছুটে ওপরে উঠছিল।

অমিয়র কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে সুবীর জিজ্ঞাসা করল—এই, তুমি নাকি কলকাতায় ফিরে যাবে এর মধ্যে?

হ্যাঁ, কিন্তু নামতে-না-নামতেই কে দিলে খবরটা?

নিভা বলল। তোমার দাদু এসেছেন কোথা থেকে।

লক্ষ্ণৌ থেকে। দাদু মানে বাবার মামা। আমি কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ছে না

তোমার যাওয়া খুব দরকার?

যাওয়াটা উচিত ভাই সুবী। মা বিশেষ করে লিখেছে, দাদুর বেশ বয়স হয়েছে, আর দেখা হবে কিনা বলা মুশকিল।

সুবীর কিছু বলল না, কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হ'ল সংবাদটা শুনে সে খুব মুষড়ে পড়েছে।

দুজনে বারান্দায় দাঁড়াল। রেলিংয়ে ভর দিয়ে।

এইবার অমিয় প্রশ্ন করল—তুমি যে এত তাড়াতাড়ি চলে এলে?

এবারেও বহুকষ্টে আলাদা হওয়াটা আটকানো গেল। পিসিমার অসুখ হয়েছিল, সব ছেলে ঘিরে বসেছিল তাঁকে। সেই সময় বাবা অনেক বুঝিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করেছে।

নৌকোটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে ঘাট থেকে। দাঁড়ের ঘায়ে ছলাৎ-ছল শব্দ হচ্ছে সেইদিকে চেয়ে অমিয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ক'দিনই বা তুমি রইলে! শিবমন্দির দেখা হ'ল না—কত কিছু দেখা বাকী রইল।

আমি আবার আসব।

এর বেশি আর কিছু বলতে পারল না। এ কটা কথা বলতে গিয়েই মনে হ'ল কে যেন সবলে তার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি।

সুবীরের বাবা উঠে এলেন। পিছন পিছন মা।

কি শুনছি অমিয়বাবু, তুমি এসেই পালাই-পালাই করছ!

অমিয় দাদুর কথা আবার বলল।

মুশকিল। তোমাকে থাকতে বলিই বা কি করে? তুমি কবে যাবে মাকে লিখেছ?

না, কাল চিঠি পেয়েছি—আজ জানিয়ে দেব। আমার ইচ্ছা কালই চলে যাই।

সুবীরের বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন।

তোমাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিলে নিশ্চয় যেতে পারবে!

কিছু না ভেবেই অমিয় বলল, হ্যাঁ, খুব পারব।

অবশ্য ভাববার আছেই বা কি? মাঝখানে তো বদল করার কোন প্রশ্ন নেই। পাগলাপোতায় উঠে একেবারে শেয়ালদায় নামা।

সুবীরের বাবা চলতে চলতে বললেন—কদিনের জন্য এসে আমাদের মনটা খারাপ করে দিয়ে গেলে। সামনের ছুটিতে আসবার চেষ্টা করো।

অমিয় ঘাড় নাড়ল।

সারাটা দিন সুবীর সঙ্গে সঙ্গে রইল। নিভাকে কিন্তু ধারে-কাছে কোথাও দেখা গেল না।

একবার মুখ ফুটে অমিয় বলেই ফেলল—নিভাকে দেখছি না?

সুবীর একবার এদিক-ওদিক দেখল। পরে বলল, আছে কোথাও।

সুবীর অমিয়র সঙ্গে কথায় এত ব্যস্ত যে, নিভার ব্যাপারে সে বেশি আমলই দিল না। কলকাতায় কতকগুলো বই তার কেনা দরকার—কিছু পড়ার বই, কিছু স্পোর্টস-এর। সেই সম্বন্ধেই সে অমিয়কে বলছিল। কোন্ দোকানে পাওয়া যেতে পারে, কিংবা হোস্টেলের কোন্ ছেলের কাছে?

রাত্তির বেলা এক এলাহি কাণ্ড।

খেতে বসে অমিয় অবাক হয়ে গেল। থালার চারপাশে কেবল বাটির সার—মাছ, মাংস, ক্ষীর, দই।

এ কি করেছেন? অমিয় হাত গুটিয়ে রইল।

পাশেই সুবীর বসেছিল। উল্টোদিকে সুবীরের বাবা।

বাবার কান বাঁচিয়ে সুবীর বলল, তোমার বিদায়-ভোজ।

অমিয় অনুচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, লাস্ট সাপার বলে মনে হচ্ছে!

অনেকক্ষণ ধরে সবাই বসে বসে খেল, কিন্তু নিভাকে একবারের জন্যও দেখা গেল না। সে যেন উবে গেছে। সুবীরের মা-বাবার সামনে অমিয় লজ্জায় নিভার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারল না।

এক বিছানায় শুয়ে দুজনে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করল। সুবীর আর অমিয়। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে দুজনের গায়ের ওপর। প্রতি দশ মিনিট অন্তর সুবীর মনে করিয়ে দিল, যে অমিয়কে খুব ভোরে যাত্রা করতে হবে, তাই তার তাড়াতাড়ি ঘুমানো দরকার। কিন্তু সুবীরই সব ভুলে অনর্গল কথা বলে গেল।

এক সময়ে অমিয়র উত্তর না পেয়ে সুবীর উঠে দেখল অমিয়র দুটি চোখ নিমীলিত, সে ঘুমে অচেতন।

সুবীরও ঘুমাবার চেষ্টা করল।

॥ ১১ ॥

খুব ভোরে উঠে অমিয় স্নান করে নিল। আশ্চর্য, ভেবেছিল এই পল্লীপ্রকৃতি ছেড়ে যেতে তার খুব কষ্ট হবে, এ কদিনের স্মৃতি তাকে পীড়িত করবে, কিন্তু শহরে ফিরে যাবার, নিজের মা-বাবার সান্নিধ্যে পৌঁছাবার ব্যাকুলতায় সে সব কিছু ভুলল। বার বার ভাবতে লাগল, এই ক্লান্তিকর গরুর গাড়ির যাত্রাটুকু যদি না থাকত! একেবারেই সে ট্রেনে উঠে পড়তে পারত। একবার ট্রেনে উঠলে, জানলার ধারে বসতে পারলে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে শেয়ালদা পৌঁছতে মোটেই দেরি হবে না।

সুবীর বারান্দায় ছিল। সে বলল, তুমি একেবারে পোশাক পরে ফেল অমি। গাড়ি এসে গেছে। আমি আর বাবা তোমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যাব। ট্রেনে তুলে দেব তোমাকে।

আমি আর বাবা! কেন নিভাও যেতে পারত। গরুর গাড়িতে একসঙ্গে রেল স্টেশন পর্যন্ত। পথে দু'একটা কথা হ'ত। নিভাকে অমিয় দেখতে পেত। কাল থেকে তার ছায়াও দেখতে পায়নি।

কিন্তু এ কথা তো সুবীরকে বলা যায় না। কাউকে বলা যায় না।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে অমিয় পোশাক পরতে আরম্ভ করল। সুটকেসটা বন্ধ করে টেবিলের ওপর রাখা।

অমি! অমি!

বাইরে থেকে সুবীরের মার গলা।

যাই মাসিমা!

প্যান্ট পরে নিয়ে অমিয় দরজা ঠেলে খুলে দিল।

এস, খেয়ে নেবে এস।

অমিয় আশ্চর্য হ'ল। সুবীরের মার কণ্ঠ বাষ্পাচ্ছন্ন। দুটি চোখ আরক্তিম।

ক'দিনের পরিচয়। কিসেরই বা সম্পর্ক। বাংলার মাটি-জলের মতনই কোমল বাঙালী মায়ের মন। অমিয় চলে যাবে, তাইতেই সুবীরের মার দুটি চোখে অশ্রু ঘনিয়ে এসেছে।

খাবার সময়ও অমিয় কোথাও নিভাকে দেখতে পেল না।

প্রণামের পালা শেষ হ'ল। সুবীরের মা আর বাবাকে।

মা অমিয়কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আবার আসবে অমি, এ আসা কিন্তু মঞ্জুর হ'ল না। ছুটি হলেই আসবে।

কোনরকমে ঘাড় নেড়ে অমিয় সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপায়ে নেমে এল।

রাস্তার ওপর গরুর গাড়ির কাছে সুবীর দাঁড়িয়ে। সুবীরের বাবা গাড়োয়ানের সঙ্গে কি কথা বলছেন। সুবীরের মা সিঁড়ির শেষধাপে এসে দাঁড়িয়েছেন আর নামেননি।

অমিয় এগিয়ে গেল। বকুল গাছের তলা দিয়ে, ছোট ছোট নুড়িবিছানো পথ বেয়ে। বিশ্রী একটা শব্দ উঠছে জুতোর চাপে। এরকম আওয়াজ না হলেই যেন ভাল হ'ত। অমিয়র ভাল লাগত, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিঃশব্দে চলে যেতে পারত।

মল্লিকা-ঝাড়ের কাছে এসেই অমিয় ধমকে দাঁড়াল।

এত দ্রুত যে ভাল করে কিছু দেখতেই পেল না। রঙীন একটা শাড়ির কিছুটা, কালো চুলের বেশি, কান্না-টলমল আয়ত দুটি চোখ।

নিভা নীচু হয়ে প্রণাম করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যাবার সময় একটা কথাও তো বলতে পারত। কথা না হয় একটু হাসি। এ কদিনের পরিচয়ের স্বীকৃতির নিশানা।

অমিয় দাঁড়িয়ে মল্লিকা-ঝাড়ের মধ্যে খুঁজতে লাগল। অন্য কোন দিক দিয়ে বের হবার পথ নেই। নিভাকে এদিক দিয়েই বের হতে হবে—অমিয়র মুখোমুখি।

অমিয় তাড়াতাড়ি কর। যেতে অনেকটা সময় লাগবে।

সুবীরের বাবার গলা।

অমিয় সচেতন হ'ল। জোরে জোরে পা ফেলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল।

গরুর গাড়ি চলতে শুরু করতে সুবীর অমিয়র হাঁটুতে মৃদু চাপ দিয়ে বাড়ির দিকে দেখাল।

অমিয় নীচু হয়ে পিছনদিকে দেখল। গাড়ি মোড় ঘুরছে। সুবীরদের বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

না, নিভা নয়। বারান্দার থামে হেলান দিয়ে সুবীরের মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একদৃষ্টে পথের দিকে চেয়ে। লালপাড় গরদের শাড়ি, কাজলকালো দুটি চোখ, চূর্ণ কুন্তল বাতাসে কাঁপছে।

একরাশ তালের গাছ এ ছবি মুছে দিল।

অমিয় সোজা হয়ে বসল।

আসবার সময় পথটা যেমন দীর্ঘ মনে হয়েছিল, যাবার সময়ে মোটেই কিন্তু ততটা দীর্ঘ মনে হ'ল না। সুবীরের সঙ্গে এলো-মেলো কয়েকটা কথা, কিছুটা সময় অর্থহীন দৃষ্টি মেলে বাইরের দৃশ্য দেখা—ব্যস, তারপরেই স্টেশন এসে গেল।

তারপরের ব্যাপার একেবারে মামুলী। ট্রেন এল। সুবীরের বাবা সাবধানে যাবার নির্দেশ দিলেন। আবার আসবার অনুরোধ।

সুবীর শুধু জানলার পাশে অমিয়র কাছে এসে দাঁড়াল। ট্রেন ছাড়ার আগে পর্যন্ত তাকে স্পর্শ করে রইল।

ট্রেন ছাড়তে সুবীর বলল, একটা চিঠি লিখো অমি। পৌঁছে চিঠি দিও।

একসময় পাগলাপোতা স্টেশন পিছনে সরে গেল। সুবীরের বাবা আর সুবীরও। সুবীর একলা থাকলে অমিয় নিজের রুমাল বের করে ওড়াত, কিন্তু সুবীরের বাবার সামনে পারল না। লজ্জা হ'ল।

সুবীরের বাবা টিকিট কিনে দিয়েছিলেন। ফার্স্ট ক্লাসের। অমিয় পয়সা দেবার কথা বলেছিল, হেসে অমিয়র পিঠ চাপড়েছেন।

পয়সা যে তিনি নেবেন না সেটা অমিয়র জানা ছিল। আসবার সময় সুবীরের টিকিটের দাম অমিয়র বাবা দিয়েছিলেন। প্রকারান্তরে সেটাই ফেরত দেওয়া হ'ল।

বাইরের দৃশ্য আর অমিয়র ভাল লাগল না। কিছু নতুনত্ব নেই। সেই সবুজের বিস্তার। মাঝে মাঝে জলের ফোঁটা। কুঁকড়েঘরের কাঠামো।

নিভার চোখে কিন্তু জল ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে হলেও সেটুকু অমিয়র নজর এড়ায়নি। অনায়াসেই নিভা একটা কথা বলতে পারত। আর হয়তো কোনদিন দেখা হবে না তার সঙ্গে। ছুটি হলেই অমির সুবীরের সঙ্গে তাদের গাঁয়ে আসবে এমন সম্ভাবনা কম।

শেয়ালদা স্টেশনে গাড়ি আসতে উঁকি দিয়ে দেখেই অমিয় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তার বাবা নিজে এসেছেন স্টেশনে।

অমিয় নেমেই বাবার পায়ের ধুলো নিল।

বাবা বললেন, তোমাকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হ'ল। বন্ধুর বাড়ি বেশিদিন থাকতে পারলে না। উপায় ছিল না, মামা এসে গেলেন।

অমিয় বলল, ভালই করেছ। আমার খুব ভাল লাগছিল না।

ভাল লাগছিল না।

না, মানে—গ্রামে তো দুদিনেই দেখা শেষ হয়ে যায়। শহরের মতন গ্রাম বদলায় না। নিত্য নতুন তার চেহারা নয়।

বাবা আর কিছু বললেন না। ভিড় কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

মোটরে বসে শহরের চৌরাস্তা পার হতে হতে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অমিয়। কি মসৃণ গতি, বসবার আয়োজন কত আরামপ্রদ! গরুর বাড়ির মত ঢিমেতাল নয়, বন্ধুর পথের জন্য প্রতি আবর্তনের সঙ্গে প্রাণান্তকর ঝাঁকানি নেই। গাছপালর চেয়ে মানুষ অনেক জীবন্ত।

তোমার দাদুর সঙ্গে কিন্তু কাল দেখা হবে।

জানলা দিয়ে চুরুটের ছাই ফেলতে ফেলতে বাবা বললেন।

কাল? কেন?

আজ ভোরে তিনি তোমার কাকার বাড়ি গেছেন। কাল ফিরবেন।

অমিয়কে নামিয়ে দিয়েই বাবা কারখানায় চলে গেলেন। বেলুড়ে।

চাকর সুটকেস নিয়ে গেল ওপরে।

অমিয় নেমেই অবাক হ'ল। মা একেবারে প্রায় পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন—যেটা এ বাড়ির রেওয়াজ নয়।

ইস্ কি রোগা হয়ে গিয়েছিস রে!

মা অমিয়কে আদর করতে করতে বললেন।

তাই বই কি! রোজ কতবার করে খেতাম—আর কত বেশি শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে!

সারাটা দুপুর মা আর ছেলে বসে বসে কথা হ'ল। সুবীরের মা যেমন অমিয়দের বাড়ি সম্বন্ধে বাড়ির লোকজন সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী, অমিয়র মার কৌতূহলও তার চেয়ে কম নয়।

সব কথা, সকলের কথা অমিয় বলল, কেবল নিভার কথা খুব সংক্ষেপে সারল। তার বয়স, রূপের কথা একেবারেই বলল না। অমিয়র মাও নিভার সম্বন্ধে বিশেষ কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন না। তাঁর প্রবল উৎসাহ শুধু সুবীরের মায়ের সম্বন্ধে।

বিকালে বাড়ির কাছাকাছি পার্ক থেকে বেড়িয়ে যখন অমিয় বাড়ি ফিরল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

বারান্দার দু'পাশে টবে দু জাতের ক্যাকটাস গাছ। তার মাঝখানে অমিয় এসে দাঁড়াল রেলিং ধরে।

বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়েই বিস্মিত হ'ল।

আশেপাশের বাড়ি থেকে উজ্জ্বল আলোর রেখা এসে পড়েছে। রেডিওর গান, লোকের কোলাহল, ফেরিওয়ালাদের সুরেলা চিৎকার—সব মিলিয়ে বিচিত্র একটা

সম্ফনী। শহরেরও রূপ আছে—মাদকতাময় আকর্ষণ। জীবনের স্পন্দন, জীবিকার চাঞ্চল্য। পার্বতী নদীর তরঙ্গভঙ্গের চেয়েও আরও হৃদয়গ্রাহী।

মুগ্ধ হয়ে অমিয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।

হুঁশ হ'ল মার ডাকে।

আজ পড়তে বসবি না অমি?

যাই মা।

অমিয় নিজের পড়ার ঘরে ঢুকল। ইতিমধ্যে মা-ই বোধ হয় সুটকেস থেকে তার বইগুলো বের করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছেন।

অমিয় পদার্থ-বিজ্ঞানের মোটা বইটা টেনে নিল।

লাইট-এর অধ্যায় থেকে নোট্স্ লিখেছিল সুবীরের বাড়িতে বসে, খুব অল্পই লিখতে পেরেছিল সে, নোট্স্টা শেষ করতে হবে।

কয়েকটা পাতা উল্টেই অমিয় চমকে উঠল।

ছোট একটা কাগজ। নীল রঙের। ভাঁজ করা।

এদিক-ওদিক চেয়ে অমিয় কাগজটা খুলল।

সুন্দর হাতের লেখা। শুধু একটি লাইন। কয়েকটা সাজানো অক্ষর।

'আমাকে ভুলে যেও না— চিত্রনিভা।'

এ চিঠি বইয়ের ফাঁকে নিভা কখন রেখে গেল? চিঠি তো নয়—নিভার হৃদয়! বইয়ের পত্রপুটে কখন নিভৃতে রেখে গেছে।

আলোর বন্যায় আপ্লুত, কোলাহলমুখরিত এ শহর থেকে অমিয়কে—অমিয়র মনকে কে যেন টেনে-হিঁচড়ে অনেক দূরের প্রকৃতি-বেষ্টিত নিরালা এক পল্লীপ্রান্তে নিয়ে গেল। আয়ত-লোচন, সুগৌরবর্ণা, কাজলকেশ এক কিশোরীর সান্নিধ্যে। যাকে কেন্দ্র করে সে উর্ণনাভের মতন দিনের চিন্তা আর রাতের স্বপ্ন রচনা করবে।

হঠাৎ সঙ্গীতের সুর কানে যেতেই অমিয় উঠে দাঁড়াল। কান পাতল জানলার কাছে, না, সে গান নয়—'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা' এই কামনা-ঘন গানের কথা নয়, অন্য কি একটা গান বাজছে পাশের বাড়ির রেডিওতে।

কিংবা কিছুই বুঝি বাজছে না। অমিয় দুটি কান ভরে এই সঙ্গীতের সুর আর কথা নিয়ে এসেছে। তারই গুঞ্জন চলেছে ইথারে ইথারে—তুমি আমারই, তুমি আমারই!

অমিয় আবার টেবিলের কাছে ফিরে এল।

কাগজের টুকরোটা স্পর্শ করে বলল।—চিত্রনিভা, আমি তোমায় কখনও ভুলব না। কোনদিন নয়।

নিরালা প্রহর



॥ এক ॥

ঘটনাটা যেমন নৃশংস তেমনি বীভৎস।

পুলিস ইন্সপেক্টর সুদর্শন মল্লিক ঘরের মধ্যে ঢুকেই যেন থমকে দাঁড়িয়েছিল।

সমস্ত ঘরের মেঝেতে চাপচাপ রক্ত। তার মধ্যে পড়ে আছে দুটি মৃতদেহ।

একটি বছর ত্রিশ-একত্রিশের তরুণীর মৃতদেহ আর অন্যটি একটি বছর চারেকের শিশুর। দুজনকেই কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে দেখলেই বোঝা যায়।

তরুণীর দেহে অনেকগুলো ক্ষতচিহ্ন—চোখে মুখে গলায় পেটে বুকে—মনে হয় বুঝি কোন উন্মাদ কোন তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে বার বার আঘাত করেছে—যার ফলে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়েছে।

শিশুটিকেও ঠিক অনুরূপভাবে হত্যা করা হয়েছে।

পাশাপাশি ঘরের মেঝেতে দুটি মৃতদেহ পড়ে আছে।

দেহটা নৃশংসভাবে ক্ষতবিক্ষত হলেও দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না তরুণী সত্যিই সুন্দরী ছিল। টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ—টানা টানা দুটি চোখ—মাথাভর্তি মেঘের মত একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে আছে।

পরনে একটা দামী ঢাকাই শাড়ি—গায়ে লাল সিল্কের ফুলহাতা ব্লাউজ। মাথায় সিঁদুর—দু-হাতে ছয় গাছা করে বারো গাছা সোনার চুড়ি—গলায় হার, কানে হীরার টাব।

তাতেই মনে হয় ব্যাপারটা কোন চোর-ডাকাতের কাজ নয়, কোন বার্গালারি নয়। তাহলে নিশ্চয়ই গহনাগুলো গায়ে তারা রেখে যেত না হত্যা করার পর!

শিশুটির খালি গা, পরনে ইজের—মাথাভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—হাতে সোনার বালা। গলায় সোনার বিছেহার।

শিশুটি মেয়ে।

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে একেবারে প্রখর দিবালোকে।

কলকাতা শহরে সি আই টি-র কল্যাণে যেসব এলাকা নতুন করে গড়ে উঠেছে—বড় বড় চওড়া পীচঢালা রাস্তা আর তারই দু'পাশে নানা ধরনের সব নতুন বাড়ি—সেই এলাকাতেই অর্ধসমাপ্ত একটা চারতলার বাড়ির ফ্ল্যাটে ঘটনাটি ঘটেছে।

একতলায় একটা ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কে ঐ সময় পুরোদস্তুর কাজকর্ম চলছিল।

বাড়িটা এখনো কমপ্লিট হয়নি। দোতলা ও তিনতলার গোটাচারেক ফ্ল্যাটে মাত্র ভাড়াটে এসেছে।

তিনতলা ও চারতলার কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, চলছে। সামনে ও পিছনে বাঁশের ভারা বাঁধা। চার-পাঁচ জন রাজমিস্ত্রী ও জনাচারেক মজুর কাজ করছিল ঐ সময়।

অথচ আশ্চর্য!

ব্যাপারটা কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পারেনি।

জানাও যেত কিনা সন্দেহ সন্ধ্যার আগে যদি না স্ত্রীলোকটির স্বামী ডালহৌসির

অফিসে বসে কাজ করতে করতে জরুরী একটা ফোন-কল পেয়ে তখুনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাসায় এসে না হাজির হত।

মণিশঙ্কর ঘোষাল, মেয়েটির স্বামী, বেলা দুটো নাগাদ একটা ফোন-কল পায়।

অফিসের পি. বি. এক্স. থেকে ফোনের কানেক্‌শানটা টেলিফোন অপারেটার তার টেবিলে দিয়েছিল।

মিঃ ঘোষাল, আপনার ফোন।

অফিসেরই ব্যাপারে হয়তো কেউ ফোন করছে ভেবে মণিশঙ্কর ঘোষাল ফোনটা তুলে নিয়েছিল।

হ্যালো—আপনি কি মণিশঙ্কর ঘোষাল? মণিশঙ্করের মনে হয়েছিল গলার স্বরটা কোন পুরুষের—মোটা, কর্কশ ও কেমন যেন সর্দিধরা গলার মত ভাঙা-ভাঙা।

হ্যাঁ, কথা বলছি। মণিশঙ্কর জবাব দেয়।

আপনি একবার এখুনি আপনার বাসায় যান।

বাসায় যাব!

কেমন যেন বিস্মিত হয়েই প্রশ্নটা করে মণিশঙ্কর।

হ্যাঁ, দেরি করবেন না—এখুনি চলে যান। সেখানে বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটেছে—

কিন্তু কেন—কী হয়েছে বাসায়?

আপনার স্ত্রী ও মেয়ে—

কি? কি হয়েছে তাদের?

উৎকণ্ঠায় যেন ভেঙে পড়ে মণিশঙ্করের গলার স্বর।

গেলেই দেখতে পাবেন—চলে যান।

কিন্তু আপনি কে? কে কথা বলছেন?

অপর প্রান্তে গলার স্বর তখন থেমে গিয়েছে—আর কিছু শোনা যায়নি।

মণিশঙ্কর কিছুক্ষণ তারপর কেমন যেন হতভম্ব হয়ে চেয়ারটার উপর বসে ছিল—ব্যাপারটা তখনো যেন ঠিক তার মাথার মধ্যে থিতোয়নি।

কে ফোন করলে তাকে—কি হয়েছে তার স্ত্রী ও কন্যার!

শেষ পর্যন্ত উঠেই পড়ে মণিশঙ্কর!

ম্যানেজারকে বলে ছুটি নিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে পড়ে।

বেলা তখন দুটো বেজে মিনিট দশেক হয়েছে।

রাস্তায় নেমে একটা খালি ট্যাক্সিও পেয়ে গেল মণিশঙ্কর—সোজা চলে যায় বেলেঘাটায়। ট্যাক্সি থেকে যখন নামল সেখানে কোনরকম কিছু অস্বাভাবিক তার নজরে পড়েনি।

ব্যাঙ্কের মধ্যে নিয়মমত কাজকর্ম চলেছে সে-সময়।

ভিতরে ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা যে যার আপন আপন কাজে ব্যস্ত।

রাস্তায়ও দু-চারজন লোক নজরে পড়ে। একটা বাস চলে গেল। গোটা দুই ট্যাক্সি চলে গেল। একটা রিকশা চলে গেল—

দুজন মিস্ত্রী ভারায় বসে কাজ করছে।

অবিশ্যি এই তল্লাটে সাধারণতই লোকজনের ভিড় বা চলাচল একটু কম সব সময়ই

এখনো তেমন কলকাতা শহরের অন্যান্য অংশের মত জনবহুল ও ঘিঞ্জি হয়ে উঠতে পারেনি বলেই হয়তো।

বাড়িতে ফোন নেই।

অবিশ্যি নীচের তলায় ব্যাঙ্কে ফোন আছে। ইচ্ছে করলে বা প্রয়োজন হলে সেখান থেকে ফোন করা যেতে পারে।

বিজিতা দু-একবার সেখান থেকে অফিসে প্রয়োজনে ফোনও করেছে মণিশঙ্করকে।

কিন্তু আজ যে তাকে অফিসে কে ফোন করল—এখনো ভেবে পাচ্ছে না মণিশঙ্কর!

নানা কথা ভাবতে ভাবতেই মণিশঙ্কর সিঁড়ি দিয়ে তার দোতলার ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিল। দরজাটা বন্ধ।

ধাক্কা দিয়ে দরজার গায়ে ভৃত্য শম্ভুকে ডাকতে যাবে কিন্তু হাতের সামান্য ঠেলাতেই দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল আপনা থেকেই।

তিনখানা ঘর—পর পর। পিছনের দিকে দুটো পর পর ল্যাভেটরি।

একটা বাথরুম—রান্নাঘর বা কিচেন, ছোট্ট মত একটা স্টোররুম।

তারই ভাড়া তিনশ টাকা।

অফিস থেকে ভাড়ার অর্ধেক টাকা দেয়, বাকিটা দিতে হয় নিজের পকেট থেকে, তাই মণিশঙ্কর ফ্ল্যাটটা নিতে সাহস করেছিল মাসচারেক আগে।

নূতন ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে মাত্র চার মাস। আগে ছিল শ্যামবাজার অঞ্চলে দেড়খানা ঘর নিয়ে একতলায়। দমবন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। মাত্র দেড়খানা ঘর, স্বামী স্ত্রী ওরা দুজন ছাড়াও একজন চাকর।

চাকর না হলে চলে না। বাজার আনাটা—টুকটাক ফাইফরমাশ কে করে। তার উপর মেয়েটাকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাওয়া।

মণির তো সময়ই নেই। সেই সকাল নটায় অফিস যায়, ফিরতে সেই কোন্ সাড়ে ছ'টা-সাতটা। বিজিতাকেও একলা থাকতে হয়!

অনেক খুঁজে পেতে বছর বারোর একটা বাচ্চা চাকর পাওয়া গিয়েছিল—শম্ভুচরণ।

তা ছেলেটা ভাল। সব সময়ই হাসিমুখ। এক পায়ে খাড়া। শম্ভুকে পেয়ে যেন ওরা বেঁচে গিয়েছিল।

বাইরের বসবার ঘরটা বেশ সাজানো। ছিমছাম। কিন্তু ঘর খালি।

শম্ভু এই শম্ভু---দরজাটা খুলে রেখেছিস কেন? বলতে বলতে দ্বিতীয় ঘরে পা দিল মণিশঙ্কর। সে ঘরেও কেউ নেই--

শেষে শোবার ঘরে পা দিতেই অকস্মাৎ একটা আতঙ্কে যেন থমকে দাঁড়িয়ে যায় মণিশঙ্কর।

নতুন মোজেকের ঘষা চকচকে ঘরের মেঝেতে চাপচাপ রক্ত।

উঃ।

মাথাটা যেন সহসা কেমন ঘুরে উঠল মণিশঙ্করের।

শঙ্কিত বিহ্বল দৃষ্টির সামনে যেন দৃশ্যটা স্পষ্ট—বিজিতা আর রুণার রক্তাক্ত দুটো দেহ—কিছুটা ব্যবধানে চাপ চাপ রক্তের মধ্যে পড়ে আছে।

বিজিতার পরিধেয় শাড়িটার আঁচল স্খলিত গা থেকে।

বুকের কাছে বীভৎস চার-পাঁচটা ক্ষত—ঝলকে ঝলকে রক্ত বোধহয় বের হয়ে

এসেছিল সেই ক্ষতমুখ দিয়ে—জামা—শাড়ি—মেঝেতে খালি রক্ত আর রক্ত।

শুধু বুকেই নয়—মুখে, গালে, গলায়, হাতে সর্বত্র ক্ষত। প্রত্যেকটি ক্ষতস্থান দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে।

হঠাৎ ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় মণিশঙ্কর—চিৎকার করবার চেষ্টা করে, কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বের হয় না।

সিঁড়ি দিয়ে নামছিল মণিশঙ্কর একপ্রকার পাগলের মতই যেন ছুটতে ছুটতে। ঐসময় দোতলার পাশের ফ্ল্যাটের অন্য ভাড়াটে ইঞ্জিনীয়ার গোপেন বসুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক গোপেনবাবু।

কি কি হয়েছে মণিবাবু—

খুন—

খুন—কে? কে খুন হলো?

আমার স্ত্রী—আমার মেয়ে—তাদের মেরে ফেলেছে গোপেনবাবু— তাদের মেরে ফেলেছে—বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে মণিশঙ্কর।

কোথায়, কোন্ ঘরে।

উপরে শোবার ঘরে।

চলুন—চলুন দেখি—

না, না—আমি যাবো না—রক্তের বন্যা বইছে—না, না—

গোপেন বসুই নীচে গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে থানায় ফোন করে দিয়েছিল, শীঘ্র আসুন স্যার—বেলেঘাটা নতুন সি. আই. টি-র ফ্ল্যাটে দুটো খুন হয়েছে।

আপনি কে? থানা-অফিসার রবীন দত্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

আমার নাম গোপেন বসু, ঐ বাড়ির উপরের ফ্ল্যাটে আমি থাকি।

রবীন দত্ত ছুটে আসে জিপ নিয়ে। দেরি করে না।

অকুস্থানে দাঁড়িয়ে যখন সরেজমিনে তদন্ত করছে ইন্সপেক্টর সুদর্শন মল্লিক লালবাজার হোমিসাইডাল স্কোয়াডের একটা পুলিস ভ্যানে চেপে হাজির হলো।

বাড়ির সামনে ও ভিতরে, সিঁড়ির নীচে পুলিস ছিল, তারা সুদর্শনকে সেলাম করল।

কোথায় খুন হয়েছে? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

দোতলার ফ্ল্যাটে স্যার—

সুদর্শন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসে। প্রথম ঘরটাতে একজন লাল-পাগড়ি ছিল—সে-ই সুদর্শনকে ইঙ্গিতে ঘরটা দেখিয়ে বলে, ভিতরের ঘরে স্যার ডেড বডি।

সুদর্শন পরের ঘরটা পার হয়ে শেষের ঘরে পা ফেলেই দরজা-পথে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সমস্ত ঘরের মেঝেতে চাপ-চাপ রক্ত। জমাট বেঁধে আছে রক্ত।

আর সেই চাপ-চাপ জমাট বাঁধা রক্তের মধ্যে পড়ে আছে দুটো মৃতদেহ।

॥ দুই ॥

একটি বছর ত্রিশ-একত্রিশের তরুণীর মৃতদেহ, অন্যটি একটি বাচ্চা মেয়ের—বছর চার বয়স হবে বড় জোর, গায়ে কোন জামা নেই, কেবল একটা ইজের পরা। তারও পেটে-বুকে নিষ্ঠুর আঘাতের চিহ্ন।

নৃশংস—বীভৎসভাবে হত্যা করা হয়েছে দুজনকেই।

কোন উন্মাদ যেন এক হত্যা-লালসায় কোন তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্রের দ্বারা ওদের বার বার আঘাত করে হত্যা করেছে।

সত্যি কথা বলতে কি সুদর্শন মল্লিকেরও ঘরের মধ্যে পা ফেলে প্রথমটায় মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে উঠেছিল।

মাত্র মাস দুই হবে সুদর্শন প্রমোশন পেয়ে লালবাজারে পোস্টিং পেয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে গত দুইমাসে আরো দুটি হত্যার ব্যাপারে তাকে দৌড়া-দৌড়ি করতে হয়েছে, কিন্তু এবারের হত্যা ব্যাপারটা যেন তার তুলনায় যেমনই নিষ্ঠুর তেমনি নৃশংস ও বীভৎস।

মুহূর্তের বিহ্বলতাটা কাটিয়ে ওঠবার পর সুদর্শন ভাল করে একবার ঘরটার মধ্যে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করল।

সুন্দর ছিমছামভাবে শয়নকক্ষটি যেন সাজানো।

জানলায় দরজায় দামী বম্বে প্রিন্টের রঙীন পর্দা। রাস্তার দিকের সব কয়টি জানলাই খোলা।

হাওয়ায় পর্দাগুলো উড়ছিল।

ঘরের একদিকে জানলা ঘেঁষে দুটি পর পর সিঙ্গল বেডে শয্যা—তার উপর দামী বেডকভার।

একধারে ছোট একটি স্টীলের প্রমাণ-আরশি-বসানো আলমারি। তারই পাশে একটি ড্রেসিং টেবিল। দেওয়াল ঘেঁষে একটি কাবার্ডের উপরে একটি খাপে-ভরা তানপুরা ও একটি বেহালার বাক্স নজরে পড়ে। টেবিলের ওপরে সুন্দরভাবে সাজানো প্রসাধনদ্রব্যগুলি। সামনে ছোট একটি বসবার টুল। তার পাশে একটি মোড়া।

অন্যদিকে ঘরের নীচু একটি টেবিলের উপরে একটি দামী রেডিও সেট—তার উপরে কাঁচের ফ্রেমে পাশাপাশি দুটি ফটো।

একটি ফটো বিজিতা ও মণিশঙ্করের—হাসিখুশি দুটি তরুণ-তরুণী—অন্য ফটোটি তাদের একমাত্র সন্তান রুণুর।

ঘরের মেঝেতে চারিদিকে রক্তের ছিটে কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে।

ইতিমধ্যে থানা-অফিসার রবীন দত্ত যতটা সংবাদ মোটামুটি সংগ্রহ করতে পেরেছিল সুদর্শনকে বললে।

সুদর্শন নিঃশব্দে সব শুনে গেল।

ফ্ল্যাটে তাহলে ঐ তরুণী, ঐ বাচ্চাটা আর চাকরটা ছাড়া কেউ ছিল না? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

না। রবীন দত্ত বলে।

চাকরটার কোন পাত্তা এখনো পাওয়া যায়নি?

না।

কতদিন কাজ করছিল এখানে চাকরটা?

মণিবাবু—মানে ভদ্রমহিলাটির স্বামী তো বলছিলেন, বছর কয়েক হবে চাকরটা ওঁদের কাছে আছে।

কত বয়স?

বছর বারো-তেরো হবে!

দরজাটা তাহলে খোলাই ছিল?

হ্যাঁ—ভেজানো ছিল—মণিবাবু হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে গেলেই খুলে যায়।

মণিশঙ্করবাবু আর কাউকেই দেখেননি?

না।

সুদর্শন আবার ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলো। দুপুরেই কোন এক সময় ঐ নিষ্ঠুর নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে অথচ কেউ জানতে পারল না!

কেউ কোনরকম আশেপাশে শব্দ, আওয়াজ বা চিৎকার শোনেনি? সুদর্শন আবার প্রশ্ন করে।

আমার মনে হয় স্যার—

রবীন দত্তর প্রশ্নে সুদর্শন ওর মুখের দিকে তাকাল, কি?

ঐ চাকর ব্যাটারই কীর্তি। খুন করে চুরিটুরি করে পালিয়েছে দলবল নিয়ে।

কিছু চুরি গেছে কিনা জানতে পেরেছেন?

না। এখনো সব অনিশ্চিত, ভাল করে সন্ধান করা হয়নি, তবে সঙ্গে যে বার্গালারি আছে নিশ্চিত।

তাই যদি হবে তো ভদ্রমহিলার হাতে সোনার চুরি—গলায় সোনার হার কানে টাব—বাচ্চাটারও গলায় হার, হাতে বালা হয়তো থাকত না। ওগুলো না নিয়েই কি তারা যেত! সুদর্শন বললে।

হয়তো কেউ এসে পড়েছিল বা তাড়াহুড়াতে সময় করে উঠতে পারেনি, সঙ্গে সঙ্গে পালিয়েছে—

আমার তা যেন ঠিক মনে হচ্ছে না মিঃ দত্ত।

কিন্তু স্যার—

যেভাবে হত্যা করা হয়েছে দুটো মানুষকে, যদি একটু চিন্তা করেন তো একটা কথা স্বভাবতই মনে হবে—

কি স্যার?

ইট ইজ এ ডেলিবারেট, প্রিমেডিটেটেড মার্ডার! সুপরিকল্পিত হত্যা। এবং হত্যার জন্যই হত্যা—হত্যাকারী চুরি করতে এখানে আসেনি! এসেছিল হত্যা করতে এবং হত্যা করে চলে গিয়েছে—হয়তো কোন প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যই হত্যা করে গিয়েছে।

প্রতিহিংসা!

সব কিছু দেখে তাই মনে হচ্ছে। হত্যার পিছনে হয়তো একটা আক্রোশ ও প্রতিহিংসার ব্যাপার জড়িয়ে আছে। তাহলেও বলবো হত্যাকারীর দুর্জয় সাহস আছে। দিনের বেলা

আশেপাশে লোকজনের মধ্যে এসে হত্যা করে গিয়েছে।

আপনি বলছেন চাকরটার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই!

তা ঠিক বলা যায় না। হয়তো থাকতেও পারে—

নিশ্চয়ই স্যার। নচেৎ পালাবে কেন?

এমনও তো হতে পারে মিঃ দত্ত, চাকরটা বাড়িতে ছিল না সে-সময়—হয়তো সে কোন কাজে ঐ সময় বাইরে গিয়েছিল অথবা ঐ মহিলাই তাকে কোন কাজে কোথাও পাঠিয়েছিলেন আর ঐ সময়ই হত্যাকারী আসে। দরজায় ধাক্কার শব্দ পেয়ে ভদ্রমহিলা গিয়ে দরজা খুলে দেন—তারপর হত্যাকারী তার কাজ শেষ করে চলে যাবার পর হয়তো চাকরটা ফিরে আসে এবং ঘরে ঢুকে ঐ দৃশ্য দেখে ভয়ে পালিয়েছে।

সে তো থানায় একটা খবরও দিতে পারত!

একটা বারো-তেরো বছরের ছেলের ঐ দৃশ্য দেখে মাথা ঠিক রাখা সাধারণত সম্ভব নয়—সে যাক—সে-সব তো তদন্তসাপেক্ষ।

সুদর্শন কথাগুলো বলে আবার ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল, পায়ে পায়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

মাথা আঁচড়াবার চিরুনিটা হাত দিয়ে তুলল সুদর্শন—কয়েক গাছি চুল চিরুনিতে তখনো আটকে আছে—

আরো একটা ব্যাপার নজরে পড়ল—ড্রেসিং টেবিলের উপরে কাচের উপরে সিঁদুর ও পাউডারের কিছু গুঁড়ো এদিক ওদিক পড়ে আছে।

সুদর্শন বললে, মনে হয় দুপুরে হয়তো প্রসাধন করেছিলেন মহিলা। প্রসাধনের পর টেবিলের কাচটা পরিষ্কার করেননি—করতে ভুলে গিয়েছেন বা করবার সময় পাননি।

তাই কি মনে হচ্ছে স্যার? রবীন দত্ত বলে।

তাছাড়া ভদ্রমহিলার পরনের দামী ঢাকাই শাড়িটা দেখে মনে হয় তো কোথাও বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন বা হয়েছিলেন, এমন সময় হত্যাকারীর আবির্ভাব ঘটেছিল।

রবীন দত্ত কোন কথা বলে না। সুদর্শন আবার বলে, দেওয়ালটা দেখুন মিঃ দত্ত—

ঘরের দেওয়ালেও কয়েকটা রক্তের ছিটে নজরে পড়ল রবীন দত্তর। রক্ত শুকিয়ে আছে।

অতঃপর সুদর্শন পাশের ঘরে এলো দুটি ঘরের মধ্যবর্তী দরজা-পথে।

এ ঘরটি মাঝারি সাইজের। এ ঘরেও একপাশে একটি শয্যা, একটি সিঙ্গল খাটে শয্যাটি নীল রংয়ের একটা বেডকভারে ঢাকা।

এক পাশে ডাইনিং টেবিল ছোট সাইজের একটি এবং খান তিনেক চেয়ার। অন্য পাশে ছোট একটি মীট-সেফ ও একটি কাঠের আলমারি।

ঐ ঘরেরই সংলগ্ন বাথরুম ও কিচেন।

ঐ ঘরেই একটা চেয়ারের ওপরে মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল মণিশঙ্কর।

রোগা পাতলা চেহারা।

পরনে দামী টেরিলিনের সুট—গলার টাইটার নট লুজ, মাথার চুল সযত্নে ব্যাকব্রাশ করা।

সুদর্শন ও রবীন দত্তর পদশব্দে মণিশঙ্কর মুখ তুলে ওদের দিকে তাকাল।

চোখ দুটো তার লাল। বোধ হয় কাঁদছিল।

মণিশঙ্কর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

সুদর্শন বাধা দেয়, বসুন বসুন মিঃ ঘোষাল।

মণিশঙ্কর আবার চেয়ারটার ওপরে বসে পড়ল।

সুদর্শনও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। জিজ্ঞাসা করল, আপনি অফিস থেকে ফোন পেয়েই তো আসেন, তাই না?

হ্যাঁ।

ফোনে পুরুষের গলা শুনেছিলেন?

হ্যাঁ—মোটা কর্কশ—সর্দিধরা গলার মতো, যেন কেমন ভাঙা-ভাঙা গলার স্বরটা ছিল।

চিনতে পারেননি কার গলা?

না।

আন্দাজও করতে পারছেন না কিছু?

না।

কখন ফোনটা পান?

ঠিক লাঞ্চের কিছু পরে—দুটো বাজতে দশ-পনের মিনিট তখনো বাকি।

তারপরই চলে এলেন আপনি?

হ্যাঁ—সোজা একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসি।

কি বলেছিল ফোনে লোকটা?

তখুনি আমাকে বাসায় আসতে বলেছিল। বাসায় নাকি একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছে তখন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি আমার এত বড় সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে—

কথাগুলো বলতে বলতে মণিশঙ্করের গলার স্বরটা যেন কান্নায় বুজে আসতে চায়

উঃ, এখনো আমি যেন ভাবতে পারছি না অফিসার—একটু থেমে আবার বলে মণিশঙ্কর।

কাউকে কি আপনার এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়?

সন্দেহ!

হ্যাঁ—আচ্ছা চাকরটা—

যদিও বয়স অল্প—তবু কি করে বলি বলুন—

তা ঠিক—যা দিনকাল পড়েছে—তা চাকরটার বাড়ির ঠিকানা-টিকানা কিছু জানেন না?

না। শুনেছি মেদিনীপুর জেলায় কোন এক গ্রামে থাকে—

গ্রামের নাম কি? শোনেননি কখনও কিছু?

পানিপারুল।

আচ্ছা আর কাউকে সন্দেহ হয়?

ভাবতে পারছি না।

আচ্ছা আলমারির চাবি, মানে স্টীলের আলমারিটার চাবি কোথায়?

আমার স্ত্রীর কাছেই থাকত তার আঁচলে বাঁধা সর্বদা।

দেখলাম না তো আঁচলে তাঁর—

তবে হয়তো ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে বা মাথার বালিশের নীচে রেখে দিয়েছে, মণিশঙ্কর বললে।

হুঁ আচ্ছা আপনার স্ত্রী কি সাধারণত বাড়িতেও দামী শাড়ি পরতেন?

অ্যাঁ—হ্যাঁ—ও একটু শৌখিন প্রকৃতির ছিল বরাবর। সর্বদা ছিমছাম সাজগোজ করে থাকতেই ভালবাসত।

কতদিন আপনাদের বিবাহ হয়েছে?

পাঁচ বছর—

নেগোসিয়েট করে বিয়ে হয়েছিল, না আপনাদের লাভ-ম্যারেজ?

আমরা পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম।

এক জাত?

না—ওর বাড়ি কেরালায়—তবে দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করায় চমৎকার বাংলা বলতে পারত।

মদ্র দেশের মেয়ে ছিলেন তাহলে উনি?

হ্যাঁ।

আত্মীয়স্বজন বলতে আপনার কে কে আছেন? তাঁরা কোথায় থাকেন—মানে মা-বাবা—ভাই—বোন—

আমি বাবার একই ছেলে—চার বোন। বোনেদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে—মা বছর কয়েক হল মারা গেছেন। বাবা এখনো বেঁচে আছেন। রিটায়ার্ড রেলওয়ে অফিসার।

কোথায় থাকেন তিনি?

আমার ছোট বোন বেনারসে থাকে—ছোট ভগ্নীপতি সেখানকার হিন্দু ইউনিভার্সিটির প্রফেসার, তার কাছেই বাবা রিটায়ার করার পর থেকে থাকেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান প্রকৃতির লোক।

আপনার বিয়েতে আপনার বাবার মত ছিল?

মত ছিল কিনা জানি না, তবে কোন বাধা দেননি।

আপনার স্ত্রী আপনার বাবার কাছে যেতেন না?

প্রত্যেক পূজোর ছুটিতেই আমরা যেতাম—বাবা ওকে খুব স্নেহ করতেন।

মিঃ ঘোষাল, একটু ইতস্তত করে সুদর্শন বলে, যদিও কথাটা অত্যন্ত ডেলিকেট তবু জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে আমাকে—

কি কথা?

বিবাহের আগে আপনাদের পরস্পরের কতদিনের আলাপ ছিল?

বছর-খানেক—

উনি তখন শান্তিনিকেতনে থাকতেন?

না—

তবে?

ও কলকাতার একটা মিউজিক কলেজে কাজ করত।

আপনাদের শোবার ঘরে তানপুরা আর বেহালা দেখলাম—

হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর তানপুরা—ও খুব ভাল গান গাইতে পারত—রেডিও-আর্টিস্ট ছিল একসময়—গানের রেকর্ডও আছে—

আই সি! তা ঐ বেহালাটা—

ওটা আমার।

আপনিও তাহলে সঙ্গীতানুরাগী?

তা ঠিক নয়—

তবে?

শিখছিলাম বেহালা।

কতদিন ধরে শিখছেন?

বছর-খানেক—

আপনাদের আলাপ কি করে হলো?

এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ওর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে আলাপ করি—আমাদের পরস্পরের এক বন্ধুই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। পরে সেই আলাপ—

বুঝেছি। আপনার সেই বন্ধুটি কোথায় থাকেন?

কলকাতাতেই—বালিগঞ্জে—

কি নাম?

সমীরণ দত্ত—নামকরা গাইয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের—

যাঁর বহু রেকর্ড আছে?

হ্যাঁ।

আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর খুব আলাপ ছিল?

হ্যাঁ—শান্তিনিকেতনে ওরা দুজনেই ছিল অনেক তখন থেকেই ওদের আলাপ।

সমীরণবাবু আপনাদের এখানে আসতেন না?

আগে মধ্যে মধ্যে আসত।

এখন আর আসেন না?

না।

কেন?

বোধ হয় সময় পান না।

আপনার স্ত্রী তাঁর ওখানে যেতেন না?

প্রায়ই যেত। বিশেষ করে রেকর্ডিংয়ের সময় রিহার্সেল যখন চলত।

তিনি বিয়ে-থা করেছেন?

না। ব্যাচিলর।

আপনি কোথায় কাজ করেন?

জন গ্রিফিথ অ্যান্ড কোম্পানিতে।

কতদিন কাজ করছেন?

বি. এ. পাস করবার বছরখানেক পরেই আমি চাকরি পাই।

মাইনে কত পান?

সব মিলিয়ে আটশর মত।

॥ তিন ॥

নীচের ব্যাঙ্কের কর্মচারীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। কিন্তু তারা সবাই বললে, কেউ কিছু জানে না—জানতেও পারেনি।

জনা ছয়েক মিস্ত্রী যারা ভারায় বসে প্লাস্টারিংয়ের কাজ করছিল তাদের মধ্যে একজন মিস্ত্রী—মকবুল বললে, বেলা তখন সওয়া বারোটা কি সাড়ে বারোটা হবে, একা সে বাড়িটার অদূরে একটা ছোট মিস্টির দোকানের সামনে গাছতলায় বসে ছিল টিফিন সেরে—একটা কালো রংয়ের অ্যামবাসাডার গাড়িকে এসে ঐ বাড়িটার সামনে দাঁড়াতে দেখে—

তারপর? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

গাড়ি থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন ভদ্রলোক নামেন—তাঁর হাতে একটা চামড়ার সুটকেস ছিল হুজুর।

তারপর? ভদ্রলোক কি করলেন?

ভদ্রলোককে দেখলাম ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকতে—

ভদ্রলোক দেখতে কেমন?

দূর থেকে দেখেছি হুজুর, ঠিক ঠাহর করতে পারিনি।

সুদর্শন প্রশ্ন করে, তারপর কি হল?

আধঘণ্টাটাক বাদে দেখলাম একজন সুট-পরা ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন বাড়ি থেকে—গাড়িতে উঠে তিনি গাড়িটা চালিয়ে চলে গেলেন।

গাড়ির নম্বরটা দেখেছিলে?

দেখিনি ভাল করে--

তাঁর হাতে কিছু ছিল?

হ্যাঁ, একটা সুটকেস।

গাড়িটা নতুন বা পুরনো?

নতুন গাড়ি বলেই মনে হল হুজুর।

আর কাউকে দেখনি?

আজ্ঞে আরো দুটো ট্যাক্সিতে লোক এসেছে—তারা ব্যাঙ্কে ঢুকেছে—তারপর ব্যাঙ্ক থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

পথে লোকজন ঐসময় ছিল না?

ছিল----তবে খুব বেশি নয়।

মকবুল!

হুজুর?

তোমরা তো অনেকদিন ধরে ঐ ফ্ল্যাটে কাজ করছ?

আজ্ঞে তা মাস তিনেক হবে—

ওই বাড়ির একটা চাকরকে দেখেছ?

হ্যাঁ বাবু—শম্ভুকেও জানি।

তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল?

হ্যাঁ—রোগা পাতলা ছেলেটা।

আজ তাকে দেখেছ?

দেখেছি।

কখন?

বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ, আমাদের টিফিনের কিছু আগে।

কোথায় দেখলে?

বাজারের দিকে যেতে দেখেছি—

হাতে কিছু ছিল?

একটা সাদা খাম ছিল বলে মনে হচ্ছে।

তাকে ফিরতে দেখনি?

না। নজরে পড়েনি।

মকবুলকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, মণিশঙ্করেরই ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরে বসে একজন সেপাই বারো-তেরো বছরের একটা ক্রন্দনরত রোগা ছেলেকে ধরে টানতে টানতে সুদর্শনের সামনে নিয়ে এল।

হুজুর, ছেলেটাকে পাকড়াও করেছি।

শম্ভু কাঁদতে কাঁদতে বললে, ওরা সব কি বলছে সেপাইরা—দোহাই হুজুর আমি কিছু জানি না।

তোর নাম শম্ভু?

আজ্ঞা শম্ভুচরণ বেরা।

বাড়ি কোথায়?

আজ্ঞা পানিপারুল—বড় পোস্টাপিস এগরা—মেদিনীপুর জিলা।

কোথায় গিয়েছিলি তুই?

আমার পিসের কাছে টালিগঞ্জে—জিজ্ঞাসা করেন না কেনে আমার বাবুকে—ঐ যে—আমি তো—পরশুই ছুটি চেয়ে রেখেছিলাম।

মণিশঙ্কর বললে, হ্যাঁ, ও আমাকে পরশু বলেছিল বটে—পিসির সঙ্গে দেখা করতে যাবে টালিগঞ্জে—

তা কখন তুই গিয়েছিলি?

কেন, এগারটায়—

তোর মাকে বলে গিয়েছিলি?

হ্যাঁ—মা তো বললেন যেতে—

সুদর্শনই আবার প্রশ্ন করে, যখন যাস দরজাটা খোলা রেখে গিয়েছিলি?

না—মা তো দরজা বন্ধ করে দিলেন, ভিতর থেকে আমার সামনেই।

তোর মা তখন কি করছিলেন?

মার তো তখনো স্নানই হয়নি।

আর খুকু?

সে তো খেলছিল ঘরে। কি হয়েছে হুজুর—সত্যিই মা আর খুকুকে মেরে ফেলেছে!

সুদর্শন শম্ভুর কথার কোন জবাব দেয় না।

সে তখন মনে মনে ভাবছিল—শম্ভু এগারটায় চলে যায়। অর্থাৎ এগারটার পর

থেকে—ফ্ল্যাটে মণিশঙ্করের স্ত্রী ও মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না—ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন মণিশঙ্করের স্ত্রী। অথচ মণিশঙ্কর ফোন পেয়ে অফিস থেকে এসে দেখে তার ফ্ল্যাটের দরজা ভেজানো এবং ঠেলতেই সেটা খুলে গেল।

সুদর্শন আবার প্রশ্ন করে, তুই যখন যাস তখন তোর হাতে একটা চিঠি ছিল?

হ্যাঁ হুজুর—

ডাকে ফেলতে যাচ্ছিলি?

না।

তবে?

শম্ভু কেমন যেন ইতস্তত করে।

কিরে, কথা বলছিস না কেন?

আজ্ঞে—

চিঠিটা কার, কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলি সেটা?

আজ্ঞে—

তোর মা দিয়েছিল চিঠিটা?

আজ্ঞে।

পোস্ট করতে?

হ্যাঁ।

সত্যি কথা বলছিস?

হ্যাঁ হুজুর।

চিঠিটা ডাকে দিয়েছিলি?

হ্যাঁ।

সুদর্শন আর কোন প্রশ্ন করে না।

রবীন দত্ত পাশের সোফায় বসে নীচু টেবিলের উপর কাগজপত্র রেখে রিপোর্ট লিখছিল। সে মুখ তুলে তাকাল, তাহলে ওর কি ব্যবস্থা করব স্যার?

কার, শম্ভুর?

আপাতত ওকে থানায় নিয়ে রাখুন। এদিককার কাজ শেষ হয়েছে মিঃ দত্ত?

একরকম মোটামুটি—ডেড বডি দুটো মর্গে পাঠিয়ে দিতে পারলেই—, কিন্তু এ ফ্ল্যাটের কি ব্যবস্থা করব?

এটা আপাতত আনডার লক অ্যান্ড কী থাকবে, আর পাহারা রাখুন।

বেশ। তাহলে মিঃ ঘোষাল—দত্ত মণিশঙ্করের দিকে তাকাল।

সে অন্য একটা সোফায় বসে ওদের কথা শুনছিল। রবীন দত্তর প্রশ্নে ওর মুখের দিকে তাকাল।

আপনি তাহলে এক কাজ করুন—

কি বলুন?

এই ফ্ল্যাটটা আপনার আপাতত আন্ডার লক অ্যান্ড কী ও পুলিস প্রহরায় থাকবে—আপনি আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে—

সে আপনার বলবার কোন প্রয়োজন ছিল না—এরপর এখানে আমি রাত্রিবাস করতে পারব আপনি ভাবতেই বা পারলেন কি করে? আমি এখুনি শম্ভুকে নিয়ে চলে যাব।

সুদর্শন বললে, ওর জন্য আপনার ভাবতে হবে না মিঃ ঘোষাল—ও থানায় থাকবে।

ওকে কি তাহলে আপনারা অ্যারেস্ট করছেন?

না।

তবে থানায় নিয়ে যাচ্ছেন?

ওকে আমাদের প্রয়োজন আছে।

ওঃ, তাহলে তো আপনাদের আশ্রয়েই থাকল!

হ্যাঁ—কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

আজ রাত্রের গাড়িতেই মালদায় চলে যাব।

মালদায়?

হ্যাঁ, আমার এক বন্ধু সেখানে থাকে—ভাবছি ছুটি নিয়ে তার ওখানেই কিছুদিন থাকব।

কিন্তু আপনাকে যে আমাদের প্রয়োজন হবে—

মালদার ঠিকানা রেখে যাচ্ছি, যখনই তার করে দেবেন আমি চলে আসব।

না।

তবে?

আপনি বরং আপাতত কিছুদিন কলকাতাতেই থাকবার ব্যবস্থা করুন।

কলকাতায়?

হ্যাঁ।

বেশ—তাহলে আমি ভবানীপুরেই, আমার একটা পরিচিত মেস আছে—কালিকা বোর্ডিং—সেখানেই থাকব।

কোথায় বোর্ডিংটা? সুদর্শন শুধায়।

৩৩/১২ কালীঘাট রোড। আমি তাহলে উঠি—কিছু জিনিসপত্র নিতে হবে—

যান।

মণিশঙ্কর উঠে পাশের ঘরে গেল। ইতিমধ্যে সুদর্শনেরই নির্দেশে দুটো বেডকভার দিয়ে ডেড বডি দুটো ঢেকে দেওয়া হয়েছিল।

সুদর্শনের চোখের ইঙ্গিত পেয়ে রবীন দত্ত মণিশঙ্করের পিছনে পিছনে যায়, নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করে।

মণিশঙ্কর পকেট থেকে একটা চাবির রিং বের করে স্টীলের আলমারিটা খুলে কিছু জামা-কাপড় বের করে আলমারির মাথায় যে অ্যাটাচি কেসটা ছিল তার মধ্যে ভরে নিল। ও যখন ব্যস্ত তখন হঠাৎ পেছন থেকে সুদর্শনের গলা শোনা গেল।

ও যে ইতিমধ্যেই রবীন দত্তের পাশে এসে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিল— মণিশঙ্কর জানতেও পারেনি—

মণিশঙ্করবাবু?

অ্যাঁ—

ফিরে তাকাল মণিশঙ্কর ওদের দিকে। ওরা দুজনে এসে ততক্ষণ ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। চাবিটা বুঝি আপনার প্যান্টের পকেটেই ছিল।

হ্যাঁ—মানে ওটা—আলমারির একটা ডুপ্লিকেট চাবি আমার কাছে থাকত।

ডুপ্লিকেট কেন?

বিজির বড্ড ভুলো মন ছিল—কোথায় কি রাখত সব সময় মনে করতে পারত না, তাই তারই ব্যবস্থামত একটা চাবি আমার কাছে বরাবব থাকত।

ওতে বাইরের দরজার চাবিও আছে বোধ হয়?

হ্যাঁ—দরজায় গডরেজের লকের চাবি, একটা আমার কাছে থাকত একটা বিজির কাছে থাকত।

দেখলেন?

কি!

আলমারির ভিতর থেকে কিছু চুরি গেছে কিনা?

না—এখনো দেখিনি, দেখছি—

মণিশঙ্কর কথাটা বলে আলমারির ভিতরে সব কিছু নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। সুদর্শন আর রবীন দত্ত দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলো।

মিনিট দশ-পনের পরে মণিশঙ্কর ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝতে পারছি না মিঃ দত্ত—কিছু চুরি গিয়েছে কিনা। মানে আমি তো ঠিক জানতাম না কোথায় কি আছে—সব কিছুই তো আমার স্ত্রীই রাখত—

সুদর্শন বললে, গহনাপত্র—টাকাকড়ি—সব ঠিক আছে—

গহনাপত্র যা ওর গায়ে দেখছেন, এছাড়া তো আর বিশেষ কিছু ছিল না। আর টাকা-পয়সা তো ব্যাঙ্কেই রাখা হয়।

ও। তাহলে—

তাই তো বলছিলাম, ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে কিছুই হয়তো চুরি যায়নি।

দেখুন তো—বালিশের তলায় বা ড্রয়ারে অন্য চাবিটা আছে কিনা! সুদর্শন আবার বললে।

মণিশঙ্কর অতঃপর সুদর্শনের কথামত ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারগুলো ও শয্যার কাছে গিয়ে বালিশের তলা হাতড়ে দেখলো কিন্তু কোথাও কোন দ্বিতীয় চাবির রিং পাওয়া গেল না।

কি হল—পাওয়া গেল না? দত্ত জিজ্ঞাসা করল।

না। দেখছি না তো—

গেল কোথায় তবে চাবির রিংটা যেটা আপনার স্ত্রীর কাছে থাকত?

বুঝতে পারছি না। হয়তো—

কি?

যারা এসেছিল চুরি করতে তারাই নিয়ে গিয়েছে—তাড়াতাড়িতে কিছু নিতে পারেনি—

তাই হয়তো হবে—সুদর্শন মৃদু গলায় বললে।

একসময় সুদর্শন বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হল।

সুটকেসটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগুতে যাবে, তখন সুদর্শন বললে, চলুন মিঃ ঘোষাল, আমিই আমার জীপে আপনাকে পৌঁছে দেব।

আপনি দেবেন?

হ্যাঁ চলুন—তাহলে রবীন আমরা চলি—তুমি এদিককার ব্যবস্থা করে তারপর যেও—

তাই যাব স্যার--

সুদর্শন নিজের জীপে মণিশঙ্করকে কালীঘাট রোডে কালিকা বোর্ডিং হাউসে পৌঁছে দিয়ে লালবাজারে ফিরে এল।

লালবাজারে পৌঁছে দুজন প্লেন-ড্রেস সি. আই. ডি-র কর্মচারী সলিল ও সন্তোষকে ডেকে কিছু উপদেশ দিয়ে রবীনকে থানায় ফোন করল।

রবীন তখনো ফেরেনি জানতে পারল।

সেকেন্ড অফিসার ফোন ধরেছিল, সে শুধাল, মিঃ দত্ত এলে আপনাকে কি ফোন করতে বলব স্যার?

হ্যাঁ, বলবেন।

ঠিক আছে স্যার—

সুদর্শন ফোনটা রেখে দিল।

ইতিমধ্যে বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। পথে পথে আলো জ্বলে উঠছে।

একটা সিগারেট প্যাকেট থেকে বের করে সেটায় অগ্নিসংযোগ করে সুদর্শন।

সমীরণ দত্ত।

নামকরা রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পী। মণিশঙ্কর ও বিজিতার সঙ্গে বহুদিনকার আলাপ সমীরণ দত্তর।

থাকে বালিগঞ্জে, মণিশঙ্কর বলছিল।

একটিবার সমীরণ দত্তর সঙ্গে দেখা করে কথা বলা দরকার। কিন্তু তার ঠিকানা জানে না সুদর্শন।

কোথায় পাওয়া যেতে পারে সমীরণ দত্তর ঠিকানাটা?

হঠাৎ মনে পড়লো সমীরণ দত্ত একজন রেকর্ড ও রেডিওর নামকরা আর্টিস্ট—রেডিও অফিস থেকেই তো তাঁর ঠিকানাটা পাওয়া যেতে পারে।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুদর্শন লালবাজার থেকে রেডিও অফিসে নিজের পরিচয় দিয়ে ফোন করল।

স্টেশন-ডাইরেক্টর আছেন?

না—অ্যাসিস্টেন্ট স্টেশন-ডাইরেক্টর বোধ হয় আছেন।

তাঁকেই দিন ফোনটা।

সমীরণ দত্তর ঠিকানাটা পাওয়া গেল।

মনোহরপুকুর রোডে থাকে সমীরণ—তিনতলা একটা ফ্ল্যাট বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটে। ফোনও সেখানে আছে, কিন্তু অনেকক্ষণ ফোনে রিং হল, কেউ ধরলে না।

হতাশ হয়েই একসময় সুদর্শন ফোনটা রেখে দিল।

॥ চার ॥

আপাতত একবার বাসায় যেতে হবে—সেই সকাল সাড়ে সাতটায় বের হয়েছে, এখন রাত প্রায় পৌনে আটটা—একবার না ঘুরে আসলে সাবিত্রীর সঙ্গে অলিখিত চুক্তিটা ভঙ্গ হবে।

বিয়ের কিছুদিন পরেই সাবিত্রীর সঙ্গে সুদর্শনের অলিখিত চুক্তি হয়েছিল সকালে

কাজে বেরুলে যেমন করেই হোক সময় করে সুদর্শন একবার মাঝখানে দেখা দিয়ে আসতেই হবে সন্ধ্যার আগে যদি ফেরা না সম্ভব হয়।*

একবার সমীরণ দত্তর ওখানে যেতে হবে, কিন্তু তার আগে একবার যেতে হবে বাসায়। বাসা অবিশ্যি বেশী দূর নয়—শিয়ালদার কাছে—হ্যারিসন রোডের কাছাকাছি।

সুদর্শন বের হয়ে পড়ল।

জীপচালক সেপাই শুধায়, কোন্ দিকে যাব স্যার?

মোহন, একবার বাসায় চল তো—সেখান থেকে বালিগঞ্জ যাব।

বাসাটা একেবারে ঠিক বড় রাস্তার উপরে নয়, গলির ভিতর ঢুকতে হয়। তবে দক্ষিণ আরা পুব দিকটা খোলা।

বাড়িটা নতুন।

দোতলার উপরে তিনখানা ঘর। হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিল বাসাটা সুদর্শন। বিয়ের পরে একটা ফ্ল্যাট খুঁজছে কলকাতা শহরে সর্বত্র যখন, তখনই এক অফিসার বন্ধু বাসাটার কথা সুদর্শনকে বলে। সেই অফিসারেরই মামাশ্বশুরের বাড়ি।

সুদর্শন একটু অন্যমনস্কই ছিল নচেৎ জীপ থেকে শেষ গলিতে ঢুকবার মুখে কিরীটীর নতুন কালো রংয়ের ফিয়াটটা নজরে পড়ত।

বড় গাড়ি বিক্রী করে দিয়ে কিরীটী কিছুদিন হল ফিয়াট কিনেছে। অসুবিধা হয়েছে ড্রাইভার হীরা সিংয়ের।

লম্বা মানুষ—চালাতে কষ্ট হয়।

তবে হীরা সিং মুখে কিছু বলেনি।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই নজরে পড়ল ঘরের দরজা খোলা। ঝুলন্ত পর্দার ওদিক থেকে আলোর আভাস আসছে—তারপরই একটা পরিচিত গলার স্বর কানে ভেসে আসতেই সুদর্শন হঠাৎ যেন খুশি হয়ে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে পর্দা তুলে ঘরে পা দেয়।

দাদা! কতক্ষণ?

সুদর্শনের দিকে ফিরে কিরীটী বলে, তা ভায়া ঘণ্টাদেড়েক তো হবেই। ভাবছিলাম এবারে উঠব—তোমার সঙ্গে বুঝি দেখাই হল না।

সাবিত্রী উঠে পড়েছে ততক্ষণে। স্বামী সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে সাবিত্রী বললে, চা খেয়েছ? নিশ্চয়ই চা খাওয়া হয়নি—

সুদর্শন হেসে বলে, না--সময়ই পাইনি---

জানতাম আমি। দাদা, আপনিও খাবেন তো?

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, তোমার দাদার চায়ে যে অরুচি নেই তা তো তুমি জান সাবিত্রী!

সাবিত্রী ভিতরের ঘরে চলে গেল।

সত্যি মেয়েটি বড় ভাল---তাই না সুদর্শন? কিরীটী মৃদু হেসে বলে।

সুদর্শন বললে, সত্যিই জহুরী আপনি দাদা—

স্বীকার করছ? কিরীটী হাসতে হাসতে বললে।

* সুদর্শনের প্রথম কাহিনী পাওয়া যাবে 'প্রজাপতি রঙ' বইতে---লেখক।

একবার কেন, হাজারবার স্বীকার করব।

আমার সঙ্গে গল্প করছিল বটে, সাবিত্রীর কিন্তু মনটা পড়ে ছিল সর্বক্ষণ দরজার দিকে—মাঝখানে একবার ঘুরে গেলেই তো পার!

আসি দাদা—নেহাত কাজে আটকে না পড়লে। আজ এক জোড়া খুনের ব্যাপারে এমন জড়িয়ে পড়লাম যে—

আরে ভায়া তোমার চাকরিই তো খুনজখম রাহাজানি নিয়ে—

তা জানি দাদা। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা এমন নৃশংস, এমনি বীভৎস যে—মনটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

তাই নাকি! তা জোড়া খুন হল কোথায়?

খুন হয়েছে বেলেঘাটা অঞ্চলে দিনের বেলা—একেবারে ভরদুপুরে। ত্রিশ-একত্রিশ বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে আর তার ফুলের মত বছর চারেকের বাচ্চাটা—মানুষ যে এত নিষ্ঠুর কি করে হয়—

ভালবাসার উল্টোদিকেই তো নিষ্ঠুরতা—মানবচরিত্রের আলো অন্ধকার দুটি দিক।

জানি দাদা তবু এক-এক সময় মনে হয় এটা কেমন করে সম্ভব হয় মানুষের পক্ষে!

আসল ব্যাপারটা কি জান ভায়া, প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই পশুবৃত্তি থাকে। ভালবাসা, স্নেহ, মমতা—সেই পশুবৃত্তিটাকে একটা পোশাক পরিয়ে চাপা দিয়ে রাখে। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব হয় না—আর যখন সম্ভব হয় না তখনই তার শিক্ষা কৃষ্টি রুচি সরে গিয়ে তার মুখোশটা হঠাৎ খুলে যায়—ভিতরের পশুটা বের হয়ে আসে নখদন্ত বিস্তার করে কুটিল হিংস্র হয়ে। আমরা চমকে উঠি তখন। কিন্তু সেটা মনুষ্য-চরিত্রের আলোর, অন্য দিক যে স্বাভাবিক অন্ধকার—সেটা ভুলে যাই।

সাবিত্রী ঐ সময় দু'কাপ চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে সুদর্শন বলে, আপনাকে বলতে ইচ্ছা করছে ঘটনাটা দাদা। কিন্তু সাবিত্রী ঐ সব সহ্য করতে পারে না।

কিরীটী হেসে বলে, তা না সহ্য করতে পারলে হবে কেন? পুলিস অফিসারের বৌ হয়েছে যখন—সত্যি সাবিত্রী—এ কিন্তু অন্যায় তোমার—

বাঃ, আমি কখনও কিছু বলেছি নাকি? সাবিত্রী বললে।

না। মুখে বলোনি বটে কিন্তু তোমার মুখের চেহারা যা হয়—আমার মায়া লাগে। —সুদর্শন বললে।

না, না—সুদর্শন। তুমি বলবে সাবিত্রীকে সব কথা। হয়ত দেখবে ওর অনেক পরামর্শ তোমার অনেক কাজে লাগবে—জান না তো মেয়েদের একটা বিচিত্র তৃতীয় নয়ন আছে। তুমি বল, আমরা শুনি আজকের ঘটনা।

শুনবেন?

নিশ্চয়ই, বল।

সুদর্শন সাবিত্রীর মুখের দিকে তাকাল। সাবিত্রী বললে, কি হয়েছে?

কিরীটী বলে, কোথায় নাকি জোড়া খুন হয়েছে—

জোড়া খুন!

হ্যাঁ।

সুদর্শন তখন সংক্ষেপে ঐদিনকার ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত করে যায়। কিরীটী

একটা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে নিঃশব্দে বসে শোনে ধূমপান করতে করতে।

সাবিত্রী বলে, কি নিষ্ঠুর।

কিন্তু সাবিত্রী, কিরীটী বলে, তোমার কি মনে হয় বল তো? মা ও মেয়েকে কে খুন করল—আর কেনই বা খুন হল? মানে খুনের সম্ভাব্য কারণ কি হতে পারে?

জানি না দাদা—

ব্যাপারটা বোধ হয় খুব একটা জটিল নয়—কিন্তু এবারে উঠব ভায়া। কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

এখুনি যাবেন দাদা?

হ্যাঁ—রাত প্রায় পৌনে ন'টা হল।

চলুন আমাকেও একবার ওদিকে যেতে হবে। সুদর্শনও উঠে দাঁড়ায়।

কোথাও যাবে?

ভাবছি একবার মনোহরপুকুর রোডে যাব।

সমীরণ দত্তর ওখানে?

হ্যাঁ—সাবিত্রী, দরজাটা বন্ধ করে দাও। দুখনকে দেখছি না—কোথায় গেল?

দুখন তো বিকেলে বের হয়েছে তার এক দেশওয়ালী ভাইয়ের সঙ্গে—এখনো ফেরেনি। তুমি যাও না—সরলা তো আছে—

সাবিত্রীর কথা শেষ হল না, দুখন এসে ঠিক ঐ সময় ঘরে ঢুকল।

কিরে, এত দেরি হল তোর? সাবিত্রী শুধায়।

বছর কুড়ি বয়স হবে দুখনের। বেশ তাগড়াই চেহারা। পুলিসের চাকরির লোভে কলকাতায় তার কনস্টেবল কাকার কাছে এসেছিল, কিন্তু এখনো কোন সুবিধা না হওয়ায় তাব কাকা রামনারায়ণের সুপারিশে সুদর্শন তাকে তার গৃহে স্থান দিয়েছে।

বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, ছোট কাজ ইত্যাদি কিছু করে না—তবে বাজার-হাট করা, অন্য ফাইফরমাশ সব করে। খুব বিশ্বাসী।

দুখন বললে, কি করি, দেরি হয়ে গেল ঝগড়া করতে করতে।

সে কি রে? ঝগড়া আবার কার সঙ্গে করছিলি? সুদর্শন জিজ্ঞাসা করে।

আমার ভাইয়ের সঙ্গে, দেশ থেকে সে এসেছে।

কেন?

দেখুন না—নোকরি-উকরি নেই, বলে কিনা সাদী কর—আমি তা রাজী নই, ওরা রাজী করাবেই আমাকে।

তা শেষ পর্যন্ত কি ঠিক হল?

কি আবার—আগে নোকরী তারপর সাদী।

সকলেই হাসতে থাকে।

রাস্তায় বের হয়ে সুদর্শন কিরীটীর গাড়িতেই উঠে বসল—এবং নিজের জীপটা তার পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

একটা কথা বলব দাদা। একসময় সুদর্শন বলে।

কি?

আপনি তখন ওই কথাটা বললেন কেন?

কোন্ কথাটা ভায়া?

ব্যাপারটা বোধহয় খুব জটিল নয়!

তোমার কাহিনী শুনে তো তাই মনে হচ্ছে। কিরীটী বললে।

আপনি কি সমীরণ দত্তকেই তাহলে সন্দেহ করেন?

প্রেমের গতি বড় বিচিত্র, ভায়া।

কিন্তু—

বিশেষ করে যে প্রেম সর্বগ্রাসী। সামান্য একটু এদিক-ওদিক হলেও হিংসা তার কুটিল নখর বিস্তার করে।

কিন্তু দাদা—

তাছাড়া ঠিক—অন্তত মণিশঙ্কর ঘোষালের কথা যদি মিথ্যা না হয়—সমীরণ দত্তর ভালবাসা না হলেও বিজিতার ওপরে একটা দুর্বলতা ছিল।

তা তো বোঝাই যায়। সুদর্শন বললে।

অবিশ্যি তোমাকে জানতে হবে কথাটা কতখানি সত্য এবং যদি সত্যিই হয়ে থাকে তবে সেই দুর্বলতাটা কোন পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছিল। তবে এও ঠিক জেনো ভায়া—

কি?

সমীরণ হয়ত অত সহজে মুখ খুলবে না।

কেন?

প্রথমত আর্টিস্টরা একটু টাচি হয়—দ্বিতীয়ত দুর্বলতা বা ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও যে তার প্রেমাস্পদকে অন্যের হাতে তুলে দিতে পারে তাদের পেট থেকে কথা বের করা খুব সহজ হবে না।

আর মণিশঙ্কর?

সন্দেহের তালিকা থেকে সেও বাদ পড়ে না।

কিন্তু ঐভাবে নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে হত্যা করাটা—

যদি সে হত্যা করেই থাকে তাহলে যখন সে হত্যা করেছিল জানবে সে তখন স্বামী বা বাপ ছিল না। একটু আগে যে বলছিলাম মানুষের উদ্দাম মনের তলে চিরন্তন পশুবৃত্তির কথাটা—তখন জেনো সেই পশুটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে তো আরো পরের কথা। তারও আগে তোমায় জানতে হবে—

কি?

কালো অ্যামব্যাসাডারে করে বেলা বারোটা সোয়া বারোটায় কে এসেছিল ঐ ফ্ল্যাট বাড়িটায়। তাছাড়া মকবুল মিস্ত্রীর কথাগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই ঠিক তেমন একটা সামঞ্জস্য নেই!

সামঞ্জস্য নেই?

হ্যাঁ। সে কি বলেনি কালো অ্যামব্যাসাডার থেকে নামতে দেখেছে—হাতে সুটকেস—একজন ধুতি পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোককে যিনি গাড়িটা ঐখানে রেখে ঐ ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢোকেন—তার কিছুক্ষণ বাদে সুট-পরিহিত এক ভদ্রলোক ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে গাড়িটা চালিয়ে চলে গেল।

সত্যিই তো। তখন তো আমার কথাটা ঠিক মনে হয়নি।

পোশাকের বিভিন্নতা বাদ দিলে কালো রংয়ের অ্যামব্যাসাডার গাড়ি—একজন

ভদ্রলোক ও একটা সুটকেস ঠিকই আছে। এর থেকে একটা কথাও কি তোমার মনে হয়নি?

কি?

যে ব্যক্তি অ্যামব্যাসাডারে করে এসে ঐ ফ্ল্যাট বাড়িটায় ঢুকেছিল এবং যে ব্যক্তি ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে একটু পরে বের হয়ে এসে অ্যামব্যাসাডারটা চালিয়ে চলে গিয়েছে তারা একই ব্যক্তি, না দুজন! তাছাড়া মিস্ত্রীর কথাটাও কতখানি সত্য তারও যাচাই হওয়া দরকার, ঐ ব্যক্তির আইডেনটিটি ও গাড়িটার—

হ্যাঁ—খোঁজ নিচ্ছি আমি।

আরো আছে।

কি?

ঐ ইঞ্জিনীয়ার গোপেন বসু ভদ্রলোকটি—যিনি থানায় ফোন করেছিলেন—যিনি ঐ বাড়িরই আর একটা ফ্ল্যাটে থাকেন—তাঁকে তো তোমরা কোন জিজ্ঞাসাবাদই করনি!

ভুল হয়ে গিয়েছে দাদা।

খুনের ব্যাপারে এত বড় ভুল মারাত্মক ভায়া। তোমার জানা উচিত ছিল। বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা উনি কোথায় ছিলেন—কি করছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে তিনি নামছিলেন না উঠছিলেন, যখন মণিশঙ্কর ঘোষালের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সিঁড়িতে—

আমি কালই সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

হ্যাঁ, ভুলো না। আর একটা কথা—

বলুন?

মকবুল বলেছে সে বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ শম্ভুকে দেখেছে বাজারের দিকে যেতে এবং তার হাতে ঐ সময় একটা সাদা খাম ছিল।

হ্যাঁ, বলেছিল।

তাকে সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলে ঠিকই, কিন্তু—

কি?

শম্ভু যে সব সত্যি কথাই বলেছে তারই বা ঠিক কি!

তা অবিশ্যি ঠিক, তবে—শম্ভু তো এখন লক-আপেই আছে!...

বুদ্ধিমানের কাজই করেছ। তাকে লকআপেই রেখো। আরও আছে—

বলুন?

যে অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করা হয়েছে সেটাও তোমরা ভাল করে খুঁজে দেখনি! হয়ত ওই ফ্ল্যাটের মধ্যেই কোথাও সেটা এখনও থাকতে পারে—

কাল সকালেই আর একবার ওখানে যাব।

ভাল কথা, বিজিতার আত্মীয়স্বজন কেউ আছে কিনা বাংলাদেশে সংবাদটা জানবার চেষ্টা করনি?

না—

সেটাও অবিশ্যি প্রয়োজন।

করব।

কিরীটী মনোহরপুকুর রোডেই সুদর্শনকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সুদর্শন বাড়ির নম্বরটা খুঁজে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে তিনতলার একটা ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু দরজা বন্ধ। দরজায় তালা দেওয়া।

সুদর্শন কি করবে ভাবছে এমন সময় একজন তরুণ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এল। সুদর্শনকে দেখে জিজ্ঞাসা করে, কাকে চান?

সমীরণবাবুর কাছে এসেছিলাম—কিন্তু দেখছি দরজায় তালা দেওয়া—

উনি তো আজ বিকেলের প্লেনে ম্যাড্রাস গেলেন—

ম্যাড্রাস?

হ্যাঁ—কি গানের রেকর্ডিংয়ের ব্যাপারে—

কখন গিয়েছেন?

তা ঠিক জানি না। আমি যখন বের হই, সোয়া তিনটে, তখনো তাঁকে দেখেছি। কখন গিয়েছেন তা ঠিক বলতে পারব না।

আপনার সঙ্গে সমীরণবাবুর পরিচয় আছে?

হ্যাঁ—আমি তো এই পাশের ফ্ল্যাটেই থাকি। তাছাড়া ওঁর কাছে আমি রবীন্দ্র-সংগীতের লেশেন নিই—

ও, তাহলে তো আপনি তাঁর বিশেষ পরিচিতই—

আপনাকে তো চিনতে পারছি না, কখনো ওঁর কাছে আসতে তো দেখিনি।

না। আমি, মানে, কলকাতার বাইরে থাকি কিনা—

তাই—তো কি ব্যাপার বলুন তো? কোন কনফারেন্স নাকি?

সুদর্শন হাসে। বলে, না, অন্য একটু কাজ ছিল। তা উনি কবে আসবেন তা জানেন কিছু?

দিন পাঁচ-সাত দেরি হতে পারে।

আপনার নামটা কি জিজ্ঞেস করতে পারি?

দেবজ্যোতি আচার্য—তা সমীরণদা আসলে কি বলব? আপনার নাম, কোথা থেকে—, কিন্তু দেবজ্যোতির কথা শেষ হল না, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে দুজনেই নীচের দিকে ঘুরে তাকায়।

কে যেন উঠে আসছে—ক্লান্ত শিথিল পদবিক্ষেপে।

আরে ওই তো সমীরণদা—এ কি সমীরণদা, আপনি ম্যাড্রাস যাননি?

সুদর্শন তাকিয়েছিল আগন্তুকের মুখের দিকে। সিঁড়ির আলোটা শক্তিশালী না হলেও স্পষ্টই, সব কিছু দেখা যায়।

বছর তেত্রিশ-চৌত্রিশ হবে সমীরণ দত্তর বয়স।

রোগা, লম্বা এবং যাকে বলে রীতিমত সুশ্রী চেহারা সমীরণ দত্তের। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি—মাথার চুল তৈলহীন রুক্ষ এবং কিছুটা এলোমেলো। তীক্ষ্ণ নাসা—সুন্দর দুটি চক্ষু। চোখে চশমা।

তার হাতে কালো রংয়ের একটা সুটকেস, মাঝারি সাইজের। দেবজ্যোতির পাশে সম্পূর্ণ অপরিচিত সুদর্শনকে দেখে সমীরণ দত্ত হঠাৎ যেন থমকে সিঁড়ির মাঝপথেই একটা ধাপের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

দেবজ্যোতি বললে, আমি তো ভেবেছিলাম এতক্ষণে আপনি ম্যাড্রাস পৌঁছে গিয়েছেন প্লেনে। এই যে এই ভদ্রলোক, আপনাকে খুঁজছিলেন।

পাশেই দণ্ডায়মান সুদর্শনকে দেখিয়ে দিল দেবজ্যোতি।

সমীরণের দিক থেকে কিন্তু কোন সাড়া এল না, সে যেন কেমন বোবার মতই দাঁড়িয়ে আছে তখনো।

॥ পাঁচ ॥

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত।

সমীরণ তাকিয়ে আছে সুদর্শনের মুখের দিকে। আর সুদর্শন তাকিয়ে আছে সমীরণের মুখের দিকে। দুজনে যেন দুজনের সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে পরস্পরকে যাচাই করছে।

দেবজ্যোতি কিন্তু দাঁড়িয়ে ছিল না। তার কথাটা শেষ করেই সে তাদের ফ্ল্যাটে ঢুকে গিয়েছিল।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সুদর্শন আর ধাপ-পাঁচেক নীচে সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে তখনো সমীরণ দত্ত।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করল সুদর্শনই। মৃদু হেসে বললে, আসুন সমীরণবাবু—আপনার কাছেই আমি এসেছিলাম—আমার নাম সুদর্শন মল্লিক। এসে শুনি আপনি ম্যাড্রাস চলে গিয়েছেন—

ম্যাড্রাস?

হ্যাঁ—দেবজ্যোতিবাবু বললেন—

সমীরণ দত্ত উঠতে শুরু করেছে তখন সিঁড়ি দিয়ে আবার। সিঁড়িগুলি অতিক্রম করে উপরে এসে মুখোমুখি হয়ে বলে, দেবজ্যোতি ভুল করেছে—

ভুল?

হ্যাঁ—আমার বোম্বাই যাওয়ার কথা ছিল ম্যাড্রাস নয়—

তা গেলেন না?

সুটকেসটা একপাশে নামিয়ে রেখে পকেট থেকে চাবি বের করে দরজার তালাটা খুলতে খুলতে সমীরণ বললে, না—প্লেনটা মিস করলাম—আসুন—

সমীরণের আহ্বানে সুদর্শন ঘরের মধ্যে পা দিল।

ঘরটা অন্ধকার ছিল, সমীরণ সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বেলে দেয়।

ঘরটা আকারে বেশ বড়ই। মেঝেতে যদিও কার্পেট পাতা কিন্তু কার্পেটটায় যে অনেকদিন ঝাঁটা পড়েনি সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। একদিকে একটা হারমোনিয়াম, তার পাশে বাঁয়া তবলা—একরাশ স্বরলিপির বই—গানের বই—খাতা-পেন্সিল, পানের ডিবে, পিকদানি অ্যাশট্রে—রেকর্ড—সব ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে।

ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে কয়েকটি সোফা। তার পাশে একটা ভাসে কিছু শুকনো গোলাপ। দেওয়ালে বড় বড় সব গাইয়েদের ফটো। মধ্যিখানে রবীন্দ্রনাথের ছবি।

সব কিছুই মধ্যেই যেন একটা অযত্ন—এলোমেলো বিশৃঙ্খলতা।

সমীরণ দত্ত সুদর্শনকে বললে—বসুন।

কথাটা বলে মধ্যবর্তী একটা দরজা ঠেলে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং একটু পরে সুটকেসটা সেই ঘরে রেখে বের হয়ে এল আবার।

আপনি বললেন আপনার নাম সুদর্শন মল্লিক—আপনাকে তো আমি চিনতে পারলাম না! আমার কাছে কি কিছু প্রয়োজন ছিল?

হ্যাঁ—বসুন না।

সমীরণ কিন্তু বসল না। সুদর্শনের মনে হচ্ছিল সমীরণ দত্ত যেন তাকে দেখা অবধি একটু বিব্রতই বোধ করছে। কেমন যেন একটু অস্থির—চঞ্চল।

বসুন সমীরণবাবু—

সমীরণ বসল পাশের সোফায়।

সমীরণবাবু—আপনাকে আমার আসল পরিচয়টা ও আসার উদ্দেশ্যটা খুলে বলছি—

সমীরণ চেয়ে আছে সুদর্শনের দিকে!

আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আসছি—

কেন?

আপনাকে আমার কিছু প্রশ্ন করার আছে।

প্রশ্ন!

হ্যাঁ—আপনি বিজিতা ঘোষালকে চিনতেন?

হঠাৎ যেন নামটা শুনে সুদর্শনের মনে হল সমীরণ কেমন একটু চমকে উঠল।

আপনি তাঁকে চিনতেন, মানে অনেকদিন, তাঁর বিবাহের আগে থেকেই, তাই না?

হ্যাঁ।

আপনি বোধ হয় একটা সংবাদ এখনো পাননি!

কি সংবাদ? সমীরণ যেন অতি কষ্টে কথাটা উচ্চারণ করল।

আজ দুপুরে তাঁকে এবং তাঁর কন্যা রুণুকে সি. আই. টি'র ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

সে কি? কে বললে?

মৃত বললেই সবটুকু বলা হবে না। দে হ্যাভ বীন্ ব্রুটালি মার্ডারড্—নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁদের—

নৃশংসভাবে হত্যা!

হাঁ—আর সেই ব্যাপারেই কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি আপনার কাছে।

আমি—

আপনি তো ওদের দুজনেরই বন্ধু ছিলেন। ওদের দুজনকেই ভাল করে জানবার ও চিনবার সুযোগ হয়েছিল আপনার। তাই—

অতঃপর সুদর্শন সমস্ত দুর্ঘটনাটা আনুপূর্বিক বলে গেল।

সমীরণ স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ যেন বসে থাকে।

মণিশঙ্কর কোথায় এখন? কেমন যেন মিনমিনে গলায় প্রশ্ন করলে সমীরণ একটু পরে।

কাছেই আছেন তিনি—কালিকা বোর্ডিংয়ে।

আপনি বলছেন যখন ব্যাপারটা ঘটে তখন সে অফিসে ছিল?

হ্যাঁ—ফোনে সংবাদ পেয়ে এসে দেখতে পায়—

সে কিছুই জানে না?

না। অন্তত তাই তো তিনি বললেন।

কিছু অনুমানও করতে পারেনি?

না।

ও!

ওকথা বলছেন কেন সমীরণবাবু? আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?

আমি!

হ্যাঁ।

আমি কাকে সন্দেহ করব? তাছাড়া ইদানীং মাসকয়েক তাদের সঙ্গে আমার একদম দেখাসাক্ষাৎও হয়নি।

কাজে ব্যস্ত থাকার দরুনই বোধ হয়?

সমীরণ হাসল মৃদু। বললে, না—

তবে?

মণি পছন্দ করত না।

কি পছন্দ করত না—আপনাদের মেলামেশা?

হ্যাঁ—বিজিতার উপর সেজন্য সে টরচারও করত।

কি ধরনের টরচার?

ঠিক আমি জানি না—তবে বিজিতার মুখ দেখে তাই মনে হয়েছিল।

তিনি কিছু বলেন নি?

না। বিজিতার মত মেয়ে হয় না। এত ভদ্র—এত নম্র—এত শান্ত—অথচ কেন যে মণি একটা কথা বুঝতে পারত না—

কোন্ কথা?

বিজিতার সমস্ত মন ভরে ছিল মণিশঙ্করই—

মণিশঙ্করের অত্যন্ত সন্দেহবাতিক মন ছিল তাহলে বলুন!

সমীরণ কোন জবাব দেয় না।

আর একটা কথা সমীরণবাবু—

সমীরণ সুদর্শনের মুখের দিকে তাকাল।

আপনি যে সুটকেসটা এইমাত্র সঙ্গে নিয়ে এলেন সেটা একবার আনবেন?

সুটকেসটা!

হ্যাঁ।

কেন?

আনুন না—দরকার আছে—

কিন্তু—

নিয়ে আসুন সুটকেসটা।

সমীরণ উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে সুটকেসটা নিয়ে এল। সুটকেসটা খুলতে গিয়ে সুদর্শন দেখল—গা-তালা বন্ধ সুটকেসের।

সুটকেসের চাবিটা কোথায়? সমীরণের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে সুদর্শন।

চাবি!

হ্যাঁ। চাবিটা দিন।

চাবি—মানে চাবিটা তো আমার কাছে নেই।

এই সুটকেসের চাবিটা আপনার কাছে নেই?

সমীরণের মুখটা যেন কেমন শুকিয়ে গিয়েছে—কেমন রক্তহীন ফ্যাকাশে।

এই সুটকেসটা আপনারই তো?

হ্যাঁ, মানে,—সমীরণ কেমন যেন তোতলাতে থাকে। তার কথা ভাল করে মুখ দিয়ে বের হয় না।

আপনার নয় সুটকেসটা?

আপনি—আপনি বিশ্বাস করুন অফিসার—ওই সুটকেসটা সত্যিই আমার নয়।

আপনার নয়!

না। আগে কোন দিন সুটকেসটা আমি দেখিওনি।

তবে আপনার কাছে কি করে এল এটা?

জানি না।

জানেন না!

না। জানি কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যি বলছি—সুটকেসটা জীবনে কখনো আমি আগে দেখিনি। আজ বেলা দশটা নাগাদ আমি বের হয়েছিলাম—আমার রিহার্শেল ছিল—বেলা দুটো নাগাদ ফিরে আসি কারণ বিকেলের প্লেনে আমার বোম্বাই যাবার কথা—

বলুন, থামলেন কেন? তারপর?

কপালে সমীরণের বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। ঠোঁট দুটো কেমন যেন কাঁপছে। সমীরণ একটা ঢোক গিলে বলতে থাকে আবার, ঘরে ঢুকে দেখি মানে আমার শোবার ঘরে, বিছানার উপরে ঐ সুটকেসটা পড়ে আছে। একটু অবাক হই। কোথা থেকে এল সুটকেসটা? কে রেখে গেল—সুটকেসটা তো আমার নয়? সুটকেসটা খোলবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু দেখি তালা লাগানো।

তারপর?

আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করতে লাগল।

কেন?

সুটকেসের ভিতরে কি আছে তখনো জানি না, তবু কেন যেন আমার বুকের মধ্যে সিরসির করতে লাগল—সেই সময় ঘরের মধ্যে হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল—তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোনটা ধরলাম, হ্যালো—

কে সমীরণবাবু?

হ্যাঁ—আপনি কে?

আমি যেই হই না কেন আপনার তাতে প্রয়োজন নেই—একটা কথা বলবার জন্য ফোন করছি। আপনার শোবার ঘরে একটা সুটকেস আছে—যদি বাঁচতে চান তো যত তাড়াতাড়ি পারেন সুটকেসটার একটা ব্যবস্থা করবেন—

ওই কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই কানেকশানটা কেটে গেল। আমি যে তখন কি করব বুঝতে পারছি না। অবশেষে ঠিক করলাম সুটকেসটা বাইরে কোথাও গিয়ে ফেলে দিয়ে আসব—

সন্ধ্যার অন্ধকারে বের হলাম সুটকেসটা হাতে নিয়ে, কিন্তু কোন ট্যাক্সিতে চাপতে সাহস হল না—হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম।

তারপর?

ঘণ্টা তিনেক ধরে এ-রাস্তা সে-রাস্তা—লেক অঞ্চল রেল স্টেশন ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম

সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে। চারিদিকে কেবল মানুষ আর মানুষ। কোথায় সুটকেসটা ফেলব—কারো নজরে পড়ে যাব—এই ভয়ে রাত্রিতে আবার বেরুব ঠিক করে ফিরে এলাম। আমি জানি, আপনি নিশ্চয় আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু যা বললাম এক বর্ণও তার মিথ্যে নয়। সুটকেসটা আমার নয়, জানিও না কার। জানি না কি ওর ভেতরে আছে, কোথা থেকে এল, কেমন করেই বা এল—বলতে বলতে সমীরণের গলার স্বরটা যেন বুজে এল।

আপনি যখন বাড়ি থেকে দশটা নাগাদ বের হয়েছিলেন, তখন দরজায় তালা দিয়ে যাননি? সুদর্শন জিজ্ঞাসা করে।

গিয়েছিলাম।

ফিরে এসে দরজায় তালা দেওয়াই আছে দেখেছিলেন?

হ্যাঁ।

গডরেজের লক?

না। সাধারণ একটা দেশী গা-তালা। তাহলেও তালাটা ভাল জাতের।

তবে? যদি কেউ এসেই থাকে তবে সে খুলল কি করে?

জানি না।

আপনার কোন চাকর-বাকর দেখছি না—নেই নাকি?

চাকরটা মাসখানেক হল ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে। একা ঠিকা-ঝি সব করে দিয়ে যায়।

রান্নাবান্না?

যাহোক কিছু ফুটিয়ে নিই—একা মানুষ—

বিয়ে-থা করেননি?

না।

মা-বাপ, ভাই-বোন নেই?

সবাই আছে।

কোথায় থাকে তাঁরা?

এই কলকাতাতেই।

তবে?

কেউ আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি।

কেন?

ভালভাবে ইকনমিক্স-এ এম. এ. পাস করেও কোন চাকরি-বাকরি করলাম না—গান বাজনা নিয়েই আছি—বাবার সঙ্গে তাই মতবিরোধ হতে লাগল সর্বক্ষণ, বাড়ি ছেড়ে তাই চলে এলাম।

কবে?

তা বছর পাঁচেক হবে।

বছর পাঁচেক এই বাসাতেই আছেন?

হ্যাঁ।

কিছু মনে করবেন না, আপনার ইনকাম কি রকম?

যা পাই—আমার তাতে ভাল ভাবেই চলে যায়। উদ্বৃত্ত ও থাকে না—অভাবও নেই।

॥ ছয় ॥

ছুরি আছে?

ছুরি!

হ্যাঁ।

আছে—তবে কি হবে ছুরি দিয়ে?

নিয়ে আসুন একটা ছুরি।

সমীরণ একটা ছুরি নিয়ে এল—তারই সাহায্যে তালা ভেঙে সুটকেসটা খুলে ফেলল সুদর্শন।

আর খুলতেই যেন ও চমকে ওঠে।

রক্তমাখা কাপড়!

টেনে বের করল সুদর্শন। রক্ত মাখা ধুতি-পাঞ্জাবি-গেঞ্জি—আর কাপড়ের মধ্যে জড়ানো ছিল একটা ধারালো বড় ছোরা।

ছোরাটার গায়েও রক্তের দাগ শুকিয়ে আছে।

সমীরণ যেন বোবা হয়ে গিয়েছে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে রক্তমাখা জামাকাপড়ের দিকে।

সুদর্শনের মুখ দিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত কোন কথা বের হয় না।

এই ধুতি আর পাঞ্জাবি—চিনতে পারছেন?

কেমন যেন অসহায় বোবাদৃষ্টিতে তাকায় সমীরণ সুদর্শনের মুখের দিকে। কোন কথাই বের হয় না তার মুখ দিয়ে।

চিনতে পারছেন না?

না তো—

আপনার ধুতি-পাঞ্জাবি কোথায় থাকে?

ওই যে আলমারির মধ্যে—হাত তুলে ঘরের মধ্যে একটা আলমারি দেখিয়ে দিল সমীরণ।

আলমারিতে চাবি দেওয়া থাকে না?

না।

সুদর্শন উঠে গিয়ে আলমারির বন্ধ দরজা দুটো টানতেই খুলে গেল। একটা তাকে কিছু ধুতি-পাঞ্জাবি দলামোচা করে রাখা—অন্য তাকে কিছু ভাঁজ করা জামাকাপড়। হ্যাঙারে একটা কোট—একটা শাল। আলমারি থেকে একটা ভাঁজকরা ধুতি নিয়ে ফিরে এল সুদর্শন—সেটা রক্তমাখা— ধুতি-পাঞ্জাবি-গেঞ্জি সুটকেসের মধ্যে ভরল। সন্তর্পণে ছোরাটাও একটা রুমালে ভাঁজ করে সুটকেসের মধ্যে ভরে ডালাটা বন্ধ করল।

সমীরণবাবু?

অ্যাঁ?

আমার সঙ্গে যে একবার আপনাকে যেতে হবে।

কেন?

চলুন, প্রয়োজন আছে—

আমাকে কি আপনি অ্যারেস্ট করছেন?

আই অ্যাম সরি সমীরণবাবু—ঠিক অ্যারেস্ট নয়, তবে আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কিন্তু কেন, আমাকে আপনি অ্যারেস্ট করছেন কেন?

না, না—সমীরণবাবু, অ্যারেস্ট আপনাকে আমি ঠিক করছি না—বললাম তো! আপাতত লালবাজারে আপনাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি—চলুন আর দেরি করবেন না।

আপনিও কি সন্দেহ করছেন আমিই বিজিতা আর তার মেয়েকে হত্যা করেছি?

চলুন আপনি আমার সঙ্গে।

কিন্তু কেন? কেন আমি আপনার সঙ্গে যাব? ঐ সুটকেসের ব্যাপারটা কিছুই আমি জানি না বিন্দুবিসর্গ। কোথা থেকে এল, কেমন করে এল—

তবু সুটকেস আপনার কাছেই পাওয়া গিয়েছে। আপনি তাকে চিনতেন, দীর্ঘদিন ধরে পরিচয় ছিল আপনাদের পরস্পরের, আপনি তাকে ভালবাসতেন—

ভাল যদি বিজিতাকে আমি বেসেই থাকি কোন দিন সেটা নিশ্চয়ই একটা অপরাধ নয়?

দেখুন সমীরণবাবু, তর্ক করতে আমি চাই না। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন কিনা সেটা কেবল আমি জানতে চাই—

যদি না যাই?

তবে বাধ্য হয়েই আপনাকে আমায় অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে হবে।

বেশ চলুন।

সুদর্শন সমীরণকে সঙ্গে করে লালবাজারে নিয়ে এল। এবং তাকে লক-আপে রেখে দেবার ব্যবস্থা করল।

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। প্রায় এগারোটা।

বাসায় ফিরবার আগে সুদর্শন কিরীটীকে ফোন করল।

কে? কিরীটীর গলা ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল।

দাদা আমি সুদর্শন।

কি ব্যাপার, এত রাত্রে?

সেই সুটকেসটা পাওয়া গিয়েছে দাদা।

পেয়েছ?

হ্যাঁ। তার মধ্যে রক্তমাখা ধুতি, পাঞ্জাবি, গেঞ্জি আর একটা ছোরাও পাওয়া গিয়েছে।

কোথায় পেলে?

সমীরণ দত্তর কাছে।

সমীরণকে অ্যারেস্ট করেছ?

নিশ্চয়ই।

কি বললে সে?

সংক্ষেপে সুদর্শন ঘটনাটা বলে গেল কিরীটীকে ফোনে। সব শুনে কিরীটী বলল, একটা কথা সুদর্শন—

বলুন দাদা?

মণিশঙ্করের ফ্ল্যাটে পুলিস-প্রহরা রেখেছ তো?

রেখেছি।

কাল একবার ভোরেই গোপেনবাবুর ওখানে যেও—

যাব। কিন্তু গোপেনবাবুর এভিডেন্সটা কি খুব প্রয়োজনীয় দাদা?

নিঃসন্দেহে। হয়তো তিনি তোমার বর্তমান হত্যা-রহস্যের ব্যাপারে আলোক সম্পাত করতে পারেন।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে দাদা—সমীরণ দত্তকে যখন হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি, হত্যা-রহস্যের কিনারা আমরা সহজেই করতে পারব।

তা হয়তো পারবে, কিন্তু তবু গোপেনবাবু কিছু জানেন কিনা জানা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু আর রাত করো না, এবার বাড়ি যাও—সাবিত্রী হয়ত তোমার জন্য বসে আছে। গুডনাইট।

কিরীটী অন্য প্রান্তে ফোনটা রেখে দিল।

সত্যিই সাবিত্রী জেগে বসেছিল সুদর্শনের জন্য।

রাত তখন প্রায় পৌনে বারোটা।

কলিংবেল টিপতে সাবিত্রীই এসে দরজা খুলে দিল, এত রাত হল যে!

খেয়েছো?

না।

কেন খেয়ে নিলে না! কতদিন বলেছি রাত হলে আমার জন্যে বসে থেকো না।

সাবিত্রী মৃদু হাসে।

হাসলে যে? সুদর্শন জিজ্ঞাসা করে।

হাত-মুখ ধুয়ে নাও—এত রাত্রে নিশ্চয়ই স্নান করবে না!

স্নান না করলে আমার ঘুমই হবে না—চট্‌পট সেরে নিচ্ছি আমি। জান সাবি—

কি?

কেসটার আরো ডেভালাপমেন্ট হয়েছে। খেতে খেতে তোমাকে সব বলব—তুমি খাবার রেডি কর—আমি আসছি!

খাবারের টেবিলে বসে খেতে খেতে সুদর্শন সব বলে গেল।

কি তোমার মনে হয় সাবি?

কিসের কি?

ঐ সমীরণ দত্তই নিশ্চয় খুন করেছে?

আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

কেন?

কি জানি! আমার মন যেন বলছে সমীরণ দত্ত বিজিতাকে খুন করেনি।

কিন্তু কেন, কেন তোমার ওকথা মনে হচ্ছে—

জানি না, তবে মনে হচ্ছে—

তুমি একেবারে ছেলেমানুষ।

সাবিত্রী সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, জান, ছোড়দা এসেছিল আজ!

অমলেন্দুবাবু?

হ্যাঁ।

তোমার মা-বাবা কেমন আছেন?

বাবার শরীরটা খুব খারাপ।

যাও না ওখানে গিয়ে কিছুদিন থেকে এস।

না।

না কেন?

আমার লজ্জা করে।

লজ্জা কিসের তোমার—যা ঘটেছিল তার জন্য তো তুমি দায়ী নও—হলই বা মাধবী তোমার বোন।

সে আমার বোন বলেই তো যেতে পারি না।

তবে না হয় তোমার মা বাবাকে এখানে এসে কিছুদিন রাখ।

বাবা আসবেন না।

কেন?

সে তুমি বুঝবে না।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, সুদর্শন টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল।

সাবিত্রী যখন শুতে এল সুদর্শন নাক ডাকাচ্ছে। গভীরভাবে নিদ্রিত।

কয়েকটা মুহূর্ত সাবিত্রী গভীর মমতায় ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ফ্যানের হাওয়ায় সুদর্শনের চুলগুলো উড়ে উড়ে তার চোখে-মুখে এসে পড়ছে।

মনে মনে স্বামীকে প্রণতি জানায় সাবিত্রী। তুমি আমাকে যে কি লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছ তুমি জান না। আশীর্বাদ কর আমাকে, যেন তোমার ভালবাসার যোগ্য হতে পারি আমি।

খুব ভোরেই উঠে হাত-মুখ ধুয়ে, শেভ করে, চা পান করেই সুদর্শন লালবাজার চলে গিয়েছিল।

অফিস-ঘরে ঢুকতেই একজন সার্জেন্ট এসে স্যালুট করে দাঁড়াল!

কি খবর বিশ্বনাথ?

একটু আগে এখানে একটা ফোন এসেছিল।

ফোন? কার?

আপনার কাছেই এসেছিল ফোন-কলটা। তবে কে যে ফোন করেছিল জানি না। তবে কালকের সেই সি. আই. টি'র ফ্ল্যাট বাড়িতে আর একটা খুন হয়েছে।

খুন! সে কি?

হ্যাঁ স্যার—বিকাশবাবু ফোন পেয়েই স্পটে চলে গিয়েছেন।

কিন্তু কে—কে খুন হয়েছে?

তা জানি না, স্যার।

সুদর্শন আর দেরি করে না। তখুনি বের হয়ে পড়ে।

অকুস্থলে পৌঁছে দেখল নীচে ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনে পুলিসের একটা কালো ভ্যান দাঁড়িয়ে—চার-পাঁচজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে।

সুদর্শন তাদেরই একজনকে প্রশ্ন করে, বিকাশবাবু কোথায়?

উপরে স্যার। দোতলায় উঠতেই সিঁড়ির মাথায় একজন সার্জেন্টের সঙ্গে দেখা হল। সুদর্শন তাকেই জিজ্ঞাসা করে, কোথায় খুন হয়েছে?

তিনতলার ফ্ল্যাটে, স্যার।

তরতর করে সুদর্শন তিনতলায় উঠে যায়।

দুটো ফ্ল্যাট সিঁড়ির ল্যানডিংয়ের দুই দিকে।

একটার দরজায় তালা দেওয়া।

অন্য দরজাটা খোলা—তার সামনে একজন সেপাই দাঁড়িয়ে। দরজার গায়ে ইংরেজীতে নেমপ্লেটে লেখা—শ্রীগোপেন বসু, বি. ই.।

ঘরে পা দিতেই চোখে পড়ল সুদর্শনের বীভৎস দৃশ্যটা।

বছর পঞ্চাশ-বাহান্ন হবে একটি ভদ্রলোক—মাথার চুল অনেকটা সাদা হয়ে গিয়েছে—সামনের দিকে টাক—পরনে স্লিপিং সুট, খালি পা—উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে দেহটা—কিছু দূরে একটা চশমা পড়ে আছে ও-দুপাটি চপ্পল।

মেঝেতে চাপ-চাপ রক্ত।

বিকাশ মধ্যবয়সী ভৃত্যশ্রেণীর লোকটিকে নানা প্রশ্ন করছিল, আর লোকটা কাঁদছিল

সুদর্শনকে ঢুকতে দেখেই বিকাশ তাকে একটা স্যালুট করে, এই যে স্যার, এসে গেছেন। কাল রাত্রে কোন এক সময় ব্যাপার ঘটেছে মনে হচ্ছে।

গোপেন বসু?

হ্যাঁ স্যার—

ঐ লোকটা কে?

গোপেনবাবুর চাকর দাশু!

আর কেউ নেই বাড়িতে?

না, গোপেনবাবুর স্ত্রী দিনসাতেক হল মুর্শিদাবাদে তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে।

বাড়িতে তাহলে আর কেউ ছিল না?

না স্যার, ঐ দাশু আর গোপেনবাবু।

॥ সাত ॥

সুদর্শন মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল।

নীচু হয়ে বসে মৃতদেহের সামনেটা উল্টে দিল সুদর্শন। বুকে ও পেটের ক্ষতস্থান দুটো চোখে পড়ল। পেটের খানিকটা ইনটেসটিন বের হয়ে এসেছে—দু'হাতের পাতায় রক্ত শুকিয়ে আছে। বুকের ক্ষতটাও প্রায় ইঞ্চি-দুই চওড়া।

চোখে-মুখে অসহ্য একটা বিস্ময় ও যন্ত্রণার চিহ্ন তখনো যেন স্পষ্ট।

সুদর্শনের বুঝতে কষ্ট হয় না প্রথমে হয়তো পেটে কোন তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা হয়েছিল, তারপর বক্ষস্থলে দ্বিতীয় আঘাত করা হয়েছে।

মোক্ষম দুটি আঘাত।

হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে।

ভদ্রলোক চেঁচাবার বা লোক ডাকবারও সময় পাননি।

ঘরের ঠিক দরজার সামনেই অনেকটা রক্ত কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে। হয়তো ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছিলেন বা ঘুমোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, ঐ সময় আততায়ী এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। ভদ্রলোক দরজার গায়ে ধাক্কা শুনে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই আততায়ী সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অতর্কিতে প্রথমে তাঁর পেটে আঘাত করে, তারপর বুকে

দেহে রাইগার মরটিস সেট-ইন করেছে।

ঘণ্টা ছয়-সাত আগেই হয়তো মৃত্যু হয়েছে।

নিষ্ঠুর নৃশংস বীভৎস হত্যা।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা ব্যবধানে পর পর তিনটি বীভৎস হত্যা একই বাড়ির উপরের ও ীচের ফ্ল্যাটে। হত্যা-পদ্ধতিও এক। কোন ধারালো তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে।

হঠাৎ মনে পড়ে সুদর্শনের পূর্বে যে অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছে সেটা পাওয়া গয়েছে। কিন্তু এবারে যে অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছে সেটি কোথায়?

সুদর্শন আবার উঠে দাঁড়াল।

ঠিক দোতলার ফ্ল্যাটের মতই উপরের তলার ঐ ফ্ল্যাটটিতেও ব্যবস্থা—তবে চারটি র এবং দুটি বেডরুম।

প্রত্যেক ঘরেই দামী দামী আসবাব।

একটি শোবার ঘরে পাশাপাশি দুটি শয্যা—একটি রাত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে য় না। সেই ঘরে একটি গডরেজের আলমারি—তার পাশে একটি দামী ড্রেসিং টেবিল। সই ঘরটি একেবারে কোণের ঘর—তার আগের ঘরে একটি সিঙ্গল বেডে শয্যা।

সে শয্যাটি দেখলেই বোঝা যায় রাত্রে শয্যাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ ঘরটি বসবার রের ঠিক পরের ঘর।

শেষোক্ত ঘরের মধ্যে একটি বুক-সেল্‌ফ—পাশে ইংরাজী ও বাংলা বই সাজানো।

সেলফের উপরে একটি ফটো। ফ্রেমে একটি ফ্যামিলি-ফটো। দেখলেই বোঝা যায় গাপেন বসুর ফ্যামিলির ফটো।

গোপেনবাবু, তাঁর পাশে মোটাসোটা মধ্যবয়সী একটি ভদ্রমহিলা, পনের-ষোল বছরের কটি মেয়ে, আঠার-উনিশ বছরের একটি যুবক ও দশ থেকে বারো বছরের মধ্যে দুটি র্ক পরা মেয়ে।

ব্যবহৃত শয্যার পাশে ছোট একটি ত্রিপায়ের উপর একটি টেবিল-ক্লক। এক প্যাকেট সিগারেট—একটা ম্যাচ ও ছাইভর্তি একটি কাচের অ্যাশট্রে ও একটা টেবিল ল্যাম্প।

ল্যাম্পটা তখনো জ্বলছিল।

বোতাম টিপে টেবিল-ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল সুদর্শন।

ঘরে দক্ষিণ কোণে একটি মাঝারি সাইজের রাইটিং-টেবিল।

কিছু ফাইলপত্র—একটা ঝর্ণা কলম। আর একটা চাবির রিং। রিংয়ের মধ্যে একগোছা াবি। টেবিলটার পাশেই একটা স্টীলের আলমারি।

রাইটিং-টেবিলের ড্রয়ারগুলো ও আলমারিটা সেই রিংয়ের চাবির সাহায্যে একে একে ুলে দেখল সুদর্শন।

একটা ড্রয়ারের মধ্যে একটা কালো মোটামত ডাইরি পাওয়া গেল। ডাইরির পাতায় ব হিসাবপত্র।

সংসার ও অন্যান্য জমাখরচের হিসাব। কিছু ঠিকানাও লেখা আছে।

সেই ঠিকানার মধ্যেই গোপেন বসুর শ্বশুরমশাইয়ের মুর্শিদাবাদের ঠিকানা পাওয়া গেল।

একটা চামড়ার পার্সও পাওয়া গেল—

একগোছা নোট পার্সটার মধ্যে। গুনে দেখল সুদর্শন প্রায় ন'শ টাকা। একশ ও দশ াকার নোট।

ড্রয়ার বন্ধ করে আলমারিটা দেখতে লাগল চাবি দিয়ে খুলে সুদর্শন।

হ্যাঙারে কিছু সুট, গোটাকতক টাই, রুমাল ও ভাঁজকরা ধুতি ও স্লিপিং-সুট। আলমারির ড্রয়ারে কিছু প্ল্যানের ব্লু-প্রিন্টও পাওয়া গেল।

আলমারিটা দেখা হয়ে গেলে সেটায় চাবি দিয়ে দিল সুদর্শন।

পাশের ঘরে গিয়ে গডরেজের আলমারিটা খুলবার চেষ্টা করল—কিন্তু খুলতে পারল না। চাবির রিংয়ের মধ্যে ঐ আলমারির চাবি নেই।

আবার বসবার ঘরে ফিরে এল সুদর্শন।

বিকাশ তখন একজন ভদ্রলোককে নানা প্রশ্ন করছিলেন।

ভদ্রলোকটির বেশ পেশীবহুল চেহারা। গায়ের রঙ কালো হলেও সুশ্রী, চোখ-মুখের গড়ন ও দু'চোখের দৃষ্টিতে বেশ একটা বুদ্ধিদীপ্তি আছে।

পরনে দামী সুট। হাতে জ্বলন্ত একটা সিগারেট ধরা।

অল্প দূরে ম্লান বিষণ্নমুখে দাশু দাঁড়িয়ে।

ইনি কে বিকাশ?

মিঃ স্বামীনাথন।

ইনি—

ঐ যে পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন।

তাই নাকি! তা একটু আগে দেখেছিলাম দরজায় তালা দেওয়া? সুদর্শন বললে।

স্বামীনাথনই জবাব দিল, হ্যাঁ, আমি এইমাত্র ফিরছি। কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম, এসে ট্যাক্সি থেকে নামতেই দেখি পুলিস। ব্যাপারটা কি তাদের জিজ্ঞাসা করতেই তো জানতে পারলাম।

কথায় কেমন যেন একটা অবাঙালী টান—এবং কথা বললে ইংরাজীতেই।

কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

কলকাতার বাইরে—বলে স্বামীনাথন।

কোথায়?

দেশে গিয়েছিলাম।

দেশে!

হ্যাঁ, ত্রিচিনাপল্লীতে।

আপনি—

আমি একজন সাউথ-ইন্ডিয়ান।

এখানে কি করেন?

এখানে একটা ইলেকট্রিকাল গুড্‌স্ ফ্যাকট্রিতে চাকরি নিয়ে এসেছি—সুপারভাইজিং অফিসারের পোস্টে।

কি নাম কোম্পানির?

মরিসন অ্যান্ড আটারা।

কতদিন এখানে আছেন?

কলকাতায়?

হ্যাঁ।

মাস-দুই হবে।

এই ফ্ল্যাটে কতদিন আছেন?

জাস্ট এ ফিউ ডেজ বলতে পারেন—দিন-দশেকও হবে না।

আপনার ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই?

না, এখনো আমার ফ্যামিলি এসে পৌঁছয়নি—সামনের মাসে আসার কথা তাদের।

তাহলে এখানে আপনি নিউ কামার?

কতকটা তাই বলতে পারেন।

গোপেন বসুকে আপনি চিনতেন?

হ্যাঁ, পরিচয় হয়েছিল সামান্য—কয়েকদিনের পরিচয়—হি ওয়াজ এ নাইস ম্যান, আই অ্যাম রাদার শকড টু হিয়ার দ্য নিউজ। হাউ স্যাড!

মণিশঙ্করবাবুকে চিনতেন?

হ্যাঁ, পরিচয় হয়েছিল ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে—

ওঁর স্ত্রী তো আপনাদেরই দেশের মেয়ে!

হ্যাঁ।

তাঁকে চিনতেন?

আগে চিনতাম না—পরে চেনা হয়েছিল।

ওঁদের সংবাদ কিছু জানেন?

না তো। কিন্তু কেন? তাঁরা তো নীচের ফ্ল্যাটেই থাকেন।

গতকাল দুপুরে মণিশঙ্করবাবুর স্ত্রী ও মেয়েটি নিহত হয়েছে।

হোয়াট? কি বললেন?

হ্যাঁ, ব্রুটালি মার্ডারড।

বাট হাউ?

সুদর্শন হেসে বলে ঃ সেটা অবিশ্যি জানতে পারিনি এখনো।

এনিবডি অ্যারেস্টেড?

না।

কেউ অ্যারেস্ট হননি?

না।

খুনীকে তাহলে ধরতে পারলেন না?

পারিনি এখনো, তবে ধরা সে পড়বেই।

উঃ, হাউ ফ্যানটাসটিক! একই বাড়িতে একই দিনে তিন-তিনটে মার্ডার! হাউ হরিব্‌ল! তা মিঃ বোসের ফ্যামিলিকে সংবাদটা দিয়েছেন?

দেওয়া হবে বৈকি।

কুড আই ইনফর্ম দেম?

না, পুলিসই দেবে ইনফরমেশান।

এত বড় সাংঘাতিক ব্যাপার—এরপর এখানে থাকতে আমি আর এক ঘণ্টাও সাহস পাচ্ছি না—আই মাস্ট ইনফর্ম দি ল্যান্ডলর্ড, আজই আমি বাড়ি ছেড়ে দেব—এক্সকিউজ মি—মাথাটার মধ্যে আমার যেন কেমন ফীল করছি—কথাগুলো বলে স্বামীনাথন আর দাঁড়াল না, স্খলিত পদবিক্ষেপে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুদর্শন ফিরে তাকাল দাশুর দিকে।

দাশু না তোর নাম?

আজ্ঞে দাশরথী তা।

বাড়ি কোথায়?

তমলুক।

বাবুর কাছে কতদিন কাজ করছিস?

আজ্ঞে হুজুর পনের বছর তো হবেই।

তুই কোন্ ঘরে রাত্রে ছিলি?

রান্নাঘরের পাশে ছোট ভাঁড়ার ঘরটা, তারই সামনে বারান্দায় ঘুমিয়ে ছিলাম। দোহাই হুজুরের, মা-বাপ—আমি কিছু জানি না, আমার দেবতার মত মুনিব—হায় হায়, এ কি হল ঈশ্বর—

বাড়িতে তোর কে কে আছে?

ছেলে মেয়ে পরিবার—সবাই আছে হুজুর।

কাল কত রাত্রে ঘুমিয়েছিলি?

বাবু দশটা নাগাদ খেয়ে নিতেই, আমিও খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

বাবু কাল অফিস থেকে কখন ফিরেছিলেন?

বাবু কাল অফিসেই যাননি—কেবল বেলা বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ একবার বের হয়েছিলেন, কিন্তু একটু পরেই ফিরে আসেন—আর বের হননি।

কাল নীচের তলায় যে খুন হয়েছে জানিস?

জা-জানি হুজুর।

জানিস?

হ্যাঁ, আমরা তো তখন উপরে যখন পুলিস আসে—আমি, বাবু—

তুই আর তোর বাবু তখন উপরেই ছিলি?

আজ্ঞে হুজুর। বাবু ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

কেন? ভয় পেয়েছিলেন কেন?

কে জানে হুজুর—দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে ছিলেন।

হুঁ। তা নীচে কাল দুপুরে কোন চিৎকার বা চেঁচামেচির শব্দ শুনেছিলি?

না বাবু।

সত্যি কথা বল্?

মা কালীর দিব্বি বাবু—কিছু শুনিনি।

তবে জানতে পারলি কি করে যে খুন হয়েছে নীচের ফ্ল্যাটে—পুলিস এসেছে?

আজ্ঞে বাবু বললেন—

বাবু বললেন!

হ্যাঁ, বাবু ঐ সময় আবার জামাকাপড় পরে কোথায় যেন বেরুচ্ছিলেন—সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পুলিস দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন।

তা খুন হয়েছে নীচে জানলেন কি করে?

তা জানি না বাবু—

তারপর কি হল?

বাবু উপরে উঠে এসে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে জামা কাপড় খুলে ফেললেন।

দাশু!

আজ্ঞে হুজুর—

তুই নেশা-টেশা করিস কিছু?

আজ্ঞে!

নেশা-টেশা করিস?

আজ্ঞে এই যৎসামান্য—

তা কিসের নেশা করিস?

দামী নেশা কোথায় পাব হুজুর—সামান্য একটু-আধটু বড় কলকে—

হুঁ। কাল বড় কলকে হয়েছিল?

আজ্ঞে।

যা বলছি তার জবাব দে।

আজ্ঞে—

কাল একটু বেশি নেশা তোর হয়েছিল, তাই না?

আজ্ঞে।

কখন বড় কলকে টেনেছিলি? সন্ধ্যায়?

আজ্ঞে না—বাবু তাহলে জেনে ফেলবেন—রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর—

তারপর?

তারপর তো কিছু জানি না হুজুর—

নীচের বাবুর সঙ্গে তোর আলাপ ছিল?

তা ছিল বৈকি হুজুর।

তোর বাবুর?

বাবুর! হ্যাঁ ছিল বৈকি।

নীচের চাকরটা—মানে ঐ শম্ভুকে চিনিস না?

হ্যাঁ—একটি ঘুঘু, বয়েস ওর অনেক হুজুর। ও মিথ্যা বলে ওর বয়েস।

তাই নাকি?

আজ্ঞে।

॥ আট ।

তা বুঝলি কি করে শম্ভু একটি ঘুঘু? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

ও আমরা দেখলেই চিনতে পারি—দাশু বললে।

হুঁ। তা তুই আজ কখন জানতে পারিস যে তোর বাবু খুন হয়েছেন?

বাবুর ঘুম ভাঙার পরই এক কাপ চায়ের দরকার হয়, সেই চা নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি—শোবার ঘরে বাবু নেই, তখন ভাবলুম বাবু বোধ হয় বাথরুমে, কিন্তু কেউ নেই—ঐ সময় দুধওয়ালা দুধ নিয়ে আসে—কলিংবেল বাজাতেই দরজা খুলে দিতে গিয়েই দেখি—

সদর দরজা খোলা ছিল, না বন্ধ?

আজ্ঞে, বন্ধ।

ভিতর থেকে খিল দেওয়া ছিল?

না।

বিকাশ ঐ সময় বলে, দরজায় গডরেজের অটোমেটিক ডোরলক্ লাগানো স্যার।

তাই নাকি!

হ্যাঁ স্যার, আমার মনে হয় হত্যাকারী হত্যা করার পর বাইরে থেকে দরজাটা টেনে হয়তো আবার লক করে দিয়ে গিয়েছিল। বিকাশ বললে।

তারপর তুই কি করলি দাশু?

আজ্ঞে প্রথমটায় কি করব বুঝতে পারিনি, তারপর দোতলায় ছুটে গিয়ে যে সেপাইজী পাহারায় ছিল তাকে ডেকে আনি।

লালবাজারে কে খবর দিয়েছিল বিকাশ?

করণ সিং—

সে-ই তো নীচের ফ্ল্যাটের সামনে পাহারায় ছিল?

হ্যাঁ স্যার—

সে কোন শব্দ-টব্দ উপরে শোনেনি?

না স্যার।

আরো আধঘণ্টা পরে সুদর্শন ফিরে এল লালবাজারে, বিকাশের উপরেই বাকি কাজের ভার দিয়ে। নিজের ঘরে ঢুকেই একজন সার্জেন্টকে বললে সমীরণকে তার অফিস-কামরায় নিয়ে আসবার জন্য। একটু পরে সমীরণ সার্জেন্টের সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকল।

এক রাত্রেই তার চেহারা যেন অর্ধেক হয়ে গিয়েছে।

চোখ-মুখ শুকনো—সমস্ত মুখে যেন একটা ক্লান্তি ও অবসন্নতা।

বসুন সমীরণবাবু।

সমীরণ বসল সুদর্শনের মুখোমুখি একটা চেয়ারে।

চা বোধ হয় খাননি—বলে সুদর্শন একজন সেপাইকে ডেকে সমীরণকে চা দেবার জন্য বললে।

কাল ঘুমোতে পারেননি মনে হচ্ছে!

সুদর্শনের প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না সমীরণ।

সমীরণবাবু।

সমীরণ মুখ তুলে তাকাল।

বিজিতা দেবীকে আপনি তো অনেক দিন থেকেই চিনতেন?

চিনতাম।

আপনি তাঁকে ভালবাসতেন, তাই না?

সমীরণ মাথাটা নীচু করল, তারপর মৃদু গলায় বললে, সে সব কথায় আজ আর কাজ কি মিঃ মল্লিক!

বুঝতে পারছি ভালবাসতেন। আর এও বুঝেছি সত্যিই কত গভীর ভালবাসা ছিল

তাঁর প্রতি আপনার। আশ্চর্য, তা ভালই যদি বাসতেন তো তাঁকে বিয়ে করলেন না কেন?

বিজিতা—

বলুন?

কিন্তু সে সব কথা শুনে আপনার কি লাভ মিঃ মল্লিক।

বিজিতা দেবীর হত্যাকারীকে ধরতে হলে তাঁর সম্পর্কে সব কথাই জানা প্রয়োজন আমাদের সমীরণবাবু। আপনিও নিশ্চয়ই চান তাঁর হত্যাকারী ধরা পড়ুক—

কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ মল্লিক, সমীরণ সুদর্শনের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল, তার দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে, বিজিতাকে আমি হত্যা করিনি।

ও কথা থাক। আপনি মধ্যে মধ্যে ওঁদের ওখানে যেতেন?

আগে আগে যেতাম—তবে ইদানীং কয়েক মাস যাইনি।

কেন?

মণি পছন্দ করত না জানতে পেরেই যাওয়া বন্ধ করেছিলাম।

মণিবাবু কিছু আপনাদের কোনদিন বলেছিলেন?

না।

তবে আপনি বুঝতে পারলেন কি করে?

বুঝতে পেরেছিলাম—

কি করে?

ঐ সময় একজন বেয়ারা এক কাপ চা নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখল।

চা-টা খেয়ে নিন।

চায়ের পিপাসা আমার নেই।

তবু খান না। সকালবেলাতে চা খাননি। নিন, কাপটা তুলে নিন।

সমীরণ কাপটা হাতে নিয়ে একটা ছোট চুমুক দিয়ে চায়ের কাপটা আবার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে দিল।

খেলেন না?

ভাল লাগছে না।

তবে থাক। যা বলছিলাম—মণিবাবু আপনার যাওয়াটা পছন্দ করতেন না তা জানতে পারলেন কি করে?

বিজিতা আমাকে একটা চিঠিতে জানিয়েছিল।

বিজিতা দেবী মধ্যে মধ্যে আপনাকে বুঝি চিঠি লিখতেন?

না।

কি লিখেছিলেন চিঠিতে বিজিতা দেবী আপনাকে?

মণি পছন্দ করে না আমার যাওয়া-আসাটা তাই—অথচ কেন ও সন্দেহ করত বিজিতাকে আজও আমি ভেবে পাইনি মিঃ মল্লিক!

ওকথা বলছেন কেন?

কারণ বিজিতার সমস্ত মন জুড়ে ছিল মণিই। সেখানে কারো স্থান ছিল না। সী ওয়াজ সো সুইট—সো টেনডার—বলতে বলতে আবার সমীরণের গলাটা বুজে এল। দু চোখে জল ভরে উঠল।

শেষ আপনি কবে তাঁদের ওখানে গিয়েছিলেন?

গতকাল।

কাল গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

কখন? কখন গিয়েছিলেন?

বেলা তখন পৌনে একটা হবে।

ওঃ, তা দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে?

না।

দেখা হয়নি?

না—গিয়ে দেখি সদর দরজা বন্ধ।

বন্ধ!

হ্যাঁ—বার বার কলিংবেল টিপলাম। বিজিতার নাম ধরে ডাকলাম, কিন্তু—

কি?

সে দরজা খুলল না।

তারপর?

ফিরে এলাম। অথচ—

কি?

শম্ভুর হাত দিয়ে চিঠি লিখে বিজিতা আমাকে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে ডেকে পাঠিয়েছিল।

চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি আপনাকে?

হ্যাঁ।

কি লিখেছিলেন সে চিঠিতে?

বিশেষ কারণে সে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

তারপর?

আমি অবিশ্যি একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। চিঠি লিখে ডেকে পাঠাল অথচ দেখা করল না! ফিরে এলাম আমি বাসায়।

কখন ফিরেছিলেন বাসায়?

বেলা তিনটে নাগাদ হবে।

তবে যে কাল বলেছিলেন—

মিথ্যা বলেছি—কাল আমার কোন রিহার্শেল ছিল না।

হুঁ। বলুন, তারপর?

বাসায় ফিরে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি বিছানার উপর সেই সুটকেসটা পড়ে আছে—কয়েকটা চাবি দিয়ে সুটকেসটা খোলবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন চাবির সাহায্যেই সুটকেসটা খুলতে পারলাম না।

আপনি সুটকেসটা খুলতে চেষ্টা করেছিলেন তাহলে?

হ্যাঁ।

তারপর?

কেমন যেন একটা ভয় ভূতের মত আমাকে পেয়ে বসেছিল ঐ সময়।

ভয়!

হ্যাঁ—আর সেই ভয়টা আরো চেপে বসল যে মুহূর্তে আমি টেলিফোনটা পেলাম। এবং টেলিফোনটা পাওয়ার পর—

হঠাৎ যেন সমীরণ আবার থেমে গেল।

তারপর? বলুন থামলেন কেন?

ভয়টা ক্রমশই যেন কেমন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সুটকেসটা দূরে কোথাও ফেলে আসবার জন্য আমি সেটা নিয়ে বের হয়ে পড়ি। আপনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করছেন না মিঃ মল্লিক?

সুদর্শন কি যেন ভাবছিল। সমীরণের কথার কোন জবাব দিল না।

আচ্ছা সমীরণবাবু!

সুদর্শনের ডাকে সমীরণ মুখ তুলে তাকাল।

যাকে আপনি অত ভালবাসতেন সে সুখী হতে পারেনি জেনে নিশ্চয়ই মনটা আপনার খারাপ হয়ে গিয়েছিল?

হয়েছিল। কিন্তু আমি আর কি করতে পারি!

আপনি মণিশঙ্করবাবুকে আলাদা করে ডেকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন না কেন?

না। করিনি।

কেন?

মণি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করত না। তাছাড়া কে জানে ব্যাপারটা আরো বিশ্রী হয়ে দাঁড়াত না!—তাই ওদের কাছ থেকে দূরেই সরে গিয়েছিলাম।

ঠিক আছে সমীরণবাবু, আপাতত আপনি যেমন আছেন তেমনি এখানেই থাকুন। সুদর্শন বলতে বলতে বেল বাজাল বোতাম টিপে।

একজন সেপাই এসে সেলাম দিল।

সার্জেন্ট চক্রবর্তীকে ডাক।

একটু পরেই সার্জেন্ট চক্রবর্তী এল, স্যার আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ, এঁকে নিয়ে যান। যে ঘরে উনি ছিলেন সেখানেই রাখুন।

সমীরণ উঠে দাঁড়াল।

সুদর্শন একটা সিগারেট ধরিয়ে ধূমপান করতে করতে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

সমীরণ দত্ত একটু আগে যা বলে গেল তা কি সত্যি? না বানিয়ে বানিয়ে সব কিছু বলে গেল?

ঐদিনকার সংবাদপত্রটা টেবিলের ওপর পড়ে ছিল—তাই কালকের সি.আই. টির ফ্ল্যাট-বাড়িতে হত্যার ব্যাপারটা প্রথম পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়েছে নজরে পড়ল সুদর্শনের।

সি.আই.টির ফ্ল্যাটে নৃশংস জোড়া খুন দিনের বেলা।

মা ও মেয়ে খুন হয়েছে।

আততায়ীকে পুলিস এখনো সন্ধান করতে পারে নি।

পরের দিন সকালে।

সুদর্শন ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে কিরীটীকে ডায়াল করল।

কে?

দাদা আমি সুদর্শন।

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে কিরীটীর গলা শোনা গেল—কি খবর?

দাদা, সেই ফ্ল্যাটে আর একটা খুন হয়েছে, শুনেছেন তো?

গোপেন বসু নিহত?

হ্যাঁ।

জেনেছি। ভাবছিলাম তুমি আমাকে সংবাদটা দেবে। মনে হচ্ছে একই ভাবে খুন হয়েছে, তাই না?

হ্যাঁ, ঠিক একই ভাবে খুন হয়েছে—সুদর্শন সমস্ত ঘটনাটা ফোনেই বিবৃত করে গেল।

সব শুনে কিরীটী বললে, আমি জানতাম এমনিই একটা কিছু ঘটবে—

আপনি জানতেন?

হ্যাঁ, মনই আমার বলেছিল—তাই তোমাকে গতকাল সকালেই ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে বলেছিলাম। কিন্তু ভাবতে পারিনি এত তাড়াতাড়ি কিছু ঘটে যাবে—

আমিও ভাবতে পারি নি দাদা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওখানে আরো একটা খুন হবে। সব যেন কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে—

শোন, এত কাজ কর সুদর্শন।

বলুন?

কালিকা ডোর্টিংয়ে পুলিস-পাহারা আছে তো?

হ্যাঁ আছে।

মণিশঙ্করবাবুকে লোক পাঠিয়ে লালবাজারে নিয়ে এস।

এখুনি আনাচ্ছি।

আরো একটা কাজ তোমাকে করতে হবে?

কি।

স্বামীনাথনকে লালবাজারে নিয়ে এস।

স্বামীনাথনকে! আপনি কি তাকেও সন্দেহ করছেন?

ঐ ধরনের হত্যার ব্যাপারে আশেপাশে যারাই থাকে কেউ সন্দেহের তালিকার বাইরে যেতে পারে না সুদর্শন। তাছাড়া কয়েকটা কথাও তার কাছ থেকে আমাদের জানা দরকার।

বেশ—যা বললেন, তাই করছি—কিন্তু তারপর?

একটু খোঁজখবর নেওয়ার জন্য যদি কালকের দিনটা আমি নষ্ট না করতাম, তবে হয়তো মিঃ বোসকে অমন করে প্রাণ দিতে হত না। যাক—যা বললাম তাই কর, ওদের দুজনকেই আমাদের প্রয়োজন—তাছাড়া ওরা—

ওরা কি?

ওরা দুজনের একজনও সব সত্যি কথা বলেনি।

মণিশঙ্কর যে বলেনি তা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু স্বামীনাথন—

একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন ভায়া—বিজিতা মণিশঙ্করের স্ত্রী ছিল, দক্ষিণ দেশের মেয়ে—আর স্বামীনাথন সেই দেশেরই লোক। এবং ঐ ফ্ল্যাটেই এসে স্বামীনাথন উঠেছিল। দুজনের পরস্পরের মধ্যে কোথাও একটা যোগসূত্র থাকা এমন কিছুই বিচিত্র নয়।

আপনি কি তাহলে—

এর মধ্যে আর সন্দেহের কি ভায়া—হয়তো খোঁজ করতে গেলে এমনও দেখতে পাব ওদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় তো বটেই আত্মীয়তাও ছিল হয়তো।

হঠাৎ ওই সময় সুদর্শন বলে, আপনি একবার আসবেন দাদা?

কেন বল তো!

জিজ্ঞাসাবাদ যা করতে হয় আপনিই করবেন ওদের।

কেন? সবই তো তোমাকে বলে দিলাম এবারে তুমিই জিজ্ঞাসাবাদ কর না!

তা পারি, কিন্তু আপনার মনের মধ্যে ওদের ঘিরে কোন্ প্রশ্নের উদয় হয়েছে সেটা তো আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়—শুধু আমার পক্ষেই বা বলি কেন, স্বয়ং ঈশ্বরও হয়তো জানেন না।

টেলিফোনের অপর প্রান্তে হো-হো করে গলা খুলে হেসে ওঠে কিরীটী।

না না—হাসি নয় দাদা—আসুন—

আসতেই হবে?

হ্যাঁ।

বেশ, আসছি—

দেরি করবেন না যেন—

না, না—দেরি হবে না।

॥ নয় ॥

সুদর্শন বুঝতে পেরেছিল বর্তমান রহস্যের ব্যাপারে সে অন্ধকারে হাতড়ে ফিরলেও কিরীটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে কোন একটা কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই।

রহস্যের ব্যাপারে তার বিশেষ অনুভূতিটা কোন একটা পথ খুঁজে পেয়েছে।

সুদর্শন তাই আর দেরি করে না।

দুটো ভ্যানে দুজন পুলিস অফিসার তখুনি পাঠিয়ে দেয় মণিশঙ্কর ও স্বামীনাথনকে আনবার জন্য।

এক ঘণ্টার মধ্যেই দুজনকে নিয়ে পুলিস অফিসার দুজন লালবাজারে পৌছে গেল। কিন্তু তার আগেই কিরীটী পৌছে গিয়েছিল।

কি হল, এলেন তোমার সম্মানিত অতিথিরা? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আনতে গেছে বসুন—

দুজনকে কিন্তু আলাদা ঘরে রাখবে।

আলাদা!

হ্যাঁ, আলাদা ভাবে প্রশ্ন করব—কেউ যেন কাউকে না দেখতে পায়।

বেশ তাই হবে।

সমীরণবাবুকেও প্রয়োজন হবে।

তাকে এ ঘরে আনাব?

না—এখন না, সময় হলে বলব।

সুদর্শন সেই মতই ব্যবস্থা করে।

প্রথমেই সুদর্শন কিরীটীর নির্দেশানুযায়ী মণিশঙ্করকে ডেকে পাঠাল।

মণিশঙ্কর ঘরে ঢুকেই বললে, কি ব্যাপার—এভাবে এখানে হঠাৎ পাকড়াও করে নিয়ে এলেন?

সুদর্শন নয়—জবাব দিল কিরীটী, বসুন মিঃ ঘোষাল। আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে!

মণিশঙ্কর চেয়ারটা টেনে নিয়ে বলল, বলুন শুনি!

আমরা জানতে পেরেছি—ইদানীং বেশ কিছুদিন ধরেই আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার মনকষাকষি চলছিল, কথাটা কি সত্যি?

মূল্যবান এ খবরটি কার কাছ থেকে পেলেন?

যেখান থেকেই পাই না কেন, কথাটা মিথ্যে নিশ্চয়ই আপনি বলতে পারেন না।

কেন বলতে পারব না—একশোবার বলব মিথ্যে।

মিথ্যে?

হ্যাঁ, যে বলেছে সে সম্পূর্ণ মিথ্যেই বলেছে। We never had any misunderstanding or quarrel!

কিরীটী এবারে প্রশ্ন করে, বেশ বেশ। আপনার স্ত্রীকে আপনি খুব ভালবাসতেন নিশ্চয়ই?

আপনি বোধ হয় জানেন না, আমাদের লাভ-ম্যারেজ!

জানি—আর এ-ও জানি অনেক ভালবাসার বিয়েতেই অনেক সময় চিড় ধরে, ধরছে হামেশাই—

আমাদের সেরকম কিছু হয়নি।

ইদানীং আপনার, মানে আপনার বন্ধু সমীরণবাবুকে ঘিরে আপনার স্ত্রীর প্রতি একটা সন্দেহের ধোঁয়া সৃষ্টি হয়নি আপনি বলতে চান?

সমীরণ আমার বন্ধু—অত ছোট মন আমার নয়।

তবে সমীরণবাবু ইদানীং আপনার ফ্ল্যাটে আর যেতেন না কেন? আগে আগে তো খুব যাওয়া-আসা ছিল!

তা আমি কেমন করে বলব?

আপনি কিছুই জানেন না?

না।

ওঃ ভাল কথা, কাল ও পরশু রাত্রে আপনার বেশ ভাল ঘুম হয়েছিল নিশ্চয়ই?

ঘুম! হঠাৎ যেন কেমন থতিয়ে যায় মণিশঙ্কর।

হ্যাঁ, ঘুম। শুনলাম আপনি দুই রাত্রিই বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছেন! কি, জবাব দিচ্ছেন না কেন? ঘুমোননি?

আমার কি ঘুমোবার মত মনের অবস্থা?

তবু বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছেন বলেই খবর পেয়েছি!

দেখুন আপনার প্রশ্নের মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!

ভালবেসে যাকে বিয়ে করলেন—আর যে নিজের সন্তান কয়েক ঘণ্টা আগে মাত্র নৃশংসভাবে খুন হয়েছে সে দৃশ্য দেখার পরও ঘুমের ব্যাঘাত আপনার ঘটল না রাত্রে—আপনার ভালবাসারই অকাট্য প্রমাণ বটে!

ব্যঙ্গের মত যেন শোনাল কিরীটীর কণ্ঠস্বর।

মণিশঙ্কর কোন জবাব দেয় না। কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

বেশ, এবারে বলুন পরশু আপনার জবানবন্দিতে দু-দুটো মারাত্মক মিথ্যা কথা কেন বলেছেন?

মিথ্যা কথা বলেছি!

হ্যাঁ—প্রথমত যে চাবিটা আপনার স্ত্রীর আঁচলে থাকার কথা সেটা আপনার পকেটে ল কি করে?

ওটা তো ডুপ্লিবেক চাবি!

মিথ্যা কথা।

না, মিথ্যা নয়—তার কারণ—

আপনার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, হত্যার দিন অর্থাৎ পরশু দুপুরে আপনি যখন ফ্ল্যাটে াসেন তখুনি কোন এক সময় আপনার স্ত্রীর আঁচল থেকে আপনি চাবির রিংটা খুলে য়েছিলেন।

কি করে বুঝলেন?

যা সত্য তাই বলছি—

বেশ, কেন—আমি তার আঁচল থেকে চাবির রিংটা খুলে নেব?

কারণ হত্যা ব্যাপারটার সঙ্গে একটা বার্গালারিও জড়িয়ে আছে, সেটাই প্রমাণ করাবার স্টা ও ইচ্ছা ছিল আপনার।

আ—আমি—

তারপর আপনি বলেছেন, বেলা দুটো বেজে দশ মিনিটের সময় আপনি ফোন পেয়ে ফিস থেকে ছুটে যান ট্যাক্সি নিয়ে বাড়িতে—

বলেছি তো!

তাও মিথ্যা।

মিথ্যা?

হ্যাঁ, তার আগেই একবার আপনি ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন—বারোটা থেকে সাড়ে ারোটার মধ্যে।

আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ঐ সময় আমি অফিসে কাজ করছিলাম—

বের হননি আপনি অফিস থেকে একবার গত পরশু বেলা এগারোটা নাগাদ বলতে ান?

কিরীটীর প্রশ্নটা এত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ যে মণিশঙ্করকে যেন কয়েকটা মুহূর্তের জন্য কমন থমকে দেয়।

হ্যাঁ—বের হয়েছিলাম, মৃদু গলায় জবাব দেয় মণিশঙ্কর, গোটা এগারোর সময়।

কখন ফিরেছিলেন আবার?

বেলা বারোটা নাগাদ।

না তার অনেক পরে আপনি ফিরেছেন—বেলা দেড়টায়।

মোটেই নয়—আমি অফিসেই ছিলাম।

না, ঐ সময়টা আপনি অফিসে ছিলেন না।

ছিলাম না বুঝলেন কি করে?

বুঝেছি কারণ তার সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। এবারে বলুন কোথায় গিয়েছিলেন ঐ সময় আর কেনই বা ফিরতে আপনার অত দেরি হল?

অফিসের কাজে—মানে অফিসের একটা কাজে আমার একটু বেরুতে হয়েছিল, এখন মনে পড়ছে।

মনে পড়েছে তাহলে! তাহলে বলুন এখন, কোথায় বের হয়েছিলেন?

ডালহৌসিতেই অন্য একটা অফিস।

সেটা কোথায় এবং কোন্ অফিসে?

হাডসন অ্যান্ড মেটার অফিসে।

সেখান থেকে পনের মিনিট বাদেই তো আপনি বের হয়ে আসেন!

হঠাৎ মণিশঙ্কর যেন আর একটা ধাক্কা খেল, কেমন যেন বিব্রত ও হতচকিত মনে হয় তাকে।

পরম বিস্ময়ের সঙ্গে সুদর্শন কিরীটীর মণিশঙ্করকে প্রশ্ন ও তার জবাবগুলো শুনছিল। কিরীটী মণিশঙ্করের মুখের দিকে তার শেষ প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে তখনো স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

মিঃ ঘোষাল আমার প্রশ্নের জবাবটা এখনো পাইনি!

মণিশঙ্কর চুপ।

আমি জানি মিঃ ঘোষাল, পরশু গোটা এগারোর সময় আপনি অফিস থেকে বের হয়ে হাডসন অ্যান্ড মেটার অফিসে গেলেও সেখান থেকে আপনি আপনার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন

না আমি যাইনি।

গিয়েছিলেন আপনি—বলুন কেন গিয়েছিলেন?

আমি যাইনি।

আপনার গলার স্বর—আপনার মুখ বলছে আপনি গিয়েছিলেন, আর আমাদের অনুমান যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ একজন আপনাকে দেখেছিল ঐ সময় ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে আসতে।

কে—কে দেখেছে!

মিঃ স্বামীনাথনকে এ ঘরে আনাও তো সুদর্শন।

সুদর্শন কিরীটীর নির্দেশে উঠে গিয়ে বাইরে দণ্ডায়মান সার্জেন্টকে বললে পাশের ঘর থেকে স্বামীনাথনকে ডেকে আনতে।

মিঃ ঘোষাল, কিরীটী আবার বলে, সত্য আর গরলকে কখনো চেপে রাখা যায় না কোনদিন-না-কোনদিন তা প্রকাশ হয়ে পড়েই।

কিন্তু আপনার বিশ্বাস করুন, মণিশঙ্কর বলে ওঠে, আমি আমার স্ত্রী ও কন্যাকে হত্যা করিনি!

কিন্তু আপনি গত পরশু এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে আপনার সি. আই টি-র ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। কিরীটী শান্ত গলায় আবার বলে।

ঐ সময় স্বামীনাথন একজন সার্জেন্টের সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকল।

মণিশঙ্করবাবু, এঁকে আপনি চেনেন?

হ্যাঁ, চিনি।

কে উনি?

আমার স্ত্রীর দেশের লোক।

আপনার স্ত্রী অর্থাৎ বিজিতা দেবী তাহলে ওঁকে ভাল করেই চিনতেন?

চিনত।

মধ্যে মধ্যে আপনাদের ফ্ল্যাটে উনি আসতেন?

স্বামীনাথন তীব্র গলায় প্রতিবাদ জানায়, ইট'স এ ড্যাম লাই! মিথ্যা—

মিঃ স্বামীনাথন!

ইয়েস!

আপনি কতদিন ওঁদের ফ্ল্যাটের উপরের তলায় আছেন? কিরীটী প্রশ্ন করে স্বামীনাথনকে।

মাত্র দিন-পনের হবে।

তার আগে কোথায় ছিলেন?

পোলক স্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাটে।

কতদিন ছিলেন সেখানে?

প্রায় বছর দুই হবে।

হঠাৎ সেখান থেকে ঐ সি. আই. টি-র ফ্ল্যাটে উঠে এলেন কেন?

ফ্ল্যাটটা ভাল—ভাড়া কম—বেশ সুবিধা—তাই।

তাই, না বিজিতা দেবীর সঙ্গে যাতে সব সময় দেখাসাক্ষাৎ হতে পারে সেইজন্যই ওখানে উঠে এসেছিলেন?

না, সেজন্য নয়; যেজন্য উঠে এসেছিলাম সে তো বললাম।

বিজিতা দেবীর সঙ্গে আপনার অনেক দিনের আলাপ?

একই শহরে পাশাপাশি বাড়িতে অনেকদিন আমরা ছিলাম।

কলকাতায় কতদিন আছেন?

বছর তিনেক।

তার আগে?

মাদ্রাজে একটা অফিসে চাকরি করতাম।

বিজিতা দেবী শান্তিনিকেতনে চলে আসার পর আপনাদের পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রের দেওয়া-নেওয়া ছিল?

ছিল।

মধ্যে মধ্যে শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন?

গিয়েছি, দুবার।

সমীরণ দত্ত—বিখ্যাত গাইয়েকে আপনি চেনেন?

চিনি।

আপনি বিজিতা দেবীকে ভালবাসতেন—তাই না?

স্বামীনাথন মাথাটা নীচু করে।

বলুন, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। ভালবাসার মধ্যে কোন অপরাধ নেই।

স্বামীনাথন তবু কোন জবাব দেয় না।

কিরীটীর হঠাৎ নজরে পড়ল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মণিশঙ্কর ঘোষাল স্বামীনাথনের মুখের দিকে।

বলুন! কিরীটী আবার বলে।

বাসতাম কিন্তু—, থেমে গেল স্বামীনাথন।

কি, থামলেন কেন, বলুন?

যেদিন জানতে পেরেছিলাম মণিশঙ্করকে সে ভালবাসে, সেইদিন থেকেই নিজেকে আমি গুটিয়ে নিয়েছিলাম।

তাই যদি হবে তো ঐ একই ফ্ল্যাটে অত কাছাকাছি আবার এসে উঠেছিলেন কেন মিঃ স্বামীনাথন? কিরীটী প্রশ্নটা করে ওর মুখের দিকে তাকাল।

আজ বুঝতে পারছি ভুল করেছি।

ভুল?

তাই। হয়তো আমি ওইভাবে ওখানে এসে না উঠলে তাকে আজ অমন পৈশাচিক নৃশংস মৃত্যু বরণ করতে হত না।

মিঃ স্বামীনাথন, গত পরশু বেলা দশটা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন? কিরীটী এবার প্রশ্ন করল।

আগেই তো বলেছি, আমি পরশু কলকাতার বাইরে ছিলাম। স্বামীনাথন বললে।

কিন্তু আমি যদি বলি আপনি মিথ্যে বলছেন!

মিথ্যে?

হ্যাঁ, ওই সময়টা আপনি আপনার ফ্ল্যাটেই ছিলেন।

না, না—আই ওয়াজ আউট অফ ক্যালকাটা!

না—স্টীল ইউ আর ডিনাইং দি ফ্যাক্টস! এখনো সত্য বলুন?

আ—আমি আগের দিনই সকালে বের হয়ে যাই—

হয়তো গিয়েছিলেন, তবে আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো গত পরশু আবার ফিরে এসেছিলেন। দেখুন মিঃ স্বামীনাথন, হাজারটা মিথ্যে দিয়েও একটা নিষ্ঠুর সত্যকে আপনি চাপা দিতে পারবেন না। পুলিসের পক্ষে জানা অসম্ভব হবে না। সত্যিই ওই সময়টায় আপনি কোথায় ছিলেন, আজ বা কাল তারা সেটা জানতে পারবেই। হত্যাকারী যে-সময় বিজিতা দেবী ও তার শিশুসন্তানকে হত্যা করে বের হয়ে যায়, আপনি তাঁকে সিঁড়িতে দেখেছিলেন তাই নয় কি? চুপ করে থাকবেন না, বলুন speak out!

হ্যাঁ, একজনকে আমি দেখেছি।

তাহলে গত পরশু সময়টাতে আপনি ফ্ল্যাটেই ছিলেন?

না।

ছিলেন না?

না, আমি পৌনে একটা নাগাদ ফিরে এসে যখন সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠেছি তখন একজনকে দ্রুত আমার পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে দেখেছিলাম।

কে সে?

ঠিক চিনতে পারিনি।

তার পরনে কি ছিল?

স্যুট পরা ছিল।

লম্বা না বেঁটে?

লম্বাই হবে সে।

সত্যিই তাকে আপনি চিনতে পারেন নি?

না।

॥ দশ ॥

কিরীটী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বললে, এবারে সমীরণ দত্তকে নিয়ে এস, সুদর্শন।

সুদর্শন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এবং একটু পরেই সমীরণকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

মিঃ স্বামীনাথন!

স্বামীনাথন কিরীটীর ডাকে ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

এঁকে চেনেন আপনি? সমীরণকে দেখিয়ে বললে।

না।

সমীরণবাবু?

সমীরণ তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

স্বামীনাথনকে দেখিয়ে কিরীটী প্রশ্ন করল, এঁকে আপনি চেনেন সমীরণবাবু?

না, চিনি না।

কখনো দেখেননি আগে?

না।

কোন দিন উনি শান্তিনিকেতনে যাননি, যখন আপনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন?

দেখিনি যেতে।

বিজিতা দেবীর মুখে কখনো ওঁর কথা শোনেননি?

না।

ভাল করে ভেবে বলুন! সত্যিই কখনো ওঁকে আপনি দেখেননি?

সমীরণ চুপ করে থাকে।

কিন্তু আমার ধারণা ওঁকে আপনি দেখেছেন আগে—

ঠিক মনে পড়ছে না—তবে—

বলুন?

একবার যেন মনে হচ্ছে দেখেছিলাম।

কবে?

মাসখানেক আগে।

কোথায়?

বিজিতাকে আমার ফ্ল্যাটে উনি ওঁর গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন।

গাড়ি!

হঠাৎ কিরীটীর কণ্ঠস্বরটা যেন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কিরীটীর চোখের মণি দুটো যেন ঝকঝক করে ওঠে. বলে, কিরকম গাড়ি? কি রং ছিল গাড়িটার?

বোধ হয় একটা কালো রংয়ের অ্যামবাসাডার।

কালো রংয়ের অ্যামবাসাডার! মিঃ স্বামীনাথন, আপনার গাড়ি আছে?

অফিস থেকে ব্যবহারের জন্য আমাকে একটা গাড়ি দিয়েছে।

গত পরশু তাহলে দুপুরে সেই গাড়িতে করেই আপনি সি. আই. টি-র ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন?

না, গাড়ি গত পরশু আমি ব্যবহার করিনি।

তবে কিসে গিয়েছিলেন?

ট্যাক্সিতে।

আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।

মিথ্যা আমি বলছি না—কিছুদিন ধরেই রিপেয়ারের জন্য গাড়িটা গ্যারেজে আছে।

কোন্ গ্যারেজে?

নিউ অটোমোবাইলস্ গ্যারেজে।

কিরীটী এবারে ফিরে তাকাল সুদর্শনের দিকে, ঐ গ্যারেজে ফোন করে একটা খবর নাও তো গাড়িটা সম্পর্কে!

সুদর্শন ফোন করল।

...কি বললেন? গাড়িটা পরশুই ডেলিভারি হয়ে গিয়েছে। আই সি. আচ্ছা ধন্যবাদ

দাদা, ওরা বলল গাড়িটা নাকি পরশুই সকালে ডেলিভারি দিয়ে দিয়েছে!

মিঃ স্বামীনাথন? কিরীটী তাকাল স্বামীনাথনের দিকে।

হতে পারে—অফিস হয়তো ডেলিভারি নিয়েছে—আমি জানি না।

কিরীটীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ—ও চেয়ে আছে স্বামীনাথনের মুখের দিকে।

মিস্টার স্বামীনাথন, আপনাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে!

কেন বলুন তো?

বিজিতদা দেবী ও তাঁর শিশুসন্তান এবং মিঃ বোসকে হত্যা করার অপরাধে।

কি পাগলের মত যা-তা বলছেন!

আমরা যে পাগলের মত যা-তা কিছু বলছি না—আদালতে সেটা প্রমাণ করতে পারব আমরা। সুদর্শন ওঁকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও।

সুদর্শন স্বামীনাথনকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

কথাটা বলেই কিরীটী সমীরণের দিকে তাকাল, সমীরণবাবু, এবারে বলুন—বিজিতা দেবীর চিঠি পাওয়ার পর সেখানে গিয়ে তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে আপনি যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন—কাউকেই আপনি দেখেননি?

সমীরণ চুপ।

চুপ করে থাকবেন না, বলুন। আই অ্যাম সিওর, ইউ মেট্ সাম ওয়ান—

সমীরণ তথাপি চুপ।

ইউ মেট্ সাম ওয়ান্ অ্যান্ড ইট ওয়াজ—আমি বলছি আপনি দেখেছিলেন মিঃ ঘোষালকে। ডিড'নট ইউ! বলুন—স্পীক আউট দি ট্রুথ!

হ্যাঁ—দেখেছি, কিন্তু একটা সুটকেস হাতে উনি এত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন যে আমাকে হয়তো ভাল করে নজরই করেননি।

তাহলে সুটকেসটা তখন মিঃ ঘোষালের হাতে দেখেছিলেন?

হ্যাঁ!

হোয়াই ডিডন'ট ইউ টেল দি ট্রুথ দেন?

আমি—

বলুন?

আমি ভেবেছিলাম মণিশঙ্করই হয়তো হত্যা করেছে—

কাকে?

বিজিতাকে।

আপনি তো তখনো জানেন না যে বিজিতা দেবী নিহত? আপনি তাহলে মিথ্যা লেছেন? ঘরের দরজা বন্ধ দেখে এবং দরজা থেকে ডাকা সত্ত্বেও খুলল না দেখে যে রে এসেছেন—সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা?

হ্যাঁ।

বলুন তাহলে কি দেখেছিলেন?

মণিশঙ্করের ফ্ল্যাটের দরজাটা খোলাই ছিল—খোলা দরজার পাশেই সামনে দাঁড়াতেই তদেহ দুটো রক্তে ভাসছে আমি দেখতে পেয়েছিলাম—

তারপর?

আমার ধারণা হয়েছিল মণিশঙ্করই—

তার স্ত্রী ও কন্যাকে হত্যা করেছে?

হ্যাঁ।

তারপর?

দরজাটা টেনে দিয়ে লক করে আমি চলে আসি।

কিরীটী এবারে মণিশঙ্করের দিকে তাকাল, মণিশঙ্করবাবু, এবারে আপনি বলুন যা ত্যি গতকাল ঘটেছিল—সব কথা।

আমি তো ঘরের মধ্যে ঢুকে—

দেখতে পান আপনার স্ত্রী ও কন্যা মৃত—রক্তে ভাসছে, মেঝেতে, তাই না?

হ্যাঁ! মাথা ঘুরে গেল আমার—

মণিশঙ্করবাবু, আপনি খুব উঁচুদরের অভিনেতা বুঝতে পারছি, কিন্তু আমরাও কিছু কছু নাটক সৃষ্টি করতে যেমন জানি তেমন অভিনয়ও করতে জানি।

কি বললেন?

নাটক আর অভিনয়ের কথা—

আমি ঠিক—

বুঝতে পারছেন না আমার কথাগুলো, তাই না?

হ্যাঁ, মানে—

বুঝতে পারবেন যখন ফাঁসির দড়িটা গলায় এঁটে বসবে।

ফাঁসি!

হ্যাঁ, ডায়াবলিক্যাল মার্ডার কেসে আসামীদের জন্য ইনডিয়ান পেনাল কোডের পাতায় য শাস্তির বিধান লেখা আছে সেটা হচ্ছে টু বি হ্যাংড বাই নেক টিল ডেথ— ফাঁসি— ভাবছেন নিশ্চয়ই তবে এতক্ষণ কি শুনলাম—কি দেখলাম—

আমি—

হ্যাঁ, আপনি যেমন দেখেছেন শুনেছেন—তেমনি আমারও আপনার মনের ঐ মুহূর্তের কথাটা না শুনতে পেলেও আপনার দু চোখে যে উল্লাসের দৃষ্টি দেখেছি—স্বামীনাথনকে অ্যারেস্ট করবার সময় মার্ডার চার্জে, সেটা আমার কাছে নিষ্ঠুর সত্যকেই উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে—আর আমার অভিনয়টুকুও সেইজন্যেই করা—কিন্তু এখন আপনি বুঝতে পারছেন—হোয়াট এ ব্লান্ডার ইউ হ্যাভ ডান—কত বড় ভুল আপনি করেছেন!

মণিশঙ্কর ঘোষাল যেন একেবারে পাথর!

কিরীটী বলতে থাকে—যে ভিন্ন প্রদেশের মেয়েটি ভালবেসে আপনার হাতে সর্ব তুলে দিয়েছিল, যার ভালবাসার মধ্যে এতটুকু খাদ ছিল না, তাকে এবং সেইসঙ্গে আপন নিজের ঔরসজাত সন্তানকে হত্যা করলেন কি করে? একটি বারের জন্যে হাত আপন কাঁপল না?

না, কাঁপেনি—হঠাৎ মণিশঙ্কর বলে ওঠে, সী ওয়াজ এ হারলট—বিশ্বাসঘাতি আর ঐ সন্তানও আমার নয়, সমীরণের—আমি জানি, আমি জানি—ঠিক সমীরণে গায়ের রঙ—ঠিক ওরই মত চোখ-মুখ—

মণিশঙ্কর!

অস্ফুট কণ্ঠে যেন আর্তনাদ করে ওঠে সমীরণ হঠাৎ।

হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি—তুমিই, আমার ঘরে আগুন জ্বেলে দিয়েছ সমীরণ—তোমার জ বিজিতা কোন দিনই আমাকে ভালবাসতে পারেনি—আমার বুকে মাথা রেখে সে তোমা কথা ভেবেছে—

না, না—মণি, না—আমি—

দিনের পর দিন তুমি তাকে চিঠি লিখেছ—আমার মানা সত্ত্বেও সে লুকিয়ে তো সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছে ফ্ল্যাটে—বল, বল সমীরণ সেও মিথ্যে—সেও ভুল!

ভুল হ্যাঁ, ভুল তোমার—সব মিথ্যা—

না, ভুল নয়—বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে চিনতে কোন স্বামীরই ভুল হয় না কোন দিন। তু আমার মনের শান্তি—ঘুম সব কেড়ে নিয়েছিলে, কিন্তু পরশু আর কাল রাত্রে অনেক পরে আমি ঘুমিয়েছি—আর জান, তোমারই একদা প্রেজেন্টেশান করা মহীশূর থেকে আম জন্য আনা ছোরা দুটোর একটা দিয়ে তোমার বিজিতাকে আমি হত্যা করেছি!

কিন্তু মিঃ বোসকে আপনি হত্যা করলেন কেন? কিরীটী হঠাৎ প্রশ্ন করে।

সে আমায় বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিল—

তাই তাকেও হত্যা করলেন?

হ্যাঁ, ইচ্ছা ছিল ওকেও, ঐ সমীরণকে হত্যা করব, সেই কারণেই অন্য ছোরাটা অ রেখে দিয়েছিলাম—কিন্তু ওর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম ওকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে অ হয়েছে; আমি যা করেছি স্বেচ্ছায় করেছি—অ্যান্ড আই কিল্ড দেম ডেলিবারেটলি! ফাঁ কথা বলছিলেন না? নাউ আই অ্যাম রেডি ফর দ্যাট!

সুদর্শন বলে ওঠে, হাউ ফ্যানটাস্টিক্—হাউ হরিবল্!

হাঃ হাঃ করে হঠাৎ ঐ সময় পাগলের মতই যেন হেসে ওঠে মণিশঙ্কর, তারপর ব খুব অবাক হয়ে গিয়েছেন ইন্সপেক্টার, তাই না?

কথাটা বলে মণিশঙ্কর সুদর্শনের দিকে তাকাল।

মণিশঙ্করের চোখেমুখে তখনো হাসি।

সুদর্শন ভাবে, লোকটা বিকৃতমস্তিক নয় তো!

মে আই হ্যাভ এ সিগারেট? একটা সিগারেট খেতে পারি স্যার? মণিশঙ্কর বল

খান—সুদর্শন বলে।

মণিশঙ্কর পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো, কিন্তু গোটা দুই দিতেই টলে পড়ে গেল। সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

মণিশঙ্কর বলে, চললাম স্যার, গুড বাই—মণিশঙ্করের চোখ বুজল।

॥ এগার ॥

সুদর্শন বাসাতে বসে পরের দিন সন্ধ্যায় সি. আই. টি-র ফ্ল্যাটের হত্যা-ব্যাপারটা নিয়েই কিরীটী আলোচনা করছিল। সামনে পাশাপাশি একটা সোফায় বসে সাবিত্রী ও সুদর্শন।

একসময় সুদর্শন বললে, প্রথম থেকেই কি আপনার মণিশঙ্করের ওপরে সন্দেহ পড়েছিল দাদা?

কিরীটী বললে, বলতে পার তোমার মুখে সব কথা শোনবার পরই মণিশঙ্করের ওপর আমার সন্দেহ জাগে মনে—

কেন?

প্রথমত মণিশঙ্করের অতগুলো চাবিসমেত চাবির রিংটাই রীতিমত একটা খট্‌কা লাগায় আমার মনে, যেটা তার পকেট থেকে বের হয় ও সে বলে সেটা একটা ডুপ্লিকেট চাবির রিং। ঐ চাবির রিংয়ের মধ্যেই ছিল দুটো চাবি অর্থাৎ একটা আলমারির ও অন্যটা সদর দরজার। মনে করে দেখ—

হ্যাঁ, মনে পড়েছে—

মণিশঙ্কর বলেছিল, চাবি তার স্ত্রীর কাছেই থাকত। কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়—সেটাই স্বাভাবিক। এবং ডুপ্লিকেট চাবি থাকলেও একমাত্র সদর দরজার চাবিই থাকত, তাই বলে রিংয়ের মধ্যে অন্যান্য চাবিও থাকবে কেন, বিশেষ করে ঘরের আলমারির চাবি—কাজেই ঐ চাবির রিং মণিশঙ্করের সঙ্গে করে অফিসে নিয়ে যাবার কোন যুক্তিও নেই। সেদিন অর্থাৎ দুর্ঘটনার দিন দ্বিপ্রহরে মণিশঙ্কর আসে তার ফ্ল্যাটে তার পূর্ব-পরিকল্পনা মত—বিজিতা দেবীর মনে তার ঐভাবে হঠাৎ আসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নিশ্চয় জাগেনি এবং সে কল্পনাও করতে পারেনি যে তার স্বামী তাকে হত্যা করবার জন্যেই এসেছে, বিশেষ করে ঐ সময়, নিষ্ঠুর একটা সংকল্প নিয়ে। মণিশঙ্কর অতর্কিতে বিজিতাকে আঘাত করে হত্যা করে হয়তো পিছন থেকে—তারপর শিশুটি পাছে সব কথা প্রকাশ করে দেয় সেই ভয়ে তাকেও হত্যা করে। হত্যার পর সে বেশ বদলিয়ে রক্তাক্ত জামা-কাপড় সুটকেসটায় নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে যায়। সে স্বামীনাথনের গাড়িটা আগেই গ্যারেজ থেকে delivery নিয়েছিল—সব দোষটা তার ঘাড়ে চাপানোর জন্য—এবং তা না হলে সমীরণের ঘাড়ে চাপানোর জন্য সে সুটকেসটা তার ফ্ল্যাটে রেখে এসেছিল; কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল সে করল যেটা আমার তাকে দ্বিতীয় সন্দেহের কারণ—

ভুল!

হ্যাঁ, চাবির রিংটা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে! চাবির রিংটা যদি সে সঙ্গে না নিয়ে যেত, হয়তো ব্যাপারটা এত শীঘ্র আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠত না। এবং ব্যাপারটা যে কোনরকম বার্গালারি নয় যখনই বুঝতে পারলাম তোমার কথায়, তখুনি বুঝেছিলাম এটা স্পষ্ট একটা নিষ্ঠুর হত্যার ব্যাপার। তোমারও সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, অবিশ্যি—

সন্দেহ যে একেবারে হয়নি তা নয়, হয়েছিল—কিন্তু—

তুমি ভাবতে পারনি যে স্বামী হয়ে নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে হত্যা করতে পারে কেউ, তাই না!

তাই, দাদা।

কিন্তু সন্দেহের মত বিষ আর নেই ভাই, বিশেষ করে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে

এ দুনিয়ায়। মনের মধ্যে একবার সন্দেহ জাগলে কোন একজনের, তার বিষ সমস্ত মনকে বিষাক্ত করে তোলে—তাই যখন মণিশঙ্কর হত্যা করেছিল তার নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে তখন তার সমস্ত শুভবুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা লোপ পেয়েছিল। যার ফলে তার মধ্যে momentary insanity davelop করেছিল—তারপরই সে ঐ নিষ্ঠুর কাজে লিপ্ত হয়।

কি জান ভাই, মানুষের শুভবুদ্ধি যখন তাকে ত্যাগ করে তখন সে কোন্‌টা ন্যায়—কোন্‌টা অন্যায় সে-বিবেচনাটুকুও হারিয়ে ফেলে। আর তার ফলে যে মানুষ তখন কোন্ স্তরে গিয়ে দাঁড়ায় আজকের দিনে তারও প্রমাণের অভাব নেই তোমার চারপাশে। কিন্তু আর ঐ প্রসঙ্গ নয়, মণিশঙ্কর তার পাপের মাসুল নিজেই হাত পেতে নিয়েছে সেই একজনের অলঙ্ঘ্য বিচারে ও নির্দেশে—

সাবিত্রী এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, দু চোখে তার জল, ম্লান কণ্ঠে বললে, আশ্চর্য!

কিরীটী মৃদু হেসে বলল, মানুষের চরিত্র সত্যিই আশ্চর্য সাবিত্রী! আরো যত বয়স হবে দেখবে—আরো জানবে—আরো—

দাদা! সাবিত্রী ডাকে।

বল? কিরীটী জবাব দেয়।

চা আনি?

নিশ্চয়ই। অবিলম্বে।—গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে।

সাবিত্রী উঠে গেল।

মালবী-মালঞ্চ



প্রথম প্রকাশ

১লা বৈশাখ ১৩৭৮

॥ এক ॥

শিখা বিশ্বাস হাসছে বটে, কিন্তু ভিতরটা আদৌ প্রসন্ন নয়। অনেকক্ষণ আগে দোতলার এই ঘরে পা দিয়েই মেজাজ বিগড়েছিল। কারণ সে টেলিফোন করেই এসেছিল। শংকরকে বলেছিল, কথা আছে সময় দিতে পারবে কিনা। জবাবে শঙ্কর এমন ভাব করেছিল যেন সে এলেই নিঃসঙ্গ সকালটা ভরে উঠবে। বলেছিল, কথা ছাড়াও তুমি যদি অনেকক্ষণ সময় নিয়ে আস তো সময় হবে।

অতএব শিখা বিশ্বাস খুশি মনেই এসেছিল। এর মধ্যে ঘরে দ্বিতীয় মূর্তির অবস্থান অপ্রত্যাশিত। অবাঞ্ছিতও বটে। এসে দেখে প্রাণের বন্ধু অপরেশ গুপ্ত সেখানে জাঁকিয়ে বসে আছে। ওকে দেখেই নালিশের সুরে শংকর বোস বলে উঠল, আমি নিরপরাধ, তুমি ফোন করার পরেই এই হতভাগা এসে হাজির হবে জানব কি করে!

বন্ধুর দিকে ফিরে চোখ পাকালো, তোকে কতবার বলেছি শিখার দরকারী কথা আছে, তুই ভাগ এখন?

অপরেশ গুপ্ত সোফায় গা এলিয়ে শূন্য দৃষ্টিটা ঘরের ছাদের দিকে চালান করে সিগারেটে লম্বা টান দিল একটা। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, দিনে-দুপুরে ঘরের দরজা বন্ধ করার মতো কথা?

শিখা এমনিতে অরসিক নয়। মোটামুটি ভালো কবিতা লেখে, তার কিছু কিছু ছাপাও হয়। কিন্তু এ ধরনের স্থূল রসিকতা শুনলে কান লাল হবে না তো কি? শংকর বোস ওকেই সালিশ মেনে বলল, দেখেছ, সাহসখানা দেখেছ?

এই সাহসের পিছনে যে ঢালা প্রশ্রয় আছে শিখা বিশ্বাস তা ভালই জানে। জবাব না দিয়ে হাসিমুখে পাশের সোফায় বসল সে। অপরেশ গুপ্ত লোকটাকে মনে মনে সে খুব পছন্দ করে না। তার কারণ লোকটার জিভের ডগায় ওইরকম ক্ষুর বসানো। স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদাভেদ কম।

অপরেশ গুপ্ত আবার সোজা হয়ে বসল। শিখার দিকেই ফিরল।—কি ম্যাডাম, কেটে পড়ব?

বলতে পারলে শিখা বলত, হ্যাঁ পড়ুন। বলা গেল না। তার বদলে বলল, কেটে পড়ার জন্যে আসেননি যখন বসুন, আমার কথাটা এমন কিছু গোপনীয় নয়। আপনারও শোনা থাকলে আপনার বন্ধুর একটু উপকার হতে পারে।

—ওয়ান্ডারফুল! কিন্তু কথার আগে কফি। বেয়ারা—!

যেন তারই বাড়ি-ঘর। বেয়ারা তার মুখ থেকেই কফির অর্ডার নিয়ে গেল এবং একটু বাদে দিয়ে গেল। অপরেশ সবিনয়ে তাকেই বলল, প্লে দি হোস্টেস, প্লীজ।

সপ্রতিভ মুখে শিখা ঝুঁকে কফির ট্রে সামনে টেনে নিল। পেয়ালায় কফি ঢালতে ঢালতে আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল শংকর তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। কিন্তু পলকের এই দৃষ্টি-বিনিময়টুকুও গোপন করা গেল না। গম্ভীর মুখে অপরেশ গুপ্ত মন্তব্য করল, মিষ্টি কম—

ঈষৎ থতমত খেয়ে শিখা তাকালো তার দিকে। নতুন সিগারেটে আগুন ছোঁয়াতে

ছোঁয়াতে অপরেশ গুপ্ত আবার বলল, কফির মিষ্টি নয়, আপনার চোখের।

এবারে শিখা বিশ্বাস হেসে ফেলল। তেমনি গম্ভীর মুখে অপরেশ বন্ধুর উদ্দেশে বলল, তোর চার আনা ফাঁড়া কাটল।

শংকর বোস হাসতে লাগল। শিখার দিকে ফিরে বলল, আচ্ছা, ও বিয়ে করলে বউটা ছ'মাসও ওর কাছে টিকে থাকবে আশা করো?

শিখার বদলে অপরেশই জবাব দিল, সেইজন্যেই আমার পরের বউ আর পরের ভাবী বউ নিয়ে কারবার। টিকে থাকা না-থাকা নিয়ে ভাবনার বালাই নেই।

হালছাড়া কোপে শংকর পার্শ্ববর্তিনীর উদ্দেশে বলে উঠল, তুমি ওকে ধরে দিতে পারো না দু'ঘা?

—রোসো বন্ধু রোসো। দার্শনিকের মুখ অপরেশ গুপ্তর।—রমণীর মন অপাত্রে ঘা দেয় না। আপাতত সেটা তোমারই প্রাপ্য মনে হচ্ছে। ম্যাডাম, অযথা কালবিলম্ব না করে আপনার অ-গোপনীয় দরকারী কথাটা সেরে ফেলুন, যা আমি শুনলে ওরও উপকার হতে পারে।

কফির পেয়ালা নামিয়ে শিখা শংকরের দিকে ফিরল।—তুমি শিগ্‌গীরই আবার কোথায় বেরুচ্ছ শুনলাম?

—কোথায় শুনলে?

পাখাটার দিকে চেয়ে অপরেশ মন্তব্য করল, গ-এ আকার ধ-এ আকার।

শিখা হেসে উঠল।—জবাব শুনলে তো?

—শুনলাম। ও সগোত্র বলে ঠিক চিনেছে!...কেন, তুমি যাবে সঙ্গে?

মুখে একটি কথাও না বলে অপরেশ গুপ্ত সোজা হয়ে বসল। তারপর বড় বড় চোখ করে শিখার দিকে চেয়ে রইল। এই লোকের সামনে সীরিয়াস হওয়া দায়, শিখা আবারও হেসেই ফেলল। তারপর হালকা ঝাঁজে জবাব দিল, না—তুমিও যাচ্ছ না।

—ও-ব্বা-বা, কেন?

—বাবা বারণ করেছে। সামনের মাসে বাইরের নানা দেশের ডাক্তাররা দিল্লীর কনফারেন্স সেরে কলকাতায় আসছে, বাবা বলল, সে সময় তোমার থাকা খুব দরকার।

বন্ধুর মুখের বিড়ম্বনার ছায়াটুকু উপভোগ্য মনে হল অপরেশ গুপ্তর। বিব্রত সুরে শংকর বলল, কিন্তু এ সময় মানে পুজোর সময়টায় একটু না বেরুলে আমার যে মেজাজপত্র ঠিক থাকে না।

শিখা বিশ্বাসের মুখে চাপা বিরক্তি।—বছরের মধ্যে চারবার করে না বেরুতে পারলেই তোমার মেজাজ ঠিক থাকে না। এরকম দায়িত্বশূন্য ডাক্তারকে ছেড়ে পেসেন্টরা সব পালায় না কেন আমি বুঝি না।

অপরেশ গুপ্ত সায় দিল, যত সব পাগলের কারবার, তাই পাগলের কাছে আসে।

—ঠাট্টা নয়। বাবাকে জড়িয়ে নিজের মনের কথাও অস্পষ্ট রাখল না শিখা বিশ্বাস। বলল, বাবা আমাকে কতদিন শোনায়, ডাক্তারের অন্তত এরকম খামখেয়ালী হলে চলে না। নিজের ভালো-মন্দর ব্যাপারে এমন অবুঝ আর দেখিনি একথা তো বাবা স্পষ্টই বলে। সেদিন তো হেসে ঠাট্টাই করছিল, নিজের জীবনের লক্ষ্যই ঠিক নেই তোমার, অন্যের জীবনকে লক্ষ্যের দিকে ফেরাবে কি! বিলিতি ডিগ্রীর চটক দেখে এখনো যারা আসছে, এমন নির্লিপ্ত দেখলে শিগগীরই তারা অন্য লোক খুঁজবে। বাবাকে দেখে

এটুকু অন্তত বুঝেছি, সব পেসেন্টের ধারণা হওয়া দরকার তার ডাক্তারের রোগী-অন্ত প্রাণ।

শিখার বাবা অনুপম বিশ্বাস মস্ত ডাক্তারই বটে। বাপের গর্ব তাঁর মেয়েদের থাকাই স্বাভাবিক। তবু পাঁচবার করে বাপের নাম করে মেয়ের এই উক্তি শংকর বোসের কানে খুব সরস ঠেকছিল না। হয়তো অপরেশ উপস্থিত না থাকলে এই কথাগুলোই শিখা অন্তরঙ্গ ভিন্ন সুরে বলত।

কিন্তু মুখে হড়বড় না করলেও রসিক সেও কম নয়। সময়োচিত গাম্ভীর্যে ভরাট করে নিল মুখখানা। শিখাকে একটু তাতিয়ে তোলার লোভও হল। বন্ধুর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, জীবন সম্পর্কে তোর কি মত?

—কবিতা পছন্দ করতে শেখা আর হজমশক্তি বাড়ানো।...আজ ছুটির দিনে তোর এখানে মাংস-টাংস হচ্ছে কিছু?

জবাব না দিয়ে শংকর বোস অল্প অল্প হাসতে লাগল। তারপর বলল, আমার মতে জীবনটা একখানা লেখার খাতা—তার লেখক জীবনের মালিক নিজেই।

—ওরে বাবা রে বাবা! দাঁড়া আগে বুঝে নিই।...তা জীবনের মালিক সে-খাতায় কি লিখবে, গপ্পো?

—হ্যাঁ। কিন্তু সর্বদাই সে ওই জীবনের খাতায় এক গল্প লেখার কথা ভাববে, অথচ সর্বদাই লিখে যাবে আর এক গপ্পো।

অপরেশ গুপ্ত সভয়ে সোফা ছেড়ে ওঠার ভঙ্গি করল। এবার আমাকে তাড়াবার মোক্ষম দাওয়াই বার করেছিস, আরো কিছু বলবি?

—হ্যাঁ, বোস্। তারপর সেই বিশাল জীবনের খাতা ভরাট হয়ে গেলে যে জীবনের গল্প সে লিখতে চেয়েছিল আর যে গল্প সে লিখল এই দুটোকে সে পাশাপাশি রেখে মেলাতে চেষ্টা করবে। জ্ঞানীরা বলে জ্ঞানের সেটাই নিজেকে দেখার সব থেকে সার্থক মুহূর্ত। হাসিমুখে শিখার দিকে তাকালো, তোমার বাবা ঠিকই বলেন, কিন্তু আমি যে লক্ষ্য ছেড়ে ভুল গল্প লেখার দলে ভিড়ে বসেছি তার কি উপায়?

অপরেশ গুপ্ত ক্লান্তির ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ছাড়তে লাগল। শিখা বিশ্বাস যথার্থই তেতে উঠেছে। চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করল, বাবাকে তাহলে তোমার এই সার্থক জীবন দর্শনের কথাই বলি?

—বলতে পারো, কিন্তু ঠিক না বুঝলে হয়তো আমাকেই ধরে হাসপাতালে পাঠাতে চাইবেন।

—এবং সেটাই সমুচিত হবে। নাটকীয় গাম্ভীর্যে অপরেশ গুপ্ত উঠে দাঁড়াল।—আপনি গিয়ে আপনার বাবাকে ঠিক যা শুনলেন তাই বলুন। একটুও মায়া-দয়া করবেন না। আর সেই সঙ্গে আমার জন্যেও একটু তদ্‌বির করে রাখতে পারেন। ওর তুলনায় আমার লক্ষ্য বরং অনেকখানি স্থির। যেমন এবারে আমি ওর সঙ্গে যাচ্ছি না, ও একাই জাহান্নমে যেতে পারে। ওই সময় আপনাদের যে ড্রামা পারফরম্যান্সের তোড়জোড় চলছে, পঞ্চাশ টাকা করে আমি তার দুখানা টিকিট কিনব সেই লক্ষ্যও স্থির—একখানায় আমি বসব, অন্যটা যে কোনো দরদী মহিলার জন্য খালি পড়ে থাকবে। গুড় বাই!

গটগট করে ঘর ছেড়ে চলে গেল। শংকরের এতক্ষণে মনে পড়ল তার বাইরে যাবার নামে শিখার এতটা আপত্তির আর বিরক্তির এও একটা বড় কারণ হতে পারে। মাসকয়েক

আগে ওদের নতুন ক্লাবের আবির্ভাব ঘটেছে। পুজোর আগে তারই প্রথম বৃহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সভ্যাদের কাছে সেটা বিশেষ উত্তেজনা এবং রোমাঞ্চের ব্যাপার।

ক্ষোভের প্রচ্ছন্ন কারণটা এভাবে অনাবৃত হবার ফলে শিখা অপ্রস্তুত একটু। হেসেই চোখ পাকালো, ওই প্রাণের বন্ধুটিই তোমার কাঁধের আসল শনি, বুঝলে?

—কেন, দুটো টিকিট কিনে মহিলার করুণার আশায় একটা সীট খালি রাখবে বলে?

—মহিলার ওকে করুণা করতে বয়ে গেছে।

তোয়াজের সুরে শংকর বলল, তোমাকে কিন্তু ওর খুব পছন্দ। সেদিন বলছিল, বেশ মিষ্টি-মিষ্টি মেয়ে, নেহাৎ তোর বুকে দাগা দিতে ইচ্ছে করে না, নইলে কবে সাবড়ে দিয়ে নিজের ঘরে এনে তুলতাম।

শিখা শিখার মতই ঝলসে উঠতে চাইল।—আমাকে নিয়ে এই ভাষায় কথা বলে আর তুমি হাসছ? তোমার জন্যেই ওর এত স্পর্ধা—

শংকর বন্ধুর হয়ে ওকালতি করল, ওর মুখের ভাষাটাই ওই রকম, ভিতরের ভাষাটা কবির মতই নরম।

শিখা ঝাঁজিয়ে উঠল, ভিতরের ভাষা শুনতে আমার বয়ে গেছে, ভদ্রসমাজে মিশতে চায় তো বাইরেটা সংস্কার করতে বলো।

শংকরের গলায় হালকা প্রতিবাদ, এ কি কবিতা-লেখা মেয়ের মতো কথা হল! ওই যে কি তোমরা লেখো, বাইরে দানব ভিতরে মানব, তার বদলে কিনা বাইরে মানব ভিতরে দানব!

শিখা বিশ্বাস মুখের দিকে চেয়ে রইল। ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসির আভাস। —এখনো বন্ধুর আশ্রয়ে থাকতে চাও তো তাকে যেতে দিলে কেন?

এবারে শংকর বোস অপ্রস্তুত একটু। এখনো বন্ধুপ্রসঙ্গ চলছে বলে এই খোঁটা। কিন্তু এ ছাড়াও একটু সত্য গোপন আছে। ছুটির দিনে অপরেশ আসবে জানাই ছিল। ছুটির দিন না হলেও যখন-তখন আসে। তার জন্যে আলাদা একটা ঘর আছে, সেখানে শয্যা পাতা আছে। শংকর বোস বাড়ি না থাকলে বা রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তার আসতে বাধা নেই। শিখা বিশ্বাস টেলিফোনে জানান দিয়ে আসছে কেন বুঝেও বন্ধুর উপস্থিতির সম্ভাবনার কথা ওকে বলেনি। উল্টে অপরেশকে বলেছে শিখা আসছে। শুনে অপরেশই ঠাট্টার ছলে প্রস্থানের উদ্যোগ করছিল। শংকর তাকে আটকে রেখেছে।

ঠেসটা তাই হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চাইল শংকর।—আশ্রয়ে থাকতে চাই মানে! একটা বছরের জন্য এখন ও-ই তো দাসানুদাস আমার।

দুই বন্ধুর মধ্যে কিছুদিন আগে একটা বড় রকমের বাজি হয়ে গেছে শিখা জানে। এদের ছেলেমানুষী উত্তেজনা দেখে হাসিই পেয়েছিল সেদিন। কোথায় জুলে রিমে বিশ্ব কাপ ফুটবল খেলা হচ্ছে, আর কোথাকার ইটালি আর ব্রেজিল তার ফাইনালে উঠেছে, এখানে এই কলকাতায় বসে তাদের কে জিতবে এই নিয়েই দুই বন্ধুর প্রবল বিতর্ক আর উত্তেজনা। তাই থেকে বাজি ধরা-ধরি। শিখা শুনেছিল বাইরে এ নিয়ে লাখ-লাখ ডলারের বাজির খেলা চলছে। কিন্তু এদের বাজির শর্ত অভিনব। অপরেশ গুপ্ত বলেছিল হারলে এক বছরের জন্য তুই আমার হুকুমের দাস হয়ে থাকবি—বিলেত-ফেরত ডাক্তারকে দোহন করে নিজের আখের কি ভাবে গুছিয়ে নেব সেটা পরে ভাবা যাবে। তার শর্ত শেষে আরো স্থূল পরিহাসের দিকে গড়িয়েছিল। শিখার দিকে কটাক্ষপাত করে

উপসংহার টেনেছিল, এমন কি তোর বউ বা ভাবী বউয়ের ওপর থাবা বসাবার মতিভ্রম হলেও তোকে মুখ বুজে থাকতে হবে।

শংকর বোস বলেছিল, ঠিক আছে, আমারও ওই শর্ত, বাজি জিতলে তোর মত গাধার নাকে আমিও এক বছরের জন্য দড়ি পরিয়ে ছাড়ব।

এদের উত্তেজনা দেখেই শিখা একটু যা উৎসুক হয়ে উঠেছিল। ফাইন্যাল খেলার দিন দুই বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে সে অবাকই হয়েছিল। শংকর বোসের সেদিন রোগী দেখা মাথায় উঠেছিল। টেলিফোনে অপরেশ শিখাকে ডেকেছিল ওর মাথায় জল-বাতাস করার জন্য। কথা শুনে আর পরে মুখ দেখে মনে হয়েছিল সে যেন বাজি জিতেই বসে আছে।

পরের ঘটনাও শুনেছে। রাত এগারোটায় রেডিও খুলে দুজনে মুখোমুখি বসে দেড় ঘণ্টা ধরে রিলে শুনেছে। জুলে রিমে ব্রেজিল জিতেছে। আর অপরেশ গুপ্ত নাকি তখন চিৎপাত হয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে আর 'জল-জল' বলে গলা ফাটিয়েছে।

শিখা জবাব দিল, কে দাস কে মনিব বোঝা গেছে, এখন তুমি উঠবে না ঘরে বসেই কচকচ করবে?

—কোথায়?

—আপাতত আমাদের বাড়ি, পরের প্রোগ্রাম পরে ভাবা যাবে।

মিনিট দশেকের মধ্যে দুজনে নীচে নেমে এলো। শিখা তার বাবার ছোট গাড়িটা নিয়ে এসেছে তাই শংকর বোসের গাড়ি বার করার দরকার নেই। শিখা ওদিকে ঘুরে ড্রাইভারের আসনে বসে এদিকের দরজা খুলে দিল। ও নিজেই গাড়ি চালায় এবং ভালই চালায়।

গাড়িতে ওঠার মুখে শংকর বোস থমকে দাঁড়াল। বাড়ির ফটক থেকে হাত পনেরো দূরে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে। বছর পঞ্চান্ন হবে বয়েস। পরনে কালোপেড়ে শাড়ি, সেও একেবারে পাটভাঙা পরিষ্কার নয়। এদিকে, না, তার দিকেই একাগ্র চোখে চেয়ে আছে। মহিলার মুখখানা শুকনো কিন্তু কমনীয়।

—কি হল, ওঠো? শিখা তাড়া দিল।

শংকর বোস গাড়িতে উঠে বসল। আগেই স্টার্ট দেওয়া ছিল, বসে আবার ঘাড় ফেরাবার আগেই গাড়িটা বেরিয়ে গেল। শংকরের মনে হল তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মহিলা। কোনো রোগী বা রোগিণী সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া তার কাছে কে আর আসবে! সেটা মনে হতেই গাড়িতে উঠে বসেছে। ছুটির দিনে ডবল ফি পেলেও কোনো পেসেন্ট দেখা বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার ব্যাপারে নিস্পৃহ সে।

কিন্তু গাড়িতে বসে মিনিট কতক ধরে কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মহিলার মুখখানা যেমন করুণ তেমনি কমনীয়। এরকম একখানা মুখ কোথাও কোনদিন দেখেছে কিনা ভাবতে চেষ্টা করল। মনে পড়ছে না। অথচ মনে হচ্ছে, জিজ্ঞাসা করলে ভালো হত, কি চাই বা কার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন।

শংকর বোস মনের রোগের ডাক্তার। মানসিক চিকিৎসার প্রায় যাবতীয় দিশী বিলিতি ডিগ্রী ডিপ্লোমা তার দখলে। বহু বিচিত্র ধরনের রোগী-রোগিণী দেখে থাকে, সেই সঙ্গে তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আত্মীয়-পরিজনদের দেখেও অভ্যস্ত। তার মধ্যে ওই মহিলাকে দেখে হঠাৎ ওই গোছের অস্বস্তি কেন নিজেই ঠাওর করতে পারল না।

অবশ্য পরের পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ওই প্রসঙ্গ বা ওই মুখ ভুলেই গেল।

॥ দুই ॥

ফিরল রাত আটটার পরে। অকারণেই ক্লান্ত লাগছে কেমন। অথচ সমস্ত দিনটাই হাসি-খুশির মধ্যে কেটেছে। তার মধ্যে ভাবী শ্বশুরের পাল্লায় পড়ে তার হিসেব-নিকেশের মধ্যে মাথা গলাতে চেষ্টা করে হাবুডুবু খেতে হয়েছে। শেষে তার দুর্দশা দেখে ক্লাবে নিয়ে যাবার নাম করে শিখাই তাকে উদ্ধার করেছে। ভাবী শ্বশুরের হিসেব-নিকেশ বিকেলের জন্য স্থগিত ছিল। কিন্তু লাঞ্চের পর বিশ্রামের অবকাশে বেলা তিনটের আগেই সে শিখাকে বাড়ি থেকে বার করে সোজা একটা বিলিতি সিনেমা হলে ঢুকেছে। তারপর আর ওমুখো হয়নি। একটু আগে শিখাই তাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে গেল। আর যাবার আগে শাসিয়ে গেল, আমিও বাবার দলেই জেনো। সামনের রবিবার আবার তোমাকে তাঁর খপ্পরে এনে ফেলছি।

দোতলায় পা দিতে বেয়ারা জানালো অপরেশবাবু সন্ধ্যে থেকে অপেক্ষা করে একটু আগে চলে গেলেন। এটা খবর কিছু নয়। অপরেশ হামেশাই এসে ওই কোণের ঘরের শয্যায় গড়াগড়ি খায়, আবার খেয়ালখুশি মতো একসময় উঠে চলে যায়। রাতে আবার থেকেও যায় অনেক দিন।

কিছু লিখে রেখে গেছে কিনা দেখার জন্য কোণের ঘরে ঢুকল। বিছানার ওপর কয়েকটা রেসের বই আর প্যাডের কাগজে কিছু হিসেবপত্র আর গোটাকতক নক্সা আঁকা। শংকর বোসের হাসি পেল। বছরের পর বছর ধরে এও এক-একটা হিসেব নিয়ে মেতে আছে। ওর বাবা মারা যেতে ভাইদের মধ্যে বিষয় ভাগ-বাঁটোয়ারার ফলে হাতে বেশ কিছু কাঁচা টাকা এসেছিল। চাকরির ধাত নয়, ব্যবসায় রাজা-উজীর হয়ে বসার সংকল্প। সেই ব্যবসা করতে গিয়ে চার ভাগের তিন ভাগ টাকা জলে গেছে। দুটো ব্যবসায় ঘা খেয়ে তৃতীয় দফায় কৃতনিশ্চয় হয়ে বিলিতি কায়দায় বড় রকমের পোলট্রি ফার্ম করেছিল একটা নিশ্চিন্ত ছিল, এবারের ব্যবসায় আর মার নেই। তা তাতে শুধু নিজের নয়, শংকর বোসেরও হাজার বিশেক টাকা জলে গেছে। বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে সে কোয়ার্টার পার্টনার করে নিয়েছিল জোরজার করে। বেচারার কপাল মন্দ। যা দিনকাল পড়েছে তাতেই দফা রফা। সব বোঝে এমন নির্ভরযোগ্য লোকের অভাবে অনেক পশু মরে গেল। আবার অনেক পশু দেশসেবী মাস্তানদের জঠরে গেল। সব শেষে জমি নিয়ে টানাটানি। তিক্ত-বিরক্ত হয়ে অপরেশ গুপ্ত সব জলের দরে বেচে দিল। সেই টাকা থেকেই বিশ হাজার টাকা ফেরত দিতে এসেছিল—শংকর বোস ওকে থাপ্পড় কষিয়ে বিদায় করেছে। কারণ তার লোকসান বত্রিশ হাজার টাকা, এই বিশ হাজার জুড়লে সেটা গিয়ে বাহান্ন হাজার দাঁড়ায়।

ওর কথা যখন ভাবে শংকর বোসের অবাকই লাগে। এ রকম বুদ্ধিমান পরিষ্কার মাথার মানুষ কমই দেখা যায়। অথচ সেই লোকের কিনা ব্যবসায়ে ঘা খেয়ে খেয়ে নাজেহাল অবস্থা। অনেকদিন বলেছে, তুই ব্যবসায় মার খাস কেন সেটাই একটা আবিষ্কারের বিষয়। অপরেশ কখনো মাথা চুলকে প্রসঙ্গ এড়াতে চেষ্টা করে, কখনো বলে নিজের তহবিলে দুপয়সা জমা হবার আগে যত শালার অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি শুনতে শুনতে মাথা খারাপ হয়ে যায়—ঘরে কিছু তোলার যো আছে!

সেদিন হেসে বলেছিল, বাইরে তোর ফাটা কপাল, আমারটা ভিতরে। ভিতরে বাইরে যে এত তফাত হয়ে যায় জানব কি করে!

শংকরের কপালের একদিকে চুলের নীচ থেকে আড়াআড়ি ভুরুর কোণ পর্যন্ত মস্ত একটা পুরনো ক্ষতচিহ্ন। ছেলেবেলার এক বড় অ্যাকসিডেন্টের ফল। কিন্তু লম্বা সুঠাম শরীরে ওই ক্ষতচিহ্নটা কুৎসিত তো দেখায়ই না, উল্টে যেন এক ধরনের পুরুষকারের মর্যাদায় বিরাজ করছে। শিখা একদিন বলেছিল, তোমার কপালের ওই কাটা দাগটা দেখলে আমার কেমন গা সিরসির করে, আবার ভালও লাগে। নিরিবিলি অবকাশে ওই ক্ষতচিহ্নের ওপর হাতও বুলোয় একটু-আধটু। শংকর একদিন হেসে বলেছিল, এত যখন পছন্দ, ভাবছি কপালের অন্য দিকটাও এরকম ফাটিয়ে নিলে কেমন হয়!

শিখা শিউরে উঠে হাত সরিয়ে নিয়েছিল।

বিছানায় রেসের বই, আর প্যাডের হিসেব, আর নক্সার তাৎপর্যও জানা আছে শংকর বোসের। কোনো কিছু গোপন করার ধাত নয় অপরেশের; বন্ধুর কাছে গোপন বলে তো কিছু নেই-ই। এ বন্ধুত্ব কম করে বিশ-বাইশ বছরের। ছেলেবেলা থেকে প্রথম কলেজ জীবন পর্যন্ত দুজনেরই কেটেছে জলপাইগুড়িতে। সেখানে অপরেশের বাবা ছিলেন কাঠের বড় কারবারী, আর শংকরের বাবা অল্প ফিয়ের জনপ্রিয় ডাক্তার। এই জনপ্রিয়তার দরুনই ডবল ফিয়ের ডাক্তারের থেকেও ভদ্রলোকের রোজগার বেশি ছিল। সেখান থেকে শংকর বোস কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে পড়তে আসে আর অপরেশ গুপ্ত কলকাতার বড় কলেজে। বিলেতের গোটাকয়েক বছর ভিন্ন এই দীর্ঘকালের মধ্যে দুই বন্ধুর ছাড়াছাড়ি হয়নি। তা অপরেশের বাপ তখন মরলে আর ওই বিত্ত হাতে এলে বন্ধুর সঙ্গে অপরেশও বিলেতে ছুটত বোধ হয়।

অপরেশ ভালভাবেই এম-এ পাস করেছিল, কিন্তু ওই বিদ্যে এযাবৎ কাজে লাগেনি। কিছু বললেই ফোঁস করে উঠত, বাপের ব্যবসার রক্ত বইছে ভিতরে, গোলামী করব কি করে! তিন-তিনবার মার খেয়ে প্রাপ্ত বিত্তের চার ভাগের তিন ভাগ জলে দেবার পর কিছুটা সমঝে চলছে। বন্ধুকে বলেছে, নিজের গাঁটের টাকা ভেঙে আর ব্যবসার মধ্যে নেই, তার ওই মাথার সঙ্গে অন্যের মূলধন যোগ হলে তবেই কিছু হতে পারে। কিন্তু শংকর বোস ঠিক জানে ওর মগজে ঠিক মতো কেউ সুড়সুড়ি দিতে পারলে বাদবাকি যা আছে সব ঢেলে আবারও একটা-না-একটা ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়বে, আর উত্তেজনার মুহূর্তে যে কোনো শর্তে মোটা টাকা ধার করতেও দ্বিধা করবে না। তাই বিশ্বকাপের হার-জিত নিয়ে বাজি জেতার পরেই হুকুম করেছে, তোর ব্যাঙ্কের কোথায় কি পাস বই আছে সব নিয়ে আয়।

নিয়ে এসেছে। তার সামনেই সেগুলো নিয়ে নিজের ব্যাঙ্কের লকারে পুড়েছে। বলেছে, এক বছর এগুলো এখন এখানে থাকবে। সুদের টাকায় চালাতে পারো চালাও নইলে মাসির ক্যাশ ভাঙো।

অপরেশ গুপ্ত থাকে মাসির কাছে। মাসি নিঃসন্তান এবং সেই কারণে একটু বেশি স্নেহপরায়ণ। অপরেশ গুপ্ত নির্দ্বিধায় সেই স্নেহের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে থাকে। মেসো সরকারী আপিসের বড় চাকুরে। বুদ্ধিমান কিন্তু নিঃসন্তান স্ত্রীর অনুগত। ফলে আদরের বোন্‌পোর দাপট তাঁকেও অনেকটা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। দুই বন্ধুকে একসঙ্গে পেলেই মাসি গালাগাল শুরু করেন। প্রায়ই বলেন, দুজনকে একসঙ্গে দেখলেই তাঁর চোখ কটকট করে, বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, যে-যার ছাড়া গোরুর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিনও এই নিয়ে অপরেশ মাসির হাতের চাঁটি খেয়েছে। মেসোর সামনেই মাসির

ভুল শোধরাতে চেষ্টা করেছিল, গ্রামার ঠিক রেখে কথা বলো মাসি, ষাঁড়কে গোরু বলা অপমানের সামিল!

আলাপন সেদিন আরো মুখরোচক হয়ে উঠেছিল। চাঁটি খাবার পর অপরেশ বলেছিল, ওকে আমার দলে টেনে আমার গর্ব খর্ব করছ কেন মাসি, ও তো নোঙর ফেলেই আছে, বাপটা নেহাত শক্রতা করল বলেই এক বছরের জন্য খালাস।

মাসি বলেছেন, বেশ এরপর তোর কি হাল হয় দেখব, ওর বউকে আমি শিখিয়ে দেব তোকে দেখলে যেন মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়।

নিরীহ মুখ করে অপরেশ বলেছে, কেন, আমি কি তার ওপর হামলা করতে যাচ্ছি!

মেসো উঠে গেছেন। মাসি বলেছেন, ফের মার খাবি তুই। কেন, দেখেশুনে তুইও একটা ব্যবস্থা কর—

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়েছে অপরেশ।—মাসি, প্রাণে দাগা দিয়ে প্রাণের কথাটা বার করে নিচ্ছ। এতদিন এত মেয়ে দেখলাম, একটার দিকেও ভালো করে তাকালাম না, কিন্তু যেই এই ছোঁড়া একটার দিকে নজর দিল, আমারও যোগ্য পাত্রীটি হাতছাড়া হয়ে গেল। বুকের ভিতরে সে কি যে জ্বলুনি তুমি জানবে কি করে মাসি!

শংকর বোস তক্ষুণি বলেছিল, আচ্ছা তোর জন্যে আমি এটুকু ত্যাগ করতে রাজী আছি. তুই চেষ্টা কর—

আরো বড় করে তপ্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে অপরেশ বলেছে, চেষ্টা কি করে করব বন্ধু, শিখা দেবী যে তোমার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের রূপে মুগ্ধ, উদার হয়ে সেই রূপোর ছটাটুকু আমার নামে চালান করে দাও, তারপর তোমাকে এক হাত দেখে নিই। শূন্য সিংহাসনে আধুনিক দেবীর আসন পাততে গেলে সে ঝাঁটা হাতে তেড়ে আসবে।

ব্যাঙ্কের পাস বই নিজের দখলে না রাখলেও ওর মাথায় সর্বদাই বড়লোক হবার ফিন্দি-ফিকির ঘুরছে। ইদানীং রেসের ব্যাপারে নানারকম হিসেবে মেতে উঠেছে। ওর ধারণা, এ ক্ষেত্রে সাফল্যের পিছনে খুব সূক্ষ্ম অথচ জটিল কিছু অঙ্ক লুকানো আছে। সেই অঙ্কটি ঠিক ঠিক কষে নিয়ে আসরে নামতে পারলে বাজিমাত। এই লক্ষ্য নিয়ে সম্প্রতি সে ঘোড়ার সাতপুরুষের জন্মবৃত্তান্ত আর ঠিকুজি নিয়ে মেতে উঠেছে। সেই অনুযায়ী অঙ্ক কষে আর গ্রাফের পাতা ভরাট করে অতীতের ফলাফল মেলায়। অতীত মিললে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ বা মিলবে না কেন?

মুখে না বললেও শংকরের প্রায়ই মনে হয়, ওর বাবা ব্যবসা করতেন, ওর মধ্যেও যে সেই ব্যবসা-বুদ্ধি একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু তার থেকে ঢের বেশি আছে জুয়ার নেশা। সার্থকতার সিঁড়িগুলো ওর চোখে পড়ে না, একেবারে চূড়োর দিকে চোখ। সেখানে ওঠার তাগিদে চোখ-কান বুজে জীবনটাকে সঙ্কটের মধ্যে ফেলতেও ওর দ্বিধা নেই। শংকর বোস জানে, এর অনিবার্য ফল হতাশা। এর হাত থেকে বন্ধুকে উদ্ধার করবে কি করে সে ভেবে পায় না।

শোবার ঘরে এসে তার নাম-লেখা একটা খাম দেখতে পেল ট্রে-তে। স্ট্যাম্প নেই. অর্থাৎ এখানকারই কেউ দিয়ে গেছে। পিছন থেকে বেয়ারা জানালো, দুপুরে একজন মহিলা এটা রেখে গেছেন এবং অবশ্য সাহেবের হাতে দিতে বলেছেন।

কোনো রোগীর সমাচার হবে। অথবা নতুন কোনো রোগীর আবির্ভাব-সম্ভাবনা। উল্টে-পাল্টে দেখে খামটা রেখে দিল। ক্লান্ত লাগছে। আগে চান সারা দরকার।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সামান্য প্রসাধন সেরে নিল। এটা অনেক দিনের অভ্যাস, রাতে ভালো ঘুম হয়। কপালের ক্ষত দাগটার ওপরও পাউডার বোলালো একটু। ওটা চকচকে দেখতে, নিজেরও খুব মন্দ লাগে না এখন। এই দাগটা তাকে খানিকটা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে।

সচরাচর যা হয় না তাই হল। চিঠির ট্রে-টা ঘরের শো-কেসের ওপর থাকে। খামটার কথা বেমালুম ভুলে গেল। শিখার অভিযোগগুলো মনে পড়তে অন্যমনস্ক কৌতুকে হাসছিল অল্প-অল্প।

...তার বাবার হিসেবের খাতা থেকে মুক্তি পেলেও শিখা নিজেই তাকে অব্যাহতি দিতে রাজী নয়। বাপের ওপরে তার অগাধ আস্থা। তার বাবার একটা বৃহৎ পরিকল্পনা আছে। কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধুলো-মুঠো সোনা হবে বাবা-মেয়ের দুজনেরই সেটা স্থির বিশ্বাস। অবিশ্বাস অবশ্য শংকর বোসও করে না। এই রাস্তায় অনেকেরই ধুলো-মুঠো সোনা হচ্ছে সে নিজেই জানে।

অনুপম বিশ্বাস ইদানীংকালের বেশ নামকরা জেনারেল ফিজিসিয়ান। বয়েস হয়েছে, এই পসার আর খুব বেশি দিন থাকবে নিজেও আশা করেন না। ভদ্রলোক প্রথম জীবনেই প্রতিষ্ঠার চাঁদমুখ দেখেননি। অনেক বছরের ধকলের পর প্রৌঢ় বয়সে সাফল্যের মুখ দেখেছেন। টাকা জমিয়ে বেশি বয়সে বিদেশের গোটাকয়েক বাড়তি ছাপ নিয়ে আসার পর দিন ফিরেছে। তারপর থেকে মোটা রোজগারই করছেন কিন্তু সঞ্চয়ের পরিমাণ আশানুরূপ হবে কেমন করে। শুরুটাই যে অনেক দেরিতে।

সঞ্চয়ের তহবিল আশানুরূপ ভরাট না হবার আরো কারণ, ভদ্রলোকের ছয়টি মেয়ে। মেয়েরা মোটামুটি সুশ্রী হলেও রূপসী কেউ নয়। শিখার বাবা আর বোনেরা শিখাকে অবশ্য রূপসী ভাবে। প্রথম চার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তার মধ্যে প্রথম দুটো মেয়ের তো জমজমাট অবস্থা এমন। পরের দুটো মেয়েরও ভালই বিয়ে হয়েছে। শিখা পঞ্চম। শিখার পরের বোন বি-এ পড়ে, এবং বড়দের কাছে আর বাবা-মার কাছেও সে একেবারে ছেলেমানুষ।

জাঁকজমক করে পর পর চারটে মেয়ে পাত্রস্থ করতে ভদ্রলোকের যে টাকা খরচ হয়েছে, তা নেহাত কম নয়। সঞ্চয়ের তহবিল আধাআধি ঝাঁঝরা তাতেই। পরের দুই মেয়ের জন্যও প্রস্তুত আছেন। সেই অর্ধেকেরও অর্ধেক নিঃশেষ হবে তাতে। তারপর যা থাকল সেটা এমন কিছু নিশ্চিত হবার মতো নয়। জীবনযাপনের মান যে পর্যায়ে ঠেলে তুলেছেন—সে তুলনায় অন্তত নয়।

সেই কারণেই জামাইদের মধ্যে এই ভাবী জামাইটিকেই সব থেকে বেশি পছন্দ তাঁর। একই পেশার লোক, এবং শুরু থেকেই সাফল্যের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। শংকর বোস তাঁর ছাত্র, বিলেতে যাবার আগে এবং ফেরার পরেও অনেক ভাবে সাহায্য করেছেন ওকে। আর্থিক সাহায্য নয়, তাঁর উপদেশ সুপারিশ অনেক কাজে লেগেছে।

ভাবী জামাইকে নিয়ে এখন তিনি এক অবধারিত লাভের ব্যবসা ফেঁদে বসার পরিকল্পনায় মেতে আছেন। বিয়েটা এতদিনে হয়েই যেত। এবং হয়ে গেলে ভদ্রলোক আরো জোর দিয়ে জামাইয়ের মাথাখানা এর মধ্যে টেনে আনতে পারতেন। মাত্র দেড় মাস হল শংকরের বাবা মারা যেতে বিয়ে একটা বছরের জন্য পিছিয়ে গেছে। বছরখানেক আগেও আর একবার বিয়েটা হব-হব হয়েছিল, কিন্তু বিদেশের আমন্ত্রণে ছ'মাসের জন্য

শংকর বোস হুট করে দ্বিতীয় দফা আকাশপথে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল। ফেরার কথা চার মাসের মধ্যে, ফিরেছিল ছ'মাস বাদে।

খুব ভালো জায়গায় কাঠা-ছয়েক জমি কেনা আছে অনুপম বিশ্বাসের। সেই জমির দাম মন্দার বাজারেও কম করে লাখ দেড়েক হবে। সেই জমিতে জামাইকে নিয়ে বড় রকমের একটা মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের নার্সিং হোম ফেঁদে বসার ইচ্ছা ভদ্রলোকের। এই বিষয়গত নার্সিং হোম করার সংকল্প খুব স্বাভাবিক কারণেই দানা বেঁধে উঠেছে। প্রথম কারণ, ভাবী জামাই এই বিষয়েই বহু ছাপমারা ডাক্তার। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হলে এখনই রোগী দেখে কূল পেত না। আখেরে আরো কি হতে পারে ভদ্রলোক সেটা সহজেই কল্পনা করতে পারেন। দ্বিতীয় কারণ, জেনারেল নার্সিং হোমের কমপিটিশন বেশি। অন্যদিকে যে দিনকাল পড়েছে তাতে এই রোগের তুলনায় নামী নার্সিং হোমের সংখ্যা কম। তাই ডক্টর বিশ্বাসের হিসেবে, প্ল্যানমত কাজ হলে, এক বছরের মধ্যে মাসে পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা রোজগার করা কঠিন কিছু নয়। আর তার ফলে জামাইয়ের নিজস্ব পসারও বাড়বে বৈ কমবে না। কারণ ঐ নার্সিং হোমেই জামাইয়ের আলাদা চেম্বার থাকবে। ডক্টর অনুপম বিশ্বাসের ইচ্ছা তাঁর ওই জমির ওপর আড়াই লক্ষর মতো খরচ করে ভাবী জামাই দালানটা তুলুক। নামী এঞ্জিনিয়ারের এস্টিমেট অনুযায়ী আড়াই লক্ষ টাকা লাগবে প্ল্যানমাফিক দালান তুলতে। পরে আরো সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও থাকবে। বাদবাকি সরঞ্জাম এনে নার্সিং হোম সাজাতে যা লাগবে সেটা ডক্টর বিশ্বাস দেবেন। বিষয় এবং ব্যবসায় জামাই-শ্বশুরের আধাআধি বখরা থাকবে। তাদের নিজস্ব প্র্যাকটিসের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রস্তাব লোভনীয় কোনো সন্দেহ নেই। নাওয়া-খাওয়া ভুলে ডক্টর বিশ্বাস এখন এই স্বপ্নের মধ্যেই ডুবে আছেন। আর এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর তাঁর পঞ্চম কন্যাটিও। তার বাবাই তাকে উত্তেজনার খোরাক যুগিয়েছেন। প্ল্যানটা ভালোমতো মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

বোনেদের মধ্যে সদ্ভাব আছে বটে। কিন্তু তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু রেষারেষিও যে আছে শিখার কথাবার্তা থেকে শংকর বোস সেটা আঁচ করতে পারে। রেষারেষিটা বিশেষ করে বড় দুই বোনের সঙ্গে। তাদের একজনের স্বামী এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যবসার এক-চতুর্থাংশের মালিক, অন্য বোনের স্বামী এঞ্জিনিয়ারিং হার্ডঅয়্যার ব্যবসার এক-তৃতীয়াংশের মালিক। তাদের বড় ভাগ্যের তুলনায় নিজের ভাগ্য আগের চেয়ে বড়ো করে তোলার বাসনাটা শিখার মনে একটা তাগিদের মতই বাসা বেঁধে আছে। দিদিরা শুধু তাদের বড় রোজগেরে স্বামীর স্ত্রী, কিন্তু বাবার সঙ্গে এই ব্যবসায় নেমে পড়তে পারলে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব আস্তে আস্তে সে নিজের হাতে তুলে নেবে। শিখা বিশ্বাস না তখন শিখা বোস নিজের হাতে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার সুযোগ পাবে। বাবা এই লোভনীয় ভবিষ্যৎটাও ওকে দেখিয়ে রেখেছেন। শিখা তার পরেও আরো কিছু ভেবে রেখেছে।....বাবার অর্ধেক অংশ বাকি পাঁচ বোন ভাগাভাগি করে নিক। শিখা তাতে ভাগ বসাতে যাবে না। বাকি অর্ধেক অংশের মালিক তো সে-ই। এর উপর শংকর বোসের ভবিষ্যৎ জমাট প্র্যাকটিসের সঞ্চয় জুড়লে টাকার পাহাড়।

বাবার হিসেবের জাল থেকে শিখা আজ ওকে ছাড়িয়ে এনেছে বটে, কিন্তু এও শাসিয়েছে যে এভাবে আর বেশিদিন চলতে পারে না। মিথ্যে সময় নষ্ট করার কোনো মানে

হয় না। সুসময় বেশি দিন শিকেয় তুলে রাখলে পরে সেটা অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বলেছে, অপরেশ গুপ্ত যে ঠেস দিয়ে গেছে সকালে, সেটা কিছুটা সত্য হলেও পুরোপুরি সত্যি নয়। ক্লাবের প্রথম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শংকর বোস উপস্থিত থাকুক এটা সে চায় বটে, কিন্তু তার বাইরে বেরুনোর নামে ওর এত আপত্তির একমাত্র কারণ এ-ই নয়। তারও মতে ডাক্তারদের এরকম খামখেয়ালী হওয়া উচিত নয়, রোগীপত্র ফেলে কোন্ ডাক্তার এরকম হুটহাট করে বছরে চারবার করে বাইরে চলে যায়? সব মানুষেরই একটা পাকাপাকি লক্ষ্য ধরে চলা উচিত, ডাক্তারদের তো আরো বেশি, এবারে তাকে প্ল্যানমাফিক কাজে নামতে হবে, ইত্যাদি।

ট্রে-র খামটার কথা ভুলে শংকর বোস হালকা মেজাজে নিজের কথাই ভাবছিল। সত্যিই কি সে খামখেয়ালী মানুষের মতোই জীবনের এই একত্রিশটা বছর কাটিয়ে দিল? তার লক্ষ্য নেই, প্ল্যান কিছু নেই? ভাবতে মজাই লাগছে তার, কারণ কথাগুলো বলছে শিখা, যার লক্ষ্য বিয়ে, আর বিয়ের পর শংকর বোস কিছু করলে তার কর্তৃত্ব হাতে নেওয়া। মজা লাগছে কারণ, শংকর বোসের ধারণা, জীবনের শুরু থেকেই সে তার নিজস্ব সংকল্পের রাস্তা ধরে চলে এসেছে। যেমনটি চেয়েছে তেমনিই হয়ে আসছে, হচ্ছে। প্ল্যানের বাইরে সে এক পা'ও কখনো হাঁটেনি। কখনো দিবাস্বপ্ন দেখেনি। যা চেয়েছে সেই মতো কাজ করেছে, সেইভাবে এগিয়েছে। এই মুক্তির ফাঁকটুকু, শিখা আর তার বাবার চোখে যেটা খামখেয়ালীপনা, শংকর বোসের স্বভাবে সেটাও লোভের বস্তু। এটুকুও অনেক দিনের অনুশীলনে আয়ত্ত।

...ছেলেবেলা থেকে সংকল্প ছিল ভালো লেখাপড়া শিখবে, বড় হবে। সেই মতো পরিশ্রম করেছে, নিজেকে তৈরি করেছে। পরীক্ষার ফল কোনদিন ভালো ছাড়া মন্দ হয়নি। খুব ছোটবেলা থেকে মাঠের ভালো খেলোয়াড়দের কদর লক্ষ্য করেছে। ওর চোখে তারা নায়কবিশেষ এক-একজন। নিজেরও সংকল্প ছিল বড় প্লেয়ার হবে। এই চেষ্টার মধ্যেও ফাঁকি ছিল না। ফুটবল আর ক্রিকেট-বিজ্ঞানীর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই দুই খেলাতেও একাগ্র অনুশীলনে মেতেছে। কলকাতায় যখন পড়ে তখন এখানকার নামজাদা ক্লাবের কর্মকর্তাদেরও চোখ পড়েছে তার দিকে। কিন্তু তখন দায়িত্বজ্ঞান বেড়েছে, বিবেচনা-শক্তিও বেড়েছে। দুই বড়র মধ্যে কোন্ দিকটা বেছে নেবে চিন্তা করছে। চিন্তা করে পড়াশুনার দিকটাই বেছে নিয়েছে। অন্য দিকটাও তা বলে একেবারে বাতিল করেনি। আজও তাই কলকাতায় কোনো বড় খেলা হচ্ছে বা বাইরের কোনো বড় টিম আসছে শুনলে সেই আগের দিনের মতই উৎসাহ আর উদ্দীপনা তার। রোগীরা সে সময় চারদিক থেকে ছেঁকে ধরলেও তার ভিতর থেকে পিছলে বেরিয়ে গিয়ে অপরেশ গুপ্তকে নিয়ে সেই খেলার আসরে হাজির হবে। দু'জনের এরোপ্লেনের টিকিট ভাড়া গুনে বার-দুই বম্বে-দিল্লী-কলকাতা-কানপুর-মাদ্রাজের পাঁচ-পাঁচটা টেস্ট খেলাও দেখেছে ক্রিকেট মরসুমে।

শংকর বোসের এক কাকা ছিলেন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। বাবার নিজের ভাই না হলেও বাবাকে আর ওকে বড় ভালবাসতেন। থাকতেন ডেরাডুনে। প্রত্যেক ছুটিতে জলপাইগুড়িতে এসে ওদের কাছে থাকতেন। কাজের মধ্যে অবকাশের স্বাদ কত লোভনীয় হতে পারে এটা তার কাছ থেকে শেখা। বাবা দিবারাত্র কাজে ডুবে থাকতেন। দু'বেলা নাওয়া-খাওয়ার সময়ের ঠিক ছিল না। রাতের ঘুমের সময়টুকুও তাঁর নিজস্ব

নয়। ডাক পড়লেই হল। বাবা শংকরের চোখে একখানা যন্ত্রের মানুষ। এর একেবারে বিপরীত ব্যতিক্রম কাকা! তাঁর সঙ্গে নিরুদ্দিষ্টের মতো কত যে পাহাড়ে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে ঠিক নেই। কোনো বড় ছুটি-ছাটা হলেই শংকর তাঁর আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। আর আগে থাকতেই আসার জন্য চিঠির পর চিঠি লিখত। তাঁর সঙ্গে মেটিলি আর ডুয়ার্সের জঙ্গল যে কতবার গেছে ঠিক নেই। মা খাবার দিয়ে দিতেন সঙ্গে। সকাল থেকে সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত নতুন নতুন পাথর, লতাপাতা, গাছগাছড়া আর পোকামাকড় আবিষ্কার করে কাটত দুজনের। কোথাও কোনো অজানা পাখি দেখলে বা তার ডাক শুনলেও দু'জনে মাথা ঘামাত কি পাখি হতে পারে। অবকাশ ভরাট করার এমন নিটোল স্বাদ আর বুঝি হয় না।

কলকাতায় যখন মেডিক্যাল কলেজের উঁচু ক্লাসে পড়ে হঠাৎ একদিন বাবার টেলিগ্রাম পেল, মা মারা গেছে, শিগগির চলে এসো। শংকর স্তম্ভিত। মায়ের কোনরকম অসুখ বা শরীর খারাপের খবরও জানত না। বাবা বরং হাইপ্রেসারে ভুগছিলেন। বাড়ি এসে আরো হতচকিত সে। শুনল, মাঝে মাঝে মায়ের ঘুম হত না। ইদানীং সেটা আরো বেড়েছিল। সকাল পর্যন্ত জেগে কাটাতেন। ব্লাডপ্রেসার সত্ত্বেও বাবা আগের মতই দিবা-রাত্র ব্যস্ত। তিনিই মাকে ঘুমের ওষুধের একটা ফাইল দিয়েছিলেন। কিন্তু মা ঘুমের ওষুধ বড় খেতেন না। একদিন কি হল, বাবা দেখেন মায়ের ঘুম আর ভাঙে না। পরে একসময় দেখেন তাঁর বিছানার পাশে ঘুমের ওষুধের শিশিটা খালি পড়ে আছে।

মা একদিনেই চিরকালের মতো অনিদ্রা রোগ ঘুচিয়ে দিয়েছেন।

সে বিস্ময় আর সেই আঘাতই শংকর বোসকে এই মানসিক চিকিৎসার দিকে টেনেছে।

ভালোমত ডাক্তারি পাস করল। হাউস সার্জনের মেয়াদ ফুরোবার পরেই বিলেত যাবার কথা ভাবছিল। বাবা জলপাইগুড়িতে ডেকে পাঠালেন।

তাঁর ইচ্ছে, শংকর ওখানেই প্র্যাকটিস করুক। ফিল্ড তৈরিই আছে, সব দিক থেকেই সুবিধে হবে। সুবিধে যে হবে শংকর জানত। কারণ বাবা এখানে সমস্ত সাধারণ মানুষের প্রিয় ডাক্তার। কিন্তু এই সুবিধের ওপর শংকরের কেন যেন এতটুকু লোভ নেই। মা বেঁচে থাকলে সম্ভবত একবারও দ্বিধা করত না। নেই বলেই এই কর্তব্যপরায়ণ কলের মানুষটিকে সে এড়াতে চাইল।

ওর ইচ্ছের কথা শুনেও বাবা দুই-একবার বাধা দিলেন। এখানেই থেকে যেতে বললেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর জোর না করে ছেলের ইচ্ছেটাই অনুমোদন করলেন। কোনো স্কলারশিপ যোগাড় করে বাইরে যাবার চেষ্টার কথা ভাবছিল শংকর। বাবা বললেন, তার দরকার নেই, টাকা যা লাগে দেব।

বাবার ভালো রোজগার শংকর জানত, কিন্তু সেটা কত হতে পারে তা নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায়নি। বাবাই তাঁকে ডেকে কোথায় কি আছে না আছে বুঝিয়ে দিলেন। কারণ তাঁর হাই ব্লাডপ্রেসার, কখন কি হয় না হয় ঠিক নেই। তাই বাইরে যাবার আগে ছেলের সব জেনে আর বুঝে রাখা দরকার।

এই উপলক্ষেই শংকর বোস আবার একটু নতুন চিন্তা নতুন বিস্ময়ের খোরাক পেয়েছে। বাবার যা আছে তাতে কিছু আর না করলেও শংকরের একটা জীবন অন্তত মোটামুটি বিলাসিতার মধ্যেই কেটে যেতে পারে। বাবা দু'টাকা আর বাইরে বা দূরে গেলে চার টাকা ফিয়ের ডাক্তার। এত আছে সে কল্পনা করেনি।...একটা দৃশ্য তার চোখে ভাসল।

সমস্ত জীবনভোর যন্ত্রের মতো পরিশ্রম করার পর বাবা হঠাৎ একদিন নেই। তখন এই সমস্ত বিত্তের মালিক ও নিজে। বাবার জীবনের কি সার্থকতা এইটুকুই?

ভাবতে একেবারে নিরর্থক লাগল।...তাহলে কি, একনিষ্ঠ সেবা? সেটাই সার্থকতা? তাও নিছক সত্যি বলে মনে হয়নি শংকরের। তাহলে ঠিক এই পরিমাণ বিত্ত সঞ্চিত হত না বোধ হয়। ফি তো মাত্র দু'টাকা আর বেশি হলে চার টাকা, ভাবতে খারাপ লেগেছে, তবু ভেবেছে শংকর। আসলে বাবা কাজের দাসত্ব করেছেন, তার ওপর প্রভুত্ব করেননি। জীবনে অবকাশের স্বাদ বোঝেননি। বুঝলে, এই বয়সে এমন ক্লান্ত দেখাত না তাঁকে। আর হয়তো বা মাও ঠিক ওইভাবে ঘুমের আশ্রয় নিতেন না। মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু শংকর বোস তা যখন পাবেবে না তখন সেবার নামে কাজের এই দাসত্বও করতে পারবে না।

চার বছর বাইরে ছিল। চব্বিশের থেকে আটাশ। বাবার ধারণা ছিল ছেলে বড় সার্জন হতে গেছে। বড় মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানী আর মানসিক চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ হবার কথা তিনি কল্পনাও করেননি।

কিন্তু শংকর বোস ঠিক তার নিজের প্ল্যানমাফিক এগিয়েছে। বিষয়গত ডিগ্রী আর ডিপ্লোমা সব অনায়াসে যেন তার পকেটে এসে ঢুকেছে। ওগুলো তার দখলের বস্তু, ভিক্ষার নয়। বাইরে অনেক জায়গায় ঘুরেছে, আর এই বলিষ্ঠ স্বভাবের দরুনই সর্বত্র সমাদর পেয়েছে। যখন মেতেছে কাজের আনন্দে মেতেছে, কাজের দাসত্ব করেনি।

ফাঁক পেলে বিদেশের গ্রামে গ্রামে আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াত। কখনো সঙ্গী থাকত, কখনো বা একলা।...কাজের মধ্যেই একটি মেয়ের সঙ্গে খানিকটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মেয়েটি মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করত, নাম স্টিফানি—স্টিফানি শোর।

ছুটির অবকাশে বেড়াতে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে বসে সে হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা বোস, বাইরে তো সর্বদাই বেশ খুশি-খুশি ভাব দেখি তোমার, কিন্তু সেটা কি ঠিক?

হালকা কৌতুকে শংকর বোস পাল্টা প্রশ্ন করেছে, কেন বল তো?

—গ্রামে বা পাহাড়ে যখন তুমি একা একা ঘুরে বেড়াও তখন মনে হয় আসলে মানুষটা তুমি নিঃসঙ্গ!

শংকর বোস হেসে জবাব দিয়েছে, মনস্তত্ত্বের গবেষণায় তুমি খুব বেশি দূর এগোবে বলে মনে হয় না।

—কেন? কেন?

—আসলে আমার ভিতরটা যখন ভরাট হতে চায় তখনই আমি ওই রকম ঘুরে বেড়াই।

—তার মানে তখন তুমি নিঃসঙ্গই থাকতে চাও।

—চাই, আবার মনের মতো সঙ্গী পেলে আপত্তিও নেই।

সকৌতুক স্টিফানি জিজ্ঞাসা করেছে, মনের মতো বলতে...আমার মতো?

হাসিমুখে শংকর বোস মাথা ঝাঁকিয়েছে। অর্থাৎ তাই।

স্টিফানি বলেছে, তুমি একটি চাটুকারের অধম। ওর দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হেসেছে খানিক, তারপর আবার বলেছে, বোস, একটা কথার সত্যি জবাব দেবে?

—বাতাসটা অন্য রকম ঠেকছে, তবু বলো শুনি?

—ধরো, কোন মেয়ে যদি তোমাকে পছন্দ করে?

—করবে। তাতে আর বাধা কি?

—তারপর কি হবে?

—তারপর কিছু হতে হলে সেটা দু'জনের পছন্দসাপেক্ষ।

—উঁহু, মেয়েটা ধরো জানে তুমি নাগালের বাইরে, তোমার মধ্যে পছন্দ-অপছন্দের কোনো বালাই নেই—তখন কি হবে?

শংকর বোস তখনো হেসে জবাব দিয়েছিল, তখন আমি আমার ছোট্ট স্টিফানিকে আদর করে বলব, আমার জীবনের কারবারে তার এই পছন্দটুকু ছোট একটা মুক্তোর মতো স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে থাকুক। এর বেশি জটিলতার মধ্যে একে টানতে গেলে দু'জনারই লোকসান।

স্টিফানি শোর তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে মিটিমিটি হেসেছিল খানিক। তারপরে বলেছিল, তুমি একটা স্কাউন্ড্রেল, নিজেই নিজেকে এমন ভরাট করে রেখেছ যে সেখানে মেয়েদের ঠাঁই নেই এখন পর্যন্ত। এ ক'বছর তোমাকে দেখে দেখে আমার অবাক লেগেছে—প্রথমে ভেবেছিলাম দেশে তোমার কোনো সুইট-হার্ট আছে, এখন দেখছি তোমার সুইট-হার্ট তুমি নিজেই। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে আমার কি ধারণা জানো? তুমি নিজে না মজলে কোনো মেয়ে জীবনভোর তোমার মনের নাগাল পাবে না—নিজে থেকে কেউ সেধে এলে তার অদৃষ্টে দুঃখু আছে।

এর পাঁচ মাসের মধ্যে শংকর বোস দেশে ফিরেছে। তার আগের সন্ধ্যায় স্টিফানি শোর তার ঘরে এসেছিল। হাসিমুখে বলেছিল, যাবার আগে তোমাকে একটা সুখবর দেব বন্ধু আর একটা উপহার দেব। তোমার ছোট্ট স্টিফানি খুব শিগগীর মস্ত স্টিফানি ফ্রাংকলিন হতে চলেছে, মিসেস জর্জ ফ্রাংকলিন। তোমার মতো নেটিভ আর কে কেয়ার করে!

শুনে শংকর বোস যেমন অবাক তেমনি খুশি। জর্জ ফ্রাংকলিন ওদের এই প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা। যেমন জ্ঞানী তেমনি ভাল মানুষ। বয়েস স্টিফানির প্রায় ডবল। কিন্তু চেহারা ভাল, স্বাস্থ্যও মজবুত। পাগল নিয়ে কারবার আর পাগলের রাজ্যে বাস বলে তার স্ত্রীর বরাবরই অপছন্দ তাকে। শংকর শুনেছে বছর-সাতেক আগে দুটি ছেলেমেয়ে রেখে সেই মহিলা আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এতদিন বাদে ওই কাজ-পাগল ভদ্রলোক আবার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইবে, কেউ ভাবতে পারেনি। খুশিতে আটখানা হয়ে শংকর বলে উঠেছিল, হোয়াট্ এ সারপ্রাইজ! কি করে কি হল, অ্যাঁ? কোনদিন তো মাখামাখি দেখিনি, ভদ্রলোক কবে প্রোপোজ করল?

তেমনি হাসিমুখে স্টিফানি জবাব দিল, প্রোপোজ এক বছর আগেই করেছিল। আমি বলেছিলাম, আমার কাজ আগে শেষ হোক তারপর ভাবব। আসলে আমার মধ্যে থেকে একটা টানাপোড়েন চলেছে—মিসেস ফ্রাংকলিন হয়ে নিশ্চিন্ত হই কি মিসেস বোস হয়ে জ্বলেপুড়ে মরি! দু'য়েতেই লোভ, বুঝলে? সমুদ্রের ধারে সেদিন তোমার স্মৃতির মুক্তো কথাটা বড় ভালো লাগল—তোমার কাছে মুক্তো না ছাই, দু'দিনেই ভুলে মেরে দেবে—সেদিন থেকে আমি বরং একটা মুক্তোর স্বাদ পেয়েছিলাম। এই সঞ্চয় ভাঙিয়ে জর্জকে বরং সুখী করতে পারব। কিন্তু তোমাকে টানতে গেলে এটুকুও খোয়াব।

তারপর আচমকা স্টিফানি দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে একেবারে বুকের ওপর

টেনে এনেছিল। তারপর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে নিবিড় চুমু একটা। শেষে আবার ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল তাকে।

শংকর বোস বিব্রত এবং বিড়ম্বিত।—এটা কি হল...উপহার?

হাসতে হাসতে স্টিফানি জবাব দিয়েছে, হ্যাঁ, আর তোমার মুক্তোর দামও, আমি বিনামূল্যে কারো কাছ থেকে কিছু নিই না—বিশেষ করে যার মনের তলায় মেয়েদের জন্য এতটুকু ঠাঁই নেই সেই মানুষটার কাছ থেকে।

স্নান সেরে শয্যায় গা ছেড়ে দিয়ে শংকর বোস শিখার কথাগুলো ভাবছিল আর হাসছিল। আর সেই সঙ্গে এইসব পুরনো কথা মনে পড়ছিল।...শিখার অভিযোগ, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট, জীবন নিয়ে তার কোনো পরিকল্পনা নেই। হাসবে না তো কি? লক্ষ্যের বাইরে কোনদিন সে এক পা-ও ফেলেছে কিনা সন্দেহ। খাবার মতো সমস্ত জীবন কাজের দাসত্ব করে হঠাৎ একদিন মরে যেতে চায়নি। মনস্তত্ত্ব-বিশারদ জর্জ ফ্রাংকলিন বলত, বোস বড় ডাক্তার, কিন্তু তার থেকেও বড় দার্শনিক। জীবনের নানান দিক দেখা আর ভোগ করাই তার দর্শন।

শিখার কথা শুনে আরো হাসি পায় এই জন্যে যে শংকর বোসের স্থির লক্ষ্য আর পরিকল্পনার মধ্যে এযাবৎ মেয়েদেরই কোনো জায়গা ছিল না। সেটা স্টিফানি বুঝেছিল। কোনো মেয়েকে জড়িয়ে এ পর্যন্ত কোনো পরিকল্পনা দানা বেঁধে ওঠেনি। এ দিকটাই শুধু শূন্য ছিল। ভাবতে ভরসা পায় না, কিন্তু ভিতরে জানে এখনো শূন্যই আছে। স্টিফানির কথা মনে পড়লে তাড়াতাড়ি সেটা মাথা থেকে তাড়াতে চেষ্টা করে।...স্টিফানি বলেছিল, তুমি নিজে না মজলে আর নিজে থেকে কোনো মেয়ে তোমার জীবনে সেধে এলে তার অদৃষ্টে দুঃখু আছে। শংকর বোস ভাবতে চেষ্টা করে শিখার প্রতি ও মজেই আছে। বাবা হঠাৎ মরে না গেলে শিখা এতদিনে তার ঘরে জাঁকিয়ে বসত আর শংকর বোস তার প্রেমে হাবুডুবু খেত।

কিন্তু এই চিন্তার মধ্যে যে ফাঁক আছে সেটা নিজেই জানে। ফাঁক আছে, স্ত্রী সম্পর্কে আর সঙ্গিনী সম্পর্কে তার মনে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা ছিল না বলেই। যোগাযোগের প্রাধান্যে বিয়েটা হয়ে যাচ্ছে—হবে। আর এও জানে, এ-ব্যাপারেও নিজস্ব কোনো পরিকল্পনা থাকলেও সেই মানস-রমণীর সঙ্গে শিখা বিশ্বাস অন্তত খাপ খেত না।

জর্জ ফ্রাংকলিনের মন্তব্য অনুযায়ী শংকর বোস দার্শনিক বটে, কিন্তু সে দর্শনের ভিত শুধু শুদ্ধ বাস্তবের ওপর গড়ে উঠেছে। এই দর্শনের জগৎ তার কাছে স্বপ্নের জগৎ নয়। সে শ্রমের বিনিময়ে বড় হয়েছে। খেলাধূলা করতে গিয়ে কঠিন মাটিতে আঘাত খেয়ে আছাড় খেয়ে সেই বাস্তবে নিজের ভিতরটাকে পুষ্ট করে তুলতে পেরেছে। সেই ন্যাচারালিস্ট কাকার সঙ্গে বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে মাটি চিনেছে, পাথর চিনেছে, গাছগাছড়া, পশুপাখি, পোকামাকড় চিনেছে। এই মানুষের পরিকল্পনায় রমণীর পদার্পণ ঘটলে শিখা বিশ্বাস তার কতটা জুড়ে বসতে পারত? এমনিতেই কত সময় মনে হয়েছে, হেসে খেলে নেচে গেয়ে বেড়ানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা এই মেয়েদের যেন মাটির সঙ্গে যোগ কম। মেয়েগুলো যেন গোটাগুটি মেয়ে নয়, ওদের অনেকটাই শূন্য—স্বপ্নে ঠাসা। বিয়েটা বাস্তবের দিকে গড়াতে শংকর বোস এই চিন্তা ছেড়েছে। নিজের অগোচরে ভিতরটা খুঁতখুঁত করলেও সচেতন হওয়া মাত্র, সেই খুঁতখুঁতুনি বাতিল করে দেয়।

॥ তিন ॥

একে একে পেসেন্ট দেখে চলেছে শংকর বোস। কেউ রোগী, কেউ রোগিনী। বেশির ভাগই পুরনো কেস, কিছু নতুন। নতুন কেসে সময় বেশি লাগছে। চেম্বার-আওয়ার্স বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে আটটা। চেষ্টা করে তার মধ্যেই কাজ সারতে। কিন্তু প্রায়ই পেরে ওঠে না। না পারলে মেজাজ বিগড়োয়, কিন্তু সেটা প্রকাশ পায় না।

এদিন রাত ন'টা বাজল। তখনো দেখে টেবিলে দুটো স্লিপ। দুটো পুরনো কেস। ভাবল, যদি সম্ভব হয় বাইরের বসার ঘরে এসেই তাদের সঙ্গে কথা বলে বা সমাচার অনুযায়ী বিধান দিয়ে বিদায় করবে। ঘরে এনে বসালে মানসিক রোগীরা সহজে নড়তে চায় না।

তাই স্লিপ দুটো হাতে নিয়ে শেষের পেসেন্টের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজেও পাশের হলঘরে এসে দাঁড়াল। তারপরেই অবাক একটু। সেখানে দু'জন নয়, তিনজন বসে। দু'জন পুরুষ, একজন রমণী। অবাক হবার কারণ এই রমণীকে দেখামাত্র মনে পড়েছে, কাল শিখার সঙ্গে গাড়িতে ওঠার আগে এই মহিলাই দূরে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছিলেন।

তাকে দেখে পেসেন্ট দু'জনের সঙ্গে মহিলাটিও উঠে দাঁড়ালেন। পরনে কালকের সেই কালোপেড়ে শাড়ি, গায়ে সাদামাঠা জামা, সুশ্রী মুখে কালচে বাদামী ছাপ। ঘরের জোরালো আলোয় এই ছাপটুকু স্পষ্ট।

অপর দুই পেসেন্টের অভিবাদনের জবাবে মাথা নেড়ে শংকর বোস মহিলার দিকে এগিয়ে এলো প্রথম।

—আপনার নতুন কেস?

মুখের দিকে চেয়ে মহিলা সামান্য মাথা নাড়লেন। চাউনিটা বিষণ্ণ, কিন্তু তার মধ্যেও উৎসুক যেন।

—পেসেন্ট কে?

—আমার মেয়ে।

অসময়ে আসার দরুন শংকর বোস মনে মনে একটু বিরক্ত। কিন্তু মহিলাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আগের দিনের মতই কৌতূহল কেন যেন।—আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

—ঘণ্টা দেড়েক। অপলক চোখে তাঁর দিকে চেয়ে থেকে মহিলা জবাব দিলেন।

গলার স্বর শুনে বা চাউনি দেখে শংকর বোসের এরকম লাগছে কেন বুঝতে পারছে না।—আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চান?

—না, আমার একটু আলোচনা ছিল।

কথায় জড়তা নেই, দু'চোখ মুখের ওপর বড় বেশি স্থির। আলোচনা মানে এই দুই রোগী বিদায় করার পরেও কম করে ঘণ্টাখানেক সময়। দ্বিধাভরে জবাব দিল, রোগী না দেখে আলোচনার সময় আমি ঠিক পেয়ে উঠি না।

মহিলা তেমনি নিষ্পলক চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলেন, আমি তার জন্যেও ফীস্ দেব। কাল দারোয়ানের কাছে একটি চিঠি রেখে গিয়েছিলাম। আমার ডাক পড়বে ধরে নিয়েই অপেক্ষা করছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে শংকর সচকিত একটু। গত রাতের মুখবন্ধ খামটার কথা মনে পড়ল তক্ষুনি। সেটা নিশ্চয় ট্রে-তে তেমনি পড়ে আছে এখনো।—ও...আমি ঠিক খেয়াল করিনি,

আচ্ছা আপনার তো সময় লাগবে, আর একটু বসুন, আমি এই দুই পেসেন্টকে চট করে ছেড়ে দিই, কেমন?

মহিলা মাথা নাড়লেন। শংকর একজন পেসেন্টকে ইশারায় ডেকে চেম্বারে ঢুকে গেল। তারপর তাকে একটু বসতে বলে ভিতরের দরজা দিয়ে সোজা ওপরে চলে এলো। ওই মহিলাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার এরকম একটা অনুভূতি নিজের কাছেই বিস্ময়ের ব্যাপার।

ট্রে থেকে খামটা নিয়ে ছিঁড়ে পড়তে পড়তে নীচে নেমে এলো। কয়েক লাইনের ছোট চিঠি।—"একদিন পরিচিতা ছিলুম। এতকাল বাদে সেই পরিচয়ের সুযোগ নেবার চেষ্টাটা নানা কারণে বিড়ম্বনাজনক। তবু এত বড় হতে দেখে আশা হয়। সত্যিকারের বড়র অনেক গুণ শুনি। আমি একটিমাত্র মেয়ের কারণে বিপন্ন। তাই সাক্ষাৎপ্রার্থিনী। শুনলাম ছুটির দিনে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। কাল আসব। একটু সময় দিলে বাধিত হব।"

চিঠিতে নাম-ধাম কিছুই নেই। শংকর বোস আর একবার অতীত হাতড়ে বেড়ালো। কিন্তু এই মুখ মনে পড়ল না। অথচ কোনদিন কোথাও দেখেছে তাতে কোনো ভুল নেই।

মিনিট পনেরোর মধ্যে পুরনো রোগী দুটিকে বিদায় দিয়ে মহিলাকে ডেকে পাঠাল। দরজা ঠেলে তিনি ঘরে ঢুকলেন।

—বসুন।

তার দিকে চোখ রেখেই মহিলা ধীর ঠাণ্ডা মুখে সামনের একখানা চেয়ারে বসলেন। তার শ্রান্ত মূর্তি দেখে বললেন, এতখানি পরিশ্রমের পর এভাবে বিরক্ত করতে সংকোচ হচ্ছে, কিন্তু কি করব...

—বলুন! শংকর বোস বাইরে নির্লিপ্ত কিছুটা। কিন্তু মহিলাকে সে লক্ষ্য করছিল। বছর পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বয়েস হলেও মুখখানা কমনীয়; আর কি-রকম যেন কাছের মনে হয়। তার ওপর বাদামী-কাল্চে ছাপ দেখলে মনে হয় দীর্ঘকাল উনি সুখের মুখ দেখেননি। টাকা-পয়সার জোর না থাকলে অনেকে সামান্য পরিচয়ের সূত্রে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। সে-রকম কেউ কিনা তাও ভাবছিল।

মহিলা স্থিরনেত্রে ওই ক্লান্ত অথচ নির্লিপ্ত মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে বললেন, মেয়ের কথাই বলি?

পরিচয়ের ব্যাপারে তার আগ্রহ না দেখেই এই প্রশ্ন, শংকর সেটা বুঝে নিল—হ্যাঁ। তবে তার আগে আপনার নাম বলুন, আমাকে একসময় চিনতেন লিখেছেন!

শান্তমুখে জবাব দিলেন, মন দুর্বল তাই লিখেছিলাম...এতকাল বাদে নাম বললেও চেনার কথা নয়। চাউনি একটু নড়েচড়ে আবার কপালের ওপর এসে স্থির হল।—আচ্ছা, তোমার কপালে অত বড় কাটা দাগটা কেন. মনে আছে?

রিভলভিং চেয়ারে অনেকটা গা ছেড়ে বসেছিল শংকর বোস। আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসল। নিঃশব্দেই যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল একদফা। মুখের বিমূঢ় ভাব কেটে গিয়ে মহিলার মুখের ওপর দু'চোখ অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠতে লাগল।

—আপনি সুমিতা দেবী...মা---মানে মাসিমা?

ঠোঁটের কোণে বিষণ্ণ একটু হাসি দেখল শংকর বোস। জবাব দিলেন, এতকাল বাদে আর এত বড় হবার পরেও এখনো যদি মাসিমা বল তাহলে তাই...আমি তোমার সেই মাসিমাই বটে।

ভিতরে যে কি হুলুস্থূল কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে এত বড় হওয়া শংকর বোসের মুখ দেখে কেউ কল্পনা করতে পারবে না। তার ভিতরের সেই এগারো বছরের ছেলেটার অস্তিত্ব কি আজও মুছে যায় নি? সেই ছেলেটা যেন এক অপ্রত্যাশিত আনন্দে মাসিমা মাসিমা মাসিমা বলে চিৎকার করে উঠতে চাইছে! চেহারা অনেকটা বদলেছে, সেই কমনীয় সুশ্রী মুখের ওপর অনেক ক্লেশের ছাপ পড়ে গেছে, তবু শংকরের কি ভীমরতি ধরেছে—সেই মাসিমাকে দু-দুদিন দেখেও সে চিনতেই পারল না! নিজের আচরণের জন্য নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে বিলেত-ফেরত নামী ডাক্তার শংকর বোসের।

...বিশটা বছর কেটে গেছে। শংকরের বয়স তখন এগারো। এই মহিলার চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। বিশ বছর আগের সেই তিনটে মাসের প্রতিটা দিনের কথা মগজে দাগ কেটে বসে আছে। তা ভোলার উপায় নেই, কারণ আয়নার সামনে দাঁড়ালে বিশ বছর আগের কপালের ওই কাটা দাগ চোখে পড়বেই।

...পিসিকে ধরে, বাবা-মাকে অনেক বিরক্ত করে সেই প্রথম কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল। পিসি আর পিসেমশাই তখন কলকাতার বাসিন্দা। তাঁরা গিয়েছিলেন দার্জিলিং বেড়াতে। তখন শংকরকে জলপাইগুড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় ওদের জলপাইগুড়ির বাড়িতে দিন-পনেরো ছিলেন। এই হৃদ্যতার ফলে পিসির সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে কলকাতা দেখার বায়না ধরেছিল শংকর।

কলকাতায় আসার তিন দিনের দিন পিসি তাকে ছোকরা চাকরের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন কলকাতা দেখতে। ট্রামে চেপে দু'জনে মনের আনন্দে ঘুরছিল। বেরিয়েছিল দুপুরে। বিকেলের মধ্যে ফেরার কথা। কিন্তু কোথা দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে কারো হুঁশ নেই। শংকরের কাছে সেই কলকাতা তখন আজব দেশ। দু'দশ গজ পরে পরেই যেন দেখার উৎসব সাজানো। কোথাও ভিড় দেখলেই দু'জনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ছোকরা চাকরটার নাম এখনো মনে আছে শংকরের। সরযূ। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রাস্তার ম্যাজিক দেখছিল দু'জনে। হঠাৎ একসময় শংকর দেখে পাশে সরযূ নেই। ভিড় ঠেলে ভালো করে দেখার লোভে ও সামনে এগিয়ে গিয়ে থাকতে পারে সেকথা মনে হল না। এদিক-ওদিক তাকাতে মনে হল ওই যে ছেলেটা চলে যাচ্ছে সে-ই সরযূ। খেলাও তখন শেষ হয়ে এসেছে। অতএব শংকর ছুটল সেদিকে। কিন্তু গিয়ে দেখে সে সরযূ নয়।

ঘুরে দাঁড়াল। খেলা ভেঙেছে। লোকগুলো চলে যাচ্ছে। শংকর বিমূঢ় কেমন। তারপর সেদিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। ওই তো ওদিকের মাঠের ভিতর দিয়ে সরযূ যাচ্ছে। রাস্তা পেরিয়ে মাঠে এসে ওকে ধরতে সময় লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, কাছে এসে দেখে সে-ও সরযূ নয়। দূরের সেই খেলার জায়গাটা ততক্ষণে ফাঁকা।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে খোঁজাখুঁজি চলল। শংকর ধরে নিল সরযূ হারিয়ে গেছে। ওর নিজের কি অবস্থা তা নিয়ে তখনো অত চিন্তা নেই। পকেটেও পয়সা নেই। কিন্তু তাতে কি, ওই তো ওদিক থেকে এসেছে, হাঁটতে হাঁটতে একসময় ঠিক বাড়ি পৌঁছে যাবে।

চলছে তো চলেইছে। কিন্তু বাড়ির হদিস ঠিক যেন পাচ্ছে না। প্রাণপণে ঠিকানাটা মনে করতে চেষ্টা করছে। মনে পড়ছে না। রাস্তার নামগুলো পড়ে পড়ে এগোচ্ছে। ঠিক নামটা দেখলেই মনে পড়ে যাবে। প্রায় ঘণ্টা দুই হাঁটা হয়ে গেল। এর একটু বাদেই সন্ধ্যার ছায়া নামবে। এবারে শংকর ঘাবড়ে যেতে লাগল। কাউকে জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই। শুনেছে কলকাতার রাস্তায় ছেলেধরা কিলবিল করছে। কে ভদ্রলোক আর কে ছেলেধরা

চেনার উপায় নেই। পথ হারিয়েছি টের পেলেই তারা এসে রসগোল্লাটির মতো ওকে তুলে নিতে পারে। বড় রাস্তা ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তায় ঢুকে পড়ল। পিসির বাড়ির রাস্তাটা অনেকটা এই গোছেরই বটে। দোতলায় ফ্ল্যাট পিসির। উপরের দিকে চোখ রেখে প্রত্যেকটা বাড়ি লক্ষ্য করতে করতে এগোচ্ছে।

ওপরের দিকে চোখ রেখেই রাস্তাটা পার হচ্ছিল। ওদিকের ওই ফ্ল্যাটটা চেনা-চেনা লাগছে। মুহূর্তের হৈ-হৈ শব্দ একটা, তারপরই আচমকা প্রচণ্ড আঘাত একটা। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কপালের ওপর আবার আঘাত।

মাটি থেকে কে যেন তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। চারদিকে অন্ধকার, ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে আসছে, কিন্তু তারই মধ্যে একবার পরিষ্কার দেখতে পেল উদগ্রীব ব্যাকুল মুখে মাটি থেকে ওকে-তুলে নিয়েছে তার মা।

—মা! একটাবার মাত্র চিৎকার করে দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে চাইল তাকে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

চোখ মেলে দেখে সকালের মতো দিন। এক বিচিত্র জায়গায় শুয়ে আছে সে। আর মাথার কাছে ঝুঁকে আছে...মা নয়, কিন্তু সেই মায়ের মতোই মিষ্টি মুখ একজন...চোখ বোজার আগে যাকে আঁকড়ে ধরেছিল।

আস্তে আস্তে হাতটা মাথার দিকে তুলল। সমস্ত মাথা আর কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

তারপর জাগা আর ঘুমের মধ্যেই কাটতে লাগল। যখনি চোখ মেলে তাকায় দেখে ওই একজন মাথার কাছে বসে। দিনেও, রাতেও।

আস্তে আস্তে সবই বুঝতে পারছে শংকর। সে গাড়িচাপা পড়েছিল। এই একজন তাকে মাটি থেকে তুলে নিয়েছিল। তখন ভেবেছিল মা। এটা হাসপাতালের ছোট ঘর একটা। ওই যারা আসছে, ওষুধ দিচ্ছে তারা ডাক্তার আর নার্স।...শুধু সকাল দুপুর বিকেল রাত্রি মাথার কাছে এ কে বসে আছে জানে না।

দু'দিন দু'রাত শুধু তাঁকেই দেখল। সকলে জিজ্ঞেস করছে, কিন্তু বাড়ির রাস্তা বা নম্বর কিছুতে আর মনে পড়ছে না। পিসেমশাইয়ের নামটা শুধু বলতে পেরেছে। ভালো করে জ্ঞান হবার পর ওর কেবলই মনে হয়েছে মায়ের মতন এই যে একজন, এও যদি তাকে ছেড়ে চলে যায় তাহলে সব গেল! দু'হাতে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরেছে তাকে, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, যাবে না তো?

তিনি ঝুঁকে ওকে আদর করেছেন। গভীর মমতায় আশ্বাস দিয়েছেন—যাবেন না।

তিন দিনের দিন এই ঘরেই পিসিমা আর পিসেমশাইকে দেখল। তাঁদের দিশেহারা মূর্তি। সেদিন থেকে রাতে পিসিমাই ঘরে থাকছেন আর ওই মাসিমা দু'বেলা এসে এসে তাকে দেখে যাচ্ছেন। পিসির সাক্ষাৎ মেলার আগে শংকর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কে?

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তোমার মাসিমা।

এই মাসিমাকে আগে না দেখলেও ইনি যেন পিসির থেকেও আপনার জন। রাতে তাঁর বদলে পিসির এখানে থাকাটা শংকরের একটুও পছন্দ নয়। রোজ দু'বেলা আসার কড়ারে তাঁকে ছেড়েছে। এলে আঁচল ধরে থাকে, যেতে দিতে চায় না।

ছ'দিন কি সাতদিনের দিন শংকর আনন্দে আত্মহারা। এই ঘরেই এসে ঢুকল তার মা আর বাবা। আনন্দে কেঁদেই ফেলল সে। মা-ও কাঁদলেন। আর বাবার কাঁদো-কাঁদো গম্ভীর মুখ। তারপর থেকে শরীরের যন্ত্রণা আর জ্বর সত্ত্বেও শংকরের ফুর্তির মধ্যেই দিন কাটতে

লাগল। আরো মজা, সে জানে মায়ের বোন মাসি, কিন্তু দুজনে দুজনকে সেই প্রথম দেখল, প্রথম চিনল। আর এর সবটা কৃতিত্ব শংকরের নিজের বলে ধরে নিল! তারপরেও মাসি একদিন ওকে হাসপাতালে দেখতে না এলেও শাসায়, মাসি ফের এরকম অন্যায় করলে রাগ করে মাথার ব্যান্ডেজ খুলে ফেলবে আর ইচ্ছে করে রক্ত বার করবে।

তারপরেও মাসির না এসে উপায় নেই।

টানা এক মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল, আর তিন মাস এই কলকাতায়।

শংকর আস্তে ধীরে অঘটনের সবটাই জেনেছে, বুঝেছে।

ভয় পেয়ে সেই ছোকরা চাকর সরযূ আর বাড়ি ফেরেইনি মোটে। সোজা দেশে পালিয়েছিল। বাড়ির খোঁজে শংকর একেবারে উল্টোদিকে হেঁটেছে ক্রমাগত। সে ট্যাক্সি-চাপা পড়েছিল বাড়ি থেকে প্রায় ন'মাইল দূরে। সেই ট্যাক্সিতেই এই মাসিমা ছিলেন। চাপা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার লোক ট্যাক্সিঅলাকে ছেঁকে ধরেছিল, ছোট রাস্তায় কেন অত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল! মাসির মতে ট্যাক্সিঅলা জোরে চালাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু শংকর চাপা পড়েছে একেবারে নিজের দোষে। ওপরের দিকে চেয়ে হঠাৎ নাকি ছুটে রাস্তা পার হতে যাচ্ছিল। গাড়ি থেকে নেমে মাসি ছুটে ওকে তুলে নেয়, তারপর সেই ট্যাক্সিতে তুলে সোজা হাসপাতালে।

বাড়ির হদিশ না পেয়ে মাসি নিজে টাকা দিয়ে কেবিন ভাড়া করেন। নইলে হাসপাতালে বাইরের লোককে থাকতে দেবে কেন?

এদিকে পিসির বাড়িতে কান্নাকাটি। সমস্ত রাত ধরে খোঁজাখুঁজি করেছেন তাঁরা। থানায় খবর দিয়েছেন, অনেক হাসপাতালেও খোঁজ করেছেন। শহরের একেবারে অপর প্রান্তের হাসপাতালে ও থাকতে পারে কে ভাববে? তাছাড়া সঙ্গে সবযূ ছিল বলে এই অঘটনের চিন্তা তাঁরা খুব করেননি।

পরে বাবাকে-মাকে অনেকবার বলতে শুনেছে, এই মাসির জন্যেই তাঁদের ছেলে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। শংকরের নিজেরও তাই বিশ্বাস। সেই দুটো রাত মাসি না থাকলে কি হত ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

ওর স্বাস্থ্যের কারণেই আরো দু'মাস কলকাতায় থাকতে হয়েছিল। শংকরের বায়নার চোটে মাসিকেও সপ্তাহের মধ্যে বার দুই অন্তত পিসির বাড়িতে দেখতে আসতে হয়েছে। সেই প্রচণ্ড আঘাতে সব কিছু অন্ধকার হবার মুহূর্তে মা ভেবে যাঁকে আঁকড়ে ধরেছিল—সে যেন মায়ের থেকেও ওর বেশি আপনার জন মনে হয়েছে।

মাসি প্রথম যেদিন পিসির বাড়িতে দেখতে এলেন, সঙ্গে বছর-সাতেকের একটা ফ্রক-পরা মেয়ে। ফোলা ফোলা গাল, আদুরে চেহারা। আর মাসির থেকেও মিষ্টি মিষ্টি মুখ, কিন্তু মাসির মতো চাউনিটা অত নরম নয়। এসেই খরখরে চোখে খানিক দেখল ওকে। যেন ও কিছু দোষ করেছে। আর মাসি যে অত ওকে আদর করলেন তাও একটুও পছন্দ হল না।

মাসির মেয়ের নাম শুনল মিলু।

এগারো বছরের শংকরের কেন যেন এই মেয়েটার ওপর হিংসে হল। মাসির মেয়ে বলেই বোধ হয়।

তারপরেও মাঝে মাঝে মাসি তাঁর মেয়েকে নিয়ে আসতেন। কিন্তু সব দিন আনতে পারতেন না, মেয়ের স্কুল, আর মাসি বেশির ভাগ দিন আসতেন দুপুরে যখন ট্রাম-বাস

অনেকটা ফাঁকা। এত দূরের পথ, আসতে-যেতে অনেক সময় লাগত। মেয়ের স্কুল থেকে ফেরার সময় ধরে মাসিকে উঠতে হত। সেই জন্যেও ওই মেয়েটার ওপর শংকরের হিংসে হত।

যাই হোক মেয়েটা মাঝে সাঝে এলেও শংকরের সঙ্গে তার তেমন একটা সম্ভাব গড়ে ওঠেনি। মেয়েটাকে খুব দেমাকী মনে হত শংকরের।

এই দু'মাস বাবা পনেরো দিন অন্তর জলপাইগুড়ি থেকে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। সুস্থ হবার পর শংকরের পিসির বাড়িতে সর্বক্ষণ কাটাতে বিষম আপত্তি। তার বাইরে বেরুনো আর মাসির বাড়ি যাওয়ার বায়না লেগেই আছে। মাসির দিক থেকেও সনির্বন্ধ অনুরোধ তো আছেই। কৃতজ্ঞতা বোধে মা ছেলেকে নিয়ে মাসির বাড়িতেই প্রথম গেলেন একদিন। ব্যস. তারপর শংকরও আসবে না আর তাই শুনে মাসিও ছাড়বেন না। হৃদয়ের গ্রন্থি পড়লে এই রকমই হয় বোধ হয়। শংকরকে নিয়ে একে একে চারদিন থাকতে হয়েছে তাঁর বাড়িতে। আর জলপাইগুড়ি রওনা হবার আগেও দিনকতক।

মাসির বাড়িতে একটি নির্লিপ্ত মেসোও দেখেছে শংকর। তাদের মেয়েটা এরকম হল কি করে ভেবে পায় না। সর্বদা গোঁ, সর্বদা বায়না। ফোলা ফোলা মেয়েটাকে দেখলে আদর করতে ইচ্ছে করে, ধরে চটকাতে ইচ্ছা করে, কিন্তু স্বভাব তিরিক্ষি। শংকরের ওপর আরো বেশি।

একটু খাতির জমতে না জমতেই ঝগড়া। ঝগড়ার বাক্-বিন্যাসও অভিনব।

—বোকা কোথাকার, গাড়ি চাপা পড়তে গেছলে কেন?

রাগ শংকরেরও হতেই পারে। —তাতে তোর কি?

—ইস, আবার কি! রাগে চোখ-মুখ বিকৃত। আমার মা আমাকে ফেলে ক'দিন তোমার জন্য হাসপাতালে থাকবে কেন? কেন?

—আমারও তো মাসিমা।

—ওঃ, মা আগে না মাসি আগে?

—তাহলে আমি যদি মরে যেতাম?

সদুত্তর দিতে না পারলেও রাগে মুখ ভার। ছবির বই দেখতে দেখতে, খেলতে খেলতে, এমনি হঠাৎ-হঠাৎ শূন্য থেকে ঝগড়া টেনে আনে ওই আহ্লাদী মেয়ে। শংকরের খুব রাগ হয়, অথচ মেয়েটাকে ভালও লাগে।

দ্বিতীয়বারে অর্থাৎ জলপাইগুড়ি যাবার আগেও এমনি ঝগড়া করেছে। ওর মায়ের কাছে সেই জন্য বকুনিও খেয়েছে। কিন্তু ওর আসল রাগের কারণ, ওর মা কেন আর কাউকে ভালবাসবে! শুধু ওকে ভালবাসতে হবে, আর কাউকে নয়।

রওনা হবার সময় মাসির সে কি কান্না! মা ওদের বার বার জলপাইগুড়ি আসার নেমন্তন্ন করেছিলেন। মাসি কথা দিয়েছিলেন যাবেন। আসেননি। আর ওই মিলু, ভালো নাম মালবী, মায়ের কান্না দেখেই বোধ হয় ওর একটু মনখারাপ হয়েছিল। ওকে বলেছিল, আবার এসো।

শংকর বলেছে, আসব কেন, তুই তো আমার সঙ্গে খালি ঝগড়া করিস!

নিজের এই দোষটা একেবারে অস্বীকার করতে পারেনি। বলেছে, আচ্ছা এবার এলে আর অত ঝগড়া করব না।

কিন্তু আর দেখা হয়নি। জলপাইগুড়ি ফেরার পর প্রথম দু'বছর মাসির কাছে ঘন ঘন

চিঠি লিখেছে শংকর। মাসির জবাবও পেয়েছে। সব চিঠিতেই আসবেন লিখেছেন, কিন্তু আসেননি। চিঠি মালবীকেও লিখেছে। বড় বড় হরফে লেখা তারও জবাব পেয়েছে। ওইটুকু মেয়ের আর অমনি রাগী মেয়ের অমন সুন্দর হাতের লেখা দেখে কিন্তু শংকর অবাক হত। মিলু এমনও লিখেছে, শংকরদা চলে যেতে তার মন খারাপ হয়েছে, আবার কলকাতা এলে ও ঝগড়া না করতেই চেষ্টা করবে।

দু'বছরের মধ্যে মাসির বাড়ির চিঠিপত্র হঠাৎ একেবারে বন্ধ। চার-পাঁচখানা চিঠি লেখার পরেও না মাসির জবাব না মিলুর। শংকরের ভয়ানক অভিমান হল, কিন্তু মায়ের মুখে একটা কথা শুনে চমকে উঠেছিল। মা বলেছিলেন, কি জানি, অসুখ-বিসুখ হল কিনা কে জানে!

ভেবে-চিন্তে শংকর পিসিকে চিঠি লিখল। অতি অবশ্য তাঁকে মাসির বাড়ির খবর নিতে বলল। দিনকয়েক বাদে সেই চিঠির জবাব এলো। পিসি মাকে লিখেছেন। মিলুর বাবা হঠাৎ মারা যেতে সুমিতা মাসি ওই বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন কেউ তার হদিস দিতে পারেনি।

সেই একটা রাত চোখের জলে বালিশ ভিজিয়েছিল শংকর।

কলকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়তে এসেও ওই বাড়িটার সামনে দিয়ে কত হেঁটেছে, বোকার মত মাসির কত খোঁজ করেছে ঠিক নেই। তারপর জীবনের সে অধ্যায়ের পাতা ওল্টানো হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা হারিয়ে যায়নি।

মাঝের বিশটা বছর জোড়া লাগা সহজ নয়, কিন্তু সেটা যে কত সহজে জোড়া লেগে গেল, বড় ডাক্তার শংকর বোসের দিকে চেয়ে মহিলা তা অনুমানও করতে পারলেন না। কেবল বুঝলেন, পুরনো পরিচয়, দেখুক না দেখুক, তাঁকে চিনেছে।

—আচ্ছা, এবার মালবীর কি হয়েছে বলুন!

নিজেকে প্রস্তুত করার জন্যেই হয়তো সামান্য হাসতে চেষ্টা করলেন তিনি। বললেন, মিলুর নামটাও তোমার মনে আছে দেখছি—

জবাবে শংকরের গম্ভীর দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর থমকালো একটু। সেই চাউনিতে যে এগারো বছরের একটা ছেলের অভিমান পুঞ্জীভূত তা তিনি বুঝলেন না। শুধু ভাবলেন বাড়তি কথায় সময়ের অপচয় পছন্দ নয়। একটু ভেবে বললেন, মিলুর অসুখটা বিশেষ করে আমার কাছে ধরা পড়ে যেদিন ও পনেরো বছর পেরুলো। তার আগে ওকে অন্যরকম দেখতাম বটে, কিন্তু এতটা ভাবিনি। পনেরো পেরুতে ওর জন্মদিনে হস্টেল থেকে ওকে বাড়ি আনা হয়েছিল। .....ওর এক কাকা স্টুডিওতে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন ছবি তোলাতে। দু-দুটো ছবি তোলা হল, কিন্তু কিছুতেই ওকে একটু হাসানো গেল না, ওর কাকারও জেদ চাপল ওর হাসিমুখের ছবি একখানা তুলতেই হবে। রাগের চোটে ও এমন হেসে উঠল যে আমি অবাক, আর তারপরেই তেমনি আচমকা আবার কান্না। সেটা সামলাতে গিয়ে চেয়ার থেকে একেবারে মাটিতে পড়ে গেল।

হাতে খাম ছিল একটা, তার ভিতর থেকে কয়েকটা ছবি বার করলেন সুমিতা মিত্র তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই প্রথম দুটো ছবি, আর এটা শেষের হাসির ছবি

শংকর বোস উৎসুক আগ্রহে ছবি তিনখানা দেখল। সাত বছরের সেই মেয়ের মুখের আদলসুদ্ধ বদলে গেছে যেন। প্রথম দুটো ছবি যেন কচি মেয়ের কঠিন পাথরের মূর্তি।

তার পরেরটাতে সেই মেয়ের উৎকট বিকৃত হাসি—দু'চোখে যেন রাগ ঠিকরে বেরুচ্ছে।

শংকব হাত বাড়ালো, ও দুটো এখানকার ছবি?

মাথা নেড়ে ও-দুটোও এগিয়ে দিলেন তিনি। একটা কলেজ-স্টাফের সঙ্গে তোলা। একটাতে একা। মোটামুটি সুশ্রী, নিটোল স্বাস্থ্য। আরো সুশ্রী দেখাতে পারত, কিন্তু চুল টেনে বাঁধার দরুন ভিতরের একটা স্তব্ধ কঠিন অভিব্যক্তিই আগে চোখে পড়ে।

—ওর বয়েস এখন কত?

—সাতাশ।

—এ পর্যন্ত কোনরকম চিকিৎসা হয়নি?

—তেমন না। চিকিৎসার কথা ওকে বলবে কে?

—ওর ছেলেবেলায় আপনারা কোথায় ছিলেন?

—মিলু এখানেই থাকত, স্কুলের হস্টেলে থেকে পড়ত। আমি কখনো কলকাতায় থাকতাম, কখনো বাইরে।

—ঠিক আছে, তারপর বলুন।

সুমিতা মাসি বলে গেলেন, স্কুল-সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে থেকে মাসে মাসে মেয়ের সম্পর্কে তাঁরা চিঠি পেতেন। প্রথম দুই-একটা চিঠিতে অভিযোগের সুর থাকত। মেয়ে পড়াশুনায় ভালো, কিন্তু ভয়ানক অমনোযোগী। আর সেই অশোভন রকমের গোঁ। হেডমিস্ট্রেসের কথাও অনেক সময় অমান্য করে থাকে। দরকারী কাজ ভুলে যায়, আর এক-একসময় বেশি বিমর্ষ দেখা যায় তাকে। তাঁরা ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলে—

এই জায়গায় শংকর বাধা দিল। —দাঁড়ান, আপনারা বলতে আপনি আর কে?

হঠাৎ একটু বেশি থমকালেন যেন মহিলা। তারপর ঠাণ্ডা জবাব দিলেন, আমি আর ওর দূর সম্পর্কের সেই কাকা। ওর পড়াশুনার খরচ তিনি চালাতেন—

—আচ্ছা বলুন।

তেমনি সংযত গম্ভীর মুখে মহিলা জানালেন, তাঁরা দেখা করতে গেলে মিলু মায়ের দিকে ফিরেও তাকাত না। কাকাকে ভালবাসত, কাকার সঙ্গে কথা বলত। কাকার উপদেশ শুনবে কথা দিত। কিন্তু মা কিছু বলতে গেলে ভয়ানক রেগে যেত। উনি একলা দেখা করতে গেলেও খুব খারাপ ব্যবহার করত, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকত, কথা বলতে চাইত না। এরপর স্কুল থেকে একদিন পত্র এলো, মেয়ের আচরণের সঙ্গে মানসিক যোগ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তার গোঁ, তার অমনোযোগিতা আর তার কাজের ভুল আরো বাড়ছে। হঠাৎ হঠাৎ মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণার কথা বলে। সেই ক্লাস-সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিজের চোখেও দেখেছেন। স্কুলের ডাক্তার দিয়ে চক্ষু ইত্যাদি পরীক্ষা করানো হয়েছে, কিন্তু শরীরগত কোন গোলযোগ নেই।

আবার তাঁরা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, মেয়ে কাকার সঙ্গে গল্প করেছে, স্কুলের চিঠির কথা হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, অথচ মায়ের সঙ্গে অন্য সময়ের থেকেও বেশি দুর্ব্যবহার করেছে। মা দিনকতক ওকে নিজের কাছে এনে রাখার প্রস্তাব করেছিলেন, তার ফলে রাগে কাঁপতে কাঁপতে মেয়ের সে এক ভয়ানক মূর্তি।

এর কিছুদিনের মধ্যেই একটা বড় রকমের বিভ্রাট হয়ে গেল। বিনা অনুমতিতে হস্টেল কম্পাউন্ড ছেড়ে মেয়েদের বেরুবার নিয়ম নয়। কিন্তু ফাঁক পেলেই মালবী বাইরে এসে ঘোরাঘুরি করত। ধরা পড়লে শাস্তির পরোয়া করত না। দারোয়ানের চোখে ধুলো দিয়ে

একদিন বাইরে বেরুতে বেশ ভদ্রগোছের একটা ছেলে এসে ওকেই জিজ্ঞাসা করল, মালবী মিত্র কার নাম?

ও জিজ্ঞাসা করল, কেন?

ছেলেটা খুব ভদ্রভাবে ওকে জানালো, তার এক নিকট আত্মীয়া অসুস্থ হয়ে ওমুক হাসপাতালে আছে, গত রাতে ছেলেটি তাকে দেখতে যেতে পাশের বেডের এক মহিলা বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন এই স্কুলের ঠিকানায় এসে তাঁর মেয়েকে খবর দিতে যে তার মা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে এসেছেন, মেয়ে যেন অবশ্য একবার দেখতে যায়। পাশের বেডের সেই মহিলার নাম সুমিতা মিত্র। মিলুকেই অনুরোধ করল ছেলেটি, সে যদি মালবী মিত্রকে এই খবরটা দিয়ে দেয় খুব ভালো হয়।

যে মায়ের সঙ্গে এতদিন খারাপ ব্যবহার করে এসেছে সেই মা অসুখ হয়ে হাসপাতালে আছে শুনে ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। তক্ষুনি সে ছেলেটাকে জানালো, তারই নাম মালবী মিত্র এবং এক্ষুনি সে মাকে দেখতে হাসপাতালে যেতে চায়। শুনল, ছেলেটিও তখন হাসপাতালে তার আত্মীয়াকে দেখতে যাচ্ছে।

দুজনে একটা ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করার জন্য এগিয়ে যেতে দেখে একটা ট্যাক্সির ভিতর থেকে আর এক ছেলে মুখ বাড়িয়ে এই ছেলেটিকে ডাকছে। তারা বন্ধু বোঝা গেল। কোথায় যাবে শুনে নিয়ে সে ওদের নিজের ট্যাক্সিতে তুলে নিল। একটা শিখ ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলুর মাথাটা যেন ভয়ানক ঝিমঝিম করতে লাগল আর ভয়ানক ঘুম পেতে লাগল। তারপর কি হল কিছু মনে নেই।

চোখ মেলে দেখে রাত্রি। একটা অজানা অচেনা ঘরে খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছে সে। সেই ঘরে ওই ছেলে দুটো সমেত আরো দুজন লোক। তারা অবাঙালী। প্রথম খানিকক্ষণ মিলুর মাথায় কিছু ঢুকল না। মিলুর ঘুম ভেঙেছে ওরা জানে না। ওদের কথাবার্তা কানে আসতে লাগল। একটু একটু করে বুঝতেও লাগল। আর বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা পাথর হয়ে যেতে লাগল তার। এই ছেলে দুটোর সঙ্গে বাকি দুটো লোকের টাকা নিয়ে ঝগড়া বেধেছে। তারা বলছে, অনেক দিন ওৎ পেতে থেকে আর অনেক মাথা খাটিয়ে ভাল জিনিস সংগ্রহ করেছে—বেশি টাকা না দিলে তারা ওকে ছাড়বে না।

শেষে টাকার ফয়সালা হল। আর এও বুঝল, পরদিন সন্ধ্যায় তাকে অনেক দূরে কোথাও চালান দেওয়া হবে।

চারজনেই তারা খাটের সামনে এসে দাঁড়াতে মিলু সভয়ে চোখ মেলে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চার-চারটে ছোরা বার করে তারা ওর বুকে ছোঁয়াল। মায়ের অসুখের খবর যে দিয়েছিল সেই ছেলেটা বলল, একটা টুঁ শব্দ বার করলে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে। কলকাতা থেকে অনেক দূরে এনে ফেলা হয়েছে তাকে, গলা ফাটালেও কেউ টের পাবে না, মাঝখান থেকে প্রাণটা যাবে।

খানিক বাদে ওদের ডাকে একটা বিচ্ছিরি চেহারার মেয়েছেলে ওর খাবার নিয়ে এলো। মেয়েলোকটাও বাঙালী নয়।

খাচ্ছে না দেখে অবাঙালী দুটোর একজন ঠাস-ঠাস করে মিলুর গালে দুটো চড় বসিয়ে দিল। এত জোরে মারল যে তাতেই চোখে অন্ধকার। অন্যজন ছোরা উঁচিয়ে ভয় দেখাতে মিলু খেতে চেষ্টা করল।

আশ্চর্য, খাওয়া শেষ হতে না হতে আবার বেজায় ঘুম পেল তার। মিলুর হাতঘড়ি ছিল, এর আগে সময় দেখেছিল রাত আটটাও বাজেনি তখন।

মিলু একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই ঘুম ভাঙল সকাল ন'টার পর। মাথাটা অসম্ভব ভার তখনো। ঘরের দরজা খোলা। সেখানে দাঁড়িয়ে ওই বাঙালী ছেলে দুটো আর কুৎসিত চেহারার মেয়েলোকটা। যে ছেলেটা ওকে ভুলিয়ে এনেছে সে কুৎসিত রকম চোখ করে হেসে উঠে বলল, রাজকন্যা যে ঘুমিয়ে গেল! এখনো কত ঘুম বাকি?

মেয়েলোকটা ঠেলে ঠেলে তাকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিলে, তারপর বাইরে থেকে শিকল দিল। মিলু দেখল ভিতর থেকে বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নেই।

আধ ঘণ্টা বাদে দরজা খুলে সে আবার তাকে ঘরে নিয়ে এলো। তারপর ওদের সামনেই খেতে দিল। খেতে দ্বিধা দেখে মেয়েলোকটা বিচ্ছিরি হেসে জানালো, এখন খেলে ঘুমোতে হবে না, ঘুমোতে হবে আবার সেই সন্ধ্যায়—রামঘুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে বহুদূরে চলে যেতে পারবে।

মাথায় জল দেবার পর মিলুর মাথা তখন অনেক ঠাণ্ডা। তার ওপর সমস্ত রাত এত ঘুম! চুপচাপ খেয়ে নিল। সেই ছেলেটা লক্ষ্মী মেয়ে বলে রসিকতা করল। তার চাউনিটা আজ অদ্ভুত মনে হল। ওর দিকে বিচ্ছিরি করে তাকাচ্ছে আর চোখ চকচক করছে।

খাওয়া হতে না হতে ওরা তিনজনে মিলে ওর দু-হাত পিছমোড়া করে এমন বাঁধল যে যন্ত্রণায় অস্থির মেয়েটা। শক্ত করে মুখটাও বাঁধল পুরু কাপড় দিয়ে। তারপর দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

মিলু তারপর পাগলের মত ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখল। ঘরের দু-দুটো জানলা লোহার জালে ঘেরা, তার ওদিকে ঘষা কাঁচ। এত ব্যবস্থা না থাকলেই বা কি করত! দু-হাত তো পিছনে শক্ত করে বাঁধা!

ঠিক বারোটায় আবার দরজা খুলে ভিতরে এলো ওরা। বাঁধন খোলা হল। খেতে দেওয়া হল। ওই ছেলেটার চাউনি আরো বিচ্ছিরি। চোখে কিছু যেন একটা মতলব চকচক করছে।

মিলু যেটুকু পারল খেয়ে নিল। মেয়েলোকটা ওর গালে ঠোনা মেরে মেরে খাওয়ালো। কেমন ঢুলু ঢুলু লাল চোখ তার। কিছু নেশাটেশা করে বোধ হয়।

খাওয়া হতে ওরা আবার ওকে আগের মতো বেঁধে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে চলে গেল। যাবার আগে এই ছেলেটা কি একটা কুৎসিত ইশারা করে গেল।

খুব একটু একটু করে সময় কাটছে। ভয়ে পাথর। সন্ধ্যের পর ওকে কোথাও চালান দেওয়া হবে জানে, কিন্তু কিছুতেই ভাবতে পারছে না। কেবল অসহ্য যন্ত্রণা।

প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে বেলা তখন দুটো-আড়াইটে হবে—বাইরে থেকে দরজা খোলার শব্দ হল। মিলু তখন হাত বাঁধা অবস্থায় খাটিয়ায় বসে।

দরজা খুলে সেই ছেলেটা ঘরে ঢুকল। তারপর ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে হাসি-হাসি মুখে তার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, কি গো রাজকন্যে, কাল থেকে যে তোমার জন্যে আমার ঘুম হচ্ছে না!

কথার সঙ্গে সঙ্গে কি রকম একটা কটু গন্ধ নাকে এলো মিলুর। খারাপ কিছু খেয়ে এসেছে। হেসে বলল, মাইরি বলছি, বুকের ভেতরটা তোর জন্যে বড় ছটফট করছে।

এমন আর হয়নি। ওই আফিংখোর বুড়িকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে আর এক কৌটো আফিং দিয়ে তবে তোর কাছে আসতে পেলাম।

বলার সঙ্গে সঙ্গে হাতের এক ধাক্কায় ওকে খাটের ওপর শুইয়ে দিল। গায়ের জামাটা টেনে খুলে ফেলল, তারপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করল। তারপরেই মুখের বাঁধনটা টেনে খুলে দিল। আর মুখ দিয়ে দাঁত দিয়ে যেন গায়ের মাংস ছিঁড়ে নিতে চাইল। মিলু যাতনায় কুঁকড়ে উঠছে, আর্তনাদ করে উঠতে চাইছে পারছে না, নিজের মুখ চেপে ওর মুখ বন্ধ করে রাখছে পাজীটা, আর না পারলে জোরে চড়চাপড় বসিয়ে দিচ্ছে।

শেষে হাত খুলে দেবার প্রস্তাব করল ছেলেটা। বুকের ওপর ছোরা ঠেকিয়ে বলল, হাত খুলে দেবে, কিন্তু টুঁ শব্দ করলে বা বকাবকির চেষ্টা করলে কেটে টুকরো টুকরো করে রেখে যাবে ওকে।

ওকে ঠাণ্ডা দেখে হাত খুলে দিতে লাগল।

মেয়েটা বরাবরই হৃষ্টপুষ্ট। স্কুলে আগে দৌড়ঝাঁপ খেলাধুলো করত। হাতের বাঁধন খোলার সঙ্গে সঙ্গে আচমকা জোড়া পায়ের ধাক্কায় ছেলেটাকে খাটিয়া থেকে ফেলে দিল। তারপরেই ছিটকে উঠে দাঁড়াল। কোমরে শাড়িটা পর্যন্ত জড়ানো নেই, শুধু পেটিকোট। কি করবে ভেবে না পেয়ে মিলু ছুটে সামনের খোলা বাথরুমে ঢুকে গেল। তারপরেই দেখে ভিতরে শিকল নেই। পাগলের মতো জলভরা বালতিটা হাতে তুলে নিল, কিন্তু উত্তেজনায় বালতিটা হাত থেকে পড়ে গেল।

আর তক্ষুনি ছেলেটা বাথরুমে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা পাগলের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। বাথরুম জলময়—সেই ধাক্কায় অপ্রকৃতিস্থ ছেলেটা পা পিছলে চিৎপাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল—মাথাটা সজোরে মাটিতে ঠুকে যাওয়ার আওয়াজ হল। কিন্তু মিলু ততক্ষণে বাথরুমের বাইরে বেরিয়েই শেকলটা তুলে দিল।

ঠিক এক মিনিটের মধ্যে শাড়িটা জড়িয়ে নিয়েছে, তারপর মেঝে থেকে ছোরাটা কুড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সেই দরজাও বন্ধ করেছে। বুকের ভিতর ঠকঠক কাঁপুনি, শক্ত হাতে ছোরাটা ধরে পা টিপে নিচে নেমে এসেছে। নিচের ঘরে খোলা দরজার ওধারে মেয়েলোকটা মাদুরের ওপর পা ছড়িয়ে বসে ওদিক ফিরে ঝিমুচ্ছে।

মিলু পাশ কাটিয়ে এল। তারপর খুব সন্তর্পণে বাইরের দরজা খুলে একেবারে রাস্তায়।

...কাকার বাড়ি জানত। নিজেই সেখানে এসেছে। ইতিমধ্যে স্কুল থেকে খবর পেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা হুলস্থূল করে তাকে খোঁজা হয়েছে। পুলিসেও খবর দেওয়া হয়েছে। বাড়ি ফেরার পর কটা দিন ভয়ানক অস্বাভাবিক। হাতে তখন ছোরা নেই, কিন্তু পুরুষমানুষ দেখলেই যেন ছোরা উঁচিয়ে তাকে মারতে চায়। ওর সেই কাকাকেও। তখন অবশ্য দিনকতক ওকে ডাক্তার দেখাতে পারা গেছে। কাকা ওকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জোর করেই মিলু আবার হস্টেলে চলে গেল। সুমিতা মিত্রের বিশ্বাস, অসুস্থ হলেই আবার ওকে বাড়িতে এনে রাখা হবে সেই ভয়েই তারপর থেকে ও প্রাণপণ চেষ্টা করত ভাল থাকতে। কিন্তু হঠাৎ-হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় খুব কাহিল হয়ে পড়ত। আর সেই থেকে পুরুষমানুষের সামনে বড় একটা আসতে চাইত না। সর্বদা তাদের এড়িয়ে চলত।

ভালভাবে তারপর হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করেছে, বি-এ পাস করেছে, এম-এ পাস করেছে। এখন মেয়ে-কলেজে মাস্টারী করছে। বাড়িতেও কটা মেয়েকেও পড়ায়। কিন্তু পুরুষমানুষ সম্পর্কে ওর ঐ বিজাতীয় ঘৃণা। এ পর্যন্ত দুটো ভাল ছেলে ওকে বিয়ে করার

আগ্রহ নিয়ে এসেছিল। ও তাদের অপমান করে সরিয়ে দিয়েছে। কলেজের চাকরিতে ঢোকার পর এই তিন বছর হল মা-কে নিয়ে বাসা করে আছে। এখনো আগের মত কম কথা বলে, আগের থেকেও বেশি ভুলো মন। ভুল দেখিয়ে দিলে ভয়ানক রেগে যায়। প্রায়ই মাথার যন্ত্রণা হয়, এক-একসময় মনে হয় বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। তখনই অনেক সময় স্থানকালের ভুল হয়ে যায়, খুব সম্ভব ভাবে সেই সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে আছে, তখন কোন পুরুষমানুষ সামনে দেখলে মেরেও বসতে পারে।

নিঃশব্দে খানিকক্ষণে চিন্তা করে শংকর সামনের দিকে ঝুঁকল একটু।—আচ্ছা এবারে আমার কয়েকটা কথার জবাব দিন।......মালবী পুরুষকে ঘৃণা করে, তাদের এড়িয়ে চলে, কিন্তু আপনার প্রতি তার আচরণ কি রকম?

মুখখানা হঠাৎ বেশিরকম বিবর্ণ দেখালো সুমিতা মিত্রের। মৃদু জবাব দিলেন, ভালো না।

—আপনি তার সঙ্গেই থাকেন, তবু মেয়েদের মধ্যে একমাত্র আপনাকেই সে ঘৃণা করে?

উনি সামান্য মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ তাই।

—তার কারণও আপনি জানেন বোধ হয়?

আরো বিবর্ণ আরো পাংশু দেখালো মুখখানা। মুখের কালচে ছাপ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল।

শংকর বোস আবার বলল, আপনি এখন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছেন। আমার যেটুকু জানা দরকার, না জানলে চিকিৎসা করা যাবে না....আর চিকিৎসা ঠিকমত না হলে আপনার মেয়ে ভবিষ্যতে আরো বিপন্ন হবে।

একটা উদ্গত অনুভূতি সামলে নিয়ে সুমিতা মিত্র আস্তে আস্তে মুখ তুললেন। বিবর্ণ মুখখানা নিজের সঙ্গে যোঝার সংকল্পে স্তব্ধ যেন। মৃদু অথচ স্পষ্ট করে বলে গেলেন, মিলুর বাবা মারা যেতে দুটো বছর খুব বিপদের মধ্যে ছিলাম। তাঁর ধার-দেনা ছিল। সেসব শোধ করার পর একটা মাসও চলার মত অবস্থা ছিল না। আত্মীয়রা অনেকে আশ্রয় দিয়েছিল, কিন্তু কোনো আশ্রয় বেশি দিন টেকেনি।...প্রায় সকলের কাছ থেকেই আমাকে পালাতে হয়েছে। শেষে মিলুর কাকার আশ্রয় পেলাম, তিনি তখন বাইরে চাকরি করেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন।...তিনি বিবাহিত, একটি ছেলে আছে, তার বছরতিনেক বয়সের সময় স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আইন অনুযায়ী ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মিলু তাঁকে পছন্দ করত, আমিও সেটা নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ই ভেবেছিলাম।...কিন্তু সব থেকে বড় বিশ্বাসঘাতকতা তিনিই করেছিলেন। মিলুর বয়েস তখন এগারো, ঠিক তখন না হোক, আস্তে আস্তে ও সেটা বুঝতে পেরেছিল। কাকা তাকে কলকাতার হস্টেলে রেখে পড়ালেন কেন তাও বোধ হয় বুঝেছিল।

সুমিতা মিত্র চুপ করলেন। শংকর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু ডাক্তারের গাম্ভীর্যেই অনুভূতিটা আড়াল করতে চেষ্টা করল। কাল্‌চে ছাপপড়া মুখখানা একটু কঠিন দেখাচ্ছে এখন। মেয়ের মঙ্গলের জন্য তিনি গোপনতম অনুভূতিটাকে শক্ত হাতে নিঃশেষ করে দিলেন যেন।

শংকর জিজ্ঞাসা করল, মালবী মাইনে পায় কত?

—চারশো। তাছাড়া বাড়িতে কয়েকটি মেয়ে পড়িয়ে আরো আড়াইশো টাকা পায়।

—সে টাকা আপনার হাতে দেয়?

—না। নিজেই খরচ করে। টাকা তার ট্রাঙ্কে থাকে, তার একটা চাবি আমার হাতে দিয়ে রেখেছে। বলেছে, দরকার মত হাতখরচের টাকা নিতে! আমি আজ পর্যন্ত নিইনি। একটু থেমে আবার বললেন, আমাকে সহ্য করতে পারে না কিন্তু আমার এতটুকু অসুখ-বিসুখ হয়েছে শুনলে ডাক্তার ডেকে আনে, ওষুধপত্র এনে দেয়, কিন্তু নিজে সহজে কাছে আসে না।

শংকর আবার নিবিষ্ট মনে ভাবল খানিক। তারপর জিজ্ঞাসা করল, সেই ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে মিলুর যেসব কথা মানে বর্ণনা আমাকে দিয়ে গেলেন সে-সব কি সে নিজে আপনাকে বলেছে?

—ঘটনাটা মোটামুটি বলেছিল, আর পুলিসও এসে জেরা করেছিল। ওর মনের অবস্থাটা আর আরো অনেক কথা পরে ওর খাতা থেকে পেয়েছি।

শংকর বোস উৎসুক।—খাতা থেকে কি রকম?

—ওর একটা মোটা বাঁধানো খাতা আছে, বহুদিন ধরে ও তাতে অনেক কিছু লিখত। লেখা হলে সাবধানে সেটা বইয়ের আলমারিতে চাবিবন্ধ করে রেখে দিত। প্রায় এক খাতা ভরাট লেখা। সে-সব ফাঁকমত পড়ে আমার মনে হয়েছে ওর চিকিৎসার জন্য ওটা হাতে পেলে ডাক্তারের খুব সুবিধে হবে। তাই অনেক চেষ্টা করে সেটা আমি সরিয়েছি।

কিভাবে সরিয়েছেন শুনে শংকর মনে মনে তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারেনি। মেয়ের ভুলো মনের সুযোগ নিয়েছেন। কখনো চাবি ফেলে রেখে কলেজে চলে যায়, কখনো বইপত্র। সুমিতা মিত্র সেই বাঁধানো খাতাটা অনেক দিন পর পর এক জায়গায় রেখে দিয়েছেন। মেয়ে সেটা তোলপাড় করে খুঁজেছে। কোন সময় নিজেই পেয়েছে, কোন সময় বা উনি খুঁজে বার করে দেখিয়েছেন, দ্যাখ দেখি এটা নাকি?

মেয়ে ছোঁ মেরে খাতা নিয়ে নিয়েছে। নিজের ভুলের কথা নিজেও জানে তাই সন্দেহ হয়নি। বারকয়েক এই করার পর সেটা একেবারেই সরিয়ে ফেলেছেন উনি। তার আগেই বাড়িটা হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল। মেয়ে আধপাগল হয়ে খাতা খুঁজেছে—শেষে ধরে নিয়েছে হোয়াইটওয়াশের সময় জিনিসপত্র ওলট-পালট করতে গিয়ে ওটা খোয়া গেছে। দিনকতক খুব অস্থির হয়েছিল, তারপর আস্তে আস্তে আবার ঠাণ্ডা হয়েছে।

শংকর বলল, খুব ভালো করেছেন, সেটা আমার দেখা বিশেষ দরকার। এনেছেন?

—না। যেদিন বলবে এনে দেব।

কি বলতে গিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শংকর থমকে গেল। রাত এগারোটা বেজে গেছে। বলল, আপনি এখনো বাড়ি ফেরেননি দেখে আপনার মেয়ে চিন্তা করছে না?

—না। দু'দিনের জন্য সে শান্তিনিকেতনে গেছে। ছুটি পেলেই বেরিয়ে যায়। ...আরো একটু বলা দরকার, ওর চিকিৎসার ব্যাপারে কিছু অসুবিধে আছে—

শংকর বলল, রাত এগারোটা এখন, আজ আর কিছু শুনব না। তাছাড়া আমার একটু ভাবা দরকার, মেয়ে ফিরবে কবে, আপনি কাল আসতে পারবেন?

—পারব। ও পরশু ফিরবে।

—ঠিক আছে, অন্য পেসেন্ট আসার আগে...এই বিকেল চারটে নাগাদ আসুন। খাতাটা সঙ্গে আনবেন। এই ফোটো ক'টা আমার কাছে থাক এখন।

দুই-এক মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে সুমিতা মিত্র সোজা তাকালেন তার দিকে। হাতে ছোট

একটা ব্যাগ দেখা গেল। স্পষ্ট মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার অনেক সময় নষ্ট করেছি, কত দিতে হবে?

নির্লিপ্ত মুখ করে শংকর বোসও চেয়ে রইল একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করল, মেয়ের টাকা তো আপনি নেন না, এ টাকা কে দিচ্ছে?

—আমি। শেষ দুই একখানা গয়না ছিল, সে আর দরকার হবে না বলে বেচে দিয়েছিলাম।

আর কিছু না বলে শংকর টেবিলের বেল টিপল। বেয়ারা আসতে শুধু বলল, গাড়ি—

বেয়ারা চলে গেল। চেয়ার ছেড়ে শংকর এদিকে এলো, কিছু না বুঝে সুমিতা মিত্রও উঠে দাঁড়িয়েছেন। শংকর ঝুঁকে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তিনি বিমূঢ় ঈষৎ।

শংকর বলল, মাসিমা, তুমি আমার জীবনে হারিয়ে গিয়েছিলে সেটাই ভালো ছিল। তুমি আমার কেউ না জানি, কিন্তু আজও মনের মধ্যে কেউ একজন হয়ে ছিলে। এতকাল বাদে সেটুকুও কেড়ে নিতে এসেছ—সেই জন্যেই চিঠিতে পরিচয় দাওনি, আর সেই জন্যে ফীয়ের কথা বলতে পারলে। যাক, চিকিৎসা হলে তিনশো ছেড়ে তিন হাজার টাকাতেও না কুলোতে পারে, তাই টাকার কথা না ভেবে যদি আসতে রাজী থাকো তো কাল এসো। ড্রাইভার গাড়ি বার করেছে, আর রাত কোরো না, আর কাল এলে তাকে বলে দিও সে গিয়ে নিয়ে আসবে।

সুমিতা মিত্র নিষ্পলক চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। শংকরের কেমন মনে হল বহুকালের মধ্যে এই প্রথম কেঁদে একটু হালকা হতে পারলেন তিনি।

বিলেতফেরত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শংকর বোসেরও কিরকম যেন হয়ে গেছে ভিতরটা। এক হাতে তাঁর কাঁধ জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে তাঁকে গাড়িতে এনে তুলে দিল। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল, কাল চারটের সময় মনে করে এঁকে আবার বাড়ি থেকে এখানে নিয়ে আসবে।

॥ চার ॥

সমস্ত দিনটাই খুশি-খুশি ভাব শংকরের। ফোটোতে সাতাশ বছরের মালবীর মুখখানা অনেকবার দেখেছে। কিন্তু সেই ফোলা-ফোলা সাত বছরের আদুরে মেয়ের মুখখানাই চোখে ভেসেছে কেবল।

সাড়ে তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরেই মাসিকে আনার জন্য গাড়ি ছেড়ে দিল। দোতলায় উঠে দেখে শিখা তার অপেক্ষায় বসে আছে। তাকে দেখলে খুশিই হয়। হেসে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার?

শিখা বলল, ব্যাপার সীরিয়স, আমার মাথা খারাপ হয়েছে।

শংকর বোস সচকিত যেন, অ্যাঁ! আবার নতুন করে?

শিখা রাগতে গিয়েও হেসে ফেলল, বলল, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক করলে নিত্যি মাথা খারাপ হওয়া বিচিত্র নয়।...আর বসে না, ওঠো, এক্ষুনি বেরতে হবে।

—সে কি! কোথায়?

—দুপুরের দিকে বাবার এক মস্ত এঞ্জিনিয়ার এসে হাজির। সেই থেকে বাবা তাকে

নিয়ে পড়েছে। আমাকে সঙ্গে করে জমিটা দেখিয়ে এনেছে—তারপর সেই থেকে বাড়ির খসড়ার আলোচনা চলছে, তার মধ্যে আমাকেও ঠায় বসিয়ে রেখেছে, তোমাকে না পেয়ে আমার এই শাস্তি। তাই রাগ করে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে উঠে এসেছি। ভয় নেই, চেম্বারের আগেই ফিরতে পারবে। টেলিফোনে একটা না একটা অজুহাত দেখাতে বলে নিজেই চলে এলাম।

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে শংকর বোস বলল, ব্যর্থ অভিসার, এক্ষুনি একলাই ফিরতে হচ্ছে তোমাকে, আজ আমার চারটেয় চেম্বার।

বিকেল সাড়ে পাঁচটার এক মিনিটও আগে চেম্বারে ঢোকে না শিখা জানে। তাই অবাক একটু। —সে আবার কি?

—হ্যাঁ, আর বিশ মিনিটের মধ্যে আমি অন্য রাজ্যে চলে যাব।

—সীরিয়স কেস্ বুঝি?

—খুব।

ডাক্তারের মেয়ে শিখা বিশ্বাস, রোগের ব্যাপার সেও হাল্কা করে দেখে না। উঠল, তাহলে আমি পালাই, তোমার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, মায়ের দরকারে এখানে এসেই আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিয়েছি।

শংকর বলল, তাহলে বোসো, কেস নিয়ে যাঁর সঙ্গে বসব আমার গাড়ি তাঁকেই আনতে গেছে।

শিখা বিশ্বাস এবারে সত্যিই অবাক।—পেসেন্টকে?

—না, পেসেন্টের মাকে, অর্থাৎ আমার মাসিমাকে।

—কি কাণ্ড, এখানে তোমার মাসিমা কেউ আছেন জানি না তো! নিজের মাসিমা?

—না। নিজের থেকেও ঢের বেশি আপনার। পরে একদিন সব বলব'খন তোমাকে।

মেয়েলী কৌতূহলে শিখা আবার জিজ্ঞাসা করল, পেসেন্ট তাঁর মেয়ে না ছেলে?

—মেয়ে।

ছদ্ম কোপে শিখা চোখ পাকালো।

—বয়স কত?

—সাতাশ।

—দেখতে কেমন?

—ফ্রক-পরা, মোটাসোটা, ফোলা-ফোলা গাল, রাগ আর আদর-ঠাসা মুখ। চোখ বুজলেই দেখতে পাই।

শিখার বোধগম্য হল না কিছুই।—তার মানে?

—তার মানে সাত বছর বয়সে ওই রকম দেখেছিলাম তাকে।

শিখা হেসে ফেলল। তার পরেই গম্ভীর একটু। —তার মানে, মহিলা এলে বিশ বছর বাদে আবার তাকে দেখতে যাবে?

—তার উপায় নেই, আমার সেই সাত প্লাস কুড়ি বছরের পেসেন্ট এখন শান্তিনিকেতনে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন।

একটু বাদে ড্রাইভার সুমিত্রা মিত্রকে সঙ্গে করে দোতলায় নিয়ে এলো। এই রকমই নির্দেশ ছিল। হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে শংকর এক হাতে তাঁর কাঁধ জড়িয়ে ধরে ভিতরে নিয়ে এলো। ঘরে শিখাকে দেখে থমকালেন একপ্রস্থ। এই মেয়ের সঙ্গেই পরশু শংকরকে

গাড়িতে উঠতে দেখেছিলেন মনে পড়ল।

সৌজন্যের খাতিরে শিখা উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে নমস্কার জানালো।

শংকর বলে উঠল, ওই রকম নয়, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর।

অপ্রস্তুত-মুখে শিখা প্রণাম সারল। মাসি সঙ্কুচিত। তার মাথায় আলতো করে হাত ছুঁইয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে শংকরের দিকে তাকালেন। অর্থাৎ মেয়েটি কে?

শংকর বলল, ওর নাম শিখা। বাবা চোখ না বুজলে এতদিনে কেউ হতে পারত, এরপর আমি চোখ না বুজলে ভবিষ্যতে কেউ হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

অস্ফুট স্বরে সুমিতা মিত্র বললেন. বালাই ষাট—

হাসিমুখে শংকর শিখার দিকে ফিরল, এবারে গাড়ি নিয়ে তুমি পালাও, আমি এখন মাসির সঙ্গে বসব—

শিখা চলে গেল। মৃদু স্বরে সুমিতা বললেন, বেশ মিষ্টি মেয়েটি—

—বোসো মাসিমা, বোসো। শংকর উৎফুল্ল, তোমার থেকে বেশি মিষ্টি এখন আমার কেউ নয়। ভাল কথা, আজ ডাক্তার শংকর বোসের কাছে এসেছ, না তোমার সেই ফাটাকপাল শংকরের কাছে এসেছ?

সুমিতা না হেসে পারলেন না। মুখের দিকে চেয়ে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, কাল যা বলেছ তারপর আরো বলতে চাও?

হাসিমুখে শংকর তাঁকে টেনে ডিভানটার ওপর বসালো, তারপর গাঁ ঘেঁষে নিজেও পাশে বসে পড়ল।—আচ্ছা আর বলব না, কিন্তু দেখো মাসি একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, তোমার সেই কপাল-ফাটা শংকর এখন একেবারে চোখ ফাটা হয়ে গেছে—ফের রাগালে সাংঘাতিক মূর্তি দেখবে।

সুমিতা চেয়েই আছেন।—আর রাগাব না।

—গুড। চা খাবে?

—খাই না।

একনজর ভালো করে দেখে নিয়ে শংকর মন্তব্য করল, কিছুই তো খাও না মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, মেয়েকে যদি তোমার একেবারে ভালো করে তুলতে পারি তাহলে ফীজ আদায় করে ছাড়ব—অর্থাৎ তোমাকে আবার সেই হাসি-খুশি মাসিটি হতে হবে।

সুমিতা মিত্র চেয়ে আছেন তার দিকে। দু-চোখ চকচক করছে। মৃদু জবাব দিলেন, ভাল হলে হব—কিন্তু মিলু যে আমাকে সব থেকে বেশি ঘৃণা করে।

—সব থেকে বেশি ভালওবাসে, আমার কাছে ক'দিন তোমাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল বলে ওর সেই রাগ দেখিনি! ভালো হলে ওর ঘৃণা একটুও থাকবে না, শুধু ভালবাসাই থাকবে।

সুমিতা মিত্র নির্বাক। বিশ্বাস করবেন কি করবেন না জানেন না যেন।

—সেই লেখার খাতা এনেছ?

আঁচলের তলা থেকে বইয়ের মতো লাল-টকটকে একটা মোটা বাঁধানো ডায়েরি বার করে তার হাতে দিল। লাল জ্যাকেটের ওপর দুই একটা কালির ফোঁটার দাগ। হাতে নিয়ে মলাটটা আগে উল্টে-পাল্টে দেখল শংকর।—এই রকম লাল রঙই ও বেশি পছন্দ করে?

—ঠিক জানি না, জামাকাপড় তো বেশির ভাগ সাদাই পরে।

আঙুলের চাপ দিয়ে ফড়ফড় করে পাতাগুলো উল্টে দেখল একবার।...বাঃ, চমৎকার হাতের লেখা তো!

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাসি বললেন, অনেক কিছুই ভালো ছিল বাবা...সবই আমার অদৃষ্ট।

—কিছু ভেবো না। নিজের মনের কথা কাগজে লেখে ডাক্তারের কাছে এটাই মস্ত আশার কথা। কিন্তু তুমি ব্যস্ত হলে চলবে না, এ চিকিৎসা সাধারণত সময়সাপেক্ষ।

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি চেষ্টা করছি জানলেই ক্ষেপে যাবে, চিকিৎসা করবে কি করে?

একটু ভেবে শংকর বলল, ধর পুরনো পরিচয়ে যদি তোমার সঙ্গে দেখা করি?

চিন্তাচ্ছন্নের মতো মাথা নাড়লেন, ও তোমার ধারেকাছেও ঘেঁষবে না, তুমি চেষ্টা করতে গেলে অপমান করে বসবে। তাছাড়া সময় লাগবে বলছ, একনাগাড়ে তো বেশিদিন পাবেও না, এই তো সামনের পুজোর ছুটি এলেই বেরিয়ে পড়বে, ধরে রাখা যাবে না।

শংকর উৎসুক হঠাৎ, পুজোর ছুটি তো মাসখানেকের মধ্যেই? কোথায় যাবে?

—পাহাড়ে। হরিদ্বার ছাড়িয়ে কোথায় যাবে শুনছিলাম। আমাকে বলে না কিছু, মেয়েদের মুখে শুনছিলাম।

—তুমি সঙ্গে যাবে?

—না। মেয়েরা কেউ কেউ সঙ্গে থাকতে পারে।

শংকর দ্রুত চিন্তা করছে। একটা ভালো মতলব মাথায় এসেছে তার। এরকম রাস্তা ধরে চিকিৎসার কথা এক শংকর ছাড়া বোধ হয় দুনিয়ার আর কোন ডাক্তার ভাববে না। মাসির কারণে নয়, শংকর যেন নিজের তাগিদে ভাবছে। খুব ভাল কথা, ও ট্রেনের কোন্ ক্লাসে যায়?

—ফার্স্ট ক্লাসে। ভিড় পছন্দ করে না, এই বাড়তি খরচের জন্য তাই অনেকদিন আগের থেকে প্রস্তুত হয়।

—আরো ভালো। শংকরের উৎসাহ বাড়ছে।—ও ঠিক কবে কোথায় কোন্ গাড়িতে যাবে আমাকে আগে জানাতে পারবে? জানাতেই হবে যেমন করে হোক। ফার্স্ট ক্লাসের রিজারভেশন তো বিশ দিন আগে হয়—তারও আগে আমার জানতে পারা চাই। চাই-ই, বুঝলে?

সঠিক না বুঝলেও সুমিতা মাথা নাড়লেন।

শংকর আবার জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা চেষ্টা করে ওর টিকিট কাটার ভারটা তুমি নিতে পার না?

একটু চিন্তা করে জবাব দিলেন, আমি না পারলেও খুব অসুবিধে হবে না। অনেক দিনের একটা বুড়ো চাকর আছে আমাদের, নাম হীরা, টেলিফোনে ব্যবস্থা করে আর ফর্ম-টর্ম লিখে দিয়ে মিলু তাকেই পাঠায় টিকিট আনতে। সে আমাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, দিদিমণির অসুখের কথাও জানে। ওকে বললে আমার কথামতো কাজ করবে।

—ওয়াণ্ডারফুল। বললে নয়, তুমি এখন থেকেই সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখো। তারপর সব ভাবনা-চিন্তা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো।

সুমিতা অবাক চোখে চেয়ে রইলেন খানিক।—তুমি কাজকর্ম ছেড়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে নাকি?

শংকর হেসেই জবাব দিল, আমার মেজাজপত্র তুমি তো জানো না—ওই যে পায়ের তলায় সরষে না কি বল তোমরা, আমার তাই। পুজোয় বেরনো নিয়ে সেদিনও শিখার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। যাক এমনিতে না বেরোলেও তোমার জন্যে বেরোতাম, তুমি যে আমার কাছে কি এখনো জানো না। মোট কথা, মিলুকে ভালো করার সমস্ত ভার আমি নিলাম। তার জন্যে যদি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যেতে হয় তাও যাব। এই এক মাস তুমি শুধু একটা কাজ করবে, ওর এই সব লেখা পড়ে নিয়ে কাল আমি যে ওষুধ দেব, সেটা সকলের অজানতে ওর বিকেলের জলখাবার বা রাতের খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে—রোজ। ভয় নেই, রাতে ও একটু বেশি ঘুমোবে শুধু, আর সকালের দিকটাতেও হয়তো একটু-একটু ঝিমুনির ভাব দেখবে। এই করবে আর সপ্তাহে একবার করে যখন সুযোগ পাও লুকিয়ে এসে আমাকে খবর দেবে কেমন থাকে—অমন চেয়ে আছ কি? যা বললাম বুঝছ তো?

মাসি চেয়েই আছেন। দু'চোখ আগের থেকেও বেশি চকচক করছে। বললেন, বুঝছি বাবা, আমি কি সময়ই না নষ্ট করেছি। বাবা তো নেই বললে—মা?

হাসিমুখেই শংকর জবাব দিল, কেউ না, দুনিয়ায় কেউ নেই জানতাম. সবে কাল টের পেলাম মাসি আছে।

রাত্রি।

পাতার পর পাতা উল্টে শংকর লেখাগুলো পড়ছে। একাগ্র, নিবিষ্ট-চিত্ত। পরিচ্ছন্ন, মুক্তোর মতো হাতের লেখা। কিন্তু তার ভিতর থেকে প্রায় সব লেখাতেই পুরুষের বিরুদ্ধে আর নিজের মায়ের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ ঠিকরে বেরোচ্ছে তাও অভাবনীয়। প্রতিটি লেখার ওপরে তারিখ বসানো। সে-তারিখগুলো খুব বেশি পুরনো নয়। মনে হয় এম-এ পাস করার পর এই সব লেখা শুরু করেছে। মাথার দুঃসহ যন্ত্রণায় কথাও মাঝে মাঝেই লেখা আছে। কিন্তু তার থেকেও ঢের বেশি অব্যক্ত একটা মানসিক যন্ত্রণা লেখাগুলোর মধ্যে ফুটে বেরোচ্ছে।...ডাক্তার দেখানোর নামে মালবী ক্ষেপে ওঠে শুনেছে, কিন্তু এ যন্ত্রণা থেকে সে যে মুক্তি চায় তাও স্পষ্ট। অথচ মুক্তি যে পাবে না তাও একরকম ধরেই নিয়েছে।...মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় থামছে শংকর বোস। দু'বার তিনবার করে পড়ছে। ফোটো অনেকবার করে দেখেছে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই মালবীর মুখখানাও যেন চোখের সামনে ভাসছে।

"সেই শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পনেরো বছর বয়সে যে ধারালো ছোরাটা হাতে তুলে নিয়েছিলাম, এ পর্যন্ত কেউ সেটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারল না। সেটা বাক্সের তলায় পড়ে থাকলেও মনে হয় সর্বদা আমার হাতেই আছে। কোনো পুরুষ সামনে এগোতে চাইলে সেটা জিভ বার করে উঁচিয়ে ওঠে। ফালা-ফালা খণ্ড খণ্ড করে দিতে চায়? তাই করছে, তাই দিচ্ছে। ওটা আর কত রক্ত খাবে? ওটা কি এ-জীবনে আমাকে নিষ্কৃতি দেবে না? মা ওটার কথা জানে। ভাবে, ওটা বুঝি আমি তার বুকেই বসাতে চাই। বসালে শান্তি পাবে আমি জানি, এইজন্যেই ভয় পায় না। কিন্তু মাকে এর থেকেও ঢের কঠিন শাস্তি দিতে চাই আমি। সেটা কি আমি জানি না।...আমি হঠাৎ মরে গেছি জানলে শাস্তিটা কেমন হয়?"

"...রঞ্জন দত্তর কাছে এগোনোর মতলব। ছোরাটা বার করে তাকে দেখাবার সময় এগিয়ে আসছে মনে হয়। বার করলে বিকাশ সেনের অবস্থাও দাঁড়াবে যে তাতে কোনো ভুল নেই। মা, বিকাশ সেনের সামনেও আমি ছোরা বার করিনি, কিন্তু আমার দিকে চেয়ে ছোরাটা দেখতে পেয়েছিল সে। আমাকে বুকে টেনে মনের কথা বলতে চেয়েছিল। মিথ্যে কথা বলে আমাকে যখন বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তখনই আমি মতলব বুঝেছিলাম। কিন্তু বিকাশ সেনের মতো মিটমিটে বাঁদরকে খণ্ড খণ্ড করার জন্যে হাতে ছোরা নেবার দরকার হয়নি আমার। প্রথম দিনই ওর দিকে চেয়ে বাঁদরের আদল দেখেছিলাম। সব পুরুষের মধ্যেই একটা না একটা পশু আছে—আমি সেই ভিতরের পশুটাকে দেখতে পাই।...আমার হাতের আচম্‌কা ধাক্কা খেয়ে সেই বাঁদরটা নিজের বাড়িতেই কোথায় পালাবে ভেবে পায়নি। শক্ত না হয়ে করব কি, প্রশ্রয় দিলেই বাঁদরের মুখোশের ভিতর থেকে আবার সেই শয়তানটা বেরিয়ে আসবে, মায়ের অসুখের নাম করে যে আমাকে স্কুল থেকে বার করে নরকে নিয়ে গিয়েছিল। সব মানুষের মধ্যেই আমি একটা করে পশু দেখি, যে পশুর ভিতরে আবার সেই শয়তানটাও আছেই। মায়ের ধারণা, রঞ্জন দত্তও কলেজের মাস্টার যখন, ভালো মানুষ। আমি তার মধ্যে একটা গাধার মুখ দেখি। তবু ভালো যদি হয়, আর প্রাণে যদি ভয়-ডর থাকে, আমার ত্রিসীমানায় যেন না আসে। উঃ, মাথার বড় যন্ত্রণা!

"মায়ের চোখ দুটো লাল দেখছি। কান্নাকাটি করেছে বোধ হয়। আমি কি বলেছি বা কি খারাপ ব্যবহার করেছি মনে নেই। আজকাল এই রকম ভুল বাড়ছে আমার। মায়ের ওই মুখ দেখলে আমার কষ্ট হয়, কিন্তু আমি কি করব—মা আমার সব থেকে বেশি ক্ষতি করেছে। ওই মা আমার কাছ থেকে আমার মাকে কেড়ে নিয়েছে। একবার এক হাঁদা ছেলে রাস্তায় মোটর চাপা পড়েছিল, মা তাকে নিয়ে ক'দিন হাসপাতালে ছিল, ভাল হবার পরেও মা খুব আদর-যত্ন করত। কত আর বয়স আমার তখন, সাত কি আট, কিন্তু আজও মনে আছে, মাকে কাড়ছে বলে মাঝে মাঝে আমার ওই ছেলেটার মাথা ভেঙে দিতে ইচ্ছে করত। কিন্তু বাবা মারা যাবার দু'বছরের মধ্যে এ কি হয়ে গেল! (মাথায় বড় যন্ত্রণা) আমার সেই মা কোথায়? এই মা কাঁদবে না তো কি? উঃ, মাথার মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে কেউ, আর পারি না—

"আমার এত ভুলের উপায় হবে কি? স্টাফের অনেকে জানে আমার সব ব্যাপারে ভুলো মন। তারা ঠাট্টা করে, মনটা কোথায় বাঁধা দিয়েছ? শুনলে আমার ভিতর জ্বলে যায়। এই ভুলের খবর মেয়েরাও কেউ কেউ জেনে ফেলেছে। আগের দিন কি পড়িয়েছি পরের দিন ভুলে যাই। আড়ালে হয়তো তারা হাসাহাসি করে। কিন্তু আজ যে কাণ্ড করলাম, লোকে আমাকে পাগল বলবে না তো কি! মাথায় অল্প অল্প যন্ত্রণা হচ্ছিল, কলেজে যাব বলে খেয়েদেয়ে বেরোলাম, কিন্তু সব ভুলে দু'ঘণ্টা ধরে যে কোথায় কোথায় ঘুরলাম ঠিক নেই। ট্রাম থেকে আমি কোন্ রাস্তায় নামলাম হঠাৎ? ঘুরে ঘুরে আমি কি খুঁজছিলাম? কতকগুলো ছেলে আমার দিকে চেয়ে হাসাহাসি করছে দেখে খেয়াল হল। ঘড়িতে দেখি কলেজের সময় পেরিয়ে গেছে, আর মাথায় তখন অসহ্য যন্ত্রণা। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মা বুঝতে পেরে ছুটে এলো। তারপর ধমক খেয়ে মুখ কালো করে ফিরে গেল। মাথার অত যন্ত্রণার মধ্যেও ভাবছিলাম, কি খুঁজছিলাম আমি? পুরুষমানুষ নেই এমন কোন জায়গা?"

প্রায় দেড় ঘণ্টা বসে সব শোনার পর অপরেশ গুপ্ত মুখ খুলল। বলল, শ্রীমতীর ফোটোগুলো একবার দেখতে পারি?

ফোটো ক'খানা বার করে শংকর বোস তার হাতে দিল। নিবিষ্ট চিত্তে সব কটাই দেখল সে। তারপর সামনের টেবিলে সেগুলো রেখে বড় নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা।

—কি হল?

—একটু মুশকিল হল। শিখা বিশ্বাস এর থেকে সুন্দরী আর তার চটক বেশি তো বটেই। তোমার পাল্লায় পড়ে ভাল হয়ে গেলে এর কি উপায় হবে? শংকর বোস আর কোন পেসেন্ট নিয়ে এত মাথা ঘামিয়েছে কিনা জানে না। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়েই বন্ধুকে সব বলা। অবশ্য তার অ্যাকসিডেন্টের ঘটনা আর মাসি লাভের খবরটা ছেলেবেলা থেকেই জানত। শংকর বোস মাঝের এই বিশটা বছর জুড়েছে।

হেসেই জবাব দিল, তুই নিশ্চিন্ত থাক—এই মেয়ে ভাল হলে আর আমার জোর খাটলে ওকে তোর ঘাড়েই চাপাব।

অপরেশ গুপ্ত আঁতকে উঠল, কি সর্বনাশ! না বন্ধু, আমি অকাল কুষ্মাণ্ড হতে পারি, কিন্তু প্রাণের মায়া তোমার থেকে আমার কম নয়। বুকে ছোরা বসিয়ে বউ সদর্পে বিধবা হতে পারে এ-চিন্তা মাথায় ঢুকলে আবার আমার চিকিৎসা শুরু করতে হবে তোমাকে। ওর থেকে চেষ্টাচরিত্র করে তুমি যদি তোমার সেই সাত বছরের প্রেয়সীর প্রেমে নতুন করে আবার জমতে পারো, আমি খুশি হই।

তেমনি হেসে শংকর জিজ্ঞাসা করল, কেন তুই তখন শিখার প্রেমে পড়তে চেষ্টা করবি?

—চেষ্টা! শিখার আগুনে পুড়তে পেলে এই পতঙ্গের তো স্বর্গলাভ হত। থাকত তোর মতো টাকার জোর, আমি দেখে নিতাম।

শংকর বোস কেন যেন উৎসুক হঠাৎ।—সত্যি?

ঠোঁটকাটার মতো অপরেশ গুপ্ত অম্লান বদনে বলে বসল, সত্যি বলছি, তোর ওই রাগ-রাগ মিষ্টি মেয়েটাকে আমার ভাল লাগে। টাকার জোর থাকলে আর তুই এরকম বন্ধু না হলে আমি ঠিক ব্যাগড়া দিতে চেষ্টা করতাম। ও হয়তো চাবুক নিয়ে শাসন করত তবু ছোরার থেকে তো ভালো।

শংকর বোস হাসছে অল্প-অল্প। কিন্তু ঈষৎ অন্যমনস্ক। তার পরেই কিছু একটা চিন্তা মনের ছেঁটে ফেলে ডাক্তারী গাম্ভীর্যে বন্ধুর কাছে নিজের প্ল্যান ব্যক্ত করল। আর তাকে বিচিত্র ধরনেরই কিছু নির্দেশ দিল।

যথা, মালবী মিত্র ওমুক দিন ডুন এক্সপ্রেসে ফার্স্ট ক্লাসে হরিদ্বার যাচ্ছে। ওমুক দিন তার চাকর হীরা রিজারভেশন আর টিকিট আনতে বুকিং অফিসে যাবে। তার আগে অপরেশকে গিয়ে একটা কূপের চারটে বার্থই রিজার্ভ করতে হবে—একটা শংকরের নামে, একটা মালবী মিত্রের নামে, আর বাকি দুটো পুরুষ বা মেয়েছেলে যে-কেউ হতে পারে এমন দুটো নামে, অর্থাৎ শুধু নাম দেখে যাতে কেউ বুঝতে না পারে তারা পুরুষ কি মেয়েছেলে। ডুন এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ছাড়ে রাত দশটা পনেরোয়। অপরেশ আর আর একজন কেউ সেই দুটো সীট্ দখল করবে, তারপর গাড়ি ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে নেমে যাবে। বার্থ খালি থাকলে রেলওয়ের তাতে লোক তুলে নেবার রাইট আছে, কিন্তু গাড়ি ছাড়ার পর অত রাতে কেউ আর বিরক্ত করবে না। পরদিন দুপুরে বেনারস অথবা সন্ধ্যার পর লক্ষ্ণৌতে আবার লোক ওঠার সমস্যা দেখা দিতে পারে—শংকর তখন ব্যবস্থা

বুঝে ব্যবস্থা করবে। মালবী মিত্রের টিকিট আর রিজারভেশন হীরার হাতে দিলেই আপাতত তার কাজ শেষ!

অপরেশ গুপ্ত খানিক হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলে উঠল, ব্রেভো! কিন্তু পেসেন্টের জন্য এতটা উৎসাহ আর উদ্দীপনা তোমার এখানকার প্রেয়সীটি কি বরদাস্ত করবে?

—সে জানে পুজোর সময় আমার হুট করে বেরিয়ে পড়াটা খুব আশ্চর্য নয়! তার বেশি আর কিছু জানার তার দরকার আছে? তাছাড়া তোকে আরো একটু হতাশ করতে পারি, শিখার ওপর দখল ছাড়ার কোন রকম মতলব আমার মাথায় নেই।

।। পাঁচ ।।

কিন্তু শংকর বোস কি বন্ধুকে সেদিন ঠিক বলেছিল?

মালবী মিত্রকে দেখার পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা পরিণত বয়স্ক মানুষের সমস্ত চিন্তা ঠিক এই গোছের ওলট-পালট হয়ে গেল কি করে, এরকম হতে পারে কি করে, মনস্তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ শংকর বোস জানে না। ফোটোর সেই মেয়েই বটে, কিন্তু কোথায় যেন রাত-দিনের তফাত। নিটোল পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, বয়েস সাতাশও মনে হয় না, সেই রকমই স্থির ঋজুকঠিন অভিব্যক্তি—তবু। শংকরের ধারণা, ছেলেবেলার সেই অনুভূতিটাই নিজের মনে কাজ করছে। দেখামাত্র অতি আপনার জন মনে হয়েছে—কাছে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে, আলাপ করতে ইচ্ছে করছে, নিজের পরিচয় দিতে ইচ্ছে করছে।

শংকর বোস বাইরে গম্ভীর কিন্তু ভিতরে তার যে কাণ্ড শুরু হল, নিজেই তার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

অপরেশ গুপ্ত এক ফাঁকে চুপি চুপি বলল, ছবিতে যেমন দেখেছিলাম তার থেকেও ভয়ঙ্কর লাগছে, তবু আমার একটু একটু আশা হচ্ছে যে রে! মনে হচ্ছে ওই রাতের ছোরার ওপরেও তোর লোভ হতে পারে!

অপরেশের সঙ্গে তাদের পরিচিত আর এক ভদ্রলোক আছে। শংকর বোস তাই কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

ওদিকে নিজের বার্থ পেয়েই মালবী মিত্র একনজরে তার সহযাত্রীদের দেখে নিয়েছে। বলা বাহুল্য খুশিও হয়নি, আশাও করেনি। রিজারভেশন কার্ডে যে নাম চারটে ঝুলছিল, তার মধ্যে দুজনের নাম শান্তি দত্ত আর কনক ঘোষ। এই দুজনেই মেয়েছেলে হবে ভেবেছিল। কিন্তু ওই লোকগুলোর সঙ্গে একটা সুটকেস আর একটা হোল্‌ড্ অল দেখে আবার মনে হল, এই তিনজনের দু'জন যাত্রী নয়, ওই নামের দু'জন এখনো আসেনি।

তার পরনে চওড়া কালোপাড় সাদা জমিনের শাড়ি, গায়ে কালো সিল্কের ব্লাউজ। মাথার চুল টেনে বাঁধা। বাঁ হাতে শুধু চওড়া ব্যান্ডের ঘড়ি একটা, এ ছাড়া কানে, গলায় বা হাতে একটিও গয়না নেই। এ-রকম সাদামাটা বেশ আদৌ চোখ টানার কথা নয়, কিন্তু শংকর বোস প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের চোখ দুটোকে শাসন করে চলেছে!

ট্রেন ছাড়তে পঁচিশ মিনিট বাকি। আরো তিনটি মেয়ে সেই কূপেতে এসে দাঁড়াল। মালবী মিত্র তাদের জিজ্ঞাসা করল, ঠিক মত গুছিয়ে নিয়েছ?

তারা মাথা নাড়তে আবার বলল, জিনিসপত্র রেখে তিনজনেই একসঙ্গে নেমে এলে কেন?

তাদের মধ্যে একটি চটপটে মেয়ে বলল, আমাদের মেয়েদের স্লিপারে আরো তিনজন মহিলা আছেন, তাঁদের বলে এসেছি, আপনার কোনো চিন্তা নেই।

মালবী মিত্র হাতঘড়ি দেখল, ট্রেন ছাড়তে তখনো তেইশ মিনিট বাকি।

—বোসো।

নিজে একটু সরে তাদের বসার জায়গা করল। মেয়ে তিনটি বসল। তাদের শিক্ষয়িত্রীর সহযাত্রী ভেবে এদিকের বার্থের তিনজনকে দেখে নিল একবার। সেই চটপটে মেয়েটি অপরেশকে জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনারা কোথায় যাবেন? শংকর লক্ষ্য করল মালবীর ভুরুর মাঝে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল একপ্রস্থ। ছাত্রীর এই গায়েপড়া আলাপ পছন্দ নয়। অপরেশ জবাব দিল, আমরা নয়, ইনি ডেরাডুন যাচ্ছেন, তার আগে হরিদ্বারেও নামতে পারেন। শংকরকে দেখিয়ে দিল, সে তখন জানলা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের ভিড় দেখছে।

জবাব শুনে মালবী মিত্র আশ্বস্ত হল একটু। আরো দুটো বার্থ এদের নয়, তারা সহযাত্রিনীই হবেন হয়তো।

সুযোগ পেয়ে অপরেশ গুপ্ত সেটা ছাড়ার পাত্র নয়। সেই মেয়েটিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

মেয়েটি জবাব দিল, হরিদ্বার, আমরা এই গাড়িরই স্লিপারে যাচ্ছি। ইনি আমাদের প্রোফেসার—এই কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছেন।

শংকর লক্ষ্য করছে অপর মেয়ের সংগোপন খোঁচা খেয়ে চটপটে মেয়েটা সচকিত একটু। ঘুরে তাকিয়ে দেখে দিদিমণির গম্ভীর মুখ। এদিকে সুযোগ পেয়েই অপরেশ গুপ্ত ব্যস্তসমস্ত সৌজন্যে প্রোফেসারের উদ্দেশে দু'হাত কপালে ঠেকাল। কিন্তু অপর পক্ষ সেদিকে তাকালও না, তার অনুশাসনভরা দু'চোখ ছাত্রীর দিকে। অপর ছাত্রী দুটি মেজাজ বুঝে শিক্ষয়িত্রীকে একটু তোয়াজ করতে চেষ্টা করল। তার হোল্ডঅল খুলে বিছানাটা পেতে দেবার প্রস্তাব করল তারা।

—তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না, আমি করে নিতে পারব।

অপরাধী মেয়েটি চালাক বেশ। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, মালবীদি, বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটা কোকাকোলা খাব?

একবার তার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে মালবী জানলার দিকে ফিরল। ভেণ্ডার দাঁড়িয়েই ছিল, তাকে দেখেই হয়তো মেয়েটার তৃষ্ণার কথা মনে হয়েছে। তিনটে কোকাকোলা নিয়ে তিন মেয়েব হাতে দিল। ওই চটপটে মেয়েটাই আবার বলল, বা রে, আপনি নিলেন না?

ব্যাগ খুলে পয়সা বার করে দিতে দিতে শিক্ষয়িত্রীর ভুরুর মাঝে আবার একটু বিরক্তির ভাঁজ পড়ল শুধু। জবাব দিল না।

খাওয়া হতেই বলল, এবার তোমরা জায়গায় চলে যাও, এভাবে একসঙ্গে নেমে আসা ঠিক হয়নি—আর আরতি, তুমি জায়গা ছেড়ে নড়বে না, হড়বড় করবে না, গল্প করতে হয় তো শুধু ওদের সঙ্গে করবে, বুঝলে? যাও—

অপরাধী মেয়েটি সবিনয়ে মাথা নাড়ল। তারপর তিনজনেই নেমে গেল। গাড়ি ছাড়তে তখনো ন'মিনিট বাকি।

গুরুগম্ভীর রমণীর দিকে তাকিয়ে ঠোঁটকাটা অপরেশ গুপ্ত হাসি-হাসি মুখ করে বলে বসল, আপনার ছাত্রীরা তো বেশ ভয় করে আপনাকে!

জবাবে নির্লিপ্ত গম্ভীর দুটো চোখ তার মুখের ওপর স্থির হল। সপ্রতিভ অপরেশ গুপ্ত সঙ্গে সঙ্গে উক্তির সংস্কার সাধন করল।—মানে, ভ-ভয় আর সেই সঙ্গে বেশ ভক্তিও করে মনে হল।

নিরুত্তর অপ্রসন্ন দু'চোখ আস্তে আস্তে আবার প্ল্যাটফর্মের দিকে ফিরল। বন্ধুর হাল-ছাড়া অসহায় মুখের দিকে চেয়ে শংকর বোসের হেসে ফেলার দাখিল। ইশারায় সামান্য মাথা নাড়ল শুধু, অর্থাৎ আর না। পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা বাজতে বিনীত মূর্তি কন্ডাক্টর গার্ড এসে মালবী মিত্রের টিকিট আর রিজারভেশন চেক করে গেল। শংকর বোস আগেই বাইরে থেকে তার তিনখানা টিকিট আর রিজারভেশান চেক করিয়ে নিয়েছে, আর সেই সময় দামী সিগারেট খাইয়ে এই কন্ডাক্টর গার্ডটিকে একটু আপ্যায়নও করে রেখেছে। ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের সাধারণত একটু দাপট বেশি হয়ে থাকে। তাই এ ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে খুশি। তার সঙ্গের দুজনকেই সে প্যাসেঞ্জার ধরে নিয়েছে।

কন্ডাক্টর-গার্ড পাশের কূপেতে ঢুকতে সঙ্গীকে নিয়ে অপরেশ নিঃশব্দে নেমে গেল। গার্ড দেখে ফেললেও ক্ষতি নেই, কারণ এই শেষ মুহূর্তে বিনা রিজার্ভেশনের কোনো ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারের জায়গা দখল করার সম্ভাবনা কম। মালবী মিত্র বাইরের দিকেই চেয়ে আছে। তার অগোচরে শংকর বোস দরজাটা ঠেলে দিল। বাইরে হৈ-হৈ শব্দ। হুইসল বেজেছে। গাড়িটা নড়তে বেশ সচকিত হয়েই মালবী মিত্র এদিকে ফিরল। এতক্ষণে খেয়াল হল অন্য দু'জন প্যাসেঞ্জার আসেনি, কূপেতে শুধু দু'জন। ঈষৎ বিমূঢ় দৃষ্টিটা শংকর বোসের মুখের ওপর থমকালো। নিবিষ্ট চিত্তে শংকর বোস ছেড়ে যাওয়া প্ল্যাটফর্মের দৃশ্য দেখেছে।

গাড়ির গতি একটু বাড়তে আস্তে আস্তে ঘুরে বসল। তখনি প্রথম চোখাচোখি। রমণীর দৃষ্টি নড়ল না, ফলে শংকর বোসের নড়ল। পোর্টফোলিও ব্যাগ খুলতে তার ভিতর থেকে স্টেথসকোপটা মাথা বার করল। হাতে খবরের কাগজটা উঠে এলো। একটু নাড়াচাড়া করে সেটা রেখে দিল। সিগারেটের বড় প্যাকেট আর লাইটার বের করল। সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে আগুন ছোঁয়াতে গিয়ে আবার সচেতন হল যেন।

—আই অ্যাম সরি...আপনার অসুবিধে হবে!

প্যাকেট আর লাইটার হাতে করে বেরিয়ে এলো। সিগরেটটা ধরিয়ে সোজা কন্ডাক্টর গার্ডের কাছে এলো। আবার একটা সিগারেট দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করল। কথায় কথায় জেনে নিল, আসানসোল পর্যন্ত তার ডিউটি—রাত দুটোর পর আসানসোল থেকে নতুন কন্ডাক্টর গার্ড উঠবে।

একটু চিন্তাচ্ছন্ন মুখে শংকর বোস বলল, একটু মুশকিল হল তো। আমার আর দুটি প্যাসেঞ্জার আসানসোল থেকে উঠবে কি সকালে মোগলসরাই থেকে উঠবে ঠিক নেই। আসানসোল থেকে উঠলে আমি ভেবেছিলাম আমাকে ডেকে দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন।

কন্ডাক্টর গার্ড অবাক, বক্তব্যটা তার বুঝতে পারার কথা নয়। ইত্যবসরে শংকর বোস নিজের নামের কার্ড বার করে তার হাতে দিল। ডিগ্রীর সারি দেখে ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে মস্ত একজন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করছে সে। এরপর ভদ্রলোক জানল, তার সঙ্গী

দুজন নেমে গেছে, আর আসানসোল অথবা মোগলসরাই থেকে একজন ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার ওঠার কথা। একটা সিরিয়াস কেসের ব্যাপারে হরিদ্বার চলেছে। সুবিধার জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েই কলকাতা থেকে তিনটে বার্থ রিজার্ভ করা হয়েছে।

ব্যাপারটা বোধগম্য হতে কন্ডাক্টর গার্ড সবিনয়ে জানালো, আসানসোল থেকে ওই দুজন উঠলে সে নিশ্চয়ই তাকে ডেকে দেবে। আর দিনের বেলায় মোগলসরাই থেকে উঠলে তো কোন অসুবিধে নেই। মনে মনে ভাবল, বড়লোকদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা!

জায়গায় ফিরে এসে শংকর দেখে মালবীর নিজের শয্যা রচনা সারা। বালিশে ঠেস দিয়ে জানলায় পিঠ রেখে বসে আছে।

নিজের বিছানা আগেই করা ছিল। বসল। কোনো দিকে না তাকিয়েও বুঝল রমনীর চোখ তার দিকে ফিরেছে। দরজাটা বন্ধ করল, তারপর ছিটকিনি তুলতে গেল।

—ওটা বন্ধ করতে হবে না।

গম্ভীর হলেও গলার স্বর নিটোল মিষ্টি। আগেও কান পেতে শুনেছে শংকর। ঘুরে দাঁড়াল। চোখে চোখ রাখল। অনুরোধ নয়, কেউ যেন আদেশ করছে তাকে।

বিনীত গাম্ভীর্যে বলল, একটু বাদেই কন্ডাক্টর গার্ড ঘুমিয়ে পড়বে, ফার্স্ট ক্লাসে চুরি-ডাকাতি বেশী হচ্ছে আজকাল, রাতে দরজা খোলা রাখা বিপজ্জনক।

মালবী মিত্র জানে সেটা। বহু জায়গায় ঘুরে অভ্যস্ত। তাই কী বলবে ঠিক করতে না পেরে মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জবাব না পেয়ে শংকর অপেক্ষা করল একটু। তারপর ঘুরে দরজাটা খুলল আবার। যে কারণে কন্ডাক্টর গার্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলাপ করা সে সুযোগ যেন আপনা থেকে সেধে এলো। তার ডাক পড়তই। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাতের ইশারায় ডেকে নিজের জায়গায় বসল। সিগারেট প্যাকেট রাখার জন্য আবার ব্যাগটা খুলতে স্টেথসকোপ দেখা গেল।

পরমুহূর্তে কন্ডাক্টর গার্ড হাজির।

স্টেথের মাথাটা তারও চোখে পড়ল। কিন্তু একটু আগে অমায়িক প্যাসেঞ্জারটির যে মুখ দেখেছিল সে মুখ নয় এখন।

—মেয়েদের কূপেতে কোনো বার্থ খালি আছে?

—ফার্স্ট ক্লাসে মেয়েদের আলাদা কূপে হয় না তো স্যার!

—আই সি...। অন্য কোন বার্থ খালি আছে?

—রাতের মতো দুটো একটা আছে, দেখব?

—দরকার হলে বলছি। আপনি যান।

কন্ডাক্টর গার্ড চলে গেল। যে কোন কারণেই হোক তার মনে হল সীরিয়াস কেসের পেসেন্ট সম্ভবত এই মহিলাই।

অপলক চোখের মুখোমুখি হল শংকর বোস।—যে কূপেতে বেশি লোক আছে সেখানে যাবেন?

খুব ভদ্র ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে, তবু রাগ চড়ছে মালবী মিত্রের। ঠাণ্ডা দু'চোখ মুখের ওপর বুলিয়ে নিল একটু।—আপনি যেতে পারেন না?

পরিষ্কার জবাব দিল, অসুবিধাটা ঠিক আমার হচ্ছে না, আপনার হচ্ছে—

পুরুষ মাত্রেই নির্লজ্জ বেহায়া পশু। এরকম পরিস্থিতিতে অসুবিধের বদলে তাদের

সুবিধেই বেশি হয় মালবী মিত্র জানে। তবু লোকটার কথাবার্তা আর ধরন-ধারণ একটু অন্যবকম, আর মার্জিত ব্যবহার।...বাইরে গিয়ে সিগারেট খেয়ে এলো, আর নিজে থেকে যেচে তাকে অন্য কূপেতে পাঠাতে চাইল। কিন্তু তবু জবাবটা স্পর্ধার মত ঠেকল, নিজে না গিয়ে তাকে মেয়ে কূপেতে বা অন্য কূপেতে পাঠাতে চাওয়াটাও।

সিগারেটের প্যাকেটটা আবার ব্যাগ থেকে বার করেও শংকর অপরের অসুবিধের কথা ভেবেই যেন রেখে দিল। আসলে সিগারেট সে বেশি খায়ও না। ঝুঁকে দরজাটা শুধু ঠেলে দিল। তারপর বলল, ঠিক আছে দরজা লক্ করবার দরকার নেই, আমি রাতটা না-হয় জেগেই কাটিয়ে দেব'খন—আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন।...তবে যে দিনকাল এভাবে আপনাদের বেরুনো ঠিক নয়, ওই মেয়ে তিনটিকে নিয়ে চারজনে একটা কূপে রিজার্ভ করলেই হত।

অপলক চোখে মালবী চেয়ে আছে তার দিকে, যে রকম চাউনি সর্বদাই পুরুষকে তফাতে ঠেলে রাখে।...দেখছে, পারলে কোন অচেনা পুরুষের সঙ্গে কথা বলে না, নইলে একটা কড়া গোছের জবাব মুখে প্রায় এসে গেছল।

...এই লোকটার মধ্যে কোন্ গোছের পশুর বাস? দেখবে! দু'দিন এভাবে পাশাপাশি চলতে হবে, দেখে রাখাই ভালো। আছেই একটা না একটা পশু। কপালে এত বড় একটা কাটা দাগ কেন? কোনো মেয়ে দিয়েছে আচ্ছা করে এক ঘা? আশ্চর্য নয়, লোকটার একটু বেশি সাহস মনে হয়।

...কুকুর বেড়াল ছাগল ভেড়া গরু গাধা...না, সে-রকম লাগছে না, আরো জোরালো কিছু। বাঘ...ভালুক...না, চোখের তারা তাহলে অন্যরকম হত, চিড়িয়াখানায় প্রায় সব জানোয়ারকেই খুব খুঁটিয়ে দেখা আছে তার। ভালুকের চোখে অস্থির শয়তানী লেগে থাকে, আর বাঘের চোখে খামোকা রাগ আর হিংসা।....সিংহ? হতে পারে। না ঘাঁটালে সিংহর ঠাণ্ডা অথচ মেজাজী চোখ। যেন দুনিয়াটা তার।...এই লোকটারও এত দেমাকী সাহস যে দরজা লক্ করতে নিষেধ করা মাত্র লোক ডেকে ওকে অন্য কূপেতে সরাতে চাইল—নিজে নড়বে না!

—আমাকে বলবেন কিছু?

মালবী সচেতন তক্ষুনি।—কেন?

—ওরকম চেয়ে আছেন, তাই মনে হল।

গম্ভীর মুখে মালবী পাশের ইংরেজী ম্যাগাজিনটা তুলে নিল। কিন্তু আড়চোখে মাঝে মাঝে দেখছে তবু।...পুরুষের মধ্যে অনেক রকমের পশু দেখেছে...বড় জানোয়ারের মধ্যে বড় জোর ভালুক আর নেকড়ে পর্যন্ত দেখেছে—বাঘ বা সিংহ দেখেনি। বাঘ নয়, সিংহের মতই লাগছে—বাইরে ভদ্র গম্ভীর গোছের হাবভাব, কিন্তু দরকার হলে হুংকারও ছাড়তে পারে বলে মনে হয়।...লোকটা ডাক্তার। কিসের ডাক্তার? ব্যাগ স্টেথেস্কোপ নিয়ে হরিদ্বারে বেড়াতে চলেছে?

নির্লিপ্ত মুখে শংকর বোস পোর্টফোলিও ব্যাগটা খুলল আবার। এবারে বিশেষ কিছু ঘটতে পারে বলেই ধারণা। কিন্তু কি ঘটে সোজা তাকিয়ে দেখার উপায় নেই। ধীরে-সুস্থে টকটকে লাল বড় ডায়রি বই হাতে উঠল। সেটা পাশে ফেলে রেখে ব্যাগটা বন্ধ করে সরিয়ে রাখল। তারপর ওটা তুলে নিয়ে আধ-শোয়া হবার ফাঁকে আড়চোখে দেখে নিল একবার।

প্রত্যাশিত ব্যাপারই ঘটেছে। ওই মেয়ে যেন নিজের মধ্যে নেই আর। বিমূঢ় বিস্ময়ে হাতের লাল বইটার দিকে চেয়ে আছে।

ওটা খুলে শংকর নিজের চোখের সামনে ধরে রাখল। পড়ছে না এক অক্ষরও। একটু বাদে পাতা ওলটালো একটা, পড়ে চলেছে যেন। দেখার উপায় নেই, কিন্তু অপর দিকের প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারছে।

হ্যাঁ, প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে মালবী বিমূঢ় প্রথমে। তারপর আস্তে আস্তে জানলায় পিঠ রেখেই সোজা হয়ে বসেছে। এ চাউনি তীক্ষ্ণ এবং অস্বাভাবিক।...অবিকল সেই রকমই তো, ওর সেই সব লেখার বড় ডায়রি বইটার মতো। মালবী কি ঠিক দেখছে?...না ভুল দেখছে, লাল মলাটের ওপর অবিকল সেইরকম কালির দাগ, রাগ করে একবার কলম ঝাড়তে গিয়ে সারি সারি গোটাকতক কালির ফোঁটা পড়েছিল।

ঝুঁকল একটু, লোকটা পড়ায় মগ্ন, দেখতে পাবে না। আর ঠিক তখনি ডায়রি বই ধরা হাতটা একটু এদিকে নড়ল! মালবী স্পষ্ট দেখল বাংলা লেখা, আর ওর মতই যেন হাতের লেখা। কে? কে এই লোকটা? এই লেখার বই এর হাতে এলো কি করে? এই কূপেতে বাকি দুটো প্যাসেঞ্জার নেই কেন?

তিন চার পাতা পড়া হতে খোলা অবস্থাতেই লাল বইটা উল্টো করে বুকের ওপর রাখল। চিন্তাচ্ছন্ন খানিক। আবার ওটা তুলে নেবার ফাঁকে হঠাৎই ওদিকে চোখ গেল যেন।

--আই অ্যাম সরি, বড় লাইটটা জ্বলছে বলে আপনার অসুবিধে হচ্ছে বোধ হয়..আমি রিডিং লাইট জ্বেলে নিচ্ছি!

সুইচের দিকে হাত বাড়ালো।

---অসুবিধে হচ্ছে না।

নিজের মনে থাকে যখন, মালবীর মাথায় বহু অস্বাভাবিক চিন্তা হামেশাই ঘুরপাক খায়। অন্যথায়, কলেজে মেয়ে পড়ায় যখন, তার কথাবার্তা আচরণ সবই স্বাভাবিক। ওর নিজের ভিতরটাকে এক ও নিজে ছাড়া আর কেউ জানে বলে ধারণা নেই। কিন্তু সেই জানাই জানছে কেউ--চোখের সামনেও তাই দেখে মালবী মিত্র স্থির থাকবে কি করে? স্বাভাবিক থাকবে কি করে? মাথাটা ভয়ানক ঘুরছে. আর সেই চেনা যন্ত্রণাটা যেন মাথার দিকে উঠে আসছে।

গলার এই স্বর আর সেই সঙ্গে এই চাউনি যেন ঈষৎ বিস্ময়ের কারণ। শংকর বোস সোজা মুখের দিকে তাকালো এবার। তারপর সেই আগের মতই প্রশ্ন করল, বলবেন কিছু?

—হ্যাঁ। কিছুক্ষণের জন্য অন্তত স্থান-কাল বিস্মৃত হয়েছে মালবী। যন্ত্রণার আভাস টের পাচ্ছে বলে চাউনিটা আরো একটু ধারালো। —আপনি ওটা কি পড়ছেন?

—কেন বলুন তো?

থমথমে মুখে মালবী আবার জিজ্ঞাসা করল, আপনার হাতে কি ওটা?

শংকর বিড়ম্বিত গাম্ভীর্যে জবাব দিল, আপনার পড়ার মতো গল্পের বই-টই কিছু নয়। ....আমি ডাক্তার, এটা এক পেসেন্টের নিজের বিভিন্ন সময়ের মানসিক অবস্থার স্টেটমেন্ট।

কঠিন পাথরের মতো দুটো চোখ তার মুখের ওপর এঁটে বসছে যেন।—সেই পেসেন্টকে আপনি চেনেন?

—আগে কখনো দেখিনি...সেই পেসেন্টের কেস নিয়ে হরিদ্বার যাচ্ছি।

—স্টেশনে আপনার সঙ্গের লোক বলছিলেন আপনি দেরাদুন যাচ্ছেন!

—যেতে পারি, দু'ঘণ্টার তো পথ মাত্র।

—এই ডায়রি বই আপনাকে কে দিয়েছে?

—পেসেন্টের আত্মীয়া।...কিন্তু আপনি এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন বলুন তো?

জবাব দিল না। ভিতরে যত উত্তেজিত, বাইরে তত স্তব্ধ।...মা। মা এই করল! তার লেখা বই চুরি করে এই লোকটার হাতে দিল! মালবী কি করবে এখন, পরের কোনো স্টেশনে নেমে যাবে? লোকটা আবার ডায়রির পাতা ওলটাচ্ছে। মালবীর মনে হচ্ছে ওকে যেন অনাবৃত্ত করে দেখছে। যন্ত্রণাটা এবার গলা বেয়ে কান পর্যন্ত উঠে এসেছে। এরপর মাথার মধ্যে ফুটবে কিছু, আর অসহ্য যন্ত্রণায় মালবী বিবর্ণ হয়ে উঠবে।

আবারও এমনিতেই যেন তার দিকে চোখ গেল শংকরের। অস্বাভাবিক দু'চোখ তার মুখের ওপর আটকেই আছে লক্ষ্য করেছে।—কি ব্যাপার বলুন তো, আপনার সেই থেকে কিছু একটা অসুবিধে হচ্ছে মনে হচ্ছে—

—আপনার ওই স্টেটমেন্টের বইটা আমি একবার দেখতে পারি?

বিস্ময়ের সঙ্গে সামান্য সৌজন্যের হাসি মিশিয়ে শংকর মাথা নাড়ল। জবাব দিল, না ডাক্তারের কাছে এসব অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার—

কি রকম গোপনীয় ব্যাপার বুঝতেই পারছে। যন্ত্রণা বাড়ছে আর মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে।

এবার সিগারেট দরকার হয়েছে শংকর বোসের। ডায়রি বইটা খোলা অবস্থায় বালিশের অন্য পাশে উল্টো করে রেখে সোজা হয়ে বসল। ব্যাগটা টেনে নিয়ে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বার করল। তারপর কূপের বাইরে এসে দরজাটা ও-দিক থেকে টেনে দিল।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য রাখছিল। শব্দ না করে চোখের পলকে দরজা ঠেলে লঘু পায়ে এগিয়ে এসে মালবীর হাতখানা শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলল। তার হাতে ওই লাল ডায়রি বই। ওটা নেবার জন্য তাকে জায়গা ছেড়ে উঠতে হয়েছে।

সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ মালবীর। চোখ দুটো জ্বলছে। মাথার মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে। গলার স্বরও অস্বাভাবিক।—ছাড়ুন!

—তার আগে আপনার এ আচরণের কৈফিয়ৎ দিন।

মালবী আরো জোরে ঝাঁজিয়ে উঠল, ছাড়ুন বলছি! এ ডায়রি বই আমি দেখব আপনার মতলব আমি বুঝি না! কৈফিয়ৎ আমি দেব?

শংকর বোসের মুখে নিখাদ বিস্ময়। হাত ছেড়ে দিল। উগ্র উত্তেজনায় মালবী ডায়রি বইটা নিয়ে ধুপ করে নিজের জায়গায় বসল আবার। হাঁপাচ্ছে। তার মুখের ওপর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ডায়রি বইটা খুলল।

পরক্ষণে ঠিক তেমনি বিপরীত ধাক্কায় হতভম্ব বিমূঢ় যেন একেবারে। প্রথমেই বড় বড় হরপে নাম লেখা বিশাখা রায়। তারপর পাতার পর পাতা লেখা, আর অনেকটা তারই মতই গোটা গোটা লেখা বটে—কিন্তু তার নয়। আর উত্তেজনার মুহূর্তে কতগুলো পাতার দু'চারটে করে লাইন যা-ও পড়তে পারল তাও বোধগম্য নয়।

ওই কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই মাথার আগুন নিভে গেছে। যন্ত্রণাটাও সরে গেছে। স্বাভাবিক সংকোচে বিবর্ণ সমস্ত মুখ। এই প্রথম মনে পড়ল সে একজন অধ্যাপিকা। সে

ম. এ. পাস, বয়েস সাতাশ। গাড়িটা থামলে এই মুহূর্তে সে বুঝি এই লোকটার সমুখ থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারত।

—মা—মাপ করবেন। ডায়রিটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

হাত বাড়িয়ে শংকর ওটা নিল। অটুট গাম্ভীর্যে দু'চোখ তার মুখের ওপর স্থির। সুমিতা াসির দেওয়া মালবীর সেই ডায়রি বইয়ের মলাট ছিঁড়ে সেই মলাট দিয়েই এটা বাঁধিয়ে নয়েছিল।

—এবারে আমি কিছু কৈফিয়ৎ আশা করতে পারি বোধ হয়?

—আমার একটু ভু-ভুল হয়েছিল।

—কি ভুল?

কিছুটা আত্মস্থ হয়ে মালবী জবাব দিল, ভুলের জন্য মাপ চাইছি, অনুগ্রহ করে আর কছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

আড়াল চায় বলেই পায়ের ওপরকার চাদরটা খুলে শোবার তোড়জোড় করল।

—শুনুন, এদিকে তাকান।

সিংহের খপ্পরেই পড়েছে যেন। তাকালো।

—আমি একজন ডাক্তার, আর লোকে নামী ডাক্তারই বলে। রোগী দেখলে বত্রিশ াকা ফি নিই। আমার যতদূর ধারণা আপনি অসুস্থ....আপনি কো-অপারেট করলে আমি য়তো একটু সাহায্য করতে পারি।

নিজেকে আড়াল করার তাগিদেই গলার স্বর আবার ঈষৎ উষ্ণ মালবীর।

—আমি অসুস্থ, আপনাকে কে বললে?

—আপনি নিজেই।

কলেজের অধ্যাপিকা মালবী মিত্র এমন দুরবস্থার মধ্যে কি আর জীবনে পড়েছে!

—আপনি কি পড়ান, ফিলসফি নিশ্চয়?

বিমূঢ় মুখে তার দিকে চেয়ে থেকে মালবী সামান্য মাথা নাড়ল শুধু। তাই। এক-একটা ইমোশনাল ক্রাইসিস্ অর্থাৎ আবেগ-সংকট কেটে গেলে যে স্বাভাবিক অথচ অবসন্ন বিড়ম্বিত মূর্তি দেখা যায়, মালবীর সেই মুখ। পরিস্থিতি শংকরের দখলে সম্পূর্ণ। বলে গেল, দেখুন, মনের রোগে ভোগে যারা, রোগটাকে তারা নিজেরাই একটা নেশার মতো সন্তর্পণে আগলে থাকে। অসহ্য কষ্ট পায় কিন্তু তার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ। এই আনন্দের অর্থ নিজের সর্বনাশ। কিন্তু খোলাখুলি মনের কথা সব বলে যারা রোগের মূলে পৌঁছুতে পারে তারা বেঁচে গেল। কিন্তু জেনে বুঝেও অনেক সময় নেশার মত ওই রোগের শোক তারা ছাড়তে চায় না....ডায়রির এই কেসটা ধরুন, একটি শিক্ষিতা মেয়ে, কানে সর্বদা যত সব অসম্ভব শব্দ শোনে, বুকের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ ভয়ানক যন্ত্রণা ওঠে, আর সব ভুল হয়ে যায়। এই মেয়েটিকে মনের কথা বলাতে আমার এক বছর লেগেছিল। অথচ ইচ্ছে করলে সে সাত দিনে সেরে উঠতে পারত—

এ পর্যন্ত কোনো পুরুষের এত কথা এ-রকম কান পেতে শুনেছে কিনা মালবী জানে না। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, আর যন্ত্রণা হয় না? আর ভুল হয় না?

—অনেক কম। মনে হয় আমি কলকাতায় ফিরে শুনব একেবারে সেরে গেছে।

মুহূর্তের জন্য নিজের যন্ত্রণা নিজের সমস্যা ঠেলে সারাবার লোভ মালবীর।

—আপনার নাম জানতে পারি?

—শংকর বোস। শুনেছেন নামটা?

মালবী মাথা নাড়ল। শোনেনি।

—হয়তো শুনেছেন কিন্তু আপনার মাথায় নেই। একবার এক মহিলা বিশ বছর বাদে কপালের এই কাটা দাগটা দেখে আমাকে চিনে ফেলল। যাক, আমি যে রোগের কথা বলছি কতকগুলো অবধারিত লক্ষণ হল, শরীরের তার বিশেষ করে মাথায় হঠাৎ হঠাৎ ভয়ানক যন্ত্রণা হওয়া, এক দেখতে অন্য দেখা, আর সর্বদা ভুল হওয়া—এখন আপনি অসুস্থ কিনা সেটা আপনি নিজেই সব থেকে ভালো জানেন এবং বলতে পারেন।

মালবী ধড়ফড় করে উঠল কেমন। ধরাই পড়ে গেছে যেন। এই বিচিত্র যোগাযোগের ফলে বলতে লোভ হচ্ছে, কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে ফেলার তাগিদটা যেন দ্বিগুণ প্রবল। বিড়বিড় করে বলল—না, আমার কিছু অসুখ নেই, আমার ঠিক ওই রকম একটা ডায়রি বই হারিয়েছিল বলেই হঠাৎ একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছল।

নিজের মাথার দিকে বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চাদর টেনে শুয়ে পড়ল

আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়ল শংকর বোসও। নিঃশব্দে সময় কেটে যাচ্ছে। চোখে ঘুম নেই। ঘুম আসবে বলেও মনে হয় না। গাড়ির ঝাঁকুনিটা যেন জীবনের এক নতুন স্বাদের দোলার মতো।...শক্ত মুঠোয় ওই মেয়ের হাত ধরেছিল। সেই স্পর্শটা এখনও যেন হাতের ভিতর দিয়ে বুকের দিকে উঠছে। বিলেত-ফেরত নামী ডাক্তার সে। কোনো মেয়ের সংস্পর্শে এসে ক'ঘণ্টার মধ্যে এরকম একটা অনুভূতি কল্পনাও করতে পারে না ডাক্তারের সঙ্গে এ অনুভূতির কোনো সম্পর্ক নেই। কতকালের পুঞ্জীভূত অথচ বিস্মৃত একটা আবেগের যোগ দেন। ওকে দেখা মাত্র বিস্মৃতি সরে গেছে, আবেগ ফেঁপে উঠেছে দেখা মাত্র মনে হচ্ছে, এই মেয়ে তার অতি আপনার জন, এরই জন্য তার অপেক্ষা করা উচিত ছিল। স্ত্রীর সম্পর্কে কোনো প্রাক্-কল্পনা ছিল না, কিন্তু মনে হচ্ছে রক্ত-মাংসের এরকম একটা বাস্তব কল্পনাই তার থাকা উচিত...দুটো বার্থের মাঝে দেড় হাত মাত্র ফারাক, বুকের ভিতরটা থেকে থেকে অদ্ভুত লালায়িত হয়ে উঠছে, সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা ভুলে, সমস্ত নীতির বালাই বিসর্জন দিয়ে নিটোল স্বাস্থ্য ওই আহত-মস্তিষ্ক মেয়েকে সবলে বুকে টেনে নেবার লোভে হাড়-পাঁজরগুলো যেন দুমড়ে গুমড়ে উঠছে।

সচকিত নিঃশব্দে, চোখের সামনে শিক্ষা-বিশ্বাসের ভ্রূকুটি। সঙ্গে সঙ্গে এই লোভটা নির্মূল করার তাগিদ। সেই সঙ্গে নিজেকে চোখ রাঙানোর চেষ্টা।....শংকর বোস, তোমার রোগীদের সঙ্গে নিজেরও কি হাসপাতালে জায়গা নেবার ইচ্ছে?

সকালে সাতটায় গয়া স্টেশনে মেয়ে তিনটি হাসিমুখে তাদের শিক্ষয়িত্রী দিদির কাছে এলো। অনেক দিনের পরিচিতের মতই শংকর বোস সাদর আপ্যায়ন জানালো, এসো দিদিরা এসো, তোমাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম, আমার ব্রেকফাস্টের অর্ডার দেওয়া সারা এলো বলে।

একটু আগে ভদ্রলোক এই উদ্যেশ্যেই উঠে গেছল মালবী জানে না। মেয়ে তিনটিও অপ্রস্তুত মুখে তার দিকে তাকালো। কূপেতে আর লোক না দেখেও তারা অবাক একটু

মৃদু সুরে মালবী বলল, বোসো। তারা বসল।

পরিস্থিতি এখনো শংকরেরই অনুকূল। রাতের ঘটনা মনে পড়লে মালবী এখনো সংকোচে মুখ তুলতে পারে না। মনে সারাক্ষণই পড়ছে। সুস্থ অবস্থায় সে তো কলেজের

মানী মাস্টার একজন—কি বিসদৃশ ব্যাপারটাই না করে বসল কাল! সংকোচের আরো কারণ, সকালে উঠেও তার কেবলই মনে হচ্ছে, মুখে আর প্রকাশ না করলেও এই লোকটা তার সময়-সময়কার মানসিক জটিল অবস্থার খবর অনেকখানি জেনে গেছে। আর ঠিক এই কারণেই কিনা জানে না, পুরুষের প্রতি তার স্বভাবগত আক্রোশ অনেকখানি স্তিমিত।

চায়ের খোঁজে শংকর আর একবার উঠে যেতেই একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রলোক কে মালবীদি?

এই কৌতূহল খুব মনঃপূত নয়।—কলকাতার একজন বড় ডাক্তার।

চটপটে মেয়ে আরতি বলে উঠল, কাল গাড়িতে আলাপ হল বুঝি? কি নাম মালবীদি?

—নাম দিয়ে কি হবে, চিকিৎসা করাবে? ডেঁপোমি না করে চুপ করে বসে থাকো।

শংকর ফিরল। পিছনে একরাশ ব্রেকফাস্ট হাতে দুটো বয়। সেগুলো সামনে নামাতে মেয়েরা খুশি।

গ্যাঁট হয়ে বসে শংকর হাসিমুখে বলল, নাউ গার্ল্‌স, হেল্‌প ইওরসেলভস্‌। পথে আমরা সব সমবয়সী বন্ধু, বুঝলে?

দুষ্টু মেয়ে আরতি তার শিক্ষয়িত্রী দিদির দিকে তাকালো। তারপর টোস্টজোড়া পোচের ডিশ আর মাখনের বাটি তার সামনে রাখল। ভিতরে ভিতরে আপত্তি সত্ত্বেও মালবীর সেগুলোর দিকে মন না দিয়ে উপায় নেই যেন।

এদিকে হাসিমুখে খাওয়া চলল। শংকর বলল, তোমার নাম আরতি কাল শুনেছি, খাসা মেয়ে তুমি। অন্য দুজনের দিকে তাকালো, তোমরাও ভালো—তোমাদের নাম কি?

—নীলিমা ধর।

—রেখা চক্রবর্তী।

—বাঃ! নামগুলোও যেন ভারি পছন্দ শংকরের।---ওই দিদির কাছে সবাই ফিলসফি পড়ো তো?

তারা মাথা নাড়ল। আরতি ফস করে জিজ্ঞাসা করে বলল, আপনি মস্ত ডাক্তার শুনলাম?

—কোথায় শুনলে, তোমাদের দিদির কাছে? একবার তাকিয়ে মহিলার ভ্রূকুটি উপভোগ করে নিল। তারপর জবাব দিল, হ্যাঁ মস্ত ডাক্তার, কম করে ছ'ফুট লম্বা।

মেয়েরা হেসে উঠল।

গাড়ি থামার মিয়াদ বাইশ মিনিট। শংকর বলছে, গাড়ি ছাড়লেও তাড়াহুড়োর দরকার নেই। মেয়েরা তবু ওরই মধ্যে চায়ের পেয়ালা শেষ করে উঠে পড়ল। ওদের এগিয়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে শংকর বলল, এরপর বেনারসে লাঞ্চ, চলে আসবে, সব ব্যবস্থা রেডি থাকবে।

মালবীর অস্বস্তি বাড়ছে। পুরুষের এই হৃদ্যতার সে অনভ্যস্ত। মেয়ে তিনটে বি.এ. পড়ে, যথেষ্ট বুঝতে শিখেছে। এই অন্তরঙ্গতার তারা কি অর্থ করবে ঠিক নেই।

বয় অনেকগুলো টাকা নিয়ে আর সেই সঙ্গে বখশিশ নিয়ে সাহেবকে খুশির সেলাম ঠুকে সরে গেল। গাড়ি তার আগেই ছেড়ে দিয়েছে। মালবী বলল, আপনি এরপর আর লাঞ্চের কথা বলবেন না, ওরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।

—শুধু আপনার আর আমার কথা বলব?

মুহূর্তের মধ্যে মালবীর দু'চোখ খরখরে হয়ে উঠল।—না আমার ব্যবস্থাও আমি করতে পারব।

—ও, আই অ্যাম সরি। কিন্তু হঠাৎ আবার কি অপরাধ করলাম বলুন তো?

এবার সুর বদলে মালবী বলল, আপনার অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেছে।

—এটা ঠিক বললেন না, আমি মাসে বারো থেকে চৌদ্দ হাজার টাকা রোজগার করি।

অঙ্কটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকল মালবীর কানে। নিজেকে আবার গুটিয়ে নিতে চেষ্টা করল তারপর।—তাহলেও আপনি মিছিমিছি খরচ করতে যাবেন কেন...

—মিছিমিছি! মেয়েগুলো কেমন মিষ্টি হাসে দেখলেন না, আমার বেশ লাগে।...যাক লাঞ্চের অর্ডার একসঙ্গেই দেওয়া হয়ে গেছে, অপরাধ নেবেন না।

রাতের অনুভূতিটা আবার টের পাচ্ছে শংকর বোস। আপনি-আপনি করে কথাও বলতে ইচ্ছে করছে না। হাত ধরে টেনে কাছে এনে বসাতে ইচ্ছে করছে।

বেনারসে মেয়েরা আসার আগেই আর একটা ছোটখাটো ধাক্কা খেয়ে উঠল মালবী। তার ফলে লোকটাকে কেমন যেন অদ্ভুত আর রহস্যময় মনে হল তার। বেনারসে নতুন অবাঙালী কনডাক্টর-গার্ড এসে দুটো বার্থ খালি দেখে শংকরকে জিজ্ঞাসা করল প্যাসেঞ্জার আছে কিনা। থাকার কথা সে জানে।

শংকর জবাব দিল প্যাসেঞ্জার না থাকলেও সমস্ত কূপেটাই তার রিজার্ভ আছে।

শুনে মালবী অবাক। ওদিকে কনডাক্টরও সবিনয়ে বলল, ঠিক বুঝলাম না সার।

ব্যাগ থেকে তিনটে টিকিট আর তিনটে রিজারভেশন বার করে শংকর তাকে দেখিয়ে দিল। তারপর বলল, এঁর রিজারভেশান আর টিকিট এঁর কাছে।

কনডাক্টরের তখনো দুর্বোধ্য ঠেকছে। বলল, কিন্তু বাকি দু'জন প্যাসেঞ্জার কোথায়?

—তারা এয়ারে আগে চলে এসেছে। লক্ষ্ণৌ থেকে উঠতে পারে বা তার পরের স্টেশন থেকেও উঠতে পার।

আর না ঘাঁটিয়ে কনডাক্টর চলে গেল। মালবী বিস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করল, লক্ষ্ণৌ থেকে আপনার লোক উঠবে, আপনি কলকাতা থেকে রিজার্ভ করেছেন?

শংকর হেসেই জবাব দিল, আমার কোথায়ও থেকে কোন লোক উঠবে না। অনেক দরকারী চিন্তা-ভাবনা সারতে হয় বলে আমি আস্ত কূপেই রিজার্ভ করে থাকি—আপনি আগেভাগেই একটা টিকিট কেটে বসে আছেন, কি আর করা যাবে, অন্য কূপেও খালি ছিল না—

মালবী বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে রইল খানিক। একবার মনে হল লোকটা স্বার্থপর।

আবার মনে হল দেমাক।...সিংহের দেমাক, যেখানে সে থাকবে সেখানে অন্যের জায়গা নেই।

লাঞ্চের সময় মেয়েদের সঙ্গে আর একপ্রস্থ হৈ-চৈ করল। ওরা যাবার আগে মালবীর চোখ এড়িয়ে বলে দিল—বিকেলে টি, আর রাত্রে ডিনার, ব্যাস্—তারপরেই তোমাদের ডাক্তার দাদার আতিথ্যের দায়িত্ব শেষ।

রাত্রি।

বাইরের অন্ধকার ভেদ করে গাড়ি ছুটেছে। পাশের বার্থের মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে মালবী আস্তে আস্তে উঠে বসল। লোকটার এক বাহুতে কপালের আধখানা ঢাকা।

.বড় ডাক্তার সন্দেহ নেই। কথায় কথায় আজও অনেক রকমের মানসিক রোগের লক্ষণ নয়ে আলোচনা করেছে, বিশ্লেষণ করেছে। কান পেতে শোনার মতই। ভিতরে ভিতরে ঃ নিজেও কি দারুণ বিপন্ন নিজে তো জানে। তাই শোনার লোভ। মুক্তির তাগিদ এক-একবার ভিতর থেকে ঠেলে উঠেছে। কিন্তু কিছুতে সেটা প্রকাশ করতে পারেনি। উল্টে জার করে চাপা দিতে চেয়েছে। চাপা দিয়েছে।

...কিন্তু লোকটা যেন তা বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে বলেই অনেক ছোট-ছোট টনার চিত্র সামনে ধরেছে। আর কেবলই চেষ্টা করেছে ওকে কথা বলাতে। ওই মেয়ে টার সঙ্গে এত হৃদ্যতার লক্ষ্যও যেন সে-ই।

...না। ঠিক এই গোছের পুরুষ মালবী আর দেখেনি। এখন পর্যন্ত তার নাম-ধাম পর্যন্ত জানতে চায়নি। কিন্তু অন্তরঙ্গ হবার একটা সহজ জোর লক্ষ্য করেছে। সংশয়ে দু'চোখ ারালো হয়ে উঠেছে মালবীর, অভ্যস্ত অবরোধের ব্যবধানে রাখতে চেয়েছে, কিন্তু সেটা টকেনি, লোকটা তাকে অনায়াসে সেখান থেকে টেনে আনতে চেষ্টা করেছে।

... কেন?

কাল রাতের ওই ঘটনার ফলে ওর মানসিক জটিলতার খবর পেয়ে গেছে বলে? বড় ডাক্তার যখন, এ রকম তো হামেশাই দেখছে। তাহলে ওর সম্পর্কে এতটা আগ্রহ আর এত উদারতা কেন?

...উদারতা? লোভ কিছু নেই? নিজের অগোচরে সেই পুরনো ব্যাধির বিবরে ঢুকেছে মালবী মিত্র। কানের দু'পাশ চিনচিন করছে। আর খানিকক্ষণ এই চিন্তায় তন্ময় হলে যন্ত্রণা শুরু হবে জেনেও চিন্তাটা ছাড়তে পারছে না। ছাড়তে চাইছেও না। পুরুষের বিরুদ্ধে যে তীক্ষ্ণ অস্ত্র উঁচিয়ে আছে ও, সেটা যেন এই লোকটা কেড়ে নেবার মতলবে আছে।... কিন্তু কেন? রোগ আবিষ্কার করতে পেরেছে বলে শুধু মমতা আর উদারতা? এই পুরুষের মধ্যেও লোভ কিছু নেই? পশু লুকিয়ে নেই?...না থাকতে পারে না...কিন্তু যে আছে সে কি অতটাই জোরালো?

নিজের অগোচরে পাশের বার্থের বাহুলগ্ন আধখানা মুখ একটু ঝুঁকে দেখছে মালবী মিত্র।

—কি দেখছেন, নেকড়ে না বাঘ না ভালুক?

—সিংহ! অস্ফুট স্বরে মুখ দিয়ে কথাটা নির্গত হবার সঙ্গে সঙ্গে মালবীর মোহগ্রস্ত ভাবটা ছুটে গেল। ধড়মড় করে সরে গিয়ে শুয়ে পড়তে চেষ্টা করল সে। কিন্তু শংকর বোস আর আগেই বড় আলোটা জ্বেলে দিয়েছে।

নিরীক্ষণ করে দেখল ওকে একটু। হাসল।—কম্প্লিমেন্ট!...আপনার ভয় করছে?

দ্বিতীয়বার এভাবে নিজেকে অনাবৃত করার ফলে মালবীর সংকোচের থেকেও রাগ বাড়ছে। লোকটার ওই চাউনি আর ওই হাসি যেন ওকে নিঃস্ব করার মতো। নীরস স্বরেই পাল্টা প্রশ্ন করল, ভয় করবে কেন?

হাসছে।—সিংহ দেখলে লোকে ভয় পায়, অবশ্য খাঁচার সিংহ না হলে। আপনি ভয় পাচ্ছেন।

ওই হাসি দিয়ে আর চাউনি দিয়েও যেন ওকে বশ করার চেষ্টা। সংগোপন ব্যাধিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ভিতর থেকে, দু'চোখ খরখরে হয়ে উঠছে। চকিতে দরজার দিকে তাকালো একবার। আজ সেটা লক করা।...বিশেষ মতলব নিয়েই তিনটে বার্থ রিজার্ভ করে থাকতে পারে। মনে হওয়া মাত্র কপালের স্নায়ুগুলো দপ দপ করে উঠল। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ

এবং অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগল। বলল, ভয় পাচ্ছি না, সমস্ত পশুকে ঘায়েল করার ব্যবস্থা আমার সঙ্গে থাকে।

ব্যবস্থাটা কি শংকর জানে। তার লেখা ডায়রিতে অনেক জায়গায় তার উল্লেখ আছে। ব্যবস্থা ওর বাক্সের একটা ছোরা। শংকর বোস জোরেই হেসে উঠল। বলল, সিংহ থাবা বসাবে বলে ঝাঁপ দিলে আপনি কি আর বাক্স থেকে ছোরা বার করবার সময় পাবেন!..শুনুন, সব মানুষের মধ্যে সমস্ত রকম পশুই থাকতে পারে, আর তাদের ওপর দিয়ে মানুষ মাথা উঁচিয়ে চলে—এ সত্যটা যদি মেনে নিতে পারেন, আপনার মনের সমস্ত অসুখ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

রুদ্ধ আক্রোশ যেন ভেঙে পড়ল মালবীর, বলে উঠল, অসুখ অসুখ অসুখ—আপনি সেই থেকে কেবল অসুখ অসুখ করছেন কেন? কোন অসুখ নেই আমার—

—শাট আপ্ অ্যান্ড ট্রাই টু স্লিপ! সত্যিকারের সিংহই যেন চাপা হুংকার দিয়ে উঠল একটা।—এ-রকম ছটফট করলে আমি আপনাকে ইন্‌জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখব!

খট করে বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়ল শংকর বোস।

আর একটা ঝাঁকুনি খেয়েই যেন মালবী মিত্র আত্মস্থ সচেতন আবার। ওই এক হুংকারে লোকটা বুঝি এক অন্ধকার গহ্বর থেকে টেনে তুলল ওকে।

॥ছয়॥

হরিদ্বারে নিজেকে নিয়ে বেশ একটা বিড়ম্বনার মধ্যেই ক'টা দিন কাটল মালবীর। ওই মানুষের সঙ্গে রোজই একবার না একবার দেখা হয়। ওরা থাকে কন্‌খলে, সে গঙ্গার ধারের কোনো হোটেলের সুইটে। দেখা হলেই মালবী নিজের ভিতর থেকেই যেন আড়াল খোঁজে একটা। অচেনার গাম্ভীর্যে নিজেকে তফাতে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। অথচ বেড়াতে বেরুলেই উৎসুক দু'চোখ তাকে খোঁজে। যেখানেই যায় মনে হয় দেখা হবে।

কেন এরকম হয় মালবী তাও বুঝতে পারে। ট্রেনের সেই দ্বিতীয় রাতেই মালবী ভাল রকম জেনেছে ওর মানসিক জটিলতার ব্যাপারটা ওই লোকের কিছুই জানতে বুঝতে বাকি নেই। সেই কারণেই আকর্ষণ, আবার সেই কারণেই ভয়ও। ও-মানুষের আশ্রয় নিলে সে যেন একটা জটিল গহ্বর থেকে তাকে টেনে তুলে ফেলতে পারে। আবার পাছে সত্যিই টেনে তোলে সেই শংকাও কম নয়।

তার মনের অবস্থা মেয়েগুলোও মাঝে মাঝে টের পায় কিনা কে জানে। ওদের হাসাহাসি করতে দেখলেও সন্দেহ হয়, তাকে নিয়েই হাসাহাসি কিনা। আরতিটা আবার যে পাজি!

নীলধারার দিকে বেড়াচ্ছিল সেদিন। মেয়েরা আগে আগে। মালবী ঘাটের বাঁধানো সিঁড়িতে বসল। এত পথ হেঁটেও মেয়েগুলোর ক্লান্তি নেই।

তন্ময় হয়ে গঙ্গার স্রোতের খেলা দেখছিল। এখানকার গঙ্গার রূপই আলাদা। চোখ জুড়িয়ে যায়। ওই উত্তাল স্রোতের সঙ্গে মনও উধাও হতে চায়।

চমকে উঠল। পিছনেই পুরুষের ভারী গলা।—এত মন দিয়ে কি দেখছেন?

সামান্য কথায় এমন চমকে ওঠার ফলে মালবী নিজেই অপ্রস্তুত একটু। হাসতে চেষ্টা করে বলল, না...বসুন।

আধ হাত ফাঁক রেখে সানন্দে পাশে বসল শংকর।—ভাগ্যটা বেশ প্রসন্ন মনে হচ্ছে, অথচ এক ঘণ্টা ধরে হেঁটে হেঁটে আপনার দেখা না পেয়ে মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছিল।

এই গোছের সোজা সোজা কথা শুনলে মালবীর ভিতরটা ধড়ফড় করে ওঠে কেমন। অন্যদিকে রোগের প্রসঙ্গ এড়াতে চায়, আবার রোগের কথাই শুনতে ইচ্ছে করে। কি মনে হতে জিজ্ঞাসা করল—আপনি যে পেসেন্টের জন্য এসেছেন তিনি কেমন আছেন?

মুখ ফিরিয়ে শংকর ভাল করে তাকে একটু নিরীক্ষণ করে জবাব দিল, ভালোই তো আছেন বোধ হয়...আপনার কি মনে হয়?

মালবী অবাক।—আমি তো দেখিনি তাঁকে, কি করে বলব?

—তাও তো বটে।

—কোথায় থাকেন তিনি?

—কন্‌খলে।

—ও...এই জন্যেই রোজ এদিকে আসেন আপনি?

—হ্যাঁ।

—আমাদের মিশনের কাছেই বাড়ি?

—একেবারে। হেসে বলল, কিন্তু চেষ্টা করে আপনার আর তার কাছাকাছি হয়ে কাজ নেই।

এই খোলা গঙ্গার ধারে বসে, এই আকাশ বাতাস আর অদূরের পাহাড়ের পরিবেশে মালবী এখন অন্তত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। জিজ্ঞাসা করল, আপনার পেসেন্ট বরাবর এখানেই থাকেন?

—না, এসেছেন।

—তিনি যতদিন এখানে থাকবেন আপনাকেও থাকতে হবে?

—আর বলেন কেন, এখন তাড়াতাড়ি করে তিনি ফিরলে বাঁচি।

পুরুষের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক কৌতুকের কথাও জীবনে বলেছে কিনা জানে না। এই পরিবেশে সেটুকুও সম্ভব হল। সহজ হাসিমাখা মুখেই বলল, আপনার মতো এত বড় ডাক্তারকে চিকিৎসার খাতিরে এত দূরে আসতে হয়েছে—খুব বড় রকমের ফি পাবেন নিশ্চয়?

হালকা গাম্ভীর্যে শংকর জবাব দিল, পেসেন্ট ভালো হলে যা চাইব তাই পাব বোধ হয়—কিন্তু চাইবার রাস্তা থাকবে কিনা সেটাই সন্দেহ।

কিন্তু রাতের মধ্যেই মেজাজ আবার বিগড়োতে থাকল মালবীর। ঈর্ষা করার মতো ছোট মন নয় তার। কাউকে ঈর্ষা করে না। তবু সন্ধ্যার পর থেকে বার বার এক অদেখা অচেনা মেয়ের কথা মনে পড়েছে। যে-মেয়ের রোগ ধরা পড়েছে, যার জন্য হয়তো বা তার আত্মীয়-পরিজন উতলা। তারা তাকে এক বড় ডাক্তারের হাতে সঁপে দিয়েছে, যে তাকে টেনে তুলবে, সুস্থ জীবনের পথে ফেরাবে। মালবীর বিশ্বাস, টেনে তুলবেই, ফেরাবেই।

কি এক হতাশা ছেঁকে ধরার উপক্রম করতেই অসহিষ্ণু মালবী মিত্র ঠেলে সরাতে চেষ্টা করল সেটা। না, তার এমন কিছুই হয়নি, দিব্যি তো কলেজে মেয়ে পড়াচ্ছে। ঘুরে-ফিরে ওই ডাক্তারের ওপরে মনটা বিরূপ হয়ে উঠতে লাগল।...গঙ্গার ঘাটে পিছনে অত

কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল কেন? মালবী কি চোখ বুজে থাকে, অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টাটা দেখতে পায় না? ওই মেয়ে তিনটে পর্যন্ত টের পায় বোধ হয়। পেসেন্ট দেখতে মোটা ফী এর লোভে কলকাতা থেকে ছুটে এসেছে, তার মধ্যে পারলে রোজ দু'বেলা তার সঙ্গে দেখা করার এত ঝোঁক কেন? মালবী যদি রোগ পুষছে বলে স্বীকারও করে, তাহলেও তো মাসে ওই বারো-চৌদ্দ হাজার টাকা রোজগেরে ডাক্তারের খাঁই মেটাতে পারবে না জানে, তা সত্ত্বেও এত টান কিসের? বড়লোকের মনের তলায় অনেক কুমতলবের বাসা—এর কি মতলব কে জানে?

এক-একবার নিজের মন থেকেই বাধা আসছে, যা ভাবছে তা সত্যি নয়। তবু এই চিন্তাটাকেই প্রশ্রয় দিয়ে নিজেকে উগ্র করে তুলছে মালবী।

পরদিন সকালে উঠেই মেয়েদের নিয়ে বাসে ঋষিকেশ লছমনঝোলায় চলল মালবী। সকালে একবার মনে হল ওই ডাক্তার জানলে মন্দ হত না। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপরেই বিদ্রূপ। না, লোকটাকে সোজাসুজি এবারে ছেঁটেই দেওয়া দরকার। মনে হল, তার ইদানীংয়ের কথাবার্তাগুলোও অন্তরঙ্গ বাঁকা-চোরা রাস্তা খোঁজে।

ঋষিকেশে এসে এখানকার ধরমশালায় দিনতিনেক থাকার ব্যবস্থা করল।

পরদিন।

বিকেলে লছমনঝোলার সেতুর ওপর দিয়ে ঋষিকেশের দিকে ফিরছিল। মালবী আগে আগে আসছিল। সেতুর ওপর পা দুটো হঠাৎ যেন স্থাণুর মতো আটকে গেল।

ওধারে গজ পঁচিশেক দূরে সেতুর ওপর শংকর বোস দাঁড়িয়ে। তার দিকে চেয়ে হাসছে মিটিমিটি।

আপাদমস্তক হঠাৎ কেন যে জ্বলে উঠল মালবী জানে না। পিছন থেকে মেয়ে তিনটে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল—ডক্টর বোস! ডাক্তারদাদা!

হাসিমুখে শংকর তাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। সকলে কাছে আসতে ভ্রূকুটি করে বলল, দুষ্টু মেয়েরা, আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসা হয়েছে?

আরতি মেয়েটা বলে উঠল, মালবীদির জন্য, যেই মনে হল অমনি ছোটো...আপনি আমাদের ধর্মশালাতেই থাকবেন তো?

অম্লানবদনে শংকর মাথা ঝাঁকালো।—নিশ্চয়!

মালবীর থমথমে মুখ। ট্রেনে এই মানুষকে কেমন দেখেছে ভুলে গেছে। সন্দেহটাই বদ্ধমূল হয়ে উঠছে, লোকটার মতলব ভালো না। মেয়েগুলোর ওপরেও রাগ হচ্ছে—বিশেষ করে ওই আরতির ওপর। মনে হচ্ছে বাকি দুটোকে নিয়ে ইচ্ছে করেই ওই ডেঁপো মেয়ে আবার একটু এগিয়ে গেল।...সেই ফাঁকে এই লোকটা তার কাঁধ ঘেঁষে হাঁটছে।

শংকর বলল, আপনার মেজাজপত্র একটু বিগড়েছে মনে হচ্ছে?

—আমার মেজাজের খবর আপনি রাখতে চেষ্টা করছেন কেন?

শংকর হাসিমুখেই জবাব দিল, আপনি এভাবে পালিয়ে এসেছেন বলেই মেজাজের অবস্থা এরকম।

চাপা ঝাঁজে মালবী বলল, পেসেন্টকে ছেড়ে আপনিই বা এসেছেন কেন?

—আমি ছাড়িনি। সম্প্রতি পেসেন্টেরই আমাকে ছাড়ার মতলব দেখছি।

মালবী একবার থমকে তার মুখের দিকে তাকালো। বলে উঠতে ইচ্ছে করল, পেসেন্টও তাহলে আপনাকে চিনেছে! কিন্তু কথা বাড়ালো না। বারো-চৌদ্দ হাজার টাকা

রোজগেরে ডাক্তারের এই ঘনিষ্ঠতা সে আর স্বাভাবিক বলে ভাবতে রাজী নয়।

তরল খুশিতে শংকর আবাব বলল, দুই-একজন ভালো ডাক্তারের আবার স্বভাব কি জানেন, রোগী ছাড়লেও রোগ ভাল না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তার তাকে ছাড়ে না।

সামনের মেয়ে তিনটে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তারা কাছে আসতে আরতি হড়বড় করে বলল, ডাক্তারদাদা কাল আমাদের সঙ্গে নরেন্দ্রনগরে যাবেন না মালবীদি?

রাগে মুখ লাল তক্ষুণি। মনে হল মেয়েটা ইচ্ছে করে শয়তানি করছে। রাগটা চোখে প্রকাশ পেল শুধু। মালবী জবাব দিল, গাড়িতে চারজনের বেশি জায়গা হবে না, তোমরা ঘুরে এসো তাহলে—

—এ মা, আরতি অপ্রস্তুত, আমি ভেবেছিলাম ড্রাইভারকে বললে—

—তোমাকে ভাবতে কে বলেছে?

আরতি আরো অপ্রস্তুত এবং চুপ।

এরপর জিজ্ঞাসা করে মেয়েদের কাছ থেকে শংকর শুনল, কাল সকালে ট্যাক্সি করে তারা যাচ্ছে টেহেরি গাড়োয়ালের প্রধান শহর নরেন্দ্রনগরে। পাহাড়ের ওপর শহর, সকলে বলছে সুন্দর জায়গা, ট্যাক্সিতে তো এক ঘণ্টারও কম পথ। মালবীদি ট্যাক্সি ঠিক করেছে, কাল সকালে তারা সেখানে বেড়াতে যাচ্ছে, বিকেলে ফিরবে।

শংকর বলল, এই ব্যাপার---তোমরাই ঘুরে এসো, আমি হয়তো সকালে উঠেই হরিদ্বার পালাব।

সমস্ত রাত ভালো ঘুম হল না মালবীর। সকালে উঠেও মাথা ভার। রাগটা গিয়ে ওই ডাক্তারের ওপরেই পড়ল। সাধারণত কলকাতা ছেড়ে বেড়াতে বেরুলেই সে অনেক ভালো থাকে। মনের জটিলতার অনেকখানি যেন একটা স্নিগ্ধ প্রলেপের তলায় চাপা পড়ে থাকে। যাত্রার শুরু থেকে এবারে যেন ওর বেড়ানোটাই মাটি। তার জন্যে দায়ী শুধু ওই ডাক্তার। সে ওকে রোগ ভুলতে দিচ্ছে না, নিজেকে ভুলতে দিচ্ছে না।

পরদিন সকালে মেয়ে তিনটিকে নিয়ে তার চোখের ওপর দিয়ে ট্যাক্সি করে যখন বেরিয়ে গেল, তখনো মুখ লাল আর মাথা আরো বেশি ভার।

মুখ দেখেই শংকর বোস বুঝে নিয়েছে রাতে ঘুম হয়নি এবং মানসিক সমাচার কুশল নয়। মনের অবস্থার এই রকমফের জানা আছে। কিন্তু ওরা চলে যাওয়ামাত্র তার ছটফটানি এই দুশ্চিন্তার দরুন নয়। বড় ডাক্তার সে, নিজের মনের এই অবস্থা নিজের কাছেই বিশ্লেষণের বস্তু একটা। কোনো মেয়ে এমন দুর্বার আকর্ষণে টানতে পারে তাকে, এ যেন কল্পনার বাইরে। শিখা বিশ্বাসের ভ্রূকুটিও আর তাকে ঠেকাতে পারছে না।

আর একটা ট্যাক্সি নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে ওই পথেই রওনা হয়ে গেল শংকর বোস।

সামান্য একটা অঘটনে যেন নাটকের বড় রকমের পট পরিবর্তন হয়ে গেল একটা। অঘটন বড় না হলেও মর্মান্তিক কিছু ঘটতে যে পারত সেটা সত্যি। মালবী মিত্রর মানসিকতায় সেই ত্রাসই অনেকখানি বাস্তব হয়ে উঠল।

সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছিল সে। মেয়ে তিনটিকে পিছনে দিয়েছিল। সুন্দর রাস্তা পাহাড়ে বাঁক ঘুরে ঘুরে খাড়া ওপরে উঠে গেছে। পাহাড়ী রাস্তা প্রশস্ত নয় তেমন। এদিকে পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ। বাঁক ঘোরার দরুন কখনো বাঁয়ে পাহাড় ডাইনে খাদ, কখনো ডাইনে পাহাড় বাঁয়ে খাদ। খানিক বাদে ওই গভীর খাদের দিকে চেয়ে মাথাটা

ঝিম ঝিম করতে লাগল মালবীর। এমনিতে একটু বেশি উঁচু থেকে নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘোরে তার।

খাদের দিকে আধ-হাত রেলিং পর্যন্ত নেই। সেদিকে চোখ গেলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে কেমন। গাড়ির চাকা সময় সময় খাদের গা ঘেঁষে চলেছে মনে হচ্ছে। চার-ছ' আঙুল সরলে কোন্ অতলে গিয়ে আছড়ে পড়বে ঠিক নেই। পড়লে কি হবে বার বার সেই চিত্রটাই সামনে এগিয়ে আসছে। শেষে এমন হল যে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করলেও সরছে না। ওই পরিণতির দিকেই চলেছে সেটা যেন। মনের ওপর এঁটে বসছে ক্রমশ। তার দিকে খাদটা এলেই কাঠ হয়ে বসে থাকছে, আর একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে চাইছে। আবার অনভ্যস্ততার দরুন, আর সেই সঙ্গে রাতে না ঘুমোবার দরুন এর অনেকখানি যে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া—থেকে থেকে তাও অনুভব করছে।

পথের শেষের মাথায় একেবারে চক্রাকারের বাঁক একটা। পার্শ্ববর্তিনীর মনের অবস্থার কিছুটা আঁচ সম্ভবত ড্রাইভারও পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ঘাড় বাঁকিয়ে সে তাকে দেখে নিচ্ছিল। আর সেই কারণেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল কিনা বলা যায় না। ওপরের বাস-ড্রাইভারও হয়তো তত জোর হর্ণ দিয়ে বাঁক ঘোরেনি।

দু'জনেই সজোরে আচমকা ব্রেক কষল। তবু সামনা-সামনি লেগেই গেল একটু। তাইতেই গাড়ির সামনের দিকটায় মাথাটা প্রচণ্ড জোরে ঠুকে গেল মালবীর—আর সেই মুহূর্তে নীচের ওই গভীর খাদ যেন একটা বীভৎস হাঁ করে গিলতে এলো তাকে। তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল একটা। তারপর আর কিছু জানে না।

আসলে মুখোমুখি সামান্য লেগে যাবার পর গাড়িটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে খাদের দিকের একটা বড় পাথরের সঙ্গে আবার বেশ জোরেই একটা ঠোক্কর খেয়েছে। তারপর গাড়ির চাকা ঘষ্টে গিয়ে একেবারে খাদ ঘেঁষেই থেমেছে—পিছনের দিকটা ওই পাথরের সঙ্গে লেগে আছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য দিশেহারা সকলেই। গাড়ির মেয়ে তিনটে আর ছোট বাসের যাত্রীরা। তারপর দুই বাসের ড্রাইভারের বচসা, যাত্রীদের চেঁচামেচি। আঘাত লেগে একটি মহিলা অজ্ঞান হয়ে গেছে দেখেই শেষে চেঁচামেচি আর বচসা থামল। মেয়ে তিনটে নেমে পড়েছে, কিন্তু তাদের দিদিকে নামায় কে?

বাসের লোকজনেরা মিলে তাকে সুদ্ধ গাড়িটাকে ঠেলে পাহাড়ের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে বাসের রাস্তা করে নিল। কিন্তু এদিকে গাড়ির ইঞ্জিন বিকল, আহত মহিলাকে নিয়ে কি করা যাবে এখন?

পথ রুদ্ধ দেখে পিছনে আর একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। তার আরোহীকে নামতে দেখে হাতের মুঠোয় যেন প্রাণ পেল মেয়ে তিনটে। আরতি ছুটে এগিয়ে এলো।—ডক্টর বোস, মালবীদির কি হল শিগগীর দেখুন।

শংকরের খালি হাত। সঙ্গে সরঞ্জাম কিছু নেই। মাথার আঘাত গুরুতর কিনা সঠিক বোঝা গেল না। বাঁ হাতের কবজিতেও লেগেছে মনে হল, কারণ ধরাধরি করে আকে পিছনের গাড়িতে তোলার সময় ওই হাত ধরতে অজ্ঞান অবস্থায় কঁকিয়ে উঠল। চিবুকের নিচের দিকটাও কেটেছে একটু।

বাসের লোকেরা জানালো আর একটু ওপরে গেলেই শহর। ভালো হাসপাতাল আছে। নীচে না ফিরে এক্ষুনি সেখানে নিয়ে যাওয়া উচিত।

মালবীকে একরকম মেয়ে তিনটের কোলের ওপর শুইয়েই নরেন্দ্রনগরের ছোট্ট ঝক্‌ঝকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। শংকর বোসের কার্ড দেখে আর পরিচয় পেয়ে সেখানকার ডাক্তার যে একটু বাড়তি খাতির করবে জানা কথাই। তাদের হাসপাতালে এযাবৎ এত বড় ডাক্তারের কখনো পদার্পণ ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

তাদের সঙ্গে পরীক্ষা করে শংকরেরও মনে হল, আঘাত তত গুরুতর নয়। আর মেয়েরাও বলছিল, গাড়িতে আগে থেকেই ওদের দিদি বেশ অসুস্থ বোধ করছিলেন, থেকে থেকে আঁকতে উঠছিলেন কেমন।...নার্ভাস শকেও এরকমটা হতে পারে বটে, তবু শংকর নিশ্চিন্ত বোধ করল না খুব। কিন্তু মাথার এক্সরের ব্যবস্থা এখানে নেই।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে মালবী চোখ মেলে তাকালো। তার আগে তার মনে হচ্ছিল, সে উঁচু থেকে কোন গভীর অতলে পড়ছে তো পড়ছেই...কিন্তু কঠিন মাটির আঘাতে এতক্ষণেও শরীরটা ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে না কেন বুঝতে পারছে না। শেষে চমকে তাকিয়েছে।

তারপর বিমূঢ় খানিকক্ষণ। কোথায় শুয়ে আছে ঠাওর করতে পারল না। মেয়ে তিনটে আর ওই লোকটাও সামনে ঝুঁকে আছে। মনে পড়ল কোথায় আসছিল। মনে পড়ল কি অঘটন ঘটতে যাচ্ছিল। চারদিকে তাকালো একবার। এটা হাসপাতাল, হাসপাতালের কেবিন। তারপরেই দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ, এই লোক এখানে এলো কি করে? ষড়যন্ত্র কিছু? ড্রাইভারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল? সেই ড্রাইভারটা এক-একবার ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখছিল কেন?

এই চাউনি দেখেই শংকরের আবারও মনে হল, মাথার আঘাত গুরুতর নয়। ডাক্তারকে ইশারা করে সে সরে এলো। তার নির্দেশমত পরীক্ষা করে আর জিজ্ঞাসা করে এই ডাক্তারও একমত—মাথায় বেশি আঘাত লাগেনি। তার থেকে বরং হাতের কবজিতে বেশি লেগেছে। তবে পেসেন্টের ভিতরে ভিতরে কিছু একটা আতঙ্কের ব্যাপার চলেছে।

শংকর বোস কিছুক্ষণের জন্য তার ঘুমের ব্যবস্থা করে দিল।

বিকেলের আগেই মেয়েদের একরকম জোর করে নীচে অর্থাৎ ঋষিকেশে পাঠিয়ে দিল সে। বলল, ওদের দিদি ভালো থাকলে কাল তাকে নিয়ে যাবে, নয়তো সে একলা গিয়ে কিছু ওষুধ নিয়ে আসবে আর তখন ওদেরও খবর দেবে। শংকর বোস ওই ছোট কেবিনে ঢুকল সন্ধ্যার পর—যখন বেশ সুস্থ আছে খবর পেল। কিন্তু সে ঘরে ঢোকা মাত্র মালবীর চাউনি আবার খরখরে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে লাগল।

—বাঃ, বেশ ভালই তো আছেন দেখছি!

চুপচাপ দেখল একটু—নীলিমা রেখা আরতি ওরা কোথায়?

—ওদের ঋষিকেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখানে থাকার জায়গা নেই।

—এখানে রাত্রিতে আমাকে থাকতে হবে?

—তা তো হবেই।

—ডাক্তার বলেছে সেকথা?

শংকর ভাল মানুষের মতো মাথা নাড়ল।

—আর আপনিও থাকছেন?

—কি আর করা যাবে, যেমন দুর্ভোগ।

সন্দেহ বাড়ছে আর সেটা রাগের দিকে গড়াচ্ছে—দুর্ভোগ ভুগতে আপনাকে কে

বলেছে? আপনি কেন এসেছেন এখানে? আপনি চলে যান।

উঠে গম্ভীর মুখে শংকর ঘর ছেড়ে চলে এলো।

রাতে ওর খাওয়ার পর নার্স এসে জানালো, পেসেন্ট ট্যাবলেটটা খেল না, ঘুমের ওষুধ বলে সন্দেহ করছে, আর সে ঋষিকেশ চলে গেছে কিনা খোঁজ করছিল।

ওষুধের পুরিয়াটা নিয়ে শংকর ঘরে ঢুকল। সামনের চেয়ারে বসে বলল, আমাকে ডাকছিলেন শুনলাম?

মালবী তক্ষুনি ঝলসে উঠল—মিথ্যে কথা, আমি কক্ষনো ডাকিনি।

শংকর হাসতে হাসতে বলল, আপনার ছাত্রীরা থাকলে দেখত আপনি হঠাৎ কেমন ছোটটি হয়ে গেছেন! আচ্ছা পুরুষমানুষের মধ্যে তো আপনি পশু দেখেন, কিন্তু কোনদিন কাউকে কাছে ডেকে দেখেছেন তার সবটাই পশু কিনা?

—না। তাদের আমি চিনি, আপনাকে চিনেছি।...কিন্তু আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, যত অসহায় ভাবছেন ততো অসহায় আমি নই—

—কিন্তু আপনার বাক্সের ছোরা তো সেই ঋষিকেশে পড়ে আছে!

মালবী শয্যায় ওপরেই সোজা হয়ে বসল। তীব্র তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে।...সব জানে। এই সাহসেই তাহলে পিছু নিয়েছে! তাদের ড্রাইভারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই তাহলে অ্যাক্সিডেন্টটা করিয়েছে, তারপর মেয়েদের বিদায় দিয়ে ওকে এখানে আটকেছে। এবারে যেন লোকটার মধ্যে সত্যিই পশুটাকে দেখছে একটু একটু করে...সেটা আকার নিচ্ছে...কিন্তু ট্রেনের মতো সেই সিংহই তো দেখছে, যে পশু যত ভয়াবহই হোক, কোনো ছলাকলা-ষড়যন্ত্রের ধার ধারে না।...দেখতে কি ভুল হচ্ছে তাহলে?

বলে উঠল, শুনুন, কাল সকালেই আমি ঋষিকেশ যাব, রাতের গাড়িতেই আমি কলকাতা ফিরতে চাই, বুঝলেন?

শংকর তৎক্ষণাৎ সায় দিল, বেশ তাই চলুন, চেষ্টা করলে রিজারভেশন পেতেও পারি।

—আপনাকে কে যেতে বলেছে, আপনার পেসেন্ট নেই?

—পেসেন্টকে নিয়েই তো যাব বলছি। হাসছে। তারপর গম্ভীর হঠাৎ।—শোনো, আমি একজন মাত্র পেসেন্টকে নিয়ে কলকাতা থেকে বেরিয়েছে, আর তাকে সঙ্গে করেই কলকাতা ফিরব—মাসিমার সঙ্গে সেই রকমই কথা আছে।

উত্তেজনার মুখে একটা বড়সড় ধাক্কা খেয়ে মালবী হতভম্ব, বিমূঢ় খানিক।...লোকটা তাকে তুমি করে বলছে...মুখোশ খুলছে নাকি? সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মাসিমা মানে?

—মাসিমা মানে তোমার মা—সুমিতা মিত্র। আমার পেসেন্টের নাম মালবী মিত্র, ছেলেবেলায় আদর করে তাকে মিলু বলে ডাকতুম।

উঠে কাছে এসে দাঁড়াল। দু'হাতে তার মুখখানা ধরে একটু কাছে ঝুঁকল। বলল, কপালের এই কাটা দাগটা দেখো। এই সেই বোকা ছেলে যে গাড়ি চাপা পড়ে কটা দিন তোমার মাকে হাসপাতালে আটকে রেখেছিল, আর ক'টা দিনের জন্য তোমার মাকে কেড়ে নিয়েছিল।

মালবীর মাথাটা হঠাৎ ঝিমঝিম করে উঠল কেমন। কিছুই মনে পড়ছে না অথচ এরকমই কি যেন একটা সে লিখেছিল তার ডায়রি বইয়ে। মনে করতে গিয়ে মাথাটা ঘুরতে থাকল। তারপর খাট চেয়ার টেবিল ঘর—সবই ভয়ানক দুলতে লাগল। শরীরটা কাঁপছে কেমন। লোকটা মুখের কাছে জলের গেলাস ধরল। তারপর হাঁ করিয়ে একটা

পুরিয়ার গুঁড়ো-গুঁড়ো কি তার গলায় দিয়ে দিল। তারপর শুইয়ে দিল। মালবী দু'চোখ টান করে দেখতে চেষ্টা করল তাকে।

কিন্তু রাজ্যের ঘুম তার চোখে ভিড় করে আসছে।

। সাত।

এই গোছের স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া দেখে শংকর বোস খুব আশা করেছিল ব্যাধির কোনো সুপ্ত তারে ঘা পড়েছে, মালবীর মনের জট হয়তো সরল হয়ে যাবে।

কিন্তু তা হল না। আর তখনি তার মনে হল রোগের মূল উৎসে ঘা পড়েনি। কলকাতা রওনা হয়েছে তার তিন দিন বাদে। তার আগে নিঃসংশয় হবার জন্য হরিদ্বারের মিশন হাসপাতাল থেকে মাথার এক্সরে করিয়ে নিয়েছে। এদিক থেকে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবু মেয়েদের বুঝিয়েছে, ওই অ্যাকসিডেন্ট আর নার্ভাস শকের দরুন তাদের দিদির আচরণ একটু-আধটু অন্যরকম দেখাই স্বাভাবিক। তার জন্য উতলা হবার কারণ নেই।

একটা ফার্স্ট ক্লাস কুপেতে মেয়েদের চারজনকে দিয়েছে। নিজে পাশের বার্থে থেকেছে। দু'দিনের মধ্যে একবারের জন্যেও এদিকের কূপেতে মুখ দেখায়নি। তার নির্দেশমতো মেয়েরা তাদের দিদিকে ওষুধ আর পথ্য খাইয়েছে।

সমস্ত পথ মালবীর পাথর-মূর্তি।...মা তার সমস্ত আনন্দ মাটি করেছে।...মা এত বড় বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারে তার সঙ্গে?...কি করলে মায়ের সব থেকে উপযুক্ত শাস্তি হয় মালবী জানে না।... মা ওকে বোঝাতে চাইবে যা করেছে ওরই ভালোর জন্যে করেছে। ...কিন্তু পুরুষমানুষকে যে বিশ্বাস করা চলে না...যাক, মায়ের মতো এমন নির্বোধ বিশ্বাসঘাতক আর কে আছে?

...দু'দিন ধরে লোকটা আড়াল নিয়ে আছে। না, মালবী আর ভয় পাচ্ছে না। মেয়েরা আছে, তা ছাড়া তার বাক্সে পশু শায়েস্তা করার সেই জিনিসটাও আছে।...সম্পর্কের ছুতো ধরে মাকে ভুলিয়েছে, কিন্তু ওকে চেনেনি এখনো।

অপরেশ গুপ্তকে আগেই টেলিগ্রাম করে রেখেছিল। যথাসময়ে সে গাড়ি নিয়ে স্টেশনে হাজির। মেয়েদের একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে মালবীকে নিয়ে তারা গাড়িতে উঠল। তার মনে অবিশ্বাস অথচ গাড়িতে ওঠার আগে সেটা তার মাথায় এলো না। গাড়ি চলতে শুরু করার পর থমথমে চোখে দু'জনকেই দেখতে লাগল। শংকর বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, অপরেশ গুপ্ত ঘটা করে দু'হাত কপালে ঠেকালো। কিন্তু মালবী মাথা নাড়ল কি নাড়ল না।

বন্ধুকে একেবারে মুখ সেলাই করে বসে থাকতে ইশারা করল শংকর।

বাড়ি।

দোরগোড়ায় শংকরের গাড়ি দেখেই সুমিতা মিত্র ছুটে নেমে এসেছেন। তারপর মেয়ের মুখের দিকে চেয়েই শংকায় স্তব্ধ। গাড়ি থেকে নেমে তাঁকে একটা প্রণামও করল না। শংকর নীরবে অভয় দিল তাঁকে।

মালবী ঘরে পা দিতেই গম্ভীর স্বরে বলল, দাঁড়াও!

দাঁড়িয়ে গেল। গলায় স্বরটা হুমকির মতো ঠেকল। নিজের বাড়ি, নিজের ঘর, ভয়ের কারণ নেই। তাছাড়া লোকটাকেও শেষবারের মতো দেখা দরকার।

এগিয়ে গিয়ে শংকর হাত ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল তাকে।—বোসো একটু, আমার গোটাকয়েক কথা তোমার শুনে রাখা দরকার। মাসিমা বোসো, অপু বোস্—

নিজে না বসে মালবীর মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল।—শোনো, তুমি সিংহ দেখেছিলে, খুব ভুল দেখোনি।...তোমার ব্যবহারে তোমার ছাত্রীদের কিছু কিছু সন্দেহ হয়েছে, সেটা আরো বাড়ুক তুমিও চাও না বোধ হয়।...তোমার মা তোমার কাছে কতটুকু তুমিই জানো, কিন্তু আমার মাসিমা আমার কাছে অনেকখানি...বিশ বছর পরে তাঁকে পেয়েছি বলে আরো অনেকখানি। আমার ওপর রাগ করে তাঁর সঙ্গে যদি এতটুকু খারাপ ব্যবহার করো, মাসিমাকে আমি আমার কাছে নিয়ে যাব আর তোমাকে আমি হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করব—দরকার হলে ঘুমের মধ্যে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে তোমাকে নিয়ে যাব—আমি শংকর বোস, ডাক্তার হিসাবে আমার কথার নড়চড় হয় না। তুমি বাড়ি থেকে চাকরি রাখতে চাও কি হাসপাতালের পাহারায় থাকতে চাও, সেটা তোমার ব্যবহারের ওপর নির্ভর করছে।

গমগমে কথার ধাক্কায় ঘরের বাতাসসুদ্ধু থমথমে হয়ে গেল যেন। মালবী প্রায় বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। শংকর বোস ঘুরে দাঁড়াল।—মিলু ভালই আছে মাসিমা, কিছু ভেবো না, সম্ভব হলে বিকেলের দিকে কোথাও থেকে আমাকে একটা ফোন কোরো। এখন থেকে রোজই একবার করে অন্তত আসব আমি, এখন চলি, আয় অপু—

কোনদিকে না চেয়ে সটান বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। পিছনে অপরেশ।

একটু বাদে চমক ভেঙে আত্মস্থ হল মালবী। দুঃসাহসের কথাগুলো যেন কানের পর্দায় নতুন করে ঘা দিল। মায়ের দিকে তাকালো। মা নির্নিমেষে তাকেই দেখছে। মালবীর দু'চোখ ধারাল স্থির-কঠিন।

—খুব বিশ্বাসের পাত্র পেয়েছ, কেমন? এত বিশ্বাসের পাত্র যে একটু খারাপ ব্যবহার করলে আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে তোমাকে নিজের কাছে রাখবে! এত বিশ্বাসের পাত্র যে বিশ বছরের খবর না নিয়েই খুব চালাকি করে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে হরিদ্বারে পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছ...এমন বিশ্বাসের পাত্র পেয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত, না?

সুমিতা কি যে বলবেন ভেবে পেলেন না। নিজেই তিনি সব থেকে বেশি হকচকিয়ে গেছেন। ঠেকে ঠেকে বললেন, কত আপনার জন ছিল...কত বড় ডাক্তার হয়েছে...বিশ্বাস না করার কি আছে...তোর জন্যে ভেবে আমি...

—থাক্। মেয়ে ছিটকে উঠে দাঁড়াল। পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করতে হবে? বলতে লজ্জা করে না তোমার? কাকা আপনার জন ছিল না? তাকে খুব বিশ্বাস করেছিলে, না?

সবেগে ভিতরে চলে গেল। পায়ের ধাক্কায় চেয়ারটা মাটিতে উল্টে পড়ে গেল। সুমিতা মিত্র স্তব্ধ, বিবর্ণ।

ড্রাইভারটা বাংলা বোঝে, তাই কানের কাছে মুখ এনে অপরেশ বলল, কী রে নিজের সর্বনাশটি করেই এসেছিস্ মনে হচ্ছে?

শংকর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাই।

—আমার তাহলে পোয়া বারো বল্?

শংকর আস্তে আস্তে ঘুরে তাকালো তার দিকে। বলল, পোয়া বারো ভাবার মতো সত্যি তোর সাহস আছে? মুরোদ আছে?

—সাহস আছে তবে মুরোদ নেই, সেটা তুই যোগালে হতে পারে। এই গোছের ঘটনা কিছু ঘটতে পারে আশা করেই এ পর্যন্ত দিন তিনেক শিখার সঙ্গে দেখা করেছি, আমি বিগড়ে গিয়ে পাছে ওর ভাবী ব্যবসার পরিকল্পনার ব্যাগড়া দিই সেই ভয়েই যা একটু খাতির-যত্ন করেছে।...কিন্তু তোর ব্যাপারখানা কি?

—বাড়ি চল, বলছি।

বাড়িতে পা দিয়ে বিশ্রামেরও তর সইল না শংকরের। অপরেশকে বলল, শোন্ বিলেতে থাকতে স্টিফানি বলে একটা মেয়ে আমাকে পছন্দ করত...তোকে বলেছিলাম?

অপরেশ মাথা নাড়ল। অর্থাৎ কিছুটা শুনেছে।

—সেই স্টীফানি সমুদ্রের ধারে বসে আমাকে একদিন বলেছিল, তুমি নিজে না মজলে কোনো মেয়ে জীবনভোর তোমার মনের নাগাল পাবে না—নিজে থেকে কেউ সেধে এলে তার অদৃষ্টে দুঃখু আছে।...কত বড় সত্যি কথা বলেছিল বুঝি নি অপু, শিখাকে তুই সত্যিই বাঁচাতে পারিস?

বড় ডাক্তার-বন্ধুর এই গোছের আকৃতি বিস্ময়কর। তবু হাল্কা করেই বলল, অর্থাৎ নিজে থেকে মালবীর প্রতি মজেছিস!

—হ্যাঁ,—হ্যাঁ—ওকে দেখামাত্র আমার মনে হয়েছে ওর জন্যেই ভিতরে ভিতরে এই বিশটা বছর অপেক্ষা করে বসে আছি—আরো কি মনে হয়েছে তোকে বোঝাতে পারব না... কিন্তু শিখার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব কি করে? মালবী ভাল হতে পারে—ভাল হবেই সে—কিন্তু হবে কি হবে না তোর ওপর নির্ভর করছে। ঠাট্টা ছেড়ে সত্যি পারবি তুই শিখাকে তোর দিকে ফেরাতে? যদি পারিস তোর কেনা হয়ে থাকব অপু।

গম্ভীর চোখে খানিক তার দিকে চেয়ে থেকে অপরেশ জবাব দিল, বাজিতে এক বছরের জন্য আমিই তোর কেনা হয়ে আছি! তার মেয়াদ এখনো ফুরোয়নি।...কিন্তু একটা মুশকিল, আমার রেস্তর জোর তো তোমার জানা আছে বন্ধু, শিখার স্বপ্ন অর্থাৎ তার নার্সিং হোমের কি হবে—তিন লাখ টাকা ছাড়তে রাজী আছ—ওইরকমই দরকার হবে বলে আমাকে বুঝিয়েছিল সেদিন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দরকার হলে তার বেশিও দেব—আর সেটা যাতে দাঁড়ায় আমি নিজে তার জন্যে প্রাণপণ খাটব। আমার দিকের অর্ধেক শেয়ারের চার আনা তোর চার আনা আমার—চাস তো তোর সবটাই হতে পারে।

—থাক থাক, ওই কন্যা সমেত চার আনা সামলাই আগে। ঠিক আছে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বন্ধু, আমার ধারণা প্রেম এত দুর্মূল্য নয়।

—আমাকে ফাঁসাবি না তো?

জবাবে ফুঃ করে একটা ফুৎকার ছাড়ল অপরেশ গুপ্ত।

॥ আট ॥

দিন আট-নয় বাদে একবার শুধু টেলিফোনে ধরতে পেরেছিল অপরেশ গুপ্তকে। সে বলেছে মুখ দেখানোর জো নেই বলে মুখ দেখাতে পারছে না তাকে।

—কেন? কি হয়েছে?

ওদিক থেকে জবাব এসেছে, কিছু হয়নি, শিখা বিশ্বাস আমাকে ধরে শুধু শপাং শপাং

চাবকেছে। হাতে নয়—মুখে, তবে এরপর ফের দেখা হলে পিঠে চাবুক পড়বে বলে শাসিয়েছে।

—বলিস কি রে! তুই কি করলি?

—কিছু করিনি। বলেছি আবার যদি আসি তো চাবুকের আশাতেই আসব।...টাকা দিয়ে প্রেম কেনা গেল না বলে খুব দুঃখ হবার কথা, কিন্তু সেরকম দুঃখও হচ্ছে না।

—তাহলে?

—তাহলেও এ বান্দা আশা ছাড়ছে না, মাইরি বলছি, মেয়েটাকে অত ভালো আর কখনো লাগেনি—পতঙ্গ হয়ে শিখাতে ঝাঁপ দেব তবে তোকে মুখ দেখাব, তার আগে নয়।

বলেই ঝপ্ করে টেলিফোন ফেলে দিয়েছে। তারপর এই তিন সপ্তাহ একেবারে নিপাত্তা। কোথাও ওর টিঁকির খোঁজ মিলছে না। কি যে হল তাও ভেবে পাচ্ছে না। আরো আশ্চর্য, সে যে ফিরে এসেছে জেনেও শিখা একবার আসা দূরে থাক, এযাবৎ একটা টেলিফোনও করেনি। শংকর বোস এই কারণেই আরো বেশি বিভ্রান্ত।

এদিকে সুমিতা মাসির বাড়িতেও রোজ যেতে হচ্ছে। যেতে হচ্ছে, আবার নিজেরও তাগিদেও যাচ্ছে। মাসির খবর, ভালো কিছু দেখছেন না, উল্টো এক-এক সময় খারাপই মনে হয়। সর্বক্ষণ থমথমে মুখ। মায়ের ওপর সব থেকে বেশি রাগ, ওই ডাক্তারকে অর্থাৎ তাকে অত বিশ্বাস করে বলে।

হরিদ্বার থেকে ফিরে এসে সেই প্রথম দিন পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করা নিয়ে মালবী কত বড় কঠিন কথা মাকে বলেছিলে, মাসির কাছ থেকে শংকর তাও একরকম জোর করেই জেনে নিয়েছে। মেয়ের মুখ চেয়ে মাসি এবারও সংকোচ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। মালবীর ওই উক্তির ভিতরে ঢুকে শংকর বোস যে কত রকমের পথ খুঁজেছে ঠিক নেই।

মাসি আরো কিছু বলেছেন পরে, যা একটু আশাপ্রদ। বলেছেন, মনে মনে তোমাকেই যা একটু ভয় করে মনে হল। অত রাগ সত্ত্বেও ওই প্রথম দিনের পর আমাকে আর কিছু বলেনি। ওষুধপত্র যা দাও, সামনে এনে ধরলে যত রাগই হোক পাছে তোমাকে বলে দিই সেই ভয়ে খেয়ে ফেলে। এখনো ছুটি চলছে ওদের, আবার কোথায় বেরুবে শুনে তোমাকে জিজ্ঞেস করার কথা বলতে জ্বলতে জ্বলতে চলে গেল।

আর একদিন বললেন, আমার থেকেও তোমার ওপর বেশি রাগ আর তোমাকে বেশি অবিশ্বাস। অথচ তুমি না আসা পর্যন্ত বার বার দূর থেকে দেখে যায় তুমি এলে কিনা।

শংকর বাড়িতে পা দিয়েই প্রথমে মাসি বলে হাঁক দেয়, তারপর মাসির ঘরে ঢোকে। পরে মালবীর ঘরে যায়। হাসে, ঠাট্টা করে, হরিদ্বারে মেয়ে কি রকম নাজেহাল করেছে মাসির কাছে সেই গল্প করে। মালবী পাথরের মতো বসে থাকে, আর পারলে যে তাকে ঘর থেকে বার করে দেয়, এক-একবার ঘোরালো চোখে তাকিয়ে তাও বুঝিয়ে দেয়।

দু'দিন মাসিমা আর মালবীকে নিয়ে নিজের গাড়ি করে বেরিয়েছে। প্রস্তাব করতেই মালবী সাফ জবাব দিয়েছে, যাবে না। শংকর গম্ভীর তক্ষুনি।—অবাধ্য হলে কিন্তু সিংহ দেখতে হবে। মাসিমা সঙ্গে আছেন, না বেরুলে তুমি অসুস্থ ধরে নেব।

স্তব্ধ রাগে গাড়িতে উঠে বসেছে।

দু'বারের একবার তাকে হাসপাতালে এনে কয়েকটা শক্ দিয়ে দেখেছে কি ফল হয়। আশাপ্রদ কিছুই মনে হয়নি। আর একবার অনেক জায়গায় বেড়াবার পর একটা ভাঙা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মালবীকে জিজ্ঞাসা করেছে, বাড়িটা চিনতে পারো?

বিরক্ত চোখে মালবী বাড়িটা দেখেছে শুধু, জবাব দেয়নি।

শংকর বলেছে, এই বাড়িতে তোমরা থাকতে। এগারো বছরের সেই বোকা ছেলেটা গাড়ি-চাপা পড়ে মাসি পেয়েছিল, তারপর এ-বাড়িতে তোমার সঙ্গে কিছুদিন থেকেছিল। তুমি তখন সর্বক্ষণ ঝগড়া করতে আমার সঙ্গে।

সেই প্রথম সাগ্রহে খানিক বাড়িটাকে দেখেছিল মালবী। ভাসা ভাসা কিছু যেন মনে পড়ছে।...দেখতে ভালো লাগছে। তারপর হঠাৎ চাপা উত্তেজনায় কঠিন হঠাৎ।—আমি এখানে থাকতে চাই না, চলুন!

এই একটা মাস শংকর কেবল ভেবেছে আর ভেবেছে। দিবারাত্র ভেবেছে। দুনিয়ায় পেসেন্ট যেন তার এই একটিই। মালবীর কলেজ খুলেছে। জোর করে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে আরো তিন সপ্তাহের ছুটি নিইয়েছে তাকে। গম্ভীর মুখে ভয় দেখিয়েছে, কলেজ করতে গেলে বিপদে পড়বে, তখন চাকরি রাখাই দায় হবে। তখন তোমার চলবে কি করে?

মালবী শোনা মাত্র জ্বলে উঠেছে। কলেজ যাবে বলে শাসিয়েছে। কিন্তু তলায় তলায় ভয়ও পেয়েছে। শেষে মায়ের কাছে এসে ঝাঁজিয়েছে, তোমার ওই দুনিয়ার সেরা বিশ্বস্ত ডাক্তারকে বলো সার্টিফিকেট দিয়ে যেতে।

ভেবে ভেবে একটা চমকপ্রদ পন্থাই মাথাই এসেছে শংকর বোসের। বিলেতের নামজাদা মনস্তত্ত্ববিদ চিকিৎসক ডক্টর জর্জ ফ্রাংকলিনকে হাবুডুবু-খাওয়া রোগী নিয়ে অনেক রকম কাণ্ড কারখানা করতে দেখেছে, যা চিকিৎসার বইয়ে নেই। আশাতীত ফলও পেতে দেখেছে। সেই রাস্তা ধরে চিন্তা করতে গিয়েই এরকম একটা আসুরিক পন্থা মাথায় এসেছে তার। নিজেই উত্তেজনায় অধীর তারপর থেকে।

...কিন্তু অপরেশ হতভাগার একটা খবর নেই। ওদিক থেকে কোনো সাড়া না পেলে জীবনের এত বড় একটা ফয়সালা করতে যাবে কোন্ ভরসায়? অধীর আগ্রহে তার অপেক্ষায় থেকে থেকে তিক্তবিরক্ত। ধৈর্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে যখন, বিকেলের দিকে টেলিফোন একটা। ওধারের গলা শুনেই রক্ত অর্ধেক জল।

—হ্যাঁ, আমি শংকর বোস।

—আমি শিখা বিশ্বাস।...চেনা কেউ মনে হয়?

ভিতরে ভিতরে খাবি খাচ্ছে।—কি কাণ্ড, বলো....

—নতুন পেসেন্ট নিয়ে ব্যস্ত খুব? ডিসটার্ব করছি না তো?

—ব্যস্ত, তবে এখন ব্যস্ত নই..। ওদিকের গলার স্বর শুনেই শংকা বাড়ছে।

—তোমার বন্ধু অপরেশ গুপ্তর খবর কি?

—তোমার চাবুকের ভয়ে পালিয়ে আছে, দেখা পাচ্ছি না।

—আমার একটু ভুল হয়েছে, চাবুকটা তোমার দিকে চালানো উচিত ছিল।...তুমি কি ভেবেছিলে তোমার মুখ থেকে সব জানার পরেও তোমার কাছে আমি দয়া চাইতাম?

কি জবাব দেবে শংকর ভেবে পেল না। নিরুত্তর একটু চুপচাপের পর ওদিকের সাড়া মিলল এবার। আজ সকালে তোমার বন্ধুর এগারো পাতা জোড়া রেজিস্ট্রী চিঠি পেলাম। চিঠিটা বাঁধিয়ে রাখার মতো, ও-রকম ফাজিল লোক এ চিঠি লিখতে পারে বিশ্বাস করা শক্ত।...তুমি খসড়া করে দাওনি তো?

শংকর আড়ষ্ট। না, আমি ওকে তিন সপ্তাহ ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।...কি লিখেছে?

—এগারো পাতার চিঠি টেলিফোনে শুনবে? যাক, সে আমার কাছে দুটো মহামূল্য জীবন আর একটা মূল্যহীন জীবন ভিক্ষা করেছে। মহামূল্য জীবন দুটো তোমার আর তোমার পেসেন্ট মালবী মিত্রর। আর মূল্যহীন জীবনটা তোমার বন্ধুর নিজের।...শুনতে কেমন লাগছে?

সব ফাঁস করে দিয়েছে বুঝেই দ্বিধা আর ছলনা ছেড়ে একান্ত আগ্রহে টেলিফোনের রিসিভারের ওপরেই ঝুঁকল শংকর বোস, শিখা, তোমার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?

—না। তোমার বন্ধুকে পাঠিয়ে দিও।

—কিন্তু তার যে দেখাই পাচ্ছি না।

—পাবে। তার বাড়িতে খবর দিও, আমি খোঁজ করেছি।

ওদিকের রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ। শংকর বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই বিপুল মুক্তির স্বাদ।

প্ল্যান সব ঠিক করাই ছিল। দু'দিন বসে শুধু নিজের স্নায়ুগুলো সংহত করল শংকর বোস। লক্ষ্য একবার স্থির হলে সে আপস জানে না।

তৃতীয় দিন বেলা সাড়ে দশটার সময় তার গাড়িটা এসে নিঃশব্দে সুমিতা মাসির দোরগোড়ায় দাঁড়াল। এবার ঘরে ঢুকে সে আর মাসি বলে হাঁক ছাড়ল না।

মালবী চানে ঢুকেছে। শংকর ঠিক এই সময়েই আসবে সুমিতারও জানা ছিল। এসেছে টের পেয়েই তিনি চুপচাপ নেমে এলেন। হাতের কাগজে মোড়া জিনিসটা ওর হাতে দিলেন। সেটা নিয়ে শংকর প্রস্থান করল।

সুমিতা সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মনে উদ্বেগ। কি যে মাথায় আছে ছেলেটার কিছুই ঠাওর করতে পারছেন না।

বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ ওই গাড়িই আবার এসে দাঁড়াল। সুমিতা তখন বাড়ি নেই, নেই যে সে শুধু শংকর জানে, মালবীও জানে না। নেমে সোজা দোতলায় উঠে গেল। মালবীর ঘরের সামনে এসে দরজায় টোকা দিল গোটা কতক।

দরজা বন্ধ ছিল না, ভেজানো ছিল। মালবী সে দুটো খুলে সামনে দাঁড়াল। এসময় তাকে দেখে অবাক একটু।

এক পিঠ খোলা চুল, পরনে ফর্সা আটপৌরে শাড়ি, গায়ে সাদামাটা জামা।

মুহূর্তের জন্য শংকরের দু'চোখ রমণী-দেহের ওপর থমকালো যেন। তারপর বলল, এক্ষুনি বেরুতে হবে একটু, চলে এসো। যেমন আছ তেমনি এসো—গাড়িতে তো যাওয়া-আসা।

মালবী আরো অবাক।—কোথায়?

—আমার ওখানে।

মুহূর্তের মধ্যে মালবীর সেই চিরাচরিত রূঢ় সন্দিগ্ধ চাউনি। তারপর মায়ের ঘরের দরজার দিকে তাকালো।

শংকর বলল, মাসিমা আমার ওখানে। হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, শুয়ে আছেন। তোমার জন্য ব্যস্ততা দেখে নিতে এলাম। এসো।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ সাদা মালবীর।—স্ট্রোক নয় তো?

—স্ট্রোক হলে তাঁকে ফেলে আমি তোমাকে নিতে আসি? দেরি কোরো না—

ঘুরে সিঁড়ির দিকে চলল। স্যাণ্ডালটা পায়ে গলিয়ে মালবীও পিছনে পিছনে নেমে এলো। শংকর নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছে। দরজা খুলে দিতে মালবী পাশে উঠে বসল। হঠাৎ খবরটা শুনে বুকের ভিতরটা কাঁপছে কেমন। মুখ ফিরিয়ে বারকয়েক পাশের দিকে তাকালো।...এই মানুষটা যেন বড় বেশি নির্লিপ্ত।

বাড়িতে ঢুকে মালবীর মনে হল দ্বিতীয় আর কোন জন-প্রাণী নেই—এত বড় বাড়িটা যেন নির্জনতায় খাঁ-খাঁ করছে।

শংকর ওকে দোতলায় নিয়ে এলো। তারপর শোবার ঘরে। খাটটা দেখিয়ে বলল, বোসো। ঘুরে দরজা বন্ধ করতে লাগল।

মালবী হতচকিত কয়েক মুহূর্ত। ঘরে আর কেউ নেই। অন্য দরজা-জানালাগুলোও সব বন্ধ। পরক্ষণে সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি একটা। চেঁচিয়ে উঠল, দরজা বন্ধ করছেন কেন? মা কই?

দরজা লক্ করে শংকর ঘুরে দাঁড়াল তার দিকে। চোখের কোণে হাসি। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি। জবাব দিল, ছল করে তাঁকেও অন্যত্র কোথাও পাঠানো হয়েছে, নইলে তোমাকে একলা পেতাম কি করে? হাসছে অল্প অল্প।—একবার এই ফাঁদে পা দিয়েছিলে, আবারও ঠিক একই ফাঁদে পা দিলে, কেমন না? তোমার বরাত মন্দ, এ লোকটা তোমার সেই এক প্রেমিকের মতো অত কাঁচা নয়।

অস্বাভাবিক তীব্র তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে মালবী। দু'চোখে আগুন ঠিকরোচ্ছে। সেই সঙ্গে মাথার মধ্যে কি যেন সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে—ঝমঝম ঝমঝম করে শব্দ হচ্ছে। ...এগারো বছর আগের সেই একজনকেই তো দেখছে, মায়ের অসুখ বলে যে তাকে বার করে এনেছিল—অন্য মুখোশ পরা সেই একজনকেই দেখছে!

শংকর বোস কাছে এগিয়ে এলো। খুব কাছে।—সিংহ এতদিন সত্যিই দেখোনি, আজ দেখবে।

নিজের অগোচরে মালবী খাটের দিকে দু'হাত সরে গেলে। গায়ের বুশ শার্টটা খুলে শংকর বোস দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর এগিয়ে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ থেকে ঝক্‌ঝক্ একটা ছোরা বার করল। সামনে এগিয়ে এলো আবার।—এটা চিনতে পারো? তোমারই অস্ত্র, তোমারই বাক্সে থাকে।

আরো উদ্‌ভ্রান্ত ধক্‌ধকে চোখে ছোরাটা দেখল মালবী। ওরই জিনিস দেখামাত্র চিনেছে।

ছোরাটা পাশের সেন্টার টেবিলে রাখল শংকর। চোখে মুখে হাসি চুঁয়ে পড়ছে। আবার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর আচমকা শক্ত-সবল দুই হাতে ওকে টেনে এনে নিজের বুকের সঙ্গে যেন পিষে ফেলতে চাইল। সেই সঙ্গে দুই ঠোঁটে ওর অধর নিপীড়নে দম বন্ধ করে দেবার উপক্রম!

প্রাণপণে দু'হাতে তাকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করছে মালবী। পারছে না। বিকৃত গলায় চিৎকার করে উঠল, ছাড়ুন! সরে যান!

—চেঁচিও না। গলা ফাটালেও কেউ টের পাবে না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ইনজেক্‌শন দেব, তুমি নড়তেও পারবে না। ছাড়ার জন্যে এত কষ্ট করে ধরে আনিনি।

কথা শেষ না হতে দু'হাতের প্রচণ্ড ধাক্কায় পুরু গদির খাটটার ওপর আছড়ে পড়ল মালবী। আর্ত, বিস্ফারিত দুই চোখ। শংকর বোস ঝুঁকে এগিয়ে এলো, মায়াদয়াশূন্য নির্মম নিষ্ঠুর। বুকের কাপড় আগেই সরে গেছল. হ্যাঁচকা টানে গায়ের জামাটাও ছিঁড়ে গেল। তার ওপর ঝুঁকে পড়ে নিষ্পেষণে হাঁড়-পাঁজর গুঁড়িয়ে দিতে লাগল, রমণীর অধর ক্ষতবিক্ষত করে দিতে লাগল।

চোখে অন্ধকার দেখছে মালবী, মাথার মধ্যে মৃত্যুর দামামা বাজছে।

আস্তে আস্তে উঠে বসল শংকর। তীব্র চোখে চেয়ে রইল খানিক। তারপর টেনে তুলে ওকেও বসালো, তারপর যে কথাগুলো কানে এলো মালবীর, ওই অবস্থাতেও বিভ্রান্ত কয়েক মুহূর্ত।

ছোট টেবিলের ঝক্‌ঝকে ছোরাটা দেখিয়ে শংকর বলল, এবার ওই নাও তোমার ছোরা—ওটা আমার বুকে বসাবার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দেব তোমাকে। আমি বাধা দেব না। তোমার কাজ শেষ করে তুমি দরজা খুলে চলে যাবে। ধরা পড়লেও লোকে জানবে শংকর বোসের পাপের শাস্তি দিয়েছ তুমি। পশু মেরেছ—তোমার মা সাক্ষী থাকবে—তুলে নাও ওটা।

মুহূর্তের জন্য দুর্বার লোভে আর উন্মত্ত আক্রোশে ছোরাটা তুলে নেবার জন্য দু'চোখ চকচক করে উঠল। তার পরেই সংশয়, এই লোকের কথা বিশ্বাস করবে কি করবে না জানে না।

আরো নির্মম কঠিন স্বরে শংকর বোস বলল, মানুষের মধ্যে এতকাল তুমি শুধু পশুই দেখেছ, তাকে হত্যা করার জন্য এতকাল ধরে তুমি শুধু ওই অস্ত্র শানিয়েছে—সেই পশু এখন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে—ওটা তোমাকে তুলে নিতে হবে—এই বুকে বসাতে হবে—গেট্ আপ্ অ্যাণ্ড গেট্ ইট্।

কি যে আবার হচ্ছে মাথার মধ্যে মালবী বুঝছে না। সে-ও তো চাইছে ওই ছোরাটা তুলে নিতে—এতকাল ধরে চেয়ে আসছে, কিন্তু পারছে না কেন? সে কি ঘুমিয়ে আছে? ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে?

থমথমে মুখে শংকর বোস উঠে দাঁড়াল। হাত-চারেক দূরে দাঁড়িয়ে আবার একটু নিরীক্ষণ করল ওকে। তেমনি মায়াদয়াশূন্য দৃষ্টি। একটি একটি করে কথা বেরুতে থাকল যেন তার মুখ দিয়ে।—তোমাকে আগেই বলেছি, মানুষের মধ্যে পশুও থাকে। মানুষ তার থেকে বড় হয়ে উঠলে সেই পশু নিজেকে গুটিয়ে রাখে। তবু থাকেই সে। মানুষ মরে মরুক, তবু সেই পশুটাকেই তুমি বড় করে টেনে হত্যা করার জন্য দিন গুনছ।...তুমি মানুষ শংকর বোসকে দেখেছ, শিক্ষাদীক্ষায় বড় ডাক্তার শংকর বোসকে দেখেছে—হরিদ্বারে তোমাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও সে শুধু সাহায্যই করেছে—কিন্তু তার মধ্যেও তুমি মানুষ ছেড়ে পশুটাকে দেখেছ আর দেখতে চেয়েছ। আজ দেখতে পেলে। এই পশুকে মারলে মানুষটাও মরবে—কিন্তু মানুষ তোমার লক্ষ্য নয়—তোমার লক্ষ্য পশু।...আমার কথার নড়চড় হবে না, হয় না, আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব, তার মধ্যে তুমি উঠে ওটা নেবে, নিয়ে যা বললাম, করবে। না করলে আমিই ওটা তুলে নিয়ে নিজের বুকে বসাব—তোমার চোখের সামনে শংকর বোস মরবে আর পশু মরবে।

এ কি দেখছে মালবী! কাকে দেখছে? কার কথা শুনছে? মাথার ভিতরটা এরকম করছে কেন?

—এক।

বিষম চমকে উঠল মালবী। সর্বাঙ্গে সেই চমকের ঝাঁকুনি। কিন্তু ও নড়তে পারছে না কেন? মাথার ভিতর থেকে এ কিসের বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে তার?

—দুই।

—ও কে? ও-রকম চেয়ে আছে কেন? আত্ম-ধ্বংস করার জন্য ও কেন ওই বীভৎস ছোরাটার দিকে এগিয়ে আসছে?

—তিন!

—না না না না না! অন্তরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে আলুথালু অবস্থায় ছোরাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মালবী।—না না না! ছোরাটা স্পর্শ করার আগেই সেটা ছিনিয়ে নিয়ে পাগলের মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলেই তেমনি উদ্ভ্রান্ত ত্রাসে দু'হাতে আঁকড়ে ধরল মানুষটাকে।—না না—না গো না—না! সেই ত্রাসেই তাকে দু'হাতে বিছানায় টেনে এনে সবলে ধরে রাখতে চাইল। না গো না—না গো না।

সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে মালবীর। কাঁপতে কাঁপতে শরীর স্থির হয়ে আসতে লাগল, শংকরের কোলের ওপরেই চেতনা হারিয়ে দেহ এলিয়ে দিল।

দুই বাহুতে তাকে আগলে রেখে শংকর স্থানুর মতো বসে। মাথার উপর পুরোদমে পাখা ঘুরছে। তবু ঘামছে দরদর করে। আর চোখের কোণ দুটো চিকচিক করছে।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই গাড়ি থেকে নামল শংকর বোস। মালবীকে ধরে নামালো। তারপর তাকে ধরেই আস্তে আস্তে ওপরে নিয়ে এলো।

বারান্দার ওধারে আবছা অন্ধকারে সুমিতা দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওদের দেখে সেখান থেকেই থমকে তাকালেন।

এধার থেকে বাহু ছেড়ে দিয়ে শংকর বলল, মায়ের কাছে যাও।

মালবী পায়ে পায়ে মায়ের দিকে এগোলো। দেখছে মাকে। সুমিতারও বুকের ভেতরটা কেমন যেন কাঁপছে। কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পারছেন।

খুব কাছে এসে মালবী মাকে দেখতে লাগল। তারপর ছোট মেয়ের মতই তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর দু'হাতে তাকে জাপটে ধরে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল—মা মা, আমার মাগো! কত কষ্ট দিয়েছি তোমাকে—

সুমিতাও ওকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। পরম মমতায় ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, না রে না, এখন আমি মরলেও সুখ...তোকে ফিরে পেলাম, এখন আমি আমার সব পাপের পায়শ্চিত্তও করতে পারব।

তাঁর বুকের মধ্যেই মালবী শিউরে উঠল, না মা, অমন কথা বোলো না! আমি হারিয়ে গেছলাম...ও-কথা বললে আবার আমি হারিয়ে যাব।

দূরে দাঁড়িয়ে শংকর বোস চেয়ে চেয়ে দেখছে।

॥ নয় ॥

সকলের জলখাবারের ব্যবস্থা করার জন্য সুমিতা হাসিমুখে ঘর থেকে বেরুতেই শিখা বিশ্বাস ফোঁস করে উঠল।—খুব আনন্দ দেখি যে সকলের, জীবন ক'টা এখনো আমার হাতেই আছে, এখনো দান করা শেষ হয়নি—

মালবী সঠিক না বুঝেও হেসে তাকালো তার দিকে।

শিখা বলল, এখনো তোমাদের এই তিনটে জীবন আমার হাতের মুঠোয় সে-খবর রাখো?

মালবী মাথা নাড়ল, রাখে না।

অপরেশ গুপ্ত বলে উঠল, দাতার অত ভণিতা করে কাজ কি, দানটা করেই ফেলো না।

শিখা এবার শংকর বোসের দিকে তাকালো।—কি মশাই, করব?

শংকর বোস ভালমানুষের মতো মাথা নাড়ল।

—উহুঁ ওতে হবে না, হাতজোড় করে বলো।

তক্ষুনি হাত জোড় করল শংকর বোস, দেবী প্রাণভিক্ষা দাও।

সঙ্গে সঙ্গে বড় নিঃশ্বাস ছাড়ল অপরেশ গুপ্ত।—আহা, ভেতরটা যেন মাখন হয়ে গেল।

মাথা নেড়ে শিখা বলল, না, এখনো শর্ত আছে।

অপরেশ গুপ্ত হড়বড় করে বলে উঠল, জানি জানি, সব শর্ত মঞ্জুর, তোমাকে বিয়ে করতে হবে, তোমাকে খেতে-পরতে দিতে হবে, তোমার দাসানুদাস হয়ে থাকতে হবে, আর আমার লেখা সেই এগারো পাতার চিঠিটা বাঁধিয়ে দিতে হবে।

ভ্রূকুটি করে শিখা জবাব দিল, সে শর্ত তো তোমার সঙ্গে, তোমার বন্ধুর সঙ্গেও কি সেই শর্তই হবে নাকি?

—কি সর্বনাশ!

সকলে হেসে উঠল। শংকর বলল, আদেশ করো।

—বাবার জমিতে নার্সিং হোম হবে কি হবে না?

—হবে।

—তোমার তাতে চার আনার শেয়ার থাকবে কি থাকবে না?

—আমার আর মিলুর থাকবে।

—আর আমার?

—তোমার আর অপুর চার আনা, আর বাকি আট আনা তোমার বাবার—সেই রকমই তো কথা ছিল।

—ঠিক আছে, কিন্তু আসল দুটো কথা বাকি ছিল।

—যথা?

—যথা ডাক্তার হিসেবে তোমাকে আমরা তার মধ্যে পাচ্ছি কিনা?

—পাচ্ছ। তারপর?

—তারপরের শর্তটাই সব থেকে আসল।—কলেজের চাকরি ছেড়ে মালবীদি আমাদের সঙ্গে নার্সিং হোমের ভার নিতে আসছে কিনা? মালবীর দিকে ফিরল, চেয়ে আছ কি, শর্ত না মানলে জীবন যাবে।

মালবী হাসিমুখেই জবাব দিল, তাহলে মানব, জীবনের মায়া কার নেই!

ফয়সালার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় শূন্য থেকেই যেন একটা সমস্যা টেনে আনল শংকর বোস। বলল, কিন্তু আপাতত কিছুদিনের জন্য আমরা এখানে থাকছি না।

অপরেশ চোখ বড় বড় করে তাকালো, আবার কোথায়?

—হরিদ্বার।

মালবী তক্ষুনি জবাব দিল, আমার যেতে বয়ে গেছে!

শংকর বোস চোখ পাকিয়ে তাকালো তার দিকে।—যাবে না মানে? সোজা যন্ত্রণা গেছে আমার, ট্রেনের সেই কূপের এক হাতের মধ্যে তোমার বার্থ, হাত বাড়াবার জন্য সমস্ত রাত হাত কড়মড় করেছে আমার—এবার আমাকে ঠেকায় কে?

— ধেৎ! ঝুঁকে মালবী আস্ত সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে সজোরে তার গায়ে ছুঁড়ে মারল। তারপরেই মুখ লাল করে চায়ের ব্যবস্থা দেখতে একরকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্বর্ণাঙ্কুর



উৎসর্গ

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রিয়বরেষু

প্রস্তাবনা

মিহিরবাবুকে কথা দিয়েছিলাম তাঁর জীবনকালেই এ কাহিনী লিখব। যা দেখেছি লিখব ঠিক ততটুকুই। আমার অজ্ঞতা পূর্ণ করতে কল্পনার আশ্রয় নেব না।

মিহিরবাবু তাঁর নিজের কথাই লিখতে বলেছিলেন, মীনামাসিমার সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেননি। কিন্তু মীনামাসিমাকে বাদ দিলে—

বিস্তার

॥ এক ॥

মীনামাসিমাকে আমি ভুলিনি। মাঝখানে ত্রিশ বছরের ব্যবধান। সময়ের রেণু জমে সেখানে বিস্মৃতির দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় গড়ে উঠেছে। কিন্তু যখনই মিহিররঞ্জন সেনের গল্প উপন্যাস বা কবিতা আমার নজরে পড়ে, কিংবা মি. র. সে. নামাঙ্কিত তেলছবি কোন শিল্প-প্রদর্শনীতে দেখতে পাই, তখনই মনে হয়, এই মুহূর্তে মীনামাসিমা তার ভয়ার্ত চোখে শেষবারের মত আমার দিকে তাকিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠল।

গাড়িতে ওঠার সময় ভীতিবিহ্বল হাতে কাঁপা অক্ষরে ছোট্ট চিরকুটে লেখা ঠিকানাটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, 'দেখা করিস ভাই, চিঠিপত্তর দিস—'

'এ বাড়িতে আর ফিরবে না বুঝি, মীনামাসিমা?'

'না,' মীনামাসিমা বোধহয় হাসল। অথবা কান্নাঢাকা চাপা স্বরে বললে, 'আর কি ফিরে আসা সম্ভব! তুই কি এখনো ছেলেমানুষ আছিস, অশোক? বয়েস-বুদ্ধি বাড়েনি!'

মীনামাসিমার বাসাবাড়ি টাউন প্ল্যানিং-এর অবাধ হস্তপদ বিস্তারের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মোহিনী পাল লেনের দক্ষিণ মোড়ের কাছাকাছি দু'পাশের খানতিনেক বাড়িও সেইসঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছে। পরিকল্পনা আর একটু সবিস্তার হলে আমাদের হলদে রঙের দু'তলা বাড়ির গায়েও কোপ পড়ত।

বলছিলাম মীনামাসিমার কথা, মোহিনী পাল লেনের কথা নয়। সেই ভরা বাদলে যে বাড়ির ঢাকা বারান্দায় প্রথম দিন আমায় হাতভাঙা চেয়ারে বসিয়ে মীনামাসিমার ঝি সীতা পরম সমাদরে গরম চা, পাঁপরভাজা আর সুজির মোরব্বা তৈরি করে খাইয়েছিল—যে জীর্ণ বাড়িটা তার সমস্ত স্মৃতির ইতিহাস নিয়ে প্রাচীন শহরের নবীনতম রূপ পরিকল্পনার খাতিরে নিহত হয়েছে—সে বাড়িটার কথাও নয়।

প্রথম দিন মীনামাসিমার অনুপস্থিতিতে আমায় তার বাড়িতে আসতে হয়েছিল। সেদিন আমাদের মোহিনী পাল লেন ভরা বর্ষার আবর্জনা বুকে নিয়ে বিগলিত অশ্রুস্রোতের মত ভেসে বেড়াচ্ছে।

সেই রবিবারের দুপুরটি রূপোলী রোদে ভরে ছিল। মোহিনী পাল লেনও শুকনো খট্‌খটে। তার বুকভরা অশ্রুধারা মুছে গেছে। শুধু আমাদের হলদে রঙের দু'তলা বাড়ির চিলেকোঠার ছাদে একটা চিল সুতীক্ষ্ণ কান্নার সুর তুলেছে তখন। দুপুরের রুক্ষ রূপের

ওপর সে সুর যেন নিঃসঙ্গতার বিষণ্ণ আমেজ ছড়িয়ে দিয়েছে।

মীনামাসিমার কথা মনে পড়ল। কি একটা বই পড়ছিলাম যেন, অথবা ঘরের দেয়ালে একটা মেটে রঙের প্রজাপতির স্থির হয়ে বসে থাকা দেখতে দেখতে তাকে হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

নিজেদের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে অন্য এক বাড়ির সামনে গিয়ে সাতাশ নম্বরের টিন-চাকতি আঁটা আলকাতরা রং করা দরজার কড়া নাড়লাম। বেশ মনে পড়ে, সেই মুহূর্তেই পালিয়ে যাবার এক দুর্নিবার ইচ্ছে আমায় আবার সিঁড়ি থেকে কয়েক ধাপ ঠেলে নামিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে দরজা খুলে প্রায় অগোছাল বেশে মীনামাসিমা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

'ওঃ, তুমি!' আমায় দেখে মীনামাসিমা ত্বরিত হাতে শাড়ির বিস্রস্ত আঁচল কাঁধের ওপর তুলে, হাঁটুর কাছাকাছি উঠে যাওয়া পাড়টা টেনে নিচের দিকে নামাতে নামাতে বললে, 'আমি ভাবলাম বুঝি ঘুঁটেউলি!' তারপর একটু হেসে আবার বললে, 'এই বুঝি তোমার রবিবারের দুপুর? এস ভেতরে—'

রাস্তা থেকে দরজা পর্যন্ত খানপাঁচেক সিঁড়ি। আবার নতুন করে ওপরে উঠতে উঠতে বললাম, 'আজই তো রবিবার।'

'তোমার ক্যালেন্ডারে রবিবার বুঝি বছরে একটাই হয়?' বলতে বলতে মীনামাসিমা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল, 'আমি ভাবছিলুম ভুলেই গেলে বা রাগ করেছ। ঐ ঘোর বর্ষায় অচেনা মানুষকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে তাকে দিয়ে নিজের বাড়ির কাজ করানো—সত্যি বলছি ভাই, আমার খুব দোষ হয়ে গেছে। কিন্তু ওটুকু দোষ না করলে, তোমার সঙ্গে পরিচয়ই বা হত কি করে?'

কথাগুলি বলে সে ভেতরে ঢুকে গেল। আমি অনুসরণ করলাম। ঢাকা বারান্দার কোণের দিকে একটা ঘরের সামনে এসে মীনামাসিমা দাঁড়াল। কি একটু ভাবলে যেন, তারপর বললে, 'এ ঘরেই বরং বসা যাক। এটা আমার নিজের ঘর। নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবসাব করা যাবে, কি বল?'

ঘাড় নাড়লাম। মীনামাসিমার ইচ্ছের স্বীকৃতি অথবা অসম্মতিতে তা বলতে পারি না, কিন্তু এ কথা আজও মনে আছে, বোধহয় তখন আমার চেহারায় একটা অক্ষম আনুগত্যের ভাব ফুটে উঠেছিল।

ঘরে ঢুকে এক নজরে চারিদিক দেখলাম। মেয়েলী হাতের অঙ্গসজ্জার চেয়ে পুরুষ অধ্যুষিত বিশৃংখলাই যেন চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। তবু মীনামাসিমারই ঘর, তার খাস কামরা। এক পাশের আলনায় কয়েকটি শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া। টেবিলে ছড়ানো খানকয়েক বই। একখানির ওপর ছিপিখোলা টুথপেস্টের টিউব। বিভিন্ন ধরনের এক্সাইজ বুক স্তূপীকৃত—টেবিলের অর্ধাংশ তাতেই ছেয়ে আছে। টেবিলের মাথার দিকের এক কোণে সেদিনকার এই অপরিচিতা ভদ্রমহিলার হাত থেকে নিয়ে, বর্ষায় ভেসে যাওয়া মোহিনী পাল লেনে সাঁতার দিয়ে এসে আমার নিজের হাতে পৌঁছে দেওয়া মোড়কটা পড়ে আছে। ও পাশটায় তক্তপোশ। গুটিয়ে-রাখা বিছানার চাদরের একটা খুঁট ঝুলে এসে মাটিতে ঠেকছে। মীনামাসিমার নিজের ঘর, সেজন্যই বোধহয় পূর্ব আলাপের জের টেনে বিনা অনুমতিতেই তক্তপোশের একপাশে পা ঝুলিয়ে বসলাম। টেবিলের সামনে ঘাড় মটকানো চেয়ারে বসবার সাহস হল না।

'তোমার নাম কি ভাই, এতক্ষণ জিজ্ঞেস করি নি। বলেছিলুম রবিবার দুপুরে আসতে, আলাপ পরিচয় হবে, তা এলে তিনটে রবিবার বাদ দিয়ে।'

বাহুল্য বোধে পুরনো প্রসঙ্গের উত্তর এড়িয়ে প্রশ্নটির প্রথম অংশের জবাব দিলাম; নাম বললাম, 'অশোক।'

'বাঃ, শুধু অশোক, আদি নেই, অন্ত নেই! শ্রী নেই, পদবী নেই?'

কথার শেষে হাসল মীনামাসিমা। কৌতুক ঝরানো সরল হাসি। আমার কিন্তু মনে হল, ভদ্রমহিলা বড় বেশি কথা বলেন। নিজেকে অযথা খেলো করে ফেলেন তিনি। প্রগল্‌ভা মেয়েদের আমি পছন্দ করি না।

'অশোককুমার মিত্র।' পুরো নামটা বললাম।

একবার নিজের মনে আমার নামটা আওড়ে নিয়ে মীনামাসিমা বললে, 'বেশ নাম তোমার। আমার পূর্বাশ্রমের নাম কুমারী মীনা দত্ত, এখন বলি শ্রীমতী মীনা সেন। স্কুলের মেয়েরা ডাকে মীনামাসিমা, টিচাররাও তাই বলেন। তাদের কে আমার চেয়ে বয়েসে ছোট আর কে বড়, তা আর হিসেব করে দেখিনি।'

এতক্ষণে বলবার মত একটা কথা খুঁজে পেলাম। বললাম, 'তাই বুঝি সেদিন নাম বললেন, মীনামাসিমা?'

মীনামাসিমা হাসল, 'ভোলনি তাহলে? দেখ, একটা সময় আসে যখন ছোট-বড়র ব্যবধান ঘুচে যায়, বড় হলে বুঝবে সে কথা। অবশ্য আমায় মাসিমা বলায় তোমার বাধা নেই, তুমি বয়সে অনেক ছোট।' তারপর যেন একটু বিশেষ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে বললে, 'বোধহয় অর্ধেক। তোমার বয়েস কত, বারো?'

'না।' এতটা ছোট হতে ইচ্ছে হল না, আসলের ওপর বছর খানেক বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'ষোল।'

'ওরে বাবা! তবে তো জোয়ান মনিষ্যি? আমি এদিকে তোমায় তুমি তুমি করছি। আমার আপনি বলা উচিত তো, তা না হলে শাস্ত্রকাররা রাগ করবেন। প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে—'

মীনামাসিমার রসিকতার ওপর আমিও একটু সরস রঙের প্রলেপ মাখিয়ে বললাম, 'এখানে শাস্ত্রকার কেউ নেই, তুমি বললে শুনতে পাবেন না।'

মীনামাসিমা হাসল, 'অপরাধ বুঝি দেখিয়ে শুনিয়ে হয়, লুকিয়ে করলে হয় না? যাই হোক, তাহলে তোমাকেও তাই বলতে হবে। মানী লোকের মান কেড়ে নিতে হলে নিজেরটা আগে দিতে হয়। এবার থেকে তুমি বোল আমায়। ইচ্ছে হলে নাম ধরেও ডাকতে পার। কিন্তু আমার নামটা এতটা ছোট যে একটুতে ফুরিয়ে যায়; তাই পাশে পিসি মাসি দিদি গোছের কিছু একটা থাকা দরকার, নয়তো ডাকলে শুনতে পাব না।'

এরপর মীনামাসিমা প্রায় একতরফাই কথা বলে গেল, আমি বিশেষ কিছু বললাম না। অথচ আমার সব কথাই সে জেনে নিলে। আমার নিজের সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান তার বেশি জেনে নিলে সে। তাই সবশেষে মন্তব্য করলে, 'কিন্তু লেখা-পড়া তো ফাঁকির জিনিস নয় অশোক, শেখবার জিনিস। এবার থেকে একটু বেশি করে মন দিও। অঙ্কে কি আছে! ওটাই তো সবচেয়ে সহজ। সবটাই নিয়মের ব্যাপার, সেটুকু বুঝে গেলে আর ভুল হবার ভয় নেই। তুমি বরং আমার কাছে এস, অঙ্ক শিখিয়ে দেব।'

হয়তো আমার উত্তরটা কিঞ্চিৎ বিরক্তিসূচকই হল, বললাম, 'আমার মাস্টারমশাই আছেন।'

'পুরুষ মাস্টারমশাই তো?' মীনামাসিমা ঠাট্টা করলে, 'তাঁরা অঙ্ক জানেন না।'

'আমার মাস্টারমশাই এম. এস-সি. পাস।'

'পণ্ডিত?'

'হুঁ।'

'অগাধ জ্ঞানের সমুদ্র?'

'হুঁ।'

'বিদ্যাসাগর?'

'হুঁ।'

'কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই অঙ্ক মেলাতে পারতেন না। ধার দিয়ে ফেরত নিতেন না। দান দিয়ে প্রতিদান নিতেন না। এ তো অঙ্কের নিয়ম নয়। কেউ আবার সম্পূর্ণ উল্টোপথে চলে, শুধু নিতে চায়, দিতে চায় না—ভাবে পাওয়াতেই তার অধিকার, দেওয়ার কর্তব্য নেই।'

সব কথাগুলি বুঝছিলাম না, মীনামাসিমার কথায় অঙ্কের সম্বন্ধে আলোচনার চেয়ে কৌতুকাংশই বেশি মনে হচ্ছিল, কিংবা আমার অজ্ঞাত কোন তথ্য ও সুরের অভিমান ছিল, কিন্তু তা আমার ভাল লাগছিল না, ভেতর ভেতর উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছিলাম।

হঠাৎ সে বললে—হয়তো আমার মনোভাবটুকু উপলব্ধি করেই বললে, 'আমি খুব বাজে বকি, না?'

চুপ করে রইলাম, তারপর জবাব দিলাম, 'তা নয়, কিন্তু আমার মাস্টারমশাই অঙ্ক খুব ভাল জানেন।'

'ওঃ, সেই কথা ভাবছ তুমি! আমি কিন্তু ঠাট্টা করছিলাম। তোমার মাস্টারমশাই অঙ্ক নিশ্চয়ই ভাল জানেন। না জানলে এম. এস-সি. পাস করলেন কি করে?'

এরপর আলোচনার মোড় ঘুরল। মীনামাসিমাই আবার নতুন কথার অবতারণা করলে। ফকাস চ্যালেঞ্জ কাপে আমাদের স্কুল কোন্ রাউন্ডে উঠেছে, জিজ্ঞেস করার পর বললে, 'তুমিও বল খেল তো?'

সত্যি জবাবই দিলাম, 'ভাল খেলতে পারি না। প্রতিযোগিতায় নামবার সুযোগ পাইনি।'

'তাতে কি, চেষ্টা তো কর। তাহলেই হল।' সান্ত্বনা দিলে মীনামাসিমা।

'তেমন চেষ্টা করি না।'

আমার সরল স্বীকারোক্তি শুনে সে হেসে উঠল। সেই হাসির শব্দে তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মনে হল, মীনামাসিমা সুন্দরী। যেন এক আপন-করা পরিচিত সৌন্দর্যের আলপনায় তার সারা মুখখানা ভরে উঠেছে।

মীনামাসিমা বললে, 'তোমার সঙ্গে কথা বলা বিপদ। কি নিয়ে আলাপ করি বল তো? সব আলোচনাই কেটে যাচ্ছে। তার চে' একটু খাওয়া-দাওয়ার কথা বলি। কি খেতে ভালবাস?'

'কিছু না।'

'রাগ করেছ বুঝি?'

'রাগ কিসের?'

'রাগ করেই তো মানুষ খাওয়ার কথায় কিছু না বলে।'

'একটু জল খাব।'

'তার সঙ্গে আর কি?'

'জানি না।'

'আচ্ছা সেটা না হয় আমিই ভেবে-চিন্তে আবিষ্কার করি, ততক্ষণ তুমি একলাটি বসে থাক।'

মীনামাসিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বসে বসে ঘরের চার কোণে দৃষ্টি বোলাতে লাগলাম। সিলিং-এর ঝুল ঝাড়া হয়নি বহুকাল। কালো ঝুলের ফাঁকে মরা মাকড়শা আটকে আছে। স্থানে স্থানে ভাঙা ডিমের খোলার মত মাকড়শার বাসা। একটা চড়ুই মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে দেয়ালে ঠোঁট ঠুকে পোকামাকড় ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দেখে ধারণা হয়, সংসারের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা নিয়েই মীনামাসিমা আমাদের মোহিনী পাল লেনে বাসা বেঁধেছে। সংসার রচনা নয়, যেন সাময়িকীর বোর্ড-ঝোলানো অস্থায়ী আবাসের তাঁবু পড়েছে এই সাতাশ নম্বরের প্রায়-জীর্ণ বাড়িতে।

॥ দুই ॥

মীনামাসিমার দিক থেকে ব্যবধান রক্ষার কোন ইঙ্গিত ছিল না, ছিল আমার দিকেই। প্রথম প্রথম তা ভাব এবং আচরণে প্রকাশ করতাম। কিন্তু তদুত্তরে সামান্য কৌতুকচ্ছটা ফুটিয়েই সে আমায় প্রায় কোলের মধ্যে টেনে নিত। বলত, 'তোর দূরে দূরে থাকা গেল না অশোক, কি লাজুক তুই! না শুধু অনাত্মীয় বলেই আমায় পর মনে করিস? কিন্তু নিজের লোকের চেয়ে বড় অনাত্মীয় আর কেউ হয না, তা বুঝি জানিস না? যে যত দূরের মানুষ, সে-ই তো তত আপন!'

এ ধরনের বিতর্কিত আলোচনায় যোগ না দিয়ে হাল্কা কথায় বলি, 'এখন আমায় তুই বলছ, আমিও বলতে পারি তো?'

'বল্ না. কে তোকে মানা করেছে? কিন্তু আমি জানি তা তুই পারবি না।'

'কেন?'

মীনামাসিমা মুচকে হাসে, কেমন এক অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে জিভের ডগা গালের একপাশে ঠেলে দেয়, সে গালটা কিঞ্চিৎ স্ফীত হয়ে ওঠে তখন। তার মুখের চেহারা একটা ব্যঙ্গের মুদ্রা ধারণ করে, তা দেখে আমার সর্বাঙ্গে যেন এক ক্রোধের বন্যা নেমে আসে।

সেই বয়সে নিজের অনুরাগময় বিরাগের কারণ অনুমান করতে না পেরে বলি, 'তোমার বড় গর্ব!'

সে হাসে। তারপর গম্ভীর হয়ে বলে. 'আমার গর্বের কি দেখলি? আলনায় ঝোলানো দু'চারটে শাড়ি সেমিজ ছাড়া বাক্সে বিশেষ কিছু নেই, এক-আধটা নকল সিল্কের শাড়ি থাকলেও থাকতে পারে। সোনাদানা নেই এক কণা। পেট ভরে হয়তো সবদিন খেতেও পাই না। কিসের গর্ব করব, বল্? সাধারণ মেয়েদের যা নিয়ে গর্ব আমার যে তার কিছুই নেই। হয়তো কিছুটা রূপ--- কিন্তু তা তো সর্বত্র দেখিয়ে বেড়াবার জিনিস নয়, যার জন্যে

আছে, সে তাকিয়েও দেখে না কোনদিন।'

আমি নিজের অভিমত প্রত্যাহার করি না। জিদ চেপে যায়। জোর দিয়ে বলি, 'তবু তোমায় দেখলেই বোঝা যায়, তুমি যেন সব সময় গর্বে ফুলে আছ। তুমি যেন—'

মীনামাসিমা বাধা দেয়। সমর্থনসূচক বাধা। এবার সত্যিসত্যিই স্বীকার করে, 'ঠিক বলেছিস অশোক, তোর কাছে আমি লুকোব না, সত্যি আমি বড় অভিমানী—নিজেই তা বুঝতে পারি। হয়তো একটা মস্তবড় মিথ্যের ধোঁয়া আঁকড়ে নিয়ে বসে আছি।'

শোনার আগ্রহ বা অনাগ্রহ কিছুই আমার নেই, তবু তার কথার পিঠে কথা এগিয়ে দিতে হয়, তাই প্রশ্ন করি, 'কি মিথ্যে?'

টেবিলের টানা থেকে ছোট্ট প্যাকেটের চিউইংগাম বের করে মীনামাসিমা আমার দিকে এগিয়ে দেয়। মিছে রাগ দেখিয়ে বলে, 'তোর জন্যে আমার রোজ নগদ দু'আনা পয়সা খরচ হয়, জানিস? তবু তুই আমার বাধ্য হলি না, শুধু তর্ক করিস!'

লজ্জা পেয়ে বললাম, 'আমি কি চেয়েছি? আর আমায় কিছু দিতে হবে না।'

মীনামাসিমা এ কথায় খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ল, অকারণে হাসল অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, তার দুটি চোখ সজল হয়ে উঠেছে।

'কাঁদছ তুমি মীনামাসিমা! আমি তো—'

সবিস্ময়ে বললাম কথাটা। আরো কি বলতে গেলাম যেন, কিন্তু তার আগেই সে আমার গালে আচম্বিতে একটা চড় মারলে। বিস্ময়ের ওপর একটা অকারণ আঘাত পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়লাম।

কিন্তু তার কোন অনুশোচনার লক্ষণ দেখা গেল না। বরং নিজেকে যেন কঠিন স্বরে সমর্থন করে বললে, 'তোদের পুরুষ জাতটাই বেইমান! চাইবি সব, নিবি সব—ইনিয়ে-বিনিয়ে ভিক্ষে নিবি, না দিতে চাইলে কেড়ে নিবি; তারপর বলবি, আমি তো চাইনি! সব যেন মোহমুক্ত নির্বাণপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী! পুরুষ জাত হচ্ছে, ভণ্ড সন্ন্যাসীর দল।'

কিসের পরিণতি কি দাঁড়াচ্ছে বুঝতে পারি না। এত হাসি, এত অশ্রু, এত অভিমান, এত অকারণ অপমান—সবই যেন কয়েকটা অর্থহীন শব্দে রচিত বাক্যের মত দুর্বোধ্য যার কোন অর্থ হয় না! অসহ্য বেদনায় আমি জর্জরিত হতে থাকি। মীনামাসিমা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে আছে। স্থলপদ্মের মত শুভ্র গালদুটি যেন দুপুর রোদের তেজে রক্তাভ হয়ে উঠেছে। ভেতরটা তার অশান্ত ঘূর্ণির ঝড়ে জর্জরিত, বাইরে স্তব্ধ প্রতিচ্ছায়া।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলি, 'আমি যাচ্ছি, আর তোমার বাড়িতে আসব না।'

'কে ডেকেছে তোকে? যা, আর আসতে হবে না।' মীনামাসিমার কথায় অনুশোচনার লেশমাত্র নেই।

ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুলাম। মীনামাসিমা অঙ্ক শেখাত, অন্যান্য পাঠ্য বিষয়গুলিতেও সাহায্য করত। আমার খানকয়েক বই তার ঘরেই পড়ে থাকে, সব গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে অপেক্ষা করলাম একটু। ভাবছিলাম মীনামাসিমা এসে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ক্ষমা চাইবে অন্তত। মীনামাসিমাকে আমার বিশেষ পছন্দ হয় না তবু এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করি, সেজন্য রোজই তার কাছে ছুটে আসি। অথচ এ আকর্ষণ কোন দুর্বার বা অপ্রতিরোধ্য মোহ নয়, এর কোন জের আমার মনে টিকে থাকে না। নিমেষে অনুভব গড়ে ওঠে। নিমেষেই ছেঁড়ে।

আর এখানে আসা হবে না। সেজন্য দুঃখ নেই আমার। বরং এক অজ্ঞাত বন্ধন থেকে

নিষ্কৃতি বোধ করি আমি। কিন্তু তবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম, অকস্মাৎ অপমানের বোঝা বয়ে বিদায় নেবার ইচ্ছে নেই আমার।

মীনামাসিমা আর ডাকল না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আর একবার ঘরে ঢুকি। অকারণে পাওয়া অপমানের খানিকটা ফিরিয়ে দিয়ে বোঝা হাল্কা করে নিই। পারলাম না, নিষ্ফল আক্রোশ নিয়ে রাস্তায় নেমে গেলাম।

। তিন।

মীনামাসিমাকে ভুলতে পারিনি। আট-দশ দিনের অদর্শনে ভুলে যাওয়ার কথা নয়। যদিও তার সঙ্গে পড়ার নামে খেলা আর খেলার ছুতোয় পড়ার কথাটা বিশেষ আর মনে পড়ে না। শুধু তাকেই মনে পড়ে, কিন্তু দেখা করার ইচ্ছে বা আগ্রহ জাগে না। বরং আর দেখা না হয়, এই কামনা করি। শেষ দিনের অপমান ভুলতে পারিনি, সেটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারিনি বলেই একটা ঋণের মত মাথায় চেপে আছে।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে শুনলাম, মীনামাসিমা আমায় ডেকে পাঠিয়েছে। মা বললে কথাটা। সীতা এসেছিল খবর নিয়ে, আজ আমারই জন্মদিন উপলক্ষ্যে মীনামাসিমা নিমন্ত্রণ করেছে। জন্মদিনের কথা আমার মনে থাকবার কথা নয়, কারণ আমার জন্মদিনে কোন উৎসব অনুষ্ঠান হয় না। হওয়া সম্ভব নয়। এগারোটি ভাই-বোনের সমষ্টিগত জীবনে বিশেষ কেউ একজন কোন উৎসবের উপলক্ষ্য হয় না, বিশেষ কোন উৎকণ্ঠার কারণও হয় না।

মনে পড়ল বয়সের হিসেব দিতে মীনামাসিমাকে তারিখটা জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, পয়লা আশ্বিন। ইংরেজির আঠারোই সেপ্টেম্বর। আজই বুঝি পয়লা আশ্বিন, হয়তো তাই। ইংরেজির কিন্তু আজ সতেরোই সেপ্টেম্বর!

মা সস্নেহ কৌতুক করলে, 'ছেলে আমার বেশ গুছুনে, কেমন মাসি পিসি পাতিয়ে নেমন্তন্ন যোগাড় করে। বাবাঃ, আমি ভাবি, ছেলের কিছু মনে থাকে না; তা নিজের জন্মদিনটা তো বেশ মনে রেখেছিস? আমায় বললি না কেন, অন্তত একটু পায়েস আর মাছের মুড়ো তো রেঁধে দিতে পারতুম; ওঁকে বলে একখানা নতুন ধুতিও আনিয়ে দিতুম?'

মার কণ্ঠের শেষ কথাগুলো ভারী ভারী। অভিমান-বিক্ষুব্ধ। নিজের অক্ষমতার খেদ তাতে মিশে আছে।

মাকে সান্ত্বনা দিতে তাড়াতাড়ি বলি, 'আমারই কি মনে ছিল! কে যাচ্ছে ঐ পচা নেমন্তন্ন খেতে? তাছাড়া আমার প্রি-টেস্ট পরীক্ষা এসে গেল, এখন খেতে গিয়ে দু'ঘণ্টা সময় নষ্ট করব নাকি!'

'তা কি হয়,' মা বাধা দিয়ে বললে, 'একজন আদর করে নেমন্তন্ন করেছে, যাবি না মানে? তোর জন্মদিনটা পর্যন্ত মনে রেখেছে! নিজের ছেলের জন্মদিনই আমাদের মনে থাকে না, পরের ছেলের জন্মদিনের কথা কার আবার মনে থাকে? মেয়েটি তোকে খুব ভালবাসে, নিশ্চয় যাস। লেখাপড়া করে তো সবই করলি, গতবার এক কেলাশেই দু'বছর পড়ে তবে পাস করলি, সেই পাসের গুমোর কত!'

মার কথায় বিরাম থাকে, সেটুকু হাঁপানির জন্য. কিন্তু শেষ থাকে না। এখন এই সামান্য বিষয় নিয়ে পুরো এক ঘণ্টা বকে যেতে পারবে। শত কাজেও খেই হারাবেন না।

হারালেও ছিন্নসূত্র হাতড়ে আসল বক্তব্যটি ঠিকই খুঁজে বের করবে। অতএব তখনকার মত অকুস্থল ত্যাগ করাই সহজ মনে হল।

মা ভোলেনি, রাত আটটা নাগাদ আর একবার তাগাদা দিতে এল। তখন সত্যি সত্যিই পড়তে বসেছিলাম। নিমন্ত্রণের কথা মনে ছিল না।

বইপত্র বন্ধ করে উঠতে হল। আলনা থেকে একটা কামিজ টেনে গায়ে গলিয়ে নিলাম। সেই সঙ্গে পায়ে চটি জোড়া গলানোর কাজ। মীনামাসিমার বাড়ির সুমুখে পৌঁছনো পর্যন্ত দু'মিনিটও লাগল না।

কড়া নাড়বার দরকার হল না, ভেজানো কপাট ঠেলতেই খুলে গেল।

দরজার শব্দে এদিকে ফিরে সীতা আমায় দেখে চিৎকার করে উঠল, 'ও মা দিদিমণি, তোমার রাগী বুনপো যে এয়েচে! তুমি বলছিলে আসবেনি!'

বিব্রতের মত আমি এক স্থানেই দাঁড়িয়েছিলাম, মীনামাসিমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। অল্প শক্তির আলোতেও দেখতে পেলাম আমায় দেখে তার মুখে এক অপূর্ব আনন্দের আলো ফুটে উঠল।

মীনামাসিমা এসে আমার সামনে দাঁড়াল, তারপর বাঁ হাতে আমার একটা হাত ধরে টান দিয়ে বললে, 'আয়, এখনো তোর রাগ গেল না?'

উত্তর দিতে পারলাম না। মীনামাসিমার হাতের আকর্ষণে তাকে অনুসরণ করলাম।

নিচের তলায় নিজের ঘরে না গিয়ে মীনামাসিমা আমায় সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলল। যেতে যেতে বললে, 'আজ তোর মেসোমশায়ের সঙ্গে বসে খাবি; তোকে দেখতে চেয়েছেন।'

মেসোমশাই অর্থাৎ মীনামাসিমার স্বামী। তাঁকে দেখিনি কোনদিন। দু'তলায় থাকেন। নিজের কাজে ব্যস্ত সর্বদা। নিচে নামেন না। বাড়ির বাইরেও বড় একটা বের হন না। বদ্ধ খাঁচায় বসে থাকতেই ভালবাসেন। সেই তাঁর কাজ। তাঁর ব্যস্ততা। মাঝে মাঝে দু'তলার মেঝে থেকে সজোর পদচারণার শব্দ কানে আসে। কখনো বা নিজের মনেই অনর্গল বকে চলেন। কি বলেন স্পষ্ট শুনতে পাই না। বুঝি না একতিল। নিজেকে ঘিরে দুর্বোধ্যতার শিবির রচনাই বোধ হয় তাঁর কাজ। মীনামাসিমা বলেনি, ভদ্রলোক কি কাজ করেন উত্তর এড়িয়ে গেছে। হয়তো তিনি পাগল আর তাঁর পাগলামীর কারণই মীনামাসিমাকে বাইরের কর্মক্ষেত্রে টেনে নিয়ে গেছে। মীনামাসিমা কৃষ্ণকুমারী বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা।

সিঁড়িতে ওঠবার সময় আমার পায়ের স্বচ্ছন্দগতি রুদ্ধ হয়ে এল। থমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছি। মীনামাসিমা কারণ অনুমান করতে পারেনি, তাই নিজেও একবার দাঁড়িয়ে পড়ে পিছু ফিরে বললে, 'সাবধানে উঠবি, অচেনা সিঁড়ি তো! ধাপগুলো উঁচু উঁচু, তার ওপর কোণ ক্ষয়ে গেছে।'

আশঙ্কার মুহূর্তে এসে মীনামাসিমার ওপর থেকে সব রাগবিদ্বেষ, সব অভিমান নিঃশেষে ধুয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'তুমি এখন ওপরেই থাকবে তো, না আমায় পৌঁছে দিয়ে নিচে চলে আসবে?'

আমার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে মীনামাসিমা উত্তর দিলে, 'তোকে ওপরে রেখে আমি কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব? আমার রান্না এখনো শেষ হয়নি।'

'তাহলে—'

'কি তাহলে?'

উত্তর দিতে গিয়ে জবাবটা গিলে নিলাম, কৈশোরের মিথ্যে সাহসের আস্ফালনটুকু ম্লান করতে পারলাম না।

দু'তলার বারান্দায় এসে পৌঁছলাম। সামনে এক সারিতে খানতিনেক ঘর জুড়ে মীনামাসিমার স্বামীর উন্মাদ সাম্রাজ্য। বারান্দাটিও কাঠকুটোর জঞ্জালে পূর্ণ। ফ্রেমে জড়ানো কয়েক বাণ্ডিল চট। আরো কত কি। কত আবর্জনা। বর্ষায় যখন আমাদের মোহিনী পাল লেনের নর্দমা ভেসে ওঠে আর গলিজোড়া আবিলতা সংসার বিস্তার করে, ঠিক তেমনি অপূর্ব আবিল পরিবেশে এসে দাঁড়ালাম।

অন্যমনস্ক মনে পা বাড়াতেই একটা ভারি জিনিস টুং করে সামনের দিকে গড়িয়ে গেল। লক্ষ্য করলাম নিঃশেষিত কাঁচের বোতল। বোধহয় মদের। মদের বোতলের চেহারা দেখার অবসর আগে কখনো হয়নি। আমার সারা দেহ বিযাক্ত স্পর্শে ঘিনঘিন করে উঠল।

মাঝের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মীনামাসিমা আমায় ডাকলে, 'আয়!'

সভয়ে এবং বিকারগ্রস্ত কণ্ঠে প্রতিবাদের সুরে বললাম, 'নিচে চল মীনামাসিমা।'

উত্তর না দিয়ে সে কাছে ফিরে এসে হাত ধরলে, আমায় তার সঙ্গে যেতে হল। কিন্তু এগিয়ে যেতে প্রাণ চায় না। পালাবার পথও যেন বন্ধ—অসম্ভব অবরোধ দিয়ে ঘেরা।

ঘরের ভেতর প্রায়-ছিন্ন গদি-আঁটা সোফায় অর্ধশায়িতভাবে লোকটি বসেছিলেন। মেসোমশাই বলতে ইচ্ছে হয় না। আত্মীয়রূপে সম্বোধন করা অসম্ভব। আমার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ মাতাল বা উন্মাদ নয়।

আমায় দেখে তিনি উঠে বসলেন, 'তোমার নাম অশোক?'

'হ্যাঁ।'

'স্কুলে পড়? দাঁড়িয়ে কেন, আমার পাশে এসে বস।' জোর করে আমার হাত ধরে টেনে তিনি আমায় নিজের পাশে বসালেন।

তাঁর কথার উত্তরে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি স্কুলে পড়ি, এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব।'

প্রশ্নের উত্তর দিলাম, কিন্তু আমার মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য তখনো তিলমাত্র দূর হয়নি।

আমার কথা শুনে তিনি যেন উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলেন, 'গুড্। ভেরি গুড্। আই লাইক অ্যান্ড লাভ স্টুডেন্টস্। আমিও ছাত্র। আঃ, ছাত্রজীবন শিক্ষানবীশির জীবন। এই জীবনটাই সুখের।'

মীনামাসিমা ফিক্ করে হেসে ফেললে তারপর মুখ গম্ভীর করে বললে, 'তা ভাল তো বলবেই! তুমি নিজে খুব ভাল ছাত্র ছিলে কিনা!'

লোকটি হো হো করে হেসে উঠলেন, তারপর একবার মাথার রুক্ষ চুলে হাতের চারটি আঙুল চালিয়ে দিয়ে সামনের তেপায়া থেকে সিগারেটের বাক্স তুলে নিয়ে দেশলাই খুঁজতে লাগলেন।

'আমার দেশলাই কোথায় গেল, মীনা!'

দেশলাইটা তেপায়ার নিচে পড়ে ছিল, মীনামাসিমা সেটি কুড়িয়ে দিয়ে বললে, 'এই তো!'

'তাই তো, এখানে ছিল, পড়ে গেল কি করে!' এবার তিনি আমার দিকে তাকালেন, 'আমি ম্যাট্রিক পাস করতে পারিনি বলে মীনা আমায় ঠাট্টা করে। কি করব, সকলের কি আর সব বিষয় পড়তে ভাল লাগে? ইংরিজি বাংলা সংস্কৃতে হায়েস্ট, ইতিহাসে চলনসই,

ভূগোলের নম্বর পাসের দানা বাঁধেনি। আর অঙ্কের নম্বর তো বাষ্প, কখনো চোখেঃ দেখিনি!'

ভদ্রলোক আবার হাসলেন। এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে একপাশে সরে বসেছিলাম, এবাঃ সুবিধামত বসতে গিয়ে তাঁর পাশে একটু সরে গেলাম। আমায় আরো গুছিয়ে বসবাঃ জন্য প্রশস্ত জায়গা করে দিয়ে তিনি বললেন, 'আজ তোমার জন্মদিন। সকালবেলা মীন বলতেই আমার মনে একটা আনন্দের স্রোত খেলে গেল। তোমাকে দেখিনি, চিনি না অথচ খুব ভালবেসে ফেললাম। না-চেনা মানুষটিকে আমরা যেমন ভালবাসতে পারি তেমন কি অতি-পরিচয়ের পর পারি? পরিচয়ের পরেব ধাপে এসে যাবার পর বাং অনেক। মীনা আমায় ভাল করে চেনার আগে যেমন ভালবাসত, আর কি তেমন বাসেঃ

ভদ্রলোকের কথায় মীনামাসিমার গাল দুটি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সে মাথা নি করে ধমক দিলে, 'ছোট ছেলের সামনে কি আবোল-তাবোল বকছ? সব সময় বাে কথা!

'ছোট ছেলে!' সবিস্ময়ে তাকালেন তিনি, 'ম্যাট্রিক দেবে—ছোট ছেলে! আমি তে ক্লাশ এইটে পড়তে বিদ্যাপতি পদাবলীর সরবৎ আর ভারতচন্দ্র কাব্যের সিদ্ধি পা করেছিলাম। জয়দেব পড়েছি আর একটু বয়েসে। বছর তের চোদ্দয়। কালিদাসও সে সময়। কালিদাস পড়েই তো একদিন...যাক সে কথা। কালিদাস এখনো পড়ি। তুমি প কিছু?'

শেষ কথাটি আমায় লক্ষ্য করে বললেন, উত্তর দিলাম, 'চণ্ডীদাসের সই কে ব শুনাইলে শ্যাম নাম, আর বিদ্যাপতির মাধব বহুত মিনতি করি তোয়, পড়েছি। এ দু আমাদের স্কুলের বইয়ে আছে।'

মুচকে হাসলেন তিনি, 'নাইস্। তোমরাই আই. সি. এস. হবার যোগ্য, চাকরির বাজা আমায় চাপরাশিগিরি করার জন্যেও কেউ ডাকবে না।'

রান্নার ব্যস্ততা আছে মীনামাসিমার, হঠাৎ সে কথা মনে পড়তে তাড়াতাড়ি বলে 'তোমরা গল্প কর, ততক্ষণে আমি রান্না চুকিয়ে ফেলি গে?'

'এখনও হয়নি? স্কুলের ছুটি নিয়ে তো দুপুর থেকে লেগেছ, কি কি রাঁধলে?

'খাবার সময় দেখতে পাবে।'

'আর কত দেরি আছে?'

'আধ ঘণ্টা, পোলাও হলেই শেষ।'

'তবে ওটা দিয়ে যাও না, খিদেটা ততক্ষণ জিইয়ে রাখি?' ভদ্রলোকের ইঙ্গিতপূ কথায় মীনামাসিমা লজ্জায় মুষড়ে পড়ল। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে আপত্তি জানালে, 'না।'

'কেন?'

'ভদ্রলোকের ছেলেকে নেমন্তন্ন করে এনে তার সামনে এ সব না-ই করলে?'

'এ সব আবার কি! আমায় দেখে যে কোন লোক, যার দুটো চোখ আছে, নাসিকা আঘ্রাণ নেবার শক্তি আছে, সে-ই বলবে, লোকটা মদ খায়। বেশি পরিমাণেই খায়। সং যখন তৈরি করতে পারনি তখন ভদ্রতার মুখোশ আঁটিয়ে রেখে কষ্ট দাও কেন? তোমা সামনে মদ খেলে কিছু মনে করবে?'

শেষের কথা আমায় বললেন। এর কী উত্তর হতে পারে তা আমার জানা নেই। নীরে ঘাড় নাড়লাম। হাঁ এবং না, দুই-ই হয় তাতে।

আমার গ্রীবা আন্দোলন তিনি বোধহয় সম্মতিসূচক ইঙ্গিত বলে বোধ করলেন। ত্বরিত সুরে বললেন, 'দেখলে তো মীনা, অশোকের আপত্তি নেই। নিজে না খেলেই হল। লোকে কি খেল, কি করল, কোথায় গেল, এ নিয়ে তারাই মাথা ঘামায় যাদের মাথা ছোট। দুর্বল সমালোচনা ছাড়া সৃষ্টি করার শক্তি যার নেই, সে-ই পরের কথায় মাথা ঘামায়। এই অশোকের মত ছেলেরা আজকের অঙ্কুর, আগামী দিনের মহীরুহ; এত স্পর্শকাতর এদের হওয়া উচিত নয়। তুমি আমায় বোতল গেলাস এনে দাও, অশোক অনুমতি দিয়েছে।'

নিরীহ আক্ষেপে মীনামাসিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর বারান্দা থেকে মদের বোতল আর গেলাস এনে তেপায়ার ওপর বসিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রাস্তাঘাটে এক-আধজন মাতাল দেখলেও ইতিপূর্বে সামনে বসে কোন লোককে মদ্যপান করতে দেখিনি। জানতাম মদের রং লাল, এ পানীয়টা কিন্তু জল-রঙের। ভদ্রলোক বোতল খুললেন, গেলাসে ঢাললেন খানিকটা। ঢকঢক করে এক নিশ্বাসে সেটুকু পান করলেন তিনি, তারপর গেলাস নামিয়ে রেখে একটা আরামসূচক শব্দ করলেন।

'মদ আমি ছেলেবেলা থেকেই খাই, খেয়ে কিন্তু লাভ নেই, শুধু স্বাস্থ্যহানি। তবে একথা যখন উপলব্ধি হয়, তখন ট্যু লেট! ফেরার উপায় থাকে না। আমারও ট্যু লেট হয়ে গেছে। আর পথ নেই। মদের নেশার মধ্যাবস্থাটুকুই ভাল। প্রথম দিকে কটু, শেষে অসহ্য। দুঃসহ। আমার এখন নেশার শেষ পর্যায় চলছে। এর পরের স্টেজ পেটে জল, লিভার পাকা, পা ফোলা —সো অন্ অ্যান্ড সো ফোর্থ। কিন্তু খুন করার নেশার মতন বিষেরও একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে,: যুক্তির দেয়াল খাড়া করে তা এড়িয়ে যাওয়া যায় না।'

আরো খানিকটা বিষাক্ত পদার্থ নিঃশেষ করলেন তিনি। তারপর বললেন, 'একটা মস্ত বদ অভ্যাসে জড়িয়ে পড়েছি, আর একটাই বা বলছি কেন, জীবনে শুধু জড়িয়ে পড়াই তো আছে। পদে পদে বন্ধন। প্রতি কথায় শৃঙ্খল। এত দিক দেখতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না। জীবন মানেই অখণ্ড যাত্রা। সে-ই একমাত্র লক্ষ্য। একটি মাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা চতুর্দিকে জড়িয়ে পড়ে শেষ হয়ে যাই। প্রাণ থাকতে থাকতেই জীবনের যা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাই মরে যায়।'

উত্তর শুনতে চান না। উত্তর দেবার ক্ষমতাও আমার নেই। নীরব শ্রোতা আমি; কিংবা শুধু তাঁর স্বগতোক্তি শোনবার জন্যই এখানে বসে আছি। শুনছি উন্মাদের প্রলাপ। সময় কাটছে।

মীনামাসিমা ফিরে এসে ঘরে ঢুকল, ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এবার তোমাদের খাবার জায়গা করি?'

'না, আমি এখন খাব না। এস, আমরা দুজনে মিলে অতিথির সেবা করি। আজ অশোকের জন্মদিন, আজকের শুভমুহূর্তে যাত্রা শুরু হোক, খালি চলুক। চলতে থাকুক। চলতে চলতে একদিন ও চরম সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পাবে। আমিও চলেছি, চলেইছি, কিন্তু পাইনি। হাতের কাছে পেয়েও হারিয়ে যায়। এ কি ভয়ঙ্কর অশান্তি, তা তুমি বুঝবে না। অশান্তি হলেও এক অপূর্ব শান্তি। এ গ্লোরিয়াস ডিস্স্যাটিশফ্যাকশন। অপূর্ব অসন্তোষ। দুনিয়ায় শিল্পী হয়ে জন্মানোর মত অভিশাপ আর কিছু নেই। সে পারিপার্শ্বিক থেকে রসদ সংগ্রহ করে, কিন্তু তাকে সকলেই এড়িয়ে যায়। বড় বিচিত্র এই শিল্পলোক। কি হরেব্‌ল্ শিল্পীচরিত! তুমি বেঁচে থাকলে মানুষের আশঙ্কা, সমাজের উপেক্ষা, আর মরে তুমি অমর। তুমি তখন শিব, তুমি ঋষি। জীবনকালে মৃতের মত অপাঙ্‌ক্তেয়, মৃত্যুর পর

সর্বজনের পূজনীয়। সমাজের আদর্শ। য়্যু আর আগ্‌লি হোয়েন অ্যালাইভ অ্যান্ড ডিভাইন হোয়াইল ডেড্‌। না মরলে তুমি সুন্দর হও না!'

মীনামাসিমা আবার তাগাদা দেয়, 'চল, খাবে চল, তোমরা দুজনে একসঙ্গে একতলার দালানে খেতে বসবে।'

ঘোর আপত্তিতে ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'না, আজ আমার নিজেকে উপভোগ করার বাসনা জেগেছে, এর মধ্যে মাংস পোলাও খাবার মত এক জান্তব কাজে লিপ্ত হয়ে একটা মস্ত বড় জিনিস হারাতে চাই না।'

আবার বোতলটি খুললেন তিনি। খুলেই কি মনে করে বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। খাঁচায় আবদ্ধ পশুর মত। কখনো দ্রুত পায়ে পায়চারি করেন, কখনো বা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন।

অগত্যা মীনামাসিমা বললে, 'তাহলে তুই ওঠ্‌ অশোক, এঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে তোকে উপোস করে থাকতে হবে।'

সে কথা শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'ওঠ্‌ মানে? এইখানে অশোকের খাবার জায়গা করে দাও, আমি পরিবেশন করব।'

'থাক, ঢের হয়েছে।' মীনামাসিমা যেন এতক্ষণে তার বিরক্তি ভালভাবে প্রকাশ করতে পারে, 'নিজে এক গেলাস জল গড়িয়ে খাবার ক্ষমতা নেই, আর অপরকে উনি পরিবেশন করে খাওয়াবেন!'

'না, না, যা বলছি শোনো, সব এখানে নিয়ে এস।'

মীনামাসিমা প্রতিবাদের নীরব ভাষার মত দাঁড়িয়ে রইল।

ভদ্রলোক ধমক দিলেন, 'যাও না, বি ওবিডিয়েন্ট।'

আর দাঁড়াল না মীনামাসিমা, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

ভদ্রলোক আমার সামনে বসে সুর পাল্টে বললেন, 'আমার নাম মিহিররঞ্জন সেন। তোমার পুরো নাম কি?'

'অশোককুমার মিত্র।'

'একদিন নিজের হাতে রেঁধে তোমায় খাওয়াব, কি খেতে তুমি ভালবাস?'

'মাংসর চপ।'

'বেশ। কিন্তু চপ কি দিয়ে তৈরি করে?'

'মাংস আর আলু দিয়ে।' বিজ্ঞের মত বললাম।

মীনামাসিমা আমার খাবারের থালা নিয়ে এল। থালাখানা কোথায় রাখবে সেই অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল সে।

ভদ্রলোক ত্বরিতে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং তেপায়ার ওপর থেকে গেলাস বোতল মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে মীনামাসিমার হাত থেকে খাবারের থালা নিয়ে আমার সুমুখে রাখলেন, 'খাও অশোক। সব খেতে হবে কিন্তু, মীনা সারাদিন কষ্ট করে রান্না করেছে।'

ভদ্রলোক আগেই আহারের অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তবু আমি ভদ্রতা রক্ষার জন্য বললাম, 'আপনি খাবেন না?'

'তুমিও যখন বলছ, তখন তো আমায় খেতেই হবে।'

আমার থালা থেকে একট টুকরো বেগুন ভাজা তুলে নিয়ে তিনি আলগোছে মুখে

ফেললেন। তারপর বললেন, 'আমি তোমার কথা রেখেছি, এবার তুমি খাও।'

অনুরোধ-উপরোধে সব নিঃশেষ করলাম। খুশি হলেন ভদ্রলোক। আনন্দের সুরে বললেন, 'এবার থেকে আমরা রোজ তোমার জন্মদিন পালন করব। রোজ রাত্তিরে তুমি এখানে খাবে। মীনা লোকজনকে খাওয়াতে খুব ভালবাসে, কিন্তু একা মানুষ পেরে ওঠে না।'

মীনামাসিমা মৃদু হাসে, কিন্তু তার নিঃশব্দ হাসি মিহিরবাবুর নজরে পড়ল, তিনি মুখ তুলে বললেন, 'কি ভেবে তুমি হাসলে বল তো! আচ্ছা মীনা, তুমি কি আমায় সত্যিই পশু মনে কর? কিন্তু ভালবাসাই তো আমার ধর্ম! সকলকেই ভালবাসি; পশুর ভালবাসায় স্বার্থময় খাদ থাকে না।'

মীনামাসিমা বললে, 'বাজে বকতে পেলে তুমি আর কিছু চাও না। রাত অনেক হয়েছে, এবার অশোককে বাড়ি যাবার অনুমতি দেবে কি?'

ভদ্রলোক তখুনি কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ নির্নিমেষে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'অশোকের ডান গালের লাল তিলটা দেখেছ মীনা? দাঁড়াও অশোক, তোমার একটা ছবি আঁকি। পেনসিল স্কেচ নয়, অয়েল পেন্টিং!'

মীনামাসিমা অসহায় স্বরে বললে, 'রাত্তির যে অনেক হয়েছে!'

'ভালই তো, রাত যখন অনেক হয়েছে, তখন ভোর হতেও দেরি নেই। ভোর থেকেই ছবিতে হাত দেব, ততক্ষণ তিলটা স্টাডি করি।'

মীনামাসিমা তাড়াতাড়ি বললে, 'না না, তত রাত নয়। এগারোটা।'

'তাহলে যেতে দাও। তুমিও যাও। ভাবতে দাও আমাকে।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তিনি কোন্‌দিকে তা নিজেও বোধহয় জানেন না। দৃষ্টিতে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই।

শূন্যদৃষ্টিতে অলক্ষিতের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি আবৃত্তির মত বললেন, 'নির্নিমেষ নয়নে আমি রজনীকে করি সম্ভাষণ—এর পরের লাইন! ভাবতে হবে, ভাবতে হবে—নির্নিমেষ-–'

তারপর যেন হঠাৎ আমায় দেখতে পেলেন তিনি, 'তুমি এবার বাড়ি যাও অশোক।' পরে দৃষ্টি ফেরালেন মীনামাসিমার দিকে, 'মীনা তুমি দাঁড়িয়ে কেন? আমায় একলা থাকতে দাও। বাঁচতে দাও। তোমাদের নিয়মিত আহার-নিদ্রার জীবনের সঙ্গে আমায় জড়িও না। তোমায় যেতে বললাম না অশোক? মীনা, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? দূর হয়ে যাও সামনে থেকে। ন্যাস্টি ওম্যান!'

ভদ্রলোক সোফার হাতল ধরে সজাগ ভঙ্গিতে বসলেন, যেন সারা রাতের সুখনিদ্রার পর সূর্যের ছোঁয়া পেয়ে সবেমাত্র জেগে উঠেছেন!

সিঁড়ির কাছে এসে মীনামাসিমা বললে, 'একলা নামতে পারবি তো?'

'কেন পারব না!' আমি যেন নিষ্কৃতির স্বাদ পেয়েছি, এমনি সুরে জবাব দিলাম।

মীনামাসিমা সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ে, মাথাটা লোহার গরাদে এলিয়ে দিল।

॥ চার ॥

আমার জন্মদিনের পর মীনামাসিমার সঙ্গে আর ছাড়াছাড়ি হয়নি। দেখা না করার সংকল্প বার-বার দেখা-সাক্ষাতের ঘনত্বে ডুবে গেছে। ভাল লাগে না, অথচ যাই। নিজের মনের সঙ্গে একক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভাললাগা-মন্দলাগার চিন্তা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি। প্রতিদিনের ঘটনার একটা অনভিপ্রেত পরিচ্ছেদের মত মীনামাসিমার বাড়ি যাওয়া দৈনন্দিন জীবনে যুক্ত করে নিয়েছি। ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন ওঠে না।

একদিন পড়তে বসে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা মীনামাসিমা, উনি—মানে মিহিরবাবু তোমার কে?'

'বর।' মুখ টিপে হাসল মীনামাসিমা, 'এও বুঝি জানিস না?'

'তা তো জানি, কিন্তু মনে হয় না।'

'কেন?'

'জানি না।'

হয়তো কোন উত্তর ছিল আমার, কিন্তু বলতে পারিনি। উত্তরটুকু আমার অনুভবের মধ্যে ছিল, ভাষায় ব্যক্ত হবার যোগ্য হয়ে ওঠেনি।

আবার বললাম, 'তুমি ওঁর কাছে থাক কেন, একলা থাকলেই হয়? কত টাকা তো তুমি রোজগার কর!'

মীনামাসিমা হাসল, 'তোদের জন্যেই ছেড়ে যেতে পারি না, নইলে আমার আর কিসের টান? আর আমি ছেড়ে গেলে উনি করবেন কী? টিকিট কেটে ট্রেন চড়ার যোগ্যতা পর্যন্ত নেই। আমি ওঁকে আজ ছেড়ে গেলে তোদেরই ক্ষতি, বড় হলে বুঝবি তা কতখানি! সেদিন তোর মীনামাসিমাকে মনে থাকবে না, সূর্যের আলোয় অন্ধকার রাতের সমস্ত কথাই মুছে যাবে।'

তার বাতুল উত্তর মেনে নিতে পারি না। সেদিনকার কথাটা বার-বার মনে পড়ে। সন্ধ্যার সময় মীনামাসিমা বাড়ি ছিল না। ফিরতে দেরি হবে। আমায় অপেক্ষা করবার জন্য সীতাকে বলে গিয়েছিল। সীতা সেই সংবাদটুকু দিয়ে নিজের মনেই গজগজ করে চলেছে। আমাকে শুনিয়ে বলে না, আবার গোপনও করে না।

সীতা বারান্দা মুছতে মুছতে বকে যায়, 'মনিষ্যি না যম! তোর খুরে পেন্নাম! তুমি কপ্‌তে নিকতে পারবি নি, দোষ দিদিমণির। ছবি নিকতে পারবি নি, দোষ দিদিমণির। গালমন্দ দিচ্ছিস, মেরে গা গতর পিষে দিচ্ছিস। কাজের মধ্যে বোয়ের রোজগারে গেলা আর ঘটি ঘটি মদ খাওয়া। আমাদের ঘরে হলে পাড়ার নোকে ঠেঙিয়ে তোর মতন মিনসের হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দিত। পিশেচ কোথাকার! বউ ঠেঙাচ্ছিস, জিনিসপত্তর ভাঙছিস, হতভাগা নোচ্চা—'

বুঝতে দেরি হয় না, যম-সদৃশ ব্যক্তিটি আমাদের মিহিররঞ্জন সেন। মীনামাসিমার স্বামী। শত অত্যাচার সয়েও মীনামাসিমা যার কাছে টিঁকে আছে। শুধু আমাদের মঙ্গলের জন্যই টিঁকে আছে!

সীতাকে ঘরের ভেতর ডাকি, 'সীতা!'

সীতা সামনে এসে দাঁড়ায়, 'কি বাবা?'

'কার কথা তুমি বলছ?'

'তোমায় তো বলিনি বাবা, বলচি ঐ নোচ্চাটাকে।'

'কে?'

'ঐ যে গো, ওপরের উনি, দিদিমণির ভাতার। ভাত দেবার ভাতার নয়, পেহার করার গোঁসাই!'

'মিহিরবাবু?'

'হাঁ, যে কপতে নেকে, ছবি নেকে, আর মাগের ওপর পুশুর মতন অত্যোচার করে, মারে!'

'মিহিরবাবু মারেন মীনামাসিমাকে?'

'বাবু! বাবু না আমার সাতগুষ্টির পিণ্ডি!'

'উনি মারেন? দেখে তো মনে হয় না।'

সীতা যেন আমাকেই মিহিরবাবু মনে করে মুখ ঝামটা দেয়, 'না, পুজো করে! তা করে বইকি! কপতে গেয়ে বোয়ের পুজো করে, যেন বেবুশ্যোবাড়ির ভেঁড়ো! বউকে ন্যাংটো করে ছবি নেকে, আবার গায়ে সিক্রেটের ছ্যাঁকা দেয়।'

'পোড়ায়!'

'পোড়াবে কেনে গো', সীতা ব্যঙ্গ করে, 'পোড়াবে কেনে, ছেঁকা খেলে নাকি মুখের ছবি খোলতাই হয়!'

'কি বলছ তুমি!' সীতার কোন কথাই আমার বিশ্বাস হয় না, 'তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না সীতা।'

সীতা সায় দেয়, 'কেম্‌নে হবে, তোমরা যে মনিষ্যি, ওটা তো পুশু—'

ইতিমধ্যে মীনামাসিমা বাড়ি ফিরেছে, সীতার দু-একটা কথা তার কানে গেছে।

মীনামাসিমা তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে বলে, 'ওখানে কি করছ সীতা, কাজকর্ম যদি না থাকে তো বাড়ি চলে যাও।'

তারপর ঘরে ঢুকে আমায় বলে, 'পরচর্চা করতে তোমার বেশ ভাল লাগে, না? কিন্তু যার সম্বন্ধে চর্চা করছ তার যোগ্যতার শতাংশের একাংশও যে বহু জন্মের তপস্যা ছাড়া পাওয়া যায় না! তেমন পুণ্যফল তোমার আছে কি?'

আমি চুপ করে থাকি, উত্তর দিই না। দিতে পারি না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিজের রূঢ়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে মীনামাসিমা বলে, 'রাগ করিস না ভাই; সামনে আলোচনা হলে কিছু মনে করতাম না, বাইরে থেকে কথাগুলো হঠাৎ কানে যেতে মাথাটা রাগে ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। এই আমার এক রোগ, সব কষ্ট সইতে পারি, কিন্তু ওর চরিত্রের সমালোচনা সহ্য করতে পারি না।'

আমি আত্মসংবরণ করতে পারলাম না। দৃঢ় কণ্ঠে বললাম এবং বললাম জোর গলায়, 'মিহিরবাবু কিছুতেই তোমার স্বামী নন। কিছুতেই--'

আমার কথার উত্তর দিতে গিয়ে মীনামাসিমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর কাছে সরে এসে জোর করে আমার মাথাটা নিজের বুকের নিরাপদ আশ্রয়ে টেনে নিয়ে, চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'তুই যে ছেলেমানুষ, কি করে বোঝাই? তোকে কেন, দুনিয়ার লোককেই বা আমি কি বোঝাব!'

আমার মনে এক অকারণ-আগ্রহ উঁকি দেয়। কয়েকটা ঘুমন্ত প্রশ্ন মনের ভেতর জেগে উঠে বুক তোলপাড় করে। মীনামাসিমার সব কথা জানতে ইচ্ছে হয়। যতটুকু জেনেছি

তা যেন না জানারই মত। কি জানি আমি তার সম্বন্ধে? জানি সে এম. এ., বি. টি.। অঙ্কে এম. এ.। চাকুরি করে বালিকা বিদ্যালয়ে, মাইনে প্রায় দু'শ। আর জানি সে মিহিররঞ্জন সেনের স্ত্রী। এ শহরের লোক নয় এরা। পদ্মাপারে বাড়ি। কোন কথায়, ইসে শব্দের ব্যবহার শুনে একদিন চেপে ধরেছিলাম, 'তুমি বাঙাল!'

'উঁহু', মুখ টিপে হাসল মীনামাসিমা। জিভের প্রান্ত গালের এক পাশে ঠেলে নিয়ে গিয়ে এক অপূর্ব বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। যে মুদ্রা দেখলে আমার অকারণে রাগ হয়ে যায়, মীনামাসিমা এবং মিহিরবাবু দুজনের ওপরই রাগ হয়—তেমনি এক মুদ্রা!

'আমি বাঙাল নই, বাঙালি—অবশ্য ঘটিরা বলে বাঙাল।'

আমি নিজের বিস্ময়কর আবিষ্কারে উৎফুল্ল হয়ে উঠি, 'ঠিক ধরেছি, আমার কাছে কিছু লুকনো সহজ নয়।'

'তাই বুঝি! কিন্তু আমি তোকে কবে কি লুকোলাম?'

'তুমি বাঙাল, এ কথা আমায় বলনি তো?'

'বললে কি তুই আমায় ভালবাসতিস, না মীনামাসিমা বলে ডাকতিস?' তার উত্তরটা কৌতুক রসে ভেজানো।

আমি ভেবে-চিন্তে উত্তর দিই,'তবুও বাসতুম।'

আরো জানি এদের বাড়িভাড়া সাতাশ। সীতার মাইনে এগারো, দু'বেলার খাওয়া উপরি পাওনা। জানি মিহিরবাবু বসে বসে বই লেখেন, আর ছিঁড়ে ফেলেন। ক্যানভাসে ছবি আঁকেন, আগুনে সমর্পণ করেন। এই করে সময় কাটান তিনি। ম্যাট্রিক ফেল। যে লেখা ছাপা হয়, তেমন লেখবার মত বিদ্যে বা যোগ্যতা তাঁর নেই। তাই লিখতে না পারলে তাঁর সব আক্রোশ মীনামাসিমার ওপর গিয়ে পড়ে; তাকে নির্মমভাবে প্রহার করেন, মিথ্যে ছুতো ধরে অত্যাচার করেন। পশু-প্রকৃতির মানুষ তিনি। আত্মনির্যাতনও কম করেন না। উপোষ করে থাকেন দিনের পর দিন। কাল্পনিক শোকে ঝিমিয়ে থাকেন। ভর্তি মদের বোতল ভেঙে ফেলে দেন। লেখা খাতা ছিঁড়ে ফেলেন। আঁকা ছবি আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়।

তবু মনে হয় আমি এদের কিছুই জানি না। দুর্দান্ত মাতাল-পাগলটাকে কতকটা বুঝতে পারি, কিন্তু যার ওপর তার সবিশেষ পাগলামির প্রয়োগ, যাকে কেন্দ্র করে সমস্ত বদখেয়ালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা—সেই মীনামাসিমাকে আমি জানি না।

তাই ধরে বসলাম, 'তোমার কথা বল মীনামাসিমা!'

'আমার আবার কি কথা রে!' তার কথাগুলো যেন বিস্ময়ের আকাশ থেকে ছুটে আসে, 'আমার আবার কি কথা? বাঙাল দেশের মেয়ে, ঘর পেতেছি তোদের বাঙালী মুলুকে। বাসাবাড়িতে থাকি। পেটের দায়ে চাকরি করি। পালপার্বণে সিনেমা যাই। পাঁচটা সাধারণ মেয়ে-বউয়ের মতই আমার জীবন। এর কোন্‌টা তোর অজানা, কোন্‌টা বলিনি?'

তবু জোর দিয়ে বলি, 'না, কিছুই বলনি তুমি। এ সব কথা তো আমি নিজে থেকেই জেনেছি। আরো কিছু বল।'

সে এবার স্তব্ধ হয়। চোখের কোণগুলি আনন্দের জলসিঞ্চনে ভরে আসে। অন্যমনস্ক ধীরতার সঙ্গে বলে, 'তুই একটা পাগল।'

'বলবে না তো?' আমার কণ্ঠে অনুসন্ধিৎসার মিনতি।

টাইমপিসটার দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলে, 'রাত সাড়ে ন'টা হল, আজ বাদে কাল তোর ফাইনাল পরীক্ষা; আমার কোন্ কথাটা তোর পরীক্ষার প্রশ্নে আসবে? আর যদি তা এসেই যায়, লিখিস, তার কথা আমি কিছুই জানি না। এর চেয়ে সত্যি উত্তর নেই। কারণ আমি নিজেও সব জানি না।'

এদিকে ব্যর্থ হয়ে আমি ওদিকের সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, 'তবে মিহিরবাবুর কথা বল?'

এবার যেন মীনামাসিমা আশ্বস্ত হয়। অনেক বলবার আছে তার। অনেক শোনাবার। অনেক জানাবার। কিন্তু বলতে গিয়ে গুলিয়ে যায় সব। কি বলবে, কোথা থেকে আরম্ভ করবে, ছেদই বা টানবে কোথায়, তাই বোধহয় ভেবে পায় না। আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে নির্বাক, একাগ্র চাহনি নিয়ে তাকিয়ে থেকে শেষে অনেক আয়াসের পর বলে, 'ওঁর কথা তুই নিজেই একদিন জানতে পারবি। অনেকেই পারবে, কিন্তু সেদিন তাঁর কথা জানবার জন্যে আমায় কেউ খুঁজবে না। তোরাই তাঁকে নিয়ে এক-একখানা উপন্যাস রচনা করবি। আমার শুধু সেই দিনটুকুর অপেক্ষা করে থাকা অশোক। তাঁর কথা জানাবার যোগ্যতা আমার নেই। বলতে গেলে বুঝতে হবে, বিচার করতে হবে, কিন্তু সে শক্তি আমার কোথায়? থাকলে দেরি করতুম না, আজই বলতুম।'

মীনামাসিমা যা বলতে পারে না সে কথা আমি নিজেই আরম্ভ করি, 'মিহিরবাবু মাতাল।'

সে হাসে। দুঃখের হাসি হেসে বলে, 'সত্যি, বড় বেশি খান উনি; লিভার খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে জ্বরও হয়। বারণ করলে শোনেন না।'

'একটা গুণ্ডা, তোমায় মারেন।'

'বেশ করেন, তোকে তো মারেন না?'

'জিনিসপত্তর ভাঙেন।'

'সবই তো তাঁর। যা ইচ্ছে করুন না কেন, তাতে আমরা বলবার কে?'

'লোক ভাল নন, অনেক দোষ—'

'তাই বুঝি!' মীনামাসিমার কৌতুকময় কণ্ঠস্বর বদলে যায়, বিদ্রূপাত্মক সুরে ব্যঙ্গ করে যেন, 'তবু তাই ভাল। উইপোকা ধরা খড়কে কাঠি হওয়ার চেয়ে বাজপড়া বটগাছ হওয়া অনেক ভাল। অনেক বড় সে। মহান সত্তা। তার দেহের ক্ষতে অনেক পশু-পাখিকে আশ্রয় দেয়। তার বুকের ঘায়ের মধ্যে আবার সজীব গাছের চারা গজিয়ে ওঠে। বাজপড়া বটগাছ দেখেছিস কখনো? উনিও তাই। উনি নিজেকে না পোড়ালে, না ক্ষয় করলে, তোরা নিজেদের পাওনা থেকে বঞ্চিত হবি।'

মীনামাসিমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না, অবিশ্বাস করাও কঠিন; কিন্তু তার কথা আমার বোধগম্য হয় না। আমি সহজভাবেই স্বীকার করি, 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারি না।'

সেও কথাটা বুঝল। মেনে নিল। কিন্তু আমায় সাবধান করে দিয়ে বললে, 'বুঝিস আর না বুঝিস, আজ তোকে যা বলে ফেললুম, তা কাউকে বলিস না যেন। তাহলে আমার আর রক্ষা থাকবে না, পরোপকারী লোকেরা আমায় ধরে-বেঁধে রাঁচী পাঠিয়ে দেবে।'

উত্তরে হাসা উচিত মনে করে, আমি একটু হাসলাম।

মীনামাসিমা আবার ঘড়ির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, 'এদিকে দেখ্, দশটা বেজে গেছে, পরচর্চায় রাত কাটিয়ে দিতে চাস নাকি? এবার বাড়ি যা।'

'আজ তোমার কাছে থাকতে ইচ্ছে করছে,' বলতে বলতে আমি তার বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

মীনামাসিমা আমার হাত ধরে টেনে তুলল, 'তোর পরীক্ষার আর কদিনই বা আছে, তারপর তোকে এনে কিছুদিনের জন্য রাখব এখানে। থাকবি তো?'

'কেন থাকব না, বলেই দেখ না তুমি?' প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে জবাব দিই এবং তখুনিই যেন থাকবার জন্য প্রস্তুত হই।

মীনামাসিমা চিন্তিত সুরে বললে, 'ভাবছি তোর পরীক্ষা হয়ে গেলে তোকে এখানে রেখে আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাব। বাড়ি পাহারা দিতে হবে—পারবি তো?'

'আর মিহিরবাবু?'

মীনামাসিমা তখুনি জবাব দেয়, 'উনি এখানে থাকবেন।'

ভয় পাই। মীনামাসিমা বড় একটা কৌতুক করে না, অন্তত এ কথাটা সে আমায় ভয় দেখাবার জন্য বলেনি।

সভয়ে বলি, 'না না, মিহিরবাবুর সঙ্গে একা থাকতে পারব না।'

'ভয় কিসের, তোকে খেয়ে ফেলবেন নাকি?'

ভয় নয়, বিভীষিকা! মিহিরবাবুর ছায়া আমার দেহের ওপর পড়লে শিউরে উঠি। যদিও সেদিনকার পর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি এবং সেদিন তিনি আমায় আন্তরিক উচ্ছ্বাসে আপ্যায়িত করেছিলেন, কিন্তু শুনে শুনে তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে এক বিভীষিকার ছায়াপাত হয়েছে। ঠিক ভয় নয়, চরম অস্বস্তিই যেন মিহিরবাবুর কথায় আমার মনে জেগে ওঠে।

মীনামাসিমা বললে, 'ভয় কি তোর, তোকে তো উনি ভালবাসেন। শুধু তোকে কেন, সাধারণভাবে সকলকে, সব কিছুকে তিনি ভালবাসেন। একটা কুকুর বেড়াল কি ফড়িং প্রজাপতির প্রতিও তিনি কোনদিন বিমুখ হননি। চোর ডাকাত খুনে বদমাস যাদের প্রতি দুনিয়ার মানুষের অসীম ঘৃণা, তাদের জন্যেও তাঁর প্রাণে কি আকুল মমতা! গভীর সমবেদনা! কিন্তু এ কি তুই বিশ্বাস করবি? তুই কেন, কেউ কি করে? ওঁর একটি জিনিসের অভাব, মুখে সৌজন্যের মুখোশ নেই। আমায় গায়ে মারের দাগগুলো দেখলে কে বিশ্বাস করবে ঐ খুনে লোকটাই রাস্তা থেকে বৃষ্টি-ভেজা-কুকুরছানার কান্না শুনে মাঝরাতে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে নিজের হাত পা ভেঙে বসেন! ওঁর মধ্যে সাধারণ মানুষের মত সামঞ্জস্য নেই, তাই যত গোলমাল।'

রাত হয়ে যাওয়ার জন্য এতক্ষণ মীনামাসিমাই আমায় বাড়ি যাওয়ার তাগাদা দিচ্ছিল, এবার বিরক্ত হয়ে নিজেই উঠে পড়ি। মিহিরবাবুর কথা উঠলেই সে পতিচরিত্র ব্যাখ্যানের নির্লজ্জ আকুলতা প্রকাশ করে। অসহ্য বোধ হয় আমার। মীনামাসিমার সান্নিধ্যও দুঃসহ তখন, মনে হয় তার অপরূপ মুখশ্রীতে খানিকটা আলকাতরার কালি ফুটে উঠুক। মিহিরবাবুর প্রসঙ্গ এসে পড়লে সে যেন সর্বত্রই মসীমুখ হয়ে যায়, লজ্জার পাথরচাপা হয়ে তার সব উচ্ছ্বাস দমিত হয়।

মীনামাসিমাকে নিঃশব্দ অভিশাপ দিতে দিতে আমি তার ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। রাস্তায় এসে যতগুলি নিঃশ্বাস ফেলি সবই যেন অভিযোগ ও অনুযোগ মাখানো।

॥ পাঁচ ॥

মীনামাসিমার ইচ্ছাই পূর্ণ হল। তখন ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে পড়ছি। মীনামাসিমার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। কারণ বুঝতে পারি, সে অন্তঃসত্ত্বা। অনাকাঙ্ক্ষিতের আগমন প্রতীক্ষায় সর্বদাই বিষাদগ্রস্ত।

একদিন বললে, 'অশোক, তোর ওপর ছাড়া আমি কারো ভরসা করতে পারি না, বল্ কথা রাখবি?'

তার কণ্ঠের ব্যাকুল মিনতি আমায় ভীত-বিব্রত করল; কিন্তু তবু সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম, 'অমন করছ কেন, বল না কি বলবে?'

মীনামাসিমা দ্বিধাগ্রস্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললে, 'তোকে কিছুদিন এ বাড়িতে থাকতে হবে, কথা দিয়েছিস, ওকে দেখবি। তোর মা বাবা অনুমতি দেবেন তো?'

'কেন বল তো!' এবার সত্যিই ভয় হল, কিন্তু জোর করে মুখে হাসি টেনে রাখলাম।

'আমার শরীর ভাল নেই,' সলজ্জে মীনামাসিমা বললে, 'কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে; ডাক্তার বলেছেন, পেটের এটা ভোগাবে।'

লজ্জায় সে অধোবদন হল, 'আমার ভয় হয় অশোক, অনেক সময় মা হতে গিয়ে মেয়েরা তো মরে যায়, তখন ঐ অবুঝ মানুষটার কি হবে?'

'তুমি ভাবছ কেন,' নিজের বুদ্ধিতে বলি, 'আমরা তো এগারোটি ভাইবোন, আমাদের মা কি মরে গেছে?'

মীনামাসিমা হঠাৎ ঘাড় তুলে সোজা হয়ে বসে, তারপর যেন কোন অলক্ষ্য শত্রুর উদ্দেশে দীপ্ত স্বরে বলে, 'তা জানি না, তবে আমায় আরো পাঁচ-সাত বছর বাঁচতে হবে। বাড়িতে হঠাৎ যদি কিছু ঘটে যায়, তাই আমি হাসপাতালে কেবিন নিয়ে থাকব। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা ধার নিয়েছি।'

আমার সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, মীনামাসিমা হাসপাতাল যাবে, মিহিরবাবুকে নিয়ে আমায় একলা থাকতে হবে। একটা পাখি পুষিনি কোনদিন, আর আজ এক দুর্দান্ত নরপশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মাথায় এসে পড়ছে। কিন্তু মীনামাসিমার ব্যাকুলতা, বেঁচে থাকার অসীম আগ্রহ, ভিখারিণীর মত অনুনয়—এগুলো বিপরীত শক্তির টান আমি অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। নিজের তরুণ পৌরুষের খাতিরে সম্মতি দিতে হল।

বললাম, 'তুমি এমন করে বললে আমার লজ্জা হয়। সামান্য তো ব্যাপার, তোমার একবার বলাই যথেষ্ট। তোমার কোন্ কথাটা আমি শুনিনি? কিন্তু আমি কাজকর্মের তো কিছু জানি না—কি করতে হবে?'

'তোকে কিছুই করতে হবে না,' যেন এক বিরাট দুশ্চিন্তার ভার তার বুকে পাথরের মত চেপে বসেছিল, সেটা নেমে যেতে স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁচল। তারপর আশ্বস্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে বললে, 'ওঁকে দেখবি। সীতা থাকবে, সে-ই সব করবে। সীতা কাছে ঘেঁষতে চায় না, তুই ওঁর খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর রাখিস। একলা রাস্তায় বেরুতে দিস না, অবশ্য রাস্তায় উনি বড় একটা যানও না। যা বলবেন কিনে এনে দিবি, তোর কাছে টাকা রেখে যাব। আর ঐ সব—', একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললে মীনামাসিমা, 'মানে ঐ মদ-টদ সীতাই কিনে এনে দেয়।'

ঐ মদ-টদ বলার লজ্জাটুকু কাটাবার জন্যই যেন সে একটু তামাশা করলে, 'তোকে

খেতে বললে খাস না, বুঝলি?'

'তা কখনো খাই!'

এবার মীনামাসিমা ভরা গলায় হাসল, 'ওঁকে তুই একটুও চিনতে পারিসনি অশোক! উনি তোকে খেতে বলবেন না, ভয় নেই। নিজেরই কোন দায়িত্ব নিতে পারেন না, অপরকে খারাপ করার দায়িত্ব নেবেন কি করে? এ কাজ আরো কঠিন, পণ্ডশ্রম করার মত শক্তি বা অবসর তাঁর নেই। তিনি সদাই নিজের সাধনায় মগ্ন থাকেন।'

সীতা ঘরে ঢুকল, বাজারের খরচ চাইল। মীনামাসিমা তার হাতে টাকা দিয়ে মুখে মুখে ফর্দ বলে দিল।

সীতা চলে যেতে সে আমায় বললে, 'কটা বাজে দেখ্ তো, আমার ঘড়ি বন্ধ হয়ে আছে।'

কলেজে ঢুকে নতুন হাতঘড়ি পেয়েছি, ঘন ঘন সময় দেখার দুর্বলতা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। মীনামাসিমার সঙ্গে কথা বলার মধ্যেও বারকয়েক সময় দেখে নিয়েছি। এখন বিকেল সওয়া পাঁচটা।

তবু আবার ঘড়ির দিকে তাকালাম, 'পাঁচটা সতেরো।'

'ক সেকেন্ড বললি না, তোর ঘড়িতে সেকেন্ডের কাঁটা নেই বুঝি?' মীনামাসিমার কাছে আমার নতুন ঘড়ির মোহ অবিদিত নেই, তাই সে একটু নিখাদ কৌতুক করে নিলে।

আবার ঠিক সময়টা দেখতে যাচ্ছি, মীনামাসিমা বললে, 'থাক্, আর দেখতে হবে না।' তারপর চিন্তাক্লান্ত সুরে বললে, 'আমার একবার বাজারে যাওয়া দরকার, সঙ্গে যাবি? একলা রাস্তায় চলতে ভয়-ভয় করে। মাঝে মাঝে মাথা ঘোরে, মনে হয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব!'

'চল না, আমি তো তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।' আমি যাবার জন্য তৈরি হয়েই আছি।

একটু চিন্তা করে মীনামাসিমা উত্তর দিলে, 'কেনা-কাটার তো অনেক আছে, কিন্তু এখন হাত-পা ছড়িয়ে খরচ করতে ভয় হয়। হঠাৎ যদি টাকার টান পড়ে, তাই ভাবছি—আচ্ছা চল্, রাস্তায় যেতে যেতে ভাবা যাবে কোন্‌টা বাদ দিয়ে কোন্‌টা কেনা চলতে পারে।'

রাস্তায় বেরিয়ে মীনামাসিমা সদর দরজায় তালা বন্ধ করে দিল। একটা চাবি সীতার কাছেও থাকে। মিহিরবাবু তাঁর নিজস্ব চিড়িয়াখানায় বন্দী হয়ে রইলেন। হয়তো জানতেও পারলেন না। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না তাঁর। এককালে নাকি খুব দুরন্ত ছিলেন। দুর্দান্ত অশান্ত ছিলেন। বাড়িঘরের সঙ্গে শুধু দু'মুঠো অন্নের প্রয়োজনেই সম্পর্ক রাখতেন। কিন্তু এ হল দশ-পনেরো বছর আগেকার কথা। তারপর বন্য মহিষটা স্বেচ্ছায় শৃঙ্খল গ্রহণ করেছে এবং তার বাইরের অশান্ত প্রকৃতিকে গৃহগত বর্বরতায় পরিণত করেছে।

মাসটা মনে পড়ে না। রাস্তার গাছগুলোয় ফুলের সম্ভার। কৃষ্ণচূড়াই বেশি। হলদে ফুলের বৃক্ষও আছে।

পথ চলতে চলতে মীনামাসিমা দাঁড়িয়ে পড়ল, 'দু-চার গুছি কৃষ্ণচূড়া তুলতে পারিস অশোক?'

'কেন?'

'ওর জন্যে। ফুল খুব ভালবাসেন, বিশেষ করে কৃষ্ণচূড়া।'

মিহিরবাবুর কথা উঠতে স্বাভাবিকভাবেই আমার চিরাচরিত বিতৃষ্ণা জাগে, বিরুদ্ধ

সুরে বলি, 'হাত বাড়িয়ে কি তোলা যায়, গাছে উঠতে হবে।'

'ওঠ্ না ভাই!'

আমি আপত্তি জানাই, এগিয়ে যেতে যেতে বলি, 'না, তোমার মিহিরবাবু ফুল ভালবাসেন বলে আমি দিনদুপুরে বাঁদরের মত গাছে উঠে ঝুলতে পারব না।'

সে তবু গাছতলায় দাঁড়িয়ে থেকে উত্তর দেয়, 'এখানে কি ফুলের বাজার আছে, তাহলে কিনে নিয়ে যেতুম। তুই ছেলেমানুষ, ওঠ্ না গাছে, কে কি মনে করবে?'

'না, আমি পারব না।'

হঠাৎ অন্য একদিকে তাকিয়ে মীনামাসিমা আমার প্রতি তার আবেদনের আগ্রহ বিসর্জন দিয়ে বললে, 'থাক্, পারতে হবে না; কোন্ কাজটা তুই পেরেছিস? ঐ ছেলেটাকে ডাক্, দুটো পয়সা দিলেই ফুল পেড়ে দেবে।'

আমার অপেক্ষা না করেই সে হাতের ইঙ্গিতে অদূরবর্তী ছেলেটাকে ডেকে বললে, 'ফুল পেড়ে দিবি, দুটো পয়সা দেব?'

উলঙ্গ ছেলেটি তরতর করে গাছে উঠে গেল, চোখের নিমেষে কয়েক গুচ্ছ ফুল ছিঁড়ে রাস্তার ওপর ফেলে দিল, 'আর লেবেন?'

'না থাক, অনেক হয়ে গেছে। তুই নেমে আয়।'

ফুলগুলি কুড়িয়ে নিয়ে মীনামাসিমা আমায় বললে, 'নে, ধর্।'

'তোমার শখ আছে, তুমি বয়ে নিয়ে চল। আমি ফুল হাতে নিয়ে বাজারের মাঝ দিয়ে ট্যাং ট্যাং করে চলতে পারব না।'

'বউ হোক, তখন ফুল কেন, তেজপাতার বস্তাও মাথায় বয়ে নিয়ে চলবি।'

মীনামাসিমা আর অনুরোধ করল না। কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন মুখে ফুলগুলো সযত্নে নিজের হাতেই গুছিয়ে নিল।

বাজার ঘুরল মীনামাসিমা। কোন্ এক বিশেষ কোম্পানীর আটত্রিশ নম্বরের একজোড়া গেঞ্জি কিনতে সারা বাজার তোলপাড় করল। আরো কয়েকটা টুকিটাকি। সবই মিহিরবাবুর জন্য। তারপর একটি স্টেশনারি দোকানে ঢুকে বললে, 'এক টিন ভাল সিগারেট দিন তো?'

'ইজিপশিয়ান্ দেব, অবশ্য দাম একটু বেশি পড়বে?'

'স্টেট এক্সপ্রেস্ নেই?'

'আছে, কিন্তু ব্যালকানটা ট্রাই করে দেখতে পারেন, আরো ভাল সিগারেট।'

'তাহলে দুটোই দিন।'

ফিরতি পথে মীনামাসিমা সর্বক্ষণ খরচপত্রের হিসেব করল। নিজের পায়ের পুরনো চটিজোড়া মুচিকে দিয়ে মেরামত করিয়ে নিল। তিন আনা পয়সা খরচের জন্য খেদ জানাল একটু। কিন্তু অনেকগুলো টাকার অপব্যয় করে অমানুষটির জন্য দু'টিন সিগারেট কিনে দোকানের বাইরে এসে বিজয়-গর্বিণীর মত হেসে বলল 'হ্যাঁরে অশোক, ইজিপ্‌শিয়ান সিগারেট খুব ভাল হবে, না? তোর বন্ধুরা কিছু বলে নি?'

আমি মাঝে মাঝে ধূমপান করি, মীনামাসিমা তা জেনেই কথাটা ঘুরিয়ে বললে। বলতে পারতাম—চার পয়সা প্যাকেটের সিগারেট আর ন' আনা প্যাকেটের সিগারেটে স্বাদের কোন তফাৎ পাই নি আমি। কিন্তু উত্তর দিলাম অন্য ভাষায়, 'আমার কোন বন্ধু সিগারেট খায় না। যারা খায় আমি তাদের সঙ্গে মেলামেশা করি না।'

মীনামাসিমা মুচকে হাসল, উত্তর দিল না।

সীতা আমাদের আগেই বাড়ি ফিরে এসেছিল। সে দরজা খুলে দিয়ে ত্রস্ত-শঙ্কিত সুরে বললে, 'ওপরে যাও তাড়াতাড়ি, বাবু খুঁজছে।'

'কেন?'

'কি যেন খুঁজে পাচ্ছে না।'

'কি পাচ্ছেন না, তুমি নিচে থেকেই জিজ্ঞেস করলে না কেন?'

'বললে না ঠিক করে। জিজ্ঞেস করতে জবাব দিলে.... জবাব দিলে...' ভাবতে লাগল সীতা। তারপর নিজের স্মরণশক্তির অপ্রতুলতায় বিরক্ত হয়ে বললে, 'জানি নি বাপু, পাগলের কথা মনে থাকে না!'

আমাকে তার নিজের ঘরে অপেক্ষা করতে বলে মীনামাসিমা বাজারে কেনা জিনিসপত্র হাতে নিয়ে ত্বরিত পায়ে ওপরে চলে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই পুরুষ কণ্ঠের চিৎকার শুনলাম, 'কোন্ চুলোয় গিয়েছিলে, ডাকছি কখন থেকে?'

মীনামাসিমার উত্তর শুনতে পেলাম না।

ও পক্ষ বললেন, 'আচ্ছা বল তো কবিতায় অবরুদ্ধ মহাবেগ শব্দ ব্যবহার করতে পারি কি না? মহাবেগের আগে অবরুদ্ধ বসালে মহাবেগের গতি কি স্থগিত হয়ে যায়, না এক্ষেত্রে অবরুদ্ধ শব্দের মানে সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েও এক বিশিষ্ট ভাবের গতি এনে দেয়? আমার তো মনে হয়, একটা ব্যথাসঞ্জাত শক্তির উন্মেষ বোঝাবার জন্যে অবরুদ্ধ মহাবেগ কথাটা যথার্থ প্রয়োগ। তোমার কি মত?'

মীনামাসিমার উত্তর এবারেও শুনতে পেলাম না, তবু মিহির সেনের পরের কথায় বুঝলাম, অবরুদ্ধ মহাবেগে তাঁর আপত্তি নেই।

মিহির সেন বললেন. 'সত্যি বলছ তো; কানে বাজছে না? বেসুরো মনে হচ্ছে না?'

মীনামাসিমার গলা এবার শুনতে পেলাম, 'না গো না।'

'সত্যি!'

মীনামাসিমা এ যাত্রা ফাঁড়া কাটিয়ে গেল। আমার আশঙ্কিত মন আশ্বস্ত হল। একটা শান্তির শ্বাস ফেললাম।

॥ ছয় ॥

মীনামাসিমা হাসপাতালে এল। বড় হাসপাতালে প্রথম শ্রেণীর কেবিন নিয়েছে। সেরা গায়নোকোলজিস্টের শরণাপন্ন হয়েছে। আড়ম্বর একটু বেশি বলেই মনে হয় আমার। নারীজীবনের স্বাভাবিক নিয়মটুকু পালনের পথে এতগুলি বিশিষ্ট আয়োজন দেখে মনে হয়, যেন এমন একটা কিছু ঘটতে চলেছে যা অভূতপূর্ব। আমার মায়ের বেলায় কখনো এমন দেখি নি। সকালবেলা রান্না করে দুপুরের দিকে নির্বিঘ্নে সন্তানের জন্ম দিয়েছে।

কিন্তু মীনামাসিমা একই কথা বিভিন্ন সুর আর ভাষায় ব্যক্ত করে, 'আমার বেঁচে থাকা দরকার, অশোক। ডাক্তার বলেছেন, পেটের বাচ্চাটা ভোগাবে, হয়তো মেরে ফেলবে আমায়। কিন্তু অন্তত আরো পাঁচ-সাতটা বছর আমায় জীবনের মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। এখন মরে গেলে আমার আসল কাজ অসমাপ্ত থেকে যাবে। উনি এখনো সফল হন

নি, এর মাঝে যদি আমি চলে যাই—না না, মরতে আমি পারি না। সাতাশ বছর বয়েসে কেই বা মরে যায়!'

চুপ করে থাকি। কেবিনের নার্স কান পেতে মীনামাসিমার কথা শুনে কাছে এগিয়ে আসে, বলে, 'এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন মিসেস সেন! সার্জারির উন্নতির ফলে আজকাল কানা মানুষ তার চোখ ফিরে পায়। লাংস কেটে বদলে দিচ্ছে, মড়া বেঁচে উঠছে, সে তুলনায় আপনার কি হয়েছে! হয়নি কিছু, হওয়ার ভয়ও নেই—তবে একটা প্রিকশান্ নেওয়া ভাল, সে তো সর্দি-কাশির ব্যাপারেও নেওয়া উচিত। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, যথাসময়ে আপনি ছেলে-কোলে বাড়ি ফিরবেন। মিস্টার সেন আপনাকে দেখতে এলে আমরা তাঁর কাছে আগাম সন্দেশ আদায় করে নেব।'

মিহির সেনের কথা উঠতে মীনামাসিমা অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু বিব্রত-অস্বচ্ছন্দ ভাবটুকু নিমেষে সামলে নিয়ে উত্তর দেয়, 'উনি কি আসতে পারবেন, শরীর খুবই অসুস্থ!'

'কি হয়েছে?' স্বাভাবিক আগ্রহ নিয়ে নার্স প্রশ্ন করে।

'অসুখ।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় মীনামাসিমা, যার ওপর দ্বিতীয় প্রশ্ন চলে না।

নার্স একবার ঘরের বাইরে যেতে মীনামাসিমা আমার ডান হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর রাখে, তারপর আমার মুখের দিকে আশাতুর দৃষ্টিতে তাকায়, 'অশোক, আমার বুক ছুঁয়ে একটা প্রতিজ্ঞা কর্'।

অনুমানে বুঝেছি মীনামাসিমার আকুলতা এবং শপথ করাবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু শ্রীমিহিররঞ্জন সেন নামক ভাগ্যবান বর্বরটি। খানিকটা বিরক্তি আর তিক্ততা এসে আমার জিভের ডগা ভিজিয়ে দেয়, তবু অপ্রিয় কথা এড়িয়ে যাবার জন্য চুপ করে থাকি।

'বল্, তোকে যা বলেছি, মনে রাখবি? আমি যে ক'দিন এখানে থাকি, ওঁকে দেখবি?'

'কতবার তো একই কথা বলেছি, তবু তুমি ভাবছ কেন?'

'যা বলেন তা শুনবি, ওঁর একটি মুহূর্ত ব্যর্থ হয়ে যেতে দিবি না?'

'মানে!'

মীনামাসিমা এক নিঃশ্বাসে বলে যায়, 'তুই বুঝবি না, কি ভাবেই বা তোকে বোঝাব! শিল্পীকে খুব কাছ থেকে দেখিসনি তো কখনো? তার সমস্ত চেতনা যখন সাধনায় মগ্ন থাকে, তখন সে বাইরের দেহটাকে নানারকম খেয়াল আর খেলায় মাতিয়ে রাখে। সেই সময়টা সহযোগিতা করাই তো আমাদের একমাত্র কর্তব্য। ওঁর কোন ইচ্ছেয় বাধা দিবি না?'

মিহির সেন মানুষটি একটি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিশেষ। তাঁর কোন্ ইচ্ছা কোন্ কাজ সমর্থন বা সহযোগিতার যোগ্য আমি তার কিছুই খুঁজে পাই না। তাঁর কাজে বাধা না দেওয়ার অর্থটাও বুঝতে পারি না; কিন্তু মীনামাসিমার উচ্ছ্বাসে অন্তরায় হয়ে পরিস্থিতিকে অযথা জটিল বা নাটকীয় করে তোলারও কোন অর্থ নেই। তাই গ্রীবা আন্দোলনে নীরব সম্মতি ব্যক্ত করলাম। বুঝিয়ে দিলাম, তুমি যা চাও, তাই হবে।

সে খুশি হল। আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বিছানায় উঠে বসল। বালিশের নিচে হাতড়ে একটা ছোট মোড়ক বের করল। চিউইংগাম। সেটি আমার হাতে দিয়ে বললে, 'ধর্, ঝিকে দিয়ে তোর জন্যে আনিয়ে রেখেছি। ভাবলাম, যখন এখান থেকে বেরুবি তখন কি তোকে খালি হাতে ফেরত পাঠাব!'

হেসে ফেললাম, 'এই বুঝি আমার মজুরি, না কথা রাখবার জন্যে ঘুষ?'

'না রে না—' খানিকটা নিশ্চয়তার আভাস পেয়ে মীনামাসিমা তার আনন্দটা কিভাবে প্রকাশ করবে, ভেবে পায় না। বেশ অনুমান করতে পারি অনেক কিছু বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছে সে। বহু সুরের সংযোগে আসল বক্তব্য বেসুরো হয়ে পড়ছে। তাই প্রকাশ করতে সংকোচ করছে যেন।

মীনামাসিমা বললে, 'তোর সঙ্গে কথা বলায় আমার সবচেয়ে বড় বাধা কি জানিস? বয়েসের তফাত। তার ওপর তুই পুরুষ আর আমি মেয়েছেলে। যেটা বলতে সহজ, বোঝানো সহজ, তা তোর কাছে অন্য ভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে জটিল হয়ে পড়ে। যা হোক, ওঁকে গিয়ে বলিস—'

'কি?'

বলতে গিয়ে কথা ঘুরিয়ে নিলে সে, 'যাঃ তুই বড় পেকে গেছিস, কিছু বলতে হবে না তোকে। যা বলে দিয়েছি সেটুকু দয়া করে মনে রাখলেই আমি বর্তে যাই।'

মীনামাসিমা ক্লান্ত ভাবে বিছানার এক পাশে দেহটা এলিয়ে দেয়। সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে বলে, 'রেগুলেটারটা আরো একটু ঘুরিয়ে দে তো—মনে হচ্ছে ইলেকট্রিকের ভোল্টেজ কমে গেছে, মোটেই হাওয়া পাচ্ছি না!'

ডাক্তার এলেন বিকেল পাঁচটায়। আমায় কিছুক্ষণের জন্য ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। মীনামাসিমা আমার একটা হাত চেপে ধরল। ভয় পেয়ে আছে অকারণেই! নার্স আর একবার তাকে ভরসা দিল। সারাদিনে এমন ভরসা সে বহুবারই দিয়েছে। আমার সামনেই বার কতক দিয়েছে।

ডাক্তার আমায় বাইরে অপেক্ষা করতে বলায় মীনামাসিমার হাত ছাড়িয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, হাতটা ধরে রেখে সে বললে, 'তোর অপেক্ষা করার দরকার নেই, বরং আমার চলে যা। মাকে বলে এসেছিস তো?'

সামনে অনুরোধের ভাষার সঙ্গে আকুলতাটুকু সে আর প্রকাশ করলে না। খানিকটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁচলাম। পরক্ষণেই মনে পড়ল, আজ সন্ধ্যা থেকে শূন্য বাড়িতে একটি পাগলের সাহচর্যে আমার প্রাত্যহিকী আরম্ভ হবে। মনে হতেই সারা শরীরে একটা বিরক্তির আক্ষেপ অনুভব করলাম।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মীনামাসিমার বাড়ির দিকে গেলাম না। বাড়ি ফিরলাম। তারপর কারো সঙ্গে দেখা না করে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে আমার চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। দাদা বিদেশে পড়তে যাওয়ার পুরস্কারস্বরূপ এই ঘরখানির সামগ্রিক স্বত্ব আমিই লাভ করেছি। নিবিড় আশায় নিজের বিছানাটিকে আঁকড়ে ধরলাম, যেন আগামী কয়েক দিনের নির্বাসন আমায় ভোগ করতে না হয়। যেন কোন ছলছুতোয় এখানেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারি। কামনা করি, কোন আকস্মিক ব্যাধি আমায় ঘিরে ফেলুক। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

হঠাৎ অঙ্কুশ-তাড়িতের মত ঘুম ভেঙে জেগে উঠি। ঘুমের জড়তা কাটিয়ে নিজের অবস্থিতির স্থান সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হতে অল্পক্ষণ সময় লাগল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত প্রায় আটটা। বিছানা ছেড়ে উঠতে হল। ফাঁকি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা সামান্য নারীর ব্যাকুল অনুরোধ, ব্যগ্র প্রত্যাশা এবং তার জন্য যৎসামান্য ত্যাগ স্বীকারে অক্ষমতা প্রকাশ করতে, সংকুচিত হয়ে উঠছি আমি।

মাকে এসে জানালাম, 'মীনামাসিমার বাড়ি যাচ্ছি।'

মা সম্মতি দিল। রান্নাঘরের কাজে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দিয়ে সম্ভবত আমায় কয়েকটি প্রয়োজনীয় উপদেশদানের আগ্রহে ছোট পিসিকে বললে, 'দুধের কড়াটায় একটু নজর রেখ ছোট্‌ঠাকুরঝি, উৎলে এলে একটু জল ঢেলে দিও।'

চৌকাঠের এপারে দাঁড়িয়েছিলাম, মা এসে কাছে দাঁড়াল, 'আপত্তি তো করতে পারি না বাবা, এ সময় করা উচিতও নয়; কিন্তু সাবধানে থাকিস।'

হাসলাম। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, 'সাবধান কিসের জন্যে মা, সে-ও তো একটা বাড়ি, যেমন আমাদেরটা। বনজঙ্গল তো নয়!'

'না, তা নয় বটে', মা জবাব দিলে, 'লোকটা যে পাগল, তাকে বিশ্বাস কি? রাত্তিরে একটু সজাগ হয়ে ঘুমোস।'

'জেগে ঘুমোতে বলছ মা,' মায়ের আশঙ্কা হাল্কা কৌতুক দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি।

মা রেগে ওঠে, 'জানি না বাপু, তোমাদের সঙ্গে কথা বলা ঝকমারি! মোট কথা, বিপদ-আপদে পোড়ো না—'

'পড়লেই বা কি, হারাধনের দশ ছেলের মতন তোমার এগারোর বোঝা দশে এসে একটু হাল্কা হবে।'

মা এ ধরনের বাক্যালাপ আদৌ পছন্দ করে না। করে না বলেই বললাম।

মা বললে, 'দুর্গা দুর্গা, যা মুখে আসে তাই বলিস কেন? আমার বোঝা আমারই থাক, কাউকে তো সাহায্য করতে ডাকিনি? তা আর রাত করা কেন, খেয়ে নে।'

'ওখানেই খাবার কথা ছিল যে।' মায়ের কথার উত্তরে বললাম, কিন্তু ও-বাড়ির অবস্থা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারছি না, তাই অল্প আপত্তি জানিয়ে আবার বললাম, 'তা তুমি যখন বলছ, তখন দাও, খেয়েই যাই।'

॥ সাত ॥

সীতা দরজা খুলে দিয়ে বললে, 'এসেছ বাবা, আমি একলাটি থেকে ভয়ে মরি! ভাবছি, এই আসে, এই আসে—'

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলি, 'ভয় কিসের তোমার?'

সুইচ টিপে দালানের বড় আলোটা জ্বেলে দিয়ে সীতা জবাব দেয়, 'ভয় নয়তো কি। দত্যিটা ওপরে দাপাদাপি করছে, আর নিচুতলায় একলাটি আমি। চল, তোমার খাবার দিই, তুমি খেয়েদেয়ে, দত্যিটার খাবার নে' ওপরে যাও'। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বলে, 'দেখ, আমি আজ সন্ধ্যাবেলায় চুপি চুপি সিঁড়ির দরজার পাশে একটা ঠ্যাঙা রেখে এয়েচি—দত্যিটা তোমায় যদি কিছু করে—'

'তার মাথায় এক ঘা দিতে হবে, এই তো?' সীতার কথা শেষ হবার আগেই জিজ্ঞেস করি।

'না, না,' সীতা ত্বরিত উত্তরে আমায় বাধা দেয়, যেন আমার সংকল্প তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ছিন্ন করে দিয়ে বলে, 'মের না মের না, লোকটা তো আসলে দত্যি নয়, মনিষ্যি। তবে পাগল কিনা, ঠ্যাঙা নিয়ে হেট্‌-হেট্‌ করে ভয় দেখিও, তাহলেই হবে।'

আমি এবার হাসি, 'তবে তুমিই বা এত ভয় পাও কেন, লাঠি নিয়ে তাকে ভয় দেখালেই তো পার?'

'আমি যে মে' মানুষ', সীতা সখেদে বলে, 'মে'মানুষ দেখে একটা বাচ্চা হনুমানই ভয় পায় না, আর এ তো এক জোয়ান মদ্দমনিষ্যি।'

গলার সুর পাল্টে সীতা আবার আমায় তাগাদা দেয়, 'চল তোমায় খাইয়ে, দত্যির খাবার গুছিয়ে দিয়ে, বাড়ি যাই।'

আমার চোখে ঘুম আসছে, হাই তুলে জবাব দিই, 'আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি যে। তুমি শুধু দত্যির খাবার গুছিয়ে দাও। তারপর তুমি বাড়ি গেলে আমি দোর বন্ধ করে ওপরে উঠব।'

সীতা সবিস্ময়ে বলে, 'দিদিমণি যে বলে গেল, তুমি কদিন সব্বক্ষণ এখেনেই থাকবে, খাবেও এখেনে; আমি সেই রকম রান্না করে রাখলুম?'

আমি তাড়া দিয়ে বলি, 'কাল থেকে তাই হবে, আজ আমি খেয়ে এসেছি। তুমি একটু তাড়াতাড়ি মিহিরবাবুর খাবার গুছিয়ে দাও। তোমায় বিদায় করে, মিহিরবাবুকে খাইয়ে, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করব।'

কিন্তু সীতা কি যেন ভাবতে থাকে, শেষে বলে, 'আমি বাড়ি গিয়েই বা কি করব, কে আছে আমার সেখেনে? শুধু ঘরের কুলুপ খুলে ঘুমুনো, এই তো! তা এখেনেও ঘুমুতে পারি। তুমি দত্যির খাবার নে' ওপরে যাও, আমি ক'দিন এ বাড়িতেই রইলুম।'

তার কথায় আপত্তি করি না। সে থাকলে আমার কিছুটা সুবিধা হয়। খাঁচার জীবটিকে পাহারা দেওয়ার ভার থেকে একটু রেহাই পাই তাহলে, আর সীতার উপস্থিতিও একটা ভরসা, হোক তা একান্ত অকিঞ্চিৎ কিংবা অসহায়।

সীতা মিহিরবাবুর খাবার গুছিয়ে দিল। থালা হাতে নিয়ে সিঁড়ির পথ ধরি। মনে প্রচণ্ড অস্বস্তি, তার সঙ্গে এক বিচিত্র পরিস্থিতির অনুভব। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হতেই ওপর থেকে মিহিরবাবু সাড়া দিলেনে, 'কে?'

'আমি', সিঁড়ি উঠতে উঠতে জবাব দিলাম। কানা-ভাঙা সিঁড়িতে আমার মনের সাবধানতা আটকে আছে।

'কে, মীনা'?

প্রশ্ন শুনে হাসি পেল আমার। পদশব্দে ভদ্রলোক ভুল করতে পারেন, কিন্তু কণ্ঠস্বরেও কি বুঝতে পারলেন না? না, নেশায় চুর হয়ে আছেন, গলার আওয়াজের তারতম্য নির্ণয়ের শক্তি অবলুপ্ত!

সিঁড়ির প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছি আমি, 'আমি অশোক।'

'ও, শ্রীঅশোককুমার মিত্র! এস, উঠে এস। না, ওখানেই একটু দাঁড়াও; আলো জ্বালি, বারান্দা অন্ধকার।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল। বারান্দায় পৌঁছে দেখলাম মিহিরবাবু সামনে দাঁড়িয়ে। নগ্ন উপরাঙ্গ। পরেন লুঙ্গি। লুঙ্গিটা ওপর দিকে খানিকটা গুটিয়ে নিয়েছেন, হাঁটুর কাছাকাছি ঝুল নেমে আছে। বিশাল দেহ বলা যায় না মিহিরবাবুকে। দত্যির মত নয়। সুগঠিত। সুদেহী। তবে রোমশ। হাত পা ও বুকে কেশের বন-উপবন। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। অথচ এখন গরম নেই বিশেষ। অন্তত ঘাম ঝরবার মত নয়, প্রথম রাতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে এখন।

'তোমার হাতে কি?'

'আপনার খাবার।'

মিহিরবাবু হাসলেন, শিশুর মত সরল হাসিতে মুখখানা ভরে উঠল, 'সীতা বুঝি নিজে আসতে পারল না? আমায় ভয় পায় কেন, অথচ আমি তো তাকে কোনদিন কিছু বলিনি? তোমারও ভয় হয় নাকি?'

ইচ্ছাকৃত এবং কষ্টকৃত বিস্ময় প্রকাশ করি, 'কিসের ভয়? আপনাকে? কেন?'

'দাও, থালা আমার হাতে দাও', মিহিরবাবু আমার হাত থেকে থালা নিলেন, 'ঘরে চল। তোমায় কিছুদিন এখানে থাকতে হবে তো?'

'হ্যাঁ।' আমি ঘরে ঢুকে সেদিনকার সোফাটিতে বসে পড়ি।

সামনের তেপায়ায় খাবারের থালা রেখে মিহিরবাবুও বসেন, 'তুমি থাকবে, খুব ভাল হল। রোজই আমাদের পিক্‌নিক্‌ হবে। চপের পুরো ফরমুলা মীনার কাছে শিখে নিয়েছি। শুধু আলু আর মাংস নয়। মাংসের কিমা। আরো জিনিস লাগবে; দেয়ার আর সো মেনি থিংস! মসলাপাতি বিস্কুটের গুঁড়ো বা ভাজা সুজি এট্‌সেট্‌রা। আন্দাজমত দিতে হবে সব—এক্সপিরিয়েন্স দরকার। এক্সপেরিমেন্ট ইজ এক্সপিরিয়েন্স। ছেলেবেলায় যখন ডিমের আমলেট ভাজতাম—আঃ, সাহেব-হোটেলেও পারবে না। উনুনের হিট্‌ সম্বন্ধে পুরো খেয়াল রাখতে হয়, কে আর জানে এ কথা! আমলেট খাওয়াব তোমায়। কাল সকালে আমাদের জলখাবারে থাকবে, আমলেট টোস্ট চা আর কোন একটা মিষ্টি, যা তোমার পছন্দ—বাড়িতে তৈরি হবে। য়্যু লাইক সন্দেশ?'

'হ্যাঁ।'

'সীতাকে বলে দিও, সকালে গোয়ালা এলেই সব দুধ যেন ওপরে দিয়ে যায়, আর একটা স্টোভ। খুব ভোর থেকে লাগতে হবে।' চোখ কোঁচকালেন মিহিরবাবু, 'আচ্ছা বল তো, সন্দেশ কি দিয়ে তৈরি করে?'

'ক্ষীর।'

'হা হা হা—। দূর পাগলা, ক্ষীর নয়—ছানা।'

আমি নিজের অজ্ঞতার দরুন লজ্জিত না হয়ে সোৎসাহে প্রশ্ন করি, 'তাহলে ছানা কাটাতে হবে তো?'

'ও সিওর, গোটা দু-তিন পাতিলেবু চাই। বাসি ছানার জলে কাজ হয়, কিন্তু এখানে তা কোথায় পাব?'

অন্ধকার মেশানো রাতে আমাদের আলাপ চলতে লাগল, হঠাৎ কথা বন্ধ করে মিহিরবাবু উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনতে লাগলেন, 'কি ডাকছে বল তো?'

'কোথায়?'

'ঐ আবার শোনো—ছাদে। পেঁচা ডাকছে, লক্ষ্মীপেঁচা। লক্ষ্মীপেঁচার ডাক ভারি মিষ্টি। করুণ। লক্ষ্মীপেঁচা বোধহয় বাই নেচার স্যাডিস্ট। দুঃখবাদী। যেন জন্মজন্মান্তরের কোন অজানা ব্যথা বয়ে চলেছে। কেমন উদাস ডাক, না?'

'হ্যাঁ'। আমি বাধ্য হয়েই তাঁর মন্তব্য সমর্থন করলাম।

মিহিরবাবু কান পেতে পেঁচার ডাক শুনতে লাগলেন।

আমি বললাম, 'আপনার খাবার পড়ে রইল যে, খেয়ে নিন।'

সে কথার উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি এই দু'তলার স্বেচ্ছাবন্দী জীবনের

মাঝেই সবকিছু পেয়ে যাই, হাজার মাইল ঘুরে বেড়ালেও বোধহয় তা পেতাম না।' তারপর কিঞ্চিৎ বিরাম দিয়ে বললেন, 'হয়তো কথাটা ঠিক বলা হল না, ছেলেবেলায় দুরন্ত ছিলাম খুব, তখনকার বিরাট পটভূমিকায় দেখা জিনিসগুলো আজ অভিজ্ঞতার অণুবীক্ষণে অল্প পরিসরের মধ্যেই দেখতে পাই। আগেকার স্মৃতি পুরনোকে নতুন করে চিনিয়ে দেয়।'

'খাবেন না?'

'খেতে পারি, না-ও পারি, তার জন্যে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি বরং পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়, ওখানে আমার বিছানা পাতা আছে।'

'আপনি?'

'এ সোফাতে গা ছড়িয়ে বেশ শোয়া যায়,' মিহিরবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'যদি ঘুমোবার ইচ্ছে হয় বা ঘুম পায় এখানেই শুয়ে পড়ব। পেঁচার ডাক থেমে গেল কেন, উড়ে গেছে নাকি!

'হ্যাঁ, উড়ে গেছে', একবার শেষ প্রচেষ্টা করি, 'কিন্তু আপনার খাবার পড়ে রইল, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

মিহিরবাবু থমকে দাঁড়ালেন। তেপায়ার সামনে দাঁড়িয়ে খাবারের থালার ওপর চাপানো বগি-থালাটা তুলে দেখলেন একবার, 'সবই তো অখাদ্য!'

'কেন, ডিমের ডালনা, লুচি—'

'ডিমের ডালনা!' মিহিরবাবু পরম ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত কললেন, 'দ্যাট্ মাস্ট বি মেয়ারস্ এগ্, ঘোড়ার ডিমের ডালনা!'

'না, হাঁসের।'

সে কথার প্রতিবাদ করলেন না তিনি। হঠাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। বোধহয় ছাদে উঠলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমি পাশের ঘরে চলে গেলাম। বিপর্যস্ত বিছানাটাকে যথাসম্ভব সভ্য রূপ দিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং ঘুমোলাম অচিরেই।

॥ আট ॥

আমার ডান গালের লাল তিলটার কথা মিহিরবাবু ভোলেন নি। পরের দিন সকালে সে বিষয় অনুসন্ধান করলেন। ঘুম ভেঙে উঠতে আমার দেরি হয়নি। ভোরের দিকে ঠাণ্ডা বাতাসের আমেজে গড়িয়ে নিচ্ছিলাম খুশিমত। তবু সাড়ে ছ'টা নাগাদ পাশের ঘরে উঠে এলাম।

মিহিরবাবু অধৈর্য ভাবে আমারই জন্য অপেক্ষা করছেন, ঘরে ঢুকতে বললেন 'তোমার বুঝি বেলা ন'টা পর্যন্ত শোয়া অব্যেস? কখন থেকে বসে আছি, আর ভাবছি এই আসে, এই আসে।'

পরক্ষণেই কাজের কথায় নেমে এলেন তিনি, 'তোমার ডান গালের লাল তিলটা এখনো আছে তো? দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে মুখটা কেমন শ্রীহীন হয়ে গেছে, কামাও না কেন?

'এমনি'।

'নাকি প্রতিজ্ঞা করেছ, কুমারী অমুককে না পাওয়া পর্যন্ত কামাব না? আমিও তোমার বয়সে অমনি এক শপথ করেছিলাম, তারপর মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর মদ

ধরলাম, দেবদাস পড়ার ফল। তারই অনুকরণ। তারপর তাকে ভুলেছি ইন য়্যুজুয়াল কোর্স অফ টাইম, কিন্তু মদের নেশাটা ছাড়তে পারিনি।'

'না, আমার তেমন কিছু হয়নি।'

'তাহলে তো খুব ভাল,' মিহিরবাবু আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এলেন, 'সেই লাল তিলটা—ঘর অন্ধকার, চল, জানলার কাছে আলোয় যাই।'

মেনে নিলাম আমি। তাঁর কথামত জানলার পাশে গিয়ে আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালাম। মিহিরবাবু পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপর ডান হাতে আমার চিবুক ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন বহুক্ষণ ধরে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমাপ্ত হবার পর মন্তব্য করলেন, 'তিলটা ঠিক আছে। মুখেও তোমার একটা কচি কচি ভাব আছে, অবশ্য ফেসের আউট লাইন একটু বেশী হার্ড। তা মন্দের ভাল, ছবির আইডিয়া বদলে নিতে হবে; নাম দেব, প্রমিস অফ ইউথ। তারুণ্যের সংকল্প। বেশ নাম—না?'

'হ্যাঁ।'

আবার আমার চিবুকে হাত দিলেন তিনি। একটু নীরব থেকে বললেন, 'কিন্তু দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে এস, এতে চলবে না।'

তারপর কি ভেবে বললেন, 'থাক, কোথায় আর যাবে, আমার সেভিং সেট দিচ্ছি, কামিয়ে নাও—'

অসহায় ভাবে বলি, 'কিন্তু আমি তো এখনো দাড়ি কামাই নি, নিজে নিজে পারব কি?'

'তবে এখানে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়, আমি ক্ষুর নিয়ে আসছি। কচি দাড়িতে জল সাবান কিছুই লাগবে না, আমি এক টানে পরিষ্কার করে দেব।'

আশংকায় আমার দেহের প্রতিটি রোমকূপ শিউরে ওঠে। ভীত পদক্ষেপে কয়েক পা সরে যাই: 'কিন্তু এখন তো আমাদের খাবার তৈরি করার কথা ছিল; সন্দেশ, আমলেট—'

'সে অন্য কোনদিন হবে। আজ এখুনি তোমায় ছবির জন্যে সিটিং দিতে হবে। এস, দাড়ি কামিয়ে দি।'

যেন এক ভিন্ন জগতের মানুষ! আহার নিদ্রার জৈবিক-প্রবৃত্তি-বিমুক্ত এক মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি আমি। গত রাতের খাবার থালা-চাপা অবস্থায় তেপায়ার ওপর তেমনি পড়ে আছে, খাওয়ার কথা তিনি পেঁচার ডাক শুনে ভুলে গিয়েছিলেন। আজ আমার গালের লাল তিলটা তাঁকে জলখাবার তৈরি করার সংকল্প থেকে বিচ্যুত করেছে। এ সব চিন্তা ছাড়িয়ে একটি বৃহত্তর দুশ্চিন্তা আমার মস্তিষ্কে দুঃস্বপ্ন রচনা করে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, কর্তব্য স্থির করতে পারি না। এদিকে মিহিরবাবু ক্ষুরের সন্ধানে গেছেন—হঠাৎ মাথায় এক আত্মরক্ষার বুদ্ধি জেগে উঠল।

মিহিরবাবু ক্ষুর নিয়ে ঘরে ঢুকতে বললাম, 'আমি বরং সেলুনে দাড়ি কামিয়ে আসি, আর সেই সঙ্গে ফেরার পথে চায়ের দোকানে কিছু খেয়ে নেব, বড় খিদে পেয়েছে আমার।'

তিনি কিছু ভাবলেন, তারপর মুচকি হেসে বললেন, 'তাহলে চা টোস্ট ডিমের আমলেট আর সন্দেশ খেও, সঙ্গে পয়সা আছে তো?'

'আছে।'

'মীনার উচিত ছিল, আমাদের খরচপত্র দিয়ে যাওয়া।'

'মীনামাসিমাই দিয়ে গেছে।'

'কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি তার আছে তাহলে! তুমি ঐ টাকা থেকেই খরচ করবে। ডোণ্ট টাচ য়্যোর ওন মানি, বুঝলে? আর ফেরবার সময় আমার জন্যে কিছু সিগারেট নিয়ে এস। বেশি দামী আনতে হবে না, মীনার ছেলে হলে আমাদের খরচ অনেক বেড়ে যাবে। বেবিফুডের দাম হু-হু করে বাড়ছে, এদিকে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায় না। তার ওপর কচি বাচ্চা মানেই রেকারিং মেডিক্যাল এক্সপেন্স—পেট ফাঁপা জ্বর ক্রিমি—!'

আবার কাজের কথায় এলেন তিনি, 'তোমার ফিরতে কত দেরি হবে?'

'কত আর। আধ ঘণ্টা—'

'তার বেশি করো না, আমি ততক্ষণ ইজেল ক্যানভাস রং তুলি সব গুছিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, বাই দ্য ওয়ে, তোমার বুকে, আরম্-পিটে লোম আছে কি?'

'না।'

'তাহলে শুধু গোঁফ-দাড়িই কামিও।'

ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দা পার হতে শুনলাম তিনি নিজের মনে দুটি শব্দ বারবার আওড়ে চলেছেন, 'তারুণ্যের সংকল্প—তারুণ্যের সংকল্প—'

নিচে নেমে আসতে সীতা বললে, 'তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে নাও অশোকবাবু, জলখাবার তৈরি করে রেখেছি। নিজে খেয়ে দত্যিটার খাবার নে যাও।'

তার কথার উত্তর দেবার সময় পাই না, পেছন থেকে যেন একজোড়া শ্যেনচক্ষু আমায় অনুসরণ করছে। দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়লাম। কর্মসূচিটা একবার মনে মনে আওড়ে নিলাম—সর্বপ্রথম সেলুন, তারপর চায়ের দোকান—চা, টোস্ট, আমলেট আর সন্দেশ। তারপর কিছু অল্পদামী সিগারেট। সব খরচই মীনামাসিমার। তবে বুঝে চলতে হবে, কারণ সংসারে নতুন শিশুর আবির্ভাব হওয়ার পর খরচপত্র কুলিয়ে ওঠা দায় হবে মিহিরবাবুর পক্ষে। দুর্ভাবনায় তিনি এখন থেকেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

॥ নয় ॥

একটা নিচু টুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। খালি গা, মিহিরবাবুর নির্দেশানুযায়ী বুকটা সংগ্রামী বীরের মত দেহের কাঠামো ছাড়িয়ে সুমুখপানে প্রসারিত করে রেখেছি। পরনে ধুতিই আছে। কোমর পর্যন্ত আমার ছবি আঁকা হবে, অতএব কোমরের নিম্নভাগের অবস্থান অথবা আবরণ সম্বন্ধে মিহিরবাবুর বিশেষ কোন আদেশ নেই। তবে পায়ের পাতার চাপে যেন দর্পীর ভাব বজায় থাকে, সে ভাবটা ঊর্ধ্বাঙ্গের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপর আমার প্রয়াসে যেটুকু অক্ষমতা মিহিরবাবু তা তুলির টানে নিবিড় করে দেবেন। এ সম্বন্ধে তিনি আমায় বারবার আশ্বাস দিলেন। অকারণ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে বললেন।

হাতে একটা কাঠকয়লার টুকরো নিয়ে মিহিরবাবু আমার দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে আছেন। বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট পুড়ে ছাই হচ্ছে, টানবার কথা মনে নেই তাঁর। সিগারেটটা মনঃসংযোগহীন অবস্থায় নিঃশেষ হতে আর একটা ধরিয়ে নিলেন তিনি। সেটিও পুড়তে লাগল। তবে তাতে মাঝে-মধ্যে দু'একটি টান দিলেন।

আমি অধৈর্য হয়ে বলে উঠি, 'কই, আঁকুন ছবি, আর যে একভাবে দাঁড়াতে পারছি

না, পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে!'

'হাস্-চুপ', আমায় চুপ করবার নির্দেশ দিলেন তিনি, 'আর একটু বাঁ পাশে ঘুরে যাও, আঃ, ও কি করলে! অতটা নয় গাধা, এ কি কুমোরের চাক, না ইস্কুলের ছেলের হাতের লাট্টু? আবার ডান পাশে ফের; আস্তে আস্তে লাইক অ্যান আওয়ার হ্যান্ড অফ এ ক্লক্—থামতে বললেই থামবে। ইয়েস—দ্যাটস্ রাইট!'

এ ভাবে কাটল বহুক্ষণ। ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটার মত মাঝে মাঝে ঘুরতে হচ্ছে শুধু। থামতে বললেই থামছি—সাইন্স পড়ছি, স্টপ ওয়াচ কাকে বলে তা তো জানি। মিহিরবাবু সাইন্স না পড়েও জানেন, আর আমি জানি না! আমি ঘুরছি, থামছি। ক্যানভাসের গায়ে কাঠকয়লার একটি আঁচড়ও পড়ল না।

মিহিরবাবু বললেন, 'আপাতত অনেকখানি কাজ হয়েছে, এবার তুমি নামতে পার।'

সেই টুলের ওপরই বসে পড়লাম।

মিহিরবাবু যেন অন্য পৃথিবীতে চলে গেছেন, সেখান থেকে বললেন, 'তোমার শরীরে অনেক ডিফরমিটি। বান্ডল অফ মিসটেক্ন টাচেস্ অফ দ্য ক্রিয়েটার। তুমি হলে স্রষ্টার তুলির ভুল টানের একটা আসল নমুনা! এমন কেন হল! তুমি কি পিতামাতার অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান? তোমার মা-বাবার মনের মিল আছে, পরস্পরকে ভালবাসেন তাঁরা?'

এ কথা শুনে আমার মস্তিষ্কে যেন ডিজেল এঞ্জিন চলতে থাকে। সামনে থেকে গুরুভার একটা কিছু তুলে নিয়ে তাঁর মাথায় প্রবল আঘাত বসিয়ে দেবার উগ্র বাসনায় মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠি। কিন্তু এ মনোভাব অতিকষ্টে চাপা দিয়ে বলি, 'আমি জানি না।'

আমার কথা তিনি গ্রাহ্য করেন না, একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়াস করে বসেন, তারপর বলতে থাকেন, 'তুমি জানো বা না জানো, এই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। যে সৃষ্টিতে আন্তরিকতা নেই, ভালবাসার স্পর্শ নেই, সে সৃষ্টি কখনো সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। হতে পারে না। প্রাণহীন শিল্পপদ্ধতি কোন কাজেরই নয়।' অতঃপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলেন, 'মীনার যে সন্তান হবে, ছেলে মেয়ে যাই হোক, দেখতে কুৎসিত হবে। কারণ মীনা আমায় ভালবাসে না, তাছাড়া সে সন্তান চায় না!'

এক রাতের সহাবস্থানে মিহিরবাবুর সঙ্গে কথা বলায় কিঞ্চিৎ জড়তাবিমুক্ত হয়েছি। তাঁর কথার আমি প্রতিবাদ করি, 'মীনামাসিমা আপনাকে খুব ভালবাসেন।'

উত্তর দিতে গিয়ে হাসেন তিনি। বলেন, 'তুমি জানো না। মীনা মনে মনে ভাবে, মস্ত কিছু করছে যেন, একটা অমানুষকে মানুষরূপে, শিল্পীরূপে গড়ে তুলছে। দাম্ভিক মনোবৃত্তি তার আন্তরিকতা কেড়ে নিয়েছে। ভালবাসা বাদ দিয়ে মহৎ সৃষ্টি হয় না। ভয়ঙ্করেরও একটা নিজস্ব পরিচয় আছে। রূপ ও সৌন্দর্যের সেও এক প্রতিকল্প। বিশাল আগ্নেয়গিরি, কিংবা কোন হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণী, বা অন্য কিছু, সবাই নিজের সৌন্দর্যে বিশিষ্ট। যে সৌন্দর্যে সামঞ্জস্য নেই, সেটাই কুৎসিত। নামগোত্রহীন অনাথা প্রকৃতির নিজের হাতে-গড়া জিনিসে কোন বিসদৃশ ভাব নেই। মানুষ যেখানে তার ওপর খপরদারী করতে গেছে, সেখানেই হেরে গেছে। হারেনি শুধু যে শিল্পী, সে। আন্তরিকতার স্পর্শ ছাড়া শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। প্রেম-রহিত যে সৃষ্টি, তা যতই বিজ্ঞ হোক,

বিকৃতরচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পরমায়ু অত্যন্ত ক্ষীণ।'

জানলার বাইরে তাকালেন তিনি। একটা উড়ন্ত কাকের ওপর দৃষ্টিপাত করে আবার আমার দিকে চোখ ফেরালেন। শান্ত নিরীহ ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকালেন যেন। আবার বলতে লাগলেন, 'আমি শিল্পী—ছবি আঁকি, কবিতা রচনা করি, গল্প উপন্যাস লিখি, কিন্তু আজও আমার কিছু সার্থক হয়নি। প্রতি পদে বুঝতে পারি লেখা বা ছবিতে প্রাণ দিতে পারিনি আমি। মানুষ খুঁজতে বেরিয়ে যেন শ্মশান থেকে শবদেহ কুড়িয়ে ফিরে আসি, তাই জ্ঞান ফিরলে সেটাকে ফেলে দি, পুড়িয়ে দি। আমি সফল হইনি তার একমাত্র কারণ, নিজেকে ভুলতে পারিনি। আমার সত্তা আর প্রাণটাকে রচনার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারিনি। তবে আমার বিশ্বাস, সময় একদিন আসবেই আসবে, আর যতদিন তা না আসছে ততদিন আমি নিজের বিষে জর্জরিত হতে থাকব। নিজে জ্বলব, অপরকে জ্বালিয়ে মারব। মীনা তো আমার হাতে পড়ে শেষ হয়ে গেল।'

মিহিরবাবু উঠলেন। মাঝের দরজা দিয়ে স্টুডিয়োয় ঢুকলেন তিনি। গিয়ে দাঁড়ালেন ইজেলে দাঁড় করানো রেখাশূন্য ক্যানভাসের সামনে। তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শূন্য পটখানির দিকে তাকিয়ে। এ ঘরে বসে আমি সকৌতুক কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলাম। আমার দাঁড়াবার টুলটা কখন ছেড়ে এসেছি তা মনে পড়ে না। কখন আমরা পাশের ঘরে চলে এসেছিলাম।

সামনের টুল থেকে একটুকরো কাঠকয়লা তুলে নিয়ে মিহিরবাবু হঠাৎ ক্যানভাসটার সামনে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেন। তারপর ত্বরিত হাতে একটি টানে প্রায় সারা ক্যানভাস জুড়ে কয়লার আঁচড়ে একটা মানুষের মুখের বহীরেখা টানলেন। দূরে সরে গিয়ে কয়েক মিনিট ধরে সেদিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি, তারপর অত্যন্ত দ্রুত পায়ে ক্যানভাসের কাছে আবার এগিয়ে গেলেন। দু-একটা ক্ষুদ্র রেখা টানলেন মুখের বহীরেখার ভেতর। এতক্ষণে কয়লায় আঁকা রেখাগুলি রূপধারণ করল। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম—আমি। আমারই মুখ এঁকেছেন ভদ্রলোক।

'অশোক!'

এ ঘর থেকে জবাব দিই, 'ডাকছেন আমায়?'

'দেখ তো, মুখটা চিনতে পার?'

'পারি।'

'পার? তবে এইটুকু শেষ করি, এর মধ্যেই তারুণ্যের সংকল্প ফুটে উঠবে।' মিহিরবাবু অসহায় সুরে বললেন, 'কি করব, তোমার দেহটা আমি কিছুতেই আঁকতে পারলাম না! অ্যান অ্যাবিউজ অফ ক্রিয়েশান। অশোক, খিদে পেয়েছে তোমার?'

'এখনো পায়নি, আমি তো জলখাবার খেয়েছি।'

'কিন্তু আমার বড় খিদে পেয়েছে, মনে হচ্ছে কত যুগ ধরে যেন অভুক্ত আছি!'

এ কথাগুলো আমার দিকে ফিরে বললেন তিনি, সেই সঙ্গে কাঠকয়লার টুকরোটা ঘরের মেঝেয় কোথায় যেন ছুঁড়ে দিলেন।

আমি আর সামলাতে পারলাম না, বলে ফেললাম, 'খিদে পেয়েছে তো বলছেন, কিন্তু খাবার পেলে খাবেন তো, না পেঁচার ডাক বা আমার গালের লাল তিলের কথা ভাববেন তখন?'

মিহিরবাবু মাঝের দরজা দিয়ে এ ঘরে ফিরে এলেন, সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে

বললেন, 'কদিন বোধহয় স্নান করি নি, আজ সে কাজটা সেরে ভাত খেয়ে একটু ঘুমোব। বিকেল থেকে ছবিটাতে আবার হাত দিতে হবে।'

'তাহলে নেয়ে নিন।'

'হ্যাঁ যাই। তুমিও নিচের তলায় বাথরুমে চলে যাও। সীতাকে বলবে, দুজনের খাবার জায়গা করে রাখতে। আমরা আজ রান্নাঘরের বারান্দায় বসে খাব, কি বল?'

'বেশ তো।'

'তাহলে স্নান করতে যাই?' তিনি যেন অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

'আচ্ছা।'

মিহিরবাবু ঘর থেকে বেরুলেন। বারান্দার এক পাশে স্নানঘর। স্নানঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন তিনি। আমি নিচে চলে এলাম।

রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'একটা সুখবর আছে সীতা!'

সীতা ভাতের ফেন গালতে গালতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'তোমার দত্যি এখুনি নিচে আসছেন।'

একটা ঝাঁকানি দিয়ে সীতা ভাতের হাঁড়িটা সোজা করে বসিয়ে দিলে। হাতদুটি খালি করে শূন্যে হাত নাড়া দিয়ে ঝঙ্কৃত সুরে বললে, 'কেন শুনি, কি দুখে?'

'তুমি পরিবেশন করে খাওয়াবে তাই।'

'ঢের হয়েছে,' সীতা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আদ্দেক দিন এস্তিরীর হাত থেকে ভাতের থালা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আর আজ আমার হাতে খেতে আসচে! কি ভাগ্যি রে আমার। পারবনি আমি—'

সীতার কথা সমাপ্ত হবার আগেই আমি গিয়ে স্নানঘরে ঢুকলাম। চৌবাচ্চার জলের সঙ্গে খেলা করে খানিকটা সময় কাটিয়ে দিলাম। দাঁড়িয়েও থাকলাম চুপ করে। মিহিরবাবু লোকটা ভয়ের নয়, অস্বস্তির। মাঝে মাঝে কৌতুকেরও।

প্রায় আধ ঘণ্টা স্নানঘরের নির্জনতায় কাটিয়ে বেরিয়ে এসে দেখলাম সীতা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।

আমি বেরিয়ে আসতেই সে বলল, 'এত দেরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি! কখন থেকে জায়গা করে বসে আছি, ডাকো দত্যিকে, এসে আমায় পিত্‌রী-দায় থেকে উদ্ধার করুক!'

'ওঁর খাবার আমি না হয় ওপরেই দিয়ে আসছি, তুমি যা রাগারাগি করছ!'

'থাক্ থাক্! দিদিমণি ফিরলে দশখান্ করে লাগাবে তো?'

সীতা স্বগত-বিরক্তির গজল গাইতে গাইতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। হাতা-খুন্তির শব্দে বুঝলাম তার ক্রোধের ফানুস অনেকখানি ফুলে উঠেছে।

ওপরে উঠে ডাক দিতেই মিহিরবাবু বললেন, 'আবার নিচে নামতে হবে! উনত্রিশটা সিঁড়ি—না উনিশটা? তার চে তুমি নিজের খাওয়া সেরে আমারটা নিয়ে এস। সীতা তো এখানে আসবে না, মদের খালি বোতল দেখলে সে আবার সেই দৃশ্যদর্শনে নরকে ভেসে যায়; এদিকে ভর্তি বোতল কিনে আনায় তার কোন আপত্তি নেই। মানুষে ঘেন্না নয়, তার শুকনো হাড়ে ঘেন্না!'

কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা নিয়ে উত্তর দিই, 'না হয় উনিশটা সিঁড়ি ভাঙলেন, কিন্তু একতলায় গিয়ে ভাত খেলে সকলেরই সুবিধে হত।'

কি জানি কেন, এবার আর তিনি আপত্তি করলেন না, আমার সঙ্গে নিচে নেমে

এলেন। অনুসরণ করে এলেন আমায়, যেন আমার বাড়িতে তিনিই অতিথি!

খেতে বসে মিহিরবাবু পরিপাটি আহার করলেন। সীতা বহুদিনকার সঞ্চিত অলক্ষ্য অভিমান নিয়ে তাঁর পাতে উপরি উপরি খাবার চাপিয়ে গেল, কোন নিষেধ বা আপত্তি মানলে না। মিহিরবাবুও বিশেষ বাধা দিলেন না, কেবল স্মিতমুখে সীতার দিকে তাকালেন বারকয়েক। তাঁর চোখের কোণে দুষ্টু শিশুর হাসির আভা ছড়িয়ে আছে। সীতার গাম্ভীর্য যেন তাঁর কৌতুক উদ্রেক করেছে।

মিহিরবাবু আমাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমাদের সীতা যেন রামায়ণের সীতা, কেমন সুন্দর রান্না করে বল তো!'

আমি স্বচ্ছন্দ সুরে প্রতিবাদ করি, 'রাঁধতে তো জানতেন দ্রৌপদী। রামায়ণে কি সীতার রন্ধন-পটুতার কথা লেখা আছে!'

'বনবাসে গিয়ে রাঁধতেন,' মিহিরবাবু যেন নিজের মূল্যবান গবেষণার ফলটুকু আমাদের দান করলেন, 'নয়তো রাম-লক্ষ্মণ কি ঘাস খেয়ে থাকতেন! ফল চিরকালই মাগ্গি।'

কথার শেষে হাই তুললেন তিনি, 'আজ এমন ঘুম পাচ্ছে যে ইচ্ছে হয় একটা কফিনের ভেতর ঢুকে কোন নিভৃত গির্জার প্রাঙ্গণে পড়ে থাকি! তুমি দুপুরে ঘুমোও নাকি?'

'না।'

'বই-টই পড়ার অব্যেস আছে?'

'পেলে পড়ি।'

'আমার ঘরে খুঁজলে পাবে, নিজের রুচিমত একটা দেখে নিও।'

মিহিরবাবু উঠলেন। আমার আহারপর্ব তাঁর আগেই শেষ হয়েছিল। হাত ধুয়ে দু'জনে সিঁড়ির পথ ধরলাম।

সীতা ডাকল একবার, 'অশোকবাবু, একটু নিচে এস তো!'

আমি মাঝপথ থেকে নেমে এলাম, মিহিরবাবু ওপরে চলে গেলেন।

সীতা মিহিরবাবুর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার চোখের দৃষ্টি ব্যাখ্যা করার সাধ্য আমার নেই। সামান্য শব্দে বলা যায়, অপূর্ব-অদ্ভুত। স্নেহস্নিগ্ধ। আনন্দোজ্জ্বল!

সীতা বললে, 'রাত্তিরে মাংস রাঁধব, দত্যিকে খাবার সময় নিচে নিয়ে এস।'

'এতক্ষণ তো এখানেই ছিলেন, তুমি বলতে পারলে না?'

'ওরে বাবা, আমি বলতে গেলে হয়তো তেড়ে মারতে আসত! দত্যিটাকে তুমি কতটুকুন জানো?'

সত্যিসত্যিই সীতা কথাগুলো ভীত কণ্ঠে বললে। এই সময় বিভিন্ন ভাবের ধারা সমন্বয়ে তার পঞ্চাশোত্তীর্ণ মুখের চামড়ায় এক অপরূপ রঙের চিত্রাঙ্কিত হল। মিহিরবাবুর চোখে পড়লে এর একটা নামকরণ করতেন তিনি। হয়তো বা তাকে টুলের ওপর দাঁড় করিয়ে ছবি আঁকতে চাইতেন, তারপর প্রশ্ন করতেন, 'তোমার বাবা মা কি পরস্পরকে ভালবাসতেন সীতা? তা যদি হয় তাহলে তোমার নাক এত চাপা আর কপাল উঁচু কেন?'

সীতা এর কি জবাব দিত!

॥ দশ ॥

দুপুরের দিকে মিহিরবাবুর সঞ্চয়ের স্তূপ উজাড় করে একখানা মনোমত বই খুঁজে বের করলাম। বিদ্যাপতি পদাবলী। সেদিন বিদ্যাপতি কাব্যে আমার অগভীর জ্ঞান সম্বন্ধে মিহিরবাবু তামাশা করেছিলেন, তাই আজ বিদ্যাপতিকেই বেছে নিলাম। ফুটনোট থেকে অর্থানুসন্ধান করে খানকয়েক কবিতা পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না। মিহিরবাবু পাশের ঘরে শুয়েছিলেন। তাঁর নাসিকাধ্বনি এ ঘরে ভেসে আসছিল, বোধহয় সেই শব্দের নেশায় আমার নিদ্রাকর্ষণ। ঘুম ভাঙতে দেখলাম বাইরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। প্রকৃত ঝড়ের পূর্বাভাস দিচ্ছে, কোথাও একতিল বাতাসের স্পর্শ নেই।

বিছানা ছেড়ে পাশের ঘরে উঠে এলাম। মিহিরবাবু সেখানে নেই। মাঝের খোলা দরজার পথে তাঁর স্টুডিয়োয় নজর পড়ল। ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মুখের ছবিটায় তিনি তেলরং ছিটিয়ে চলেছেন। নিমেষের জন্যও তাঁর দৃষ্টি অন্যত্র পড়ছে না। এমন কি রঙের প্যালেটখানির দিকেও তাকাচ্ছেন না, হাতের আন্দাজে বিভিন্ন তুলির আগায় ভিন্ন ভিন্ন রং তুলে নিচ্ছেন।

আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই মিহিরবাবু চমকে উঠলেন। চমকিত স্বরে বললেন 'কে! ও অশোক। ঘুম ভাঙল?'

'ছবি আঁকছেন? ঐ টুলে আমায় আবার দাঁড়াতে হবে নাকি!'

'আজ হবে না, যদি প্রয়োজন হয়, অন্যদিন—'

'আকাশে ভীষণ মেঘ, অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছেন?'

মিহিরবাবু আবার যেন চমকে উঠলেন, 'কোথায় অন্ধকার!' তারপর পাশের খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন, 'তাই তো, ঝড় উঠবে এখুনি! হয়তো—'

কথাটা অর্ধপথে ছেড়ে দিয়ে তিনি জানলার বাইরে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন। ঝড়ের মুখে-পড়া পথ-হারানো পাখির মত অদ্ভুত দৃষ্টি তাঁর চোখে। ভীতিবিহ্বল অথচ তার মাঝেই বিপুল বিস্ময় আর আনন্দের সমাবেশ।

ঝড় উঠল। সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি। কপাট-ভাঙা জানলা দিয়ে জলের ছাঁট ঘরে ঢুকছে। জিনিসপত্র নিয়ে মিহিরবাবু বিব্রত হয়ে পড়লেন। ইজেলটা ঘরের অন্য পাশে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, স্থান পেলেন না। অসহায় ভাবে চতুর্দিকে তাকাতে লাগলেন।

তারপর আমায় বললেন, 'শোনো অশোক, ঐ ছবিখানা আনো তো।'

ঘরের একটা কোণের দিকে হাত দেখালেন তিনি। দেখলাম একখানা সম্পূর্ণ ছবি। ফ্রেমে বাঁধানো। মীনামাসিমার পূর্ণাকৃতি অয়েল-পেন্টিং! বেশবাসের সম্পূর্ণ আবরণহীন।

মিহিরবাবু বললেন, 'ছবিখানা তাড়াতাড়ি এনে জানলার খাঁজে বসিয়ে দাও, জল আটকাবে।'

আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'কিন্তু ছবি যে নষ্ট হয়ে যাবে!'

'তা হোক,' তিনি অধৈর্য স্বরে উত্তর দিলেন, 'ওটা আঁকা শেষ হয়ে গেছে, এখন নষ্ট হলে ক্ষতি নেই।'

'কিন্তু—'

'যা বলছি, তাই কর না। আমি নড়তে পারছি না, ইজেল আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছি, দেখতে পাচ্ছ না? কুইক্—'

প্রচণ্ড ধমকে তিনি আমার আপত্তির নিষ্পত্তি করে দিলেন। ছবিখানা তুলে এনে জানলার খাঁজে বসিয়ে দিলাম। জল আটকাতে লাগল। ভিজতে লাগল। নষ্ট হতে লাগল।

ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যেতে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে মিহিরবাবু ধীরেসুস্থে মডেল দাঁড়াবার টুলে বসে একটি সিগারেট ধরিয়ে নিলেন।

এতক্ষণে সুস্থ এবং স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি একটি শিশু! নিজের সৃষ্টিতে এত মায়া থাকলে সৃষ্টি কখনো সম্পূর্ণ হয়? অতি-মমতার দোষে সব নষ্ট হয়ে যায়। মীনার যে ছবিখানা জলে ভিজছে অমন ছবি আমি আরো আঁকতে পারি, কিন্তু আমায় ভাল, ভালর চেয়ে ভাল, এঁকে যেতে হবে। ওটাই আমার আঁকা শেষ ছবি নয়। শিল্পী যেখানে থামবে, যেখান থেকে সে নিজের দিকে বিমুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে ফিরে তাকাবে, সে জায়গাটা তার সমাধিস্থান। প্রাচীন স্মৃতিমন্থন শিল্পীর কাছে মৃত্যুর সমান। আমি কোথাও থামতে চাই না। পিছু ফিরে তাকাতে চাই না। নিজেকে সম্পূর্ণ সফল মনে করতে চাই না। খানিকটা ঈশ্বরদত্ত শক্তি নিয়ে এসেছি, তার অকাল-বিনাশ আমি চাই না। কে-ই বা তা চায়? অকাল-বিনাশ সন্ন্যাসীও চায় না। তার প্রথম সাধনা জীবনকে যতদূর সম্ভব দীর্ঘায়িত করা, তারপর ঈশ্বর—সর্বশেষ মোক্ষ'।

বিশেষ আগ্রহ নিয়ে না শুনলেও মিহিরবাবুর বলার ভঙ্গিতে তাঁর কথাগুলো আমার স্মৃতিতে ফোটোপ্লেটের মত স্থায়ী ছাপ রেখে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে কথাগুলো ভুলব না। সশ্রদ্ধ মনোভাব নিয়ে তাঁর সুমুখে কখনো এসে দাঁড়াই নি, কোনদিন আকণ্ঠ আগ্রহে তাঁর কথা শোনবার চেষ্টা করি নি।

মিহিরবাবুকে আমার যতটুকু ভাল লাগে তা ততখানি মন্দ লাগারই সামিল, অর্থাৎ তাঁকে বিচিত্র জীব ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় নি। তাঁর কাজে চরিত্রে কথায় এবং আচার-আচরণে আমি যেন সর্বদা কোন ভৌতিক কীর্তিকলাপের চিহ্ন দেখতে পাই। তাই বোধহয় সীতা তাঁকে এড়িয়ে চলে। মীনামাসিমা এবং আপাতত আমি ভিন্ন আর কেউ কোনদিন তাঁর কাছে আসে না। পৃথিবীর জনারণ্যে তাঁর অস্তিত্বের কোন মূল্য নেই। হয়তো আশপাশের বাড়িগুলির জানলার খড়খড়ি তুলে সভয় কৌতূহল নিয়ে কেউ-কেউ তাঁকে লক্ষ্য করে, কিন্তু সে দূরস্থিত কৌতূহল এড়িয়ে চলারই নামান্তর।

মিহিরবাবু হঠাৎ বললেন, 'বৃষ্টি এখুনি থেমে যাবে বলে মনে হচ্ছে, সন্ধ্যের দিকে তোমার বিশেষ কোন কাজ নেই তো?'

'না, আমার আর কি কাজ!' একান্ত আল্‌গা ভাবে জবাব দিলাম, 'মীনামাসিমা যতদিন না হাসপাতাল থেকে ফিরছে, ততদিন আপনার কাছে কাছে থাকাই আমার একমাত্র কাজ।'

'আমার ওপর বেশ রেগে আছ দেখছি!' মিহিরবাবু জানা কথাটাই যেন আবার জানবার চেষ্টা করেন। অবশ্য চেষ্টা করেন যেন নিজের কথার সূত্রটা বজায় রাখবার জন্যই, এ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব কোন আগ্রহ নেই।

'না না, তা নয়।'

'তোমার এতে লজ্জার কি আছে? জোর করে কি কাউকে ভালবাসানো যায়! অবশ্য কামরূপ কামাখ্যায় বশীকরণ কবচ ভালবাসা কবচ ইত্যাদি ছড়াছড়ি যাচ্ছে বলে শুনেছি, সেখান থেকে একটা কিনে এনে তোমাকেও বশ করতে পারি। যাক, ও কথা যেতে দাও। এই যে মীনা দিনরাত আমার জন্যে ভাবছে, আমার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে, অথচ তাকে আমার মোটেই ভাল লাগে না। মীনা কি সেজন্যে কোন অনুযোগ করে?'

একটু থামলেন মিহিরবাবু। নীরবে সিগারেট টানলেন কিছুক্ষণ, তারপর আবার শুরু করলেন, 'তোমরা হয়তো বলবে, আমি অকৃতজ্ঞ। প্রতিদান দিলাম না। স্বীকৃতি দিলাম না। কিন্তু কি কবি, ওকে আমি ভালবাসাতে পারি নি। অথচ সাধারণভাবে আমি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি জীবজন্তু গাছপালা পাহাড় পর্বত নদীনালাকে ভালবাসি। এ বোধহয় আমার এক ধরনের দোষ। যেখান থেকে পাই, যার কাছ থেকে পাই, তার সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহ থাকে না। যেখানে ব্যর্থ হচ্ছি, সেখানেই মনপ্রাণ নিয়ে ছুটে চলেছি। আমার এ ছুটে চলা বাইরে থেকে চোখে পড়ে না। এ আমার মানসিক আক্ষেপ। আমি শুধু ব্যর্থতার পথেই পদক্ষেপ করি। সুদূর দুর্গমের আকর্ষণ—এই আমার ভালবাসা। তাই আমি শিল্পী, কারণ শিল্পীর জীবনে পরিতৃপ্তি নেই, অনুসন্ধিৎসার শেষ নেই।'

মিহিরবাবু বোধহয় আমাকে আরো গভীর ভাবের সমুদ্রে টেনে নিয়ে যেতেন, কিন্তু শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত বোধ করি। তাই তাঁর সকল প্রকার দার্শনিক প্রসঙ্গের মুখে পাথর চাপা দেওয়ার জন্য বলি, 'বৃষ্টি থামার কথা বলছিলেন কেন, কিছু কিনে আনতে হবে?'

'না। মীনাকে একবার দেখে এস। তার কেবিনটা কেমন?'

'বেশ ভাল। পরিষ্কার। আলো বাতাস খুব আসে।'

'আমারও মাঝে মাঝে কোন হাসপাতালের কেবিনে, বা পাহাড়-ঘেঁষা স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। এমন এক রোগ, যেমন টি. বি.—টি. বি. নিয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানে, পৃথিবীর রূপ রস গন্ধের আস্বাদ নিতে নিতে মৃত্যুর পদক্ষেপ শুনতে ইচ্ছে হয়। আমার কথা সকলে ভাবছে, সকলে ব্যস্ত; আমার জীবন পৃথিবীর জীবনমূলে বেঁধে রাখার জন্যে তারা উদগ্রীব, আর আমি চরম অকৃতজ্ঞের মত, পরম অনাসক্তের মত তাদের পাশ থেকে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছি—এ ভাবতে বেশ লাগে!'

আমি হেসে ফেললাম, 'এই যে আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন, আমি অকালমৃত্যু চাই না, অকালমৃত্যু সন্ন্যাসীও চায় না?'

মিহিরবাবু আমার কথা শুনে তখুনি পরাজয় স্বীকার করে নিলেন, 'হ্যাঁ, তা বলেছিলাম বটে, তাহলে এটাই বা বললাম কেন? তবে কি দুই-ই সত্যি, না দুটোই মিথ্যে! কিন্তু যখন বলেছি, তখন দুটোই আমার মনের সত্যি। যাক, আমার কথা বাদ দাও। মীনাকে একবার দেখে আসবে?'

'যদি বলেন তাহলে যাব। তাকে কি কিছু বলতে হবে?'

'না, বলবে আর কি? ছেলে-টেলে হল কি না, দেখে এস।'

বিজ্ঞের মত বলি, 'তার এখন দেরি আছে'।

'তোমায় কে বললে!' মিহিরবাবু অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন।

'মীনামাসিমা—'

'ওঃ, তাই বল।' হাসলেন তিনি।

॥ এগারো ॥

মীনামাসিমা হাসপাতাল থেকে ছুটি পেল। একটি মেয়ে নিয়ে ফিরল। শারীরিক কষ্ট বিশেষ পায় নি। স্বাভাবিক যন্ত্রণার মাত্রা সামান্য ছাড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাতে জীবন-সংশয়ের মত কিছু হয় নি।

মীনামাসিমাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম। রিক্সায় উঠলাম দুজনে কোলে মেয়ে নিয়ে মীনামাসিমা। তার মুখে একটা থম্‌থমে্‌ ভাব। রুগ্ন পাণ্ডুর মুখে যে বিষণ্ণ ভাবের ছায়া গভীর রেখায় আবদ্ধ হয়ে আছে। পাশে বসে আমি অস্বস্তি বোধ করি কথা বলার চেষ্টা করি, কিন্তু কি নিয়ে শুরু করব, তা ভেবে পাই না।

কোলের মেয়েটার দিকে পরম অবজ্ঞায় তাকিয়ে মীনামাসিমা আমায় বললে, 'অশোক এটাকে বাড়ি নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

মীনামাসিমার মুখের ভাব অন্যমনস্ক। তার কথাটা আমি হয়তো ঠাট্টা বলেই মনে করতাম, কিন্তু গম্ভীর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানিয়ে যাওয়া বিষাদগ্রস্ত মুখাকৃতি দেখে তা মনে হল না। কৌতুক বলে মনে হল না বলেই গভীর বিস্ময় অনুভব করলাম। মা তো আমাদের প্রতিদিনই যমের বাড়ি যেতে বলে এবং তা ঠাট্টা করে বলে না; বাড়ি থেকে দূর হয়ে যাবার নির্দেশও পাই অবিরত, কিন্তু সে সব কথাগুলি সহজ জীবনযাত্রার স্বাভাবিক প্রকাশ বলেই মনে হয়। অথচ এই মুহূর্তে আমি মীনামসিমার কথায় সবিস্ময় হয়ে উঠি।

'এ কথা কেন বলছ!' তার কথা যেন আমাকেই আহত করেছে, এমনি এক বেদনাহত সুর আমার গলায়।

'সত্যি বলছি রে!' ডান হাতে রিক্সার হুডের পাশটা ধরে খোয়া-ওঠা রাস্তার ঝাঁকুনি বাঁচিয়ে মীনামাসিমা বলে, 'সত্যি বলছি, এটা মরা অবস্থায় জন্মালে আমি বাঁচতাম। একে নিয়ে আমার অশেষ জ্বালা; পেটে আসতে না আসতে আমায় আধমরা করেছে, বেঁচে থাকলে আমার সব আশাআকাঙ্ক্ষা মেরে ফেলবে।'

উগ্র স্বার্থপরতার আঁচে তার মুখখানা যেন উনুনের মত জ্বলজ্বল করে। সে তাপ থেকে বাঁচবার জন্যই আমি রিক্সার সঙ্কীর্ণ আসনে সরে বসবার চেষ্টা করি।

'আমার কথা শুনে তুই শিউরে উঠলি?' সরে গিয়ে যে নৈতিক ব্যবধানটুকু সৃষ্টি করেছিলাম মীনামাসিমা সেটাকে যেন ইচ্ছে করে ঘুচিয়ে দিল। আরো ছড়িয়ে বসে আমার কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে সামান্য ধাক্কা দিয়ে সে বলে যায়, 'মনের কথা বাইরে প্রকাশ করা কি মুশকিল বল তো! তুই শুধু এই মেয়েটাকেই দেখছিস,' কোলের ছোট্ট জীবন-কুঁড়িটাকে উদ্দেশ্য করে সে বলে, 'কিন্তু এর বেঁচে থাকা আর না থাকায় পৃথিবীর কোন পরিবর্তন হবে না, বরং থাকলে আমায় জ্বালাবে। আমার যে উদ্দেশ্যে বাঁচা সেটাই হয়তো এর জন্যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

মীনামাসিমা থামল। আবার একটা দীর্ঘতর শ্বাস টেনে নিয়ে বলতে আরম্ভ করল 'কিন্তু আমি তা কোনমতেই চাই না। সারাজীবন ধরে নিজেকে তিল তিল করে ক্ষয় করে চলেছি, কিসের জন্যে তা বিফল হয়ে যেতে দেব, কেন দেব?'

নিজের মনেই বলে চলে মীনামাসিমা। সন্তানের মৃত্যুকামনার জবাবদিহি করে নিজের কাছে। আমার দেহটাকে সে নিজের দেহের স্পর্শে আটকে রাখলেও তার বক্তব্য আমার উদ্দেশ্যে নয়। আমি নীরব শ্রোতার মত তার কথাগুলো কানে নিচ্ছি। কোনরূপ উত্তর দেওয়ার দায়-দায়িত্ব আমার নেই, তাই মন দিয়ে শোনার প্রয়োজনও আমার নেই।

সূর্য-ছোঁয়া আকাশ থেকে খানিকটা প্রত্যাশার আলো মুখে মেখে নিয়ে মীনামাসিমা বলে, 'আমার মনে হয়, যত বাধাবিপত্তিই আসুক, শেষটুকু আমি অবশ্যই দেখে যেতে পাব। তোর কি মনে হয়, পাব না?'

'কিসের শেষ?' আমার জানবার আগ্রহ অণুমাত্র নেই, তবু সৌজন্যমূলক নিয়মরক্ষা করি।

'তাঁর কথা বলছি, ওঁর সাধনা নিশ্চয়ই সফল হবে? কবি কাহিনীকার চিত্রকর রূপে উনি নিশ্চয়ই নাম করবেন?'

মীনামাসিমার কথা বিশ্বাস করতে পারি না। মিহিরবাবুর শিল্পরচনার শক্তি হয়তো কিছু আছে. কিন্তু সঞ্চয়ের আগ্রহ নেই। কোন কবিতা সম্পূর্ণ করেন না, উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দু-চার পরিচ্ছেদের বেশি রচিত হয় না। কোন ছবিতেই তুলির শেষ আঁচড় টানেন না। এবং এই অসমাপ্ত সাধনা এত বিক্ষিপ্ত এত খেয়ালখুশি সংবলিত, এত অবহেলিত যে তাঁর সম্বন্ধে কোনরূপ প্রত্যাশা নিয়ে বসে থাকা সম্পূর্ণ বাতুলতা।

আমি সেই কথা বলি। কণ্ঠস্বরের বিরক্তি গোপন না করেই বলি, 'মিহিরবাবু শিল্পী নন, উন্মাদ। তাঁর মনে স্থিরতা বলে কিছু নেই। সব বিক্ষিপ্ত। সবই অস্থির। অস্থির তিনি নিজেও—এ অবস্থায় কোনদিন সাফল্য লাভ করবেন, এমন বিশ্বাস আমার নেই।'

মীনামাসিমা চুপ করে থাকবার চেষ্টা করে। নিরুত্তর অবজ্ঞায় আমায় পরাজিত করতে চায়, কিন্তু প্রতিবাদের তরঙ্গতাড়িত মানসিকতা তাকে নীরব থাকতে দেয় না। একটি দুটি কাটা কাটা কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত যে প্রতিবাদটুকু ব্যক্ত করে ফেলে।

প্রতিটি শব্দ পরীক্ষিত বিশ্বাসের জারক রসে সিক্ত করে বলে, 'তুই তাঁর কতটুকু জানিস! দুনিয়ার কে কতটুকু জানে! আগে আহরণ শেষ হবে, তবে তো সঞ্চয়! তার মধ্যে ভাল-মন্দ বেছে নিতে হবে। কেবল আর্বজনা আঁকড়ে থেকে কি ধনী হওয়া যায়? উনি তোদের যতটুকু দিয়ে যাবেন, তার সবটাই খাঁটি। নির্মল। রসোত্তীর্ণ। —তাই—'

কথার মাঝে বাধা দিয়ে এ অনর্থক তর্কদৃশ্যে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিই, 'বেশ তো, সেই অনাগত দিনের আশায় বসে থাকব। আজ এ আলোচনা অর্থহীন, অবান্তর।'

মীনামাসিমা আর মুখ খুলল না। একবার অপ্রসন্ন ও ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।

॥ বারো ॥

আজ এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম। আমাদের অপেক্ষায় মিহিরবাবু সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে মীনামাসিমার মেঘাবৃত মুখ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মনের সুখপ্রবাহ দমন করতে পারল না।

'তুমি এখানে!' মিহিরবাবুকে দেখে মীনামাসিমা সানন্দ বিস্ময়ে রিক্সা থেকে নেমে এল।

মিহিরবাবুও হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, 'তোমার জন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি। কোলে কি, ছেলে?'

'মেয়ে।' মীনামাসিমার জবাবটা যেন বিতৃষ্ণ সুরের কথার মত আমার কানে শোনাল।

'অশোক তো আমায় পুরো খবর দেয় নি; যাক, দাও আমায়—'

মিহিরবাবু দু'হাত বাড়িয়ে তাঁর কন্যাকে কোলে নিলেন। মুখ দেখে বললেন, 'বাঃ বেশ দেখতে হয়েছে তো, আমারই মত পেঁচামুখী. কিন্তু নাকটা তোমার মত। এ কি, হাসছে নাকি? এক মাসেই হাসতে পারে? কি নাম? হাসি? না, এ নামটা চিবিয়ে খাওয়া আখের

ছিবড়ের মত, বড় একঘেয়ে। তার চে' বর্ণালী নামটা ভাল। এর হাসিতে তোমার আমার নীরস জীবনে বর্ণের সমারোহ হোক। অন্ধকারের কালো আঁচড়গুলো ঘুচে যাক।'

দরজার সুমুখে দাঁড়িয়ে কন্যাকে বুকে নিয়ে তিনি বকে চলেছেন, আমাদের প্রবেশপথ বন্ধ। মীনামাসিমা দরজার বাইরে লজ্জানত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলে না। আমি মিহিরবাবুর দিকে তাকালাম। নতুন দৃষ্টিতে তাকালাম। তিনিও আমার প্রসন্ন বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য করলেন। হাসলেন।

আমায় উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমার ধারণা আমি একান্ত উদ্ভট? আমায় খেতে দেখলে অবাক হও, ঘুমোতে দেখলে তোমার হার্ট ফেল হয়, হাসতে দেখলে বিস্ময়ে মাথা ঘোরে, সাধারণ স্বাভাবিক মানুষের মত কথা বলতে দেখলে, তা ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ ঠাওরে বস। সীতাও তোমার মত। আমি সব বুঝি, কিন্তু কিছু বলি না। মানুষের ভুল ধারণার অবজেক্ট হয়ে থাকতে আমার বেশ মজা লাগে।...তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

মেয়েকে বুকে আঁকড়ে ধরে মিহিরবাবুই সর্বপ্রথম ভেতরে গেলেন। সীতা সম্মোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, কোন কথা বলতে পারে নি। এমনকি একটা সাধারণ অভ্যর্থনাসূচক শব্দে মীনামাসিমাকে সম্বোধনও করতে পারে নি।

মিহিরবাবু সিঁড়ির পথে অদৃশ্য হয়ে যেতে সীতার রুদ্ধ আবেগ যেন ফেটে পড়ল। অবরুদ্ধ বাক্যস্রোত একসঙ্গে বেরিয়ে এল—লক্ষ্য সকলেই। মিহিরবাবু মীনামাসিমা এমনকি সাতাশ দিনের শিশুটাও বাদ গেল না।

সীতা বোধহয় উনুনে বাতাস দিচ্ছিল, আমাদের আগমন শব্দে রান্নাঘরের ঝুলকালিমাখা পাখাটা হাতে নিয়েই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কিংকর্তব্যের প্রতীকচিহ্ন স্বরূপ পাখাখানা সে তখনো হাতে ধরে রেখেছিল, নামিয়ে রাখে নি। মিহিরবাবু ওপরে উঠে গেলে পাখাটা ঠকাস্ করে বারান্দায় ফেলে দিয়ে সীতা ভাষণ শুরু করল।

'কি বলব আমি, যেমন সবার আক্কেল, তেমন বুদ্ধি! কি বলে তোমরা ঐ দত্যিটাকে এক ফোঁটা রক্তের ডেলা নিয়ে একলা ওপরে যেতে দিলে? তুমিই বা কি দিদিমণি, কেমনতর মা? আমি এখনো মেয়ের মুখ দেখলুম নি,' আঁচলের খুঁট খুলে সে একটা রুপোর টাকা বের করলে, 'আর তোমরা কিনা ওকে বাঘের গুহোয় পাঠিয়ে দিলে? যাও অশোকবাবু, শীগ্গির ওপরে গিয়ে দত্যির পাশে কাছে থাক।'

সীতা কিঞ্চিৎ বিরতি দেয়, আবার ভিন্ন সুরে কথা আরম্ভ করে, 'আজ আমার মাথার ওপর দিয়ে কি যে বিপদ গেছে তা ভগমানই জানে! তুমি দিদিমণিকে আনতে যাবার পর দত্যিঠাকুর দুমদুমিয়ে নিচুতে এসে বলে, 'সীতা চা করে দাও!' তা ওপর থেকে হাঁক্কাই-হোক্কাই করলেই তো হত, আমি চা নিয়ে সিঁড়িতে রেখে আসতুম। তা নয়, একেবারে সোজাসুজি রান্নাঘরে ঢুকে ঘাড়ের কাছটিতে দাঁড়িয়ে বলে, 'চা দাও সীতা।' তাড়াতাড়ি ঘুঁটে ধরিয়ে করে দিলুম এক কাপ। সেটা এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে বলে, 'তোমার চায়ের হাত তো বেশ 'সোন্দর', আরো দু-তিন কাপ দাও তো।' আবার এক কেটলি চা তৈরি করে তার সুমুখে বসিয়ে দিলুম। কাপে ঢালে আর খায়, আর আমি দুগ্গা নাম করি।'

সীতা তার কয়েক ঘণ্টা একলা থাকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছে, আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলছি, সেদিকে নজর পড়তে সে বলে, 'থাক্ অশোকবাবু, ও আমার কাজ। তুমি ওপরে যাও। তা কি যেন বলছিলুম, ভাল কথা মনে—! হ্যাঁ, তারপর আবার আধ ঘণ্টা

আগে ফের নেবে এসে বলে, 'সীতা ওরা তো এখনো এল নি, দেরি হচ্ছে কেন? অশোক ছেলেমানুষ, হাসপাতাল যেতে গিয়ে বল-টল খেলতে চলে যায় নি তো!' বার-বার সদর দরজা খোলে আর বন্দ করে, আমি ভয়ে সিঁটকে থাকি। ভাবি, এই বুঝি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়! তাকে কি বিশ্বেস আছে, কোথায় গাড়িচাপা পড়বে, আর না তো কোথায় গিয়ে কার ঘাড় মটকে বসে থাকবে। সে কথা তো তুমি জানো না অশোকবাবু! বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে দোকানে খাবার খেয়েছে, পয়সা দিতে পারে নি। দোকানী পাহারাওলা ডেকে ধরিয়ে দিলে, বাড়ির ঠিকানা বলতে পারে নি। আমি খুঁজে খুঁজে ছ'দিন পরে ছাড়িয়ে আনলুম।'

এ গল্প মীনামাসিমা আমায় বলেছিল।

জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি কি বাড়ির ঠিকানাও মনে রাখতে পার না। উত্তর দিলেন, কেন পারব না, আমার ইচ্ছে হয়েছিল, জেলখানার ভেতরটা একবার দেখে আসি, তাই একটা ছুতো। ফাঁসিকাঠ দেখারও আমার সাধ আছে, তবে তার ওপর চড়ার বাসনা নেই।'

এরপর থেকে মীনামাসিমা কোনদিন মিহিরবাবুকে একলা পথে বেরুবার সুযোগ দেয়নি। প্রয়োজনে তাঁকে বাড়িতে রেখে দরজায় তালা বন্ধ করে নিজে বাইরে গেছে।

আমার তরুণ বুদ্ধিতে হঠাৎ উদিত হল, মিহিরবাবু আর মীনামাসিমাকে খানিকটা একান্তের সুযোগ দেওয়া দরকার। সীতাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'তুমি খুব বকবক করতে পার। আমাদের খাবার-চা করে দেবে তো, না দত্যিকে এক কেটলি চা খাইয়েছ বলে, আমাদেরটা বাদ যাবে? তাহলে আমিই চা করে নিচ্ছি?'

'দেব না কেন, এইতো আমার হাত খালি।'

সীতার কথায় কান না দিয়ে আমি গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লাম। সীতাও তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হল। মীনামাসিমা কিছুক্ষণ চুপ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে ওপরে চলে গেল। সিঁড়িতে তার মৃদুমন্থর পদশব্দ ধ্বনিত হল, আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম। সীতাও শুনলে। শুনে সে একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেললে, অস্বস্তির বা আশ্বস্তের তা বুঝতে পারলাম না। আমি কিন্তু মনের ভেতরে গভীর প্রশান্তি অনুভব করলাম।

॥ তেরো ॥

কন্যাটিকে দেখছেন মিহিরবাবু। মানসচক্ষে অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে তন্নতন্ন করে দেখছেন। দেখছেন তার দেহের সমস্ত অনুপরমাণু। হাত পা ছুঁড়ে খেলা করছে দু' মাসের শিশুটি। মাস দুয়েকের ওপরই বয়স, তিন মাসের কাছাকাছি।

মিহিরবাবু তার ঠোঁটের গড়ন বিশেষ করে লক্ষ্য করছিলেন, সে কাজে মেয়েটি বাধার সৃষ্টি করছে। মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অনবরত। মিহিরবাবু সস্নেহ বিরক্তির ধমক দিয়ে বললেন, 'বর্ণালী, কথা শোনো না কেন? বলছি না, দু মিনিট চুপ করে শুয়ে থাক্‌তে?'

ধমক শুনে বর্ণালী চমকে ওঠে। মুখ থেকে হাতের মুঠি সরিয়ে নিয়ে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে এক নিমেষের জন্য মিহিরবাবুর মুখের দিকে তাকায়। আমি লক্ষ্য করছি মিহিরবাবুকে। কিন্তু মীনামাসিমার কোনদিকেই নজর নেই। আজ রবিবারের দুপুরে সে সমস্তক্ষণ একভাবে, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতার প্রতিমূর্তির মত মিহিরবাবুর শয়ণকক্ষের কোণের দিকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আছে। কোন উৎসাহ নেই তার। শ্রান্তিও নেই একতিল।

আমার উপস্থিতির জন্যই সে মাঝে মাঝে বর্ণালীকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যাচ্ছে। মেয়ে যখন কেঁদে ওঠে তখনি তাকে নিয়ে যাচ্ছে আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই তার উদরপূর্তি করে ফিরিয়ে আনছে। তাকে খাটে শুইয়ে দিয়ে আবার কোণের দিকের চেয়ারে গিয়ে বসছে। শুধুমাত্র এই ধাত্রী-কর্মটুকু তার আজকের কর্মসূচি, বাকি কোন দিকেই লক্ষ্য নেই।

মীনামাসিমার এ ধরনের ভাবান্তর আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি। এটা তার সাময়িক রূপান্তর বলে আর মনে হয় না, মনে হয় এই যেন তার আসল রূপ। চিরন্তন প্রকৃতি।

হঠাৎ মীনামাসিমা কথা বলে উঠল, কাকে উদ্দেশ্য করে বললে বোঝা শক্ত। সম্বোধনরহিত কথা। পুরনো কথাই, যা জন্মাবধি শুনে শুনে মানুষ আর কোন গুরুত্ব দেয় না।

অথচ মীনামাসিমার কর্কশ কথার খোঁচায় মিহিরবাবু যেন চমকে উঠলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে এত কঠিন কঠোর স্বর মীনামাসিমার মুখ থেকে বের হতে পারে, এ যেন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি!

'সময় চলে গেলে তা আর ফিরে আসে না। মানুষের কর্মশক্তিও বয়েসের সীমা দিয়েই বাঁধা, এটা আমরা ভুলে যাই কেন?'

'আমায় বলছ নাকি?' চমকে উঠে মিহিরবাবু প্রশ্ন করলেন।

মীনামাসিমা চুপ করে রইল। অবান্তর বোধেই যেন মিহিরবাবুর কথার উত্তর দিল না।

আবার কি একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে মিহিরবাবু মীনামাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন। তারপর মিনিট খানেক নিস্তব্ধতা পালন করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর গমনপথের শূন্যতার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়েই পরক্ষণে মীনামাসিমা আমার দিকে চোখ ফেরাল।

এইবার সে অনুপস্থিত মিহিরবাবুকে লক্ষ্য করে আমায় বললে, 'মানুষ যে এমন অপদার্থ নিষ্কর্মা হতে পারে, তা এঁকে না দেখলে বোঝা যায় না। কাজকর্ম নেই, লেখাপড়া নেই, ছবি আঁকা নেই। সব বিসর্জন দিয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দিনরাত বসে আছেন। যেন আধুনিক যুগের বিশ্বকর্মা, নিজের অপরূপ সৃষ্টিতে মোহিত। মেয়ে ছেলে যেন কারো হয় না। অসহ্য, অসহ্য! মেয়েটা মরেও না!'

আমি অত্যন্ত শান্ত অথচ গভীর স্বরে উত্তর দিই, 'তুমি কেমন মা, মীনামাসিমা, দিনরাত একটা নির্দোষ নিষ্পাপ শিশুর মরণ কামনা করছ? তোমার একটুও মায়া দয়া নেই!'

'না নেই।' মীনামাসিমা ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত ফণা তুলে জবাব দেয়। তার মেরুদণ্ড বেতের ছড়ির মত টান্‌টান্ হয়ে ওঠে, তীক্ষ্ণ স্বরে বলে, 'আমার কিছু নেই। সব বিসর্জন দিয়ে যে একটা জিনিসকে সর্বস্ব বলে আঁকড়ে ধরে, সেটাকে সে ধ্বংস হতে দিতে চায় না। আমার একমাত্র স্বপ্ন, একটি মাত্র কামনা, ওঁকে শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠিত করা। ওঁর গৌরবের আসন আমি নিজের হাতে বুনে দেব। এতে যদি অপরে বাধা দেয়, বা উনি নিজে দেন, তা আমার সহ্য হবে না। উনি আঁকা ছবি পুড়িয়ে দেন, লেখা খাতা ছিঁড়ে ফেলেন, তার জন্যে আমার কোন খেদ নেই—কারণ শক্তি যার আছে তার অপচয় করা শোভা পায়। বরং অল্পবিস্তর অপচয় কল্যাণজনকই হয়। কিন্তু আজকাল দেখিস না দিনরাত শুধু বর্ণালী আর বর্ণালী। কেন আমি সহ্য করব, আমার যা গেছে তা ঐ নিস্পৃহ মায়াবী মানুষটি কি ফিরিয়ে দেবেন?'

মীনামাসিমার কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করতে পারি না। প্রতিবাদও করি না। সবই সত্য। মিহিরবাবুর জন্য প্রাণপাত করছে সে। দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামে আহরিত বৃত্তিটুকু মিহিরবাবুর খেয়ালের আগুনে অসঙ্কোচে নিক্ষেপ করছে। এর জন্য তাকে একদিনও আক্ষেপ করতে দেখি নি। শুধু এক লক্ষ্য, একমাত্র কামনা, মিহিরবাবু শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠিত হবেন। অনন্যতা লাভ করবেন। কিন্তু বর্ণালী পৃথিবীতে আসার পর থেকে মিহিরবাবু যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছেন। চব্বিশ ঘন্টার দিনরাতের অধিকাংশ সময় তিনি বর্ণালীকে নিয়ে কাটিয়ে দেন। মীনামাসিমাকে গ্রাহ্য করেন না। শিল্পসংগ্রামেও তিনি বিরতি দেয়েছেন। বিরতি নয়, পূর্ণচ্ছেদ! বর্ণালীকে কোলে নিয়ে মীনামাসিমা হাসপাতাল থেকে ফেরার পর থেকে মিহিরবাবু সব ভুলেছেন। কবিতার উপযুক্ত শব্দানুসন্ধানে তাঁকে পাগল হতে দেখি না, হলদে রঙের সঙ্গে সবুজ মিশিয়ে বর্ষাস্নাত পত্রগুচ্ছের ছবি আঁকবেন অথবা সবুজের বদলে নীলের প্রয়োগ করবেন, সে গবেষণায় সারা বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে রঙের ফোয়ারা খুলে দেন না। শুধু বর্ণালীকে আগলে বসে থাকেন তিনি। এক বিরাট শিশু নির্বাক বিস্ময়ে একটি অনর্গল-বাক্ জীবন-কোরকের দিকে তাকিয়ে!

এতটা বাড়াবাড়ি মীনামাসিমার সহ্য হয় না। এর শতাংশের এক ভাগও বোধহয় তার সহ্য হবে না। বর্ণালীর জন্মমুহূর্ত থেকেই সে তার মৃত্যু কামনা করছে। প্রকাশ্যেই করছে। হয়তো বর্ণালীর জন্মের পূর্বাহ্নে মীনামাসিমা অনুমান করেছিল মিহিরবাবু বিরাটের তপস্যায় ক্ষান্তি দিয়ে একটা তুচ্ছ মায়াকে আঁকড়ে ধরবেন। তাঁর শিল্প জীবনের অপঘাত মৃত্যু হবে।

মীনামাসিমার কামনা ব্যর্থ হয় নি। সেদিন মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে গাঢ় নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে বর্ণালী, সকাল সাতটাতেও তার ঘুম ভাঙে নি। মেয়টা মরে গেছে। মীনামাসিমা যখন জানতে পারল তখন তার দেহ ঠাণ্ডা কাচের মত শক্ত হয়ে গেছে। গায়ে হাত দিয়ে শিউরে উঠল মীনামাসিমা। চিৎকার করে মিহিরবাবুকে ডাকল।

বর্ণালী আসার পর থেকে মীনামাসিমা মিহিরবাবুর শয়ণকক্ষে নিজের শয্যার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। মিহিরবাবু বৈঠকে নিশিযাপন করতেন। তাঁর এ কষ্ট স্বেচ্ছাকৃত। মিহিরবাবু মীনামাসিমাকে আর একতলায় শোবার অনুমতি দেন নি। বলতেন, 'বর্ণালী আর একটু বড় হলে আমরা পিতাপুত্রী মিলে তোমায় অধঃপতিত করব, তার আগে, মেয়ে যতদিন না মায়ের দুধ ছাড়ে, তোমার ততদিনের জন্য উন্নতি হোক।'

মিহিরবাবু মীনামাসিমার আর্ত চিৎকার শুনে বিস্রস্ত পদক্ষেপে ছুটে এলেন, 'কি হয়েছে মীনা?'

মীনামাসিমার বাক্যস্ফূর্তি হল না, আঙুলের ইশারায় বর্ণালীকে দেখিয়ে দিলে। তার আগেই মিহিরবাবুর সেদিকে চোখ পড়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর পথ আগলানো কঠিন নিশ্চল প্রতিবাদের মত বর্ণালীর শক্ত অনড় ক্ষুদ্র দেহটা খাটের মাঝখানে পড়ে আছে।

নিমেষেই মিহিরবাবুর জড়তা বিলুপ্ত হল। স্থির পায়ে খাটের কাছে এগিয়ে গেলেন। নীরব বিস্ফারিত চোখে বর্ণালীর দিকে তাকালেন। তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর একই দৃষ্টি তুলে তাকালেন মীনামাসিমার দিকে। চোখে চোখ রাখলেন। একটু হাসলেনও সেইসঙ্গে।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমাদের নিয়ম কত সহজ মীনা, কত সহজেই তোমরা

ভাঙা-গড়ার কাজ সেরে নাও! তোমরাই তো প্রকৃতির প্রতিভূ! প্রকৃতি ইচ্ছাপ্রসূ, তাকে কষ্ট করে সৃষ্টি করতে হয় না, তাই সে মায়ামমতাশূন্য, না মীনা?'

॥ চোদ্দ ॥

বর্ণালী মারা যাবার পর থেকে মিহিরবাবু যেন এক অবাস্তব জীবনের প্রতিশ্রুতির মত চলতে লাগলেন। সম্পূর্ণ জড়বৎ হয়ে গেলেন তিনি। আগ্রহ নেই, উৎসাহ নেই, অসাফল্যের বিলাপ নিই। উদ্দাম জীবনস্পৃহা নেই। বর্ণালীর মৃতাত্মা যেন তাঁকে নির্জীব নিদ্রায় জড়িয়ে দিয়েছে।

মিহিরবাবুকে দেখে আমি অবাক হই। লেখা বা চিত্রাঙ্কন তিনি বর্ণালীকে দেখার পর থেকে ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু তখন তা সাময়িক বিরতি বলেই বোধ হত। এ বিরতি যেন পুনঃপ্রয়াসের পূর্বাভাস। পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার বাসনায় নিথর শক্তিসঞ্চয়। কিন্তু বর্ণালী মারা যাওয়ার পর মিহিরবাবুর বাহ্যিক রূপে আর কোন পরিবর্তন না এলেও তাঁকে দেখে মনে হয় ভেতরটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। একটু নির্বুদ্ধিতার ছাপ পড়েছে চোখমুখের দর্পণে। মূর্খের অন্যমনস্কতা যেন তাঁর দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। আমি মিহিরবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকি। তিনিও তাকান। কথা সামান্যই বলেন, না বলার মতই।

ওপর বারান্দায় মিহিরবাবু শান্তপদে পায়চারি করছেন। সিঁড়িতে আমার পায়ের শব্দ শুনে সেদিকে এগিয়ে এলেন। দাঁড়ালেন সিঁড়ির মুখে। আমি উঠে আসতে নির্বাক নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। ঠোঁটদুটি মূকের ভাষার মত নড়ে উঠল, অস্পষ্ট স্বরে কিছু বললেন যেন। ভাষায় বোধগম্য হয় না, কিন্তু আমি বুঝতে পারি বর্ণালীর কথাই বললেন তিনি।

তারপর বললেন, 'এস অশোক!' স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করে কথাটা বলে অন্য দিকে চলে গেলেন।

আমি কিছুক্ষণের জন্য তাঁকে অনুসরণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করি। কথা বলবার চেষ্টা করি। দু'একটা আজেবাজে অবাস্তর অর্থহীন প্রশ্নে তাঁকে জাগিয়ে তুলতে চাই। নিজের ইচ্ছায় করি না, মীনামাসিমার আদেশেই করতে হয় আমায়।

সে বলে, 'তুই চেষ্টা করে দেখ্ অশোক, আমার দিকে তো উনি আজকাল ভুলেও তাকিয়ে দেখেন না। কথা বলতে গেলে এমন এক অদ্ভুত শব্দ করে পাশ থেকে সরে যান, কি বলব! ঘৃণা না অবজ্ঞা, না আমায় চিনতে না পারা, তা বুঝতে পারি না। উনি ভাবেন, আমি বর্ণালীকে মেরে ফেলেছি, কি আশ্চর্য ধারণা! আমি প্রতি মুহূর্তে মেয়েটার মৃত্যু কামনা করতুম, সে মরে যেতে আমার কোন আফসোস নেই, কিন্তু—'

উত্তর না দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। নির্বাক নিস্পৃহ দৃষ্টি নিয়ে ঠিক মিহিরবাবুর মতই তাকাই। আমার চোখে সন্দিগ্ধের ভাষা দেখে মীনামাসিমার বাকরোধ হয়। আমারও বিশ্বাস, সে বর্ণালীকে খুন করেছে। আমার স্থির বিশ্বাস, বর্ণালীর মৃত্যু জীবন-মরণের স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল নয়, অনির্দিষ্ট মরণ অস্বাভাবিক ভাবে তার কণ্ঠরোধ করেছিল।

মীনামাসিমা আবার কৈফিয়ৎ দেয়, 'কি করে যে মেয়েটা মারা গেল, তা আমি আজও

বুঝে উঠতে পারি না! ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দেখি মরে আছে। আমি তাকে বিষ খাওয়াই নি, গলা টিপেও মারি নি। মেয়েকে সহ্য করতে পারতুম না, এ কথা সত্যি; কিন্তু কোনদিন তো অযত্ন করি নি! মাতৃস্নেহ দিতে পারি নি, তা বলে কর্তব্য করি নি, এ কি তোরাই বলবি? সবই তো দেখেছিস অশোক? তবু যদি তাঁর সন্দেহ ছিল তাহলে পোস্টমর্টেম করালেন না কেন? রোগে মরেছে বলে শ্মশানের খাতায় লেখালেন কেন? কেন মরা মেয়েকে ডাক্তার দেখিয়ে সার্টিফিকেট নিলেন?'

কোন কথারই উত্তর দিইল না। মীনামাসিমার কথায় অবিশ্বাস করি না, কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাকে বিশ্বাস করা আরো কঠিন। কঠিন নয়, অসম্ভব!

মিহিরবাবুকে কোন কথা বলাতে পারি না, অগত্যা আবার একতলায় নেমে আসি। ব্যর্থ ও বিফল হয়ে ফিরতে হয় আমাকে। আমার মুখ দেখে মীনামাসিমার আর কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজন হয় না। তবু খানিকটা আশঙ্কার সংমিশ্রণ দেওয়া অনুসন্ধিৎসা নিয়ে সে প্রশ্ন করে, 'কিছু বললেন রে উনি?'

'না।'

'একটা কথাও নয়?'

'না'

হঠাৎ কি যেন ভাবে মীনামাসিমা। ভ্রূকুঞ্চিত করে চিন্তা করতে থাকে। তার দুটি চোখের কোণে রক্তের আবেশ ছুটে আসে; আমি দেখি তার ভ্রূকুঞ্চনে, চোখের স্থির ভাবে, একটা কুটিল সংকল্প ঘনিয়ে উঠেছে।

মীনামাসিমা আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়। মুখের চিন্তারেখাগুলি ম্লান হাসির প্রলেপে পরিষ্কার করে নিয়ে বলে, 'এবার তাহলে তুই বাড়ি যা অশোক? আমার একটু কাজ আছে, বেরুতে হবে।'

'কোথায় যাবে?'

'কেন?' তীক্ষ্ণ তীব্র সুরে প্রশ্ন করেই স্বরের ক্রটিটুকু সংশোধন করে নিয়ে সে বলে, 'একবার স্কুলের বোর্ডিঙে যাব, আরতির সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার।'

'আরতি কে?' মীনামাসিমার অনিচ্ছাকৃত বাক্যালাপে ইচ্ছে করেই অতিরিক্ত বিরক্তি উৎপাদন করি।

'আরতি আমাদের স্কুলের নতুন টিচার। গত বছর আই.এ. পাস করেছে; এখন প্রাইমারি সেকশনে পড়াতে দিয়েছি।'

'আরতি এখানকার মেয়ে?'

'না কাঁঠালপাড়ায় বাড়ি। বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়া।' কথার শেষে সে মৃদু হাসল। তারপর শেষ করা কথায় আর একটু কথা যোগ করে বললে, 'দেখলে বিয়ে করতে ইচ্ছে হবে, কিন্তু তোর চেয়ে বয়েসে বড়।'

আমার সব প্রশ্নের সবিস্তার উত্তর দিয়ে সে পোশাক বদলাবার জন্য ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। বন্ধ দরজার দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে আমিও বেরিয়ে পড়লাম।

॥ পনেরো ॥

আরতি আসে। আমার মতই সে অবাধে এবং অনিয়মিত সময়ে এ বাড়িতে আসে। তার যাওয়া-আসায় অতিথির মত কোন আয়োজন বা পারিপাট্য নেই।

আরতি সুন্দরী সুঠাম তন্বী দেহবল্লরীর প্রকৃত স্বাক্ষর। অন্তত আমার দৃষ্টিতে তার অঙ্গে কোন খুঁত দেখতে পাই না। মিহিরবাবুর ভাষায় বলতে গেলে, আরতি তার পিতামাতার পারস্পরিক প্রীতিপূর্ণ সহযোগিতার প্রতীক স্বরূপ। তার দেহের কোন অংশে তিলমাত্র অসামঞ্জস্য নেই। মুখের হাসি আরো সুন্দর। মনে হয় তার হাসিতে অন্তরের সৌন্দর্য বাইরের রূপের ওপর এসে উপচে পড়ে। আমার চোখে আরতি অলৌকিক। বয়সে সে হয়তো আমার চেয়ে দু'তিন বছরের বড়, কিন্তু এ বিপরীত ব্যবধানটুকু আমার স্বপ্ন রচনায় ব্যাঘাত আনে নি। মনে হয় দিনের কোলাহলে, রাতের শ্রান্তিতে আরতি আমায় ঘিরে থাকুক।

কিন্তু তেমন সুযোগ পাই নি। মীনামাসিমার সন্দিগ্ধ এবং সুকঠিন দৃষ্টিপ্রাচীর ডিঙিয়ে ওপারে যেতে পারি নি। দু'একটা কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু সে কথাগুলি 'আমাদের কথায়' পরিণত করার অবসর পাই নি, নিজেকে প্রকাশ করার পূর্বেই অবলুপ্ত হয়ে গেছি।

'বেশ মেয়ে যা হোক,' মীনামাসিমা বলতে বলতে ঘরে ঢোকে, 'শিল্পী রং তুলি নিয়ে বসে আছেন, আর ইনি এখানে গল্পে উন্মত্ত!' এবং কথার শেষে আমার সর্বাঙ্গে একজোড়া জ্বলন্ত দৃষ্টির আগুনের স্পর্শ অনুভব করি।

আরতি ওপরে চলে যায়। যাবার সময় সে যেন আমায় অপেক্ষা করতে বলে গেছে! বসে বসে মুহূর্ত গণনা করি। প্রতিটি মুহূর্ত আমার মনে পেটা ঘড়ির মত বাজতে থাকে। গুণে চলি—মুহূর্তের গণনায় হাজার লক্ষ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু ততক্ষণেও আরতি নিচে নামে না। আমি কোনদিনই তাকে ফিরে আসতে দেখি নি। নানা অজুহাতে আমার স্থিতিকাল বাড়িয়ে দিয়েও তার দেখা পাই নি। উৎকর্ণ হয়ে ওপর তলার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শোনবার চেষ্টা করি, কিন্তু অখণ্ড নীরবতা ভিন্ন অন্য কিছু আমার অনুভূতিতে ধরা দেয় না। একটা নিস্পন্দ নীরবতা যেন আমার জন্যই ওপর তলাটাকে মৃত্যু মাখিয়ে রেখেছে। মিহিরবাবুর স্টুডিয়োয় অনেক আলো জ্বলে, কিন্তু নিচের তলার ঘরে বসেই আমি বুঝতে পারি জমাট অন্ধকার ওখানে নিভৃত আলাপে মগ্ন হয়ে আছে। আমার বুকের ভেতরটা কেঁদে ওঠে, মীনামাসিমা আমার মানসিক মানচিত্রের বিচিত্র রেখাজাল ঘেঁটে অর্থানুসন্ধান করে ফেলে, তখন এক ব্যঙ্গোক্তির মতই তার চোখদুটো ভাষায়িত হয়।

সেদিন সন্ধ্যার পর মিহিরবাবু হঠাৎ দু'তলার সিঁড়ির কাছ থেকে হাঁক দিলেন, 'দু কাপ চা পাঠিয়ে দিও তো!'

সম্বোধন নেই, কাকে বললেন জানবার উপায় নেই, তবু এ ঘরে বসেই মীনামাসিমা সাড়া দিল, 'দিচ্ছি এখুনি—'

তারপর সে ত্বরিতে রান্নাঘরে ছুটে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে দু'হাতে দুটি পরিপূর্ণ চায়ের পেয়ালা নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু ওপরে না উঠে কি মনে করে সেখানে থেকেই আমায় ডাকল, 'অশোক!'

তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

পেয়ালা দুটি আমার হাতে দিয়ে মীনামাসিমা বললে, 'এ দুটো ওপরে দিয়ে আসতে পারবি? দিয়েই চলে আসিস কিন্তু—আজ তোর সঙ্গে খুব গল্প করব, স্কুলের খাতা দেখতে ভাল লাগছে না।'

আহত ক্ষতবিক্ষত বুকের দুন্দুভি শুনতে শুনতে চায়ে পেয়ালা হাতে ওপরে উঠলাম। স্টুডিয়োর আলো নেবানো, সেখানে মিহিরবাবু নেই। আরতিও নেই। খোলা জানলার পথে ভেসে আসা চাঁদের আলোয় আরতিকে খুঁজলাম। জানি তাকে একলা পাব না, কিন্তু আমি এদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখতে চাই। এক ঘরে মিহিরবাবুকে। অন্য ঘরে আরতিকে।

পাশের ঘরে ঢুকে দেখলাম মিহিরবাবু বড় সোফাটায় তাঁর পরিচিত ভঙ্গিতে বসে আছেন। ধূমপানে মগ্ন। সামনের কৌচটায় আরতি। কিঞ্চিৎ আলুলায়িত। সামান্য বিস্রস্ত। আমায় দেখে বুকের আঁচল স্থানযুক্ত করে মাথার খোঁপায় হাতে দিল একবার। গুছিয়ে বসবার চেষ্টা করল।

মিহিরবাবু যেন একটু বিস্মিত হলেন, 'অশোক তুমি চা নিয়ে এলে কেন! মীনা কোথায়?'

অনুগত ভৃত্যের মত চায়ের পেয়ালা দুটি তেপায়ায় বসিয়ে দিয়ে বিনাবাক্যে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। মীনামাসিমার নিষেধাজ্ঞা দেওয়া আছে, আমার নিজেরও এদের মাঝে অবস্থান করার প্রবৃত্তি নেই।

আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি, মিহিরবাবু ডাকলেন, 'যাচ্ছ কেন অশোক, কতদিন তোমায় দেখি নি? একটু বস এখানে।'

তাঁর নির্দেশে অপর একটি শূন্য কৌচে নিজের প্রতিবাদ-কঠিন দেহটাকে স্থাপন করলাম।

'এর নাম আরতি', মিহিরবাবু পরিচয় করাবার চেষ্টা করেন।

মুখে হাসি টেনে বললাম, 'জানি।'

আরতিও হাসল, তারপর বললে, 'আসুন, আমার চা দুজনে ভাগ করে খাই? কিসে নেবেন আপনি, কাপে না প্লেটে?'

নিজের জন্য প্লেটে খানিকটা চা ঢেলে নিয়ে পেয়ালাটা সে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। অনেক স্বচ্ছন্দ মনে হল তাকে। অনেক সহজ। যেন কোন আকস্মিক প্রবাহে তার বয়সটা অনেক বেড়ে গেছে। আচবণে কুমারীসুলভ ব্রীড়া নেই।

মিহিরবাবুর উদ্দেশ্যে আরতি বললে, 'এতদিনে বুঝি অশোকের সঙ্গে পরিচয় করানোর কথা আপনার মনে পড়ল?'

মিহিরবাবু ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'তুমি জানো নাকি অশোককে? অশোক আমার একমাত্র বন্ধু।'

'অশোক নিজেই তো বললে, আমার চেনে, আর আমি তো একে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হবার আগে থেকেই জানি। তবে যদি কিছু মনে করে, সেই ভয়ে আপনি বলেই সম্বোধন করি।'

আরতি হাসল, সহজ সরল হাসি মুখে নিয়ে তাকাল আমার দিকে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, এ আরতিতে আমার আর লোভ নেই। তাকে কাছে পাওয়ার স্পৃহা আমার অচিরাৎ অন্তর্হিত হয়েছে। আরতির চেয়ে বরং মীনামাসিমার আকর্ষণই

আমার কাছে বেশি। কে যেন আরতি নামের একটা উৎপীড়ক শব্দ আমার মানসিক ক্লেশের অনুভূতি থেকে মুছে দিয়ে গেল। আমি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মিহিরবাবুর দিকে তাকালাম, আরতিকে গ্রহণ করে তিনি আমায় প্রণয়পীড়ন থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মিহিরবাবু বললেন 'বেশ চা! বোধহয় নীলগিরি—?'

উত্তর দিলাম, 'না, দারজিলিং—'

'গন্ধটা কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর!'

আমার একটা পুরনো কথা মনে পড়ে গেল, মিহিরবাবুর সঙ্গে কৌতুক করার জন্য বললাম, 'বলেছিলেন একদিন নিজের হাতে চপ তৈরি করে খাওয়াবেন?'

আরতিও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, যেন মিহিরবাবুর সব কথাই সে জানে, তাঁর প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের নির্ঘণ্ট। তাঁর কথাবার্তা প্রতিশ্রুতি কিছুই তার অজ্ঞাত নয়, শুধু যেন এইটুকুই সে শোনে নি।

'সত্যি, বলেছিলেন বুঝি? তাহলে তো আপনার কথা রাখা উচিত।'

মিহিরবাবুর একান্ত আপনজনের মত এবং তাঁর প্রতি অধিকারের গণ্ডিতে দাঁড়িয়ে যেন কথাটা বললে সে। কানে কিছুমাত্র বেমানান শোনাল না, শুধু মনে হলে, আপনির জায়গায় তুমি বলা উচিত ছিল আরতির।

মিহিরবাবু তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে বললেন, 'আমি ভুলি নি, কবে খেতে চাও?'

'যে দিন আপনার সুবিধে।'

'তাহলে আর দেরি কেন, দু'চার দিনেই—কি বল? একটা ছুটির দিন চাই তো! তুমি থাকবে, মীনা থাকবে—'

'আর আমি!'

'আরতির নাম অনুক্ত থেকেই অপরিত্যাজ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, তবু সে কৌতুক বা অভিমানের অভিনয় করার অবসর ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়।

'তুমি তো থাকবেই।'

মিহিরবাবু তার দিকে তাকালেন একবার, তাঁর চোখদুটি যেন বলতে চাইছে—অনুল্লেখেই তুমি উল্লিখিত হয়েছ আরতি!

॥ ষোল ॥

কিছুদিন থেকে মীনামাসিমা কথাবার্তা বলা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছিল। তবু যেতাম। একটা বিষাক্ত নেশার মত মনে হত আমার। প্রতিদিন সংকল্প করি, আর আসব না এখানে। মীনামাসিমা ডেকে পাঠালেও না। কিন্তু প্রতিটি সন্ধ্যার মানসিক সংঘাত আমায় পরাজিত করে।

মীনামাসিমা কথা বলে না। অন্যমনস্ক। আশঙ্কিত। তাকে দেখামাত্রই মনে হয়, এক অবর্ণনীয় ভীতির আরকে যেন নিমজ্জিত হয়ে আছে। কিসের ভয়, কিসের আশঙ্কা, বুঝতে পারি না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সদুত্তর পাই না।

তবু সেদিন জিদ ধরে বসলাম, 'তোমার কি যেন হয়েছে মীনামাসিমা!'

সে স্বীকার করে না, কপট কৌতুকের সঙ্গে কৌতূহল মিশিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করে, 'কি

হয়েছে রে আমার, গণক ঠাকুর?'

'কি হয়েছে তা আমি কি জানি', আমি স্বরের দৃঢ়তা বাড়িয়ে দিয়ে বলি, 'কিন্তু বেশ বুঝতে পারি, তুমি যেন সদা-সর্বদা কোন এক ভয়ে থতমত খেয়ে আছ!'

'না, না,' মীনামাসিমা প্রবল প্রতিবাদের গণ্ডি টেনে আমার মুখ বন্ধ করে দিতে চায়। ধরা পড়ার ভয়ে কাজের অছিলায় সুমুখ থেকে পালিয়ে যেতে চায়। আমি তার পথ আগলে দাঁড়াই।

'তোমায় বলতেই হবে। তোমার মুখ দেখ্‌লে মনে হয়ে তুমি যেন সব সময় আতঙ্কিত হয়ে থাক?'

'কি বলব?' ঘরের বাইরে যাবার রাস্তা না পেয়ে মীনামাসিমা হতাশ ভঙ্গিতে চৌকির ওপর বসে পড়ে বলে, 'আমার কিছুতেই ভয় নেই, আমি জানি আমার কর্তব্য আমায় করতে হবে।...জানিস অশোক, তোদের মিহিরবাবু এই দু'মাসের মধ্যে একখানা উপন্যাস লিখে শেষ করেছেন, ঐ দেখ্‌ আমার টেবিলে আমি পাণ্ডুলিপি নকল করছি। বড় ছবি এঁকেছেন দু'খানা। একখানা আরতির, আর একটা কোন কাল্পনিক দৈত্যের। উপরন্তু গুটিকয়েক কবিতা। তুই ধারণা করতে পারিস, এতে কতটা শক্তির প্রয়োজন? তা তাঁর আছে। আমি নিবে-যাওয়া আগুন আবার জ্বালিয়ে তুলেছি, এ আর কোনদিন নিববে না। এবার লেখাগুলো ছাপাতে আরম্ভ করব। ছবিও দেব এগ্‌জিবিশনে। উনি বলেছেন, এগুলো তাঁর মনের মত হয়েছে; লেখায় রেখায় যা প্রকাশ করতে চান, তা পেরেছেন।'

মীনামাসিমার আশঙ্কাকৃষ্ণ মুখ আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কিন্তু অবান্তরে উৎসাহ নেই আমার। প্রশ্নের জবাবই আমি তখন শুনতে চাইছি, তাই অধৈর্য-বিরক্তির সঙ্গে বলি, 'এ সব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না, যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও।'

মীনামাসিমা নীরব রইল কিছুক্ষণ। টেবিল ঘড়িটা টিকটিক করছে। শেড্‌লাগানো টেবিলল্যাম্পের অনিয়মিত আলো ঘরের অংশবিশেষে ছড়িয়ে আছে। চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল মীনামাসিমা।

তারপর গভীর প্রত্যয়ে বললে, 'তুই ছেলেমানুষ, তোর কথার উত্তর আমি ঠিকই দিয়েছি, কিন্তু বুঝতে পারিস নি। তোর না-বোঝার দোষ আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছিস কেন?'

'কই জবাব দিলে তুমি!'

এ কথার উত্তর না দিয়ে মীনামাসিমা বিষাদগম্ভীর মুখে বললে, 'অশোক, কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছে, এখানকার সংসার আমার ভেঙে এসেছে। এ বাড়ি আমাদের ছেড়ে যেতে হবে। আর কখনো তোকে দেখতে পাব কিনা জানি না। আমার সব কথাই তোকে বলছি, মীনা কোনদিন নিজের কাছে মিথ্যে হয় নি, তোর কাছেও নয়, কিন্তু তুই আমায় বুঝতে পারিস নি। হয়তো এই না বোঝার জন্যেই একদিন আমায় ঘৃণা করবি, কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি জানি, আমি ঘৃণার নই, প্রশংসারও নই, আমি প্রয়োজনের। সেদিকে আমি কোনদিন কার্পণ্য দেখাই নি। কিন্তু আমার প্রয়োজনীয়তা সকলকার জন্যে নয়, যার জন্যে তাকে আমি চূড়ান্ত দেওয়াই দিয়েছি, আজও দিয়ে যাচ্ছি। আমি—'

আরো কি বলতে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ সদর দরজার গায়ে অনেকগুলি উত্তেজিত করাঘাতের শব্দ উঠল। বাইরেও কয়েক জনের মিলিত কণ্ঠের গোলযোগ। আমি দরজা

খুলতে উঠে যাচ্ছিলাম, মীনামাসিমা মুখে এক অদ্ভুত হাসি নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'তুই এখানে থাক না, বরং আমি দরজা খোলার পর পাশ কাটিয়ে চলে যাস।' তারপর একটু ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললে 'তোর কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়তো এখুনি হয়ে যাবে!'

মীনামাসিমার পাশে পাশে এসে অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়ালাম। দরজা খুলে দিয়ে সে একপাশে সরে দাঁড়াল। বিনা অনুমতিতে অনেকগুলি লোক বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল আমিও তাদের সঙ্গে মিশে গেলাম যেন। কিন্তু পরক্ষণেই আগন্তুক দলের একজনের মত রাস্তায় নেমে পড়লাম।

একটি উচ্চ কণ্ঠের কথা কানে এল, 'এইতো মাগীটা, ব্রথেল খুলে ব্যবসা চালাচ্ছে! এটাই—'

মীনামাসিমার অনুচ্চ কণ্ঠও শুনলাম আমি, 'আপনারা চুপ করুন, এ বাড়ি আমাব—'

'এ বাড়ি আমার! বেশ্যার বাড়ি আমার তোমার হয় না ম্যাডাম, ব্রথেল ইজ ব্রথেল, ওপ্‌ন্ টু অল। সেই মেয়েটা কোথায়, যার নাম আরতি?'

'আপনার প্রয়োজন?'

'আছে প্রয়োজন, সি ইজ মাই—মাই সিস্টার।'

'আরতির কোন ভাই নেই।'

'ভাই নেই, ভাতার আছে, না? হোয়াই ইজ দ্যাট ভাতার?'

অন্য একজনের কণ্ঠ, 'এটা ভদ্দরলোকের পাড়া—'

আর একটা ভীত পুরুষ-কণ্ঠ শুনলাম, 'শ্যামলাল, এ ক্লাসের মেয়েদের বিশ্বাস নেই, পুলিস ডাকতে পারে। দেখলি না, একটা ছোঁড়া পুক্ করে পাশ কেটে বেরিয়ে গেল, বোধহয় থানায় গেল!'

'ডাকুক না পুলিস—'

'সকলকে বাঁধিয়ে দেবে দাদা, টু বি হ্যাংড বাই নেক্ টিল ডেথ—পুলিসের সঙ্গে এদের শেয়ার থাকে। ঐ ছোঁড়াটাই তো টাউট্—'

'আরে না, ও তো মিত্তির বাড়ির ছেলে—'

'মিত্তির বাড়ির ছেলে টাউট্ হতে শাস্তরে মানা আছে? আমার কাছেই তো একদিন এসেছিল। উইথ প্রোপোজাল—'

অনেক কথা। অনেক কণ্ঠ। অনেক মন্তব্য। অনেক অনেক! বাড়ির ভেতরকার বিপর্যয়ের বাইরে দাঁড়িয়েও আমি যেন ভেসে গেলাম। শুনতে শুনতে আমার চেতনা লুপ্ত হয়ে এল। আর কোন কথা স্পষ্ট শুনতে পেলাম না, কানে প্রবেশ করলেও বুঝতে পারলাম না। নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি যেন! এই বিস্মৃতি নিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় বাড়ি ফিরে এলাম। সকলকার দৃষ্টি এড়িয়ে আমার চিলেকোঠার নিঃসঙ্গ রাজ্যে পৌঁছে নিঃশব্দে শুয়ে পড়লাম। অসহ্য মনোভাবের শ্রান্তিবশত ঘুমিয়ে পড়লাম অচিরেই।

॥ সতেরো ॥

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। বোধহয় মধ্যরাত্রি। দরজার বাইরে থেকে মায়ের উচ্চস্বরের ডাক ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

'অশোক, অশোক—'

'উঁ! কে?'

'আমি রে!'

'মা? খুলছি।'

উঠে দরজা খুলে দিলাম, 'কি মা?'

নিদ্রাজড়িত গলায় মা বললে, 'মীনার বাড়ির ঝি দাঁড়িয়ে আছে, তোকে কি দরকারী কথা বলবে।'

'কি কথা'?

'আমায় বলতে চাইলে না। জিজ্ঞেস করতে কেঁদে উঠল।'

সীতার কান্না তখনও থামে নি। তার চেহারা দেখে বুঝলাম বিস্তারিত কিছু জানবার আশা নেই, এখানে দাঁড়িয়ে বিশেষ কৌতূহল বোধ করলে ঘটনাটি আমার অনুমানেই জানতে হবে। সে যতটুকু বলতে পারবে, তা আমিও জানি। অতএব তাকে আর কোন প্রশ্ন না করে গায়ে কামিজ চাপাবার সময়টা অযথা নষ্ট না করে গেঞ্জি গায়ে নগ্ন পায়ে এ বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

গোটাতিনেক ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা ঠেলাগাড়িও। মালপত্র বোঝাই হচ্ছে গাড়িগুলিতে। নীরবে। নিস্তব্ধে। কোনরকমে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। নীচের তলার বারান্দায় সকলেই উপস্থিত, মীনামাসিমা মিহিরবাবু আর আরতি।

মিহিরবাবুই সর্বাগ্রে কথা বললেন, 'এ যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাদের বীরত্বপূর্ণ পলায়ন, অশোক! আমার পালাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এরা তা শুনবে না।'

উত্তর দেওয়ার মত কিছু নেই। কিছুদিন থেকে আমি শুধু নির্বাক বিস্ময় নিয়ে এই মানুষ তিনটিকে লক্ষ্য করে চলেছি। দেখছি অসামাজিক আবর্তে নিক্ষিপ্ত তিনটি মনুষ্য নামধেয় প্রাণীকে। দেখছি আতঙ্কগ্রস্ত মীনামাসিমাকে, সদাসর্বদা নিষ্ঠুর ভয়ে সে যেন ভেতর ভেতর শুকিয়ে যাচ্ছে, অথচ এ ভীতির কারণ সে নিজেই আমন্ত্রণ করে এনেছে।

মীনামাসিমা আমার কাছে সরে এল, 'অশোক, আমরা চলে যাচ্ছি। আজ রাত্তিরের মধ্যে না গিয়ে উপায় নেই, দিনের বেলায় অবস্থা কি দাঁড়াবে বলতে পারি না। এমন দিন যে আসছে তা আগেই বুঝেছিলাম। এই নে আমার ঠিকানা, সুবিধেমত দেখা করিস। কিন্তু মনে হয় তুই বোধহয় আর আমার কাছে আসবি না। সন্ধ্যেবেলা স্বচক্ষে যে দৃশ্য দেখে গেলি, তারপর আর কি করে আশা করি—'

তার কথা সম্পূর্ণ হবার আগেই বললাম, 'না মীনামাসিমা, আমি তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করব।'

কান্নায় আমার গলার স্বর বুজে এল, কিন্তু মনের মধ্যে প্রশান্ত অস্বস্তির প্রবাহ চলেছে তখন!

আরতি বলল, 'আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করা হল না, আমাদের নতুন ঠিকানায় আসবেন একদিন—মাত্র তো মাইল পাঁচিশেক পথ!'

আরতির কথার উত্তর দিলাম না আমি।

মিহিরবাবু হঠাৎ কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন, 'অশোককে এত বলবার কি আছে, আমার বন্ধু অশোক। আই হ্যাভ মাই বেস্ট লাভ ফর হিম।'

মীনামাসিমা সীতাকে বললে, 'তুমি আবার ভেবে দেখ সীতা, আমাদের সঙ্গে গিয়ে তোমার কি লাভ?'

সীতা সাশ্রুনেত্রে জবাব দিল, 'আর দিক্ কোর নি বাপু, আমি যখন যাব বলেছি, তখন যাবই—নয়তো দত্যিটার জন্যে তুমি কোন্‌দিন খুন হবে!'

মিহিরবাবু নির্বিকার স্বরে তাকে সমর্থন করে বললেন, 'সীতা তো যাবেই সঙ্গে, না গেলে আমাদের চলবে কি করে? সি সেভড্ দ্য সিচ্যুয়েশন; সীতা যদি বঁটি নিয়ে না বেরুত, তাহলে আজ সন্ধ্যেবেলায় কি হত বল তো!'

তিনখানি ঘোড়ার গাড়ি আর একখানা ঠেলাগাড়ি আমার চোখের সামনে দিয়ে অন্ধকার রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেল, খালি বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। তারপর সেই বাড়িরই শেষ অধিবাসীর মত সেখান থেকে বিদায় নিলাম। সদর দরজার কপাট দুটো হাট করে খোলা রইল।

॥ আঠারো ॥

মীনামাসিমার ঠিকানা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। না হারালেও তাকে আর কোনদিনই খুঁজে পেতাম না। কারণ পরে জেনেছি, সে ঠিকানায় তারা বেশিদিন থাকতে পারে নি। সেখানে মিহিরবাবুর কাজের অসুবিধা হচ্ছিল তাই সেই ছোট শহর অল্পদিনের মধ্যে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। মীনামাসিমার সংসার মহানগরীর নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জয়দেব কাব্যে আমার জ্ঞানের স্বল্পতা দেখে মিহিরবাবু একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, এরাই আই. সি. এস. হবার যোগ্য, চাকরির বাজারে আমার কানাকড়িও দাম নেই। তাঁর সে কৌতুক সফল হয়েছে। এম. এস. সি. পাশ করে আমি অ্যাডমিন্সট্রেটিভ সার্ভিস পরীক্ষায় বসেছিলাম। দ্বিতীয় প্রচেষ্টাতেই আমার নির্বাচন হয়েছিল।

মিহিরবাবু বা মীনামাসিমাকে আমি ভুলি নি। মীনামাসিমাকে ভুলি নি, কারণ আমার জীবনে সে-ই প্রথম নারী। প্রথম নারী কথাটা ব্যাপক অর্থে। মানবজীবনের যত কিছু বিচিত্র জ্ঞাতব্য তা আমি মীনামাসিমার সংস্পর্শে এসেই জেনেছি। কৈশোরের শেষাংশ থেকে যৌবনের প্রথম অধ্যায় তার বাড়ির বিচিত্র আবহাওয়ায় আমার প্রথম জ্ঞানোদয় হয়।

মীনামাসিমাকে আমি ভালবাসতাম না, শ্রদ্ধা করতাম না, কিন্তু বিষাক্ত নেশার মত তার প্রতি আসক্তি অনুভব করতাম। সেই আকর্ষণের জন্যই আমি প্রতিমুহূর্তে সংকল্পচ্যুত হয়ছি। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে এড়িয়ে চলতে পারি নি। আজও ভুলি নি তাকে।

আরতির প্রতিও আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তার সান্নিধ্য কল্পনা করে প্রবল প্রণয়-বাসনায় জর্জরিত হতাম; কিন্তু এ আবেগ আমার মন থেকে আচম্বিতেই অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। আরতির নামটুকু মনে আছে, তাকে মনে নেই।

আর মিহিরবাবু—তাঁকে ভোলবার উপায় নেই। শিল্প বা সাহিত্য সম্বন্ধে চলতি রকমের সংবাদ রাখতে গেলেই মিহিররঞ্জন সেনকে সর্বাগ্রে মনে পড়বে। তাঁর নাম বাদ দিয়ে এ যুগের সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। শিল্পের প্রগতি পঙ্গু।

সাহিত্য বা চিত্রশিল্প সম্বন্ধে তেমন আগ্রহী না হলেও সামাজিকতা রক্ষার দায়ে কিছু চর্চা রাখতেই হয়। মিহিরবাবুর লেখা উপন্যাস গল্প কবিতা আমি পড়েছি। তাঁর রচনার মধ্যে আমি তাঁকে আবিষ্কার করতে পারি। না, ভুল বললাম বোধহয়—নিজের রচনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। আমার পরিচিত কোন মানুষের প্রতিচ্ছবি বা কোন ঘটনার

চিত্রণ আমি তাঁর লেখায় খুঁজে পাই নি। অথচ মনে হয়, সব রচনার মধ্যে উহ্য থেকেও তিনি নিজেকেই সর্বত্র বিধৃত করেছেন। মিহিরবাবুর আঁকা ছবি আমি প্রদর্শনীতে দেখেছি। তার মধ্যে আমার সেই ছবিটিও ছিল। শুধু মুখটুকু। আমার শারীরিক গঠন মিহিরবাবুর পছন্দ হয় নি, এতে অনেক অসামঞ্জস্য দেখেছিলেন তিনি। মিহিরবাবুর ছবির প্রতিলিপি বহু দেশী বিদেশী পত্রিকাতে স্থান পায়। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার শোভা ও গৌরব বর্ধন করে। অথচ জানি, মিহিরবাবু কোনদিন কোন শিল্প বিদ্যালয়ের দরজা মাড়ান নি।

জেলা সমাহর্তারূপে ভাগলপুরে বদলি হয়ে আসার কিছুদিনের মধ্যেই শুনলাম, আমি এখানকার সাহিত্য-মন্দিরের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি। আসনটি জেলা সমাহর্তার জন্যই সংরক্ষিত, যোগ্যতার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

সাহিত্য-সভার বার্ষিক অনুষ্ঠান। সদস্যদের আন্তরিক আগ্রহ মিহিররঞ্জন সেন সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। পূর্বেও তাঁরা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মিহিররঞ্জন সম্মত হন নি। শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে, নয়তো অনুরূপ একটা কারণ প্রদর্শন করে আমন্ত্রণ অস্বীকার করেছেন।

সম্পাদক নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করলাম, 'মিহিররঞ্জন কি সভা-সমিতিতে আসেন? জানেন আপনারা?'

'কেন জানব না স্যার? এই তো গত বছর বাঙ্গালোর নিখিল ভারত সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে এলেন। খবরের কাগজ আর পঞ্চাশটা পত্রিকায় ছবি দেখেছি।' তারপর খানিকটা মনঃক্ষুণ্ণের মত বলেন, 'তবে আমাদের ভাগলপুর সাহিত্য-পরিষৎ তো নিখিল ভারত স্কেলের ব্যাপার নয়, এখানে সভাপতিত্ব করে বড়জোর বাংলা কাগজের ফুট্‌নোটে নিজস্ব সংবাদদাতার খবরস্বরূপ দু-চার লাইন ছাপা হবে, তাও হবে কিনা সন্দেহ! পাবলিসিটির কোন গ্যারান্টি নেই।'

কৌতুক অনুভব করছিলাম কিন্তু সে ভাব চাপা দিয়ে অনুসন্ধিৎসুর মত প্রশ্ন করলাম, 'মিহিরবাবু বুঝি একজন প্রচারপ্রিয় ব্যক্তি?'

শিল্পীচরিত বোধ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হাসি হেসে নির্মলবাবু বললেন, 'কে নয় বলুন?'

'তা তো ঠিক!' খানিকটা সন্দিগ্ধ সুরে বলি, 'তাহলে এবারই বা তিনি আসবেন কেন, আগে যখন দু-বার নারাজ হয়েছেন?'

'দেখি তো চেষ্টা করে, বার বার তিনবার', সম্পাদক নির্দ্বিধায় বলেন, 'এবার না এলে লাইব্রেরি থেকে তাঁর বইগুলো টেনে ফেলে দেব।'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'শিল্পীকে অতটা শাস্তি দেবেন না, তার চেয়ে আর একবার চেষ্টা করুন। চিঠি লিখুন, ঠিকানা জানেন তো?'

'তা তো জানিই!'

'পুরনো ঠিকানা যদি বদলে থাকেন?'

'সে ভয় নেই, তাঁর নামের গন্ধেই চিঠি ডেলিভারি হবে।'

'বেশ, লিখুন তাহলে।'

'চিঠি স্যার, এবার প্রেসিডেন্টের তরফ থেকেই লিখতে হবে। ইতিমধ্যে আমার মতন স্থানীয় সাহিত্যিক-সম্পাদকের লেখা চিঠি তিনি নস্যি করে দিয়েছেন।'

'আমি আবার কেন, আপনিই—। আমার চিঠিরও যদি ঐ দুর্দশা হয়?'

মুখে আপত্তি জানাই, কিন্তু ভেতর ভেতর আগ্রহী হয়ে উঠি। জানি দুবার যখন

প্রত্যাখ্যান করেছেন, এবারও অস্বীকার করবেন; তবু একটা বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়ভূ হয়। আমার সই দেখলে অগ্রাহ্য করবেন না মিহিরবাবু। অবশ্যই আসবেন তিনি। সাহিত্য মন্দিরের জন্য নয়, আসবেন আমার জন্যই।

সম্পাদককে জিজ্ঞেস করলাম, 'সভাপতি উঠবেন কোথায়? যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে আমার এখানেই—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সম্পাদক খুশী-উজ্জ্বল স্বরে বললেন, 'তাহলে তো আমরা বেঁচে যাই স্যার, এই সব লোকের বায়নাক্কা কত! আগেও তো দু-চারজন প্রথম সারির শিল্পী-সাহিত্যিক দেখেছি, সবাই যেন ছাঁকা-তেলে ভাজা, গর্বে মুড়মুড় করছেন।'

সপরিষদ অভ্যর্থনা করে মিহিরবাবুকে স্টেশন থেকে নিয়ে এলাম। মিহিরবাবু আমায় দেখে পরিচিতের হাসি হাসলেন, কিন্তু পূর্ব-পরিচয়ের কোন ইঙ্গিত দিলেন না।

নিজের সরকারি বাসভবনে মিহিরবাবুকে নিয়ে এসে চায়ের আসরে বললাম, 'আমাদের কবি-সম্পাদক বলছিলেন, আপনি দু বার এঁদের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেছেন, এবার না এলে আপনার লেখা বইগুলো লাইব্রেরি থেকে বের করে দেবেন।'

লজ্জায় সম্পাদকের চায়ের পেয়ালা চলকে উঠে খানিকটা চা তাঁর জামাকাপড়ে পড়ল।

মিহিরবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন, 'এ কথা সম্পাদক মশাই তো আগেই চিঠিতে লিখলেই পারতেন। কিন্তু যদি এমন ভয় সবাই দেখাতে আরম্ভ করেন, তাহলে তো কাগজ কলম তুলি ছেড়ে দিনরাত সভাপতিত্ব করে বেড়াতে হবে!'

বিনীত সুরে সম্পাদক বললেন, 'আপনি স্যার, আমাদের বড় হতাশ করেছিলেন, এতে কার না দুঃখ হয়!' তারপর আমায় বললেন তিনি, 'কিন্তু স্যার, আপনি তো জানেন কত কষ্টেই আমার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়েছিল, এঁর বই বাদ দেওয়া আর পাঠাগার তুলে দেওয়া, একই কথা। আমার কথা যদি—'

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু আমার ও মিহিরবাবুর হাসি দেখে তাতেই যোগ দিলেন।

সান্ধ্য অধিবেশনে মিহিরবাবু বক্তৃতা দিলেন। লেখা প্রবন্ধ পাঠ নয়, অসংলগ্ন ভাবে বলে গেলেন তিনি। সে ভাষণে তিনি নিজেকে সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরলেন। বিষয় ছিল, শিল্পী ও শিল্প। আমারই নির্বাচন। পূর্বে মিহিরবাবুকে মনে হত কয়েকটা অসংগত এবং অসংলগ্ন ক্রিয়াকলাপের জান্তব প্রতিমূর্তি, সামঞ্জস্যহীন ভিন্নধর্মী চরিত্রের সংমিশ্রণ। সেই সন্দেহের অবসান করবার জন্যই মিহিরবাবুর বক্তব্য বিষয় নির্বাচন করে দিয়েছিলাম। মিহিরবাবু যুক্তি আবেগ ও প্রবল অনুভূতির ছোঁয়া মাখিয়ে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করলেন। অসংলগ্ন কথার মালা গেঁথে একটা চমৎকার নিবন্ধ শেষ করলেন তিনি।

॥ উনিশ ॥

দর্শনার্থীর ভিড় সরিয়ে গভীর রাতের কাছাকাছি মিহিরবাবুকে নিজের সান্নিধ্যে পেলাম। রাত্তিতে তিনি অন্য কিছু আহার করেন নি, শুধু এক গেলাস বার্লি চেয়ে নিলেন। অন্যেরা ওজর আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু আমি তাদের বারণ করেছিলাম।

ভিড় সরতে আমি ঘনিষ্ঠস্বরে মিহিরবাবুকে বললাম, 'ঘুমোবেন না আপনি?'

এতক্ষণে মিহিরবাবু আমার কাছে পুরনো পরিচয়ে ফিরে এলেন, 'তোমাব ঘুম পায় নি তো?'

'না।' আমি মৃদু ঘাড় নাড়লাম।

মিহিরবাবু ঈষৎ হাসলেন, 'আমিও আজ ঘুমোতে চাই না। দুটো ইজিচেয়ার যোগাড় করতে পার, তাহলে আরাম করে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করি?'

কথার শেষে ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করলেন তিনি।

আমি বললাম, 'ভেতরের বারান্দায় চলুন। ড্রিঙ্ক করবেন তো? আমারও ও বস্তুর স্পর্শদোষ লেগে গেছে, বলতে পারেন চেয়ারের গুণ; জাতে উঠতে গেলে অনেক জিনিসই মেনে নিতে হয়।'

'বাঃ, মরাল আপ্‌লিফ্‌ট্‌। কিন্তু আমার অব্যেস বহুকাল আগেই ছেড়ে গেছে। বর্ণালী মারা যাবার পর একদিনও খাই নি।'

ভেতরের দিকের বারান্দায় এসে আরাম-চেয়ারে নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন তিনি। পা দুটো চেয়ারের হাতলে তুলে দিয়ে ঘরোয়া ভঙ্গিতে বসলেন।

উঠোনে ফুলগাছ। রাতজাগা গাছগুলি থেকে কামিনী হেনার গন্ধ ভেসে আসছে। চাঁদ ডুবে গেছে। তারার স্তিমিত আলোয় বসে দুজনে গল্প করছি। মিহিরবাবুর ইচ্ছানুসারে বাতি নিবিয়ে দিয়েছি, তবু অস্পষ্ট আলো কোথা থেকে এসে পড়ছে যেন—তাঁর মুখ দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না আমার। পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন তিনি। মাথার চুলে সামান্য পক্কতা দেখা দিয়েছে। বন্য স্বাস্থ্য খানিকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে।

ধীরে ধীরে মিহিরবাবু বললেন, 'তোমার জন্যেই আমার এখানে আসা। অবশ্য তোমার চিঠিতে ব্যক্তিগত কোন কিছুরই নিদর্শন ছিল না, কিন্তু নিচের নামটুকু দেখে মনে হল, এ তুমি ভিন্ন অন্য কোন অশোক নয়। তোমার কথা মনে না হলে আমি আসতাম না।'

'আমারও মনে হয়েছিল, আমার নাম দেখে আপনি না এসে থাকতে পারবেন না।'

মিহিরবাবু চুপ করে রইলেন। আকাশে একটা পাখি ডাকল। বোধহয় লক্ষ্মী পেঁচা, কিন্তু সেদিকে তাঁর মনঃক্ষেপ হল না।

আবার বললেন তিনি, 'সেদিনকার তুমি কত বড় হয়ে গেছ, একটা জেলার মালিক!'

'এ তো আপনারই ভবিষ্যৎ-বাণী।'

'তাই নাকি! আমার তো মনে নেই?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আমার বিদ্যের বহর দেখে আপনি বলেছিলেন, এই সব ছেলেই আই.সি.এস. হবার যোগ্য। আমি অবশ্য আই.সি.এস. হই নি, তবে ইংরেজ শাসন থাকলে বোধহয় তাই হতাম।'

আমার কৌতুক মিহিরবাবু সরল হাসি দিয়ে উপভোগ করলেন, 'তোমার এত মনে থাকে! আমার স্মৃতিশক্তি কিন্তু খুব ক্ষীণ। মীনাকেই আজকাল ভাল করে মনে পড়ে না।'

চমকে উঠলাম আমি, 'তার মানে! মীনামাসিমা কোথায়?'

'জানি না।' স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন তিনি, 'সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ফেলতে ফেলতে বললেন, 'কলকাতায় আমার ছবির একটা বিশেষ প্রদর্শনী ছিল, আমি মীনা আর আরতি দেখতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে সে ইচ্ছে করেই হারিয়ে যায়। আমাদের এক মিনিট দাঁড়াতে বলে সে চলে গেল, ফিরল না। আমি জানতাম ফিরবে না। আরতি আর সীতা খুঁজতে বলেছিল, আমি খোঁজ করি নি।'

'আরতি আপনার কাছেই থাকত বুঝি, আর ফিরে যায় নি?' আমি প্রশ্ন করি।

'না, কোথায় ফিরবে! তার প্রথম সন্তান জন্মাবার পর মীনা আমাদের বিয়ে দেয়। এখন আমাদের পাঁচটি।'

এতটা শোনবার প্রত্যাশা করি নি। মিহিরবাবুর নির্দোষ কণ্ঠের স্বীকারোক্তিতে যেন অধিকতর বিস্মিত হই।

বিস্ময় লুকিয়ে রাখতে পারি না, তারই টানে আরাম-চেয়ারে সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করি, 'সে কি, মীনামাসিমার তাহলে কি হল?'

আমার বিস্ময় মিহিরবাবু গ্রাহ্য করলেন না। শান্ত এবং অবিচলিত ভাবে বললেন, 'বললাম না, মীনা ইচ্ছে করে হারিয়ে গেল! তাছাড়া সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী ছিল না। তাকে আমি পড়াতাম, তখন থেকে আমাদের পরিচয়। ইংরেজি আর বাংলা পড়াতাম আমি। আর ইতিহাস। তারপর দুজনে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে কলকাতা যাই, মীনা তখন এম.এ.পাস করে গেছে। খোঁজখবর নিয়ে কালীঘাটে বিয়ে করতে গেলাম, কিন্তু সেখানকার সংক্ষিপ্ত বিবাহপদ্ধতি তার পছন্দ হল না। স্থির হল পরে সুবিধেমত ব্যবস্থা করা যাবে কলকাতা থেকে দরখাস্ত দিয়ে মীনা তোমাদের শহরে চাকরি পেল। তারপর তো সবই জানো। দরখাস্তে অবশ্য মীনা নিজেকে বিবাহিতা বলে উল্লেখ করেছিল। তারপর চাকরি করেছে, আমায় খাইয়েছে। সবই তো তার, বাড়ি থেকে পালানোর ক্যাপিটাল পর্যন্ত বড়লোকের মেয়ে নগদে-গহনায় হাজার পাঁচ-সাত নিয়ে পালাতে পেরেছিল।'

আমি যেন কৈফিয়ৎ নিতে চাই, 'মীনামাসিমাকে আপনি বিয়ে করলেন না কেন?'

হাসলেন মিহিরবাবু, 'ভেব না তাকে প্রবঞ্চিত করেছি বা করবার চেষ্টা করেছি। সতি বলতে, আমাদের সময় হয়ে ওঠে নি। আমি তখন নিজের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত, মীনা আমার কাছে একটা প্রয়োজন ও সাময়িক জৈবিক বাসনা পরিতৃপ্তির উপাদান ভিন্ন আর কিছু নয়। আর আমি তার সংকল্পের প্রতীক। সে আমায় গড়ছে। আমার বাহ্যিক জগতের প্রয়োজনীয় সবকিছুর যোগান দিয়ে আমার মানসিক জগৎটাকে ভারমুক্ত করে রেখেছে আমার সাফল্য ভিন্ন সে কোনদিন কিছু খোঁজে নি। চায় নি। তাই যেদিন সে বুঝল আমি সফল হয়েছি, আমার সাধনা বাইরের জগতে স্বীকৃতি পেয়েছে, সম্মান পেয়েছে, সেদিন তার কাজ শেষ হয়ে গেছে জেনে সে চলে গেছে। এ মীনার আত্মাভিমান। সে যেখানেই থাকুক এ কথা সর্বদাই মনে মনে অনুভব করে, আমার গৌরবের সবটা তারই দানে সমৃদ্ধ। তার দানেই আমার ঐশ্বর্যের সৃষ্টি। মীনা আমার কৃতজ্ঞতা কামনা করে নি, আমার যশের অংশ গ্রহণ করে নি। আমার প্রেরণারূপে বাঁচতে চায় নি। সে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে গেছে, দানের ওজনে আমায় কিনে রেখে গেছে। মীনাকে আমি বিবাহ করলেও ধরে রাখতে পারতাম না।'

আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বর্ণালীর কথায় এসে পড়ি। আমার সন্দেহ দৃঢ়তর হয় অপরিণয়ের সন্তান বলেই তাকে মীনামাসিমা হত্যা করেছিল।

মিহিরবাবু বলেন, 'এ ব্যাপারটাই আমি বুঝে উঠতে পারি নি। আমার মনে হয় মীনা মেয়েটাকে মেরে ফেলেছিল; অবশ্য যে কারণে তোমার এই সিদ্ধান্ত, তা ভুল। মীনার মনে যে দৃঢ়তা ছিল তাতে সন্তানের বৈধতা বা অবৈধতা নিয়ে তার মাথা ঘামাবার কথা নয় তবে সে চাইত না, এমন কিছু আসুক যা আমার সাধনার প্রতিবন্ধক হয়। আমার মনে হয় তাই মীনা বর্ণালীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে বলে খুন করে নি

বর্ণালীর মৃত্যু একটা অজ্ঞাত আকস্মিক অঘটন ভিন্ন আর কিছু নয়। মীনার কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারি না, সে অতি সাংঘাতিক বিষয়ও লঘুভাবে নিতে পারত। এমন মানুষ মিথ্যে বলবে কেন!'

মিহিরবাবু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, কিন্তু পরক্ষণেই যেন বাকি কথাগুলি বলার আগ্রহে জোর করে সে অন্যমনস্কতা দূর করে বললেন, 'মীনা যখন বুঝল বর্ণালীর মৃত্যুতে আমি তাকেই সন্দেহ করেছি এবং তাকে আর সহ্য করতে পারছি না—হয়তো এ ভাবে কিছুদিন থাকলে আমি উন্মাদ হয়ে যেতাম—তখন সে আরতিকে আমার সঙ্গে বেঁধে দিল। মানুষের অবিশ্বাস যত প্রবলই হোক, শোক তার যত কঠিনই হোক, সাধারণ জৈব প্রবৃত্তি থেকে সে কিছুতেই মুক্ত হতে পারে না। মীনা যথার্থই অনুমান করেছিল, আরতির আকর্ষণে আমি আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েছিলাম। এখানেই মীনার সঙ্গে অন্যান্য নারীর পার্থক্য। মীনা আমার বিবাহিতা স্ত্রী হলেও তাই করত, যেভাবে সে গেছে, তেমনি করেই আরতির সঙ্গে আমায় বেঁধে দিয়ে চলে যেত।'

মিহিরবাবু আর একটা সিগারেট ধরালেন, 'আরতিকে বিবাহ করে আমি সাধারণ মানুষের মত জীবন নির্বাহ করতে পারছি। তার ঈর্ষা লোভ মমতা ভালবাসা উদারতা সংকীর্ণতা সবই আছে। মাটির মানুষের সব দোষগুণই আরতির আছে। মীনা ছিল মহাকাব্যের নায়িকা; সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল তার, কিন্তু ধারণ করার শক্তি ছিল না। স্থৈর্য ছিল না। গড়া জিনিস সে আগলে রাখতে চাইত না। দাম্পত্য জীবন বলতে যা বোঝায় সে তার উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু তাই বলে তার মধ্যে কোন অসম্পূর্ণতা ছিল না, অশোক!'

আমি মিহিরবাবুর সঙ্গে সহমত হতে পারছি না, সেটুকু ব্যক্ত করে ফেলি, 'আপনি মীনামাসিমার প্রতি অবিচার করেছেন। তাছাড়া আপনার জীবনের কথা শুনলে আপনাকে অত্যন্ত অসঙ্গত ও ব্যভিচারী বলে মনে হয়!'

মিহিরবাবু আমার কঠোর সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হলেন না, বরং আমার মন্তব্যের অনুমোদন করলেন তিনি, 'জানো অশোক, শিল্পীজন্মই একটা অভিশাপ, স্বাভাবিক মানুষের নিয়মে সে চলতে পারে না।'

'তার সব পাণ্ডিত্য বিফল হয়ে যায় বলুন?' আমি সুস্পষ্ট কণ্ঠে ব্যঙ্গোক্তি করি।

তিনি যেন উত্তর দিতে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হলেন, তারপর বললেন, 'সাময়িক ভাবে আমি যদি নিজেকে শিল্পস্রষ্টা বলে দাবি করি, তুমি হেসো না অশোক। কিন্তু তোমার ভুলটুকু ধরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। একটা কথা জেনে রেখো, সৃজন-শক্তি কখনো পণ্ডিত হয় না। কখনো নৈতিক হয় না। এই ভুল ধারণার জন্যেই তোমরা আমাদের প্রতি অবিচার করে ফেল। আমি কি পণ্ডিত! সাহিত্যের আমি কি বুঝি, চিত্রবিদ্যারই বা কি জানি? নিজেকে বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই, কোন শিল্পীরই নেই। তার মানসিকতার কোন্ বিশেষ গুণ কোন্ বিশিষ্ট পদার্থ কাব্যের ছন্দে বা চিত্রের রূপ নিয়ে অথবা গানের সুরে আপনা হতেই বেরিয়ে আসে—তার বিচারক তোমরা। তার বিচারক পণ্ডিতমণ্ডলী। পাণ্ডিত্যের ধর্ম সৃষ্টি নয়; তার কর্ম সমালোচনা। বিশ্লেষণ। শিল্পী পণ্ডিত হয় না। পণ্ডিতও শিল্পী হয় না। আমার বিশ্বাস খুব বড় রকমের সৃষ্টি অজ্ঞানতা থেকেই হওয়া সম্ভব, জ্ঞান মহৎ সৃষ্টির অন্তরায়। বাইরের প্রবাহ এলে ভেতরকার স্বাভাবিক স্রোত চাপা পড়ে যায়।'

মিহিরবাবুর বিচিত্র কথার স্রোতে আবদ্ধ হয়ে আমি ভেসে চলি। তাঁর কথাগুলো

হৃদয় স্পর্শ করে, কিন্তু সব সময় যেন যুক্তি ছুঁতে পারে না। নীরব শ্রোতা আমি, অপ্রতিবাদ নিরুত্তরে বসে থাকি।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে মিহিরবাবু আবার প্রসঙ্গ টেনে চললেন, 'শিল্পীর মনে কুনীতি সুনীতি বলে বাস্তবিকই কিছু নেই; তার ভাবাবেগকে সে বাইরে ছড়িয়ে দেয়। ব্যক্তিগত ভাবে যে এই প্রবাহমুখে পড়ে, সে ভেসে যায়। তাই শিল্পীর জীবন অতি দুঃখের। সে সুন্দরের সৃষ্টি করে, কিন্তু ভাবের মজুর, নিজেকে সুন্দর করার শক্তি তার নেই। অবসরও নেই। সাধারণ মানুষের মত আত্মবিচার বা আত্মনিয়ন্ত্রণ করার শক্তি থেকেও সে বঞ্চিত প্রেম আর সঙ্গকামনার অনন্ত বুভুক্ষা নিয়েই শিল্পীর মৃত্যু!'

মিহিরবাবু আবার প্রথম কথাতে ফিরে এলেন, 'তুমি আমায় নিয়ে কিছু লিখে অশোক, এটুকু বলবার জন্যেই আজ তোমার কাছে এসেছি। আমায় যেমন দেখলে, যেমন বুঝলে, অসঙ্কোচে তাই লিখো। আমি জানি, মৃত্যুর পর অনেকে আমার জীবনী লিখবে ততটা প্রতিষ্ঠা আমি পেয়েছি। কিন্তু এ-ও জানি, আমার কথা কেউ লিখবে না। আমার নামের পাশে অনেক বিশেষণ পড়বে—ঋষি, আচার্য, পরমদ্রষ্টা, সংবেদনশীল মনীষী—সমস্ত অভিধান উজাড় হয়ে অর্ঘ্য পড়বে! তুমি এভাবে শিব গড়তে বাঁদর গড়ে না, অশোক। আমায় দেবত্ব দিও না, দানবরূপেও দেখিও না। আমি যা, ঠিক ততটুকু তুমি লিখো। তাতে আমার সম্মানহানি হবে না, বরং প্রকৃত মানুষের মর্যাদাই আমায় দেওয়া হবে।'

মিহিরবাবু ক্ষান্ত হলেন। আমিও আর কথা তুললাম না। রাত গভীর হয়েছে, কিন্তু এ গভীরতা আলোর দিকেই এগিয়ে চলেছে। আকাশের দিকে তাকালাম, চতুর্দিকে কালোর ছড়াছড়ি, তবু এর মাঝেই খানিকটা আলোর ইঙ্গিত!

॥ উপসংহার ॥

মিহিরবাবুকে কথা দিলেও তাঁর জীবনকালে এ কাহিনী প্রকাশ করতে পারি নি। আমার পক্ষে সংস্কার ও সংকোচ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি।

মিহিরবাবুর মৃত্যুর পঞ্চম বছরে তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মীনামাসিমাকে দেখেছিলাম আমি। মহিলামহলে বসেছিল সে। পরনে সাদা সিল্কের থান, বয়স ষাটের কাছাকাছি। মাথার চুলে সময়ের সাদা-কালোর গভীর স্পর্শ লেগেছে।

কিন্তু মীনামাসিমা যেন আগের চেয়ে সুন্দরী। তার যৌবনের অগ্নিগর্ভ সৌন্দর্য নিভে গিয়ে সমাহিত জীবনের রূপ ফুটে উঠেছে। অপরূপ মনে হল মীনামাসিমাকে।